অমিয়ভূষণ

অমিয়ভূষণ মজুমদার

অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র

১ নিজের কথা গড় শ্রীখণ্ড প্রমীলার বিয়ে মধুছন্দার কয়েকদিন
নন্দরানী তাঁতি বউ সান্যালদের কাহিনী ইতিহাস
গারদ সুনীতি গড অন দি মাউন্ট সিনাই
রচনাপ্রসঙ্গ অংশে সংযোজিত উদ্বাস্তু

অমিয়ভূষণ
রচনাসমগ্র
২

গ্রন্থনা

তরুণ পাইন   অপূর্বজ্যোতি মজুমদার

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০০৭৩

AMIYABHUSHAN RACHANASAMAGRA (Vol II)
Collected Works in Bengali of AMIYABHUSHAN MAJUMDAR
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241-2330/2219-7920 Fax : (033) 2219-2041
e-mail : deyspublishing@hotmail com
Rs. 300.00

ISBN 81-295-0120-1

প্রচ্ছদ · সোমনাথ ঘোষ

৩০০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণ-সংস্থাপন : দিলীপ দে, লেজার অ্যান্ড গ্রাফিক্স
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৬

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

নিবেদন

কালের মাত্রায় পর্যবেক্ষণ সম্ভব, কিন্তু কোনো একজনের জীবনকালেই সময় ছোট-বড় নানাভাবে, নানা বিভঙ্গে সময়ের মধ্য থেকে সময়-পূর্ব, সময়-ভবিষ্যতে কীভাবে যে জড়িয়ে থাকে ঠাহর করে ওঠা সম্ভব হয় না। (সময়ের রূপ কতটুকুই-বা এই এক আঁজলা-জীবনে ধরা যায়)। কোনো এক সংগীতগুণী, চিত্রশিল্পী বা সাহিত্যকর্মীর অবর্তমানে কালের মাত্রার ভাবনা ফিরেই আসে—আমরা তাঁর সঙ্গে সাল-তারিখ মিলিয়ে মাত্রাবদ্ধ করতে চাই, এক সোজা সহজ ছকে সাদাসাপটায় বুঝে নিতে চাই। কেননা, সে-জীবন তো তখন এক সম্পূর্ণতা পেয়েছে জীবনের সত্যিকারের অর্থে ; মনে হয় তখন মাত্রাবদ্ধ করার কাজটি সহজ, সোজা। অথচ তাঁর যাপিতজীবনেই ছিল সময়ের খণ্ড-খণ্ড ধারা, জীবনযাপনের অন্তঃস্থ ছিল পূর্বকাল যেমন সেভাবেই আগামীর আকাঙ্ক্ষা—আর বর্তমান তো ভীষণই সাময়িক, তাৎক্ষণিক। হোক না লেখক-শিল্পী-সংগীতগুণী মানুষটি আমাদের বর্তমানে নেই, চারপাশে তখন ছড়ানো-ছিটানো তাঁর কৃতি, আর আমাদের পথ চলা এই কৃতি সম্বল করে। দেখি যে কখন তাঁরা নিজেদের কৃতিরই মধ্যে সময়কে ভাঙেন, গড়েন—নিরন্তর সন্ধানে থাকেন সংজ্ঞার স্বরূপে। মাত্রাবদ্ধ করার কাজ তখন আর সময়ের নিগড়ে আঁটোসাটো রাখা যায় না, মেনে নিতে হয় কাজ-চালানো-গোছের এক কালানুক্রম। আর, শেষ পর্যন্ত শ্রোতা-পাঠক তো স্বাধীন, নিজেই তিনি গড়ে নেন অসংখ্য অজস্র বিন্যাস—কৃতি তখন বহুস্বর সমৃদ্ধি পায়, কালের মাত্রাকেন্দ্রিক হয়েও সময়ের বৃহতের মধ্যে আশ্রয় পায়।

রচনাসমগ্রের দ্বিতীয় খণ্ডেই খানিক সরে আসতে হল ঘোষিত-নীতি থেকে। এক 'ত্রয়ী' উপন্যাসের পর্বে-পর্বে বাংলা দেশের 'নীলাক্ত' সময় ঘিরে মানুষ-মন-সমাজের কথা লিখতে চেয়েছিলেন তিনি—বহু আলোচিত নাটকটির মতো নয়—আন্দোলনকেন্দ্র কলকাতা থেকে দূরে দেশীয় রাজারানী-সাহেবমেম নিয়ে সময়ের আবহে ইতিহাসেরই আর-এক প্রেক্ষিত। প্রকাশসালের পার্থক্য উপেক্ষা করে ত্রয়ী উপন্যাসের দুটি একত্রেই গ্রথিত হল, তৃতীয়টি তো আর হয়নি। সহজ ছকে অন্য নির্দিষ্ট খণ্ডে ক্রমে গেঁথে দেয়া যেত পরেরটি ; কিন্তু সে হতো এক ধৃষ্টতা, মূর্খামি যদি না-বলি। পাঠকের সঙ্গে 'সংবিত্তি,' কম্যুনিকেশন অর্থে, চেয়েছিলেন অমিয়ভূষণ, তাহলে পাঠককে অপমান করা হয়।

প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর পাঠক-প্রতিক্রিয়ায় আমরা খানিক বিমূঢ়। অথচ কী ত্রুটিই-না আমাদের নিজেদের কাছে ধরা পড়েছে। ঘরসংসার নিয়ে পাঠের যে-জগৎ বিশ্বসাহিত্যে বাঁধা পড়েছে সেখানে স্বকীয়তার সব চিহ্ন ধারণ করে বাংলাভাষার পাঠক বিশ্ব-মন হয়ে উঠুক—এই একমাত্র আস্থায়, বিশ্বাসে বারেবারে তিনি লেখার জগতে ফিরেছেন। আর, তখন তিনি নাগর-নগরীর প্রাজ্ঞ হাসি থেকে বহু দূরে, আপনাতে আপনি মগন।

আমরা পাঠকের কাছে কৃতজ্ঞ। অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র বাস্তবিক সমগ্র হয়ে উঠুক—এই সদিচ্ছায়, ভালোবাসায় যাঁরা আগ বাড়িয়েই সাহায্য করছেন তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের ঋণ। অবশ্য, নিজেরা তো জানি ভবিষ্যতে সঠিক যোগ্যতর কেউ 'রচনাবলি'-র দায়িত্ব পালন করবেন, তার আগে অন্তত একটা বীজতলা তৈরি হয়ে থাকুক। নমস্কারান্তে।

অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র
দ্বিতীয় খণ্ড

সূচি

প্রথম পরিচ্ছেদ ৯

উ প ন্যা স
নয়নতারা ২১
রাজনগর ১৯৩
গ ল্প
দীপিতার ঘরে রাত্রি ৪৪৯
কলঙ্ক ৪৫৯
দুলারহিনদের উপকথা ৪৬৮
অঘটনা ৪৭৯
শহিদ ৪৮৮
সাগ্নিকা ৪৯৮

না ট ক
মহাসত্ত্ব ৫১৫

রচনাপ্রসঙ্গ ৫৪৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

What though the earlier grooves
Which ran the laughing loves
Around thy base, no longer pause and press?
What though, about thy rim,
Skull-things in order grim
Grow out in graver mood, obey the sterner stress?

সে সবকিছু বুঝতে চেয়েছিল। তার ইচ্ছা ছিল আঙুল দিয়ে অসীমকে স্পর্শ করার। কিন্তু একটু বয়স বাড়লে সে বুঝতে পারল অসীমকে স্পর্শ করা যায় যে-দিগন্তে তার পথ গিয়েছে বইয়ের বন্ধ পাতার সংকীর্ণ গিরিবর্ত্ম দিয়ে। সেই পথেই সে চলেছে। সে কি পৌঁছবে কোনো গন্তব্যে? হয়তো কোনো নগণ্য অখ্যাত সরাইখানার জীর্ণ দেয়ালগুলিই হবে তার অসীম যাকে সে শেষবারের মতো স্পর্শ করতে চাইবে। তাহলেও এ-যাত্রা ভালো। এর চাইতে আনন্দের আর-কিছু সে খুঁজে পায়নি অনেক পরিভ্রমণ করেও।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের এক শীতকালের সকাল আমার কাছে স্মরণীয়। এই সকালেই আমাদের পরিবারে চূড়ান্ত একটা পরিবর্তন এসেছিল। আমরা গ্রাম থেকে শহর, নীলকুঠির বিত্তহীন বনেদিয়ানার চাইতে নিম্ন-মধ্যবিত্তের আধুনিকতা পছন্দ করে নিলাম। কারণ সেদিন আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হল। আর আমার এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারটাকে সহজ ও সার্থক করার জন্য আমাদের পরিবার পাবনা থেকে কোচবিহারে এল। এ একরকমের আদর্শবাদ যার মূল্য খুঁজে পাওয়া খুব সহজ নয়, অন্তত ধনবিজ্ঞানের কোনো সূত্রের সার্থকতা নেই এখানে।

সেই শীতের সকাল আমার কাছে প্রথম পরীক্ষাকে নিয়ে এল। ভয় ছিল, কিন্তু সেদিনই ভয় ভেঙেও গেল। দেখলাম বই না-পড়েও পরীক্ষা দেয়া যায়। ইংরেজির যে-বই থেকে পরীক্ষা করা হল সে-বই আমার পরিচিত নয় কিন্তু দেখা গেল পরীক্ষা সবটুকু যাচাই করে না, বই পড়া না-থাকলেও পরীক্ষায় সাফল্য পেতে আটকায় না। এ-ব্যাপারটা বোধ হয় ভালো হয়নি। কারণ পরীক্ষার ভয়ে আমাকে মনোযোগী ছাত্র করেনি কোনোদিন। বরং যা অর্থহীন বোধ হয়েছে পরীক্ষায় নম্বর পাওয়ার লোভ তা আমাকে কোনোদিনই আকর্ষণ করতে পারেনি। কাকে স্পর্শবর্ণ বলে আর জলের সঙ্গে ঔকা যোগ করে জোঁক করা যায় কিনা এ নিয়ে মাথা ঘামানো আমার রুচিতে আটকাত। (এখনও আমার ধারণা রক্তের সঙ্গে ঔকাদের যোগ করলে বরং ওদের স্বরূপ বোঝা যায়)। বাংলা পড়াতেন অতুল ঘোষ মশায়। এখন হয়েছে কি তিনি চাইতেন যে তাঁর ছাত্ররা পাঠ্যপুস্তকে মনোযোগ দেবে। কিন্তু যে-ছাত্র রামায়ণ-

মহাভারতের গল্প জেনে ফেলেছে, দিদিমার কাছে রবিবাবু নামে এক ভদ্রলোকের গল্প শুনেছে, এস্রাজের সঙ্গে গলা মিলিয়ে 'তোমার অসীমে'র সন্ধানে গান গাইছে তার কাছে ডুবালের চরিত্র হাস্যকর মনে হওয়া স্বাভাবিক ছিল। এখন হাসি পায় কিন্তু তখন তর্কটাকে খুব কঠিন বলেই মনে হয়েছিল। বড়দের উপরে আস্থা নষ্ট হয়েছিল। রবি ঠাকুর বড় কবি—কিন্তু কী তাঁর পরিচয়? লাঙল গলা ছেড়ে কাঁদছে আর তার ভাইয়ের নামও ফলা। গলা ছেড়ে কাঁদাটা এত বিশ্রী ব্যাপার যে রিয়ালিজমের খাতিরেও আজ পর্যন্ত আমার কোনো নায়ক-নায়িকাকে গলা ছেড়ে কাঁদাতে পারিনি। আর তাছাড়া জানতাম এবং এখনও জানি, কাঁদতে-কাঁদতে যারা চিৎকার করে কথা বলে তাদের রুচি ভালো না। সুতরাং দিদিমাকে বললাম রবিবাবুকে প্রশংসা করা যায় না। বইয়ের পাতাটাও আঠা দিয়ে জুড়ে দিলাম। ডুবালের চরিত্র আমার আজও জানা হয়নি।

কিন্তু স্কুল ও বাংলা সম্বন্ধে আমার আর-একটু অভিজ্ঞতা হতে বাকি ছিল। যতদূর মনে পড়ে আমাদের ক্লাস আর সিক্সথ ক্লাসের মধ্যে কাঠের পার্টিশনের ব্যবধান ছিল। ও-ক্লাসের পড়ানোর শব্দ এ-ক্লাসে ভেসে আসত। কী করে ঘটত তা জানি না। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ও-ক্লাসে পড়ানো হচ্ছিল—'যে হৃদয়ে মাতৃভক্তি নাই তাহা নরক সদৃশ'। এ ধারণাটা বদ্ধমূল করে দেয়ার জন্য চেষ্টার অন্ত ছিল না বোধ হয়। আমার কানে কথাগুলি ভেসে আসত আর আমি অবাক হয়ে ভাবতাম আমার মনও তাহলে নরকসদৃশ নয় কি? রবিবারে মা আমাকে দুপুরে পড়াতেন। সেই রবিবারে একখানা ছোট জলচৌকি পেতে তার উপরে টেবল-ক্লথ বিছিয়ে দিলাম। পাতাবাহারের পাতা এনে তার চারিদিকে বেঁধে দিলাম। তারপরে অপেক্ষা করতে লাগলাম মায়ের। বলা বাহুল্য, আসনটি মায়ের জন্য পাতা হয়েছিল সেদিন ; মা কিন্তু এই ভক্তির আসনে বসলেন না। আমার পাশে মাদুরে বসলেন। সেই থেকে আমি মাকে আর ভক্তি করি না, ভালোবাসি। কিন্তু আসল কথাটি বলা হয়নি। আমাদের উপরের ক্লাসের ছাত্ররা হঠাৎ কিছু-একটা করে বসল। হৈ-হৈ শব্দ। আমাদের মাস্টারমশাই একবার বেরিয়ে গিয়ে দেখে এসে বসে রইলেন চুপ ক'রে। হেডমাস্টারমশাই এলেন, ভোজ এল, যদু এল। বালতি করে জল এল। ডাক্তার এসেছিল কিনা মনে নেই। খবর গোপন রইল না। শুনলাম, মাস্টারমশাই সুখলালবাবু কোন-এক ছাত্রকে জুতো মেরেছেন আজ, সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে ফিরেও ভয় যায় না। অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম এমন কেন হল। একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম ছাত্রটি এমন-কিছু করেছে নিশ্চয়ই যার জন্য এমন শাস্তি হতে পারে। তারা কি 'নরক সদৃশ' পড়তে-পড়তে নরক দেখে ফেলেছে। মামার কাছে ইতিমধ্যে কোনান ডয়েলের গল্প শেষ হয়ে গিয়েছে—কোনো একটা বিষয় তেমন একমনে চিন্তা করতে পারলে বিষয়টাকে সৃষ্টি করা যেতে পারে? নরক সৃষ্টি হয়েছে নাকি। পরে যখন আমাকেও পড়তে হল নরকসদৃশ ব্যাপারটা তখন বুঝলাম, বিদ্যাসাগরের মাকে বিদ্যাসাগর ভালোবাসতেন তাই বোঝাতেই নরকের অবতারণা। নতুন সিদ্ধান্ত করলাম এবং লেখককেই নরকবাসের দণ্ড দিলাম। আজও সে-দণ্ড মকুব করিনি। সুখলালবাবুরও অপরাধ ছিল? লেখকের সঙ্গে যোগসাজশ? যে-দুষ্ট বালকটি সেদিন সুখলালবাবুর কাছে প্রহৃত হয়েছিল সে কিন্তু কৃতী। লাখপতি বণিক সে এখন। এতে অবশ্য এই প্রমাণ হয় না লাখপতি হওয়ার জন্য বাল্যে ও-রকম ঘটনা ঘটানো দরকার। হৃদয়ে বিদ্যার জন্য কোনো উত্তাপ না-থাকলেও লাখপতি হওয়া যায়—এটাই প্রমাণিত হচ্ছে?

তখন কোচবিহারের প্রধান পথগুলি ছিল লাল, সুরকির তৈরি। পথের দু'ধারে ছিল গাছ। গ্রীষ্মকালে এখন যে রকম আফ্রিকায় আছি বলে মনে হয় তখন তা হতো না। আর্টিজান স্কুলের পিছন দিকে ছিল সুরকির কল। সে-সুরকি দিয়ে রাস্তা পাকা করা হতো। তারও আগে কোচবিহারে স্টিমরোলার ছিল কিনা আমার মনে পড়ে না। সেবার একটা নতুন এঞ্জিন এসেছিল। আপনি অফিসে বসে কাজ করছেন হঠাৎ যদি আপনার কামরার বাইরে জাহাজের ভোঁ বেজে ওঠে আপনি নিশ্চয়ই অবাক হন। আপনার মনে অন্তত কামরার গা ছুঁয়ে নদীর জোয়ার বয়ে যায়। একদিন তেমনি হল আমাদের। টিফিনের ঘণ্টা হতে

কিছু দেরি। হঠাৎ সেই অবিশ্বাস্য শব্দ শুনলাম। রেল স্টেশনটা আমাদের স্কুলের হাতার মধ্যে উঠে এল? ঘণ্টা পড়তে যা দেরি। ছুটে বেরিয়ে এদিক-ওদিক সেই রেলস্টেশনটার সন্ধান করতে লাগলাম। দিনের আলোয় স্টেশনটা মিলিয়ে গেল, কিন্তু পি. ডব্ল্যু. ডি অফিসের পাশ দিয়ে জামগাছের সারির তলায় রেলের এঞ্জিন চলছে যেন। আমরা এঞ্জিনের পিছনে হাঁটতে লাগলাম, কখনও এগিয়ে, কখনও পিছিয়ে।

কিন্তু যদু ও ভোজ ছিল। ভোজ এল। আমরা প্রায় পঞ্চাশজন, কিন্তু সে সকলকেই যেন এক অদৃশ্য জালে বন্দী করে ফেলল। আর চকচকে এক ঝাঁক মাছের মতো আমাদের ঢেলে দিল হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘরে। হেডমাস্টারমশাই তখনও তাঁর ঘরে আসেননি। শুনতে পেলাম ছেলেরা বলছে, আজ ভোজ এক নম্বর আনবে। মনে-মনে ভাবতে লাগলাম, না-জানি এক নম্বর কাকে বলে। এমন সময়ে হেডমাস্টারমশাই এলেন। আমরা ঘরের দেয়াল বরাবর দুই সারিতে দাঁড়ালাম। সংখ্যায় এত ছিলাম যে তাতে চাপাচাপি হচ্ছিল। আমি আকারে ছোট ছিলাম বলে এক কোণে পড়েছিলাম। তারপরে হেডমাস্টারমশাই এলেন— বিরাট চেহারার ফর্সা এক ভদ্রলোক, মুখ থমথম করছে তাঁর। চেয়ারে বসেই টেবলের ঘণ্টা টিপলেন। ভোজ এল, কিছু বলল সে। তারপর জিজ্ঞাসা শুরু হল। একটিমাত্র প্রশ্ন—তুমি রোলার এঞ্জিনের কাছে গিয়েছিলে? একই উত্তর—না, যাইনি সার। প্রথম সারির পর দ্বিতীয় সারি। আমি বোধ হয় দ্বিতীয় সারির শেষ দুজনের আগে ছিলাম। আমার পালা এল। ততক্ষণে হেডমাস্টারমশায়ের টেবলে একটা বেত সত্যি দেখা দিয়েছে। উত্তর তো জানাই ছিল। কিন্তু কী-একটা প্রতিরোধ যেন এল মনে। হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ হল আমার, চোখে জলও এল। বেশ জোর গলায় বললাম—গিয়েছিলাম, সার। বেতটার উপরে হাত গেল হেডমাস্টারমশাইয়ের। 'গিয়েছিলে, সার'? কিন্তু হঠাৎ যেন কিছু হল। হেডমাস্টারমশাই ভাবলেন, ভাবলেন, ভাবলেন। সেটা দু'এক সেকেন্ডের ব্যাপার হতে পারে—আমাদের মনে হল বিকেল হয়ে যাচ্ছে। অবশেষে হেডমাস্টারমশাই বললেন—যাও তোমরা। আর কখনও স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে যেয়ো না। ওতে আমার অপমান হয়। ছেলেরা মাঠের উপর দিয়ে চলতে-চলতে হেডমাস্টারমশাইকে দোষ দিতে লাগল। আমার কিন্তু মনে হল—কথাটা কোথাও শুনেছি। তারপরে মনে হল, বাবার মুখে। মনে হল সত্যি হেডমাস্টারমশাইকে অপমান করেছি রাস্তায় বেরিয়ে। আমার চোখে জল এল। সেই থেকে হেডমাস্টারমশাইকে আমি ভালোবাসি। যদিও হয়তো আমার মতো ছোট্ট একটি ছাত্রের ভালোবাসা মনীন্দ্র রায় মশাইয়ের মতো একজন রাশভারি হেডমাস্টারের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সেদিনই আর-একটি ঘটনা ঘটেছিল। সাহাবুদ্দিন ছিল আমাদের সহপাঠী। যখন ক্লাশের অন্য অনেক ছেলে আমাকে বিদ্রূপ করছে, রঞ্জিত নামে একটি ছেলে আমাকে মারবে বলে শাসাচ্ছে, সাহাবুদ্দিন বলল—ওর গায়ে হাত দিলে আমার গায়ে হাত দেয়া হবে সেটা। আমি নিরাপদ হলাম। সাহাবুদ্দিন এখন কোথায় জানি না। সে মোহম্মদ ইসমাইলউদ্দিন চৌধুরী সাহেবের আত্মীয় ছিল। সে সেদিনই আমাকে একটা কলম উপহার দিয়েছিল। কাচের নিব ছিল কলমটার। কাচের গায়ে পলতোলা। ঘটনাটা ভুলতে পারিনি। এখনও যদি হঠাৎ কোনো পাখির ডাকে মনে হয় খিড়কি দরজায় সমুদ্র এসে গিয়েছে হয়তো সব নিয়ম ভুলে তা দেখতে যাব— আর দেখে এসে স্বীকার করে ফেলব কাগজ-কলমে যে আমি তেমন গিয়েছিলাম।

সাহাবুদ্দিনের আর-একটা কথা মনে আছে। প্রভাতবাবু আমাদের ভূগোল পড়াতেন। আমি ম্যাপ আঁকতে পারতাম না, আর সাহাবুদ্দিন খুব ভাল পারত। সাহাবুদ্দিন ডবল সাইন পেত রোজ, আমি পি. জি. পর্যন্ত পেতাম না। (ম্যাপ ভালো হলে প্রভাতবাবু তাঁর পুরো সই করতেন ম্যাপের পাশে, তাকে বলত ডবল সাইন। চলনসই ম্যাপে তাঁর নামের আদ্যক্ষর লিখে দিতেন, তা ছিল পি. জি.)। একদিন আমার ম্যাপ-খাতা সাহাবুদ্দিনকে দিয়ে দিলাম। বাড়ি থেকে সে আমার খাতাতেও একটা ম্যাপ এঁকে আনল। ম্যাপ দেখানোর সময়ে সে যথারীতি ডবল সাইন পেল, আমি পি. জিও পেলাম না। তখন সাহাবুদ্দিন তর্ক করল, তার নিজের খাতার ম্যাপ ও আমার খাতার ম্যাপ দেখাল। প্রভাতবাবু একটু হকচকিয়ে গেলেন। তারপরে আমার খাতাতেও ডবল সাইন দিলেন। তারপর ব্যাপারটা তাঁকে কেউ বলে দিল।

মনে হল প্রভাতবাবু রাগে ফেটে পড়বেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর আমার খাতার মাপটার উপরে লিখে দিলেন—মানচিত্রকর : সাহাবুদ্দিন। প্রভাতবাবুর এই হাসিটা আমার মনে আছে। হাসির অর্থও ভুলবার নয়।

এই ক্লাসেই আর-একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমাদের সময়ে সাপ্তাহিক পরীক্ষা হতো। অঙ্ক কষাতেন উষাকুমার দাশ মশাই। ভদ্রলোকের মিষ্টিগলা আমাদের ভালো লাগত, কিন্তু প্রথম অঙ্কের পরীক্ষায় আমি পাঁচ পেলাম। খুব দুঃখ হল মনে। বনবাসে যাব স্থির করে ফেললাম। রবীন্দ্রনাথের 'সেথায় হবো বনবাসী' কবিতাটি পড়া ছিল। স্কুল থেকে বেরিয়ে আর্টিজান স্কুলের পাশ দিয়ে মেঠোপথে (তখন মেঠোপথ ছিল—পথের ডানদিকে জঙ্গল ছিল) পার্কে গিয়ে পৌঁছলাম। একটা বেঞ্চ দখল করে বনবাসের ব্যবস্থা করে নিলাম। কিন্তু মামাবাড়ির কর্মচারীরা বেরিয়ে পড়েছিলেন। শনিবার বেলা তিনটে পর্যন্ত আমি অনুপস্থিত। তাঁদের একজনের কাছে ধরা পড়ে গেলাম। এরপর থেকে অঙ্ক আমাকে ভর করল—যাদব চক্রবর্তী মশায় এলেন তাঁর গ্রন্থরূপে। সে কী দুর্বহ বোঝা। পাঠ্যজীবনে অঙ্ক আর আমাকে ছাড়ল না। এখনও অঙ্ক কষি, অন্যের কষা অঙ্ক, লাখো-লাখো টাকার চেক্ করি। আর গৃহিণী যখন এলেন, শুনলাম, তিনি যাদব চক্রবর্তী মশায়ের আত্মীয়া। এইটুকুই এখন সান্ত্বনা, চক্রবর্তীমশায়কে এখন দাদামশায়ের মতো মনে হয়। কিন্তু উষাবাবু ও আমার অঙ্কের যোগ এখানেই শেষ নয়। সে-কথা পরে বলব।

প্রমোশন পেয়ে উঠলাম। অবাক হয়ে শুনলাম আমাকে নাকি একটা প্রাইজও দেয়া হবে। পরে অবাকও হতাম না, চেষ্টাও ছিল না। অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। এ-ক্লাসের কথা আমার তেমন মনে নেই। সিক্সথ ক্লাসের স্মৃতি হাতড়ে আমার ইংরেজি শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষিতীশচন্দ্র রায় মশায়কে খুঁজে পাই। তাঁর কাছে ক্রোকোডাইলের গল্প পড়েছিলাম। ক্রোকোডাইল আর মানুষের গল্পে ক্রিয়াপদের ছড়াছড়ি ছিল। ট্র্যানজিটিভ কাকে বলে তা বুঝেছিলাম। সিক্সথ ক্লাস এদিক দিয়ে যেন ইংরেজির কাছে টেনে এনেছিল—অন্যদিক দিয়ে ইতিহাসের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই মনোমালিন্য হয়ে গেল। প্রথম ইতিহাসে বুদ্ধদেবের কথা থাকে। হাফইয়ারলি পরীক্ষায় প্রশ্ন ছিল—বুদ্ধদেব সম্বন্ধে যাহা জানো লিখ। যা জানতাম লিখলাম। সার্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব থেকে শুরু করে দাঁড়ি-কমা বাদ না-দিয়ে শেষ লাইন পর্যন্ত মুখস্ত। এমন সব উত্তরই হয়েছিল। ধারণা ছিল নব্বইয়ের ঘরে পাব। তাহেরউদ্দিন সাহেব ছিলেন পরীক্ষক। তিনি অনেক কষ্টে তেত্রিশ নম্বর দিয়েছিলেন। কারণ? কারণ, একশো নম্বরের উত্তর আমার তিনপাতায় শেষ হয়েছে। সেই ইতিহাস সম্বন্ধে আমার শেষ কথা হয়ে গেল। বই একটা কিনতাম, পরীক্ষার আগের রাত্রিতে উল্টে দেখতাম। পরীক্ষার আগে ছুটি পেলে পরীক্ষা একটু ভালো হতো। কিন্তু ছাত্রদের এ রকম করা উচিত নয়। আমার বরং লোকসানই হয়েছে। ইতিহাস পড়া আমার শেষ হয়নি। এখনও ইতিহাসই আমার পড়ার সময়ের এক-তৃতীয়াংশ কেড়ে নিচ্ছে। আর বুদ্ধদেব? তাঁর সম্বন্ধে এখনও কিছু কি জানি। শুধু বুঝেছি—আধুনিক ফরাসি একজিস্টেনসিয়ালিস্ট লেখকদের মতোই তিনি আধুনিক।

স্কুলের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন-একটি বিষয় এ-সময়ে আমাকে টানতে থাকে। কিম্বা অন্য কথায় জেনকিন্স স্কুলের পরিধি আমার কাছে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। কেশবাশ্রম, ব্রাহ্মমন্দির, স্কুল ও আমাদের বাড়ি এসবই ছিল যেন এক-একটা বিদ্যালয়। বিকেলে খেলতাম সঙ্গীদের সঙ্গে, কিন্তু ওরই মধ্যে মন উধাও হয়ে যেত। কেশবাশ্রমের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম কিছুক্ষণের জন্যে, ফিরবার সময়ে বিকেলের পড়ন্ত-আলোয় ব্রাহ্মমন্দিরের বাড়িটার পাশ দিয়ে খুব ধীরে-ধীরে হেঁটে আসতাম, চেষ্টা করতাম যেন পায়ের জুতো রাস্তার খোয়ার শব্দ না-করে। এ কথা এর আগে কাউকে বলিনি, বলতে লজ্জা করত কারণ বিষয়টা একটা স্বপ্নের মতো কিছু। খুব ছোটবেলায় প্রিন্স ভিক্টরের বাড়িতে যে-আনন্দমেলা হতো তাতে যেতাম। তার স্মৃতিটা মনে আলো হয়ে ছিল। ইতিমধ্যে দিদিমার সঙ্গে একজনকে আলাপ করতে শুনেছি। আলাপের অর্থ বুঝিনি, কিন্তু ধ্বনি আমাকে বিস্মিত করেছিল। যেন দিদিমা এবং তিনি মুখে-মুখে কবিতা বলে যাচ্ছেন। শুনলাম, তিনি কেশব সেনের মেয়ে। কে কেশব সেন? দিদিমা

তাও বললেন। কেশব সেন, দেবেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে দিদিমার গল্প রামতনু লাহিড়ী মশায়কে ছুঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল। দিদিমার বাবা সেকালের মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, দিদিমার কাকা ছিলেন রামতনু লাহিড়ী মশায়ের জামাতা। মনের অ্যালকেমির ধরনধারণ বিস্ময়কর। কী করে যেন শিশুকল্পনায় রামতনু লাহিড়ী আমার দাদামশায় হয়ে গিয়েছিলেন। জেনকিন্স স্কুল কেশব সেনের জামাতার সৃষ্টি। সেদিক দিয়েও স্কুল আমার আপন হয়ে উঠল। মন আমার বর্তমানকে ছাড়িয়ে অতীতে চলে গেল। আমি পুরনো দিনের এক আবহাওয়ায় বাস করতে লাগলাম। কিন্তু পুরনো বলেই মৃত নয়। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামে বইখানি যোগাড় করা গিয়েছিল। বইটির মলাট ছিল না, অনেকদিন পর্যন্ত বইটির নাম ও লেখকের নাম আমার অজানা ছিল। কিন্তু শনিবারের বেলা দুটো থেকে চারটে প্রায় দু'মাস এ-বইটি আমাকে খেলা থেকে দূরে রাখত। রামমোহন রায়কে দেখলাম—কলকাতার পথে নয়, সাগরদিঘির পার দিয়ে হেঁটে ব্রাহ্মমন্দিরে যেতে। প্রায় দু-তিন বছর ধরে আমি এই আবহাওয়ায় বাস করেছি। আমার মন যেন বাঙালি হওয়ার জন্য বাঙালির সেই জন্মমুহূর্তে ভূমিষ্ঠ হতে চাইছিল।

ওদিকে তখন স্কুলে পড়া চলছে। নিবারণ মজুমদার মশায় তখন বোধ হয় সদ্য বি.টি. পাশ করে এসেছেন। শার্দূলপ্রতিম তাঁর চেহারা। পাঠ্য বিষয় ইংরেজি। পুমা এবং জাগুয়ারের গল্প। পুমা মানুষের বন্ধু, জাগুয়ার শত্রু। তারপর এল গরিলার গল্প। পেশিশক্তির পরাকাষ্ঠা। দাঁতের দাগ বসে যায় বন্দুকনলের ইস্পাতে। হাত দিয়ে মাথা ঢেকে সে বৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করে। সন্তান-সন্ততি যখন গাছের ডালে ঘুমায় সে তখন গাছের গোড়ায় প্রহরী। গরিলাকে ভালো লাগত। পাঠ্যবিষয় ও পাঠের উদ্যোক্তার এমন সমন্বয় কম হয়। গরিলার গল্পের রস প্রচার করতে হলে শক্তিমান মানুষেরই দরকার। নিবারণবাবুর বলিষ্ঠ বাহুর আন্দোলনের দিকে চেয়ে গরিলার গল্প আমাদের ভালো লেগে উঠত। কিন্তু নিবারণবাবু আশ্চর্যভাবে আমার কাছে প্রথম প্রেমের কবিতা পাঠক হলেন। একদিন তিনি পড়ালেন—

Her arms across her breast she laid
She was more fair than words can say
Barefooted came the beggar maid
Before the king Cophetua.

আশ্চর্য ভালো কবিতা। আশ্চর্য ভালো কবির সৌন্দর্য বর্ণনার কৌশল। ইংরেজি তাহলে ক্রোকোডাইলের ট্রানজিটিভত্ব দিয়ে শুরু করে গরিলার বলবত্তায় শেষ নয়? দ্যাখো কবি কী বলেছেন—

Cophetua swore a royal oath—
This beggar maid shall be my Queen.

নিবারণবাবুকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি যা পড়াবেন তা এমন মন দিয়ে পড়ব যে একবর্ণ ভুল হবে না—এই শপথ নিলাম। তিনি এরপরে বোধ হয় ছ'মাস ধরে ইংরেজি verb-এর conjugation পড়ালেন। আর-কেউ বোধ হয় এমনভাবে ইংরেজির এই দুর্গজয়ের শক্তি রাখতেন না। চার্চিল আর-যাই পারুন, ভারতীয় বলে আমার কাছে থেকে তাঁর ভাষা ব্যবহারের স্বাধীনতা সেই পরাধীন যুগেও আটকে রাখতে পারেননি।

কিন্তু এই ক্লাসে দেখা হল উপক্রমণিকার শিক্ষক পরেশ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে। 'নর' শব্দ পড়তে-পড়তে একটা কাণ্ড হয়ে গেল। হ...বলে একটি ছেলে পড়ত আমাদের সঙ্গে। সে কী করেছিল আমাদের মনে নেই, কিন্তু পরেশবাবু তাকে ছাতি দিয়ে মেরেছিলেন। টিফিন পিরিয়ডে যদু এসে ডেকে নিয়ে গেল হ...কে। আমরা ভাবলাম—না-জানি কী হবে। কিন্তু হ...ফিরে এল, তার হাতে একখানা নতুন এক্‌সারসাইজ বুক ও একটি সুন্দর পেনসিল। আমরা সবাই হ...কে ঘিরে দাঁড়ালাম। এক্‌সারসাইজ বুকে কিছু লেখা ছিল। হ...রাগ করে খাতা ফেলে দিল। কারণ তার কাছে পরেশবাবুর প্রশ্নগুলো উত্তর দেয়ার মতো কিছু

তো ছিলই না এবং সেগুলো খাতাখানার নতুনত্বকেই নষ্ট করেছে। হ...র জীবন ভালো হয়নি। শুনেছি যে সমাজবিরোধী কার্যকলাপের জন্য সে জেলও খেটেছে।

পরেশবাবুর কথা বলতে গিয়ে ঋষির কথা মনে হয়। অপূর্ব এক আধুনিক ঋষি। সারা জীবন ক্রিকেট সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে পেনশন নিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। কিন্তু ঋষিকল্প এই শিক্ষক ব্রহ্মবিদ্যার চর্চায় ব্যাপৃত থেকেও বালখিল্যদের কথা ভুলে যেতেন না। আমার 'র' এবং 'ড়'-য়ে খুব ভুল হতো। একবার বাংলা পরীক্ষার খাতার উপরে তিনি আমার জন্যে একটা ফরমুলা লিখে দেন। তারপর থেকে ও-ভুলটা আর হয় না। দ্বিতীয়বার বাংলা পরীক্ষার খাতার উপরে তিনি লিখে দিলেন—**you should not copy the Hooghly Valley dialect** ; এর আগে আমি ক্রিয়াপদে তুম, লুম প্রভৃতি ব্যবহার করতাম। সেই থেকে ছেড়ে দিয়েছি। বুঝতে পেরেছিলাম চলতি বাংলা বলে যে-ভাষা আমাদের ব্যবহার করতে হবে সেটা হুগলি ভ্যালির কথ্য ভাষা নয়। যারা পরেশবাবুর কাছে পড়েছেন তাদের অবশ্যই মনে পড়বে সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রগুলি পড়াতে তিনি কী করে বিমল হাস্যরস সৃষ্টি করতে পারতেন। বোর্ডে লিখলেন—তোঃ শ্চুনাশ্চুঃ। আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। তখন সেটা তিনি এমনভাবে উচ্চারণ করলেন যে ধমক খেয়ে হকচকিয়ে গেলাম আমরা। তখন তিনি বোর্ডে লিখলেন—ষ্টুনাষ্টুঃ। সম্পূর্ণ অন্যগ্রামে উচ্চারণ করলেন সূত্রটি। মৃদু-মৃদু হাসলেন। বললেন—কী মধুর, কী মধুর স্তোঃ শ্চুনাশ্চুঃ ষ্টুনাষ্টুঃ। সমস্ত ক্লাস তখন হাসিতে ফেটে পড়ছে। তিনি বললেন—হাসবে না, হাসবে না, দেবভাষা। বলেই পিছন ফিরে বোর্ডে লিখলেন—তোর্লিঃ। সংস্কৃত ব্যাকরণ থেকে বিমল আনন্দ আদায় করার এ-কৌশল তাঁর পূর্ব অভ্যাসের ফল কিনা জানি না। কিন্তু কোনো বিষয়ে তাঁর পূর্ব অভ্যাসের পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম।

কালী আমার বন্ধু ছিল। আমার স্বর্গগত বন্ধু মেজর বিজয়রতন সেনগুপ্তকে তার খেলার জন্য আমি ভালবাসতাম। ক্লাস নাইনে পড়বার সময়ে সে আমাদের ক্রীড়াশিক্ষক ছানাবাবুকে টেনিসে স্ট্রেট সেটে হারিয়ে দিয়েছিল। ছানাবাবুর সে কী আনন্দ। হেডমাস্টারের ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছিল টেনিস মাঠ। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি কালীর ফোরহ্যান্ড ড্রাইভের প্রশংসা করতে লাগলেন। খেলার মাঠে কালীকে আর-একবার বিজয়ীর ভঙ্গিতে দেখেছিলাম। মহারাজা বাহাদুরের টিমের সঙ্গে ছাত্রদের ক্রিকেট ম্যাচ। কলকাতা থেকে কয়েকজন খেলোয়াড় এসেছিল। কলেজের রবি কর (তার নাম বোধ হয় রবি ছিল) আর নির্মল দাস মহারাজা টিমের চারটি উইকেট নামিয়ে দিয়েছে, কিন্তু রানও উঠেছে প্রায় দুশো। তখন এল বিজয়রতন বল করতে। তার প্রথম তিনটি বলেই রান উঠল। বিজয় বল নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দৌড়ের সীমায়, মনে হল তার মাথা নিচু হয়ে আছে লজ্জায়। কিন্তু তারপর বিজয়রতন যেন লেংথ খুঁজে পেল। ওদিক থেকে রবি কর আর এদিকে বিজয়রতন। সত্যি বিজয়ের বল দেখা যাচ্ছিল না। ছ'টি উইকেট আধঘণ্টায় পড়ে গেল। আমাদের দল ব্যাট করতে নামল, খেলার তখনও দু'ঘণ্টা সময় আছে। দু'ঘণ্টায় কি আড়াইশো রান উঠবে : আমার মনে হয় সর্বকালের এই অসম্ভব চেষ্টা করেছিল বিজয়। তৃতীয় উইকেটে গিয়ে সে দাঁড়াল, আম্পায়ারের কাছে মার্কিং নিল, তারপর শুরু হল তার ব্যাট থেকে ফুলঝুরি। এক রান-দু রান-বাউন্ডারি-বাউন্ডারি-এক রান-বাউন্ডারি। যখন সে চার ওভারে ত্রিশ রান করে আউট হল, দর্শকরা বলল আনাড়ি। আমি অন্য মত পোষণ করি। আনাড়ির অমন ফুটওয়ার্ক থাকে না।

এই কালীর সঙ্গে একদিন আমার তর্ক বাধল। তখন অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের টেস্ট ম্যাচ চলছে। পথ দিয়ে চলতে-চলতে আমরা তর্ক করছিলাম। পথটা ছিল পরেশবাবুর বাড়ির সামনে দিয়ে। আমাদের চিৎকারে পরেশবাবুর ধ্যানে বিঘ্ন হয়েছিল। জানলা দিয়ে ইশারায় ডাকলেন। কাছে গিয়ে দাঁড়ালে পথে তর্ক করতে নিষেধ করলেন। লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে গেল। তারপর তর্কের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা বললাম গত দু-টেস্টে কে কত রান করেছে, কে কার বলে আউট হয়েছে তাই তর্কের বিষয়। তিনি বিজয়কে পাশের ঘর থেকে এক মাসের অমৃতবাজার আনতে বললেন। তারপর কালীকে বললেন—তুমি দ্যাখো আমি বলি। তিনি ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার স্কোর বোর্ড বলে গেলেন। অমুক এত রান,

কট অমুক, বোল্‌ড অমুক। বিস্ময়ে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম। তারপর তিনি বললেন খেলার মতো স্মৃতিটারও অভ্যাস করা যায়। অভ্যাসে স্মৃতিশক্তি বাড়ে। উপদেশের পরে জলযোগ। টিপ্পনি কাটলেন—কালী, ব্রাহ্মণসন্তান এসেছে, খালিমুখে গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হবে।

পরেশবাবুর কথায় তাঁর আর-একটি উপদেশ মনে পড়ছে। আমাদের হেডমাস্টারমশাই স্কুলে ডিবেটিং ক্লাব স্থাপন করলেন। আমরা তখন ক্লাস এইটে পড়ি। প্রতি শনিবারে ডিবেট-এর ব্যবস্থা। ক্লাস নাইন-টেনের ছাত্ররা বার দু' এক যোগ দিয়ে বোধ হয় আমাদের সেই ছেলেখেলাকে ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু হেডমাস্টারমশাই এবং আমাদের ক্লাস এইট একে ধরে রাখলাম। সেদিন ডিবেটের বিষয় ছিল 'সুখ ত্যাগে না ভোগে', সভাপতি পরেশবাবু। দু-পক্ষের বক্তা ঠিক হয়েছে। আমাদের সহপাঠী বিজয়কৃষ্ণ সেন ত্যাগের পক্ষে। কামিনী রায়ের 'নাই কিরে সুখ নাই কিরে সুখ' কবিতাটা সে অঙ্কের ক্লাসেও মুখস্থ করেছে। কিন্তু যা শুনলাম তাতে আমাদের বুক দমে গেল। স্বয়ং হেডমাস্টারমশাই ও-পক্ষের নেতা। আমাদের ভোগের পক্ষ। আমাদের বোধ হয় কোনো নেতা ছিলেন। কিন্তু তিনি এলেন না। সভায় বসে দেখলাম বিজয়কৃষ্ণ হেডমাস্টারের পাশে বসে জয়ের আনন্দে মিটমিট করে হাসছে। আমাদের দল সেদিন বামপন্থী। কারণ বাঁয়ে বসেছিলাম আমরা। তাকিয়ে দেখি আমরা মাত্র তিনজন ছাত্র। আমি, রসময় আর ক্লাস টেনের একজন। এঁর নাম করব না কারণ তিনি সেদিন ভালো কাজ করেননি। হেডমাস্টারমশাই প্রস্তাব আনলেন 'সুখ ত্যাগে'। সে কী প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব, বক্তৃতার তোড়—সে কী জলধর গর্জন। আধঘণ্টা পরে তিনি থামলেন। অনেক অনুনয় করে রসময়কে তুলে দিলাম, সে ভালো উপকরণ সংগ্রহ করেছিল। তার প্রথম কথা মনে আছে। নুনকে আমরা ত্যাগও করতে পারি, ভোগও করতে পারি। আসুন নুনকে ত্যাগ করে শুরু করি। কিন্তু এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি রসময়ের কাজে এল না। সে মিনিট দু'এক কী বলল তা বোধ হয় সে নিজেই শুনতে পেল না। তারপর ও-পক্ষের বিজয়কৃষ্ণ উঠল। ভালো বক্তা ছিল না। তারপরে কামিনী রায় সঠিক মুখস্থ করেছে হালে। মিনিট দশেক ধরে সে-ও বলল। আর এমন মুখভঙ্গি করল যেন সে আমাদের মূর্খতায় মর্মাহত হয়েছে। এবার ক্লাস টেনের ছেলেটিকে তুলে দেব ভেবে পাশে চেয়ে দেখি আসনটি শূন্য। 'Only for a handful of silver he left us'—সে বিজয়ের পাশে গিয়ে বসেছে। ভোগের পক্ষে তখন আমি দ্বিতীয় এবং শেষ যোদ্ধা। পা কাঁপতে লাগল, গলা শুকিয়ে উঠল, মাননীয় সভাপতিমশাই বলে মিনিটখানেক শূন্য মগজ হাতড়াতে লাগলাম। তারপর কিছু বেমক্কা বলেছিলাম, শ্রোতাদের মধ্যে হাসির গুঞ্জরণ উঠল। রসময় বলেছিল পরে আমি নাকি নুনের উৎপত্তি নিয়ে কিছু বলতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু তাহলে ঠিকই শুরু করেছিলাম। ভোগ যদি নয় তবে নুনের খোঁজ কেন, কিন্তু তারপরে যে-প্রতিরোধের ভূত এখনও আমাকে কথা বলায় সেই ভর করল। বেশকিছু তরতর করে বলে ফেললাম। আর শেষের ওকালতি প্যাঁচটা এখন মনে আছে। তখন উপনিষদ নিয়ে দৈনিক বসুমতীতে আলোচনা হচ্ছিল। আর তা পড়ছিলাম না-বুঝেও। উপনিষদের এক বাণীর কদর্থ করে উপস্থিত করলাম যেমন উকিলরাই পারে। শেষ কথা বললাম ত্যাগ দ্বারা ভোগ করতে বলা হইয়াছে। তাহলে বোঝা যায় ত্যাগ ক্রিয়াটা আগে হলেও ভোগই উদ্দেশ্য। শ্রোতারা এ-হেন সংস্কৃত বাক্যের সামনে বেশ দ্বিধায় পড়ল। কিন্তু আমার আসল বক্তব্য পরেশবাবুর ভাষণ। তিনি বললেন (তাঁর কথাগুলি ভুলবার নয়)—সুখ ত্যাগেও আছে ভোগেও আছে। ভোগ করে সুখী গোলক-অধিপতি নারায়ণ, ত্যাগ করে সুখী শ্মশানচারী মহাদেব। এখানে উভয়পক্ষেই মানুষ, নারায়ণ বা মহাদেব হওয়া সাধ্য নয় ; তাদের সুখ সুতরাং আত্মবশে। এই বলেই তিনি সভাভঙ্গ করলেন। এসেম্ব্লির স্বীকার নয়, সই না-করে বিল ফেরত দিতে পারে এমন কোন প্রেসিডেন্ট। ডিবেটকে সত্যোপলব্ধিতে পরিণত করাই তার উদ্দেশ্য ছিল। আর সত্যকে তিনি যে উপদেশের ভাষায় সীমাবদ্ধ রাখেননি তার প্রমাণ তাঁর বর্তমান জীবন।

কিন্তু উপক্রমণিকার মাস্টারমশাইয়ের কথা বলতে-বলতে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। সেই ক্লাস সিক্সেই আর-একজন শিক্ষকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। একদিন দেখলাম পাঠ্যপুস্তক 'মণিমাল্য' নিয়ে

আমাদের ভূতপূর্ব অঙ্কের মাস্টারমশাই এলেন। বিরক্তবোধ হল কারণ ইতিমধ্যে 'মণিমাল্য' খানিকটা পড়ে ফেলেছি বাড়িতে। কবিতাগুলি বিশেষ করে ভালো লেগেছে। তারই কিনা এই দুর্গতি যে অঙ্কের মাস্টারমশাই পড়াবেন? কিন্তু অবাক হলাম। কী সুন্দর কণ্ঠ! কী মধুর কবিতা পাঠ! উষাকুমার দাশ মশায়কে আমার মন অঙ্ক থেকে সাহিত্যে প্রোমোশন দিতে রাজি হল। এটাকেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বলব। অঙ্কে যিনি আমাকে পাঁচ দিয়েছিলেন তিনি আমার উপকার করেছিলেন কিনা তা আগেই বলেছি। তিনি মাস্টারমশাই ছিলেন, গুরু নন। 'মণিমাল্য' হাতে উষাবাবু আমার গুরু হলেন।

উষাবাবু পক্ষপাতিত্ব করতেন। আর গুরুরা তা করেও থাকেন। ঘটনাটা বলি। উইক্‌লি পরীক্ষা বাংলার। পঞ্চাশের নম্বরের পাঁচটি প্রশ্ন। শেষ প্রশ্ন রচনা। গোরু অথবা রাসমেলা, তার নিচে একটু যেন বড়-বড় অক্ষরে লেখা আছে—'চন্দ্রালোকে বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণ'। হাতে-লেখা প্রশ্ন। লেখার তারতম্যর জন্যই হয়তো আমার ধারণা হয়েছিল 'চন্দ্রালোকে বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণ' এই রচনাটা পাঁচটি প্রশ্নের পরিবর্তে লেখা যেতে পারে। এটা ভুলই হয়েছিল আমার। পরীক্ষার সবটুকু সময় ধরে চন্দ্রালোকে ভ্রমণ করে বেড়ালাম। পরীক্ষাব ঘর থেকে বেরিয়ে কান্না এল। দশ নম্বরের উত্তর দিয়ে কতই-বা পাব? তাও আবার চলতি বাংলায় লেখা। ক্রিয়াপদে 'য়' যোগ করতে আমার চিরদিনই আপত্তি। আবার 'পাঁচ' পেতে হবে, যেমন উষাগবুর কাছে অঙ্কে পেয়েছিলাম। কিন্তু উষাবাবু সে-পরীক্ষায় আমাকে পঞ্চাশে উনপঞ্চাশ দিয়েছিলেন। ওই এক নম্বর বোধ হয় গুরুর প্রণামী। একে পক্ষপাতিত্ব বলছি এইজন্যে, বাংলায় কোনোদিন আমি এত নম্বর আর পাইনি। একশোর মধ্যে সব প্রশ্ন লিখে উনপঞ্চাশ পেয়েছি কিনা সন্দেহ। কারণ ক্রিয়াপদে 'য়' না-থাকায় আমার বক্তব্য পরীক্ষকদের কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিল চিরদিন।

উষাবাবুর পক্ষপাতিত্বের মতোই আরো ত্রুটি ছিল। ক্লাস এইটে উঠে দুখানা বই পাঠ্য হল আমাদের নিয়মিত পাঠ্য ছাড়াও। শিক্ষাদপ্তরের 'Approved by D.P.I.'-মার্কা দেয়া 'সাহিত্যচয়নে'র উপরন্তু আমাদের জন্য উষাবাবু নির্বাচন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ' এবং 'কথা ও কাহিনী'। আজকাল বোধ হয় এমন বোঝা চাপানোকে cruelty to animals বলা হবে। বালখিল্যদের রবীন্দ্রসাগরের তীরে নিয়ে যাওয়ার এমন আয়োজনকে বুদ্ধিমানেরা নিরর্থক বলবেন হয়তো। কিন্তু উষাবাবু যদি সে-নিরর্থক কাজ করে থাকেন তবে D.P.I. তার বিচার করবেন। আমার মনে আছে 'কথা ও কাহিনীতে' একটা কবিতায় ছিল :

> মোরে তুমি হে ভিখারী মা'র কাছ হ'তে কাড়ি
> করেছ আপন অনুচর।

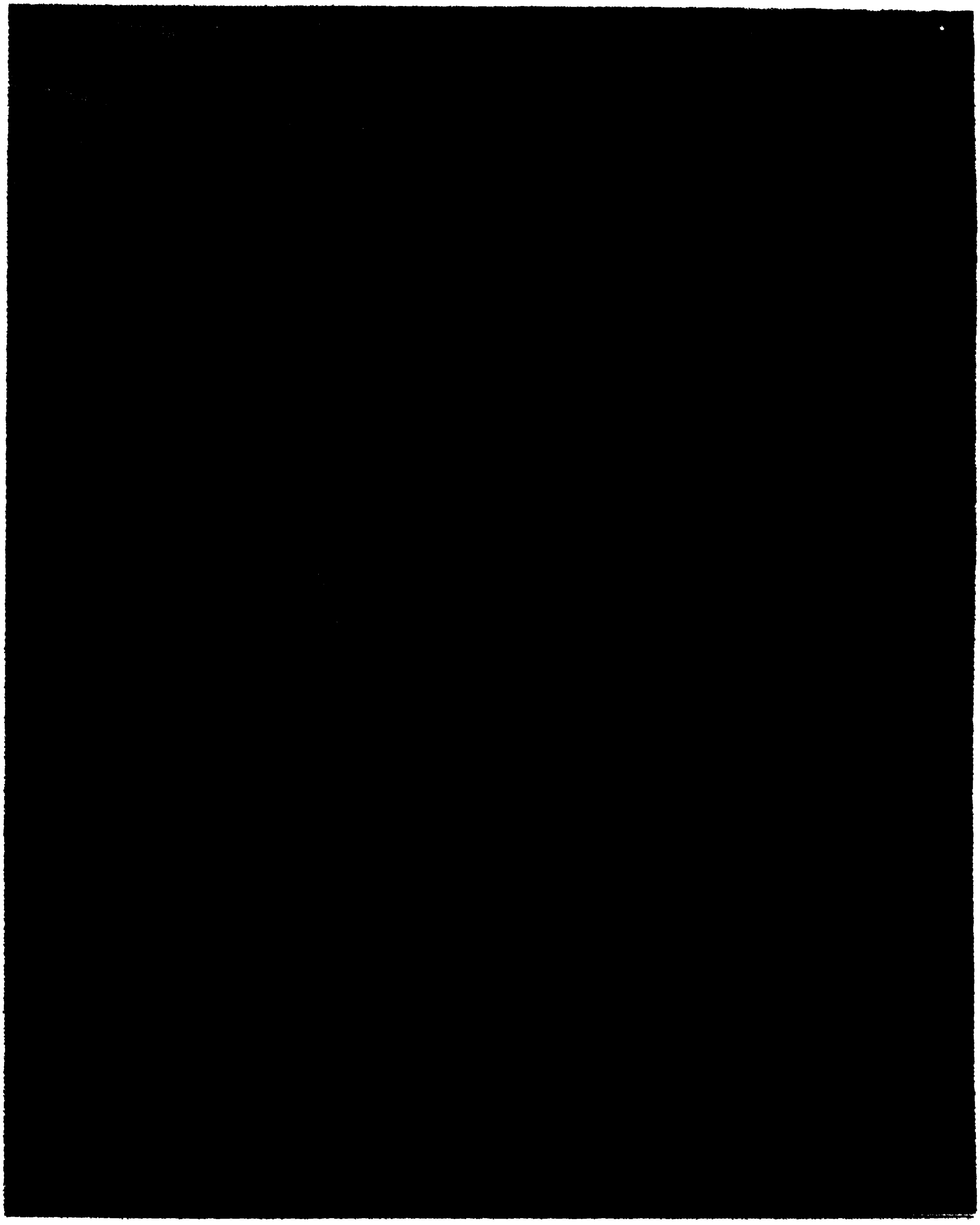
এ রকম একটা ব্যাপার ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথের দিকে এভাবে ঠেলে দেয়া কি ভালো হয়েছে? সেই সাগরে অবগাহন করেছি বটে, নাকানি-চোবানিও কম খেতে হচ্ছে না জীবনে।

আমার ধারণা উষাবাবু D.P.I. বলতে Discretion in preceptor's instruction বুঝতেন। প্রমাণ আরো আছে। ক্লাস নাইনের হাফইয়ারলি পরীক্ষায় বাংলার প্রশ্নপত্র দেখুন। অপঠিত বিষয়ের সারমর্ম লিখতে দিয়েছেন তিনি। এক নম্বরে দেখতে পাচ্ছি 'শাজাহান' কবিতার একটি স্তবক, অন্যটিতে 'শ্রীকান্ত' চতুর্থ পর্বের বৈষ্ণবী কমললতার চরিত্র বর্ণনা। ছাত্ররা কি উত্তর দিতে পেরেছিল? পরে উষাবাবু আমাকে যা বলেছেন তার সারমর্ম এই : চারাগাছ একহাত উঁচু বলে কি তার জন্য টিনের ছাদ এঁটে আকাশকে তার মাপ মতো করে দিতে হবে?

> যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক
> শুধু থাক
> এক বিন্দু নয়নের জল।

এ নিশ্চয়ই আকাশের উদারতার সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।

উষাবাবুকে উৎসাহ দিতেন কিনা জানি না, কিন্তু হেডমাস্টারমশাই তার সমধর্মী ছিলেন বলেই আমার



ডম্বরী

ধারণা। মণীন্দ্র রায় মশায়কে আমরা ভয় করতাম। যতক্ষণ তিনি হেড ততক্ষণ তাঁকে কে-না ভয় পেত? লোহার মতো দৃঢ় ছিল তাঁর মত। আর শাসনের ব্যাপারে তাঁর কোনোপক্ষ ছিল না; কোনো মাস্টারমশাই তাঁর কাছেও ছিল না দূরেও ছিল না। তিনি যখন প্রত্যেক ক্লাসের পাশ দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে যেতেন তখন ফাঁকি দেয়ার প্রশ্ন ছাত্র-মাস্টারমশাই কারো মনে আসত না। অপশনাল সংস্কৃতে মাত্র একজন ছাত্র, সুতরাং আমি না-পড়ালেই-বা কী এ-চিন্তা করার সাহস কারো হতো না। কিন্তু হেডমাস্টারমশাই যখন মাস্টার তখন তিনি একটু যেন অন্যরকম ছিলেন। ইংরেজি পাঠ্যবই নির্বাচনে এটা ধরা পড়ত। ক্লাস সেভেনে 'Legends of Greece and Rome' পড়তে হতো, 'Heroes of Bengal' নয়। কারণ ইংরেজি সাহিত্যে Legends-এর যে-দাম Heroes-এর তার কিছু অংশও নয়। এর সঙ্গে আস্ত একটা কবিতার বই যাতে প্রায় একশো কবিতা। ক্লাশ এইটে Lamb's Tales from Shakespeare, সঙ্গে পূর্বকথিত সেই কবিতার বই। না-পড়ে উপায় কী? সাহিত্য তো, হলই-বা ইংরেজি। অ্যাপ্লিকেশন আর প্রেসি লিখতে শিখলেই তুমি ইংরেজি শিখেছ এ মণীন্দ্রবাবু মশায়ের বিশ্বাস ছিল না। একদিন একটা ঘটনা ঘটল। ক্লাস এইটের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ ক্লাস সেভেনের দরজার সামনে থেমে গেলেন হেডমাস্টারমশাই। এই রে! কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অমৃতবাবু বেরুলেন সে-ক্লাস থেকে। কিছুক্ষণ আলাপ হল দুই ইংরেজি শিক্ষকের। ক্লাস সেভেন ছিল নেসফিল্ড ঘষে আমাদের ইংরেজি ধারালো করার ক্লাস, অমৃতবাবু ভালোভাবেই ঘষে দিতেন। ইস্পাত হলে ধার পড়ত, লোহা চকচকে হতো, অন্য ধাতু ভেঙে চুরমার। হেডমাস্টারমশাই চলে গেলেন ক্লাস টেনের দিকে। কিন্তু আবার ফিরলেন। আবার অমৃতবাবু বেরুলেন তাঁর ক্লাস থেকে। আবার তর্ক হল। ক্লাস সেভেন আর টেনের ক্লাস হল না। অমৃতবাবু আর হেডমাস্টার তর্ক করতে-করতে আমাদের ক্লাসের পাশ দিয়ে চলে গেলেন। কান পাতাই ছিল। ধরা পড়ল—'Can' is a principal verb; তর্কটা Can verb-এর কোনো সমস্যা নিয়ে।

মণীন্দ্র রায় মশায়কে আমি শেষ পর্যন্ত ভয় না-করে ভালোবাসতাম। ক্লাস টেনে তাঁকে বন্ধু বলে মনে হতো। আগের দিন Mountain and Squirrel-এর ঝগড়ার সাবস্ট্যান্স লিখেছি। যেদিন হেডমাস্টারমশাই রাগ করে ছেলেদের বলছিলেন আমি দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করতে পারি, তোমরা কেন একটা essay লিখে আনার পরিশ্রম করতে পারো না। ছেলেরা হতবাক। তখন আমরা ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত, এটা কেউই বলছে না। বস্তুত আমরা তখন ক্রিকেট মাঠ থেকেই ছুটতে-ছুটতে এসেছি। আমি বললাম, 'Neither can you crack a nut, Sir'! এইবার বুঝি বজ্রপাত হবে। বজ্রপাতই হল। সে কী অট্টহাসি, আনন্দের সে কী উচ্ছ্বাস! পাহাড়ের মতো হেডমাস্টারের অনেক গুণ আছে, কিন্তু আমা হেন কাঠবিড়ালি ক্রিকেট মাঠে যে-রকম ছুটতে পারে তা কি তিনি পারেন?

ক্লাস নাইনে উঠলাম আমরা। সেই প্রথম যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে কথা হল। তারপর দু'বছর তাঁর সঙ্গে প্রায় রোজই দেখা হয়েছে। সুগৌর ঋজু দেহ, চোখে পুরু কাচের চশমা। এখনও এক্স-টু-দি-পাওয়ার-এন বোঝাতে গেলেই যতীনবাবুর চশমার কথা মনে হয় আমাদের। প্রথমদিনেই 'আঁক' কষাতে গিয়ে বললেন তিনি—মেকানিকস্ নিলিনি? কী উত্তর দেব ভেবে পাচ্ছিলাম না। আবার বললেন তিনি—জেগ্রাফিতে কি লেটার পাবি? রসময়ও একই অপরাধে অপরাধী। নিবারণ রায়চৌধুরী মশায়ের আকর্ষণে আমরা দুজনেই জিওগ্রাফি নিয়েছি। সে বলল—পাব, সার! যতীনবাবু সন্তুষ্ট হলেন না। রসময় বলত—আমাদের রাশে লেগেছেন। তখন সে-কথা বিশ্বাস করতাম। অঙ্কের সে-কী নিত্য নতুন প্রবলেম। অ্যাডিশ্যনাল কম্পালসারি করে দিনে-দু'বার দেখা তাঁর সঙ্গে—দু'বার করে মাথা-মাটি করা। কিছুতেই সন্তোষ হয় না তাঁর। Hall and Knight-এর একখানা এরিথমেটিক বই একদিন আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। বললেন, লালকালিতে দাগানো অঙ্কগুলি কষে দিতে হবে। এটা উপরন্তু, ক্লাসের অঙ্কের বাইরে। তখন জেট কথাটা আমরা জানতাম না। জানা থাকলে বলতে পারতাম, অ্যাডিশ্যনাল কম্পালসারির টুইন জেট টার্বোপ্রপ গতিতে অঙ্কের দিগন্তে ঝলসে বেড়ানো শুরু হল। যতীনবাবু বললেন একদিন—একই

প্রবলেম নানা পদ্ধতিতে সল্‌ভ করা যায়, সংক্ষিপ্ততম পদ্ধতিতে না-করলে তুমি ও রসময় পুরো নম্বর পাবে না। উত্তর ঠিক হলেও না? না। আমি ও রসময় মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। এসব কি রসময়ের মনে নেই? Major R. M. Ganguli, I.M.S-এর কথা বলছি।

কিন্তু যতীনবাবুর এ-চেষ্টার ফল কী হল? ক্লাস নাইনের হাফইয়ারলিতে অঙ্কে আটষট্টি পেলাম। অন্যটিতে কিছু বেশি। একদিন বন্ধু কালী (স্বর্গত মেজর বিজয়রতন সেনগুপ্ত) এসে ডাকল। ভাবলাম বোধ হয় সে খেলবে আর আমাকে তা দেখতে হবে। বলল সে, উষাবাবু ডেকেছেন। উষাবাবু? কিন্তু ছবি আঁকছি যে। কালী বলল—আমার সাইকেলের রডে উঠে বোস। কালী আমাকে উষাবাবুর কাছে নিয়ে গেল। উষাবাবু মিষ্টি খাওয়ালেন না পরেশবাবুর মতো, হেডমাস্টারমশাই যেমন গর্জে উঠতে পারতেন তা করলেন না। বললেন—অঙ্কে আটষট্টি পেয়েছ? হায়, এই কি ভালোবাসা! বললেন—তুমি ব্রিজখেলা শিখেছ? ব্রিজখেলা শিখছিলাম বটে, সে তো কালীর কাছেই। কালী তাহলে বলে দিয়েছে। কিছুই বললাম না। কারণ তা বলার বিষয় ছিল না।

এতদিনে বোধ হয় তা বলা যায়। কবে থেকে এর প্রস্তুতি? হঠাৎ কী করে তা সম্ভব হল? সেদিন ব্রাহ্মমন্দিরের কোনো সভা ছিল না। বিকেলের ধুলোখেলায় যোগ না-দিয়ে একজনমাত্র সঙ্গী নিয়ে ব্রাহ্মমন্দিরের কম্পাউন্ডে ঢুকেছিলাম। কাজ করতে-করতে ভাবতে ভালো লাগে। ব্রাহ্মমন্দিরের ঘেরের মধ্যে রবারের গাছ ছিল। গাছের ত্বক ফুটো করে পাতায় রস শুকিয়ে বল তৈবি করছিলাম আমরা। আর ভাবছিলাম আমি। বল তৈরির কাজটা ক্রমশ সঙ্গীর উপবেই চলে গেল। তখন তত্ত্ববোধিনী সভার সংবাদ জেনেছি। সে কি আমাদের ডিবেটিং ক্লাবের মতোই ছিল। ডিরোজিওর ছাত্ররা কেমন ছিলেন? এ সবই তো অতীত। দেবেন্দ্রনাথের যুগ চলে গিয়েছে, এখন ববীন্দ্রনাথের যুগ। সেটা অবশ্য আনন্দেব কথাই। আর রবীন্দ্রনাথ কবি হলে কী হয়, বেশ শক্ত মানুষও বটে। স্যর উপাধি ত্যাগ করার ব্যাপারই দ্যাখো। আমার চিন্তা এমনসব পথ ধরে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলে বেড়াচ্ছিল। কিম্বা অন্য কথায় একটা স্নিগ্ধ অন্ধকারের নীড় থেকে উঁকি দিযে খর আলোকে উদ্ভাসিত বর্তমানের সঙ্গে পরিচয়ের চেষ্টা চলেছিল মনের।

এমন সময়ে যাদব চক্রবর্তী আমাকে ডাকল। সে বলল—সে আমার খোঁজেই বেরিয়েছে। বেশ কথা, কী করতে পারি আমি? যাদব আমাকে নিয়ে গেল ব্রাহ্মমন্দিরের দক্ষিণে তাদের বাড়ির পিছনে। ভারি সুন্দর জায়গাটা। চারিদিকে বড়-বড় গাছের মধ্যে শুকনো খটখটে একটুকরো ঘাসে-ঢাকা মাঠ। সেখানে যেন একটা সভা হবে। কিন্তু সাকুল্যে তিনজন আমরা। আমি, যাদব, আর চশমা-চোখে-অপরিচিত এক ভদ্রলোক। সেদিন বেশি আলোচনা হল না। সেই ভদ্রলোক আমাকে একখানা বই পড়তে দিলেন। বইখানার নাম 'আমার দেশ'। লেখক বোধ হয় সখারাম গণেশ দেউস্কর। অদ্ভুত সে-বই। হেমন্তের শিশু-সর্পকেও ফণা মেলতে আহ্বান করে। আবার সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হল। গোপন রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটা ফটো অ্যালবাম দেখার সুযোগ পেলাম। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী থেকে শুরু করে ভগৎ সিং পর্যন্ত। দু-এক মাস পরে তিনি বললেন—এখন থেকে তুমি বই পাবে, জিনিসপত্র পাবে। কোথায় পাবে তা বুঝতে চেয়ো না। এমন করে আমরা নতুন এক পথে যাত্রা শুরু করলাম। একদিন খেলার মাঠে কালী আমাকে একটা প্যাকেট দিল। বললাম—কী! বলল সে—তোমার জন্যে। তখন বিস্মিত হওয়ার উপায় ছিল না। প্যাকেটটায় কী আছে তা প্রশ্ন করা নিয়ম ছিল না, আলোচনা করার তো নয়ই। বুঝলাম শুধু, কালীও এর মধ্যে আছে। মনে-মনে প্রশ্ন করলাম : কালী আমার আগে, না পরে! বাড়িতে এসে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে প্যাকেট খুললাম। হাতে লেখা প্রকাণ্ড মোটা একখানা বই—'পথের দাবী'। এসবের পরিণতি কী হয়েছিল, টেগরা, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ প্রভৃতির কার্যকলাপ আমাকে কতখানি উদ্বুদ্ধ করেছিল, সে অন্য গল্প। কিন্তু রাজা রামমোহন যেমন সঙ্গী ছিলেন একসময়ে, এখন অন্য অনেক সঙ্গী হল মনের।

অঙ্কে আটষট্টি পাওয়ার কারণ কি ব্রিজ খেলা? কালী, তুমি কি জানো না প্যাকেটটায় কী দিয়েছিলে

আমাকে? একি রসিকতা, না বিশ্বাস হনন? কিছুই বললাম না উষাবাবুকে। এখন বুঝি উষাবাবুর নির্দেশ অবহেলা করার ক্ষমতা কালীরও ছিল না, আমারও না।

কিন্তু যতীনবাবু রাগ করেননি। হুকুম হল জিওমেট্রির একস্‌ট্রা কষার। যতীনবাবু অঙ্কের মাস্টার কিন্তু প্রায়ই তিনি সারস্বত সম্মেলনের কর্তা হতেন। যতীনবাবুর কথায় সে-কথার উল্লেখ করতে হবে। তখন এই স্কুলের সারস্বত সম্মেলন শহরের শ্রেষ্ঠ সম্মেলন ছিল। সরস্বতীর এই সভায় শহরের নামকরা লোকেরা সবাই আসতেন। ছাত্ররা স্বরচিত কবিতা পাঠ করত, প্রবন্ধ পড়ত, স্পোর্টসের পুরস্কার পেত, সাহিত্যের পুরস্কার পেত। পণ্ডিতব্যক্তিরা বক্তৃতা দিতেন। যতীনবাবু কী রকম লোক ছিলেন তার এই একটা প্রমাণ যে আমরা যেবার ক্লাস টেনে পড়ি, তিনি বললেন এবার সারস্বত সম্মেলন হবে না। কারণ? স্বরচিত কবিতা লিখবে কে? ছাত্ররা ফিরে এল মুখ কালো করে। কথাটা বলতে সংকোচ বোধ হচ্ছে। চ্যালেঞ্জটা নিতে হল। যতীনবাবুকে গিয়ে নিবেদন করলাম, কবি আছে আমাদের। তিনি বললেন, কবিতা পড়ে যদি তাকে কবিতা বলে মনে করেন তবে সাধারণ পুরস্কারের উপরেও স্পেশাল প্রাইজ দেবেন। নতুবা সম্মেলন হবে না। সেবার সম্মেলন হয়েছিল। যতীনবাবুর দেয়া দীননাথ সান্যাল মশায়ের টীকাসমেত 'মেঘনাদবধ' কাব্যখানি আমি সযত্নে রক্ষা করছি। হয়তো সেটাই আমার সাহিত্যকর্মের প্রথম এবং শেষ পুরস্কার।

যতীনবাবুর মান আমি সবটুকু রাখতে পারিনি পরীক্ষায়। রসময় পেরেছিল। আমার টুইনজেটের একটিতে আগুন লেগে গিয়েছিল। গার্ড দিচ্ছিলেন যে-ভদ্রলোক তার গায়ের পাঞ্জাবির রং লাল টকটকে দেখাচ্ছে। কম্পালসরি অঙ্কের পরে আমি এবং রসময় যুক্ত ঘোষণা করেছিলাম লেটার পাব। দিনে-দিনে বেড়ে অ্যাডিশনালের দিন আমার জ্বর উঠেছে একশো চার। জলে ঠোঁট ভিজিয়ে পাশ করা যায়, ভালোভাবেই যায় কিন্তু টার্বোপ্রপ গতি থাকে না। 'জেগ্রাফি'তে লেটার পায় না স্কুল থেকে, আমাদের দল নিয়ে সেবার গোটা পাঁচ-ছয় পেয়েছিলাম। নিবারণ রায়চৌধুরী মশায়ের মানচিত্রের কর্মশালা এখন বোধ হয় বাংলা দেশে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

কিন্তু এসব তো পরের কথা। আগে পরীক্ষার ফিস জমা দিতে হবে। সেদিন কি ১৫ই জানুয়ারি ছিল? *আমরা হেডমাস্টারমশাই-এর ঘরের সম্মুখে মিষ্টি রোদে দাঁড়িয়ে আছি। এক-এক করে ফিজ দেয়া হচ্ছে। সাইকেল স্ট্যান্ডের পাশের জাম গাছটা স্কুলের চৌহদ্দির ভিতরে ছিল তখন।* গাছতলায় অমৃতবাবু এবং দু-একজন মাস্টারমশাই বসেছিলেন র‍্যাপার গায়ে। হঠাৎ কী হল। দুলতে লাগল পৃথিবী। মরমর করে কাতরিয়ে উঠল স্কুলের পুরনো বাড়ি। জাম গাছ কাত হয়ে মাটি ছোঁবার চেষ্টা করতে লাগল। অমৃতবাবু দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, বসে পড়লেন। ক্লাস ভেঙে ছেলেরা মাঠে উপচে পড়ল। আবার দোলা—এবার আরো জোরে। পি. ডব্লু. ডির পূর্বের পথ দিয়ে একটা হাতি পাগলের মতো চিৎকার করে ছুটছে। পূর্বদিকের গেটের কাছে জামগাছের ডাল একটা ভেঙে গেল হাতির মাথায় লেগে।

আমার জীবনেও তখন একটা দোলা লেগেছে। আলোড়ন বললে তাকে গুরুত্ব দেয়া হবে। আমার চোখে তখন মানুষ হেঁটে যাচ্ছে, যেমন গণ্ডোয়ানা মহাদেশ ফেটে নানা দেশ হয়েছে। দেখতে পাচ্ছি যেন বড়লোককে ফিলিস্টাইন বলে দয়া করলেই তাদের সম্বন্ধে সব কথা বলা হল না। তাদেরও নখদন্ত আছে। অর্থ একটা প্রচণ্ড শক্তি, কারণ সেটা মানুষের, বহু মানুষের শ্রম। কিন্তু একথা কি বলা যায়?

> Tell it not in Gath, let it not be known
> In the streets of Ashkelon,
> Lest the Philistines be glad.

কিন্তু এ-আলোড়নের চাইতে জীবন বড়। কী অদ্ভুত লাগে! ফুলগুলি কী সুন্দর, আকাশ কত গভীর

নীল! আর রাজা রামমোহনের বাড়ির এপারে-ওপারে কত অতীত আমাদের, কত ভবিষ্যৎ। এসব থেকে দূরে এসে দ্যাখো সব মানুষকে।

প্রকৃতপক্ষে খেদ করার কিছু নেই। পরাজয়গুলি জয়ের মতোই মূল্যবান। স্কুলের ভাষায় বলতে পারি উষাবাবু ব্যাকরণ পড়াতেন না, তার ফলে জ্ঞানটা একপেশে হয়েছে। তা হোক না-হয়। নম্বর কিছু কম পাওয়া তো? এই কম-বেশি নম্বর পাওয়ার মধ্যে একটা ছন্দ আছে। সেটাকেই দ্যাখো, উপভোগ করো।

হারানো দিনের জন্য আমার শোক নেই। কারণ তারা হারায়নি। তারা তাদের কাজ করেছে, ক্লান্ত হয়ে বিদায় নিয়েছে। এখন নতুন দিন আসবে। নতুন পুরনোর চাইতে নিশ্চয়ই ভালো হবে। মানুষের জীবনের ছকটা কিছু-কিছু বুঝতে পারা যাচ্ছে। এরপরে আরো স্পষ্ট হবে পথটা। তা দরকারও। কারণ মানুষের পথ সোনালি সমরখন্দের পাশ দিয়ে অসীমের দিকে চলে গেছে।

নয়নতারা

আঠারোশো পঞ্চান্ন খ্রিস্টাব্দ। শীতকাল। শীতটা খ্রিস্ট বৎসরের আদি এবং অন্তে থাকে। ইতিহাস লেখার চেষ্টা করে যেসব অনুসন্ধান করা গেছে তাতে নির্দিষ্টভাবে স্থির করা যায়নি মাসটা কী ছিল। আঠারোশো পঞ্চান্ন বটে, জানুয়ারি কিংবা ডিসেম্বর তা স্থির করা যায়নি। অর্থাৎ রাজচন্দ্রর বয়স তখন সতেরো কিংবা আঠারো, বলা সম্ভব হবে না।

সকালে উঠেই সে শিকার করতে গিয়েছিল নতুন-কেনা হাতিটার পিঠে চেপে। খবরটা এনেছিল বুজরুক। বুজরুক ঘোড়ায় চেপে এসেছিল, মস্ত বড় তাজিয়া ঘোড়া। তার মাথায় কুল্লাযুক্ত পাগড়ি, আচকান শেরোয়ানির উপরে ওয়েস্টকোট, কোমরে তলোয়ার, পিঠে বন্দুক। চোখে সুর্মা ছিল, গোঁফের কোণ দুটিতে মোম।

রাজচন্দ্রর উপনয়ন হয়েছে কিছুদিন আগে। মাথার চুলগুলো তখন ছোট-ছোট। আদুড় গায়ে খড়ম পায়ে সে তখন ঠাকুরবাড়ি থেকে আহ্নিক শেষ করে ফিরছে। পায়ের খড়ম হাতির দাঁতের, নরসুন্দর ভৃত্য চলেছে কোশাকুশি নিয়ে—সে-দুটি সোনার। নরসুন্দরের গায়ে পশমের ধোকড়। শীতে রাজুর গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

ঘোড়ার পায়ের শব্দে রাজু দাঁড়িয়েছিল। সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে সদরটা চোখে পড়ে। দেখতে পেল, ঘোড়া থেকে বুজরুক লাফিয়ে নামল, লাগামটা অবহেলা ভরে ছুঁড়ে দিল দরজার পাশে দাঁড়ানো একজন পথচারীর হাতে। রাজু এক দৌড়ে, তার পায়ের খড়ম খুলে পড়ে গেল, বুজরুকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

বুজরুক পাথরের মতো অবিচল। খাপ থেকে তলোয়ার রীতিমাফিক বার করে মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করল, 'জনাব, জাঁ পিয়েত্রোর সেলাম হুজুর বরাবর পঁহুছে। পরে সমাচার, শিকার খেলবার শওখ পিয়েত্রোর। বিলের উত্তরতীরের খাস-জঙ্গলে শের ; পিয়েত্রোর আরজ হাওদানশিন হুজুর ফৌরন খাস-জঙ্গলের পথে পিয়েত্রোর গরিবখানায় পঁহুছেন'।

'বলো কি, বুজরুকসাহেব, শিকার ব'লে বাঘ শিকার! আমার কি বন্দুক আছে, না আমি বন্দুক চালাতে জানি? তার চাইতে তোমার ঘোড়াটা দাও, আমি একটু ছুটিয়ে আসি'।

রাজচন্দ্র বুজরুকের পাশ দিয়ে ঘোড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। বুজরুক বাহু বিস্তৃত করে পথ আটকালো।

রাজচন্দ্র একটু দাঁড়িয়ে বুজরুকের প্রসারিত বাহুর বাইরে দিয়ে যাবার সুযোগ খুঁজতে খুঁজতে বলল, 'খাঁ-সাহেব, শিকার আমার দ্বারা হবে না। বাঘ আমি জীবনেও দেখিনি। বন্দুক তুলতেই জানি না'।

বুজরুক খাঁ বললে, 'তিনটে বন্দুক কাল কলকোত্তা থেকে এসেছে পিয়েত্রোসাহেবের। তার মধ্যে যেটা সবচাইতে চকচকে সেটা আপনার জন্য তোলা আছে। আপনি গেলেই সেটা আপনার হাতে আসবে'।

খবরটা পেয়ে রাজচন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

'নতুন বন্দুক'?

'হ্যাঁ'।

'কাল এসেছে কলকাতা থেকে'?

'জী'।

কথা বলার সময়ে দুজনের চোখই আয়ত ও আকুঞ্চিত হয়ে বিদ্যুৎতরঙ্গ আদানপ্রদান করল।

'তাহলে আমার বোধ হয় যাওয়াই উচিত, না খাঁ-সাহেব? হাওদানশিন হয়ে যেতে হবে? তুমি একটু দাঁড়াও ভাই, আমি পোশাক পরে আসি'।

অন্দরের দিকে খানিকটা গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে রাজচন্দ্র বলল, 'রূপচাঁদ, খাঁ-সাহেবকে বসতে দাও গে। আর পিলখানায় একটু বলে দাও হাওদা বেঁধে রামপিয়ারিকে ঠিক রাখে'।

রূপচাঁদ কোশাকুশি নিয়ে, খড়ম জোড়া কুড়িয়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা দেখছিল ; মনিবের হুকুম তামিল করার চেষ্টায় খাঁ-সাহেবকে কাছারিতে যাবার আমন্ত্রণ করল ; কিন্তু ব্যাপারটা যে তার আদৌ পছন্দমতো হল না তা তার চলার ভঙ্গিতে প্রকাশ পেল, বলার ভঙ্গিতেও। রূপচাঁদ বলল, 'খাঁ-সাহেব, আপনি কাছারির দিকে যান, আমি রানীমার কাছে যাই। তাঁকে না-জানিয়ে তো পিলখানায় খবর দেওয়া যাবে না'।

বুজরুক বললে, 'কিন্তু কোনো গোলমাল কোরো না রূপচাঁদ, গোলমেলে কথা বোলো না'।

রূপচাঁদ লোকটির সহজ হবার কথা নয়, সহজ নয়ও সে। কিছুক্ষণ পরেই একজন দাসী এসে বুজরুক খাঁকে ডেকে বলল, 'রানীমা ডাকছেন'।

দাসীর পেছনে বুজরুক অন্দরের দরজা পার হয়েই প্রথম ঘরখানায় গিয়ে পৌঁছল। ঘরের মেঝেতে কার্পেট, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আসন, বাঁ-দিকের দেয়ালটার কাছে খুব সৌখিন কাজ করা আবলুশ কাঠের মস্ত একখানা চেয়ার। চেয়ারের পাশে দেয়ালের গায়ে ঝোলানো একটা প্রকাণ্ড পর্দা। পর্দার গায়ে দু-তিনটি শিকার-ক্ষিপ্ত হাতির ও অনেক লোকজনের ছবি। পর্দাটা হাওয়ায় মৃদু মৃদু দুলছে।

আসন নিয়ে বুজরুক ভাবল, এইবার বোধ হয় রানীমা আসবেন এবং ওই বড় আসনটায় বসবেন। কিন্তু রানীমা এলেন না। পর্দাটা মৃদুমন্দ দুলছিল, তার পেছন থেকে পরিষ্কার, একটু-বা ভারি কিন্তু মৃদু গলায় কে একজন কথা বলল। বুজরুক বুঝল, এই রানীমা।

রানীমা বললেন, 'রাজু কি তোমাদের সঙ্গে শিকারে যেতে রাজি হয়েছে'?

'হ্যাঁ, তিনি আপত্তি করেননি, আপনার অমত যদি না-থাকে তবেই যাই'।

'আমার আপত্তি নেই। ওকে একটু চোখে চোখে রাখতে হবে'।

'তা রাখব'।

'পিয়েত্রোর শখ যখন, তখন সেও নিশ্চয়ই সঙ্গে থাকবে শেষ পর্যন্ত'?

'তা থাকবেন'।

'রাজুর পোশাক কী রকম হবে'?

'যে-কোনো পোশাকেই ওঁকে চমৎকার মানায়, রানীমা'।

'তা মানায়। কিন্তু ওর গত জন্মদিনে পিয়েত্রো যে ইংরেজি পোশাক দিয়েছিল সেটা পরে গেলেই আমি খুশি হই'।

'তাহলে তাই হবে'।

কিছুক্ষণ পরে রাজু এল, তার পেছনে ছোটখাটো পোর্টম্যান্টো নিয়ে রূপচাঁদ। রূপচাঁদ মাথায় করে আনেনি, তার তদারকে অন্য লোক এনেছে। পোর্টম্যান্টোর চাবি খুলে দিয়ে রূপচাঁদ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বুজরুক কৌপীনবস্ত্র রাজুকে আন্ডারওয়্যার থেকে শুরু করে টাই পর্যন্ত পরিয়ে দিল নিজের হাতে। প্রথম দিকটায় লজ্জিত রাজু দু-হাত দিয়ে নিজের চোখ ঢেকেছিল, পরে অবশ্য এদিক-ওদিক চাইতেই দেখতে পেল, রূপচাঁদ হাতে একখানা বড় আয়না ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

ততক্ষণে নতুন হাওদা-আঁটা রামপিয়ারি এসে গেছে, জানলা দিয়ে চোখে পড়ল। রামপিয়ারির নব যৌবন, সারা গায়ে চা-খড়ি ও সিঁদুরের পত্রলেখা। হাওদায় রুপোর আর জরির কাজ। হাওয়াদার ছাতা থেকে মুক্তার অনুকরণে বড়-বড় রঙিন পুঁতির ঝালর দুলছে।

বুজরুকের সামনের পর্দাটা আবার দুলে উঠল। ওদিক থেকে রানীমা নিজেই ডাকলেন, 'রাজু'।

বুজরুক বাইরে হাতিটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

সাহেবি পোশাক পরা রাজুকে দেখে রানীমা কিছুটা সময় অবাক হয়ে রইলেন। ও যদি এখনই হ্যাটম্যাট করে ইংরেজিতে বলে : আমি তোমার ছেলে নই, তাহলে অবাক হবার কিছু থাকবে না। কত বড় ও বলিষ্ঠ দেখাচ্ছে রাজুকে! রানীমা রাজুর বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে নিজের দাঁত ছুঁইয়ে দিলেন, কিন্তু অন্য সময়ের মতো বুকে জড়িয়ে ধরতে পারলেন না তাকে। বিদেশি পোশাক পরে অন্য একটি লোক যেন রাজু।

তারপর হাতি সওয়ার নিয়ে চলতে লাগল। দু-তিনজন লোক ইতিমধ্যেই সদর-দরজার মাথায় উঠে তারও উপরের দরজাটা খুলে ধরেছে। প্রাচীন কেল্লার কায়দায় দরজা। দুটি ভাগ। নিচের অংশটা দৈনিক খোলা ও বন্ধ হয়। উপরের দরজাটা খোলা হয় দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জনের সময়, কিংবা চৌদোলায় চেপে যখন নতুন বউ আসে। তখন দরজা খুলে দিলে মাটি থেকে খিলান অবধি বিশ হাত উঁচু ফটক তৈরি হয়।

বুজরুক হাতি থেকে দূরে থাকবার জন্য আগে আগে তার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে চলেছে। ঘোড়াটার চাল দেখবার মতো। হঠাৎ দেখলে মনে হবে এগোচ্ছে না, এক জায়গাতেই নাচছে।

রাজবাড়ির দোতলার সাদা দেয়ালের গায়ে জানলা ছাড়াও পাথরের ঝিলমিল বসানো ঝরোকা ছিল, তার গায়ে চোখ রেখে রানীমা অনেকক্ষণ হাতিটার চলন দেখলেন। দেখতে পেলেন, কে একজন হাতিটার পেছনে দৌড়চ্ছে, কতকটা রূপচাঁদের মতো চেহারা।

জাঁ পিয়েত্রো প্রৌঢ়ত্ব পার হয়েছে। মোটাসোটা নাদুসনুদুস চেহারা। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, ইংরেজিতে যাকে 'গোটি' বলে, তেমনি। কিন্তু মুখ-চোখের বয়স আর তার চুল-দাড়ির বয়সে যেন পার্থক্য আছে। মুখের কোন দিকটা ঠিক বলা কঠিন, বোধ হয় কপালটুকুতে পঁচিশের ছায়া এখন লেগে আছে। কিন্তু ঠোঁটের কোণের বয়স দু'হাজার বছর হবে, পৃথিবীর সব খেলা দেখবার পর মানুষকে অত্যন্ত বোকা বলতে শিখলে যে-রকম হয় তেমনটি। চুল-দাড়ি দিয়ে বয়স নির্ণয় করতে গেলে পিয়েত্রোকে ষাটের কোঠায় নিয়ে যাওয়া যায়।

সওয়ার নিয়ে রামপিয়ারি যখন পিয়েত্রোসাহেবের কুঠির কাছাকাছি পৌঁছাল তখন সে তার আটচালার হাওয়াঘরে বসে গড়গড়া টানছে।

আটচালাটির ভিত চারদিকের জমি থেকে প্রায় দশ হাত উঁচু। চারদিকে চাবটি সিঁড়ি দিয়ে নেমে তবে পথে আসতে হয়। আটচালাটি চতুষ্কোণ, ত্রিশ হাত লম্বা-চওড়া। ঘরের ছাদ খড়ের। মোটা মোটা শাল কাঠের তীর-বরগার কাঠামোর উপরে খড়ের ছাদ। আটচালাটির হাত-পঞ্চাশ দূরে পদ্মা।

পদ্মার বুক থেকে সোজা দেওয়াল গেঁথে তোলা, ভাঙনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। পদ্মার বুকে নৌকোয় যেতে যেতে বাঁধের দিকে তাকিয়ে মনে হবে যেন কেল্লার প্রাচীর উঠেছে। বাঁধের উপরের পথে যখন লোকজন চলাচল করে তখন মনে হয় কেল্লার প্রাচীরের সৈন্যরা পাহারা দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে বুজরুক আলি এসে গিয়েছিল। রাজু ও বুজরুক উভয়েই বাহন থেকে নেমে আটচালায় প্রবেশ করল।

পিয়েত্রোসাহেবের সম্মুখে একটি ছোট্ট টেবিল, তার উপর মদের গ্লাস ও মদ। তার হাতে একটা, টেবিলের উপরে একটা, চেয়ারের হাতলে ঠেসিয়ে রাখা তৃতীয় একটা বন্দুক। বন্দুকগুলোর ঝকঝকে চেহারা দেখে বোঝা যায় সেগুলো নতুন। তার মধ্যে একটি সবিশেষ। সেটার নল রুপোর মতো ঝকঝক করছে, অন্য দুটোর মতো নীল ইস্পাতি রঙের নয়। সেটার কাঠের বাঁটের গায়ে চাঁদির মসৃণ কাজ।

কাজের জিনিস বলে মনে হয় না, শখের জিনিস। তলোয়ারের বাঁটে হীরা বসানো হতো সেকালে। পিয়েত্রোর হাতে এই বন্দুকটিই ছিল, নলটিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পরীক্ষা করছিল সে।

রাজু উঠে এসে কাছাকাছি দাঁড়াতেই পিয়েত্রো দাঁড়িয়ে উঠে তাকে অভ্যর্থনা করল। টেবিলের ওপাশের একটা চেয়ারে রাজু বসল। বুজরুক আলি রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছল, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আটচালাটা খোশবুতে ভরে গেল। পিয়েত্রো হাসিমুখে টেবিলের উপরে রাখা ঝকঝকে কাচের গ্লাসটিতে বুজরুককে ইঙ্গিত করল। বুজরুক পাত্র থেকে পুরো গ্লাসটা ভরে ঢকঢক করে গলায় ঢেলে দিল। পেগের হিসাবে সে চলে না।

পিয়েত্রোসাহেব একটু ইতস্তত করে এবার কথা বলল। কথা শুনে বুঝবার উপায় নেই তার নাম জাঁ পিয়েত্রো। পরিষ্কার স্থানীয় বাংলায় সে বললে, 'রাজচন্দ্র, এখন তোমার ষোলো পাব হযেছে। নানা কারণে লম্বা তলোয়ারের শিক্ষা তোমাকে দিতে পারলাম না। আমার নিজের ধারণা, কাজের সময়ে লম্বা তলোয়ার যত প্রয়োজন বাঁকা ছোট তলোয়ার তত নয়। যাক, তোমাব জন্য এই বন্দুকটি আনানো হয়েছে। যদি পছন্দ হয় নাও, নতুবা অন্য যে-কোনো একটা নিতে পাবো'।

'কিন্তু আমি তো ওর ব্যবহার জানি না'।

'ব্যবহার আজই শিখবে। চিতা শিকারের ব্যবস্থা আছে। বনে বাঘ আছে। তার উপবে চালাতে হবে। অবশ্য যাত্রার আগেই বুজরুকসাহেব তোমাকে কল টিপবার কৌশল দেখিয়ে দেবে'।

রাজু এবার একটা বন্দুক হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। পিযেত্রোর একজন লোক এসে ছিলিম বদলে দিয়ে গেল। পিয়েত্রো গড়গড়ায় মন দিল। বুজরুক রাজুকে ডাকল, 'চলুন, কল টেপা শিখিয়ে দিই'।

বন্দুক হাতে রাজু বুজরুকের সঙ্গে আটচালার এক কোণে পদ্মার দিকে মুখ কবে দাঁড়াল। সেখানে দাঁড়িয়ে বুজরুক রাজুকে বন্দুক চালানোর প্রাথমিক কৌশলগুলি শিখিযে দিযে বলল, 'এবাব জলেব দিকে দু-চারটি গুলি ছুঁড়ুন'।

প্রথম গুলিটা যখন প্রচণ্ড স্বাভাবিক শব্দ করে বেবিযে গেল, বাজু হকচকিয়ে বন্দুকটা প্রায় ফেলে দিয়েছিল আর কি। বুজরুক তার কাঁধে হাত রেখে বলল. 'ঠিক আছে'।

তারপর দু-চারটে গুলি রাজু নিজে নিজেই ছুঁড়ল।

বুজরুক বললে, 'এবাব নিশানা ঠিক করতে হয়'।

'কী ক'রে করে'?

বুজরুক কৌশলটা দেখিয়ে দিল।

'কিন্তু নিশানা করব কী'?

বুজরুক জলেব উপরে উড়ন্ত গাঙশালিকেব ছোট একটি দলকে দেখিয়ে দিল।

'ওরা তো নড়ছে, নিশানা হবে কী করে'?

'হবে'। বলতে বলতে বুজরুক নিজের বন্দুকটি তুলে নিল এবং 'বাঁয়েরটা' বলে গুলি ছাড়ল। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দলের বাইরে বাঁ দিকের শালিকটা জলে পড়ে গেল।

কিন্তু বুজরুক পারল বলেই রাজু পারবে এমন কথা নেই। শালিকের দলটি ফিবে আসতেই রাজু পরপর তিন-চারটি গুলি করল কিন্তু একটিও শালিক ছুঁতে পারল না।

রাজু লজ্জিত হল। বুজরুক বলল, 'ভালো হয়েছে ছোঁড়া, বন্দুক ধরার ভঙ্গিটাও ভালো। চলুন, কিছু খেয়ে নিয়ে এবার রওনা হওয়া যাক'।

রাজু ফিরে দাঁড়িয়ে দেখল। পিয়েত্রোর টেবিলের কাছাকাছি আর-একটা বড় টেবিল পাতা হয়েছে এবং তার উপরে আহার্য সাজানো হয়েছে। রং করা একটা বেতের ঝুড়িতে কতকগুলি নারাঙি, একটা রুপোর পরাতে ধোঁয়ায় খোশবু ছড়ানো বিরিয়ানি, একটা ছোট রুপোর গামলায় ডিমসিদ্ধ। একটা

ঝকঝকে কাচের বাটিতে ননি, আর তারপরে এল মেটে রং করে ভাজা একটা দুম্বার প্রায় আধখানা।

'এসো রাজু। চটপট কিছু খেয়ে নাও। অবশ্য সঙ্গেও খাবার থাকবে'।

শার্টের নিচে পৈতার গোছাটি মোটা হয়ে উঠে রাজুর বুকে লাগতে লাগল। রাজু বলল, 'পৈতের আগে দু'একবার খেয়েছি বটে, কিন্তু এখন আর পারি না, মঁসিয়ে পিয়েত্রো'।

পিয়েত্রো জিদ করল না, যুক্তির অবতারণা করল না। পরিচারককে ডেকে চাপা গলায় কী বলে দিল।

রাজু ততক্ষণে আবার তার সেই চাঁদমারির কাছে ফিরে গিয়েছে। গাঙশালিকরা ইতিমধ্যে ফিরে এসেছিল, কিন্তু ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকায় সেদিকে সে নজর দিল না। খানিকটা সময় চড়বড় করে বন্দুক ফুটিয়ে সে পদ্মার হাতখানেক জল বিক্ষুব্ধ করে তুলল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটা নৌকো আসছে। বড় নৌকো, শাদা পালে বুক ফুলিয়ে মাথায় একটা লাল নিশানের ঝুঁটি উড়িয়ে—ঠিক যেন একটা দৈত্যমার্কা চিনেহাঁস। পালটি নড়ছে বটে তবু গাঙশালিকের শাদা বুকের চাইতে পালটির বুক প্রশস্ততর। কিছু চিন্তা না-করেই রাজু পালটি লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে পালটি তিন-চার হাত লম্বালম্বি ছিঁড়ে গেল। অত বড় নৌকোটা টাল সামলাতে না-পেরে পাক খেয়ে টলতে লাগল। রাজু প্রথমে চমকে উঠল। সে ভাবতেও পারেনি তার গুলিতে এমন ব্যাপারটা হতে পারে। আটচালার রেলিং টপকে সে যেন তখনই নৌকোটার সাহায্যের জন্য ছুটে যাবে।

রাজু আকুল হয়ে ডাকল, 'আলি খাঁ, আলি খাঁ'।

বুজরুক নৌকোটা লক্ষ্য করে প্রথমে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করল। নৌকোটা টাল সামলাতে না-পেরে একটা চড়ার উপরে উঠে পড়েছে। মাঝিমাল্লারা কিলবিল করে হাত-পা নাড়ছে। হঠাৎ বুজরুক প্রচণ্ড শব্দে হা-হা করে হেসে উঠল।

পিয়েত্রো বলল, 'কী ব্যাপার'?

'মরেলগঞ্জের দেওয়ানের কোষা ...'

'ও'। পিয়েত্রো ওই একটিমাত্র অব্যয় প্রয়োগে তাচ্ছিল্যের শেষ কথা উচ্চারণ করল।

'মাথায়, দেওয়ানের মাথায় নয়, মাস্তুলের মাথায় ইউনিয়ন জ্যাক'। বলল বুজরুক।

পিয়েত্রো কথা না-বলে বড় ছুরিটা অতিরিক্ত জোরে মাংসের চাংড়ায় বসিয়ে একটানে বড় এক টুকরো মাংস কেটে নিল।

বুজরুক বলল, 'বেশ নিশানা করেছেন, আমি কিন্তু ওই পতাকাটিকে নিশানা করতাম, নৌকোর পালটা মস্ত বড়, নিশানা দুরস্ত হয় না ওতে'।

রাজু এইটুকুমাত্র প্ররোচনাতেই আবার বন্দুক তুলে নিল এবং পতাকাটা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। পতাকাটার খানিকটা ছিঁড়ল কি না-ছিঁড়ল, গুলির শব্দে মাঝিমাল্লারা নৌকোব পাটাতনের উপর শুয়ে পড়ল।

বুজরুক আবাব হা-হা করে হেসে উঠল।

পিয়েত্রোর একজন ব্রাহ্মণ পরিচালক ছিল। সে ইতিমধ্যে খবর পেয়েছিল, দুধ, সন্দেশ, ছানা, নারকেল, কিছু ফলমূল-সমেত আহার্য সাজিয়ে উপস্থিত করেছে। সঙ্গে জল, আসন ইত্যাদি নিয়ে আরো দুজন ব্রাহ্মণ।

বুজরুক ও পিয়েত্রোর থেকে কিছুদূরে জল ছিটিয়ে আসন করে আহার্য সাজিয়ে দিল তারা। পিয়েত্রো বললে, 'এবার বোসো রাজু। আমি আমার মামার কাছে শুনেছি, এরকম খেতে দোষ নেই'।

একটু দ্বিধা করে রাজু এবার বসল। বুজরুক ও পিয়েত্রো তাদের টেবিলে মন দিল। খেতে খেতে এটা-ওটা গল্প হল।

এদের প্রাতরাশ শেষ হতে হতে পিয়োত্রোর হাতিও সেজে এসে দাঁড়িয়ে ছিল।

মাহুতরা শিকারের সরঞ্জাম তুলে নিচ্ছে হাওদায়। পিয়েত্রো আটচালার রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে

তামাক খাচ্ছে এমন সময়ে রাজু প্রশ্ন করল, 'মঁসিয়ে পিয়েত্রো, প্রায়ই আপনি আপনার মামার কথা বলেন। আজকের উল্লেখ শুনে মনে হচ্ছে, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, পাঁতি দিতেন'।

'তা দিতে পারতেন কিন্তু তাঁর পাঁতি কেউ নিত না'।

'যদি আপত্তি না-থাকে আমাকে আজ আপনার মামার গল্প বলবেন'?

'তা বলা যাবে। বলে রাখা ভালো। কোন দিন টুপ করে খসে পড়ব, এসব গল্প একেবারে অজানা থেকে যাবে। তুমি বরং আমার হাওদাতেই চলো। যেতে যেতে গল্পটা বলা যাবে। এখন তোমার শোনার বয়স হয়েছে'।

হাতি দুটি পাশাপাশি বসেছে। হাওদা পর্যন্ত মই লাগিয়ে প্রথমে পিয়েত্রো, তারপরে রাজু উঠল পিয়েত্রোর বুড়ো হাতিটায়। বুজরুক বিনা মইয়ে মাহুতদের কায়দায় শুঁড়েব সাহায্যে রামপিয়ারিব পিঠে চেপে বসল।

মাহুতের ইঙ্গিতে হাতি দুটি যখন উঠছে তখন রাজু দেখে বিস্মিত হল, বুজরুকেব পেছনে হাওদা চেপে ধরে রামপিয়ারির পিঠে দাঁড়িয়ে আছে রূপচাঁদ। চোখে চোখ পড়ায় রূপচাঁদ হেসে ফেলল। রূপচাঁদের মাথায় লাল গামছা বাঁধা, গায়ে পিরান, পায়ে খোট্টাই জুতোও আছে।

হাতি পদ্মার তীর ধরে উত্তরমুখে চলতে লাগল। চলতে চলতে বাজুকে পিয়েত্রো তার মামাব গল্প যা বলেছিল তার সারমর্ম এই :

১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের কথা। এখন যাকে মরেলগঞ্জ বলা হয়, তখন তাকে কোনো গঞ্জই বলা হতো না। চারদিকে জঙ্গল, মাঝখানে দু-তিনশো একব জমি সাফ করে চাষ-আবাদ করা হচ্ছে। জঙ্গল এমন যে যাতায়াতের একমাত্র পথ ছিল পদ্মা। লোকে উল্লেখ কবতে হলে বলত পিয়েত্রোব আবাদ। কখনও কখনও বলত ফরাসডাঙা।

বর্তমান জাঁ পিয়েত্রোর পিতার নামও ছিল জাঁ পিয়েত্রো এবং তিনি ছিলেন এই ফবাসডাঙার মালিক।

পিয়েত্রোদের আবাদে যে নীলের চাষ হতো সেটা বিদেশে চালান যেত না। পঞ্চাশ ঘর তাঁতি ছিল আবাদে। তারা মসলিন বুনত। সেইসব মসলিন রাঙানো হতো নীল দিযে। ক্রমে পিয়েত্রোর আবাদে তাঁতির সংখ্যা বাড়তে লাগল। আব সেই সঙ্গে নীলের চাহিদাও বাড়তে লাগল, কিন্তু তাব চাইতে আরো চাহিদা বাড়ল ধানচালের। পিযেত্রোদের আবাদের চাল বাইবে যেত না। দু তিন মাস পব পব পিয়েত্রো নৌকোর বহর সাজিয়ে ফরাসডাঙায় যেত, যে-ফরাসডাঙাব নাম চন্দনগড়। সেখান থেকে আবাদের মসলিন ফরাসি জাহাজে চেপে যাত্রা করত ইউবোপে। এমন একসময় এসেছিল যখন মসলিন বলতে পিয়েত্রোর নামের ছাপ দেওয়া মসলিনকেই বোঝাত। ইংরেজদের কলে মলমল তৈরি হতে আরম্ভ করেছে, এদেশের লোকের জন্য সেই মলমল চালান আসতে শুরু হযেছে। ফলে এদেশের মসলিনের মহাজনরা মার খেয়ে বসে যেতে লাগল। কিন্তু স্পেন ও ইটালির কাউন্টেসরা তখনও মসলিন চায়। সেই মসলিন নিয়ে যেতো ফরাসি জাহাজ। তখন ইংরেজরা তাদের দেশের মলমল এদেশি কারিগর দিয়ে ফুল তুলিয়ে রং করিয়ে ফের ইউরোপে নিয়ে যেত। কিন্তু এই জালিয়াতি সাধারণ লোকরা বুঝতে না-পারলেও সেভিল-ক্যাস্টিলের মহিলারা বুঝতে পাবত, তেমনি বুঝতে পারত ফ্লোরেন্সের নাগরিকারা। সে অন্য-এক গল্প।

এই মসলিনের চালান দিয়ে পদ্মা দিয়ে যাওয়া-আসা করত পিয়েত্রোর নৌকো।

একদিন ঝোড়ো সন্ধ্যার মুখে নৌকোর মাঝিরা পরস্পর ডাকাডাকি করে বলল—নৌকো বাঁধা দরকার।

পিয়েত্রো তার কেবিন থেকে মুখ বার করে বলল—আর-এক বাঁক এগিয়ে বাঁধো।

আর-এক বাঁক এগিয়ে পাওয়া গেল একটা শ্মশান। নৌকো তখন জলঙ্গি ছাড়িয়ে ভাগীরথী ধরে চলেছিল। নৌকো বাঁধতে গিয়ে যাত্রীদের কানে এল বহু কণ্ঠের চিৎকার এবং রামশিঙা ও জয়ঢাকের

সম্মিলিত শব্দ। নৌকো থেকে কয়েকজন লোক নেমেছিল রসদ কিনতে যাবে বলে, চিৎকারের শব্দে তারা পিছিয়ে এল। খুব বড় রকমের কোনো উৎসব হচ্ছে, বোধ হয় হিংস্র ধরনের উৎসব। পিয়েত্রো কাঁধে বন্দুক, কোমরে কিরিচ বেঁধে নামল ডাঙায়, সঙ্গে বুজরুকের পিতা উসমান খাঁ। তার কোমরেও দুখানা লম্বা তলোয়ার, পিঠে দেশি বন্দুক ঝোলান।

খানিকটা দূরে গিয়েই যা দেখতে পাওয়া গেল তাতে পিয়েত্রোর বুক হিম হয়ে গেছে। ডিফোর রবিনসন ক্রুসোতে তেমনি বর্ণনা পাওয়া যায়। মাঝখানে একটা অগ্নিকুণ্ড, তার চারদিকে অসংখ্য লোক ধেই-ধেই করে নাচছে, বীভৎস আনন্দে চিৎকার করছে, রামশিঙা, ঢোল, জগঝম্প বাজাচ্ছে। পিয়েত্রো হাত দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে আবার দেখল—অবিশ্বাস্য! এ কি আফ্রিকা? একটা মানুষকে ওরা ধরে রেখেছে। তার গলায় ফুলের মালা, পরনে দামি শাড়ি। শাড়ি দেখে পিয়েত্রো বুঝতে পারল, এরা স্ত্রীলোকটিকে দাহ করবে, পুড়িয়ে খাবে না। কিন্তু তাই-বা কেন। হঠাৎ কী করে কী হয়ে গেল, ব্যাপারটা শুরু করল উসমান খাঁ। আকাশের দিকে চোঙ পেতে সে বন্দুক ছুঁড়ল দু-দুবার। একটা কলরব উঠল। কলরব থেমে একেবারে নিস্তব্ধ হল পৃথিবী, তারপর সমস্বরে ওরা কথা বলে উঠল। তারা কী বলছে শুনবার আগেই পিয়েত্রোরা দেখতে পেল স্ত্রীলোকটি ছুটতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু শুধু সে-ই নয়, যারা তাকে ধরে রেখেছিল, শিকার পালায় দেখে তারাও ছুটতে লাগল। স্ত্রীলোকটি ছুটতে ছুটতে—বোধ হয় তার লক্ষ্য ছিল নদীব জল, আগুনে জ্বলে মরার চাইতে নদীর জলে ডুবে মরা কম বীভৎস—পিয়েত্রোদের কাছে এসে পড়েছিল। কিন্তু সে স্ত্রীলোক, দৌড়ে পারবে কেন শ্মশানের বালির উপরে। প্রতি পদক্ষেপে তার পেছনের লোকরা তার দিকে এগিয়ে আসছিল। একজন বল্লমের মতো একটা চোখা বাঁশ তাকে বিঁধবার জন্য তাক করল, ঠিক এমনি সময়ে উসমান খাঁর বন্দুক আবার ছুটল। লোকটা পড়ে গেল। স্ত্রীলোকটি দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তারপর আবার ছুটতে আরম্ভ করল এবং জলের কাছাকাছি পিয়েত্রোর কাছে পৌঁছে মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কিংবা শাড়িতে পা জড়িয়ে। পিয়েত্রো বাহু প্রসারিত করে ধরে ফেলল তাকে। স্ত্রীলোকটি চমকালো না, পালাবার চেষ্টাও করল না। আর-একটু আশ্রয় দেবার জন্য পিয়েত্রো তাকে জড়িয়ে ধরতেই সে ঘুমন্ত শিশুর মতো পিযেত্রোর গলা জড়িয়ে ধবে যেন ঘুমিয়ে পড়ল।

এই মহিলাটি আমার মা। তখন আমার মার বযস ষোলো-সতেরো হবে হয়তো। আমার জন্মের সঙ্গে ই আমার মায়ের মৃত্যু হয়। লোকের মুখে শুনেছি আমার মায়ের দেহবর্ণ আমার পিতার দেহবর্ণের চাইতেও উজ্জ্বল ছিল। আব পুরনো চিঠিপত্রে জেনেছি মাকে নিয়ে বাবা যখন পারীতে গিয়েছিলেন, শুধু পিয়েত্রোদের পরিবারে ও পাড়ায় নয়—সার্লঁ, কাফে, রেস্তোরাঁ, থিয়েটাব, যেখানেই কপালে সিঁদুর, চোখে কাজল আর মসলিনের শাড়ি পরে আমার মা গিয়েছেন ধন্য-ধন্য করেছে লোকে। যাক, এখন মামার গল্প শোনো :

নৌকো চলছে, পরের দিন সকালে একটা ছোট নৌকো পিযেত্রোর বড় নৌকোটাকে ইশারা করল। উসমান খাঁর নৌকোটা ছিল সেই ছোট নৌকোটার কাছে। পিয়েত্রো ডেকে বলল উসমান খাঁকে, উসমান খাঁ হাঁক দিয়ে ছোট নৌকোর সওয়ারিকে সামাল করে দিল। অনেক হাঁক-ডাকের পর যে-লোকটি পিয়েত্রোর নৌকোয় উঠলেন, তিনি আমার মামা।

ঠিক কী কী কথাবার্তা হয়েছিল তা বলা সম্ভব নয়। মামার রূপের বর্ণনা শুনেছি, নামও শুনেছি। নবদ্বীপের কাছে কোথায় এক টোলের পণ্ডিত তিনি। জায়গির-টায়গিরও ছিল। খাজনা আদায়-টাদায় করার ব্যাপারে দুঃসাহসের কাজও কিছু-কিছু করতে হতো। কাজেই পেশিবহুল ছিল তাঁর দীর্ঘ ঋজু দেহ। ন্যায়ের পণ্ডিত ছিলেন তিনি। তিনি তাঁর ভগ্নীকে সংস্কৃতে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন, সেগুলির উত্তর পেয়ে পিয়েত্রোকে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি একে বিবাহ করবে?

—এ কি খ্রিস্টান হবে?

—না।

—তাহলে কী করে বিবাহ হবে?

—গান্ধর্বমতে হতে পারে।

—সেটা কি তোমাদের সমাজে চলে?

—না। শাস্ত্রে অচল নয়। তুমি বিবাহ করতে ইচ্ছুক কিনা তাই বলো।

—যদি না-করি?

মাতুল হেসে বলেছিলেন—ব্রাহ্মণের মেয়েকে তো আর নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। আমার কাছে বিষের নাড়ু আছে। ওকে মানুষ করে আদর দিয়ে মাথা খেয়েছে ওর বউদি, সে-ই নিজের হাতে ওর জন্যে তৈরি করে পাঠিয়ে দিয়েছে। কাচের গুঁড়ো আর গোখরোর বিষ সমান অংশে মিশিয়ে ছানা ও খইচুর দিয়ে তৈরি। এই নাড়ু অমোঘ।

সেই ব্রাহ্মণকন্যা সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিল দাদার হাত থেকে নাড়ু নেবার জন্য।

তখন পিয়েত্রো বলেছিল—দাঁড়ান, দাঁড়ান। আপনার ভগ্নী কি আমাকে ভালোবাসবে?

ব্রাহ্মণকন্যা এ-কথায় নিরুত্তর হয়ে মুখ নামাল। তার গণ্ড দুটি নিশ্চয় লাল হযে উঠেছিল। কাবণ তার অবনত মুখের দিকে চেয়ে থেকে, শুনেছি উসমান খাঁকে বলতে, পিযেত্রো হঠাৎ দাঁড়িযে উঠে বিশুদ্ধ ফরাসিতে চিৎকাব করে কী সব বলে উঠেছিল। তার পবে জানু পেতে বসে আর কী সব বলেছিল প্রার্থনা করাব মতো।

পিযেত্রো অতঃপর বলল—নবদ্বীপে কি আমাদেব বিবাহ হতে পাবে?

—পারে।

—সেখানে কি ব্রাহ্মণ-বিধবার বিবাহ হবে?

—হবে। আমি দেব।

—তারপর আপনার সমাজ?

—আমার পক্ষে সমাজে বাস করা আব সম্ভব হবে না। কাশীবাসই বিধেয় হবে।

—তাহলে?

—দুটি মানুষ যদি তার জন্য সুখী হয়

বিবাহ কী মতে হয়েছিল আমি জানি না। আমার মায়েব মৃত্যুব পব বাবা মনমবা হযে থাকতেন। আঠারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দ। তখন আমার বয়েস বছব পনেরো হবে। ইংবেজদেব সঙ্গে ফবাসিব যুদ্ধ। পৃথিবীর সব জায়গাতেই ইংরেজ-ফরাসি পরস্পরের বিরুদ্ধে মারমুখি হযে দাঁড়াল। বাবা আমাকে তখন মামাবাড়িতে রেখে এসেছিলেন। তোমাদের মতো ধুতি-চাদব পরে থাকতাম। বাংলা আগেও কিছু শিখেছিলাম, সে-সময়ে পুরোপুরি শিখলাম'।

'তারপর'? রাজু চোখ বড় বড করে শুনছিল।

'তারপর আর কী'

'আপনার মামা বেঁচে আছেন? এখন কাশীতেই আছেন'?

'এসব খবর আজ নয়। আরো কিছুদিন পরে। বলব বইকি, একসময়ে বলব তোমাকে'।

'আপনার বাবা কী করলেন আঠারোশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে'?

'কিছু করবার আগেই ইংরেজদের হাতে বন্দী হলেন। প্রায় এক বছর পরে ছাড়া পেয়েছিলেন। তারও বছর দু-এক পরে পিয়েত্রো-আবাদে ফিরে এসেছিলেন। আমাকে আনিয়ে নিলেন কাছে। উসমান খাঁ আব বুজরুক আলি দুজনে আমাকে নিয়ে এসেছিল। তখন বোধ হয় তোমার মতোই বয়েস ছিল আমার'।

'তারপর থেকে এখানেই আছেন'?

'আর কোথাও না-গিয়েই বলতে পারি, যদি আর-একবার কিছুদিনের জন্য কাশী যাবার কথা ছেড়ে দিই'।

খুব সামান্য একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে পিয়েত্রো কথা শেষ করল।

হাতি দুটো ততক্ষণে পদ্মার তীর ছেড়ে ক্রমশ দূরে চলে যাওয়ার রাস্তা ধরে পশ্চিমমুখে চলছে। পথটির পাশে কোথাও কৃষকদের ছোট ছোট খামার, কোথাও ধানের জমি, খড়ের ঘর। কোথাও দু-পাশ থেকে বড় বড় গাছ ডাল ছড়াতে ছড়াতে বীথিকার মতো ছায়া করেছে। অন্য কোথাও মানুষ-সমান ঘাসের ঝোপ বাতাসে শিরশির করছে। হাতি দুটো বারংবার গাছের ডাল ভাঙবার চেষ্টা করে শুঁড় উঁচু ক'রে, কোথাও পথের ধারের কলাগাছ ধরার জন্য শুঁড় বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু মাহুতের তাড়নায় ছুটছেই, আর হাওদা দুলছে।

আধ ঘণ্টা পরে বন শুরু হল। এবার মাহুতরা হাতি দুটিকে শুঁড় চালনায় প্ররোচিত করতে লাগল। গাছের ডাল ভাঙতে লাগল হাতি দুটো, কোথাও পথ করে নেওয়ার জন্য, কোথাও-বা মাথার উপরে ডালের আঘাত থেকে হাওদার সওয়ারিদের বাঁচানোর জন্য। কখন-বা মাহুত নিজেই ছোট ছোট ডালপালা লতা দা দিয়ে কেটে দিতে লাগল। হাতির গতি মন্থর হয়ে এল।

কিন্তু মাঝে মাঝে শুধু ঘাসের জঙ্গল। এ রকমটা কী করে হয় বোঝা কঠিন। জায়গাগুলো একটু নিচু। ঘাসগুলো সেখানে হাতিগুলোর পেট অবধি উঁচু। হাতি দুটি যেন এই ঘাসের বন্যায় অবগাহনের জন্য তীর থেকে নিচে নামে, তারপর তরঙ্গে সাঁতার দিয়ে অন্যদিকের জঙ্গলে গিয়ে ওঠে। ঘাসের জঙ্গলগুলো আয়তনে খুব কম নয়। মাঝে মাঝে এক-আধটা মাঝারি চেহারার গাছ ছাড়া শুধু ঘাস আর ঘাস।

সহসা হাতি দুটির পায়ের তলায় শব্দ হতে লাগল। তাদের গতি আরো মন্থর হল। জলের ছপ্‌ছপ শব্দ। পথটা পিয়েত্রোর হাতির সম্ভবত পরিচিত—সেটা আগে আগে চলেছে। বামপিয়ারি তাকে সন্তর্পণে অনুসরণ করছে। কিন্তু পিয়েত্রোর চাইতে পথের সঙ্গে বুজরুকের পরিচয় বেশি। সে-ই রামপিয়ারির পিঠ থেকে হাতি দুটিকে ডাইনের দিকে চালাতে বলল।

ঘাসের বনের তলায় এখানে-ওখানে এখনও মাটি ভিজে ভিজে, কোথাও-বা জল ছলছল করছে।

সহসা আবিষ্কারের ভঙ্গিতে রাজু চিৎকার করে উঠল, 'পদ্মা, পদ্মা'। তার বক্তব্য অবশ্য পদ্মা নয়, বক্তব্য বনের অজস্র পল্লবের ভিতর থেকে দেখা পদ্মার অপরিমেয় সৌন্দর্য।

'পদ্মা নয়। পদ্মা বিশ ক্রোশ পেছনে'। বুজরুক বলল।

বুজরুকের ইঙ্গিতে হাতি দুটি বিলের প্রান্তে এসে দাঁড়াল, রাজুকে বিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য। এটা পাখিদের রাজ্য। মানুষের সাড়া পেয়ে ডাহুক, পানকৌড়ি, বক, সারস, বুনোহাঁস প্রভৃতি একসঙ্গে সহস্র কলরব করে উঠল। পাখার ছায়ায়, ডানার রঙে কিছুক্ষণের জন্য দৃশ্যের স্বাভাবিক রং বদলে গেল। ঐকতান বললে তুলনাটা ঠিক হয় না। এ-অর্কেস্ট্রায় বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের আপাতবিরোধী ধ্বনি-উচ্ছ্বাসগুলো একান্ত অদ্ভুত একটি হারমনির ইঙ্গিত দিতে লাগল।

পাখিরা একটু প্রবোধ পেয়ে স্থির হলে রাজু লক্ষ্য করল হাতি দুটির পায়ের কাছে জল। স্থির কালো জল। আধক্রোশ পরিমাণ জলের বুকে সংখ্যাহীন পদ্ম। পদ্মপাতার সবুজ গালিচায় লাল পদ্মের নকশা। বাতাসে পদ্মের ডাঁটগুলো দুলছে। অবারিত প্রসারিত দৃষ্টির সীমায় আকাশ ও বিলের রং পরস্পরকে প্রভাবিত করে অবশেষে এক হয়ে গেছে। সেখান দিয়ে একটা নৌকো যাচ্ছে, তার গলুইয়ের দু'ধারে কালো জল শাদা হয়ে ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

রাজু চিরকালের জন্য বিলকে ভালোবেসে ফেলল।

কিছুক্ষণ বিলের পাশ দিয়ে জল বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে চলার পর হাতি দুটি বিল থেকে দূরে সরে যেতে লাগল। নীরব হয়ে এল পাখিদের ডাকাডাকি। শুধু একজোড়া ডাহুকের প্রশ্নোত্তরের পালা তখনও শেষ হয়নি বোঝা গেল।

হাতি দুটির এখন পা মেপে মেপে চলতে হচ্ছে, পথ করে করে এগুতে হচ্ছে। একসময়ে পিয়েত্রো বলল, 'এবার আমরা পৌঁছে গেছি। এখন শিকারের খোঁজ শুরু হবে। রাজু, তুমি তোমার হাওদায় যাবে?

অবশ্য বুজরুক সঙ্গে থাকবে। কারণ দুটো হাতি থেকেই সমান আক্রমণ হওয়া চাই'।

মাহুতরা হাতি দুটিকে পাশাপাশি গায়ে গায়ে দাঁড় করালো। রাজু নিজের হাতিতে গিয়ে বুজরুকের পাশে বসল।

শিকারের জায়গাটি যেন পূর্বস্থিরীকৃত। চারদিকে ছোট ছোট গাছের প্রাচীরের মধ্যে খানিকটা ঘাসের জঙ্গল। সেই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঝিরঝির করে একটা স্বল্পপরিসর ধারা মন্থর গতিতে বিলের দিকেই এগিয়ে চলেছে। ঘাসের জঙ্গলটির উত্তর দিকের খানিকটা অংশ বড় গাছের জঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত, একটা ক্রীড়াক্ষেত্রের যেন প্রবেশদ্বার। বুজরুকের হাতি সেই প্রবেশদ্বার দিয়েই রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করল।

কিছুদূর যাবার পর হাতি দুটির গতি মন্থর হয়ে এল। পিয়েত্রোর হাতি অত্যন্ত শিক্ষিত, তার চাল দেখে মনে হল তার মাথায় কিছু একটা ফন্দি ঘুরছে। শুঁড়টাকে গুটিয়ে নিয়ে সে বাঁ-দিকের দাঁতের উপরে অকেজো কিছু একটার মতো রেখেছে, তারই মধ্যে থেকে ফোঁস ফোঁস করে ঘ্রাণ নিচ্ছে। রামপিয়ারিও মাহুতের নির্দেশে শুঁড় তুলে একটা দীর্ঘস্থায়ী সেলামের ভঙ্গিতে এগোচ্ছে।

বড় ঘাসের একটানা জঙ্গলের পরিবর্তে পরস্পরবিচ্ছিন্ন ছোট ছোট ঝোপের মধ্য দিয়ে হাতি দুটি এগিয়ে চলেছে। অভিযাত্রীরা ক্রমশ একেবারে নির্বাক হয়ে গেল।

ইতস্তত ছড়ানো মৃত প্রাণীর কঙ্কালও চোখে পড়ছে মাঝে মাঝে। সদ্যোমৃত নয়। কঙ্কালগুলোর কোনো-কোনোটা বর্ষায় ধুয়ে, রোদে পুড়ে চিনেমাটির তৈরি বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আর বেশি দূর যাবার আগেই বুজরুক বললে, 'এখান থেকেই পায়ে হেঁটে যেতে হবে'।

'পায়ে হেঁটে'? রাজু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল।

হাতি থেকে নেমে পিয়েত্রো, বুজরুক এবং রাজু পাশাপাশি অগ্রসর হতে লাগল। বন্দুকের নলগুলো সামনের দিকে বাগিয়ে ধরে তারা পা টিপে টিপে চলছে।

শিকারের চিত্র রাজু দেখেছে : উন্মত্ত হাতি তীব্র বেগে ছুটছে, আর্ত বন্যপ্রাণীরা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, কোথাও-বা শার্দূলরাজ হাতির মাথা কামড়ে ধরেছে। রাজু ফিসফিস করে বলল, 'কিন্তু কারো ঘুম ভাঙবার ভয়ে যেন পা টিপে টিপে যাচ্ছি। পাখি কিংবা হরিণ হলে হতো, শুনলাম বাঘ ...'

পিয়েত্রো এই প্রথম তার নস্যদানিটা বার করে নস্য নিল।

বুজরুক বলল, 'বাঘ যখন বহুদূর থেকে শিকার লক্ষ্য করতে করতে এগুতে থাকে তখন সে ও এমনি পা টিপে টিপে চলে'।

পিয়েত্রো হাসিমুখে চাপা গলায় বললে, 'বুজরুক, তুমি কি বাঘদের আফিম খাইয়েছ'?

কিন্তু বেশি দূর তাদের যেতে হল না। বুজরুকের খবরাখবর কতদূর নির্ভরযোগ্য তারই একটা প্রমাণ পাওয়া গেল। একটা বড় ঘাসের ঝোপের ডান দিক দিয়ে ঘুরতেই দৃশ্যটা চোখে পড়ল। তাদের থেকে একশো গজ দূরে আতপ্ত ঘাসের বুকে বাঘের সংসার। বাঘিনী তার দু-তিনটি শিশুকে স্তন্য দিচ্ছে, আর তাদের থেকে গজ দশ-বারো আগে বাঘ নিজে বসে। কান দুটো খাড়া, দৃষ্টি স্থির, লাঙ্গুল ঈষৎ আন্দোলিত। বড় বাঘ নয়, চিতা। হলদে ঘাসের উপর প্রাণী কয়টির কী মধুর চিক্কণ রূপ! শরীরের কী অপূর্ব গঠন! রাজুর বুকের ভেতরটা ধক্‌ধক করতে লাগল।

রাজু বন্দুক তুলতে যাচ্ছিল, পিয়েত্রো নিষেধ করল। বলল, 'আমার মামা বলেছেন, রাজু, পাণ্ডু-রাজা হরিণকে তার সংসারের গণ্ডির মধ্যে বধ করে অভিশাপগ্রস্ত হয়েছিলেন'।

'তাহলে! আমরা কি ফিরে যাব'?

'না রাজু। আক্রমণটা ওদের দিক থেকে আসুক। আমরা তিনজন, ওরা তো দুই। তার উপরে ওদের সম্বল সামান্য কিছু প্রকৃতিদত্ত অভিজ্ঞতা, কিছু ধারালো নখ। আর আমাদের সঙ্গে কত অস্ত্রশস্ত্র'। পিয়েত্রো হাসল।

বুজরুক তার তলোয়ার কোষমুক্ত করে আরো দু-এক পা অগ্রসর হয়েছিল এদের আলাপের অবসরে।

এবার বাঘটা উঠে দাঁড়াল। মৃদু একটা গর্জন করে, সবগুলো দাঁত বার করে মানুষদের দেখতে পেল। বাচ্চাগুল তখনো স্তন পাবার জন্য আকুলিবিকুলি করছে। বাঘিনীও উঠে দাঁড়াল। নিজের উদরে লাঙ্গুলের আঘাত করে নিজের শক্তি সম্বন্ধে মানুষদের যথেষ্ট জ্ঞান দেবার চেষ্টা করল, তারপর আরো কিছুদূর পিছিয়ে অপেক্ষাকৃত বড় বড় ঘাসের মধ্যে বাচ্চাগুলোকে লুকিয়ে ফেলল। শুধু তার নিজের মুখটা দেখা যেতে লাগল। বাঘটাও ধীরে ধীরে পিছিয়ে গিয়ে সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়াল।

এবার বুজরুক তার তলোয়ার খাপে রেখে পিঠ থেকে বন্দুকটা হাতে নিল এবং বাঘটার দিকে লক্ষ্য করে বন্দুকের আওয়াজ করল। বাঘটা আহত হয়ে গর্জন করে উঠল এবং মুহূর্তমধ্যে তার মূর্তি মৃত্যুর মতো ভয়াল হল এবং রাজুর আশৈশব কল্পনার বীভৎসতাকে ছাড়িয়ে গেল। রাজুর হাত থেকে বন্দুক পড়ে গেল না, কিন্তু তার হাত কাঁপছে। ওদিকে বাঘ তখন তীব্র গতিতে আক্রমণের জন্য এগিয়ে আসছে। ছোট ছোট গুলির কয়েকটা বাঘের গায়ে বিঁধেছে, তার হলদে মখমল-মসৃণ দেহ রক্তে লাল হয়ে যাচ্ছে। একশো হাত থেকে কমে দূরত্ব পঞ্চাশে এসেছে, এমন সময় পিয়েত্রো বন্দুক তুলল। এমন বাঘকে গুলি করা কঠিন, কিন্তু পিয়েত্রোর গুলি বাঘকে ভীষণভাবে আহত করল। তার গতি স্তম্ভিত হয়ে গেল এক মুহূর্তের জন্য। হাহাকারেব মতো একটা তীব্র গর্জন করে উঠল। আবার তখন উঠে পড়ে সে পালাবার চেষ্টায় পেছন ফিরে চলতে লাগল। কিন্তু সে পালাতে পারছে না, তার বাঁ কাঁধ থেকে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে, কিছুতেই সে সামনেব বাঁ পা ফেলতে পারছে না। ঠিক এমন সময় বুজরুক হাতের বন্দুক মাটিতে ফেলে তলোয়ার খুলে এগিয়ে গেল বাঘটাব দিকে।

রাজু চিৎকার কবে উঠল, 'আলি খাঁ, আলি খাঁ!'

পিয়েত্রো বুজরুকের কাছাকাছি থাকবার জন্য সামনের দিকে ছুটে গেল, কিন্তু বুজরুক বাঘটাকে এমনভাবে আড়াল করছে যে গুলি করা যায় না।

বাঘ ফিরে দাঁড়াল ত্রিশ হাত দূরে। এক মুহূর্তের ঝঞ্ঝার মতো ব্যাপারটা। বাঘ অপমানে বেদনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে। পিয়েত্রোর বন্দুক গর্জন করে উঠল। বুজরুকের তলোয়ারও ঝল্‌কে উঠল বিদ্যুতের মতো। হলুদ-কালো-লালে মেশানো একটা গতি বুজরুকের গা ছুঁয়ে মাটিতে পড়ে গেল। তিন-চার হাত দূরে বুজরুকও মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, তার চার-পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে পিয়েত্রো।

কল্পনা কবা যায় না, এত তাড়াতাড়ি বুজরুক উঠে বসল। কিন্তু বাঘটা আর উঠল না। এবার রাজু এগিয়ে গিয়ে এদের পাশে দাঁড়াল। বাঘটার পেটের কাছটা তখনও আক্ষেপে ওঠাপড়া করছে। কিন্তু সে আর উঠবে না তা বোঝা গেল। বাঘটার বুকের কাছে প্রকাণ্ড একটা গুলির ঘা, তার ডান দিকের পাঁজরায় একটা যেন তীরের ফলা বিঁধে আছে। রাজু ভালো করে দেখে বুঝতে পারল বুজরুকের মাথায় তার কুল্লাযুক্ত মুরেঠা নেই, মাথায় মস্ত বড় একটা টাক। দেখল, তার তলোয়ারটা মাটিতে পড়ে আছে এবং ডগার দিকে প্রায় আধ হাত ভেঙে গেছে।

বাঘিনীর সাড়া পাওয়া গেল না। দূর থেকে যেন একটা গর্জন শোনা যাচ্ছে। এদিকে হাতি দুটিও এগিয়ে এসেছিল। বাঘটার মৃতদেহ সেখানেই পড়ে রইল। বুজরুক বা পিয়েত্রো একবারও বোধ হয় তার কথা আর ভাবল না। মাহুতের নির্দেশে হাতি দুটি বসল। শিকারিরা আবার হাওদানশিন হল। হাতি দুটি নীরবে ফিরে চলল। সেই পুরনো পথে আবার হাতি চলছে কখনও-বা পা মেপে মেপে, কখনও-বা দ্রুতগতিতে।

অনেকটা বেলায় পিয়েত্রোর বাড়িতে পৌঁছে রাজু তখন-তখনই বাড়ি ফিরবার কথা তুলেছিল। পিয়েত্রো শোনেনি। রূপচাঁদের মুখে খবর পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাজুর বাড়িতে। রাজু সন্ধ্যায় ফিরবে। সেই ব্রাহ্মণ পরিচারক দুটি রাজুর স্নান-আহ্নিক ও সাত্ত্বিক আহারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

সন্ধ্যা নামছে। সারাদিন হাতির দোলায় দুলে রাজুর হাতিতে ওঠবার ইচ্ছে ছিল না। মাহুত হাতি নিয়ে চলে গেছে। কিন্তু নতুন-পাওয়া বন্দুকটা হাতছাড়া করেনি রাজু; রূপচাঁদের সঙ্গে ধীরে ধীরে হেঁটে বাড়ি ফিরছে।

রাজু বলছিল, 'বুজরুক আর পিয়েত্রোর মধ্যে কার সাহস বেশি বল তো রূপচাঁদ। বুজরুকের, না'?

'আজ্ঞে'।

'আসলে তুই বুজরুককে দেখতে পারিস নে। খোলা কিরিচ নিয়ে বাঘের দিকে অমন করে ছুটে যাওয়া সোজা কথা নয়। এ তোর নিমে কামারের খাঁড়া দিয়ে হাড়িকাঠের মোষ কাটা নয়'।

'আজ্ঞে'।

'আজ্ঞে কি রে। ও, তুই তো তখন পালিয়েছিলি। আচ্ছা, চল, বাড়ি গিয়ে বলব। কী ভালো যে লাগল আজ আমার। আমি তো ভাবছি পাঁচ-সাত দিন পরে আবার যাব'।

'আজ্ঞে'।

'আবার আজ্ঞে করলে গুলি করব তোকে। আমি বলছিলাম বুজরুকের উচিত ছিল পিয়েত্রো যেমন গুলি করল বাঘটাকে তেমনি গুলি করা'।

'হ্যাঁ হুজুর'।

রাজু রূপচাঁদের কথা বলার কায়দায় হেসে ফেলল, 'ভারি চালাক হয়েছিস তুই। বন্দুকটা একবার হাতে করে দেখবি কেমন? বাড়ি গিয়ে কিন্তু এর গায়ে সিঁদুর লাগিয়ে প্রণাম করিস নে যেন'।

আর কয়েক পা এগুলে মাঠটা শেষ হবে। মাঠের প্রায় প্রান্তে একটি অশ্বত্থ গাছ। গাছটা প্রাচীন। তার তলায় তিনটি পথ এসে মিশেছে। একটি মরেলগঞ্জ, একটি রাজুদের গ্রাম, আর-একটি গেছে পিয়েত্রোদের আবাদের দিকে।

নিজেদের গ্রামের পথে উঠে রাজু বলল, 'কিন্তু শিকারে যাবার আগে নিশানা ঠিক করে নিতে হবে। আজকের শিকারে তো একটা গুলিও চালাইনি। এর পরের দিন আর তা চলবে না। আচ্ছা, পাখি কোথায় পাওয়া যায় বলতে পারিস? উড়ন্ত পাখির উপরে নিশানা করা অভ্যেস করতে হবে'।

নিজের ঘরের কাছে শিকার করলে এবং সে-শিকার যদি পাখি হয় তবে বোধ হয় রূপচাঁদের খুব একটা আপত্তি ছিল না। সে বললে, 'আমাদের পুরনো বাড়ির পুকুরে বুনোহাঁস আসে এ-সময়ে, বনে হরতেল আসে। খোঁজ নিয়ে দেখতে হয় তিতির আছে কিনা'।

রূপচাঁদের পুরনো বাড়ি—রাজুদেরই পুরনো বাড়ি। প্রকাণ্ড এই জীর্ণ ধ্বংসস্তূপটা এরা দু-পুরুষ আগে ত্যাগ করে এই নতুন বাড়িতে এসে বাস করছে।

কথাটা শুনে রাজু খানিকটা সময় ভাবল। পরে বলল, 'আজ নিশানা নিয়ে ভারি এক মজার ব্যাপার হয়েছে। মরেলগঞ্জের দেওয়ানের নৌকো আসছিল। আমি কি আর তাই জানি! মস্ত বড় পাল। বুজরুক উড়ন্ত গাঙশালিক মারল বন্দুক দিয়ে। আমি কি আর তাই পারি, আমি পালটা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তেই একশো হাত দূরে পালটা চড়চড় করে ফেঁসে গেল গুলি লেগে। নৌকোটা কাত হয়ে পাশের ডুবো-চড়ায় আটকে গেল। ও-নৌকো তুলতে দেরি আছে। কিন্তু নিশানা আমার খুব খারাপ নয়। ওদের মাস্তুলে বাঁধা নিশানটায় একটু নিশান করে গুলি মারতেই সেটাও পড়ে গেল'।

রাজু দৃশ্যটা স্মরণ করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বললে, 'কিন্তু যে-কটা গুলি পিয়েত্রোর কাছে পেয়েছি, এতে আর ক'বার নিশানা করা যাবে! গুলি কোথায় পাওয়া যায় জানিস?'

'পিয়েত্রোসাহেবের কাছে'।

'বার বার তার কাছে চাওয়া যাবে না। সেটা লজ্জার ব্যাপার। বরং তার কাছে জেনে নিতে হবে কোথায় পাওয়া যায়'।

'কোথায় পাওয়া যায় আমি জানি'। কথাটা রূপচাঁদ বলেনি। পেছন থেকে কে যেন বলল। তখন প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। পথের ধারে এ-জায়গাটাতেই অন্ধকার একটু বেশি হয়। পুরনো একটা শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষকে ঘিরে লতা ও আগাছায় রাস্তার বাঁ দিকটাতে খানিকটা জায়গা অন্ধকার করে

রেখেছে। ডান দিকে দু-তিনটি অত্যন্ত প্রাচীন বকুলগাছ আর মন্দির বোধ করি সমবয়সী।

রাজু বিরক্ত হল পথচারীর ব্যবহারে, কিন্তু আগ্রহও তার কম ছিল না। সে বলল, 'কোথায় পাওয়া যায়?'

'মরেলগঞ্জে। সেখানে গেলেই পাবেন। চলুন'।

'খবরটা জানা থাকল'। বলে রাজু ফিরে আবার পথ ধরল।

কিন্তু লোকটির আগ্রহ রাজুর চাইতেও বেশি।

'আজ্ঞে না, শুধু খবর জানা নয়, যেতে একটু হবেই'।

'তা যাওয়া হবে একদিন'।

'একদিন নয়, এখনই একবার যেতে হয়'।

রাজু মনে মনে স্থির করল, লোকটার বোধ হয় ছিট আছে। আর কথা না-বলে রাজু পথ চলতে লাগল।

কিন্তু লোকটি ছাড়বার পাত্র নয়। সে বললে, 'কই, শুনলেন না? এখনই একবার যেতে হবে মরেলগঞ্জে'।

'তুমি কি পাগল'?

'যারা চলন্ত নৌকোর পালে গুলি ছুঁড়ে নৌকো বানচাল করে দেয় তাদের চাইতে কম পাগল'।

'কী বললে কথাটা'?

'এমন কিছু নয়, আপনাকে এখনি একবার মরেলগঞ্জে যেতে হবে। নিশান দাগার গল্পটা সেখানে সবাই শুনতে চায়'।

লোকটির কথা বলার ধরন ভালো নয়। রাজু বিস্মিত হল।

'তুমি বোধ হয় কার সঙ্গে কথা বলছ তা জানো না'।

'খুব জানা আছে। আপনি বোধ হয় জানেন না আমি কে। আমি মরেলগঞ্জের সদর-তহসিলদার চন্দ্রকান্ত সেন'।

রাগে রাজুর গা রি-রি করতে লাগল।

'ভাব দেখে মনে হয় এখানেও তুমি তহসিলদারি করতে এসেছ। আমার সামনে থেকে সরে যাও'।

'সরে যেতে কি এসেছি! মরেলগঞ্জের দেওয়ানসাহেবের হুকুমে এসেছি। ভালো কথায় না-যান তো যেতে বাধ্য করা হবে। কৈফিয়ত দিয়ে আসবেন মরেলগঞ্জের নৌকো বানচাল করার'।

'বদমাস কোথাকার'! রাজু দাঁতে দাঁত চেপে বলল।

'বদমাস আমি? না বদমাস ...'

রাজু আর কথা বলল না। বন্দুকে গুলি ভরে সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, তহসিলদার'।

'বাজে কথা বলবেন না'।

তহসিলদারের কথা শেষ হবার আগেই রাজু গুলি করল। বন্দুকের শব্দ, আগুনের হল্‌কা, একটা অব্যক্ত আর্তনাদ। তহসিলদার মাটিতে পড়ে মাটি কামড়াতে লাগল, মুঠ্‌-মুঠ্‌ করে মাটি চেপে ধরতে লাগল। অতি সামান্য সময়। তারপর তার সেই বোবা কান্না স্তব্ধ হয়ে গেল। সন্ধ্যার ম্লান আলোয় রক্ত বোঝা গেল না।

রূপচাঁদ ফিসফিস করে বলল, 'খুন করলেন হুজুর, লোকটাকে'।

রাজু কথা বললে না।

রূপচাঁদ আবার বলল, 'শেষ হয়ে গেল যে'!

রাজুর মুখ দিয়ে বার হল 'মরেলগঞ্জ'।

তারপর রাজু দ্রুত হাঁটতে লাগল। রূপচাঁদ খানিকটা পথ রাজুর পেছন পেছন গেল, তারপর হঠাৎ

পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পিয়েত্রোর আবাদের উদ্দেশ্যে ছুটল।

রাজচন্দ্রর বাড়ির দরজায় তখন আলো জ্বলছে। কিছুদূর যাবার পরই আলো হাতে কয়েকজন লোকের সঙ্গে তার দেখা হল। তারা রাজবাড়ি থেকে রাজচন্দ্রকে খুঁজতে বেরিয়েছে। তাকে দেখে সরে দাঁড়িয়ে মাথা নিচু করে তারা সম্মান জানাল, তারপর পথ আলোকিত করে সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল। বন্দুকটা মুঠো করে চেপে ধরে মাথা নিচু করে রাজু নিঃশব্দে তাদের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলল।

সদর-দরজা পেরিয়ে বাইবের চত্বর পার হতে হতে রাজু দেখতে পেল বাঁ দিকের কাছারিঘরগুলি বন্ধ। আমলারা বাড়ি চলে গেছে। ডান দিকে টবে সাজানো বিলেতি গাছগাছড়ার একটা ছোট বাগান। বাগানটুকু পার হলে রাজুদের দেওয়ানের বাসা। রাজু দেখতে পেল বাসার ঘেরা বারান্দায় আলোর কাছে দেওয়ান বসে আছে।

কী মনে করে সে দেওয়ানের কাছে যাবার জন্য বাগানটুকু পার হতে লাগল। রোজ যে-জিনিসগুলো চোখে পড়েও পড়ে না, এখন সেগুলো খুব যেন স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়তে লাগল।

তার মনে হল, তার মনের ভেতর থেকে কে যেন বললে, দেওয়ানের নাম হরদয়াল। লোকের মুখে মুখে সে-নামটা কী করে হৃদলাল হয়ে গেছে।

হরদয়াল একখানা আরামকেদারায় অর্ধশায়িত। তার গায়ে কাশ্মীরি শাদা পশমের চিনা কোট। পায়ের উপরে শাল ভাঁজ করে রাখা। পাশে ছোট একটা বিচিত্র কাজ কবা টেবিলের উপবে ইংরেজি আলো। সেই উজ্জ্বল আলোতে একখানা ইংরেজি বই পড়ছে সে।

রাজু আরো লক্ষ্য করল, হরদয়ালেব কানের পাশে আরো কিছু চুল পেকেছে, তার হাতের আংটিব পাথরটা থেকে নীল রঙের একটা আলো দেখা দিচ্ছে। তার শালের পাড়ে যে-কল্কাগুলো আছে সেগুলো ঠিক কল্কা নয়, বল্লমের ফলার মতো দেখতে।

পায়ের শব্দে চোখ তুলে হরদয়াল বলল, 'বোসো। এ-পোশাকে তোমাকে বেশ মানায'।

রাজু হঠাৎ জানু পেতে হরদয়ালের পাশে মাটিতে বসে পড়ল এবং যতদূব সম্ভব তার দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললে, 'খুন কবেছি, একটা মানুষকে খুন করেছি'।

বই থেকে চোখ সরিয়ে হরদয়াল বলল, 'কী? কী হত্যা করেছ? মানুষ'!

কিন্তু তারপর রাজু আর দাঁড়াল না। অন্দরের দিকে রওনা হয়ে গেল। হরদয়াল বইয়ের উপব আবার চোখ পাতল কিন্তু মন পাততে পারল না। তার সন্দেহ হল রাজু মদ খেয়েছে। পিয়েত্রোটা যা মাতাল তাতে তার সংস্পর্শে এলে মাতাল হতেই হবে। ঘৃণা হল হরদয়ালের। তীব্র একটা তিরস্কার তার মনে জমা হল। কিন্তু আলোটার দিকে চেয়ে ভাবতে ভাবতে ম্লান আলোয় দেখা বাজুর বিবর্ণ মুখটা দেখতে পেল যেন আবার।

হরদয়ালকে উঠতে হল। চটিটা পায়ে গলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাগানটা পার হয়ে অন্দরের দিকে চলল সে।

অন্দরের পথে পা দিতেই একটি দাসীর সঙ্গে দেখা হল হরদয়ালের। মোটা থান-কাপড় পরা মলিন চেহারার দাসীটিকে দেখে হরদয়াল বলল, 'রানীমা কোথায় তোদের'?

দাসী বলল, 'দয়াল? আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম'।

'কী ব্যাপার রানী? রাজুর কথা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। সে কি নেশা করেছে'? হরদয়াল রানীমাকে চিনতে পেরে বলল।

'ঘরে এসো বলছি'।

ঘরে গিয়ে হরদয়াল প্রশ্ন করল, 'এমন অবস্থায় কোথায় যাচ্ছেন'?

'শুনেছ, রাজু একটা মানুষ খুন করেছে? সে আবার নাকি মরেলগঞ্জের দেওয়ান মনোহর সিং-এর লোক। কী হবে'?

'রাজু নেশা করেনি তো? নেশার ঝোঁকে বলছে না তো'?

'না। নেশা করেছে বলে মনে হয় না। কী হবে এখন, তাই বলো। ইংরেজ দেশের রাজা'।

'উপায় এখন প্রমাণগুলো দূর করা। রাজুর যে-রকম মানসিক অবস্থা দেখলাম, সে আর-কাউকে বলছে কিনা কে জানে'।

'রাজু বলছে, রূপচাঁদ জানে, তুমি জানো, আর আমি'।

'প্রমাণগুলো দূর করতে গেলে আরো অনেকে জানবে। তা না-জানিয়ে উপায় দেখছি না। রূপচাঁদ কোথায়'?

'সে রাজুর সঙ্গে ফেরেনি'।

দুজনে কিছুটা সময় চিন্তা করলেন।

হরদয়াল বললে, 'আমার প্রতি কী হুকুম'?

'আচ্ছা তুমি তোমার ঘরে যাও। আমি আর-একটু খোঁজখবর নিই। রাজুর কথাটাকে আর-একটু যাচাই করি। জেগে থেকো'।

'তাই দেখুন'।

হরদয়াল নিজের ঘরের দিকে ফিরে চলল চিন্তা করতে করতে।

২

পিয়েত্রোব কাছে রূপচাঁদ যখন খবরটা পৌঁছে দিল তখন বুজরুক দাদনের হিসেব নিয়ে মশগুল।

পিয়েত্রো তাকে ডেকে নিয়ে ফবাসিতে কী বলল। রূপচাঁদ এক বর্ণও বুঝল না, কিন্তু বুজরুকের চোখ দুটিতে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল, সেটা সে লক্ষ্য করল। আরো কিছুক্ষণ তারা রূপচাঁদের অবোধ্য ভাষায় কী আলাপ কবল, তারপর বুজরুক বললে, 'তুমি ভাঙ খেয়েছিলে রূপচাঁদ। ব্যাপারটা আর-কিছু নয়। আর কাকে কাকে বলেছ'?

'আর কাউকে নয়।'

'বেশ করেছ। তুমি এখানে দৌড়ে এসেছ, একটু বিশ্রাম করো। আমরা দেখে আসি ব্যাপারটা কতদূর। আমরা ফিরে না-আসা পর্যন্ত যেয়ো না কোথাও'।

বাত্রির পথ। ঘোড়া নয়, হাতি অনেক বেশি নির্ভরশীল, ছোট খানাখন্দয় পা পড়ে খোঁড়া হবে না। তার নিজের হাতিটায় একটা গদি বসিয়ে নিয়ে বুজরুক যখন সেটা নিজেই চালিয়ে নিয়ে উপস্থিত হল তখন পিয়েত্রোরও পোশাক পরা শেষ হয়েছে।

তারপর রাত্রির অন্ধকারে হাতি তার দ্রুততম গতিতে ছুটে চলল। অঙ্কুশের আঘাতে নয়, হাতির কানের পেছনে বুজরুকের পায়ের আঙুল গতি নির্দেশ করছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দে তবু তার গতির পরিচয় পাওয়া যায়, হাতির গতি প্রায় নিঃশব্দ। একেবারে পথের ধারে না-দাঁড়ালে শব্দে কেউ গতির ঠিকানা করতে পারবে না।

শিবমন্দিরের কাছাকাছি পৌঁছে বুজরুক ফিসফিস করে বললে, 'অনেকটা জায়গায় খুন ছড়িয়ে আছে'।

বুজরুক প্রেতে বিশ্বাস করত না, পিয়েত্রোও নয়। কিন্তু মৃতদেহের কাছে এমন একটা দৃশ্য চোখে

পড়লে অত্যন্ত দৃঢ় প্রত্যয়ও দুলে ওঠে। পিয়েত্রো ও বুজরুক সবিস্ময়ে দেখল, কে একজন অবগুণ্ঠনবতী দাঁড়িয়ে আছে মৃতদেহটার পাশে। অবগুণ্ঠনবতী পথের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু হাতির চলার শব্দে চকিতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পিয়েত্রো ও বুজরুক হাতি থেকে নামল। পরামর্শ আগেই করা ছিল। মৃতদেহটাকে বুজরুক হাতির উপর তুলে নিল। এবং পরক্ষণেই হাতি বুজরুককে নিয়ে অস্পষ্ট পথে উধাও হয়ে গেল। পিয়েত্রো ধীরে ধীরে নিজের বাড়ির পথ ধরল।

কিন্তু তখনও এ-দৃশ্যের সমাপ্তি ঘটেনি। পিয়েত্রো শুনতে পেল, কে তাকে পেছন থেকে ডাকছে।

'শুনুন'।

দ্বিতীয়বারও পিয়েত্রো আহ্বানটি শুনতে পেল। পিয়েত্রো থামল, ফিরে দাঁড়াল, দেখতে পেল একটি অবগুণ্ঠনবতী নারী তার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ম্লান আলোয় অবগুণ্ঠনবতীর মুখাবয়ব বোঝা গেল না। তার দেহবর্ণ যে অত্যন্ত পরিষ্কার, তার মাথার চুল যে অজস্র এবং তার দারিদ্র্য যে দুঃসহ তা বোঝা গেল। ছেঁড়া ময়লা শাড়ি, নিরাভরণ হাত, কুণ্ঠিত দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িযে সেই নারী, তবু অপ্রাকৃত বোধ হল পিয়েত্রোর কাছে। যেন সে কেউ নয়, শুধু দৃষ্টির বিভ্রম, কথা বলতে গেলেই মিলিয়ে যাবে।

পিয়েত্রো বললে, 'কী চাও তুমি'?

'আপনি কে তা আমি জানি, এখানে এসেছিলেন কেন তাই জানতে চাইছিলাম'।

'কেন, তা তুমি বুঝতে পেরেছ। এখন বললেও দোষ নেই। মৃতদেহটা এতক্ষণে সকলের নাগালেব বাইরে পৌঁছে গেছে'।

'আপনি কি কাজটি সৎ উদ্দেশ্যে করলেন'?

পিয়েত্রো একটু হেসে বলল, 'উদ্দেশ্য একটা ছিল, সৎ কি অসৎ কী করে বলি'।

'রাজচন্দ্রকে আপনি অবশ্য স্নেহ করেন'।

'সে আমার বন্ধুর ছেলে। কিন্তু তুমি কে? আমাব মনে হচ্ছে তোমাব দারিদ্র্য ছদ্মবেশ। সে-দারিদ্র্য মানুষকে এমন নিঃশঙ্ক করে না'।

'আমি একজন দরিদ্র গ্রামবাসী। আচ্ছা, আমি আসি'।

অবগুণ্ঠনবতী পেছন ফিরে চলতে শুরু কবল। পিয়েত্রো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাকে খানিকটা সময় দেখল।

রানী পিয়েত্রোর থেকে দূরে এসে দ্রুত চলতে লাগলেন। দাসীর ছদ্মবেশে নিজের বাড়ির সিংদরজার বাইরে যে-রানী অন্ধকার রাত্রির পথে এতদূর এসেছিলেন, আর যিনি এখন ফিরে চলেছেন, দুজন যেন এক নয়। ভয় ঠিক নয়, কেমন একটা স্নায়ুপীড়া অনুভব করছেন তিনি।

কাছারি পার হতে হতে রানী দেখতে পেলেন ঘরের বারান্দায় আলো জ্বালিয়ে হরদয়াল বসে বসে তখনও পড়ছে।

বাগানটুকুর এ পার থেকে রানী তাকে ডাকলেন। কাছে এলে রানী ঘটনা বর্ণনা করে জিগ্যেস করলেন, 'তোমার কি মনে হয় না পিয়েত্রো প্রমাণ গোপন করার জন্যই এমন করেছে'?

'তাই তো মনে হয়। কিন্তু রানী, আপনি নিজে গিয়েছিলেন? আপনারও উদ্দেশ্য ছিল পিয়েত্রোর মতো। অথচ আমাকে বললেন খবর নিতে হবে'।

'তুমি সঙ্গে যাও এটা আমি চাইনি'।

'এখন তা বুঝতে পারছি'।

'কাজটা কি আমি অন্যায় করলাম, হরদয়াল'?

'অনেক-সময়ে আপনার কাজকে আমি অন্যায় মনে করেছি। কিন্তু আজ বোধ করি আমার বেশি রাত জাগার ফলেই একটু অদ্ভুত বোধ হচ্ছে ব্যাপারটা। নরহত্যা নতুন নয়। কিন্তু রানীর পক্ষে এই অভিযানটির তুলনা পাচ্ছি না আমি'।

'সন্তানকে রক্ষার চেষ্টা সব মাকেই কখনও-না-কখনও করতেই হয়'।

'তা হয়। কিন্তু আজ সহসা আমার একটা চরিত্রকে মনে পড়ে গেল যেটি কাব্যে প্রায় অবহেলিত। তিনি হচ্ছেন আমাদের কাব্যসাহিত্যের একমাত্র ঐশ্বর্যময়ী বিধবা, যিনি স্বামীর অবসানের পরও অনেকটা সময় দীপ্তিমতী ছিলেন। ভীমার্জুন-আদিকে তিনি নিশ্চয়ই রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন। তিনি কুন্তী। তাঁকে শোক করতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাঁকে শাপ-শাপান্ত করতেও শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না। অথচ পঞ্চনায়কের পেছনে তাঁর ধীর মূর্তিটা চোখে পড়ে কখনও কখনও'।

রানীর চোখে-মুখে লুকনো হাসি বিচ্ছুরিত হল। (তখন তাঁর চল্লিশ হতে হয়তো দেরি আছে এবং তিনি স্থিতযৌবনা)।

রানী বললেন, 'ভাবকরা এ রকম বলে থাকে'।

হরদয়ালের স্বভাবস্নিগ্ধ মুখখানা ঈষৎ বিবর্ণ হল।

কিন্তু রানী পরক্ষণেই শান্ত গলায় বললেন, 'এখনও কিছু কাজ আছে হরদয়াল। রূপচাঁদ এখনও ফেরেনি। তার জন্য অপেক্ষা করার বোধ হয় দরকার নেই। কিন্তু অনুসন্ধান নিশ্চয়ই হবে এবং সেসব প্রশ্নের উত্তর তোমাকেই দিতে হবে। ভেবে-চিন্তে রেখো। আমি যাই, একটু স্নানের ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখি'।

চলার উপক্রম করে রানী বললেন, 'যদি তোমার কুন্তী বলে রানীকে সম্মান করতে সাধ যায়, আমি আপত্তি করব না, হরদয়াল'।

রানী চলে গেলেন।

৩

রোহিণী শুনেছিল তার স্বামী কার্যোপলক্ষে রাজচন্দ্রর গ্রামে এসেছে। তারপর আর তাকে পাওয়া গেল না। এ গ্রামে এসে খোঁজ করার আগে কুঠির দেওয়ানখানায় সে খোঁজ নিয়েছিল। তারাও অনুসন্ধান করে পায়নি।

এ গ্রামে এসে প্রথম দেখা হল তার রূপচাঁদের সঙ্গে। অবশ্য উভয়েই পরস্পরের সম্পূর্ণ অপরিচিত। নিচুস্তরের স্ত্রীলোক নয়। অথচ এমন অকুণ্ঠিতভাবে আলাপ করতে রূপচাঁদ কাউকে দেখেনি। স্বভাবতই রূপচাঁদ স্ত্রীলোকটির প্রতি শ্রদ্ধালু হয়েছিল। কিন্তু তার অনুসন্ধানে রূপচাঁদ ভীত হয়ে প্রথম সুযোগেই পালিয়ে বাঁচল তথাপি খবর ছড়িয়ে পড়ার আগে হরদয়ালের কাছে সে খবর দিল স্ত্রীলোকটির।

হরদয়াল তার খাতাপত্র থেকে মুখ তুলে বলল, 'তামাক সাজো'।

অনেকক্ষণ ধরে তামাক খেল হরদয়াল কিন্তু দ্বিতীয় কথাটি বলল না।

সে স্থির করল স্ত্রীলোকটির সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার হতে দেওয়া চলবে না। তার মুখের উপর বলা যাবে না—আমি জানি না।

রূপচাঁদ ছটফট করছিল, খবরটা হজম করার সাধ্য ছিল না তার। অবশেষে রানীমা জানলেন। রোহিণী চোখের কাপড় সরিয়ে বললে, 'আমি আশ্রয়হীনা নই, কিন্তু কী মূল্য সে-আশ্রয়ের? আমি কী করব'?

রানী বললেন, 'স্বামীর সঙ্গে আবার দেখা না-হওয়া পর্যন্ত তোমাকে এখানেই থাকতে দিতে পারতাম। কিন্তু জানো কি, সেই সুবাদে কুঠিয়ালদের সঙ্গে কোনো পরিচয় হয় তা আমি চাই না। আর আশ্রয়ের

কথা বলছি এইজন্যে, বয়েস তোমার ভালো নয়'।

রোহিণী বলল, 'আপনি একটু খোঁজখবর করুন রানীমা আমার হয়ে'।

এবার রানীকে একটু ভাবতে হল উত্তর দেওয়ার আগে। একটু পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'যদি খুঁজে পাওয়ার হয় খবরও পাবে তুমি। আর যদি কোনোদিন সংসার চালাতে অসুবিধে হয়, আমাকে খবর দিয়ো'।

রোহিণী চলে গেলে রানী বললেন রূপচাঁদকে, 'তোমাদের কুমারের কাছে যেন মেয়েটি কখনও না-যায়'।

এরপরে এল সদর থেকে ডেপুটি কালেক্টর। ছোটখাটো রাজসূয় ব্যাপার একটা ঘটে গেল। ডেপুটি আসার সাতদিন আগে খবর এল ডেপুটি আসছে। নদীর ধারে গঞ্জের ঘাটের কাছে ছোট একটি মাঠ ছিল। তার উপরে তাঁবু পড়ল গোটা তিন-চার। কোনোটি সাহেবের খাসকামরা, কোনোটি অফিস, কোনোটিতে রসুইখানা। মরেলগঞ্জের কুঠির তরফ থেকে স্বয়ং দেওয়ান মনোহর সিং তদবির-তদারক করছে, সকাল-বিকেল হাতি নিয়ে যাওয়া-আসা করেছে। ইতিমধ্যে ডেপুটিসাহেব দুবার কুঠিতেও গিয়েছিল।

তৃতীয় দিনে পেয়াদা এল রাজচন্দ্রর বাড়িতে। ডেপুটিসাহেব স্মরণ করেছে।

খবরটা এসেছিল হরদয়ালের হাতে।

'তা বটে। আশঙ্কা এরকমই করা গিয়েছিল এ ব্যাপারে'—এই হল হরদয়ালের স্বগত উক্তি।

চুনট-করা অতিসূক্ষ্ম ধুতি, জরিদার চাপকান, তার উপরে কল্কাদার শাল, মাথায় শামলা, পায়ে পাম্প জাতীয় ঝকঝকে জুতো পরে ষোলো-বেহারার পালকিতে চড়ে হরদয়াল ডেপুটির তাঁবুর দিকে রওনা হল। পেছনে দুজন চোপদার ছুটতে লাগল।

তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত রেখে ডেপুটিসাহেব বায়ু গ্রহণ করছিল। চোপদারদের ঝলমলে পোশাক ও ছটা দেখে ডেপুটি অনুমান করল, কেউকেটা কেউ আসছেন, বোধ করি রাজকুমার।

ডেপুটি কড়া মুখ করে তাঁবুতে প্রবেশ করল।

হরদয়াল এর আগে সদরে ডেপুটিদের এজলাসে মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষে গিয়েছে। কিছুদিন আগেও এক ফিরিঙ্গি ডেপুটি ছিল এ জেলায়। হরদয়াল ফিরিঙ্গিদের চেনে, তাদের ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে তার ধারণা আছে। সে জানত তাদের সঙ্গে দু-রকম ব্যবহার করা যায় : পালটা ঔদ্ধত্য কিংবা বিনয়। মাঝে মাঝে অত্যন্ত সদ্‌গুণসম্পন্ন ফিরিঙ্গির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা দুর্বিনীত।

হরদয়াল তাঁবুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাঙালি পেশকারকে দেখতে পেল। বাংলায় কথা বলতে পারত, কিন্তু তা না-বলে ইংরেজিতে যা বললে তার ইডিয়মগত অর্থ—ডেপুটি-কালেক্টরকে আমার আগমন জানাও।

কিছুক্ষণ পরে ডেপুটির খাসতাঁবুতে হরদয়াল প্রবেশ করল।

ডেপুটি বাঙালি। হরদয়ালকে বসতে বলে জিগ্যেস করল, 'আপনি কি রাজকুমার'?

'না, আমি তাঁর কর্মচারী এবং আমমোক্তার'।

'আপনি কি জানেন চন্দ্রকান্ত সেন নামে মরেলগঞ্জের কুঠির কোনো একজন কর্মচারী গুমখুন হয়েছে'?

'এ রকম সংবাদ আমি জানি না'।

'আপনি কি জানেন রাজকুমার পিয়েত্রো নামক এক ফরাসির সঙ্গে ঘটনার দিন শিকারে গিয়েছিল'?

'ঘটনাটা কী, তাই যখন জানি না তখন ঘটনার দিনে আর-কী ঘটেছিল কী করে বলা যাবে। তবে রাজকুমার কিছুদিন আগে শিকারে গিয়েছিলেন এ-কথা সত্য'।

'শিকারে যাবার আগে মরেলগঞ্জের একখানি সুলুপকে সে বন্দুক ছুঁড়ে দখল করার চেষ্টা করে'।

'এ খবর রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা না-করে কিছু বলা যাবে না'।

'কিন্তু পিয়েত্রোর অনুচরদের আমি জিজ্ঞাসা করে জেনেছি ব্যাপারটা ঘটেছিল। তার বন্দুকের গুলি লেগে সুলুপের পাল ছিঁড়ে যায় এবং চলন্ত অবস্থায় নৌকোটা একটা ডুবোচরে আটকে বানচাল হবার উপক্রম হয়েছিল। তারপরেও ইউনিয়ন জ্যাককে গুলি করে ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে'।

'এসব খবর আপনি যখন নির্ধারণ করেছেন তখন আর আমাকে জিজ্ঞাসা করা কী দরকার'!

ডেপুটি হুঁকাবরদারকে তামাকু দিতে বলল। তামাক সেবনের পরে সে বলল, 'আমরা দুজনে এতক্ষণ ইংরেজি ভাষায় কথা বললাম। আপনার ইংরেজি শুনে আমি বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছি। আপনি কি হিন্দু কলেজের'?

'না, কলেজে পড়া আমার হয়নি। তবে হেয়ারের সঙ্গে একসময়ে আমার পরিচয় ছিল। আপনি হেয়ারের ছাত্র'?

ডেপুটি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন, 'কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য! সমুদ্রের গভীরে রত্নখনি, এই রাজ্যে আপনাকে পাব ভাবতেও পারিনি। আপনি কি ব্রাহ্ম'?

'না। তবে রাজা রামমোহনকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি'।

'আরে শুনেছেন মশাই, শুনেছেন হীরার কাহিনী! সে-এক কেচ্ছা'।

'কোন হীরা'?

'হীরা বুলবুল'।

'কী হয়েছে তার'?

'তার এক ছেলেকে কলেজে ভর্তি করা নিয়ে কলকাতার জ্ঞানী-গুণীরা দু'ভাগ হয়ে গেছে। এডুকেশন কাউন্সিল বলছে তাকে কলেজে ভর্তি করতে হবে, আর কলেজের গভর্নিং বডির কিছু সভ্য বলছে, বাইজির ছেলেকে কলেজে ভর্তি করলে ভদ্রলোকের ছেলেরা কলেজে পড়বে না, পড়া উচিত নয়'।

'তারপর'?

'রাজু দত্ত নতুন কলেজ খুলেছে, হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ। গভর্নিং বডির অনেক সভ্য পদত্যাগ করেছে। ক'দিন চলবে কলেজ কে জানে'।

আধুনিক কলকাতার খবর নিয়ে আরো কিছুটা সময় দুজনের আলাপ হল। ইতিমধ্যে ডেপুটিসাহেবের পিপাসা পেয়েছিল। শ্যাম্পেন এল।

'চলবে নিশ্চয়'?

'তা চলুক'।

শ্যাম্পেন চলতে চলতে কথা হল আরো কিছুটা সময়। ডেপুটি কাজের কথায় ফিরে এসে বলল, 'তাহলে, একটা ব্যাপার কিন্তু আমাকে নোটিসে নিতে হচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই সত্যি যে, সুলুপটা গুলির আঘাতেই বেচাল হয়েছে এবং সে গুলি চলেছিল পিয়েত্রোর হাওয়াখানা থেকে। আমি পিয়েত্রোর গ্রামেও যাব তদন্তে। আপনাকে রেজাল্ট জানাব'।

'যদি রাজকুমারের দোষ প্রকাশ হয়, কী হতে পারে'?

'হতে কিছু পারে। সুলুপের জন্য ভাবি না। বিটউইন ইউ অ্যান্ড মি, আমি মশাই এতে খুশি হয়েছি। ব্লাডি নীলকর! আর মশাই এটা তো কোনো বিচারই নয়। ওরা ব্ল্যাক অ্যাক্ট বলে চ্যাঁচাবে আর আমরা ব্ল্যাকম্যানদের সাজা দেব! সেই পুরনো কথা। নীলকরদের এত বাড় সহ্য করা যায় না। কিন্তু মুশকিল ওই ইউনিয়ন জ্যাক নিয়ে। সেটার অপমান হয়েছে। কিছু শাস্তি হবে'।

'ফাইন'!

'কালেক্টর লোক ভালো। ফাইনে নিষ্পত্তি করলেও করতে পারেন'।

হরদয়াল বলল, 'আমি এ-বিষয়ে একটু আলাপ আলোচনা করে পরে আপনাকে জানাব'।

হরদয়াল অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়েছিল। রাজুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সে জানতে পেরেছিল রাজু গুলি করে পতাকা ছিঁড়ে দিয়েছে। অন্যায় বইকি। রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতীককে অপমান করা। অন্য দিকে, রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতীক নীলকররা ব্যবহার করছে, এটাই-বা অন্যায় নয় কেন?

কিন্তু ব্যাপারটা সহসা অন্য দিকে ঘুরল।

একদিন সকালে যখন হরদয়াল এবং ডেপুটি শ্যাম্পেনের গ্লাসের সাহচর্যে হেয়ার ও ডিরোজিও থেকে রিচার্ডসনের যুগে এসেছে এবং হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের ছাত্ররা রিচার্ডসনকে পেয়ে ধন্য হয়েছে কিনা আলোচনা করছে—বুজরুক আলি এল তার তাজিয়া ঘোড়ায় চেপে। সোনা-চাঁদি-জরি-ইস্পাত-মসলিনের সমন্বয়ে অপূর্ব পরিচ্ছদ। মাথার কামদার পাগড়ির কুল্লা এত উঁচু যে তাঁবুর ছাদে বার বার লেগে যাচ্ছে। সোনা ও কালোয় চিত্রিত একটা বাঘ যেন।

ডেপুটি বললে, 'আপনার কথার সত্যতা বিচার করব কী করে'?

'আমার ইমানদারি। আমি পাঠান। আমার নাম বুজরুক আলি খান লোদি। আমার ইমানদারি জিম্মা আছে হজরৎ মৈনুদ্দিন চিশ্‌তির রহমতের কাছে'।

'কিন্তু ...'

বুজরুক অট্টহাস্য করে বলল, 'একটা নাবালক ছেলে কখনও অন্যায় করতে পারে, ফিরিঙ্গি কাজিসাহেব? আমি তাকে বলেছিলাম নিশানা দাগতে, নাবালক ভুলক্রমে নিশানকেই মেরে দিল'।

'আপনি জানেন এর ফল কী হতে পারে'?

'কয়েদখানা'।

'আপনি তার জন্য প্রস্তুত'?

'উপায় কী। তলোয়ার আর বন্দুক নিয়ে এ-জমানায় আত্মহত্যা করতে পারি, আর-কিছু নয়'।

'আচ্ছা, আপনাকে আমি পরে ডাকব'।

বুজরুক আলি চলে গেল। ডেপুটি বললে, 'নৈতিক দায়িত্ব বেশ জোর দিয়ে স্বীকার করছে লোকটি। তবে তাতে কাজের দায়িত্ব দূর হচ্ছে না। কিন্তু লোকটি কি সবটুকু সত্য বলছে'?

হরদয়াল বললে, 'সবটুকু সত্যের মূল্য দিতে আমরা পারি না। ধরুন, সত্যি যদি নীলকরের সুলুপের মাথায় ওড়ানো ইংলন্ডের জাতীয় পতাকাকে ওরা নষ্ট করেই থাকে তবে সবটুকু সত্য বলতে গেলে কি এ-ও বলতে হয় না যে, ওরা একটা অন্যায়ের প্রতিবিধান করেছে মাত্র? নীলকরের কি নৈতিক অধিকার আছে অন্যায়ের জাহাজে রাষ্ট্রীয় পতাকা স্থাপন করার? সে তো তার রাষ্ট্রের প্রতিভূ নয়। সে শুধু চায় তার রাষ্ট্রের অস্ত্রবলের ভয় দেখিয়ে পদ্মার বুকে অন্যায়ের জাহাজ চলিয়ে নিয়ে যেতে। পর্তুগিজ হারমাদদের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? সেইসব হারমাদদের যারা জব্দ করেছিল তারা কি অন্যায় করেছে? না। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে মরেলকে জব্দ করাও অন্যায় হয়নি। কিন্তু এই অন্যায়কে অন্যায় বলা যাচ্ছে না। মরেল-হারমাদদের সমর্থন করছে কলকাতার কিছু লোক। সবটুকু সত্য বলাও ভালো নয়, শুনেও ফল হয় না'।

মৃত্যু—এই বিষয়টি যে-বয়সে অবিশ্বাস্য থাকে সেই বয়স রাজুর। তার জ্ঞান হওয়ার পর কোনো মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি তাদের বাড়িতে। মৃত্যু তার অপ্রত্যক্ষ ছিল।

শিকারের বাঘ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর মৃত্যুও সে দ্যাখেনি। বাঘের মৃত্যুর ব্যাপারটা যেন একটা দ্রষ্টব্য কিছু। যেন একটি ঝড়, কিংবা একটা মহীরুহের ধ্বংস। তাদের বাগানে বড় বড় গাছ কাটার সময়ে খবর পেলে রাজু এর আগে বাগানে গিয়ে দৃশ্যটা অনুভব করেছে। মড়মড় করে যখন কর্তিতশাখা বনস্পতি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে তখন মনটা একটু ফাঁকা হয়ে যায় বটে।

কিন্তু বাঘও নয়, বনস্পতিও নয়, কেউ এমন করে ডুবন্ত মানুষের মতো মুঠ্‌মুঠ্‌ ক'রে মাটি ধরার চেষ্টা করে না, কোনোক্ষেত্রেই এমন একজোড়া চোখ রাজুর চোখের উপর নালিশ জানানোর মতো প্রায় শিশুর মতো সাহায্য চাওয়ার ভঙ্গিতে স্থাপিত হয়নি। ইতিমধ্যে একদিন তার মায়ের ঘর থেকে নিজের ঘরে আসতে আসতে প্রায়ান্ধকার বারান্দাটিতে সে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তার চোখে জল এসেছিল সহসা।

হত্যা অপরাধ কিনা, তার জন্য শাস্তিবিধান হয় কিনা—হলে সে শাস্তি কত বড়, এ সম্বন্ধে রাজুর কোনো প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। এ বিষয়ে কারো আলোচনা সে শোনেনি। তার চিন্তায় নিজের জন্য ভয় ছিল না। রূপচাঁদই পার্থক্যটা সূচনা করল প্রথম। যে এতদিন প্রায় খেলার সঙ্গী ছিল, তার ব্যবহারে কী করে একটি সসম্ভ্রম ভয় এসে গেছে। রাজু তার নিজের ঘরে বসে থাকলে আগেকার মতো রূপচাঁদ সরাসরি ঘরে চলে আসে না।

রানীর হৃদয় অপরিসীম। রাজু যখন তাঁর বক্ষলগ্ন হয়ে থাকত, তখন যেমন এখনও তেমনি—সে তাঁর মনের সীমা পায়নি। প্রথম দিনের সকালেই রানী তাঁর নিজের ঘরে ডেকে পাঠিয়ে নিষেধ করে দিয়েছেন, 'কাউকে বলিস নে'। রাজুর প্রতি তাঁর ব্যবহারের পরিবর্তন হয়েছে বললে ঠিক বলা হয় না। সে অসুস্থ হলে তাঁর ব্যবহারে যেমন স্নেহকাতরতা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে, যেন রাজু অসুস্থ।

লেখাপড়া, খেলাধুলো নয় ; আস্তাবল-পিলখানা পরিদর্শন, বাগবাগিচার তদবির, অর্থী-প্রার্থীদের আবেদন রানীর পাশে বসে শোনা—এই ছিল তার প্রাত্যহিক কাজ। ঘটনাটির পর থেকে সবগুলো নিরর্থক হয়ে গেছে।

রাজবাড়ির মধ্যে যেমন, গ্রামের পথেও তেমনি সে একা একা ঘুরে বেড়ায়। যে-ঘটনাটি সবসময়েই মনে পড়ে যায়, সেটা কাউকে বলতে ইচ্ছে করে। দু-তিন দিনের মধ্যে তার দৃষ্টিতে একটা গাম্ভীর্য এসে গেছে।

একদিন যেমন সহসা তার চোখে জল এসে আরো কয়েকবার অশ্রু আসার পথ করে দিয়েছিল, তেমনি গ্রামের পথে ঘুরতে ঘুরতে একদিন সে হেসে ফেলল। স্বচ্ছ হাসি নয়, মরিয়া হওয়ার হাসি।

একদিন রাজু বলল রূপচাঁদকে, 'তুই কথা বলতে জানিস না। কথা বলার কায়দাও কষ্ট করে শিখতে হয়। তেমন লোক পাওয়া যায় না রে'?

এমনি অবস্থায় নয়নতারার সঙ্গে রাজচন্দ্রর দেখা হয়েছিল।

তারপর। ডেপুটির বিচারে বুজরুক আলি জেলে গেল। তার তলোয়ার-বন্দুক-ঘোড়া কয়েদখানার দরজা থেকে নিয়ে এল রূপচাঁদ। হরদয়াল নগদ টাকা গুনে দিয়ে রাজচন্দ্রকে সঙ্গে করে এজলাসের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে দেখল, কিছু দূরে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে পিয়েত্রো ঘন ঘন নস্য নিচ্ছে।

চন্দ্রকান্তর মৃত্যু-ব্যাপারটার কোনো হদিস হল না।

৪

নয়নতারাকে তার দাদার সংসারে যে দেখেছে আর এখন যে দেখবে সে-দুজনের বর্ণনা শুনলে নয়নতারাকে একই ব্যক্তি বলে মনে হবে না। তার দাদা ন্যায়রত্ন মশাইয়ের চতুষ্পাঠী ছিল গ্রামে। ছাত্রসংখ্যা নগণ্য। বরং ফার্সির পাঠশালায় ছাত্র পাওয়া যেত সে-সময়ে। ন্যায়রত্নমশাই কী রকম লোক ছিলেন তা গ্রামের লোকের এখন মনে নেই। তাঁর দু'একটা সদ্‌গুণের কথা শোনা যায় এর-তার মুখে, কিন্তু সেসব সদ্‌গুণের সমষ্টিই একটি চরিত্র-গঠনে পর্যাপ্ত নয়। আর-দশজন সম্বন্ধেও সেগুলো প্রয়োগ করা যায়।

ন্যায়রত্নের যখন মৃত্যু হল তখন তাঁর যুবতী স্ত্রীও সহমরণে যাবার জন্য প্রস্তুত। তার কিছুদিন আগে আর-একটা ঘটনা থেকে গ্রামবাসীদের জানা ছিল যে সহমরণে গেলে মৃতের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হবে এবং জেলার কালেক্টরের কাছে গিয়ে তার অনুমতি আনতে হবে।

ন্যায়রত্নবধূ সব শুনে আত্মীয়স্বজনকে কিছু বললেন না, নয়নতারাকে ঘরের মধ্যে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'একটা ফুলের মালা গেঁথে আনো আমার জন্যে'।

নয়নতারা দাদার মৃত্যুতে যন্ত্রের মতো বিচারশক্তিহীন হয়ে গিয়েছিল। তখনই সে মালা গাঁথতে চলে গেল।

মালা নিয়ে কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সে দেখেছিল, পরিষ্কার একটা শাড়ি পরে, চুলগুলি টান-টান করে বেঁধে ঘরের একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে ন্যায়রত্নবধূ বসে আছে। মুখে-চোখে কান্নার ময়লা নেই, ধুয়ে-মুছে প্রসাধনের যতটুকু সম্ভব নিখুঁতভাবে তা করেছে। চোখ দুটো বন্ধ, ছোট দেহটা থরথর করে কাঁপছে, ঠোঁট দুটো নীল, একটু যেন দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে।

নয়নতারার ডাকে চোখ দুটো ঈষৎ খুলেছিল, তারপর ন্যায়রত্নবধূর দেহটা লুটিয়ে পড়ল। বিষ! নিঃসন্দেহে সূচিকাভরণের জন্য সযত্নে রাখা বিষ। নয়নতারার প্রথমে মনে হল, আর-একবার চিৎকার করে কেঁদে উঠবে, কিন্তু একেবারে নীরব হয়ে গেল সে। হাতের মালাটা বউদির গলায় পরিয়ে দিল। পায়ে আলতা দিল, কপালে সিঁদুর। তারপরে পাড়ার লোকদের বলল, 'বউদি সূচিকাভরণের বিষে আত্মহত্যা করেছেন'।

গোলমাল তখনই মেটেনি। আত্মহত্যা আর সহমরণ একই কিনা এই নিয়ে তর্কবিতর্ক উঠেছিল। ঠিক এমন সময়ে পালকিতে চেপে এসেছিলেন একজন। কেউ বলে, রানীমা স্বয়ং—কেউ বলে, তাঁর প্রেরিত আর কেউ। তিনি এসে নয়নতারাকে প্রবোধ দিলেন। তারপর এল রাজবাড়ি থেকে বারোজন ব্রাহ্মণ। তারা রাজবাড়ির সেরেস্তার কর্মচারী। প্রায়শ্চিত্তের কথা তুলে যেসব ব্রাহ্মণ তখন আলাপ-আলোচনা করছিল তাদের উপেক্ষা করে ন্যায়রত্ন-দম্পতির দেহ সৎকারের জন্য নিয়ে গিয়েছিল তারা।

সে-ঘটনাগুলির অনেক খুঁটিনাটি ভুলে গিয়েছে নয়নতারা কিন্তু শেষ মুহূর্তে মালা গেঁথে আনার আদেশের একটি শব্দও সে বিস্মৃত হয়নি, এমনকী তার উচ্চারণটাও সে যেন এখন শুনতে পায়, যেমন সে দেখতে পায় তার ভ্রাতৃবধূর স্থির হয়ে বসে থাকার ভঙ্গিটি। দেহটা থরথর করে কাঁপছিল। এখনও মাঝে মাঝে নয়নতারার মনে হয়, তখন বোধ হয় বিষক্রিয়ার শেষ অবস্থা, জ্ঞান লোপ পাবারই কথা, তবু মনের ক্ষীণতম অংশকে জাগ্রত করে রেখেছিল সে নয়নতারার ডাক শোনার জন্য।

তখন নয়নতারা আর-দশটি মেয়ের মতোই ছিল, শুধু প্রতিবেশীদের তুলনায় কিছু মার্জিত ছিল তাব মন। ন্যায়রত্নমশাই বোনকে সটীক মহাভারতখানা আগাগোড়া পড়িয়েছিলেন। বলতেন—মেয়েছেলের ন্যায় শিখতে নেই, অন্যভাবে বলতেন, মহাভারত রসায়ন, ওতেই সব হবে।

কিন্তু পৃথিবীতে পুরুষের আশ্রয়ে নেই এমন একটি স্ত্রীলোককে চিনতে পারা কঠিন। তখন চাকরি করার সুবিধা ছিল না, নয়নতারার পক্ষে কুৎসিত জীবনও সম্ভব ছিল না। খুব শক্ত মেয়ে সে সন্দেহ কী। প্রথম দিকে সে মসলিনের জন্য সুতো কাটত। সেই সুতোর নাম ছিল। সুতোর জন্য দাদন পেত এবং দাদনের পরিমাণ স্থির হতো তার ইচ্ছায়, মহাজনের খুশিতে নয়। কিন্তু এ-বৃত্তি তাঁকে ত্যাগ করতে হল।

মহাজনের অর্থ ছিল, প্রাণে শখ ছিল। রাত্রির অন্ধকারে একদিন মহাজন এসে উপস্থিত। ঘরের দরজা খুলে নয়নতারা বলল—এত রাত্রিতে?

মহাজনের বয়স এমন কিছু বেশি নয়। ঝাঁকড়া চুল দুলিয়ে সে এক বিখ্যাত কাব্য থেকে এক-আধটা পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করল। শেষ খবর এই, নয়নতারা এরপর কার্পাসের কাজ ছেড়ে দিল এবং ধীরে ধীরে চিকিৎসাবৃত্তি গ্রহণ করল।

এখন সে কবিরাজ। যত-না সে কবিরাজি করে তার চাইতে বেশি করে ওষুধ তৈরি। গ্রামের হরনাথ কবিরাজ রোগীকে অনেকসময়ে তার কাছ থেকে ওষুধ আনতে বলে দেন, বিশেষ করে যখন রোগীর প্রাণ বাঁচানোর ইচ্ছা হয় তাঁর এবং সেই ইচ্ছার সূত্র ধরে আয়ুর্বেদোক্ত ওষুধের কথা মনে পড়ে যায়।

নয়নতারার বয়স পঁচিশ হবে। সন্ধ্যার আগে সে যখন পড়শিদের সঙ্গে কলস কাঁখে জল নিয়ে আসে তখনই তাকে প্রথম দেখা দরকার। সে যেন পাথরের তৈরি। কোমলতা ও বর্তুলতার আভাস যতই থাক, পাথরের কাঠিন্যের কথাও মনে করিয়ে দেয় তার শরীর। আর মনে হবে আগুনে পুড়ে গেলে বর্ণ কিছু মলিন হবে বটে, কিন্তু ওই কোমলতা তবুও থাকবে।

নয়নতারা সুন্দরী। সহসা এমন রূপ চোখে পড়ে না। বোধ হয় যে-বয়সে মেয়েরা সংসারের দাবিতে সাধারণ ক্ষয়িতরূপা, সেই বয়সে সে একান্ত নিজের হয়ে বেড়ে উঠবার সময় পেয়েছে।

নয়নতারার কথা ভাবতে গিয়ে আর-একটা কথা মনে আসে।

নয়নতারার পূর্বপুরুষ কনৌজ থেকে এসেছিলেন। তার ভ্রূ, নাসিকা, ওষ্ঠের গঠনে অবাঙালিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। দেহবর্ণ ফর্সা নয়, বরং যেন রক্তাভ। ধানের রং, গমের রং। কিন্তু 'তিলফুল জিনি নাসা', নয়ন খঞ্জনগতি এবং দশন মুকুতাপাঁতি। কবিরাজের পক্ষে চোখ দুটো আর-একটু স্থির হলে ভালো ছিল। নয়নতারা অতুল-মধ্যমা।

রাজচন্দ্র অন্যমনস্ক হয়ে তার বাগানে বেড়াচ্ছিল। এমন সময়ে সে দেখতে পেল নয়নতারাকে।

সে রাজকুমার। গ্রামের সাধারণ লোকের সঙ্গে তার যোগ খুব কম। আর যতটুকু-বা যোগ আছে তা শুধু পুরুষদের সঙ্গে। তবে নয়নতারার কথা আলাদা। মাঝখানে সাত-আট বছর তাকে দেখেনি রাজু, কিন্তু তার আগে বোধ হয় দেখেছিল, বোধ হয় কথাও বলেছিল। সেদিন রাজু পথ হারিয়ে ফেলে একা একা নয়নতারাদের পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সম্ভবত নয়নতারাই তাকে বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

নয়নতারা পথ থেকে দৃষ্টি তুলতে গিয়েই রাজচন্দ্রকে দেখতে পেল। পুতুল হাতে পেলে প্রথম কিছুক্ষণ তার দিকে যে-বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা স্বাভাবিক তেমনই বিস্ময়ের দৃষ্টিতে রাজচন্দ্র নয়নতারাকে দেখছে। তার দৃষ্টি যেমন নিষ্পাপ তেমনি নির্লজ্জ। নয়নতারা অনুভব করল, তার গ্রীবার কাছে, তার বক্ষের কাছে, তার চিবুকে রাজচন্দ্রর দৃষ্টি স্থির হয়ে পড়ছে—তখুনি সরে যাচ্ছে না, যেন অনুভব করছে।

নয়নতারা কথা বলতে বাধ্য হল—'রাজকুমার'?

'হ্যাঁ। তুমি কে'?

'নয়নতারা কবিরাজ। আপনি একদিন পথ হারিয়ে ফেলেছিলেন ...'

'সে কি তুমি? তুমিই কি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলে'?

'হ্যাঁ'।

নয়নতারার বলার কিছু ছিল না। সে চলতে লাগল।

দ্বিতীয়বার দেখা হল। সেটাও এমনি আকস্মিকভাবে। নিজের বাড়ির দরজায় নয়নতারা দাঁড়িয়ে ছিল।

তৃতীয়বার সাক্ষাৎ হল নয়নতারার বাড়িতে। নয়নতারা সকালের আরামদায়ক রোদে পিঠ দিয়ে চতুষ্পাঠীর দাওয়ায় বসে বই পড়ছিল। রাজচন্দ্র দাঁড়াল। রাজচন্দ্রর পরনে মুসলমানি পোশাক। তাকে দেখলে মনে হবে কোনো মীর রহিসই হবে। কাঁধের উপরে সেই রুপোর কাজ-করা বন্দুক।

নয়নতারা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'রাজকুমার যে! এদিক কোথায়'?

'এমনি, এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম'।

'ওটা কী, ওর নামই বুঝি বন্দুক'?

'হ্যাঁ'।

'বসবেন'?

'তা বসি একটু'।

নয়নতারা হাসল। এর আগে রাজচন্দ্র নয়নতারার হাসি হাসি মুখ দেখেছে বটে কিন্তু হাসি দেখেনি। নয়নতারা হেসে বলল, 'কতকগুলো প্রাণীর প্রাণ বাঁচল আজ। কিন্তু বারান্দায় নয়, ঘরের ভেতরে আসুন। রোদ লাগছে গায়ে'।

অন্দরের ঘরে মাদুরে বসে রাজচন্দ্র জিগ্যেস করল, 'তুমি একা থাকো নয়নতারা, একটুও ভয় করে না তোমার'?

'দেশে রাজা থাকতে ভয় কী'?

'তুমি কি আমার কথা বললে'?

'হ্যাঁ'।

রাজচন্দ্র হেসে বলল, 'তুমি আমাকে এর আগে চিনতে? তবে? ওটা তোমার মন-যোগানো কথা'।

নয়নতারা এ কথার উত্তর না-দিয়ে বলল, 'রাজকুমার, আপনি যে এমন প্রাণীহত্যা করেন, কষ্ট হয না আপনার'?

'না'।

'বন্দুকের শব্দ তো বজ্রের মতো, ওর আঘাতও বোধ হয়'।

সহসা রাজচন্দ্রর মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। সেটা এত দ্রুত ও এত স্পষ্ট হয়ে ঘটল যে নয়নতারাব চোখেও ধবা পড়ল। সে ভাবল, রাজকুমার হয়তো তার কথায় শাসনের সুর পেয়ে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

কথাটাকে অন্য খাতে নেবার জন্য সে বলল, 'তা হোক, রাজাদের শিকার করতেই হয়। শিকার করবেন বইকি'।

কিন্তু সেই মানুষটার মৃত্যুযন্ত্রণা মনে পড়ে গিয়েছিল রাজচন্দ্রব। তার মুখে যে-হাসিটা ফুটল সেটা বোকামির হাসি। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'আসি নয়নতাবা'।

'শিকারে যাবেন'?

'না, বাড়ি ফিরে যাব'।

বয়স্ক লোকরাও মাঝে মাঝে অকর্তব্য কাজ কবে বসে, একটি কিশোরও তাই করল।

পরদিন সকালেই রাজচন্দ্র আবার নয়নতারার বাড়িতে এল। নয়নতারা ঠিক তেমনি করে বসেই পুঁথি পড়ছে।

রাজচন্দ্র বলল, 'আচ্ছা নয়নতাবা, তুমি তো বলছিলে আমার ভরসায় তুমি গ্রামে থাকো, একদিন আমিই যদি গ্রামে না-থাকি'?

'সে কী'! নয়নতারা উঠে দাঁড়াল।

'গ্রামে কালেক্টর এসেছে, জানো'?

'কেন এসেছেন'?

রাজচন্দ্র অধীর হয়ে উঠল। ঘরের ভেতরে পায়চারি করে বেড়াতে লাগল।

নয়নতারা লঘু স্বরে, তখনও যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়নি সে বিষয়টিতে, বলল, 'কী হয়েছে রাজকুমার'?

'শোনো, নয়নতারা, শোনো ; তোমাকে একটা কথা বলব, তুমি কি গোপন রাখতে পারবে'?

'কী এমন গোপন কথা তোমার মনে তৈরি হয়েছে? গোপন কাকে বলে তা কি জানো'?

আবহাওয়াটা মানুষের কথায়, তাদের পারস্পরিক অবস্থান ও চোখের চাহনিতে সৃষ্টি হয় ; এ-আবহাওয়া এমন যে নয়নতারা রাজকুমারের দূরত্ব বোধটা বিস্মৃত হয়ে গেল। শুধু ভাষায় নয়, নিজেও দু-পা এগিয়ে এল রাজচন্দ্রর দিকে।

রাজকুমার বললে, 'আমি যা করেছি তা ভয়ঙ্কর'।

তারপর যে-বক্তব্যটা জিহ্বায় এসে পড়েছিল সেটাকে রোধ করার চেষ্টা করল। পরমুহূর্তে সব সংকোচবিমুক্ত হয়ে সে বলল, 'জানো নয়নতারা, আমি একটা মানুষকে খুন করে ফেলেছি'।

'কী যা-তা বলছ'।

এবার রাজকুমার তার কথা ওজন করে করে বলল, 'রাগের মাথায় কাজটা করে ফেলেছি'।

'কী সাংঘাতিক! তুমি এমন কাজ করতে পারো'?

'তোমাকে বলে ফেলেছি। কালেক্টর এই বিষয়েই খোঁজ করতে এসেছে'।

'এখন উপায়? আমাকে বললে কেন'?

'কেন, তুমি কি এটা গোপন রাখতে পারবে না'?

'যদি না-পারি, যদি না-পারি'!

কথাটা বলার আগের মুহূর্তে রাজচন্দ্রকে বিচলিত দেখাচ্ছিল, নয়নতারা বরং যেন একটু কৌতুক অনুভব করছিল। কথাটা বলার পব রাজচন্দ্র যেন নিশ্চিন্ত হল, তার দৃষ্টি স্নিগ্ধ হল। তার মুখের বর্ণটাও স্বাভাবিক হল। কিন্তু নয়নতারার মুখ বিবর্ণ হল, তার দৃষ্টিতে উত্তেজনা এল, একটু বিচলিত হল সে।

নয়নতারা এগিয়ে গিয়ে রাজচন্দ্রর মুখোমুখি দাঁড়াল, 'তুমি কি এ-কথা সকলকে এমন করে বলেছ'?

'না। হরদয়াল জানে, আর মা। রূপচাঁদ সঙ্গে ছিল, সেও জানে'।

'আর-কাউকে তুমি বোলো না'।

'বেশ, তাই হবে'।

নয়নতারা রাজকুমারের হাত ধরে শয্যার উপরে এসে বসল। 'কালেক্টর কি তোমাকে সন্দেহ করেছে'?

'জানি না'।

নয়নতারা খানিকটা সময় চুপ করে ভাবল।

রাজচন্দ্র বলল, 'নয়নতারা, আমার আর ভালো লাগে না চিন্তা করতে। কী করে এটা ভোলা যায় বলতে পারো'?

নয়নতারার ছোট ভাই ছিল না। সে অবিবাহিতা। যে-কয়েকটি পুরুষকে সে চিনবার সুযোগ পেয়েছিল তাদের সংখ্যাও নগণ্য। তারাও নয়নতারাকেই আশ্রয় দিয়েছে, তার দুর্ভাবনা দূর করেছে। কিন্তু তারই কাছে এসে আর-একটি লোক এমন করে পরামর্শ চাইবে এটা ভাবতে পারেনি নয়নতারা।

বাজকুমার! রূপকথার ব্যাপার যেন। সুকুমার ও বলিষ্ঠ একটি পুরুষকে পাশে নিয়ে বসে নয়নতারা অবাক হয়ে রাজকুমারের দিকে চেয়ে রইল। কতই-বা বয়স হবে। ইতিমধ্যে নয়নতারার নিজের তুলনায় কত বলিষ্ঠ কত দীর্ঘ দেখায় তাকে। তবু মুখের দিকে চেয়ে দেখো, কত কিশোর।

হঠাৎ নয়নতারা বলল, 'রাজকুমার, চলো আমরা অন্য কোথাও চলে যাই'।

'কোথায় যাব'?

'যেখানে কেউ চিনতে পারবে না'।

রাজকুমার প্রকৃতপক্ষে কিশোর। তার পক্ষে অন্য কোথাও যাবার কল্পনা করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু নয়নতারা কবিরাজের বয়স পঁচিশ হল। তার পক্ষে হঠাৎ এমন করে এ-প্রস্তাবটা করা যেন বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়। কিন্তু অতীতের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হবে নয়নতারার এবং সেই কালের অন্তঃকরণের উপাদানটা দেখতে পাওয়া গেল।

ঘটনাটা নিয়ে রাজচন্দ্র এরপর খানিকটা সময় আলোচনা করল। 'আর বোলো না' বলে নয়নতারা বাধা দিতে গিয়েছিল কিন্তু রাজচন্দ্র কোনো অনুরোধ শোনেনি। বহুদিন ধরে কথাগুলো মনের মধ্যে আবিল হয়েছিল, আজ সামান্যমাত্র পথ করতে পেরে স্রোতের মতো বেরিয়ে এল, যেন তার মন নতুন হয়ে উঠবে স্রোতস্নান হতে পারলে। রৌদ্রোজ্জ্বল পদ্মার উপমা।

রাজকুমার চলে গেল। যাবার আগে সে জিজ্ঞেস করল না নয়নতারা কথাগুলো গোপন রাখতে পারবে কিনা। সেদিকে যেন তার আর এতটুকু আগ্রহ নেই।

নয়নতাবাই বললে, 'আর কাউকে বোলো না, রাজকুমার'।

রাজচন্দ্র চলে যাবার পর নয়নতারা দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল। সকলেই জানে, ইংরেজ দেশের রাজা, আর ইংরেজ কুঠিয়ালের একজনকে হত্যা করেছে রাজচন্দ্র, তার পরিণাম কী ভয়ঙ্কর কে জানে। আর এমন ব্যাপারটা কিনা তাকেই বলে গেল সে।

প্রাত্যহিক কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে নয়নতারা ভাবল : কতটুকু পরিচয়, কিছুই নয় নির্ভর করার মতো, তবু এতখানি বিশ্বাস করার কী যুক্তি! আসলে অত্যন্ত ছেলেমানুষ। কী ভাগ্য, গ্রামের আর-দশজনকে বলে বেড়ায়নি!

কিন্তু যেন আহত সে, তেমনি অবসন্ন তেমনি ভাগ্যনির্ভর।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নয়নতারা ভাবল : এতখানি বিশ্বাস অর্জন করার মতো কী-বা কবেছে সে। এটা খুব সম্ভব, হয়তো-বা ব্যাপারটা বলবার জন্য ছটফট করছিল রাজকুমাব, কিন্তু নিজে কি সে প্রীতি অর্জন করেছে? প্রীতি ছাড়া, মনের মানুষ ছাড়া এমন মনের কথা কেউ কাউকে বলে?

মনের মানুষ! কথাটা উল্টেপাল্টে দেখতে গিয়ে নয়নতারা থেমে দাঁড়াল। শুধু তার মন নয়, তার কর্মরত হাত দুখানিও। প্রীতি আকর্ষণ করেছে কি তার রূপ? নয়নতারা তার নিজের রূপ সম্বন্ধে সচেতন।

নিজেকে শাসন করল নয়নতারা। শাসনের পাত্র তার সমগ্র মন।—ছি ছি, কিশোর।

কিন্তু রাজকুমারদের যে-কল্পনা তার মনে ছিল সেটাও কিশোব।

তিন-চারদিন পরে অপরাহ্ণের দিকে দিবানিদ্রা শেষ করে উঠে বসেছে নয়নতারা, এমন সময়ে রাজকুমার এল। সদরের দিকে চোখ পড়তেই নয়নতারা দেখল শাদা ধবধবে ঘোড়ায় সওয়ার রাজকুমার। ঘোড়াটা কোথায় বাঁধা যায় তার খোঁজ করছে রাজচন্দ্র। ঘোড়াটা মাথা নাড়ছে, তার গলার ছোট ছোট ঘণ্টাগুলো টিনটিন করে বাজছে।

বারান্দায় উঠে রাজচন্দ্র বলল, 'আজ কালেক্টর চলে গেল'।

'তাহলে'? বুকের বোঝা নেমে গেল নয়নতারার। খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠে সে বলল, 'আপনি মিথ্যে ভয় পেয়েছিলেন, রাজকুমার'।

'না নয়নতারা, মিথ্যে নয়'। গাঢ়স্বরে বলল রাজচন্দ্র, 'ভালো হল না যেন কাজটা। কিছুতেই ভালো লাগছে না। খুশি হতে পারছি না যেন। বাড়ির খিড়কিতে দাঁড়িয়ে দেখলাম ধুলোর কুণ্ডলীর মধ্যে কালেক্টরের গোরুর গাড়ির বহর সদরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মনে হল যেন চুরি করে লুকিয়ে ছিলাম'।

উত্তর খুঁজে না-পেয়ে নয়নতারা চুপ করে রইল।

'আচ্ছা নয়ন, তুমি কি আমাকে খুব নীচ মনে করবে'?

'না'।

'কেন তা করবে না, তাই বলো'।

'রাজকুমারদের অনেকসময়ে শত্রুবধ করতে হয়'।

কথাটা বলতে একটু সময় লেগেছিল নয়নতারার। রাজচন্দ্র কথাটা অনুভব করল কয়েক মুহূর্ত ধরে।

'তুমি সত্যি তাই বিশ্বাস করো'?

রাজচন্দ্র কী করে বুঝবে হঠাৎ কেন তার কিশোর-কপালের ওই চিন্তার দাগ মুছিয়ে দিতে ইচ্ছা হল নয়নতারার, সে নিজেও জানে না।

নয়নতারা বলল, 'করি। এ-রকম এর আগেও হয়েছে'।

রাজচন্দ্র খানিকটা সময় চিন্তা করল। তারপর বলল, 'সে-লোকটা আমার শত্রু ছিল কিনা জানি না। বিদেশি কুঠিয়ালের দম্ভ নিয়ে যথেষ্ট অপমান সে আমাকে করেছিল। এ-ব্যাপারে অনেক ক্ষতির মধ্যে একটা লাভ হল তুমি আমাকে নীচ মনে করোনি। তোমার কাছে অন্তত নিজেকে লুকিয়ে বেড়াতে হবে না'।

নয়নতারা বলল, 'রাজকুমাররাও যদি অপমান থেকে আত্মরক্ষা করতে না-পারেন, প্রজারা কার ভরসায় এই অপমানের দেশে থাকে'।

রাজচন্দ্র নয়নতারাকে দেখতে লাগল ; অনুভব করতে লাগল। সে-উপস্থিতি যেন উষ্ণ, সুন্দর, যেন তার সৌরভও আছে।

বাজচন্দ্র বলল, 'কী যে কবতে ইচ্ছে করছে জানি না। চলো না নযনতারা, একটু ঘুরে আসি'।

'মেয়েছেলের কি পথে বেরতে হয়'?

'পথে কেন, ঘোড়ায়। তুমি যদি বলো এখুনি আর-একটা ঘোড়া আনিয়ে নিই কিংবা চতুর্দোলা'।

নযনতারা হাসল।

বাজচন্দ্র বলল, 'নয়ন, তোমার কাছে আসতে আমার ভারি ভালো লাগে। এখন থেকে আমি রোজ আসব। কখন আসব তা বলতে পারি না। তুমি যেন বাড়ি থেকে কোথাও চলে যেয়ো না'।

৫

হরদয়াল তার বন্ধুকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছিল। তার উত্তরে সেই বন্ধু একটি ছোট চিঠিতে তার মতামত জানিয়েছিল। তাতে হরদয়াল দীর্ঘতর পত্র দিয়েছিল, উত্তরে বন্ধুও দীর্ঘতম পত্র দিয়েছে।

হরদয়াল তার প্রথম পত্রে প্রশ্ন তুলেছিল—মৃত্যুদণ্ড ও নরহত্যার পার্থক্য কোথায়। রাজচন্দ্র, চন্দ্রসেন প্রভৃতিব নাম উহ্য বেখে সে মোটামুটি ঘটনাটা বর্ণনা করেছিল, তারপরে প্রশ্ন করেছিল দ্বিতীয় পর্যায়ে: এ-ঘটনায় একে নরহত্যা বলা চলে কিনা এবং যদি তাই হয় তবে এক্ষেত্রে হত্যাকারীকে সাহায্য করা চলে কিনা।

বন্ধু লিখেছিল : হরদয়াল নিজের বিবেকের কাছে কথায় জিতলেও ঘটনার বিচারে হেবে গেছে এবং সেজন্যই আরো-কিছু কথার প্যাঁচ পাবার জন্য বন্ধুকে চিঠি লিখেছে।

দ্বিতীয় পত্রে হরদযাল বিবেক ও চাকরির মধ্যে একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা কবেছিল। চাকরি অর্থে এক্ষেত্রে শুধু অর্থের মোহ নয়, অন্নদাতার—এবং অন্নদাতা অকৃপণ—উপকারের প্রত্যুপকার করা। বিবেক বড়, না প্রত্যুপকার ও কৃতজ্ঞতা বড় হবে, এই প্রশ্ন তুলেছিল সে। নামগুলো এবারেও গোপন করে সে প্রশ্ন কবেছিল, বিবেককে চোখ ঠারা এবং সত্য গোপন করা এক্ষেত্রে অন্যায় হয় কিনা।

এবং এ-বিষয়কে উপলক্ষ কবে জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি জিজ্ঞাসাবোধক কথা লিখেছিল সে। তার সূত্রে জীবনের উপকরণ সম্বন্ধে দু'এক কথার মধ্যে হরদয়াল বন্ধুর কাছে কিছু বই, পত্রিকা চেয়ে পাঠিয়েছিল।

বন্ধু বই পাঠাতে পারেনি, একখানা পত্রিকা পাঠিয়েছে। দীর্ঘপত্রে সে প্রমাণ করেছে, হরদয়াল সত্য থেকে, জীবন থেকে, অবশেষে বিবেক থেকে পালানোর চেষ্টায় আছে। হয়তো-বা একদিন প্রাণীজগতের আদি দর্শনের 'যে কোনো উপায়ে বাঁচো'—এই বাক্যটিকেই চরম বলে মেনে নেবে।

হরদয়াল চিঠি পড়া শেষ করেছে, তার সম্মুখে বন্ধু-প্রেরিত ইংরেজি পত্রিকা। পত্রিকাখানির নাম 'হিন্দু পেট্রিয়ট'। এ সংখ্যাটিতে বিশেষ কোনো খবর আছে তা নয়, হরদয়াল পত্রিকার জোরদার ভাষা লক্ষ্য করছিল। হরিশ মুখুজ্জে নাম লোকটির, কিন্তু হ্যারিশ মেকলে বললে দোষ হয় না। ভাষার যেমন গতিবেগ তেমনি শক্তি। যেন বক্তৃতা দিচ্ছে রাজসভায়।

সে স্থির করল, বন্ধুকে ধন্যবাদ দেবে পত্রিকার জন্য এবং অনুরোধ করবে যাতে নিয়মিতভাবে এই পত্রিকাখানি ডাক মারফত আসে। হ্যাঁ, ডাকঘর। বন্ধু বিস্মিত হবে হয়তো, গ্রামে একটা ডাকঘর বসানো হয়েছে, এ খবর তাকে বলা হয়নি।

আরামকেদারায় শুয়ে পত্রিকা পড়ছে হরদয়াল। সন্ধ্যার আর দেরি নেই। পত্রিকাব অক্ষরগুলো অস্পষ্ট হতে সেটাকে ভাঁজ করে কোলের উপর রাখল। পাশের ছোট টেবিলটায় ছোট কাচের গ্লাস ও একটি পেটমোটা বোতল। সামান্য কিছু মদ ঢেলে নিয়ে, আর-একটা বড় গ্লাস থেকে খানিকটা জল, কিছু লেবুর রস, কিছু চিনি মিশিয়ে পরে গ্লাসটা রেখে দিল পাঞ্চটাকে থিতোবার জন্য। তারপর কোলের উপরে হাত দুখানা ভাঁজ করে রেখে সে ভাবতে লাগল।

একটু পরে পাঞ্চটুকু খেল হরদয়াল। ভৃত্য আলো দিতে দেরি করছে। তা করুক। চল্লিশ বছর হল এবার হরদয়ালের। মাথার চুলে বোধ হয় পাক একটু দেরিতে ধরবে। কানের পাশে কিছু দেখা দিচ্ছে। জীবনের স্তর পার হবার লক্ষণ সেগুলো। কিছুদিন আগেও সন্ধ্যায় আলো দিতে দেরি হলে অস্বস্তি বোধ হতো, এখন যেন মাঝে মাঝে অন্ধকারে অবগাহন করতে ইচ্ছা হয়।

অতীতের দিকে চোখ ফেরালে গোটাকয়েক ঘটনা মনে পড়ে। দশ বছর আগে থেকে শুরু কবে আজ পর্যন্ত কয়েকটিমাত্র ঘটনা ঘটেছে হবদয়ালেব জীবনে।

হরদয়াল রাজবাড়ির একজন কর্মচারী। তার ইংরেজি জ্ঞান ও সাধুতাব পুরস্কার পেল যখন সে প্রথম শ্রেণীর আমলা থেকে প্রধান কর্মচাবী হল। নাম হল দেওয়ান। তার পরের ঘটনা হচ্ছে—বাজবাড়ির চত্বরের বাইরে দেওয়ানখানায় তার নিজের জন্য বাসগৃহ ও লাইব্রেরি স্থাপন।

ঘটনা বলতে এই কয়েকটি। আর যা, সেগুলো মানসিক ইতিহাস। কাজগুলোর ঘটনাগুলোর পরিবেশ ও কারণ। সেই পরিবেশ ও কারণ বিশ্লেষণ করছে এখন হরদয়াল।

যদি আকাঙ্ক্ষার কথা ওঠে তাহলে বলা যায়, ভালো লেগে গেল বাজবাড়িটা তার। এই বিশ্রামের অবকাশ, এই শান্ত পরিবেশ তার আকাঙ্ক্ষিত ছিল। কিন্তু এরই কি নিশ্চয়তা ছিল? ছিল না, কিন্তু সুযোগ ছিল। বাকিটুকু তার আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি।

ভৃত্য আলো দিয়ে গেল। আলোর প্রথম জ্যোতিটা চোখে লাগতে হাতের চেটোয় চোখ আড়াল করে সইয়ে নিল হরদয়াল। এই ভৃত্যটি তার নিজের হাতে মানুষ। আগে মফস্বলে যখন মাঝে মাঝে খাজনা আদায় করার কাজে যেতে হতো তখন এ-ই ছিল একমাত্র অবলম্বন। হরদয়ালের কখন কী প্রয়োজন এ যেমন সে জানে আর-কারো তেমন জানা নেই।

ভৃত্যটি বলল, 'বাবুর্চি জিগ্যেস করছিল কী রান্না হবে আজ'। সাধারণত এসব প্রশ্নের উত্তরে লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে দেয় হরদয়াল। গৃহিণীহীন গৃহ। বাবুর্চি-চাকরের সংসার। নিজের অভিরুচি না-জানিয়ে দিলে তারাই-বা কী করতে পারে।

'শাদা মাংস যা হয় রাঁধতে বলো। একটু দেরি করে'।

'তিতির আছে'।

'তাতেই হবে'।

ভৃত্য চলে গেল।

হরদয়াল বন্ধুকে কথা বলার মতো মুখভঙ্গি করে ভাবল : এটা আমার ক্যাম্পলাইফ। শহর থেকে বাইরে তাঁবুতে জিপসিদের মতো জীবন কাটানো। যদি বলো কেন, তার উত্তর এই যে, ভালো লাগে। এ-জীবনে এইটাই মহত্তম বোধ হচ্ছে।

হরদয়াল উঠে একটু পায়চারি করল, তারপর পাশের টেবিলটায় গিয়ে বসল। তার উপরেই ছিল আলোটা। একখানা লম্বা-চওড়া খাতা খুলল। চামড়ায় বাঁধানো খাতা, কোণগুলো চাঁদির পাতে মোড়া। দোয়াতদানটা টেনে নিল। সেটিও চাঁদির। গায়ে তার উঁচু করে পল-তোলা, যেখানে পল-তোলা নয় সেখানে একগুচ্ছ ফুল খোদাই করা। কলমটা হাতির দাঁতের, লিখবার সময় যেখানে আঙুলগুলি থাকবে সে-জায়গাটুকু সোনার মোড়া বলেই মনে হয়।

খাতাটা খুলে তারিখ লিখল। তারপর লিখল তখনকার দিনের পক্ষে চলতি বাংলায়—বন্ধুর চিঠি পাবার পর এই কথাগুলো আজ লিখছে :

> জীবনটা আমার একটা ক্যাম্প। পথের ধারে বাসা বেঁধেছি। এই জীবনই আমার ভালো লাগছে। জীবনকে অনুভব করার পক্ষে এ-পদ্ধতিটাই ভালো। তোমরা স্রোতের ভেতরে আছ, কখনও বাধা দেয়ার চেষ্টা করছ, কখনও বাধা দিতে গিয়ে পর্যুদস্ত হচ্ছ, মোট কথা স্রোতের সঙ্গে গতি তোমাদের। এখানে জীবনের নদীর বাঁক। জল স্থির ধীর। অবগাহন করা যায়, তীরে উঠে এসে অথৈ নিবিড় জলরাশিকে অনুভব করাও যায়। জীবনকে এমন স্থির হয়ে দেখার কি মূল্য নেই? বাঁচার জন্যই একদিন এই শুধু-দেখবার অভিজ্ঞতা কারো কাজে লাগে না?

হরদয়াল হাসল। বন্ধু তাকে একটা কড়া গালি দিয়েছে। একসময়ে ছিল যখন কলেজের ছাত্র বলতেই সত্যবাদী বোঝাত। প্রবাদ আছে, তখনকার কলকাতায় বলা হতো এই ইংরেজনবিশ ছাত্রগুলি মিথ্যা কাকে বলে তা জানে না। এটা খুব উচ্চ প্রশংসার কথা। এতে একটা জিনিস প্রমাণ করে . তারা একান্ত অভী ছিল। সংকোচ, কুণ্ঠা, লোকলজ্জাও তাদের ছিল না। তুমি মদ খাও? খাই। তুমি অসৎ স্ত্রীলোকের বাড়ি যাওয়া-আসা করো? করি। তুমি রামের টাকা নিয়ে ফেরত দাওনি? কথাটা সত্য। তুমি নাকি ভগবান মানো না? না। এসব উত্তর দিতে যাদের সাহস আছে তারা মিথ্যে বলবে কেন? ধরো, তাদের কেউ একটা খুন করেছে, জিজ্ঞাসা করো—খুনের জন্য তুমি দায়ী? অভ্যাসবশে বলে বসবে, হ্যাঁ। বন্ধু তাকে বলেছে, তুমি সত্যবাদী নও।

হরদয়াল চিঠির উত্তর এখনও দেয়নি। সে সত্যবাদীর মতো স্বীকার করল নিজের কাছে—সে সত্যবাদী নয়। সে রাজকুমারকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলেছে এবং মিথ্যা ব্যবহার করেছে।

চিন্তা এবং ডায়েরি লেখা বন্ধ করতে হল। একটা মৃদু সৌরভে তার ঘরটা পূর্ণ হয়ে উঠল। চোখ তুলে সে দেখল, রানী এসেছেন। সন্ত্রস্ত হয়ে সে চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিল, রানী বললেন, 'বোসো দেওয়ানজি'।

'ডেকে পাঠালেই পারতেন। কষ্ট করে এলেন'।

'সে কিছু নয়। একটা পরামর্শ আছে তোমার সঙ্গে'।

'আজ্ঞা করুন'।

'একটা উৎসব করতে ইচ্ছে হয়েছে, এখন করা কি সমীচীন হবে'?

'অসমীচীন হবে কেন'?

'কেউ যদি মনে করে বিপদমুক্তির জন্যই এই আনন্দ'।

হরদয়াল মৃদু হাসল।

'কই, বললে না'?

হরদয়াল বললে, 'স্বৈঃ দোষৈঃ শঙ্কিতাঃ হি মনুষ্যাঃ ...'।

'তা বটে। তুমি নিষেধ করছ'?

'না। ব্যবস্থা করছি। কী কী হবে'?

'কালীপুজো, জনসাধারণের নিমন্ত্রণ। কবিয়ালদেরও খবর দিতে হবে'।

'আচ্ছা, পুরোহিতকে ডেকে পাঠাচ্ছি'।

রানী উঠে দাঁড়ালেন। হরদয়ালের ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিযে নিলেন। দামি আসবাব ও গৃহসজ্জাগুলি রানী অনুমোদন করলেন। কিন্তু একটা ব্যাপাবে হরদয়ালকে অত্যন্ত অপবিচ্ছন্ন বোধ হল। বিছানায়, বসবার চেয়ারে, এমনকী ঘরের মেঝেতেও বইপুঁথি ছড়ানো।

রানী বললেন, 'হরদয়াল, তোমার কিছু আলমারিব দবকার মনে হচ্ছে'।

'না, তার এমন কী প্রয়োজন'।

'বইপুঁথি ঘরময় ছড়ানো দেখছি'।

'চাকরকে বলব তুলে রাখতে'।

'আজকাল আর তোমার বই তেমন আসে না, না'?

'আসছে, আগের চাইতে কিছু কম'।

'যা দরকার হয় আনিয়ে নিয়ো'।

রানী চলে গেলেন।

ইতস্তত চাইতে চাইতে দেয়ালের গায়ে বড় ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ল হরদয়ালের। আলো পড়ে ঘড়ির ডায়ালটাকে একটা লাল আলো বলে বোধ হচ্ছে। একটা মথ-জাতীয় প্রজাপতি সে-আলোর গায়ে বসবার জন্য উড়ছে, ডানার ঝাপটা লাগছে কাচের গায়ে। রাত্রি ন'টা হল।

হরদয়াল ঘরের মেঝেতে একটু পায়চারি কবে জানলার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জানলার নিচে কী কী ফুলের গাছ আছে এখন তা বুঝবার উপায় নেই ; এ শীতে ফুল যদি-বা ফোটে, ঘ্রাণ থাকে না। হরদয়াল এখন ঠাহর করল, বানীর ব্যবহৃত সুগন্ধিটি বর্ষার একটি দুষ্প্রাপ্য ফুলের।

ফিরে এসে ডায়েরির সদ্য-লেখা পৃষ্ঠাটির দিকে একটু সময় দৃষ্টি দিল হরদয়াল, তারপর অন্যমনস্কেব মতো পাতা উল্টোতে লাগল। প্রায় এক সপ্তাহ আগেকার একটা তারিখের নিচে তার মন স্থির হল। লেখাটার সারমর্ম এই রকম :

> ছাত্রাবস্থায় পরীক্ষা দিতে বসে অনেকেবই একটা বিষয় অনুভব হয়, হল্-এ বসে আপাত-বিস্মৃত বিষয়গুলিও মনে পড়ে যায। সেটাই মনের প্রকৃত শক্তির পরিচয়। তেমনি দুর্ঘটনাব সময়ে, যুদ্ধেব সময়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষ যেমন জড়ীভূত হয, অন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চরিত্র ও স্বরূপের প্রকাশ পায়। রানী বুদ্ধিমতী, রানী রূপসী, বানীর দেহ ও মনে অন্য অনেক গুণ আছে, কিন্তু রাজ্য চালানোর পক্ষে সেটুকুই সব নয়। শিশুপুত্রকে কোলে করে নিঃসহায় একটি মহিলা অজস্র সম্পদ আগলে রাখতে পারে না। আত্মীয়রা, কর্মচারীরা সুযোগ পেলেই ছোবল দেবে। কিন্তু রানীকে সবাই ভয় করে। কী সে ভয়, কোথায় সে দৃঢ়তা এতদিন হরদযাল জানতে পাবেনি, দীর্ঘ দশ বৎসরের একটি দিনের জন্য রানীকে কঠিন এবং দুঃসাহসী বলে মনে হযনি। কিন্তু সেই রাত্রিব সেই নিঃশঙ্ক নিঃসঙ্গ অভিযান একটি লৌহ কঠিন দার্ঢ্য ও অকুতোভযতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।
>
> রানী শ্রদ্ধেয়া।

চাপে না-পড়লে চরিত্রের প্রকৃত ~ প চোখে পড়ে না। হরদয়াল নিজের চরিত্রের সমালোচনা করল— সে নিজেও কখনও কল্পনা করতে পারেনি, প্রয়োজনের সময়ে সে-ও নিখুঁত একটি অভিনয় করতে পারে। বন্ধুর তিরস্কারটা টাটকা এবং তীব্র না-হলে সে হয়তো নিজের পিঠ নিজেই চাপড়ে দিতে পারত অভিনয়ের

সার্থকতার জন্য।

এইটুকুই তার নিজস্ব ব্যাপার, আর সব কর্তব্য। দেওয়ানের কর্তব্য প্রভুকে রক্ষা করা। তাই করেছে সে।

কর্তব্যের তাড়নায় পরদিন সকালে পুরোহিতকে ডেকে পাঠাল হরদয়াল। পুরোহিত এলেন। সাধারণত পূজা-অর্চনার ব্যাপারে সাধারণ কর্মচারীরাই খবরদারি করে। দেওয়ান স্বয়ং তদারক করছেন, তদবির করছেন—প্রাচীন হয়েও পুরোহিত একটু বিস্মিত হলেন। ব্যাপারটা সাধারণ নয়, সন্দেহ কী।

প্রাথমিক আলাপ-আলোচনার পর পুরোহিত প্রস্তাব করলেন, 'তাহলে তান্ত্রিক একজনকে আনলে কেমন হয়'?

'আমার ধারণা ছিল আপনি নিজেই তান্ত্রিক'।

'আমি সিদ্ধ নই'।

'তা হোক, জ্বালে বোধ হয় একটু কম হয়েছিল ...'

'দেওয়ানসাহেব, জ্বালের কম-বেশিতেই ওটা হয় না। পদার্থটি সিদ্ধ হবার মতো হওয়া চাই। আপনাদের সেবায় লেগে থেকে অনেক পেলাম, কিন্তু হারালাম ওই পদার্থটিকে'।

হরদয়াল পুরোহিতের খোঁচাটি উপভোগ করল।

'তা বেশ। আপনি তাহলে আপনার মনের মতো লোক আনিয়ে নিন, কিন্তু পুজোটা সামনের অমাবস্যায় হওয়াই চাই'।

'তাই হবে'।

'টাকার জন্য ভাবনা নেই। রানীমা নিজে মুখ ফুটে বলেছেন'।

পুরোহিতের পর দেওয়ানের কামরায় ঢুকল সদর-নায়েব।

'এদিকে কবিয়ালরা কোথায় থাকে জানেন, নায়েবমশাই'? হরদয়াল প্রশ্ন করল।

'তা আপনাদের শোনবার মতো ভালো গান এদিকে হয় না, স্যার'।

'আপনাদের শোনার মতো'? হরদয়াল নায়েবের বিনয়কে ব্যঙ্গ করল।

'তা হয়'।

'তার চাইতে ভালো কোথায় পাওয়া যায়'?

'দক্ষিণে। শুনেছি কলকাতায় নাকি'...

'নায়েবমশাই, কলকাতা-প্রীতি আপনার অসাধারণ'।

'তা নয় স্যার, ওদিকে সত্যি ভালো কবিয়াল আছে'।

'আসতে ছ'মাস লাগবে'।

'জেলার সদরে নাকি বিদ্যাসুন্দরের পালা বেঁধে আজকাল গান হচ্ছে'।

'সেটা কী রকম? আচ্ছা, তা-ই না-হয় আনবার ব্যবস্থা করুন'।

নায়েব চলে যাচ্ছিল, হরদয়াল ডাকল।

'হ্যাঁ মশায়, কাল খাতা চেক করতে গিয়ে একটা রহস্য দেখলাম। ইসবশাহি পরগনার হিসেব কি আপনি দেখেন'?

নায়েবের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একটু থেমে ভদ্রলোক বলল, 'আপনার বাহাত্তর নম্বর হুকুমে ওটা আমাকেই দেখতে হয় বটে'।

'আমি তিন সপ্তাহের আমদানি দেখলাম। গত বছরের তুলনায় ভালো দেখাচ্ছে না। বাজে আদায় কমেছে বটে, কিন্তু বাকি খাজনা উসুল বাড়েনি'।

নায়েব আমতা-আমতা করে বললে, 'মাসটা শেষ হলে হিসেব করব ভেবেছিলাম। আচ্ছা আমি নজর

রাখছি'।

'আচ্ছা যান'।

নায়েব পালিয়ে বাঁচল। মুহূর্তকালের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেল আজ বিপদের সূচনা দেখা দিয়েছে। সাবধানে কাজ করো, উঁচু-গলায় কথা বোলো না। বড় বড়রা ছাড়া আর কেউ আছে এ যেন মনে না-পড়ে যায়।

কিন্তু আধঘণ্টাও পার হল না। পাশাপাশি দু-তিনখানা ঘরে অনেকগুলো কান সতর্ক হয়ে উঠল। ডাকছেন—কাকে ডাকছেন যেন।

সদর-নায়েব সবেমাত্র ডাবা-হুকোয় মন দিয়েছিল, তাড়াতাড়ি হুঁকোটা নামিয়ে রেখে কোঁচা সামলাতে সামলাতে খাসকামরার দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। হ্যাঁ, ডাকছেন বটে, তাকেই ডাকছেন।

পর্দা ঠেলে প্রবেশ করে নায়েব দেখল, দেওয়ান মৃদু মৃদু হাসছে। 'মরেলগঞ্জের কুঠিয়ালকে নিমন্ত্রণ করছেন নাকি'?

'তা করা উচিত'।

'তাই করুন। বাজারের বন্দরের মহাজনদেরও করবেন বোধ হয়'?

'সাধারণত তা করা হয়ে থাকে'।

কী একটা ভাবল দেওয়ান, একটু পরে সে বলল, 'কবিয়াল বা যাত্রা যা-হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করবেনই, তার উপরে নাচওয়ালির ব্যবস্থা করুন। ভালো নাচওয়ালি চাই'।

'এদিকে কোথায় পাওয়া যাবে'? নায়েব বিপদ গুনল।

'যাবে। সদরে খোঁজখবর নিন। আপনারই সদরে যাওয়ার দরকার। কালেক্টর ও ডেপুটি কালেক্টরকে নিমন্ত্রণ করবেন, এবং মরেলগঞ্জের কুঠিয়ালকেও'।

'যে আজ্ঞে'।

'আপনাকে একবার সদরে যেতেই হচ্ছে। সদরের নিমন্ত্রণগুলো এবং সব ব্যবস্থা আপনার দায়িত্বে রইল : মোদ্দা কথা, নাচওয়ালি যেন সাহেবদের মনোরঞ্জন করতে পারে'।

নায়েব চলে গেলে দেওয়ান তার খাসভৃত্যকে ডেকে পালকি আনতে বলল।

চারজন বেহারা ছোট পালকিখানা বারান্দায় ঘরের দরজায় নামাল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেওয়ান বলল, 'তাহলে আপনাদের সই করাবার কাগজ আজ নেই তো'?

সদর-নায়েব আবার এল, তার পিছনে খাতা-হাতে সারিবদ্ধ পাঁচ-ছজন আমলা।

তাদের হাত থেকে সই করার কাগজ নিয়ে নায়েব দেওয়ানের সম্মুখে উপস্থিত করল। দেওয়ানের খাসভৃত্য দোয়াত-কলম নিয়ে এসেছিল। পালকির ছাতে রেখে দেওয়ান কাগজগুলো খসখস করে সই করে দিল।

আমলারা চলে গেল, নায়েব দাঁড়িয়ে রইল। দেওয়ান পালকিতে উঠল, পালকি বেহারাদের কাঁধে উঠল। নায়েব হাত জোড় করে নমস্কার করল। দেওয়ান-কুঠির দিকে রওনা হল পালকি। কাছারিঘর থেকে দেওয়ান-কুঠি তিনশো গজ।

কথাটা উঠেছিল বছর তিন-চার আগে হরদয়ালের দেওয়ানগিরির দ্বিতীয় বৎসরের গোড়ার দিকে। সূত্রটা মনে নেই হরদয়ালের।

কালেক্টর কত বেতন পায়? রানী জিগ্যেস করেছিলেন।

—হাজার টাকা হবে।

—আমার দেওয়ানের বেতন হাজার এক টাকা ধার্য হল।

রানীর হাসিটা দেওয়ানের মনে আছে।

হরদয়াল বিমূঢ় হয়ে চেয়েছিল রানীর মুখের দিকে।

কিন্তু রানীর কথা তখনও শেষ হয়নি। রানী বললেন—প্রতি আমলার বেতন পাঁচ টাকা করে বাড়বে, পেয়াদাদের এক টাকা করে।

হরদয়ালের মনে আছে, খবরটা রাষ্ট্র হওয়ার পর কী আনন্দ, কী উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছিল কাছারিতে।

কয়েকদিন পরে সদর-নায়েব বলেছিল—মাসিক খরচ প্রায় চার হাজার বেড়ে গেল স্যার।

—মাসিক আয় চার হাজার বাড়ানো যায়?

—আজ্ঞে।

—ভেবে দেখুন।

দেওয়ান নিজের ঘরে ঢুকে ভাবল, আয় বেড়েছিল বইকি। শুধু বিলের জলকর থেকেই টাকাটা উঠে এসেছিল। এখনও উঠছে। আয় এখনও বাড়ছে। কিন্তু নিজের হাজার টাকা নিয়ে কী করবে হরদয়াল ভেবে পায় না। বছরে আট-দশ হাজার জমে যাচ্ছে।

দেওয়ান আরামকেদারায় বসলে খাসভৃত্য এসে পাশে একটা ছোট টেবিল রেখে গেল। ঝকঝকে পেতলের বারকোশে সাজিয়ে অতঃপর ব্রেকফাস্ট এল দেওয়ানসাহেবের। একটু দেরিতেই হয় সেটা। বাবুর্চি খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রইল আদেশের অপেক্ষায়। অগ্নিমান্দ্যের কোনো চিহ্ন নেই দেওয়ানের। চামচের মাথায় হরদয়াল ডিমগুলো ভাঙতে লাগল, হাল্কা ধোঁয়া উঠতে লাগল ডিমগুলো থেকে। ডিমের পর ফলের দিকে যখন দেওয়ান চামচ বাড়াল, বাবুর্চি তখন খুশিমুখে বিদায় নিল।

খাসভৃত্য বললে, 'হুজুরের আজ রাজবাড়িতে নেমন্তন্ন'।

'সে কি রে, আবার আজই'?

'দেওয়ান-কুঠির সকলেরই। সকালে আপনি কাছারিতে বসলে রানীমার খাস রসুয়ে-বামুন বলে গেছে'।

দেওয়ানের ব্রেকফাস্ট শেষ হল। আরামকেদারায় গা ঢেলে দিয়ে আতপ্ত খুশিতে পূর্ণ হয়ে উঠল সে। একটু সময় বিশ্রাম, তারপর শুরু হবে নিজের লেখাপড়ার কাজ। খাসভৃত্য উচ্ছিষ্ট সরিয়ে ফেলে ঘরের পর্দাটা টেনে দিল।

হরদয়াল বন্ধুকে এই ধরনের একটি চিঠি লিখল :

> তোমার দ্বিতীয় পত্রের উত্তর এখন টাটকা টাটকা দেওয়া যাবে না। বিল্ উইলবারফোর্সের কোনো আত্মজীবনী পাওয়া সম্ভব কিনা জানিয়ো। তুমি একবার প্রশ্ন করেছিলে, সেনাপতি বড়, না তার সৈন্যদল। উইলবারফোর্সের জীবনী পড়ে তার উত্তর দেব। একক চেষ্টায় একটি সাম্রাজ্যের রোগ দূর করা সম্ভব, একটি মস্তিষ্ক পৃথিবীকে অনুপ্রাণিত কবতে পারে। এ-রকম সেনাপতি হয়তো-বা সৈন্যদল অপেক্ষা অনেক বড়।
>
> একটা কৌতুকের ব্যাপার ঘটেছে যার জন্য একথা উত্থাপন করলাম। রূপচাঁদের কথা তুমি জানো। তার পিতামহ ও পিতামহীকে এই রাজপরিবার একশত এক টাকায় কিনেছিল। রানীমাকে বলে ক্রয়পত্র ছিঁড়ে ফেলেছি, কিন্তু সে ক্রীতদাসই থেকে গেল। রাজবাড়ির বাইরের জীবন সে কল্পনাও করে না।

আহারের পর রানীর কামরায় ডাক পড়ল হরদয়ালের।

'খেয়ে তৃপ্তি হয়েছে, হরদয়াল'?

'আজ্ঞে হ্যাঁ'।

'উৎসবের ব্যবস্থা করছ তো। কী কী করলে'?

'পুজোর ভার পুরোহিত নিয়েছেন। সদর-নায়েব জেলার সদরে যাচ্ছেন। তিনি কবিয়ালের ব্যবস্থা করবেন, আর...'

'আর কী'?

'নাচওয়ালির কথাও বলে দিয়েছি'।

'নাচওয়ালি? তোমাদের রাজা তো এখনও নাবালক'।

'আজ্ঞে, কালেক্টরদের নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা হচ্ছে...'

'কিন্তু তোমাদের কি নাচমহল আছে'?

'ভেবেছি দেওয়ান-কুঠির হলঘরেই হবে'।

'তা বেশ'।

'কিন্তু...'

'আবার কিন্তু কিসে'?

'স্বভাবতই লোকে প্রশ্ন করবে এ-উৎসবটা কিসের। আমাদের রাজকুমারের বিপদমুক্তি বললে চলবে না। কী বিপদমুক্তি, লোকে প্রশ্ন করতে পারে'।

'তুমি নিজে কিছু ভেবেছ'?

'কারো জন্মোৎসব হিসাবে প্রচার করা চলে'।

'রাজকুমারের জন্মোৎসব হোক তবে'।

'তাতে একটু অসুবিধা আছে। তাঁর জন্ম বৈশাখে ; বৈশাখ এখনও অনেক দূর'।

'তাহলে কী করতে চাও'?

'রানীর জন্মোৎসব হোক'।

'কবে আমার জন্ম হয়েছিল তা কি আমারই মনে আছে'!

'সেটাই তো সুবিধা হবে এক্ষেত্রে'।

রানী ঈষৎ আরক্তিম হলেন। চোখ নামিয়ে নিজের হাতের বলয় দুটি পরীক্ষা করলেন যেন। 'আচ্ছা, তাই হোক তবে'।

রানী তাকিয়ার উপরে কনুইয়ের ভার রেখে ঈষৎ একটু হেলে বসলেন। তিনি প্রায় নিরাভরণ। হাতের একজোড়া বলয় আর গলার একছড়া হার ছাড়া আর-সবই পরিত্যক্ত। তাঁর অবস্থান-পরিবর্তনের সময়ে হারে-বসানো শাদা পাথরগুলো ঝকঝক করে উঠল।

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বলা যায়—রানীর জন্মোৎসবের প্রথা এইভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল।

৬

'কী তুমি পড়ো দিনরাত? পড়তে মানুষের এত ভালোও লাগে'!

নয়নতারা উঠে দাঁড়াল অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে।

'কী বই ওটা'?

'কিছু নয় এমন'।

নয়নতারা হাতে-লেখা পুঁথিখানি আড়াল করল অঞ্চলে। আড়াল না-করলে রাজচন্দ্রের কৌতূহল হতো কিনা সন্দেহ।

'লুকোচ্ছ কেন? বই কি লুকোবার জিনিস? ও তো তোমার কবিরাজি শাস্ত্র'।

'তা হবে। কিন্তু আকাশে মেঘ, বাদলা বাদলা লাগছে। জল হতে পারে। এমনদিনে বেরিয়েছেন'?

'শীতের মেঘ। তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে এলাম, নয়ন, রাজবাড়িতে উৎসব হবে। তুমি যেয়ো। কালীপুজো হবে, বিদ্যাসুন্দরের পালা হবে'।

'যাব। কিন্তু রাজবাড়ির সকলে যদি বলে, কবরেজটা এখানে এসেছে কেন'।

'তুমি বলবে রাজকুমার ডেকে এনেছে। বোলো, তুমি বাজকুমারের মিতে'।

নয়নতারা হাসল।

রাজকুমার বলল, 'আচ্ছা নয়ন, নাচওয়ালি কি খুব সুন্দর হয়'?

'তা, এ-গ্রামে নাচওয়ালি আবার কে এল'?

'উৎসবে নাচওয়ালিও নাকি আসবে। বললে না, নাচওয়ালিরা সুন্দর হয় কিনা'?

'একেবারে কুৎসিত হয় না'।

'তা আমি জিগ্যেস করিনি। তোমার চাইতেও সুন্দর কিনা তাই বলো'।

'তাও হয়'। নয়নতারার ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হল।

'এটা একেবারে ডাহা মিথ্যে। তা কখনও হয়, তাহলে সে নেচে বেড়াবে কেন'।

'কী করবে, কবরেজি'?

'তোমার সবতাতেই ঠাট্টা'।

নয়নতারা হাসি গোপন করতে মুখ ঘুরিয়ে নিল। এক টুপরে গম্ভীর মুখে রাজচন্দ্র প্রশ্ন করল, 'নয়ন, তোমার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট। এখন থেকে তুমি আর কবরেজি করতে পারবে না'।

'আমাকে খেতে-পরতে দেবে কে'?

'আমি কি পারি না, নয়ন'?

আর-একবার হাসবার উপক্রম করতে গিয়ে নয়নতারা দেখল প্রস্তাবটি রাজচন্দ্রব অন্তরের গভীর থেকে উত্থিত হয়েছে। সে বলল, 'পারেন, নিশ্চয়ই পারেন। দরকার হলেই আপনাকে আমি বলব'।

ঝিরঝির করে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে গেল।

রাজচন্দ্র বলল, 'কিছুদিন থেকে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে নয়নতারা, তোমার বইপুঁথি দেখে। এরপরে লোকে আমাকে মূর্খ বলবে'।

'কেন, কেন? মূর্খতার কী দেখল লোকে'?

'আমি না-পারি ফার্সি পড়তে, না-বুঝি ইংরিজি। বাংলায় লেখা কতকগুলো বই আছে—তাও পড়তে ভালো লাগে না'।

'আপনার পণ্ডিত আপনাকে সংস্কৃত পড়ায়নি'?

'অং বং শুনলে আমাব বিরক্ত বোধ হয়'।

'কেউ আপনাকে ভালো করে পড়ায়নি। সংস্কৃতে খুব ভালো লাগার মতো বিষয় আছে'।

'ছাই! কী বই পড়ছিলে তুমি? ওটায় একটাও ভালো কথা আছে তুমি বলতে চাও'?

নযনতারা মৃদু হাসল। স্মিতমুখে বলল, 'ওটা কালিদাসের বই'।

'কোন কালিদাস? যাকে তার বউ মূর্খ বলে তাড়িয়ে দিয়েছিল'?

'হ্যাঁ, প্রবাদ তাই বলে'।

'তুমি যদি প্রমাণ করতে পারো ওর মধ্যে একটাও দামি কথা আছে, আমি...'

'আমি নিজেই ভালো জানি না, আমি কী করে প্রমাণ করি'।

'চেষ্টা করো'। রাজচন্দ্র পালঙ্কের উপরে জাঁকিয়ে বসল।

পুঁথিখানা 'মেঘদূত'। দু-রকম সংকোচ অনুভব করতে লাগল নয়নতারা। মহাভারত হতো যদি, তাহলেও সে সংকোচ অনুভব করত। নিজের বিদ্যা সপ্রমাণ করার সংকোচ তবু কাটিয়ে ওঠা যায়, কিন্তু মেঘদূতের প্রেম ও বিরহের কথাগুলি কী করে বলা যায় রাজকুমারের সামনে।

কিন্তু রাজচন্দ্র রাজকুমার। অসাধারণ পুরুষ।

'এটা কালিদাসের মেঘদূত। আপনি নিশ্চয়ই জানেন এর কথা'।

'সেই মেঘ এক দেশ থেকে আর-এক দেশে যাচ্ছে। কে যেন একদিন বাংলা করে বলেছিল গল্পটা'। রাজচন্দ্র বলল।

'আপনার ভালো লাগেনি'? কথাটা বলে নয়নতারা রাজকুমারের দিকে চেয়ে দেখল। দু'বছর আগেও যদি শুনে থাকে রাজকুমার, ভালো লাগার কথা নয়। ভালো লাগার মতো, অনুভব করার মতো বয়স তখনও হয়নি। একটা ঘোর যেন লাগল নয়নতারার চোখে, সহসা তার মনে হল এমনি এক যক্ষই তো নায়ক ছিল এ-কাব্যের, এমনি প্রথম তারুণ্যে উচ্ছল না-হলে এমন কথাগুলি সৃষ্টি হয় না।

নয়নতারা বলল, 'শুনবেন'?

'পড়ো না'!

এরপরে নয়নতারা মেঘদূত পড়তে শুরু করল। তার কণ্ঠ ভালো, তার উচ্চারণ শুদ্ধ, ছন্দজ্ঞান অনবদ্য। কালিদাস লিখবার সময় যে-ধ্বনিগুলি বিধৃত করার চেষ্টা করেছেন মন্দাক্রান্তায়, বোধ করি, নয়নতারার পাঠে সেগুলির প্রতিধ্বনি ছিল।

ধ্বনিবিন্যাস রাজচন্দ্রকে আকৃষ্ট করল, কিন্তু তার মনে যে দাগ কাটছিল সেগুলি শুধু ধ্বনি নয়, নয়নতারার স্ফুরিত অধর, তার বিলোল দৃষ্টি। মাঝে মাঝে তার গণ্ড আরক্তিম হচ্ছে কেন রাজচন্দ্র বুঝতে পারল না, কিন্তু অনুভব করল পরিবর্তনগুলো। পূর্বমেঘের মাঝামাঝি নয়নতারা থামল, কাব্যের সুরে তখন সে আচ্ছন্ন।

রাজচন্দ্র বলল, 'আমাকে অর্থ শিখিয়ে দেবে'?

নয়নতারা বিপদ গুনল। রাজচন্দ্র অর্থ বুঝবে না মনে করেই সে পড়তে পেরেছিল, তবু আর-একজনের কাছে বসে পড়ছে এই অনুভূতিতে মধুর একটা সংকোচ তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছিল মাঝে মাঝে। অর্থ করা কী করে সম্ভব!

'আপনার পণ্ডিতমশাইকে বললেই হবে'।

'যদি পড়ি, যদি শিখি, তোমার কাছেই শিখব। এই প্রথম আমার মনে হল পড়াটা মধুর। শিকারের চাইতেও ভালো লাগার মতো বিষয় ওতে আছে'।

'আচ্ছা আর-একদিন'।

'কেন? এই ঝিরঝিরে বাদলায় সমস্ত পথঘাট ভিজে গেছে, আজ ঘোড়াটাকে কষ্ট দেবার ইচ্ছে নেই। আজ কোথাও বেরুব না। তোমার কাছে বসে বসে পুঁথিটা পড়ব। আমার মনে হয় তোমার মতো পড়তে কেউ পারবে না। পণ্ডিতের সংস্কৃত পড়া যেন কটকট করে কাঠসুপুরি চিবোনো'।

'আমি পারি না'।

'না, তুমি পারো'।

'কিন্তু আপনার নিশ্চয় খাওয়া-দাওয়ার সময় হয়েছে। আপনি অনেকক্ষণ হল এসেছেন। ওঁরা সকলে আপনার খোজ করছেন'।

'নয়ন, আমি প্রথম শ্লোক না-পড়ে উঠব না'।

'কিন্তু আপনি তো ক্লান্ত, একটু শরবৎ দেবার ব্যবস্থাও আমার নেই'।

'তুমি বুঝি গরিব'? রাজচন্দ্র হো-হো করে হেসে উঠল। তারপর নয়নতারার শয্যায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বলল, 'এই শুলাম। তুমি পড়বে, অর্থ করবে, তবে উঠব'।

'যদি অর্থ করতে না-পারি'?

'আমার শুয়ে শুয়ে পা নাচানো বন্ধ করতে তো আর পারবে না'।

কুমারী নয়নতারা রাজচন্দ্রর দিকে চেয়ে ছিল কিন্তু হঠাৎ যেন সংবিৎ পেল তার মন—কিন্তু এ যে কিশোর, একেবারে ছেলেমানুষ। নয়নতারা বলল, 'আচ্ছা রাজকুমার, এরপর যেদিন বলবেন আমি আপনাকে বলব এর অর্থ। আমি ব্যাকরণ, টীকা, অন্বয় সব ঠিক করে রাখব পুঁথি ঘেঁটে'।

'ঠিক তো'?

'হ্যাঁ। কথা দিচ্ছি'।

'তাই বলে আমি উঠছি না। গল্প বলো একটা, শুনি'।

'গল্প'? নয়নতারা অবাক হয়ে তাকাল রাজচন্দ্রর চোখের দিকে।

রাজচন্দ্র হাত বাড়িয়ে নয়নতারার ডান হাতের আঙুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে বলল, 'তোমার গল্প। তুমি একা একা কী করে থাকো, কী ভাবো, রাত্রিতে ভয় করে কিনা—এই সব। এ কি, তুমি কাঁপছ কেন'?

'না, কাঁপব কেন! সুড়সুড়ি লাগছিল আঙুলে'।

নয়নতারা নিজের কাঁপা কাঁপা একটা ভাবকে পুড়িয়ে দিল নিজের ভেতরে। কিন্তু বলল, 'আমাকে তোমার খুব ভালো লাগে'?

'ভয়ানক'।

কয়েকটি চুল রাজচন্দ্র কপালে এসে পড়েছিল, নয়নতারা সেগুলো আঙুল দিয়ে সরিয়ে দিল। তার মনে হল, সে প্রশ্ন করবে, কেন এত ভালো লাগে ; কিন্তু মনে হল, সে এমনি প্রগলভা হয়ে পড়ছে কোনো প্রশ্ন না-করেই। প্রশ্ন করা আদৌ উচিত হবে না।

রাজচন্দ্র বলল, 'বললে না তোমার গল্প? আমার মনে হয় একদিন সারাদিন সারারাত তোমার কাছে থাকি, দেখি, তুমি কি করো'।

নয়নতারা নিজের অজ্ঞাতেই মুচকি হেসে বলল, 'থেকো একদিন'।

'হ্যাঁ থাকব। সেদিন পূর্ণিমা হওয়া চাই। বারান্দায় বসে বসে দুজনে অনেকক্ষণ গল্প করব। বাঁশ গাছগুলোর মাথার উপর দিয়ে চাঁদ উঠে পড়বে। তবু আমরা গল্পই করব'।

একদিন রাজচন্দ্র অভিমান করে বসল। নয়নতারার কাছে এসে নিজেকে তার তুলনায় ঐশ্বর্যবান বলে কখনও তার মনে হতো না, বরং নয়নতারাকেই পরিপূর্ণা বলে মনে হতো ; কিন্তু প্রিয়জনকে উপহার দিতে সাধ যায় বইকি মানুষের।

মসলিন বলতে কতকটা আজকালকার টিসু বেনারসি শাড়ির মতো যে কাল্পনিক জিনিসকে আমরা আন্দাজ করে নিই ঠিক সে-রকম নয়। মুঠি করে ধরলে তবে বোঝা যায় কাপড়টা ডালিমফুলি রঙের ; নতুবা ঘাসের সামনে মেলে ধরো, মনে হয় ঘাস-রং। আকাশের দিকে তুলে ধরো, মনে হবে আকাশি। এত পাতলা, কিন্তু কি সমান বুনন। সবচাইতে সুন্দর শাদা সুতোয় তোলা বুটিগুলো।

প্রাত্যহিক ঘোড়ায় চড়ার ব্যায়ামটা শেষ করে ফিরছিল রাজচন্দ্র। পিয়েত্রোর বাঁধা জোলাদের মধ্যে প্রধান দবীর বক্সের বাড়িটা পথের ধারেই। ঘোড়া সেই বাড়িটার কাছাকাছি আসতে দু'একজন লোক রাজচন্দ্রকে দেখতে পেয়ে পথের ধারে যুক্তকরে দাঁড়াল।

'কী ব্যাপার, তোমাদের সকলের কুশল তো'?

'হুজুরের রাজ্যে সকলেই ভালো আছি। হুজুর আমাদের একটা বিচার করে দিন'।

হাসিমুখে রাজচন্দ্র বলল, 'কী বিচার, কী হয়েছে'?

'হুজুর, আমরা বাজারের দোকানদার। দবীরচাচার কাছে আমরা সকলেই টাকা পাই। তেল, নুন, চাল, ডালের জন্য পায় ওরা, আর আমি পাই তামাক আর অন্য মশলার জন্য। দবীরচাচা আমাদের খবর দিয়েছে কাল, সে সব দেনা-পাওনা শোধ করে দিয়ে আজমীর শরিফের দিকে রওনা দেবে। হুজুর, দবীরচাচার এ-গের্দে ঠাট্টার জন্য নাম আছে। আমরা সহজে আসিনি, অনেক খবরাখবরের পর এসে দেখছি—সেই ঠাট্টা। একখানা শাড়ি দিয়ে বলছে, এটা নিয়ে সব ধার সকলে শোধ দিয়ে দাও'।

'শাড়িটা কি বাজে? তাতে কি তোমাদের ধারের টাকা ওঠে না'?

'আজ্ঞে দাম কত তা আমরা জানি নে। এই যে লোকজন দেখছেন, সকলেই এসেছে ওই শাড়ি দেখতে, দামের কথা কেউ জানে না। কত দাম হতে পারে এ কথা জিগ্যেস করলে সকলেই মাথা চুলকোচ্ছে'।

'দবীর নিজে কী বলছে'? রাজচন্দ্র জিগ্যেস করল।

'আজ্ঞে তিনি হাসছে আর বলছে, যার সাহস থাকে ন্যায্য দাম ফেলে তুলে নেও। আমি ঠিক এই রকম শাড়ি আর বুনব না এটা আমি বলে দিতে পারি। এর জোড়া আর হবে না'।

'পিয়েত্রোসাহেবের দরবারে যাও তোমরা, তিনি শাড়ি সম্বন্ধে খুব ভালো মতামত দিতে পারবেন'।

'আজ্ঞে পিয়েত্রোসাহেবের লোকও আছে ওই দঙ্গলের মধ্যে। তারা বলছে ওই শাড়ির যা দাম তাতে পাঁচখানা মুর্শিদাবাদি গরদ হয়। লাভ কি মসলিন কিনে? তারপর হাত দিয়ে বলছে কাপড়ে—ও সব্বনাশ, এও তো রেশমির চাইতে রেশমি সুতোর! এর দাম করাব সাহস আমাদের নেই'।

রাজচন্দ্র ঘোড়া থেকে নেমে বলল, 'চলো, আমি শাড়িটা দেখব'।

রাজকুমার আসছেন শুনে দবীর বক্স তার সাকরেদ আল্লারাখা বসাকের সঙ্গে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল।

রাজকুমাব বলল, 'কী ব্যাপার ওস্তাদ দবীর বক্স'?

'কিছু না হুজরৎ, এদের চক্রান্ত। আমি বলছি তোমরা ন্যায্য দামে কিনে নেও। কেউ দাম বলবে না, কেবল হাসাহাসি করছে'।

'তুমি নিজেই দাম বলো না'?

'হুজুর, আমি তো দোকানদার না, আমি দামের কী জানি'।

'দেখি কাপড়টা'।

তখন আল্লারাখা বসাক লোকজনকে সরিয়ে দিয়ে শাড়িখানা রাজকুমারের হাতে দিল। একখানা রেশমি রুমালের যে-ওজন শাড়িটার ওজন তার চাইতে বেশি নয়। রাজকুমারের হাতের উপরে ডালিমফুলি রঙের একখানা রুমালই যেন দিল আল্লারাখা। কিন্তু যখন দবীব বক্স আর আল্লারাখা দুজনের আঙুলের ওস্তাদিতে শাড়ির ভাঁজ খুলতে লাগল তখন শাড়িটা অদৃশ্যপ্রায় হল। শাড়ি দেখে গুঞ্জন উঠল। শাড়িটা খুলে দেখার সৌভাগ্য এর আগে আর-কারো হয়নি।

রাজকুমার এদের দিকে ফিরে বলল, 'কত দাম হতে পারে এর? তোমরা এর কত দম দিতে পারো'?

'আজ্ঞে পিয়েত্রোসাহেব বলেছেন একশো টাকার চাইতে দামি শাড়ি আমরা কিনব না'।

'শাড়ি যদি তার চাইতেও দামি হয়'?

'আজ্ঞে বিক্রি হবে না। আজকালকার খরিদ্দাররা সোনা-চাঁদির কাজ-করা বেনারসির দিকে ঝুঁকেছে। এসব শাদামাটা কারিগরির দিকে মন নেই'।

'বেশ তো, একশো টাকাই দাও না। তাতে কি দবীর বক্সের সব ধার শোধ হয় না'?

'তা হয় না হুজুর। ও-শাড়ির দাম একশো টাকার অনেক বেশি'।

হঠাৎ রাজচন্দ্র অন্যভাবে কথা বলল, 'আচ্ছা দবীরমিয়াঁ, আমার বাবার কালে তুমি কি শাড়ি দিয়েছ আমাদের বাড়িতে'?

'জি'।

'এ-রকম শাড়ির কী দাম পেতে'?

'জি, দাম নেবার কথা ছিল না। বছরে একজোড়া শাড়ি বরাদ্দ ছিল আমার উপর। তাতে আমার চেলা-সাকরেদ সহ খাওয়া-পরার খরচ চলত ছ'মাস'।

রাজচন্দ্র একটু সময় চিন্তা করল। প্রথমে তার মনে হল এ-রকম সব ওস্তাদের দুঃখকষ্টে সাহায্য করা উচিত, তারপর মনে হল শাড়িটা কি নয়নতারা পড়বে? তারপরই মনে হল, নিশ্চয়ই সে কিনবে শাড়িটা।

সঙ্গে সঙ্গে তার মনের মধ্যে নয়নতারা শাড়িখানা পরে দাঁড়াল।

'দবীরমিয়াঁ, তোমার ধারের পরিমাণ লিখে ঠিক করে শাড়িটা নিয়ে আমার কাছে যেয়ো'।

এইভাবে শাড়িটা এল রাজচন্দ্রের কাছে।

তখনও বেলা আছে। শীতের পড়ন্ত বেলায় শাড়িখানা নিয়ে বাজচন্দ্র নয়নতারার বাড়িতে গেল।

নয়নতারার কাছে কয়েকজন লোক ওষুধের জন্য বসেছিল। সে কখনো হেসে, কখনও কোনও লোভী কু-আহারী রোগীকে ভর্ৎসনা করে তাদের খবরাখবর করছিল। রাজকুমারকে আসতে দেখে লোকগুলো তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করে বিদায় নিল।

নয়নতারা তার ওষুধের ঝাঁপিটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, 'এমন করে তুমি যদি সবসময়ে আসো, আমার বোগীরা ভয়ে ভেগে যাবে'।

'যত যায় তত মঙ্গল'।

'কী সব্বনেশে ভালোবাসা, আমার দিন চলবে কিসে'?

'না চলাই তো আমি চাই। এবার দ্যাখো তো এটা কী'?

'বাঃ, বেশ শাড়ি তো, মসলিন বুঝি'?

'হ্যাঁ। কেন এনেছি বলতে পারো'?

রাজকুমাবের এখনও রাজকন্যে আসেনি। এ শাড়ি যে তার জন্যেই সে এনেছে তা বুঝতে দেরি হল না নয়নতারার। মসলিন জিনিসটার মূল্য কখনও কখনও খুব বেশি হয়—এটা জানত সে। হয়তো দামের দিক দিয়ে এ-শাড়িখানা রাজকুমারের কাছে সাধারণ, কিন্তু গ্রহণ করার কি যুক্তি আছে নয়নতারার।

'রাজকুমার'!

'হ্যাঁ মিতেনি, তোমার জন্যেই'।

'ছি-ছি, রাজকুমাব, আমার জন্যে কি ওসব আনতে হয'!

'কেন, বন্ধু নও তুমি আমার'?

'লোকে শুনলে ক্রী বলবে তোমাকে'?

'যার যা খুশি বলুক। তুমি এখন একবার এটা পরো তো। পরে আমার সামনে দাঁড়াও'।

'তা হয় না'।

'সে কী, কেন হয় না'?

'তা হয় না। ওসব কাপড় আমাদের পড়তে নেই'।

'কেন পরতে নেই, কোন শাস্ত্রে নিষেধ আছে'?

রাজচন্দ্র একটা অনুচিত কাজ করে ফেলল। নয়নতারাব দিকে এগিয়ে গিয়ে তার আঁচলটা স্পর্শ করল। যেন সে নিজেই মসলিনটা পরিয়ে দেবে তাকে। দৃঢ় মুঠিতে আঁচল ছাড়িযে নিয়ে নয়নতাবা বলল, 'রাজকুমার, বোসো। আমার কথা শোনো'।

কিন্তু রাজচন্দ্র বসল না। তার ঠোঁট কাঁপল, চোখ ছলছল কবে উঠল, গাল দুটি লাল হয়ে উঠল।

'রাজকুমার, রাগ কোরো না। ভালো কথা, তুমি বলেছিলে মেঘদূত পড়বে। এসো, আমরা মেঘদূত পড়ি'।

রাজকুমারের সামনে মসলিন পরে দাঁড়ানোর চাইতে তার পাশে বসে মেঘদূত পড়া অনেক সহজ, এখন মনে হল নয়নতারার।

'শোনো, শোনো, রাগ করে চলে যেয়ো না'।

রাজকুমার আঙিনা পার হয়ে নতমস্তকে চলে গেল। নয়নতারা অনেকক্ষণ কপাটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর একসময়ে তার চোখের প্রান্তে জল এল।

মাটি থেকে মসলিনখানা কুড়িয়ে নিয়ে সে তুলে রাখল। আবার রাজকুমার আসবে, তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, বুঝিয়ে বললে সে বুঝবে।

তার পরদিন রাজকুমার এল না।

৭

অবশেষে উৎসবের দিনটি এল। রাজবাড়ির তোরণে প্রভাতে নহবত বাজল। দাস-দাসীদের পরনে কোরা কাপড়। দাসীদের মুখের পানে, দাসদের মাথার লাল গামছায় উৎসব ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

পূজার দালানে ব্রাহ্মণ-কায়স্থঘরের বউ-ঝিও বিধবারা বসেছে। তিন-চারজন একপাশে বসে রান্নার মশলা বাছছে, তাদের চাইতে খানিকটা দূরে পাঁচ-সাতজন বসে রান্নার চাল ঝেড়ে-বেছে পরিষ্কার করছে। সকলেরই তটস্থ ভাব। এদের মধ্যে সবাই ভক্তিমতী নয়। কিন্তু নেহাত টাকার বদলে যে কাজ করতে বসেছে তারও তটস্থ ভাব। সকলের মনেব মধ্যেই এই রকম একটা ভাব কাজ করছে ; পুজোটা কালীব, অন্য কেউ নয় যে ক্ষমাঘেন্না করবে।

দালানের বাঁ দিক দিয়ে চলতে চলতে একটা থামের আড়ালে পুরুষদের সাক্ষাৎ পাওযা গেল। পুরোহিত সঙ্গে দুজন ব্রাহ্মণ নিয়ে বসে যজ্ঞেব কাঠ, বেলপাতা বেছে রাখছেন।

কাজের তুলনায় মাঝে মাঝে কলরব বেশি হচ্ছে বইকি। এসব ব্যাপারে বানীর আত্মীয়া দু'একজনই সর্বময় কর্ত্রী। তাদের কেউ যখন এসে দাঁড়াচ্ছে কোলাহল কমে যাচ্ছে। আত্মীয়স্থানীয়া একজন এসে এদের মনে করিয়ে দিল, 'কথা বোলো না, থুথু ছিটোলে সব নষ্ট হবে'।

দালান থেকে নেমে কিছুদূর গিয়ে চার-পাঁচজন জোয়ান যেখানে ভোগ রান্নার কাঠ ফাড়ছে সেখানে দাঁড়ালে দেখা যাবে আট-দশটা পাঁঠা বাঁধা আছে। ছোলা, কাঁঠালের পাতা খাওয়ানোর জন্য দু-একটা উলঙ্গ শিশু জুটে গেছে সেখানে।

বাইরের তোরণ থেকে সানাইয়ের ভৈরবী রাগিণীটা অত্যন্ত মধুর হয়ে কানে আসছে, কিন্তু সেদিকে খুব একটা লক্ষ্য করছে না কেউ।

কাছারিবাড়ির বড় আঙিনাটায় শামিয়ানা খাটানো হচ্ছে। বড় শামিয়ানা, ঝালরগুলো একটু বিবর্ণ হয়েছে, নতুবা দেখতে ভালোই লাগছে। শামিয়ানার নিচে বাঁশ পুঁতে একটা অংশ চিক দিয়ে ঘিরে ফেলা হচ্ছে। পর্দানশিনাদের জায়গা হবে ওদিকটায়। শামিয়ানা টাঙানোর আগে বোধ করি কাল আঙিনার ঘাস চেঁচে ফেলে গোবর দিয়ে নিকিয়ে দেওয়া হয়েছে মাটি। একটা রোদ পেয়ে আঙিনাটা খটখট করছে।

কাছারির পেছনের দিকে ছোট্ট বাগান। বাগানে অবশ্য ফুলগাছ নেই, দু'একটা কাঠচাঁপা, এক-আধ ঝাড় হাসনুহেনা। বাগানের ভিতর কিছুদূরে একটা খড়েব চাল দেওয়া পাকা দেয়ালের ছোট বাড়ি চোখে পড়ে। এটার ব্যবহার ঠিক বোঝা যায় না। পাশাপাশি আট-দশটা কুঠুরি। প্রায় সবগুলোই তালাবন্ধ। শুধু একধারের খানতিনেক খোলা আছে। তার মধ্যে একখানিতে আট-দশজন লোক। সকলেরই বাবরি চুল, গাঁজার নেশায় সকলেরই প্রায় চোখ লাল। ঘরের এক কোণে ঢোল, তবলা, সারেঙ্গি, বীন ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র ছড়ানো রয়েছে। এরাই যাত্রাগান করবে। এপাড়া-ওপাড়া থেকে কয়েকটা লোক ও তার চাইতে বেশিসংখ্যায় ছেলেপুলে এসেছে।

অন্য ঘর দুখানির লোকদের সঙ্গে এদের কোনো সংস্রব নেই। সে-ঘর দু'খানির একটিতে তিনজন লোক উবু হয়ে বসেছে একটা ফুর্সিকে ঘিরে, ধূমপান করছে, কথা বলছে কম। সেদিকে লোকের ভিড় জমার সুবিধা নেই। অন্যটিতে দুটি স্ত্রীলোক। একজনের বয়স ত্রিশ পার হয়েছে। একটু যেন রোগাটে, হাত পাগুলো শুকনো, মুখে মেচেতার দাগ, পানের রসে দাঁতগুলো কালচে, চোখে সুর্মার টান। অন্য

স্ত্রীলোকটির বয়স কম। উদ্ধত যৌবন, বিলাসমুখিনতার ছাপ চোখে-মুখে, কিন্তু চোখ দুটিতে নির্বুদ্ধিতার দৃষ্টি। জড়বুদ্ধির আর-একটা প্রমাণ এর হাসি। অকারণে শব্দ করে পরিপার্শ্বককে সচকিত করে হেসে উঠছে অল্পবয়সী স্ত্রীলোকটি। ভাঙের নেশায় এমনি করে হাসে নেশাখোররা। এদের পরনে পশ্চিমদেশি পোশাক। পাঞ্জাবি ও পায়জামা। অবশ্য ওড়নার বালাই নেই। এরা নাচওয়ালি।

সদর-নায়েব তার কর্মভার সুচারুরূপেই নির্বাহ করছে।

সারা গ্রামে চঞ্চলতা বিচ্ছুরিত হচ্ছে এবং চঞ্চলতার একটা মূল সুর কখন সন্ধ্যা হবে, এই প্রশ্ন। সহজেই শীতের সন্ধ্যা এল।

পূজা-দালানে ঢাক বেজে উঠল, নহবতখানায় সানাই দু'একবার প্যাঁ-প্যাঁ সুরে বেজে উঠল ; লোক ছুটতে লাগল কাছারির উঠোনের দিকে।

অভিনয়ের বিষয় 'বিদ্যাসুন্দর'। আসরে তিল ধারণের স্থান নেই। মাঝখানে দাঁড়িয়ে অধিকারী কালীকীর্তন শুরু করেছে।

শ্রোতাদের চোখ জ্বলছে। পালা মাঝামাঝি এসেছে, যুবারা সোজা হয়ে উঠে বসেছে উৎকণ্ঠায়। বয়োবৃদ্ধরা রামপ্রসাদী সুরের দোলায় দুলছে।

জনসাধারণের পাশ কাটিয়ে বাজচন্দ্র আসর থেকে বেরিয়ে বাইবে এসে দাঁড়াল। রূপচাঁদ এল তার পিছু পিছু।

'তুই যা, শোন গে। আমার কিছু দরকার নেই'। রাজচন্দ্র রূপচাঁদকে বললে।

আকাশে তারা আছে। ধোঁয়ার মতো একফালি মেঘ একগুচ্ছ তারার উপর দিয়ে উড়ে গেল। তারাগুলির প্রত্যেকটি যেন অসাধারণ বড় দেখাচ্ছে। আকাশের রং কালো নয়, যেন অত্যন্ত গভীর বর্ণনাতীত নীল।

রাজচন্দ্রর মনে হল যেন একটা কাচের গোলকের মধ্যে সে আছে। আর এটা যে সে অনুভব করছে, এটাও যেন পুরোপুরি তার অনুভূতিতে নেই।

চোখের সম্মুখে একটি প্রাণ মুছে যেতে দেখে যেমন অপূর্ব অনুভব হয়েছিল, চোখের সম্মুখে অভিনয়ের নায়ক-নায়িকা আর-এক অপূর্বতায় যুক্ত করে দিল তার অভিজ্ঞতাকে। প্রেম লালসার হিংস্রতায় উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। সে-লালসা এখনও দুঃসহ হয়নি, জ্বলে যাচ্ছে না অন্তর। কিন্তু আহার্য যেমন দেহকে উত্তপ্ত করে তেমনি সে-লালসা সবলতা এনে দিচ্ছে চিন্তায়।

প্রায় তার গায়ের উপর দিয়ে একটি পালকি হাঁই-হুঁই করতে করতে চলে গেল। ওদের দোষ নয়, অন্ধকারে মানুষ ঠাহর করাও কঠিন, রাজকুমার বলে চেনা অসম্ভব। সুন্দরও এক দেশের রাজপুত্র, এমনি অন্ধকারে সে যাচ্ছিল বিদ্যার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য। আসরের লালচে আলোগুলো চোখে পড়ছে, কিন্তু ইতিমধ্যে এতটা দূরে সে এসে পড়ছে যে গানের কথাগুলোর চাইতে সুরই বেশি স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

পালকিটা যাচ্ছে দেওয়ান-ভবনের দিকে। দেওয়ান-ভবনের সামনের টানা বারান্দায় ঝাড়ের আলোগুলো ঝলমল করছে। রাজচন্দ্রর মনে পড়ল নাচের কথা।

নাচের আসর কী রকম হচ্ছে কে জানে। কিন্তু এ-পর্যন্ত তাকে কেউ ডাকতে আসেনি। বোধ হয় এখনও কিছু দেরি আছে।

পায়চারি করতে করতে সে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেটা সিংদরজায় যাবার পথ। সেদিকে তাকিয়ে সিংদরজার বাইরের কিছুই নজরে পড়ল না। সিং দরজার থামগুলোর এ-পিঠটায় অস্পষ্ট আলো পড়েছে। অস্পষ্ট ফ্রেমে-আঁটা গাঢ়তম অন্ধকার। সেই অন্ধকারে জোনাকি উড়ছে। জোনাকিগুলোর মধ্যে দিয়ে চলে গেলে ওই অন্ধকারে নয়নতারার বাড়ির পথ।

কিন্তু নয়নতারা তাকে অপমান করেছে।

সহসা রাজচন্দ্রর মন অস্থির হয়ে উঠল। নয়নতারাও কি বিদ্যার মতোই একজন নারী! তেমনি সব...

কিন্তু ভাবনায় বাধা পড়ল। দুজন লোক আলো হাতে, তাদের সঙ্গে রূপচাঁদ, এদিকে এল। ম্লান আলোতেও রূপচাঁদ তাকে চিনতে পারল এবং দাঁড়াল।

'কী রে রূপচাঁদ, আলো হাতে কোথায় ঘুরছিস'?

'আজ্ঞে হুজুর আপনাকে খুঁজছি, ওদিকে যাবেন না'?

'কোথায়, নাচের আসরে'?

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ডানকানসাহেব এসেছে, পেত্রো এসেছেন। ডিপ্‌টিসাহেবও এসেছেন'।

'বটে? তা তারা তো তোমাদের দেওয়ানের অতিথি'।

'সে কি হুজুর, আপনি না-গেলে যে কেউ নাচের আসরে ঢুকছে না। চলুন'।

'দেওয়ান-বাড়ির বড় হলঘরখানা দেয়ালগিরি ও ঝাড়ের আলোয় ঝকঝক করছে। দেয়ালে এদিক-ওদিক খানকয়েক বড় বড় আরশি বসানো হয়েছে এবং সেগুলি থেকে প্রতিবিম্বিত হচ্ছে আলো। মেঝেতে নীল কামদার গালিচা পাতা। দেয়ালের কোল ঘেঁষে ঘেঁষে ছোট ছোট গদিমোড়া ফরাস। একদিকের দেয়ালের ফরাসটি রাজকীয় আড়ম্বরে সজ্জিত। লাল মখমলের গদির গায়ে জরির কাজ, তাকিয়াগুলোর গায়ে জরির ঝালর। এটা যে রাজকুমার-প্রমুখদের জন্য সংরক্ষিত, বুঝতে বিলম্ব হয় না।

হলঘরটি লাগোয়া একটি ছোট কুঠুরিতে একটিমাত্র বেলদার ঝাড়ের তলায় একটা টেবিলের পাশে দেওয়ান, পিয়েত্রো এবং অন্য দুজন লোক। তাদের মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ, অন্যজন ভারতীয়। রাজু অনুমানে বুঝল, এরাই ডেপুটি এবং ডানকান।

হরদয়াল উঠে দাঁড়িয়ে সোৎসাহে বলল, 'এই আমাদের রাজকুমার আসছেন, রাজকুমার দীর্ঘজীবী হোন। ইনি রাজকুমার, ইনি মরেলগঞ্জের ডানকান হোয়াইট'। হাসিমুখে ডানকান হাত বাড়িয়ে দিল, 'হা ডু ডু, থ্যাঙ্কস অফুলি ফর দি ইনভিটেশ্যন'!

রাজকুমার নমস্কার করল। সে ইংরেজি জানে না। নীরব হয়ে রইল। হরদয়াল অতঃপর ডেপুটির সঙ্গে রাজচন্দ্রর পরিচয় করিয়ে দিল। ডেপুটিও ইংরেজিতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল এবং রানীর দীর্ঘজীবন কামনা করল। হরদয়াল পিয়েত্রোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। পিয়েত্রো উঠল না। হাতের ইশারায় রাজকুমারকে তার পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। রাজকুমার সেই চেয়ারটায় বসতে পিয়েত্রো তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল।

হরদয়াল নিজের হাতে ডিক্যান্টার ধরল। গেলাসগুলো পূর্ণ করে নিয়ে অভ্যাগতরা পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করল। রানীর স্বাস্থ্যপান আগেই হয়েছিল। ডানকান উঠে দাঁড়িয়ে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্বাস্থ্যপান প্রস্তাব করল, হরদয়াল এবং ডেপুটি সহর্ষে ও সোল্লাসে গ্লাসে গ্লাস লাগিয়ে তা সমর্থন করল। পিয়েত্রো অর্ধোত্থিত হয়ে হাসি হাসি মুখে গ্লাস এগিয়ে দিল।

সকলে আসন গ্রহণ করলে পিয়েত্রো বলল, 'আমার গাউট, মিস্টার ডানকান, অমন সহসা কারো স্বাস্থ্য কামনা করে আমাকে বেমওকায় ফেলবেন না'।

ডানকান বলল, 'আপনার ভঙ্গিটিই সবচাইতে স্বাভাবিক হয়েছে'। ডেপুটি যোগ দিয়ে বলল, 'এবং সুচারু'।

এদের ইংরেজির মাঝখানে নিজেকে বোকা লাগছিল রাজচন্দ্রর। সে যেন কেউ নয়, এমনি মনে হচ্ছিল তার। পিয়েত্রো তাকে চুপি চুপি বলল, 'রাজু, তোমার সঙ্গে যে-ভাষায় কথা হবে সেই ভাষাতেই উত্তর দেবে'। রাজচন্দ্রর যেটুকু সাহস অবশিষ্ট ছিল, প্রস্তাবটি শুনে সেটুকুও উবে গেল। কিন্তু পিয়েত্রো কতখানি ভেবে দাবা বোড়ে চালে, বিশেষ করে এমন সাহচর্যে, সেটা রাজচন্দ্র জানত না। পরে একদিন কথায় কথায় বলেছিল পিয়েত্রো—অনর্গল হাসি এবং অনর্গল তামাকের ধোঁয়ার মধ্যে—ইংরেজ জাতটা যতই

লোককে নিজের ভাষার কথা শুনিয়ে বেড়াক, আসলে ফরাসি ভাষা তাদের স্বপ্নের ভাষা। সুযোগ পেলে ইংরেজরা তাদের ফরাসি ভাষা-জ্ঞান জাহির না-করে পারে না।

পিয়েত্রো বলল ফরাসি ভাষায়, 'রাজকুমার, আপনার মা মহীয়সী রানীকে আমাদের নমস্কার জানাবেন। বলবেন, প্রতিবেশীদের প্রতি তাঁর সমবেদনা আমাদের আবার নতুন করে মুগ্ধ করেছে'।

কথাটা সামান্য, মনে মনে মক্‌শো করে রাজচন্দ্র দু-তিনটে কথা যোগ করে করে একটা বাক্য খাড়া করে ফেলল, 'মায়ের পক্ষ থেকে প্রতিবেশীদের সমবেদনার জন্য অজস্র ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি'।

পাছে ভুল হয় এই ভয়েই তার কান দুটিও লাল হয়ে উঠল। কিন্তু ডানকান ও ডেপুটি নয় শুধু, হরদয়ালও বিস্মিত হল। পিয়েত্রোও ভাবল, ছোকরা ভালো শিখতে পারবে তো ফরাসি।

এবার ডানকানের পালা। সে কেউকেটা নয়, হ্যারোর স্কুল থেকে পাস করেছে, ফরাসি দেশে বেড়িয়েছে, কন্টিনেন্টে ঘোরাও তার ভাগ্যে ঘটেছে। ইদানীং সে মরেলগঞ্জের ইন্ডিগো লিমিটেডের ম্যানেজার। এমনকী কেউ কেউ তাকে ফ্যাক্টরও বলে। সে বললে—তার ফরাসি তোবড়ানো-টুপির মতো—'রাজকুমার, তোমার এই বদান্যতার কথা আমি কলকাতার সমাজে বলব। যদি লাটসাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁকেও বলব তোমাদের দিকে নজর রাখতে'।

ডানকানের ফরাসির দম হারিয়ে যাচ্ছিল। সে চালাকি করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হরদয়াল ও ডেপুটিকে লক্ষ্য করেই যেন বলল ইংরেজি করে, 'আমরা প্রতিবেশী, প্রকৃত এবং খাঁটি প্রতিবেশী'।

ভাষার ব্যাপারটা আরো কিছুদূর হয়তো গড়াত, এমন সময় পিয়েত্রোর হুঁকাবরদার প্রবেশ করে প্রভুর পাশে গড়গড়াটা রাখল। ডানকানও চুরুট ধরাল। নিশ্চিন্ততার আনন্দে ডেপুটি ও হরদয়ালকে এগিয়ে দিল।

হল্ থেকে পিড়িং পিড়িং করে তার টানার শব্দ আসছিল। সদর-নায়েব দরজার কাছে মুখ বার কবে বলল, 'হুজুররা এলেই নাচওয়ালি আসরে আসবে'।

রাজচন্দ্রর জীবনে এই প্রথম নাচ। অন্য সবাই অল্পবিস্তর ভালো-মন্দ নাচ দেখেছে, কিন্তু সেই হলঘরের আরামদায়ক আসরে বসে অভিজ্ঞতারও খানিকটা বিস্মিত হয়েছিল। যা রটে তার কিছু বটে, এই স্বগতোক্তি করল রাজু কোণ ঘেঁষা রাজকীয় ফরাসে বসে।

নাচওয়ালি প্রবেশ করল। তার তবলচি, বীনকার এবং সারেঙ্গি-বৃদ্ধ তিনটি যেন যমজ, তারা আগেই বসেছিল আসরে। নাচওয়ালি উরু মুড়ে বসল ওদের মাঝখানে। তার চোখের সুর্মা এবং আঙুলের মেহেদি, তার ঝুটা মোতির অলংকার এবং স্বচ্ছপ্রায় পেশোয়াজ এক মুহূর্তে হলঘরখানিকে পরিপূর্ণ করে দিল।

পিয়েত্রো দাড়িতে হাত বুলাল। অনেক নাচ দেখার সুযোগ তার হয়েছে। তার অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে যা ধরা পড়েছে সেটা আর কারো চোখে পড়ল কিনা কে জানে। নাচওয়ালি বিশ জোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখ দিয়ে হেঁটে এসেছে দরজা থেকে আসরের মাঝখানে। সেই পদক্ষেপগুলিও নাচ। সর্বাঙ্গ যেন হাওয়ায় ভেসে আসে, এত লঘু। শুধু পায়ের সুশিক্ষিত আঙুল ক'টা অচঞ্চল গতিতে অগ্রসর হচ্ছে এবং চোখ দুটিতে নাচের তীব্রতম চঞ্চলতা সংহত হয়ে দুলছে।

পিয়েত্রো হরদয়ালের দিকে ঝুঁকে পড়ে জিগ্যেস করল, 'কোথা থেকে যোগাড় করলেন'?

'আপাতত জেলার সদর থেকে, শুনছি নাকি অযোধ্যায় বাড়ি'।

'অযোধ্যা'?

ডানকান বলল, 'আউধ? নবাবের দরবার'?

রাজকুমার স্থিরদৃষ্টিতে নাচওয়ালির মুখের দিকে চেয়ে রইল।

নাচ আরম্ভ হল। হরদয়ালের নিজস্ব ভৃত্যটি রুপোর একটা বারকোশ নিয়ে প্রবেশ করল। দু-তিনটি বোতল, ঝকঝকে কাচের গ্লাস।

নাচওয়ালি নিজের দেহটাকে কখনও ফেনহিল্লোলে পরিবর্তিত করছে, কখনও পুষ্পস্তবকে। সংগতদাররা সুতীক্ষ্ণ মনোযোগ দিয়ে তার গতির সূক্ষ্ম সময়-বিভাগকে সুরেব সূক্ষ্মতর বিভাগ দিয়ে সূচিত করার চেষ্টা করছে।

পিয়েত্রোর হাতের গ্লাসের ধার উপচে ফেনাগুলো গ্লাসের গা বেয়ে তার আঙুলের উপরে এসে জমছে। গ্লাস নামিয়ে রেখে সে সম্মুখের ফুর্সিটার নল নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল।

নেশা মাথায় পৌঁছলে কেউ কেউ নির্বাক দার্শনিক হয়ে যায়। ডানকানের বয়স চল্লিশেব ঘর এখনও পার হয়নি। ইতিমধ্যে একবার তার হাতের গ্লাসে নাচওয়ালির প্রতিবিম্ব পড়েছিল। হ্যারোর স্কুলের চুল্লির পাশে-বসে-থাকা রাত্রিগুলির কথা ডানকানের মনে পড়ল। কিছুদিন বেকার অবস্থায় কেটেছিল তাব, সেই দিনগুলির কথাও মনে পড়ল। এই ভারতবর্ষ। এলাচ লবঙ্গর দেশ, মসলিন ও সোনাব দেশ, এই নাচের দেশ। আগুনের মতো গরম হয়ে উঠেছে হৃৎপিণ্ডটা। এই সোনার দেশে সবই প্রখর। প্রখর এব আকাশ, প্রখরা এর নারী। যেন একটি কবিতা। ময়ূরেব ডাকে ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়াল। সোনালি মখমলে নিপুণ তুলিতে টানা কালো ডোরাকাটা। মখমলের মতো মসৃণ উষ্ণস্পর্শ বলে আশা হয়। রানীর কণ্ঠের মালায় স্থান পাবার মতো ক্যাট্‌সআই পাথরে তৈরি চোখ, কী নরম, কী ভাস্বর সেই দৃষ্টি। কী অপূর্ব প্রাণনা, কী সর্বগ্রাসী নিথরা নেশা।

প্রথম নাচ থামলে ডানকান ইশারায় নাচওয়ালিকে ডাকল। কুর্নিশ করে নাচওয়ালি ফরাসেব নিচে গালচেয় বসল। ডানকান জেব থেকে একটা গিনি বাব করে দিল। নাচওযালি উঠতে যাচ্ছিল, হাতের ইশারায় তাকে বসতে বলে নিজের হাতে ভবে এক গ্লাস সুবা দিল। সুরাটুকু পান করে নাচওযালি বাজনার সুরে কুর্নিশ করে নাচতে নাচতে গালচের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল।

দ্বিতীয় নাচের পর পিয়েত্রো উঠে দাঁড়াল। রাজকুমার এবং ডানকানকে নিজের গাউটের কথা বলে তাদের অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে গেল। সম্মানিত অতিথিকে বিদায় দেবার জন্য হরদয়ালও উঠে গেল।

দেওয়ান-ভবনের ঘেরা গাড়ি-বারান্দাব নিচে পিয়েত্রোর পালকি। পিয়েত্রো সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালকির পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেওয়ান, শোনো'!

'দেওয়ান কাছে এলে পিয়েত্রো বলল, 'তুমি বাঘে-বলদে একঘাটে জল খাওয়ালে হে দেওয়ান। যাই বলো, ডানকান ছোকরা ভালো। দেখলাম ওব আগের লোকটিব মতো বদমেজাজি নয়। তা বেশ করেছ। কিন্তু হুঁশিয়াব থেকো, স্ত্রীলোক নিয়ে যেন নাচমহলে বচসা না-হয়। দেখলাম ডানকানের বেশ নেশা লেগেছে।

হরদয়াল হেসে বলল, 'আপনার পৃষ্ঠপোষকতা থেকে যেন বঞ্চিত না-হই'।

হরদয়াল ফিরে এসে দেখল ডানকান ও রাজচন্দ্র পাশাপাশি বসেছে। ডানকান ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা বলছে, রাজচন্দ্র তার উত্তর দিচ্ছে। সম্ভবত দ্বিতীয় নাচওয়ালি নাচবে, নতুন করে সুর বেঁধে নিচ্ছে যন্ত্রে। হরদয়াল ফরাসের একটি কোণে বসল।

দ্বিতীয় পর্যায়ে নাচ শুরু হল।

কোথায় যেন শোনা গেছে, পেশোয়াজ ওড়না মুসলমানযুগের আমদানি। কিন্তু তারও আগে নাচ ছিল। বৌদ্ধযুগে ছিল, স্বর্গে উর্বশীরা নাচত। কী রকম পোশাক ছিল তাদের নাচের? এ-নাচওয়ালিটির মতোই কি? সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়েদের মতো শাড়ি পরা, কোমরে মোটা একটি ফুলের মালা, হাতে ফুলের বলয়, গলায় ও কপালে ফুলের সাজ। যেন একটি গৃহস্থ-মেয়ে হাতের কাজ ফেলে নেচে উঠল। এই কথাগুলো রাজচন্দ্র চিন্তা করছিল তখন।

কিন্তু সে জানত না অর্ধ-অসংবৃত বাস এ-নাচের দুর্ঘটনা নয়, অঙ্গ ; নতুবা কাঁচুলিতে অত কারুকার্য থাকত না।

রাজচন্দ্র দেখল, হরদয়াল একসময়ে উঠে গেছে। ডেপুটি কখনও হাতের আড়ালে চোখ ঢাকছে,

কখনও দেখছে নাচ। ডানকান একটা রুমাল ছুঁড়ে দিল নাচওয়ালির দিকে।

কত রাত্রি পর্যন্ত আজ নাচ চলবে কে জানে। মনে হল আলোগুলো লালচে হয়ে আসছে। ডানকান ডান হাতের তর্জনী দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ফেলল।

আবার প্রথম নাচওয়ালির নাচ শুরু হল।

কিন্তু নাচের মাঝখানে ডানকান বলল, 'দুসরা কো বুলাও'।

প্রথম নাচওয়ালি যেন জানত এমনটা ঘটবে, সে নাচ বন্ধ করল না। দুসরা নাচওয়ালি মুখে আঁচল চেপে হাসতে হাসতে ডানকানের সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

ডানকান তাকে ফরাসে বসিয়ে সুরার পাত্র এগিয়ে দিল। নাচওয়ালি খিলখিল করে হেসে উঠল। ডানকান প্রথমে অবাক। তারপর সে-ও হাসিতে যোগ দিল।

নাচ থেমে গেছে। অতিথিরা চলে গেছে। দেওয়ান-ভবনের ভৃত্যরা নাচঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে বারান্দার আলো নিভিয়ে দিচ্ছে।

নিজের শোবার ঘরের বারান্দায় ম্লান আলোকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হরদয়াল ভৃত্যকে জল আনতে বলল। এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলই এখন প্রয়োজন তার। শীতের মাঝরাত্রি। কিছুক্ষণ আগে দেউড়িতে দারোয়ান দুটো বাজিয়েছে। সন্ধ্যার কলকোলাহল একেবারে মগ্ন হয়ে গেছে, দূর থেকে ঠাকুরদালানের একটা মৃদু শব্দ কানে আসছে।

ভৃত্য এলে তার হাত থেকে জলের গ্লাস নিয়ে এক চুমুকে গ্লাসটা নিঃশেষ করে হরদয়াল বলল, 'নেবু পেয়েছিলি তাহলে। বেশ, এবার দ্যাখ তো রূপচাঁদকে পাওয়া যায় কিনা'।

ভৃত্য চলে গেল।

মাথাটা টিপটিপ করছে। বারান্দার রেলিঙে হেলান দিয়ে হরদয়াল শিরশিরে বাতাসটা অনুভব করল।

সহজেই পাওয়া গেল রূপচাঁদকে।

'কুমার কোথায় রে রূপচাঁদ'?

'আজ্ঞে তাঁর খাসকামরায়'।

'আচ্ছা, যা'।

'কিছু বলবেন'?

'না, খোঁজ নিলাম'।

রূপচাঁদ চলে গেলে হরদয়ালের ভৃত্য বলল, 'রাত অনেক হয়েছে, এরপরে খাবেন কী করে'?

'খাওয়ার রাত আগেই পার হয়েছে'।

'কিছুই খাবেন না'?

'না। বালাপোশটা নিয়ে আয়। আর এই জামাজোড়া নিয়ে যা'।

ভৃত্য জামা নিয়ে গেল, বালাপোশ এনে দিল। হরদয়াল বালাপোশ গায়ে ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নামল।

এদিকে উৎসবের আলো নিভে গেলেও ঠাকুরদালানের পূজা মহাসমারোহেই চলছে। হোম হচ্ছে সেখানে। পূজারীদের অনতিদূরে রানী বসে আছেন। প্রতিমার দিকে তাঁর দৃষ্টি স্থির।

হরদয়াল একজন দাসীকে বলল, 'রানীমাকে জিগ্যেস করো, দেওয়ানের আর কাজ আছে নাকি'।

উত্তর দেবার জন্য রানী নিজেই উঠে এলেন। বারান্দার উপর থেকে হরদয়ালকে ডেনে বললেন, 'তোমার ওদিকের সব মিটেছে, হরদয়াল'?

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার পুজো মিটতে দেরি আছে। রাত অনেক হল, বিশ্রাম নিলেও পারতেন'।

'নিজের ছেলের মঙ্গলকামনায় এক রাত জাগলে মেয়েদের কিছু হয় না হরদয়াল। তোমার অতিথিরা

সবাই এসেছিল'?

'হ্যাঁ, মরেলগঞ্জের ডানকান এসেছিল, ডেপুটিও এসেছেন। পিয়েত্রো তো আসবেনই'।

'তাদের যথাযোগ্য সমাদর হয়েছিল তো'?

'আজ্ঞে হ্যাঁ। মরেলগঞ্জে রাজকুমারের নিমন্ত্রণ হয়েছে। সেখানে দু'এক দিনের মধ্যে নাচের মজলিস হবে'।

'এ বন্ধুত্ব কি চিরস্থায়ী করা যাবে'?

'আশা করা যাক। অন্তত তদন্তের কথাটা আর-কোনো প্রকারে কেউ তুলতে সাহস পাবে না'। চাপা গলায় হরদয়াল বলল।

রানী একটি মধুর হাসিতে হরদয়ালকে পুরস্কৃত করলেন।

রাজু বলল, 'রূপচাঁদ, মদ খেতে খারাপ নয় তো! আব-একটু খাওযাতে পারিস'?

'আজ্ঞে তা পারা যায়'।

'যা, নিয়ে আয়'।

রূপচাঁদ চলে গেল।

কিছুক্ষণ আগে আর-একটা ভৃত্যকে বলে তামাক সাজিয়েছে রাজু। সেটা পুড়ে পুডে সুগন্ধ ছড়াচ্ছিল। রুপোর টোপর ঢাকা কলকে। টোপরের গাযের ছিদ্রগুলো দিয়ে মধুরগন্ধী ধোঁয়া উঠছে।

রাজু ফুর্সির নলটায় মুখ দিয়ে। প্রথমে মিষ্টি স্বাদ লাগল, কিন্তু তারপরই বেদম কাশি এল।

ফুর্সিটা সরিয়ে রেখে সে জানলার পাশে দাঁড়াল। নিচে শামিয়ানাটা চোখে পড়ছে। বাঁ দিকের দরজা দিয়ে ব্যালকনিতে যাওয়া যায়। সেই ব্যালকনির নিচেই বাগান শুরু হয়েছে। এখন কিছুই চোখে পড়ছে না। অন্ধকারে অতিপরিচিত জিনিসের অবস্থান আন্দাজ করতে কষ্ট লাগে। বাগানের সেই ঘরগুলোব মধ্যে নাচওয়ালিরা এখন ঘুমুচ্ছে বোধ হয়।

চিন্তার একটা বাঁক নিয়ে নিজেই আবিষ্কার করে অবাক হল। কোনোদিন সে চেষ্টা কবেনি, নতুবা রাজপুরীর কোনো কোনো জানলা থেকে নয়নতারার বাড়িটা চোখে পড়ত, নিদেন ছাদে উঠলে তো বটেই। এখন আর সম্ভব নয়। দিনের বেলায় দেখা যাবে চেষ্টা করলে।

রূপচাঁদ একটা ছোট কালো মোটা বোতল ও গ্লাস নিয়ে এল।

'এনেছিস! তুই তো আচ্ছা ওস্তাদ! খুলবি নাকি'?

রূপচাঁদ বোতলটা খুলে গ্লাসে ঢেলে রাজুর সম্মুখে ধরল।

'কোথায় পেলি'? গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলল রাজু।

'দেওয়ানের বাবুর্চির কাছে। বলল, এর নাম শ্যাম্পেন'।

'এটাই খায় নাকি সকলে'?

'তা তো জানি না আজ্ঞা'।

'তুই খাস না'?

'না, আজ্ঞা'।

গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে তুলে আবার নামিয়ে নিল রাজু।

'ভারি মজা রে! কেউ আমাকে কোনোদিন নিষেধ করেনি। রূপচাঁদ, তুই মদ খাস নে'?

'কেউ খেতেও তো বলেনি'।

'বেশ কথা। তুই ভারি চালাক। (রাজু হাসল)। তাহলে খেতেও বলেনি, নিষেধও করেনি। আমি যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। খুব ইচ্ছে করছে'।

গ্লাসটা নিঃশেষ করে রূপচাঁদের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে রাজু বলল, 'মা কোথায় রে? পুজোর এখনও

অনেক দেরি নাকি'?

'হ্যাঁ, তা দেরি আছে'।

'আচ্ছা রূপু, তুই কি দেখেছিস নয়নতারা এসেছিল কিনা'?

'আজ্ঞে না, ঠাহর করিনি'।

'নয়নতারা আমার উপরে রাগ করছে কিনা বলতে পারিস'?

'আজ্ঞে তাও নয়'।

'না পারলি, না পারলি'! রাজু পালঙ্কে বসে বলল, 'আর একটু দে তো'।

'আরও'?

'দে না, আহাম্মক। দিব্যি একটা ঘুম দিলেই সেরে যাবে। আর তুই দেওয়ানের বাবুর্চিকে জিগ্যেস করে রাখবি, দেওয়ানের নেশা হলে কী খায়'।

'আজ্ঞে আচ্ছা'।

রাজুর মনে হল, আশ্চর্য এই নয়নতারা। এলেই-বা কী ক্ষতি ছিল। ওই যে মেয়েটি এতগুলো পুরুষের সম্মুখে নাচতে পারল মসলিন পরে, আর তুমি আমার সামনে পরতেই পারলে না, এত লজ্জা!

রূপচাঁদ দরজার কাছে বসেছিল। রাজু পালঙ্ক থেকে উঠে টেবিলের উপরে রাখা বোতল আর গ্লাসটা হাতে নিল।

'তুই যা ভাবছিস তা নয়। এই দ্যাখ কতটুকু'!

রাজু আধমাত্রা ঢেলে নিয়ে ধীরে ধীরে পান করল।

'এমন উৎসব আর-কোনো দিন হয়নি, না রে? আচ্ছা, তুই কি এর আগে এমন উৎসব এ-বাড়িতে হতে দেখেছিস'?

'আজ্ঞে না'।

রাজু তৃতীয়বার তামাকের কাছে গেল। কিন্তু এবার তার সাহস হয়েছে, দু-তিনবার টান দিল নলটায়।

'দ্যাখ রূপচাঁদ, ঘুম আসছে না। একটু ঘুরে এলে কেমন হয়'?

রূপচাঁদ বাইরের অন্ধকারের কথা তুলল। প্রত্যুত্তরে হাসিমুখে রাজচন্দ্র সন্ধ্যায় শোনা সুন্দরের অভিসারের কথা বলল। রূপচাঁদ নিষেধের দ্বিতীয় যুক্তি তুলে বলল, 'রানীমার অনুমতি না-নিয়ে বাইরে যাওয়া উচিত নয়'।

রাজু বলল, 'যাব আর আসব। ততক্ষণে তোর পুজোও শেষ হবে না'।

সদর-দরজা পার হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রূপচাঁদ বলল, 'আজ্ঞে এটা পথ নয়'।

'তুই আমার চাইতে বেশি জানিস'?

রূপচাঁদ প্রমাদ গুনল। নেশা হয়েছে সন্দেহ কী। বাগানের সেই ঘরগুলোতে যাবার পথ এটা নয় তো রাজকুমারের নেশার ঝোঁকে ঠাহর হচ্ছে না।

কিছুদূর গিয়ে রাজু বলল, 'তুই বিয়ে করেছিস রূপচাঁদ'?

'আজ্ঞে'। অন্ধকারে রূপচাঁদের মাথা-চুলকানো দেখা গেল না।

'তোর বউ তোকে খুব ভালোবাসে? ওই বিদ্যার মতো'?

'আজ্ঞে ওনারা দেবতা'।

'দেবতা কি রে আহাম্মক। ওরা তো আমাদের মতোই মানুষ'।

'হুজুর, এটা বাগানের পথ নয়'।

'তা আমি জানি। যদি তোর ভয় করে তাহলে বলবি—কালু ইন্নু আলহে ইন্নু এলাহে'।

'ওটা কী হুজুর'?

'আলি খাঁ আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিল, ভয়ের সময় ওটা বললে আর ভয় থাকে না। কী ভালোই

আমাকে বাসত আলি খাঁ। পৃথিবীতে এক মা ছাড়া অত ভালো কেউ বাসে না'।

রাজু বুঝতে পারেনি, কিন্তু তার মস্তিষ্কে সুরা ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করছিল।

আরো কিছুদূর যাবার পর রাজু বলল, 'রূপচাঁদ, এবার ফিরে যা'।

'আজ্ঞে আপনাকে একা ছেড়ে দিয়ে যাব কী, হুজুর'!

'যাবি না? যেতেই হবে'।

'আজ্ঞে তা হয় না। বেড়ানো হয়েছে, এবার চলুন'।

'না-যদি যাবি তাহলে আমি অন্ধকারে একদিকে চলে যাব, সারা রাতে খুঁজেও পাবি না, যা বলছি'!

রূপচাঁদ 'আজ্ঞে' বলে চলে গেল।

নয়নতারার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রাজু সহসা ডাকতে পারল না নয়নকে। এতক্ষণ পথে হাসি-তামাশায় কাটিয়ে দিয়েছে, রূপচাঁদ চলে যাবার পরই তার মনের একটা অংশ ফিরে যেতে চেয়েছিল। তার প্রায়-কিশোর মনে সুন্দরের অভিসারের দুঃসাহসিকতাটা কাজ করছিল, নিজেকে সুন্দর বলে ভাবতে মন্দ লাগে না। কিন্তু সে শুনেছে, সবটুকু বুঝতে না-পারলেও ; অভিনয়ের একান্ত আদিরসাত্মক ইঙ্গিতগুলো তার মনে গিয়ে অভূতপূর্ব অনুভবের সৃষ্টি করেছিল। হঠাৎ নয়নতারাকে ডাকতে গিয়েই সেসব মনে পড়ল। পথে চলার লঘুতা হারিয়ে তার মনের বয়স একমুহূর্তে বেড়ে গেল। কী-একটা অজ্ঞাত উৎকণ্ঠায় তার গলার ভেতরটা শুকিয়ে উঠল।

'নয়নতারা, নয়ন, নয়ন'!

নয়নতারা উঠে বসে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না।

'নয়ন'!

নয়নতারা গলার স্বর চিনতে পেরে দরজা খুলে দিল।

'রাজকুমার, এই রাতে'?

রাজুর মনে হল বলবে—তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে এলাম।

কিন্তু আদৌ বলতে পারল না, একান্ত ব্যথিতের ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে নয়নতারার বুক ঘেঁষে দাঁড়াল।

'বোসো'।

নয়নতারা নিজেও যেন কথা হারিয়ে ফেলল। কয়েক দিন আগে অভিমান করে চলে গিয়েছিল—সে-কথাও সে বলতে পারল না।

'বোসো'।

রাজকুমারকে পালঙ্কে বসল। নয়নতারা ঘরের প্রদীপটা বাড়িয়ে দিয়ে এল। সুরার গন্ধ রাজকুমারের দেহের সুঘ্রাণগুলিকে ছাড়িয়ে উঠেছিল। নয়নতারা সহসা রাজকুমারের মুখের দিকে চাইতে পারল না। একবার তার মনে হল সে চোখ দুটি যেন নেশায় বিহ্বল।

নয়নতারা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি শোও, আমি আসছি'।

বাইরে এসে নয়নতারা অন্ধকাবে বারান্দার এক কোণে বসল। কী ভাববে সে। ভাবতে যেন জোর পাচ্ছে না। অনেকক্ষণ সে আকাশের দিকে, অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল।

ঘরে এসে দেখল, রাজকুমার বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কপট নিদ্রা নয়। তবু, পরীক্ষা করার জন্য একটু শব্দ করে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। প্রদীপটা কমাতে গিয়ে নিভিয়ে ফেলল। কেমন একটা ম্লান আলো ওদিকের খোলা জানলাটার গায়ে। নয়নতারা বিছানার একপাশে অতি সন্তর্পণে বসল। কপট নয় রাজুর নিদ্রা।

নয়নতারা বিছানায় শুয়ে পড়ল। পরে একটু সাহস করে একটু কোমলতা অনুভব করে রাজকুমারের দখল-করা বালিশটার এক কোণে মাথা রেখে সে-ও ঘুমিয়ে পড়ল।

৮

পিয়েত্রো এত সহজে রাজি হবে কল্পনা করা যায়নি। কিন্তু বিষয়টা যার কাছে নিছক অনুমোদনের ব্যাপার সে রাজি হল না। মরেলগঞ্জের ডানকান আপত্তি করল।

পিয়েত্রোর আপত্তিতে যুক্তি ছিল, ডানকানের আপত্তিতে ছিল জোরে জোরে বলা তার মতামতমাত্র।

পিয়েত্রো ফুর্সিতে মুখ রেখে পদ্মার উপরের আকাশে মেঘের সঞ্চালন লক্ষ্য করতে করতে বলল, 'কী প্রয়োজন? তুমি ভেব না দেওয়ান, ইংরেজ আমার এখনও জাতশত্রু। আমি জানি দ্যুপ্লের সময়ে একটা ভুল করেছে ফরাসিজাতি, দ্বিতীয়বার ভুল করে পলাশিতে। এখন দ্যুপ্লের সময় ফিরে পাওয়া আর সম্ভব নয়। যদি তুমি আমাকে বলতে ফরাসি শেখার জন্য স্কুল করবে, আমি আপত্তি করতাম। কেন করবে? কী তোমার যুক্তি? তুমি কি মনে করো কোনো বিষয়েই ভারতীয়দের চাইতে বেশি অগ্রসর ইংরেজ কিংবা ফরাসি'?

নিজে ভারতীয় হয়ে অভারতীয়ের মুখের প্রশংসাকে প্রত্যাখ্যান এবং অস্বীকার করতে দেওয়ান একটু দ্বিধা বোধ করল, কিন্তু তার সাহসের অভাব নেই। সে বললে, 'ফরাসি ভাষার কথা আমার জানা নেই, কিন্তু শেলি কীটস-এর তুলনাই কি সংস্কৃতে আছে, শেকসপীয়র মিলটনের কথা না-হয় নাই তুললাম'।

'তুমি কি বিশ্বাস করো না একটি মহাভারত শেকসপীয়রের সবগুলি নাটকের সমান। শেকসপীয়রের নাটক পড়ার জন্য যতখানি শ্রম করেছ, ততখানি শ্রম কি মহাভারতের জন্য করেছ? মহাভারতে যতগুলি চরিত্র আছে ততগুলি চরিত্র তেমনি জীবন্ত হয়ে কি শেকসপীয়রে আছে'?

পিয়েত্রোর সায়াহ্নের সুরা এল। দেওয়ানের ও নিজের মাঝখানে সুরার সরঞ্জামগুলো রেখে পিয়েত্রো বলল, 'কলকাতায় খুব বড় একটা আন্দোলন চলছে জানো'?

'কোন আন্দোলনের কথা বলছেন? বিধবা-বিবাহ কি'?

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। তোমাদের অনেকের মনে হয়েছে বিধবা-বিবাহটা প্রচলিত করার মূলে নারীজাতির স্বাধিকার স্বীকার করে নেবার যে-প্রবৃত্তি সেটা পেয়েছ ইংরেজজাতির কাছে। এটা কি সত্যি? বিধবা-বিবাহ কি তোমাদের দেশে অচল ছিল? রামায়ণেও বিধবা-বিবাহের নজির আছে। মুসলমানদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ সুপ্রচলিত। তবু ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা কেন বড়াই করো, তোমাদের জ্ঞান হয়েছে বলেই এমন করছ'।

'অতীতে ছিল এও যদি স্বীকার করে নিই, ইংরেজরা আমাদের সেই নষ্ট জ্ঞান ফিরিয়ে না-দিলে আমরা অতীতে যা আছে তাও লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করতাম। হতভাগিনীদের পুড়িয়েই মারতাম'।

'কথাটা ঠিক হল না দেওয়ান। তোমাদের সমাজের উপরের তলায় বিধবা-বিবাহ ছিল না, কিন্তু দুলে-বাগ্দি এদের মধ্যে'?

'ছিল এবং আছে'।

'তাহলে এটাই প্রমাণ হয় সমাজের রুচির মান ও তার শাসনের ভয় যাদের কাছে বড় তারাই এ-বিষয়ে পরাঙ্মুখ ছিল। সমাজের শাসন বড় ভয়ংকর। তার ভয়ে মানুষ গোপনেও একটা কাজ সহসা করতে পারে না। সমাজের বিধানই ন্যায়-অন্যায়ের মান। নতুবা ন্যায়-অন্যায়ের কোনো মানই নেই। তোমরা জ্ঞান লাভ করে এই হৈ-চৈ করছ তা নয়। পৃষ্ঠপোষক পেয়েছ ইংরেজদের মধ্যে। কলকাতায় এক নতুন সমাজ তৈরি হচ্ছে। সেই নতুন সমাজের নেতা ইংরেজ এবং ইংরেজের নুনের ব্যবসায়ের বেনিয়ানরা। কাজেই তারা যেটাকে নিন্দা করে না সেটাকে তোমরাও অন্যায় বলো না'।

'আপনার যুক্তিগুলো প্রখর কিন্তু ঘাতসহ নয়। প্রাচীন শাস্ত্রে ভালো যা আছে তা গ্রহণ করার মন তৈরি করছে ইংরেজি শিক্ষা, যেমন দিয়েছে সে-শাস্ত্রের অধিকাংশই যে এ-যুগের পক্ষে অপ্রয়োজনের—

এই চিন্তা করার সাহস'।

'বেশ তো, তোমরা যখন শিখেছ আর অন্য লোকের নতুন করে শেখার দরকার কী? তোমরা এবার ব্যাখ্যা করো। একটি ব্যাপারে লক্ষ্য রেখো দেওয়ান, ওদের দেশের স্কুলে নতুন শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু নিজের দেশের পুরনো বিষয়গুলিকে ওরা অশ্রদ্ধা করে না। ওরা যত অগ্রসর হয় প্রাচীনকে তত শ্রদ্ধা জানায়'।

কিন্তু শুধু তর্কই করে যাবে এমন লোক পিয়েত্রো নয়। হঠাৎ একসময়ে প্রায় তর্কের মাঝখানে বলল সে, 'তোমার মত বদলায়নি, দেওয়ান'?

'কী করে বদলায় বলুন'?

'তা যদি না-বদলে থাকে তবে তুমি স্কুল করো। প্রথমে ছেলেরা পড়ুক। তারপর মেয়েরা আসবে। একেবারে শিক্ষা না-হওয়ার থেকে ইংরেজি শিক্ষাও ভালো। জ্ঞান না-বাড়ে বুদ্ধি বাড়ুক, অন্তত ভালো বন্দুক তৈরি করতে শিখুক'।

দেওয়ান আলোচনার আকস্মিক গতি-পরিবর্তনে বিস্মিত হল। কিন্তু তখন-তখনই কাজের কথায় ফিরে এল, বলল, 'তাহলে আপনার সহায়তা পাচ্ছি'।

'কী করতে হবে আমাকে, বলো'।

'জায়গা-জমি দিতে হবে'।-

'জায়গা, আমার জায়গা কোথায়? মাত্র ছ'ফিট অবশিষ্ট'।

'কে খাবে এতসব? পাঁচ ভূতে লুটবে তো'।

'মিথ্যা বলোনি। তা, কোন জায়গা তোমার দরকার'?

'গঞ্জের পাশে আপনার তাঁতিদের খালি ভিটেগুলো'।

'তা বটে, তাঁতিরা আর ফিরবে না। দিতে পারি'।

একটু চিন্তা করল পিয়েত্রো। অর্ধপূর্ণ গ্লাসটা ঠোঁটে লাগিয়ে আবো খানিকটা চিন্তা কবল। তারপর বলল, 'দিতে পারি একটি শর্তে...'

'কী শর্ত'?

'স্কুলের নাম কী রাখবে স্থির করলে'?

'এখনও স্থির হয়নি'।

'যদি স্কুলের নাম রাখো জ্ঞানদা-সভা'।

'ওটা মানায় না। জ্ঞানদায়িনী সভা বললে তবু মন্দ হয় না'।

'তা হলে জ্ঞানদা-স্কুল নাম রাখো না'।

'তা রাখা যায়, জ্ঞানদা হাই ইংলিশ স্কুল। এই আপনার শর্ত নাকি'?

'শর্ত আর কী? বললাম, খেয়াল হল। তা নিয়ো জায়গাটা। লিখে-পড়ে দিতে হবে নাকি'?

'ভালো হয় তাহলে'।

'দেব। জ্ঞানদা-স্কুলের নামে লিখে দেব'।

নিজে উদ্যোক্তা অথচ কী নাম হবে বিদ্যালয়ের সে-বিষয়ে কিছুমাত্র আগ্রহ দেখাল না হরদয়াল। আগ্রহ থাকলে সে জিগ্যেস করতে পারত—জ্ঞানদা কি কারো নাম? সে-রকম প্রশ্ন করলে হয়তো পিয়েত্রো উত্তর দিত—হ্যাঁ, একজনের নাম। কিন্তু তার পরিচয় দিয়ে লাভ নেই, তোমরা চিনতে পারবে না।

হরদয়াল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাহলে কাল একবার গিয়ে জায়গাটা দেখুন। আমি আসব। কী রকম ভাবে ঘরগুলো তোলা যায় তার আলোচনা করা যাবে'।

কিন্তু ডানকানের মতিগতি বোঝা দুঃসাধ্য।

হরদয়ালের বক্তব্যে স্কুল কথাটা উচ্চারিত হওয়ামাত্র সে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল।

স্কুলটার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছিল হরদয়াল, চুরুট চিবোতে চিবোতে ডানকান হোয়াইট শুনছিল। তার নিজের দেওয়ান সিংমশাইও উপস্থিত ছিলেন।

হরদয়াল বলল, 'দেখুন, সাহেব, ইংরেজজাতি যেদিন পলাশিতে দাঙ্গায় অংশ নিয়েছিল সেদিনই ভারতের সুপ্রভাত হল। এত বড় একটি বাঙালি জাতি সেদিন নিশ্চিন্ত হবার অবকাশ পেল। মাৎস্যন্যায় শেষ হল'।

'দ্যাটস অল রাইট'।

'সুশাসনের গুণে মানুষ তার সৎপ্রবৃত্তিগুলির উন্মেষের সুযোগ পাচ্ছে। রাজা বদলালেই যুদ্ধ, রাজা বদলালেই আইন বদলানো—এসব অত্যাচারের হাত থেকে বাঙালিজাতি বেঁচেছে'।

'হোয়াট দেন'?

'ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাঙালিজাতি সংস্কৃতিবান হয়ে উঠবে এমন সূচনা দেখা দিয়েছে'।

'রাইট এগেন'।

'যে-আলোয় কলকাতা উদ্ভাসিত সে-আলো আপনার চারদিকেও প্রতিভাত হোক'।

'ইউ রাইট দু টু অথরিটিস ইন ক্যালকাটা'।

'তাঁরা নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন, কিন্তু খানিকটা সেল্ফ-হেল্প দরকার বইকি। আমরা প্রাথমিক চেষ্টা করি। তারপর তাঁরা বাকিটুকু করবেন। বীটন যা কলকাতায় করেছিলেন আপনি এই অঞ্চলে তাই করুন। আমাদের জেলার সদরে এখন হাই স্কুল স্থাপিত হয়নি'।

'বীটন ওঅজ এ ব্যাড মার্চেন্ট'।

'ব্যবসায়ী হিসেবে সে-ভদ্রলোক আপনার স্টিরাপ ধরারও উপযুক্ত নন। কিন্তু ক্রিশ্চিয়ান চ্যারিটির কথা মনে করলে যে-কোনো ফাদারের চাইতে তিনি কম নন'।

'ডোন্ট ইউ ফাদার মি টু মাই ফেস [আমার মুখের সামনে ফাদার ফাদার কোরো না]। সাহেবের আকস্মিক ক্রোধে হরদয়াল হকচকিয়ে গেল। চুরুটে দাঁতের চাপ দিয়ে ডানকান বলল, 'আই হেট ফাদারস অ্যান্ড রেভারেন্ডস'।

হরদযাল ভাবল এটা সময়োচিত হয়নি, তার এই আসাটা। সে ফাদার লং-এর কথা বলতে যাচ্ছিল। এখন ভাবল, ভাগ্যে বলেনি।

কিন্তু হরদয়াল সাহেবের প্রজা নয়। প্রতিবেশী এক দুর্দান্ত জমিদারের ম্যানেজার। তাবও নখদন্ত আছে। তাছাড়া, আপদে-বিপদে সাহায্য করতে পারার শক্তি আছে তার।

ডানকান বললে, 'ডেওয়ান, তোমার কথায় আমি বিলকুল রাজি, কনডিশান—তোমার স্কুলে ইংরাজি পড়াতে পারবে না'।

হরদয়াল সাহেবের মনের গতিটা বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল। সাহেব হরদয়ালের কাছে প্রতিবাদ না-পেয়ে বক্তৃতার উদ্দীপ্ত হয়ে বললে, 'ইংলিশ এডুকেশন হ্যাজ এন্টার্ড ইনটু দ হেড। ইউ হ্যাভ হ্যাড টু মাচ অব ইট'।

সাহেব যা বললে তার সারমর্ম এই : কলকাতা থেকে খানকয়েক চিঠি পেয়েছে সে। যারা একসময়ে ইংরেজি শিখে ইংরেজদের ভক্তি করত তারা অতিরিক্ত আদরে মাথায় চড়ে বসেছে। এরকম হয়েই থাকে। প্রভুজাতি যদি নিগারদের মাথায় তুলে নাচে তবে নিগারদের ধারণা হয় তারাও প্রভুদের সমকক্ষ। খানাপিনা মেলামেশার ফল এইসব। হরিশ মুখুজ্জেদের মতো লোককে শায়েস্তা করতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি কোনো কোনো আহাম্মক পরনিন্দা-বিশারদ পাদরি এর পেছনে আছে। মোট কথা, ইংরেজি শেখার ফলে ইংরেজদের মুখের সামনে দাঁড়িয়ে ব্লাডি নিগাররা কথা বলতে শিখেছে। মেকলে আর-এক ইডিয়ট ছিল। কৃষকরা, চাষিরা আজ তাদের প্রভুকে সমালোচনা করতে শিখেছে।

হরদয়ালের চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল। এমনকী দেওয়ান সিং-এর মুখোশ-পরা মুখেও ঠোঁটের কোণগুলো আকুঞ্চিত হল।

কিন্তু হরদয়ালের মুখ পলকে আবার তার স্বাভাবিক রং ফিরে পেল। সে বলল, 'কিন্তু সাহেব, বিট্‌উইন ইউ অ্যান্ড মি, এদেশের এই লোকগুলি এবং আপনাদের শাসকজাতির মাঝখানে এমন একদল এদেশীয় লোক দরকার যারা শিক্ষা-দীক্ষায়, ধ্যান-ধারণায় আপনাদের অনুকরণ করে, এবং আপনাদের শাসন এদেশের কাছে প্রিয় করে তোলার চেষ্টা করে'।

সাহেব বলল, 'হুঁ'!

হরদয়াল বলল, 'তাছাড়া, ভগবান না-করুন, হঠাৎ কিছু ঘটলে হোম থেকে সৈন্য ও শাসকের জাহাজ পৌঁছনোর আগে এরা আপনাদের সাহায্য করবে'।

হরদয়ালের চোখের কোনায় অত্যন্ত ধারালো, অত্যন্ত বাঁকা, জেবে লুকিয়ে দরবারে যাওয়া যায় এমন একটি হাসি দেখা দিল।

সাহেব বলল, 'হুঃ'!

হরদয়াল সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আচ্ছা সাহেব, আমি চলি'।

সাহেব হরদয়ালের উঠে দাঁড়ানো দেখে যেন সংবিৎ ফিরে পেলো, 'মাই ডিয়ার হৃদলাল, আমার কথায় নিশ্চয়ই তুমি ভুল বোঝোনি। উই আর গুড নেবারস অ্যান্ড উইল রিমেইন সো'!

হরদয়াল বলল, 'অনেস্ট ডিফারেন্স অব ওপিনিয়ন দেয়ার মাস্ট বি। সে যা-হোক, আপনি যে খোলাখুলি আপনার মত জানিয়েছেন এজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ'।

ডানকানের বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে হরদয়াল সাহেব কুঠির দরজা পর্যন্ত মাথা নিচু করে হেঁটে গেল। তার ক্রোধটার পাত্র খুঁজে পাচ্ছে না, অপমানবোধে তার মনটা অবিরত জ্বালা করছে। লাগামে হাত দিয়ে সে পা বাড়াতে যাবে এমন সময়ে সিংমশাই তার কাঁধে হাত রাখলেন।

'দেওয়ানজি'!

হরদয়াল ঘুরে দাঁড়াল।

'সাহেব বললেন, যদি কোনো ইংরেজ বা আর্মানি টিচার না-আনেন স্কুলে এবং পাঠ্যবিষয় ঠিক করার সময়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে নেন তবে স্কুল বসানোতে তত অমত নেই তাঁর'।

হরদয়াল বলল, 'আচ্ছা, ভেবে দেখব'।

সিং বললেন, 'সাহেবের রাগ করার কারণ আছে। নীলচাষিদের নিয়ে কলকাতায় একটা গোলমাল শুরু হয়েছে। ইংরেজি-জানা এদেশি লোকরাই সেসব গোলমালের নেতা'।

হরদয়াল বলল, 'তাই নাকি? আমি খবর নেব। এসব কারণেই একটা ডাকঘর গ্রামে বসানো হয়েছে, খবরাখবর পেতে ভারি বেগ পেতে হয়। আচ্ছা, নমস্কার'। হরদয়াল ঘোড়ায় চাপল।

৯

দরবারি প্রথায় খবরাখবর করে দেওয়ান রানীর কাছে দরবার করতে গেল।

রানী বললেন, 'এসো, এত জাঁকজমক কেন এটুকু পথ আসতে'?

'নিজের জন্য দরবার করতে এসেছি'।

'জায়গির চাই'? রানী হাসলেন।

'জায়গিরদার হবার মতো যোগ্যতা আমার নেই। আমি মাসমাহিনায় কাজ করতেই ভালোবাসি'।

'তাহলে বেতন বাড়াতে হবে'?

'আজ্ঞে তা-ও নয়। একটা স্কুল স্থাপন করার চেষ্টা করছি'।

'সেখানে কী হবে'?

'দেশের ছেলেমেয়েরা ইংরেজি শিখবে'।

'শুধু ছেলেরা নয়, মেয়েরাও'?

'আপনি অনুমতি করলেই হয়'।

'ইংরেজি শিখে লাভ হবে বলে তোমার মনে হয়'?

'তা হবে'।

'বেশ, যদি প্রজাসাধারণের উপকার হয়, করো। আমাকে কী করতে হবে'?

'আজ্ঞে স্কুলের শিক্ষকদের বেতনটা আপনাকে বহন করতে হবে'।

'কত হবে'?

'আপনার দেওয়ানের বেতনের অর্ধেক। সদর-নায়েবের উপরে যে-পদটা তৈরি করার কথা হয়েছিল সেটা বন্ধ থাক'।

'তোমার কষ্ট হবে তো'!

'এক-আধ ঘণ্টা বেশি খাটতে হবে'।

'তাহলে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এরকম একটা ব্যাপার করতে যাচ্ছ, প্রতিবেশীদের মতামত নিতে হয়'।

হরদয়াল বললে, 'পিয়েত্রোর মত আছে। প্রথমে আপত্তি করলেও পরে মত দিয়েছেন। স্কুলবাড়িটা তাঁর জমির উপরেই হবে'।

'কেন, তার কী দরকার ছিল'?

'গঞ্জের মাঝখানে হয়। আশপাশের গ্রামগুলি থেকে ছাত্রদের সমান দূর পড়বে'।

'তাহলে আর কী। সবই তো ঠিক হয়েছে'।

'ডানকান আপত্তি করছে'।

'কেন? সে তো নিজে ইংরেজ শুনেছি'।

'লোকটা আসলে লেখাপড়া খুব জানে না। ওদের দেশের স্কুলে পাস করা। কলেজের মুখও দেখেনি। প্রায় আমারই মতো'।

'কী বলে'?

'বলে, ইংরেজি পড়ানোর জন্য ইংরেজ মাস্টার না-আনলে তিনি মত দেবেন'।

'ডানকানের অমতে চলতে তুমি সাহস পাও'?

'মত করাতে হবে। দেখি'।

হরদয়াল অন্যমনস্ক হয়ে ভাবল।

রানী বললেন, 'পিয়েত্রোকে দিয়ে বলাও-না কেন'।

'সে আর-এক মুশকিল। দুজনে একসঙ্গে হলে দুজনের মত এক হয়ে যাবে। কিংবা মতের পার্থক্য গ্রামগুলির স্বাভাবিক জীবনযাত্রাই বন্ধ করে দেবে'।

'এ ব্যাপারেও রাজনীতি আছে তাহলে। কিন্তু পিয়েত্রো যখন মত দিয়েছে অগ্রসর হও'।

'আপনার অনুমতি পাব আমি জানতাম। জেলার সদরে যা হয়নি তেমনি একটা স্কুলই আমরা স্থাপন করব। একটু মুশকিল লাগছে'।

'আবার কী মুশকিল'?

'পিয়েত্রো এক বায়না ধরেছেন। স্কুলের একটা নামকরণ করেছেন। অবশ্য যে-নাম দেওয়া হবে তাই থাকবে এমন হয় না। নাম বদলে যায়। লোকের মুখে মুখে গ্রামের নামে স্কুলের নাম হয়, মাস্টারের

নামে স্কুলের নাম হয়'।

'পিয়েত্রো কী নাম দিতে চাচ্ছে'?

'বলছে, জ্ঞানদা-সভা'।

'অদ্ভুত নাম তো। বিদেশি লোক, ওর কল্পনায় এর চাইতে ভালো নাম কী করে আসবে'।

'আমার মনে হল, সভার বদলে বিদ্যাপীঠ কথাটা বললে মন্দ হয় না'।

রানীর চোখের দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ হল যে তার চেষ্টায় তাঁর ভ্রূ দুটি ও মুখের কয়েকটি পেশিও কুঞ্চিত হল। হরদয়াল জানে বিদ্রূপ করার সময় কখনও-কখনও ভ্রূ এমন করেই কুঞ্চিত হয় রানীর, সে-কুঞ্চন নাসিকায় নেমে এসে পক্ষ্ম দুটিকে একটু বিস্ফারিত করে অবশেষে ঠোঁটে তীর্যক হাসি হয়ে ফুটে ওঠে। কিন্তু বিদ্রূপ নয়, ভ্রূ দুটি কুঞ্চিত হয়েই রইল, চোখের তারা দুটি ঈষৎ সংকুচিত হল, তারপর স্বাভাবিক হল দৃষ্টি। যেমন একটি কৌতুক-সমস্যার সমাধান হল অবশেষে।

'জ্ঞানদা বিদ্যাপীঠ'? রানী প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ। তাহলে পিয়েত্রোর প্রস্তাবের মানও রাখা হল। নামটাও ওরই মধ্যে একটু ভালো করা গেল'।

তীক্ষ্ণধার তরবারিটা পরীক্ষা করার জন্য তার ধারের উপর দিয়ে আঙুল চালানো যেমন সাহস এবং কৌশলের কাজ, তেমনি কৌশলে এবং তার চাইতেও বেশি সাহসভরে রানী একটি প্রশ্ন করে বসলেন। যেন দরবার শেষ হয়েছে এমন ভঙ্গিতেই উঠে দাঁড়িয়ে রানী প্রশ্ন করলেন, 'জ্ঞানদা কারো নাম নয় তো'?

'না—তা কী করে হবে! আপনার এ-রকম সন্দেহ হল কেন? তা সন্দেহ হয় বটে। নতুবা স্কুলের নামেই জমি দান করার শর্ত কে করে। এ যদি পিয়েত্রো না-হয়ে আর কেউ হতো তবে আপনার সন্দেহ যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হতো, কিন্তু পিয়েত্রোর প্রিয়জনের নাম জ্ঞানদা হবে এ সম্ভব হয় না। গুইনেভি, গুইনিভার ইত্যাদি হলে হতো। কী বলেন'?

'তাই হবে। খেয়ালি লোক। খেয়ালের মাথায় বলেছে'। বলতে বলতে রানী আকস্মিকভাবে চলে গেলেন।

হরদয়াল নিজের ঘরে ফিরে এসে বিশ্রাম করতে করতে ভাবল : পিয়েত্রো রাজি হয়েছে। রানী রাজি হয়েছেন। ডানকান রাজি না-হয়েও রাজিই হয়েছে। বহুদিনের একটি উচ্চাশা পূরণ হবে। হোক, জ্ঞানদা বিদ্যাপীঠই নাম হোক। মহারানী বিদ্যালয় বা রানীমাতা বিদ্যাভবন এমন যেসব নামের কল্পনা করেছিল হরদয়াল, তার চাইতে জ্ঞানদাবিদ্যাপীঠই-বা এমন কী খারাপ নাম? রানী যে-রকম সন্দেহ করছেন তাই যদি হয়, জ্ঞানদা যদি কারো নামও হয় তাতেই-বা ক্ষতি কী!

আপাতত ইটের গাঁথুনি দিয়ে পাকা বাড়ি তুলে দেওয়া যাবে না। তোড়জোড় করে ইট চুন সুরকি এনে জমা করে কাজে লাগিয়ে দিতে দিতে তিন-চার মাস। কাজ শেষ হতে ছ মাস। প্রায় এক বছর পরে ছাড়া স্কুল চালু করা যাবে না। তার চাইতে কাঠের কাঠামোয় আটচালা উঠুক। ভিত পাকা করা হোক। স্কুল চালু হোক।

আর শিক্ষক। শিক্ষকের জন্য একটু চিন্তা সে আগেই করে রেখেছিল। প্রাথমিক আলোচনাও হয়েছে পত্র মারফত। বন্ধুকে লিখেছিল, সে জবাবে বলেছে—দুশো টাকায় একজন ভালো হেডমাস্টারই পাওয়া যাবে। কিন্তু বন্ধু প্রশ্ন করেছিল, একই হেডমাস্টার কী করে ছেলেদের এবং মেয়েদের স্কুলে হেডমাস্টারি করবে। বন্ধুকে এ-চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি। তখনও স্কুল স্থাপন করা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে পারেনি হরদয়াল।

তখনকার দিনে হরদয়ালরা চা খেত না। তার একটি প্রিয় পাঞ্চ ছিল। ব্র্যান্ডি, নেবুরস, চিনি আর

গরম জল। মাত্রাগুলি তার নিজের ঠিক করা। আজ পরিশ্রম বেশি হয়েছে। বাবুর্চিকে পাঞ্চ মেশাতে বলে আরামকেদারায় শুয়ে ভাবছিল সে। পাঞ্চ এলে সে আরামকেদারাতেই উঠে বসল।

বন্ধুকে চিঠি লিখল হরদয়াল :

তোমাকে পূর্বে যে প্রকার সমাচার দিয়াছিলাম তাহার পর লিখি এখানকার স্কুল স্থাপন বিষয়ে অধুনা নিশ্চিত হইয়াছি। পিয়েত্রোসাহেব আপন বদান্যতাবশত স্কুলবাটির নিমিত্ত জমি ছাড়িয়া দিবেন। আমার প্রভুপত্নী শিক্ষক মহাশয়দিগের বেতন বহন করিতে রাজি হইয়াছেন। অর্থসাহায্যের কারণ—কালেক্টর মহোদয়ের সাহায্যত গভর্নর কৌন্সেলেও একখানি দরখাস্ত পেশ করিব ভাবিয়াছি।

আমার পূর্বের প্রস্তাব মতো লিখি, তুমি অগৌণে একজন প্রধানশিক্ষক পদের উপযুক্ত উচ্চশিক্ষিত ভদ্রব্যক্তিকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবে। তাঁহাকে অবশ্য ইংরাজি ভাষায় জ্ঞান বিতরণের যোগ্যতা রাখিতে হইবে। তাহা অপেক্ষাও বড় প্রয়োজন, তাঁহাকে বিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ হইতে হইবে। পুরাকালে শুনিয়াছি একটিমাত্র গুরুকে কেন্দ্র করিয়া বহু বিদ্যার্থী জ্ঞান লাভ করিত। আমার বাসনা, তোমার প্রেরিত প্রধান শিক্ষক সেইরূপ কুলাধ্যক্ষের স্থান গ্রহণ করিতে পাবিবেন।...

কোন কথায় কী মনে পড়ে যায়। হরদয়াল বন্ধুকে চিঠি লিখে টেবিলের আলোটা কমিয়ে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। লোকের মুখে বহুবার শুনে যা পুরনো হয়ে গেছে সেই কথাটি নতুন করে মনে পড়ে গেল প্রথমবার শোনার বিস্ময় ও আনন্দ বিচ্ছুরিত করে।

কলকাতার লাল সুরকির পথ দিয়ে পালকি যাচ্ছে। কলেজ থেকে এ-সময়ে পালকি বেরিয়েছে, বীটনসাহেব ছাড়া কেউ নয়। একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে পালকির পাশে পাশে দৌড়চ্ছে। দুপুর-রোদে ছেলেটি ঘর্মাক্ত! তার মলিন ধুতি ও মলিনতর উড়ুনির অসংবৃত অবস্থা। পালকির আরোহী ছেলেটির থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে ডানদিকে মুখ করলেন। ছেলেটি দৌড়ে পালকির ওপাশে গিয়ে সাহেবের চোখে পড়ার চেষ্টা করল—মি পুয়োর বয় স্যার। মি টেক স্কুল, ভেরি ভেরি পুয়োর স্যার। বীটন হেসে ফেললেন। রোদে তপ্ত গোরার লাল মুখে মেয়েলি হাসি। আরো কিছুদূর যাবার পর বীটন কথা বলতে বাধ্য হলেন—সি মি টুমরো। কাল ডেকা করিয়ো।

হরদয়ালের মনে হল বাজারের ছেলেরা তার জামা ধরে টানছে : দেওয়ানসাহেব, স্কুলে পড়ব। টাকা নেই। বাবা গুড়-মুড়কির দোকান দেয়, হুজুর। বেতন দিতে পারব না।

আনন্দের আতিশয্যে দেওয়ানের চোখে জল এল।

কিন্তু ভাবদুর্বল হচ্ছে মন, এই অনুভব করে হরদয়াল সোজা হয়ে বসল চেয়ারে। সাধারণত যা করে না তেমনিভাবে ডাকল সে খাসচাকরকে, সে এলে বলল, 'ওয়াইন'।

ডানকানের কথা ভাবল হরদয়াল : লোকটার মনের গঠন কিম্ভূত। কিন্তু এত ভয় পেল কেন? 'হিন্দু পেট্রিয়টে' কিছু প্রকাশিত হয়নি যাতে নীলচাষীরা উৎক্ষিপ্ত হতে পারে। হয়তো কলকাতায় দু-একটা বক্তৃতা হয়েছে নীল চাষিদের দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে। অবশ্য রামগোপাল যদি বক্তৃতা দিয়ে থাকেন তবে ইংরেজদের ভয় পাবারই কথা। রামগোপালের বক্তৃতা! তিন-তিনটে জবরদস্ত অক্সফোর্ড-পাস সাহেব ব্যারিস্টার তর্কে যুক্তিতে হারল, হার মানল ইংরেজি ভাষার দাপটে, ইংরেজি শ্লেষে! খোঁজ নিতে হবে।

চাকর রুপোর বারকোশে ক্লারেটের সরঞ্জাম এনেছিল। হরদয়াল সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'দরকার হবে না। তামাক দে'।

চাকর চলে গেলে হরদয়ালের মনে পড়ল পিয়েত্রোর সূক্ষ্ম শ্লেষ ; সে বলেছিল, অন্তত ভালো বন্দুক তৈরি শিখুক। তারপর তার নিজের তীব্র ব্যঙ্গটার কথা মনে হল। হোম থেকে সৈন্য না-আসা পর্যন্ত এরা লালকুর্তা গায়ে সিপাহি হবে, তাই নয়? প্রশ্নটা নিজের কাছে করে হরদয়ালের মনের তলে একটা হাসি জাগল, যেটা প্রসন্নতার রূপ নিয়ে ফুটে উঠল মুখে। কথাটা সে খুব ভালো বলেছে, এই আত্মতৃপ্তির সঙ্গে কথাটা বলার পীড়ন সুখ সে অনুভব করল নতুন করে।

পিয়েত্রোর কাছে যাই যাই করছিল রাজু কিছুদিন থেকেই, কিন্তু কেউ প্রশ্ন করলে সে উত্তর দিত, সময় অভাবে যেতে পারছি না। অবশ্য কেউ তাকে এমন প্রশ্ন করেনি।

অবশেষে নয়নতারাই একদিন তাকে জিজ্ঞেস করল, 'রাজকুমার, তোমাকে যারা ভালোবাসে তাদের কথা ভুলে যাওয়াই তোমার স্বভাব, তাই নয়'?

'কেন বলছ এ কথা'?

'এমনি জিজ্ঞেস করলাম'।

'শুধু শুধু তুমি কিছু বলবে এমন তো হয় না, নয়নতারা'।

নয়নতারা পুঁথিটি জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধে ফেলল। কুলুঙ্গিতে পুঁথিটি তুলে রাখবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'পিয়েত্রোর কাছে তুমি তো আর যাও না'।

'আজকাল তুমি যেন আমাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছ'।

'না, তা নয়। একটা কথা কী জানো রাজকুমার, আমি যদি তোমার স্ত্রী হয়ে জন্মাতাম তাহলে বলতাম স্ত্রৈণ হোয়ো না'।

'স্ত্রৈণ কাকে বলে আমি জানি না'।

নয়নতারা হেসে হেসে বলল, 'জানবার কথাও নয়। কিন্তু মিতা, রাগ কোরো না। পুরুষমানুষের দেহ যেমন পরিশ্রম না-করলে নষ্ট হয়, মনও তেমনি। শুধুমাত্র মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বললে পুরুষের মন নষ্ট হয়, গ্লানি জমে মনে। মেয়েমানুষেরা সে-রকম পুরুষকে আর শ্রদ্ধা করতে পারে না'।

'এতসব বলছ কেন, আমি বুঝতে পারছি না'।

'বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে বলিনি। ঘুজরুক আলির কথা মনে করো। তার খোঁজও তো তুমি করো না। শুনলে কত কষ্ট হবে তার। অত ভালো তোমাকে আর কে বাসে'?

রাজু গম্ভীর মুখে বলল, 'তা বটে। আমিও ভাবছি কিছুদিন থেকে। আজই যাব'।

'তাই বলে এখুনি তোমাকে উঠতে হবে না'।

'কেন, এখন যাওয়াই তো ভালো'।

'না, তাহলে সারাক্ষণই আমার মনে হতে থাকবে তুমি রাগ করে চলে গেছ, বসে বসে ভাবব আমি তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কাল যেয়ো সকালে। স্নান-আহারের বেলা হবার আগে চলে এসো'।

'কাল তাহলে তোমার কাছে দুপুরবেলা আসতে পারব না'।

'বেশ তো, না-এলে'।

রাজুর আবার অভিমান হল। সে বলল, 'তুমি কখনোই আমার আপন হবে না। এ আমি বেশ বুঝতে পেরেছি'।

দরজার কাছে যেখানে রাজু দাঁড়িয়েছিল সেখানটায় এগিয়ে এল নয়নতারা। রাজুর একখানা হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'এই নিয়ে এ কথাটা একশোবার বলা হল তোমার। মনে এমন অশান্তি বাসা বাঁধলে সে-মন কখনও প্রশান্ত হয় না। মেঘদূতের রস দূরের কথা, সাধারণ কাব্যের রসও মনে দাগ কাটবে না। সব কাব্যেই নিজের দুঃখ দেখতে পাবে। কীসে তোমার বিশ্বাস হবে আমি ভেবে পাই নে'।

কথা বলতে বলতে নয়নতারা হঠাৎ একটা কাজ করে ফেলল, রাজুর হাতের কমলহীরের আংটিটা খুলে নিল। নিজের আঙুলে পরল। তারপর তেমনি হাসি হাসি মুখে নিজের ছোট আংটিটা খুলে নিজেই রাজুর হাতে পরিয়ে দিল।

'হল তো'।

'কী হল'?

'কেন, রূপকথার গল্প শোনোনি? সেসব গল্পে রাজকুমাররা কাঠুরের মেয়েকে এমন আংটি দেয়, শোনোনি'?

বিষয়টির আকস্মিকতায় রাজু খানিকটা সময় মুহ্যমান হয়ে রইল, তারপর তার অবিশ্বাস্য দ্রুততার জন্যই সে বলল, 'যাও, সবতাতে তোমার রসিকতা'।

'হয়তো তাই, কিন্তু এ আংটি তোমাকে আর ফেরত দিচ্ছি নে। যদি রাজবাড়ির লোকেরা চোর বলে ধরে তখন বোলো খুশি হয়ে দিয়েছ। দেখো, যেন বিপদে না-পড়ি'। অদ্ভুত একটা গভীর হাসিতে নয়নতারা ঝিকমিক করে উঠল।

'তুমি কি আংটিবদল বলো একে'?

'আর কি বলব! তুমি যে কিছুতেই বিশ্বাস করো না'।

'এর মানে কী হল'?

'আমার পোড়াকপাল, তাও আমাকেই বলতে হবে নাকি! তোমার বিয়ে হোক, সুয়োরানী আসুক, একদিন তার গলা ধরে বলব'।

খানিকটা সময় দুজনে চুপ করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর রাজু বলল, 'তুমি সব বিষয়েই আমার চাইতে বেশি বোঝ। তুমি যখন এ ব্যবস্থা করলে তখন এতে বোধ হয় আমার ভালোই হবে'।

ভবিষ্যতে এই সামান্য ঘটনাটার ফল কতদূর প্রসারিত হয়েছিল তা এখনই বলা যায় না। কিন্তু হেতুটা রাজু নিজে না-বুঝলেও সে রাত্রিতে তার গভীর সুনিদ্রা হয়েছিল। সাধারণ আংটিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে একসময়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

পরদিন সকালে প্রাতরাশ শেষ করে উঠেই সে রূপচাঁদকে হুকুম করল ঘোড়ার জিন কষতে।

রানী বললেন, 'কোথায় যাবি'?

'অনেকদিন পিয়েত্রোর কাছে যাইনি। একবার ঘুরে আসি'।

'যাওয়াই উচিত। প্রতিবেশীর খোঁজখবর নেওয়াটাই ভদ্রতা'।

অত্যন্ত হালকা মন নিয়ে রাজু পিয়েত্রোর বৈঠকখানার দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

রাজুর ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যেতে রানী বললেন, 'দাশুর-মা, পালকি আনতে বলো। রূপচাঁদ ছাড়া আর-কেউ যেন না-জানে। খিড়কির বাইরে পালকি থাকবে'।

প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে দাশুর মা এসে খবর দিল পালকি প্রস্তুত। রানী অতি সাধারণভাবে খিড়কি পার হয়ে এসে পালকিতে চেপে দাশুর মাকে বিদায় দিলেন, হাতের ইশারায় রূপচাঁদকে ডেকে বললেন, 'নয়নতারার বাড়ি'।

পালকির পাশে পাশে রূপচাঁদ ছুটে চলল।

নয়নতারা স্নান করে উঠে ঝুঁটি করে চুল মাথার উপরে তুলে দিয়ে দাওয়ায় বসে কুলোয় করে চাল বাছছে। বাড়ির চৌহদ্দির বেড়া ঠেলে পালকি অন্দরের চিকের পর্দা দেওয়া ছোট দরজাটার কাছে এসে দাঁড়াল। এত ছুটে এসেছে পালকি যে বেহারাগুলো হাঁপাচ্ছে। সর্বাঙ্গ দিয়ে দরদর করে ঘাম পড়ছে।

রানী পালকি থেকে নেমে বললেন, 'দূরে গাছতলায় বিশ্রাম করো গে, ডাকলে এসো'।

রানী অন্দরে প্রবেশ করলেন। উঠোন পার হতে হতে তিনি দাঁড়ালেন, ততক্ষণে নয়নতারাও উঠে দাঁড়িয়েছে।

নয়নতারা আন্দাজ করার চেষ্টা করল লোকটি কে হতে পারে। বেশভূষায় পারিপাট্য নেই, তবুও

বড় ঘরের চিহ্ন আছে। কপালে সিঁদুর নেই, কিন্তু ভূষণরহিতাও নয়।

নয়নতারা বলল, 'আমি তো আপনাকে চিনতে পারলাম না'।

আগন্তুকা বললেন, 'পারার কথাও নয়, আমাদের দুজনের এর আগে দেখা হয়নি'।

'আপনি কী অন্য গ্রাম থেকে এসেছেন'?

'না, এই গ্রামেই থাকি'।

'বসুন'।

রানী মাদুরে বসে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নাম নয়নতারা'?

'হ্যাঁ'।

'তুমি কুমারী? তোমরা বুঝি কুলীন'?

'হ্যাঁ, কুমারী বটে। কিন্তু কুলীনের লক্ষণ কী আর আছে বলুন! না-আছে দান-ধ্যান, না-আছে যাগযজ্ঞ'।

'তোমার অভিভাবক কে আছেন'?

নয়নতারা একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আমার অভিভাবক এই গ্রামের রানীমা'।

রানী বললেন, 'এরপর আমার আর পরিচয় না-দেওয়া চলে না ; আমিই রানী'।

নয়নতারা বিস্মিত হল, খানিকটা সময় রানীর মুখের দিকে চেয়ে থেকে তারপর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

কিন্তু নয়নতারা শঙ্কিত হল। তার আঙুলের নতুন ধরনের আংটিটা ভার-ভার লাগতে লাগল। রানী নিজে এসেছেন, কী বলবেন, কী উদ্দেশ্য, কে বলতে পারে। রানী কি তার চরিত্র সম্বন্ধে ইঙ্গিত করবেন, কিংবা সোজাসুজি তার এবং রাজুর সম্বন্ধের কথা উত্থাপন করে বসবেন। নয়নতারা মুখ নিচু করে বসল। কিন্তু রানী সেসব কোনো প্রশ্ন না-তুলে বললেন, 'কথায় কথায় জানতে পারলাম, রাজু তোমার কাছে কাব্য পড়ে। তা ভালোই হয়েছে। এ গ্রামে কাব্য পড়ার মতো পণ্ডিত আর কোথায়। টোলের পণ্ডিত নাকি ব্যাকরণসর্বস্ব। কী পড়ছে এখন রাজু'?

নয়নতারার মুখে ক্ষীণ একটু হাসি দেখা দিল, 'তাকে ঠিক পড়া বলে না। আমি নিজে ব্যাকরণ কিছু জানি না। ব্যাকরণ বাদ দিলে কাব্যের অর্থবোধের চেষ্টাই শুধু হয়। দুজনে মিলে পড়া। এখন আমরা রঘু পড়ছি'।

রানী বললেন, 'তুমি নিশ্চয় মহাভারত পড়তে পারো'?

'দাদার কাছে পড়েছিলাম'।

'আমাকে একটু শোনাও না একদিন'।

নয়নতারা সত্যিকারের সংকোচ বোধ করল। মূল মহাভারত যিনি শুনতে চান তাঁর সংস্কৃত-জ্ঞান খুব সাধারণ নয়। তবু যাচাই করার জন্য জিজ্ঞেস করল, 'কাশীরামের'?

'না, মূল। তোমার কাছে আছে'?

নয়নতারা এই ভেবেও অবাক হল যে-মহিলা মূল সংস্কৃত মহাভারত শুনতে চান তাঁর ছেলে কেন সংস্কৃত আদৌ ধরতে পারে না। বলল, 'দাদার ছাত্ররা প্রায় সবগুলি পুঁথি নিয়ে গিয়েছে। তারা খুঁজে পায়নি পরে এমন-একটা পেয়েছিলাম আমি। সেটা শুধু শান্তিপর্ব'।

'তাহলে তো কথাই নেই, নয়ন। তুমি কবে যাবে তাই বলো'।

'যেদিন আপনার হুকুম পাব। আপনাকে না-চিনতেই তো আপনাকেই আমার অভিভাবক বলেছি'।

রানীর মুখ উজ্জ্বল হল, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি পালকি পাঠাব'।

রানীর সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এসে তাঁকে বিদায় দিয়ে নয়নতারা ভাবতে বসল।

সমগ্র ব্যাপারটি নয়নতারার কাছে প্রহেলিকা বলে মনে হল। রাজুর বিষয়ে অনুসন্ধান করাই অবশ্য

রানীর উদ্দেশ্য ছিল। তিনি কি তাঁর স্বাভাবিক ঔদার্যে রাজুর জন্য নয়নতারার প্রীতিকে সখ্য বলে নিতে পেরেছেন? তা যদি হতো তবে এমন করে আসার কী দরকার ছিল? যেন সব ব্যাপারটা চুপিচুপি নিষ্পত্তি করার ইচ্ছা। যদি মহাভারত শোনাই উদ্দেশ্য হয়, লোক পাঠিয়ে খবর দিলেই তো হতো। যেন গোপন আচরণের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে রানীর আসার ধরনটা।

দাসী এসে রান্নার কথা মনে করিয়ে দিল। তার নিজের আহারের রুচি কিছুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না। কমলহীরের আংটিটায় আবার চোখ পড়ল সেটা একবার খুলে ফেলল, আবার পরক্ষণেই পরল।

নয়নতারা রান্নার উদ্দেশ্যে চলে গেল।

পালকিতে যেতে যেতে রানী ভাবলেন নয়নতারার কথা। মেয়েটি সুন্দর বটে। মোহিত করার মতো সৌন্দর্য, মিষ্টি গলার স্বর। কিন্তু বয়সের পার্থক্যটাও লক্ষণীয়। অবাক লাগল রানীর, সেদিনকার সেই রাজু, বুকে চেপে যাকে ঘুম পাড়াতে হতো সে-ও কি নারীর রূপের আকর্ষণ অনুভব করতে পারে। অবশ্য একজাতীয় রূপ আছে যা প্রাণীমাত্রকেই আকর্ষণ করে, যেমন আলোর রূপ, শিশু হলেও আকর্ষণ করে, যেমন লাল রং। নয়নতারার দেহবর্ণ আকর্ষণীয়, তার মিষ্ট ভাষা আকর্ষণীয়, কিন্তু সে যে রমণীরত্ন, এ বুঝবার বয়স কি রাজুর এরই মধ্যে হল!

রানী স্থির করলেন, সূচনাটা ভালোই হয়েছে, কাব্যই যদি পড়তে হয় নিজের বাড়িতে তা পড়া হোক। একজন প্রজার বাড়িতে রাজকুমারের প্রত্যহ যাওয়াটা ভালো দেখায় না। মহাভারত পড়তে আসুক নয়নতারা, দশজনে তার কাব্য শুনুক এবং তার নারীত্ব গৌণ হয়ে যাক রাজুর চোখে।

রাজবাড়ির খিড়কির কাছে পৌঁছে রানীর মনে হল—কিন্তু যদি রাজুর কাছে নয়নতারার রমণীয়তাই প্রধান হয়ে থাকে!

বিষণ্ণতা বোধ করলেন রানী। ছেলে নরহত্যা করেছিল, সেখানে ছেলের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো যায়, কিন্তু সত্যি যদি ছেলে অবিবাহিত প্রেমের দিকে ঝুঁকে পড়ে, কী করে তা রোধ করা যাবে। কী করে তাকে বলা যাবে, নিষেধ করা যাবে। তখন তাঁর মনে হল, নয়নতারাকে আকর্ষণ করে নিজের মহলে আনার চেষ্টা কি তাহলে রাজুর পুরুষ-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়ার সমান হল। সহসা নয়নতারার তুলনায় নিজেকে দুর্বল বলে মনে হল রানীর।

পিয়েত্রো তার পোষা কাকাতুয়াকে ছোলা খাওয়াচ্ছিল। রাজুকে দেখে হাতের ইশারায় তাকে ডেকে আবার ছোলা খাওয়ানোর দিকে মন দিল। রাজু কাছে এলে ফরাসিতে বলল, 'এটাকে আমি ফরাসি ছাড়া অন্য কোনো ভাষা শিখতে দেব না। ইতিমধ্যে চারটি ভদ্রতার কথা শিখে ফেলেছে, তুমি যেন এর সামনে কথা বলতে গিয়ে বাংলা বলে ফেলো না'।

রাজু ফরাসিতে বলল, 'তাহলে অন্য কোথায় চলুন। আমি কতক্ষণ-আর ফরাসি বলব'?

বসবার ঘরে এসে পিয়েত্রো বললে, 'অনেকদিন আসোনি। ভালো আছ তো'?

'ভালোই আছি। আলি খাঁর খবর কি'?

'সে ভালোই আছে, কিন্তু তার একটা কাজ আমার ভালো লাগেনি'।

'কী কাজ'?

'হঠাৎ সে কালেক্টরের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করে চিঠি দিয়েছে'।

'কী বলেছে'?

'শুনলাম নাকি বহু রকমে ত্রুটিমার্জনা চেয়ে লিখেছে, এবারকার মতো ছেড়ে দিলে সারাজীবন ব্রিটিশপতাকা অভিবাদন করে কাটিয়ে দেবে'।

'লাভ কী হল'?

'ছাড়া পেতে পারে। উকিলের চিঠি পেয়েছি কাল, সে-ই নাকি পরামর্শ দিয়েছে, তদবিরও করছে'।

রাজুর বিপদ হল। সে খুশিই হচ্ছিল কথাটা শুনে, আলি খাঁ ছাড়া পাবে এর চাইতে সুখের কথা আর কী আছে, কিন্তু পিয়েত্রোর যখন মনঃপূত হয়নি ব্যাপারটা, হয়তো-বা কাজটা ভালোই হয়নি। একটু ভাবতে গিয়ে সেও অনুভব করল—ব্রিটিশপতাকা অভিবাদন করাটাই বোধ হয় অনুচিত। অবশ্য কথাটা তাকে বিচলিত না-করলে সে সম্ভবত দেখতে পেত, পিয়েত্রোর ধীর দৃষ্টির পেছনে থেকে রাজুকে পরখ করছে পিয়েত্রোর তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক।

'কিন্তু', বলল রাজু, 'জেল-খাটা তো উদ্দেশ্য নয় মানুষের'।

'তা নয়। তাছাড়া এক্ষেত্রে আলি খাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তোমাকে বাঁচানো'।

'তা যদি হয়, সেটা তো হয়ে গেছে। ইচ্ছে করে অপমান মাথায় নিয়েছে আলি খাঁ। কৌশল করে পালিয়ে আসা মন্দ কী'।

পিয়েত্রো এক টিপ নস্য নিয়ে বলল, 'আসুক, কী দুষ্টুমি মাথায় খেলেছে কে জানে! যাক সে কথা, ডানকানের কুঠিতে গিয়েছিলে ওর নাচের আসরে? কী রকম লাগল'?

'মন্দ নয়। তবে নাচওয়ালিদের বয়স হয়েছে। আসর অল্প রাত্রিতেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল'।

পিয়েত্রো কথা না-বলে রাজুর মনের উপরে নাচওয়ালিদের ছাপের পরিমাপটা দেখল।

'তুমি একাই গিয়েছিলে, না দেওয়ানও ছিল'?

'দেওয়ানের যাবার কথা ছিল, যাননি শেষ পর্যন্ত'।

'তোমাদের এই দেওয়ানের চরিত্রটা নতুন ধরনের। নিজে নাচ-গান ভালোবাসে বলে মনে হয় না, অথচ উৎসব করতে নাচওয়ালি নিয়ে আসে। তা ভালো করেছে সে, ডানকানের সঙ্গে সদ্ভাব হয়েছে। আচ্ছা, তুমি নিজে গান গাইতে পারো'?

রাজু হো-হো করে হেসে উঠল, 'আমি করব গান, তাহলেই হয়েছে'।

'চেষ্টা করে দ্যাখোনি তো'?

'তা না-দেখলেও বলা যায়'।

'নানা রকমের বাজনা আছে, যে গাইতে পারে না সে বাজাতে পারে। একটা সুর যখন মনের মধ্যে কাজ করে, আর সে-সুর যখন গলায় ফোটে না, বাজনায় তা ফুটিয়ে তোলা যায়'।

'বাজনা তো নহবতওয়ালারা বাজায়'।

'সবসময়ে তা নয়। বড় লোক, মহৎ লোকও বাজায়'।

'কী বাজাব, বাঁশি'?

'অবশ্য কৃষ্ণ যখন রাজা হয়েছিলেন তখন আর বাঁশি বাজাতেন বলে শোনা যায় না। কিন্তু তাহলেও বাঁশি বাজাতে দোষ কী'?

'দোষ বোধ হয় কিছু নেই। ভেবে দেখিনি বিষয়টা'।

পিয়েত্রো বলল, 'বাজনা শুনবে'?

'কে বাজাবে'?

'কয়েকজন বাজনদার আছে। আমাদের দেশের হিসাবে তারা সকলেই বিশেষ ভদ্রলোক'।

'বেশ কথা, কোথায় তারা? ডাকুন না, শোনা যাক'।

'তুমি শুনবে কিনা, শুনতে তোমার ভালো লাগবে কিনা এই সমস্যা'।

'শুনতে দোষ কী'।

রাজুকে সঙ্গে করে পিয়েত্রো লাইব্রেরি-ঘরে এসে বসল। দু-তিনটি শেল্‌ফ বোঝাই বই, কিছু পুঁথিও আছে। রাজু এর আগেও লক্ষ্য করেছে, কালো এবনির দেরাজের মতো একটা বড় আসবাব সেই ঘরের একপাশে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে পড়ে আছে। পিয়েত্রো একটা চেয়ার টেনে দিয়ে রাজুকে বসতে

বলে নিজে সেই কালো-আসবাবটার পাশে গিয়ে বসল একটা টুলে। তারপর বলল, 'একটা কথা তোমাকে বলে রাখি রাজু, বাজনা যতক্ষণ চলবে একটা কথাও বলবে না'।

রাজু যাকে আসবাব মনে করেছিল, সেটা একটা পিয়ানো। পিয়েত্রো ডালা খুলে পিয়ানোর সামনে বসল। রাজু এর আগে কোনোদিন পিয়ানো দেখেনি, নামও শোনেনি। হঠাৎ আসবাবটার পরিবর্তন দেখে সে বিস্মিত হল। একটা জন্তু যেন হাঁ করল আর তার অসংখ্য দাঁত চোখে পড়ল।

পিয়েত্রোর পাঁশুটে দাড়িগুলো শূন্যে ভাসছে, মাথাটা পিঠের দিকে হেলানো, দু হাত ডাইনে থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে, প্রান্ত থেকে মধ্যে, মধ্য থেকে প্রান্তে সরে যাচ্ছে আর অপূর্ব মনোহর ঝংকার উঠছে। ক্রমশ সেই ঝংকারগুলি মিলেমিশে একটিমাত্র সুরে মূর্ছিত হচ্ছে।

বাজনা থামলে পিয়েত্রো বলল, 'কী রকম লাগল'?

রাজু সহসা কথা বলল না।

'সুরটা চেনা চেনা লাগল'?

'কোথায় যেন শুনেছি'।

'তোমাদের বাড়ির নাচের কথা মনে হল'?

রাজু নিজের মন হাতড়াচ্ছিল, এবার ঠাহর করতে পেরে উৎসাহিত হয়ে বলল, 'ঠিক তাই'।

পিয়েত্রো হাসিমুখে বললে, 'ঠিক একেবারে সে-রকম হয়নি। একটু এদিকে-ওদিকে যোগ করা আছে। ওভারচারগুলি ঠিক এক নয়। পরে একদিন ট্রায়োগুলি বুঝিয়ে দেব। ভালো লাগল'?

'খুব ভালো'।

পিয়েত্রো দরজার কাছে উঠে গিয়ে ভৃত্যকে তামাক দিতে বলে ফিরে এল।

রাজু বলল, 'এটা কি ফরাসি নাচেরও সুর'?

'না। ভালো কথা, তুমি কি য়ুরোপের নাচ সম্বন্ধে কিছু শুনেছ কারো কাছে'?

'না'।

'য়ুরোপের নাচের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রায়ই মেয়ে-পুরুষে জোড়ায় জোড়ায় দল বেঁধে নাচে। ব্যালে বলে একরকম নাচ আছে, সেগুলি অভিনয়ের মতো'।

তামাক এল। পিয়েত্রো তামাক খেতে খেতে ব্যালের বিশিষ্টতা বোঝাল রাজুকে। তারপর বলল, 'আমি নিজে খুব কমই ব্যালেতে যাবার সুযোগ পেয়েছি। শুনেছি আজকাল রাশ্যানরা এদিকে অনেক এগিয়ে গেছে'।

গড়গড়ার গায়ে নলটাকে কয়েক পাকে জড়িয়ে পিয়েত্রো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আর-একটু শুনবে বাজনা'?

পিয়েত্রো পিয়ানোর সম্মুখে টুলটায় বসল, রাজুও তার চেয়ারটা টেনে এগিয়ে নিল পিয়ানোর দিকে।

বাজনা শেষ হল। পিয়ানোর চাবিতে হাত রেখে পিয়েত্রো স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। রাজুর চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রাজু বলল, 'এটা কী সুর'?

পিয়েত্রো হাসি হাসি মুখে বলল, 'হল না, সবটুকু পারলাম না। এটা মোজার্টের একটা গৎ। খুব ছোটবেলায় বাবার পাশে বসে একদিন শুনেছিলাম মোজার্টের একটা পূর্ণাঙ্গ সুর। সে যে কী তা বর্ণনা করা যায় না, ভোলা যায় না। ওরে তামাক দে'—বলে পিয়েত্রো আবার চেয়ারে এসে বসল।

রাজু বললে, 'আপনি যে এ-রকম বাজাতে পারেন তা জানতাম না'।

'আমি যে কাউকে বাজনা শুনিয়ে খুশি করতে পারি তাই কী জানতাম'!

পিয়েত্রোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজু বাড়িতে ফিরতে ফিরতে ভাবল, নয়নতারাকে বলতে হবে এই বাজনার কথা। গান-বাজনার কথা, নাচওয়ালিদের কথা উঠলেই সে ভ্রূকুটি করে।

১১

সদর-নায়েবের ভাগিনেয় গোবর্ধন দত্ত গ্রামের নতুন স্থাপিত পোস্টাপিসের পোস্টমাস্টার। খবরটা আনল সে-ই। প্রথমে সে গুজবের মতো ছড়িয়ে বেড়ালো কথাটা।

দু-দিন তার আপিসে ডাক আসেনি, অথচ একদিন পর একদিন ডাক আসার কথা। সে নিজেই একটা টাট্টু ঘোড়ায় চেপে সদরের বড় আপিসে পোস্টমাস্টারের কাছে গিয়েছিল ডাক আনতে। সেখানে সে নাকি সদ্য-ডাকে আসা একটি পত্রিকা পড়ে এসেছে। কী মারাত্মক কথা! যে শুনল, সে-ই শিউরে উঠল। সকালবেলা যারা গোবর্ধনের ডাকঘরের বারান্দায় বসে হুঁকো টানে আর গল্প করে তারা গ্রামের মাতব্বরস্থানীয় লোক না-হলেও সাধারণ প্রজাও নয়। তাদের মানসিক অগ্রগতিও খানিকটা ছিল এবং সে-অগ্রগতির জন্য মুখ্যত কৃতিত্ব গোবর্ধনের। তাদেব মধ্যে কেউ কেউ ডাকঘরকে পোস্ট-অফিস, সময়কে টাইম, কাজকে ওয়ার্ক ইত্যাদি বলতে শুরু করেছে গোবর্ধনেব মুখে শুনে শুনে। তার চাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এদের সাহিত্য-চেষ্টা। সাহিত্য-চেষ্টা বলতে সাহিত্য-সৃষ্টিব চেষ্টা নয়। সাহিত্য সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়া। হুতোম পেঁচার নক্শা পড়া চলছে এদের এখন। গোবর্ধন ভালো পড়তে পারে। তার আপিসের টুলে বসে যখন সে পড়ে তখন মনে হয়, বই নয়, লেখক নিজেই যেন তাদের সঙ্গে কথা বলছে।

সেই গোবর্ধন বলল, 'আইন হয়ে গেল'।

'আইন করল কে? কলকাতার লাট'?

'আইন করালো বিদ্যেসাগর। লাটে কি আইন করতে পাবে? সাহস পায না'।

'তাহলে ঘরে বিধবা হয়ে কেউ পড়ে থাকবে না'?

'এই তো সবে শুরু, দ্যাখো কতদূর জল গড়ায়'।

গোবর্ধন দত্তের একজন সঙ্গীর প্রেমিক হিসাবে নাম ছিল। সে বলল, 'বলো কী, এ তো খুব কৌতুকের ব্যাপার হল। আইনের খসড়াটা আমাকে একদিন শোনাও'।

এদের সকলেরই বয়স বাইশ থেকে পঁচিশ।

গোবর্ধনের প্রেমিক সঙ্গী চরণদাস বলল, 'তাহলে বাবাজি না-হয়েও লোকে বিধবা-বিবাহ করতে পারবে'।

গোবর্ধনের দলের আর-পাঁচজন হেসে উঠল।

গোবর্ধন বলল, 'বাবাজিদের ধর্মপুস্তক পড়ে প্রেম করতে শিখলে, অথচ তাদেব ধর্মের প্রথা মানতেই দোষ'?

'তা দোষ নেই, ভয় হয়, লোকে বলবে মেয়েমানুষের জন্যই কণ্ঠী পরলাম, কণ্ঠীরও অপমান, মেয়েমানুষটারও'।

গোবর্ধন দত্তের আড্ডা থেকে কথাগুলো গ্রামের এদিক-ওদিকে ছড়াতে লাগল।

সেদিন সন্ধ্যায় চরণদাস প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়ে ডাকল, 'বনদুর্গা, এদিকে এসো, একটা খবর আছে'।

বনদুর্গা চরণদাসের প্রায় সমবয়সী একজন বিধবা, চরণদাসের দূরসম্পর্কীয় এক ভ্রাতৃস্থানীয় আত্মীয়ের স্ত্রী।

'কিছু বললে'?

'বললাম, এদেশ থেকে না-পালিয়ে যদি তুমি আর আমি একসঙ্গে থাকতে পারি'।

বনদুর্গা বলল, 'চরণ, এই নিয়ে তুমি তিন বছরে তিন বার এই কথা বললে। লোকে শুনলে একে কুপ্রস্তাব বলবে। নিজেকে দশের চোখে হেয় করো কেন? আমি বিদেশি, ভিন্ন গ্রামের মানুষ। আমার

এই হাল-বলদ জায়গাজমির একটা বিলি-বন্দোবস্ত করে দাও তোমরা দশজন, আমি চলে যাই'।

চরণ বললে, 'লোকে কী বলবে জানি না, তুমি নিজেও কি একে কুপ্রস্তাব মনে করো'?

বনদুর্গা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বলল, 'চরণ, চরণ'!

দৃশ্যটা এই রকম : বনদুর্গার বাড়ির সদরের আগড়ের পাশে যে-চাঁপা গাছ, তার নিচে দাঁড়িয়ে চরণদাস। অস্পষ্ট চাঁদের আলো চরণদাসের বাঁ-কাঁধের উপর দিয়ে তার মুখের একটা পাশে পড়েছে। আগড়ের ওপারে বনদুর্গা।

বনদুর্গা বলল একটু পরে, 'চরণ তোমাকে আমি যে-কথা বলি না, সে-কটি কথা শোনার জন্যই তুমি এমন বার বার আসছ। লোকে তোমাকে হাটের পথ দিয়ে ফিরতে ফিরতে ঢিল ছুঁড়বে, তোমার ঘরে আগুন দেবে। আমাকে নষ্ট মেয়েমানুষ ভাববে। তার ফলে আমার উপরে অনেকের অন্যায় লোভ হবে। লোকে তোমার প্রাণনাশের চেষ্টাও করবে হয়তো। তবু সেই দু-দিনের জন্যও আমি তোমাকে সুখী করতে রাজি হতাম যদি তুমিও আমাকে নষ্ট মেয়েমানুষ ভাববে এমন সম্ভাবনা না-থাকত'।

চরণদাস বলল, 'বনদুর্গা, তুমি আমার চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধি রাখো। তুমি বলো, এর থেকে কী পরিত্রাণ আছে আমার? তোমার কাছে আসতে ইচ্ছে করে, তোমাকে পেতে ইচ্ছে করে, এসব আমি ঠেকাই কী করে'?

বনদুর্গা মুখ নিচু করে একটু চিন্তা করল। তারপর বলল, 'চরণ, আমি তোমার কথায় রাজি, কিন্তু একটা কথা আমি তোমাকে বলে রাখি। অনেকদিন আমাকে পাবে না, তার জন্য তুমি মনস্থির করে নাও। অপমান আমি সহ্য করব না'।

বনদুর্গার কথাগুলি যেমন শান্ত তেমনি ধীর।

চরণ বলল, 'না, না বন, তার দরকার নেই। তুমি এখানেই থাকো। আমি আর এ-রাস্তা দিয়েই হাঁটব না। তুমি আমাকে দু-দিন সুখী করার জন্য বিপদ কাঁধে নেবে তার দরকার নেই। ওরা বলছিল, বিধবাদের নাকি কুমারী-মেয়েদের মতোই বিয়ে হবে এমন আইন হবে। বিদ্যেসাগর নামে এক বড় পণ্ডিত নাকি বলেছেন বিধবা-বিয়েতে পাপ হয় না। আমি সেইজন্যেই এসেছিলাম'।

বনদুর্গা অনেকক্ষণ ধরে কথাটা ভাবল। তারপর হঠাৎ তার চোখে জল এল, সে বলল, 'চরণ, কেন তুমি আমার ভাই হয়ে আসতে পারলে না'!

চরণ মাথা চুলকে বলল, 'বনদুর্গা, আমি এখন আসি'।

'দাঁড়াও চরণ, কথাটা এত দূর এগিয়েছে, বাকিটুকু বলে নিই। তুমি কি আমাকে তার পরও সতী মনে করতে পারবে? কথাটা তুমি ভাবো। আর-একদিন এসো। মনে কোরো না, আমি তোমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলাম। আর একবার এসো'।

দু-চার দিন পরে গোবর্ধনের আড্ডায় বিধবা-বিবাহের কথাটা যখন সরস আলোচনায় উচ্ছ্রিত হয়েছে, চরণদাস ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, একটা কথা তোমরা বলো, যে সব বিধবা বিয়ে করবে তাদের কি তোমরা সতী মনে করবে না'?

গোবর্ধন বললে বিজ্ঞের মতো, 'যেসব বিধবা কুল নাশ করে তাদের চাইতে ভালো, তাই বলে কি একবার যাদের বিয়ে হয়েছে তাদের মতো'?

সঙ্গীরা হো-হো করে হেসে উঠল।

গোবর্ধনের উত্তরটা চরণদাসের ভালো লাগেনি, এদের হাসিতে সে অত্যন্ত বিরক্ত হল।

বিধবা-বিবাহের কথাটা গোবর্ধনের আড্ডায় সীমাবদ্ধ রইল না। মুখরোচক আলোচনা হিসাবে ছড়াতে লাগল। মেয়েদের জল তোলার ঘাটে তো বটেই, পুরুষদের স্নানের ঘাটেও। বয়সের কোনো ব্যবধান

রইল না, সত্তর বছরের ঠাকুরদা আর ষোলো বছরের নাতি আলোচনা করল ; এমনকী, বাপ-জ্যেঠার আলোচনাস্থলেও ছোট-ছোট ছেলেদের ভিড় হতে লাগল। মেয়েদের ঘাটে তখন বিধবাদের সংখ্যা বেশি থাকত না। দু-একজন যারা ছিল তাদের অবস্থা কষ্টকর হয়ে উঠল। আলোচনা উঠতেই সকলেই তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে এই নববিধানের কদর্যতাগুলির উদ্‌ঘাটন করত, যেন তারাই এই বিধবা বিবাহের ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছে। গ্রামে যে শিরোমণিমশায় জীবিতই আছেন সেটারও প্রমাণ পাওয়া গেল। জিওল গাছের আঠা দিয়ে পৈতা মাজতে মাজতে তিনি বললেন, 'বাপু হে, শুদ্রযাজী ব্রাহ্মণ, অর্থগ্রাহী ভিষক, আর অগ্রণযোগ্য-দানগ্রাহী ব্রাহ্মণ শাস্ত্রে সমান পতিত। তোমাদের বিদ্যাসাগর খ্রিস্টানের দানে বর্ধিত, খ্রিস্টানের বৃত্তিভুক। তোমরা কি শুনেছ, লোকটা তার কলেজে ভারতীয় দর্শন পড়ানো নিষিদ্ধ করেছে? তার কাছে আর কী আশা করো'?

রাজবাড়ির কাছারিতেও আলোচনা শুরু হল। সদর-নায়েবমশাই পদশব্দে সন্ত্রস্ত হয়ে কথাটা থামানোর জন্য বলল, 'কাজ করো, কাজ করো। আইন হল তো হয়েছে কী? আইনে এমন কথা নেই বিধবা-বিবাহ আবশ্যিক। তোমার খুশি না-হয় বিধবা-বিবাহের ভোজ খেয়ো না'।

কিন্তু যার পদশব্দে এত ত্রস্ততা সে-ই আলোচনার আসরে এসে বসল। কাছারির ফরাসে যার পদধূলি পড়ে না, সেই দেওয়ান স্বয়ং নায়েবদের মাঝখানে বসে বলল, 'আপনাদের আলোচনায় আমিও যোগ দিতে এলাম। ভোজ খাওয়াটা বড় কথা নয়, নায়েবমশাই, কথাটা ভেবে দেখুন'।

নায়েব এবং উঁচুদরের আমলারা ভয়ে ভয়ে চুপ করে রইল।

তখন দেওয়ান একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিল। তার সে-বক্তৃতা শুনে উপস্থিত সকলেরই মুখ শুকিয়ে গেল। নায়েবমশাইয়ের যদি মেরি গডউইনের বক্তব্য জানা থাকত তবে বুঝতে পারত দেওয়ান খ্রিস্টান হওয়ার প্রস্তাব করেনি, খ্রিস্টানদের মধ্যেও যারা একান্ত অগ্রসর, যারা মানুষের সুখদুঃখে বিচলিত হয়ে খ্রিস্টানি বিধানগুলি, খ্রিস্টান সমাজের বিধিগুলিও নস্যাৎ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে তাদের মতো কথা বলছে দেওয়ান। আপাতদৃষ্টিতে সেটা একটা নিরীশ্বর সমাজব্যবস্থা। বক্তৃতা শেষ করে দেওয়ান বলল, 'এর জন্য শাস্ত্র থেকে নজির দেখানোর কোনো দরকার নেই। যা অন্যায়, তা অন্যায়ই। বিদ্যাসাগরের মতো বিদ্যা যদি আমার থাকত তবে আমি এই ঘোষণা করতাম—ভালো এবং ন্যায় এ দুয়ের প্রতিষ্ঠা করার জন্য যুক্তি দেখানোই দুর্বলতা। ভালো এবং ন্যায়কে অনেকসময়ে বলপ্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। আইন হয়নি, না-হোক ; বেআইনি হলেও ন্যায়ই সব আইনের বড়'।

দেওয়ান চলে গেলে নায়েব এবং আমলারা পরস্পরের মুখের দিকে ভীত ও বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

কথাটা অতঃপর রাষ্ট্র হল। এ গ্রামের মাথার কাছে একজন আছেন যিনি বিধবা-বিবাহ-আইন সমর্থন করেন। কী সাংঘাতিক অবস্থা, কী উপায় হবে তাহলে! নায়েবগিন্নি কর্তাব মুখে কথাটা শুনে এই মন্তব্য করল। নায়েব দু-কূল রক্ষার জন্য বলল ভয়ে ভয়ে, 'ভয় কী, তুমি তো আর বিধবা নও'।

দেওয়ানের আহারাদির বিচার যে গ্রামের আর-দশজনের মতো নয় এটা গ্রামের অনেকেই জানত। এখন সেটা নিয়ে আবার আমলাদের গিন্নিমহলে এবং তা থেকে প্রতিবেশী মারফত নতুন করে কানাঘুষো চলল।

নতুন স্কুলবাড়ির নকশা পেতে, কাজ শুরু হতে তখনও দেরি আছে। মোটা মোটা অসংখ্য পাকা বাঁশের উপরে বাঁশের কাঠামোর আটচালা উঠেছে একখানা। আপাতত তিন-চারটে ক্লাসের ব্যবস্থা হবে এরই নিচে। দশ-বারোজন ছুতোর ওই চালার নিচে করাত হাতুড়ি বাটাল র‍্যাঁদার শব্দে হৈ-হৈ করে বেঞ্চ তৈরি করছে ছেলেদের বসার। যেখানে তাঁতিপাড়ার সত্যপীরতলা ছিল, সেটা স্কুল বাড়ির কাছেই, সেখানে অনেকটা জায়গাতে বাঁশের প্রাচীরের ঘেরের মধ্যে একটা নতুন বাড়ি উঠেছে। বাড়ির কাজ প্রায় শেষ হল। ঘরামিরা চালে খড় দিচ্ছে। পাকা মেঝে, কাঠের দেয়াল, খড়ের ছাদ। জানলা-দরজাগুলিতে রং দিচ্ছে একজন ছুতোর। এটা হেডমাস্টারের বাড়ি। হরদয়াল স্থির করেছে স্কুল চালু হবার আগেই হেডমাস্টার আসুন, গ্রামের দশজনের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করুন, নিজের মতো করে স্কুলবাড়ি তৈরি করে নিন। স্কুল যখন বসবে তখন তাঁকে বাইরের লোক বলে যেন কেউ মনে না-করে। বন্ধুকে ইতিমধ্যে একখানা তাগিদপত্রও দিয়েছে সে।

কয়েকদিন আগে গ্রামের পাঠশালার বুড়োপণ্ডিত এসেছিলেন তার কাছে।

'হুজুর, বিদ্যার প্রসার খুবই হৃদয়ঙ্গম করার ব্যাপার'।

হরদয়াল তাঁকে দেখে অবাক হল। জরাজীর্ণ দেহ, মলিন বেশ।

'আপনি'?

'হুজুর, আমি এই গাঁয়ের পণ্ডিতমশাই'।

'বসুন, বসুন'।

হরদয়াল উঠে গিয়ে নিজে চেয়ার টেনে দিল। পণ্ডিতমশাই দ্বিধা করতে লাগলেন।

'বসুন। আপনি এসেছেন, ভালোই হয়েছে, আমি নিজেই আপনার কাছে যাব যাব করছিলাম'।

পণ্ডিতমশাই বসলে হরদয়াল বলল, 'আগে আপনার বক্তব্য বলুন, তারপর আমার কথা বলব'।

পণ্ডিতমশাই তবু সহজ হয়ে কথা বলতে আরো খানিকটা সময় নিলেন। অবশেষে এক সময়ে বললেন, 'হুজুর, আমার পাঠশালা তাহলে উঠেই যাবে'?

'যাক না উঠে, ক্ষতি কী'?

'এই বুড়ো বয়স, জোতজমাও নেই'। তাঁর চোখ ছলছল করে উঠল।

'কষ্ট হবে, না? তা পরিবর্তনের সময় একটু কষ্ট সবারই হয়, কিন্তু সে দু'দিনেই সয়ে যাবে, বরং নতুনটাই তখন ভালো লাগবে'।

'খাব কী'?

হরদয়াল হাসতে গিয়ে থামল। বলল, 'আপনার কথা শেষ হয়েছে, এবার আমি যেজন্য আপনার পাঠশালায় যাব বলছিলাম তা শুনুন : আপনার পাঠশালাটা তুলে দিতে হবে ; তুলে দেওয়া ঠিক নয়, তুলে নিয়ে আসতে হবে। স্কুলবাড়িটা তো দেখেছেন, ওইখানে একদিন আপনি আপনার সব ক'টি ছাত্র নিয়ে চলে আসবেন। পরে অন্যান্য গ্রাম থেকেও ছাত্ররা আসবে। সব ছাত্র তো আপনি একলা পড়াতে পারবেন না। কলকাতা থেকে একজন ইংরেজি-জানা মাস্টারমশাই আসবেন। পরে প্রয়োজন মতো আরো মাস্টারমশাইরা আসবেন'।

পণ্ডিতমশাইয়ের দৃষ্টিটা অস্বাভাবিক বোধ হতে লাগল। এ রকম উল্টো কথা তিনি আশা করেননি। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় মেয়েটা পিছু ডেকেছিল বলে ফিরে গিয়ে তাকে দু'ঘা দিয়ে বেরিয়েছিলেন বাড়ি থেকে। একটু সময় বোকা বোকা মুখ করে চেয়ে থেকে বললেন, 'তাহলে আমার জন্যও বৃত্তির ব্যবস্থা হবে'?

'আজকাল বৃত্তির ব্যবস্থা হয় না, বেতনের। বেতন বলুন, বৃত্তি বলুন, আপনার জন্যও ব্যবস্থা করা

হবে'।

পণ্ডিতমশাই আনন্দে ছলছল চোখে উঠে দাঁড়ালেন, বোধ হয় খবরটা সারা গ্রামে রাষ্ট্র করে দেওয়ার জন্য তিনি আকুলতা অনুভব করছিলেন।

হরদয়াল বলল, 'কবে উঠে আসতে হবে আপনাকে জানাব'।

পণ্ডিতমশাই চলে গেলে হরদয়াল ছাতি মাথায় দিয়ে স্কুলবাড়ির দিকে রওনা হল।

গোবর্ধনের ডাকঘরে ডাক এসে পৌঁছয় সন্ধ্যাবেলা। তখন ডাক বিলি করার ব্যবস্থা নেই। পরদিন সকালে গোবর্ধন ডাকের চিঠিপত্র ভাগ করে বিলি করার জন্য গ্রামের মহিন্দির নাপিতকে দেয়। মহিন্দির তার বাঁধা মক্কেলদের দাড়ি কামিয়ে বেড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে চিঠি বিলির কাজও করে। চিঠির অধিকাংশ তিনটি ভাগে ভাগ করা থাকে। পিয়েত্রোর ভাগ নিয়ে যায় পিয়েত্রোর লোক, ডানকানের বেলাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা, আর গোবর্ধন নিজে ডাকঘরের কাজ শেষ করে বাড়ি যাবার আগে রাজবাড়ির চিঠিগুলো নিয়ে যায়।

গোবর্ধন অন্যান্য দিনের মতো চিঠি নিয়ে রাজকাছারির দিকে যাচ্ছিল, পথে স্কুলবাড়িটার উঁচু আটচালার সামনে দাঁড়াল। আটচালাটা দর্শনীয় হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে। একটা বিষয়ে গোবর্ধনের মনঃপূত হয়নি ব্যাপারটা ; এত উঁচুঘর ঝড়ের মুখে টিকবে কিনা এ বিষয়ে তার সন্দেহ আছে, যদিও এ ব্যাপারে তার মাথা ঘামানো একেবারেই নিরর্থক। সাধারণ লোকের বাড়িঘর হলে বাড়ির কর্তার সঙ্গে তবু এ বিষয় নিয়ে খানিকটা আলাপ আলোচনা করা যেত। কিন্তু যে-বাড়ি হরদয়াল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তুলছে, তার সমালোচনা করাও চলে না, অথচ এ-প্রবৃত্তি এমনই অপরিহার্য যে কথাগুলো মনের মধ্যে পাক খেয়ে ফেরে।

'হ্যাঁ হে, ডাক এসেছে তোমার'?

আহ্বানটা পেছন থেকে এসেছিল, গোবর্ধন দাঁড়াল।

'আজ্ঞে হুজুর, এসেছে'।

দুখানা চিঠি ছিল। গোবর্ধন হরদয়ালের হাতে দিল।

'হ্যাঁ গোবর্ধন, তুমি নাকি এর আগে উকিলের মুহুরি ছিলে'?

'আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর'।

'তুমি তো ইংরিজি জানো, বাংলায় দরখাস্ত লিখতেও পারো'।

'কিছু কিছু হয়'।

'এই স্কুলে মাস্টারি করতে পারবে? ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের পড়াবে'?

'হুজুরের হুকুম হলে পারি'।

'বেশ, কথা রইল, পরে একদিন দেখা কোরো। তোমার ডাকঘর তো সকাল আর সন্ধ্যায়, দুপুরে স্কুল করতে পারবে'।

গোবর্ধন খবরটায় খানিকটা বিচলিত হয়ে চলে গেল। কিন্তু সে যতটা বিচলিত হয়েছিল তার চাইতেও বেশি বিচলিত হল হরদয়াল নিজে ডাকে-আসা চিঠি খুলে। চিঠি লিখেছে তার কলকাতার বন্ধু। স্কুলের হেডমাস্টার ঠিক করেছে সে, তার নাম চন্দ্রকান্ত অ্যান্ড্রুজ বাগচী। সস্ত্রীক গ্রামে যেতে রাজি হয়েছে। তার স্ত্রীর নাম ক্যাথারিন। বাগচী বহুদিন মধ্যপ্রদেশে ও মদ্রদেশে মিশনারির কাজ করেছে। লোকটি তেজস্বী বলেই মিশনারিদের সংস্রব ত্যাগ করেছে। ইত্যাদি।

হরদয়াল মিস্ত্রীদের ডেকে বলল, 'হাত চালিয়ে কাজ করো। সাত দিনের মধ্যে সবগুলো বেঞ্চ ঠিক করা চাই। সাত দিন, শুনেছ'?

হরদয়াল ভাবল, এতদিন দরকার হয়নি, এখন দরকার হবে। সারাদিন এদের কাজের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে কাজগুলো করিয়ে নিতে হবে। সে স্থির করল গোবর্ধনকেই নিয়োগ করা দরকার তদবির-তদারক

করার জন্য।

হরদয়াল অপেক্ষাকৃত দ্রুত পায়ে বাড়ি ফিরে গেল। এত তাড়াতাড়ি হেডমাস্টার এসে পড়বে এ যে কল্পনাও করা যায়নি। হেডমাস্টারের বাড়ির ভেতরটা কী রকম হল কে জানে। উঠোনটা গোবর দিয়ে নিকিয়ে, ঘরদোর ঝাড়পোঁছ করে রাখা দরকার। দশজনের দৃষ্টিতে হেডমাস্টার হরদয়ালের বেতনভুক একজন কর্মচারীমাত্র, কিন্তু হরদয়ালের ব্যাকুলতা দেখলে মনে হবে যেন তার সমমর্যাদাবিশিষ্ট কোনো অতিথি আসছেন।

ক্যাথারিন, বন্ধু লিখেছে, মাস্টারের স্ত্রীর নাম। ইউরোপীয়ান নাকি ভদ্রলোকের স্ত্রী! কী কৌতুকের ব্যাপার হল। মেমসাহেবদের মতো—মতো আর বলা কেন, মেমসাহেবই যদি হয়—তাদের মতো গাউন পরে উঁচু জুতো পরে পথেঘাটে ঘুরে বেড়াবে নাকি?

কথাটা অকস্মাৎ মনে হল। ডানকান ইংরেজি শিক্ষারই প্রতিবাদ করেছে। ফাদার এবং পাদরিদের ঘৃণা করে সে। স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা তো হবেই, উপরন্তু একজন মিশনারি-ঘেঁষা লোক আসছে শিক্ষকতা করতে, সঙ্গে শ্বেতাঙ্গিনী মহিলা। হয়তো তার বিলেতে বাড়ি নয়, হয়তো-বা তার পিতামাতার কেউ এ-দেশীয়ই ছিল, তবু ডানকানের রক্ত-কৌলীন্যের গর্বে সে পরোক্ষে আঘাত দেবে।

একটা বিবাদ বেধে উঠতে পারে—অন্তত মনকষাকষি হবেই। হরদয়াল ভ্রূকুটি করে ভাবল এবং চিন্তা করতে গিয়ে কোথায় একটা আঘাত খেয়ে হঠাৎ কড়া মুখে স্বগতোক্তি করলে—আমার স্কুলে আমি আমার খুশিমতো শিক্ষক রাখতে পারব না, এ-নিয়ম কোথায় আছে? আর থাকলেই-বা মানবো কেন।

হরদয়াল তখনই চিঠি লিখল বন্ধুকে :

...স্কুলবাড়ি এখন পর্যন্ত তৈয়ারি শেষ হয় নাই, সম্ভবত আগামী মাহিনার পূর্বে স্কুল বসিবে না, কিন্তু বাগচী সাহেবকে সস্ত্রীক রওনা করিয়া দিবে। এখনও বর্ষা আসিতে কিছু বিলম্ব আছে। নদীপথে যাত্রার প্রকৃষ্ট সময় ইহাই। আমি চার দাঁড়িযুক্ত একখানি বোট রওনা করিয়া দিতেছি। তাহারা স্টিমারের মতো দ্রুতগতি নয়, কিন্তু সঙ্গে যে-চারিজন বরকন্দাজ যাইতেছে তাহারাও দাঁড় চালাইতে পারে। এবং বোটে দাঁড়িদের জন্যও আরো চারিটি বন্দুক থাকিবে। অর্থাৎ প্রয়োজনে আটজন দাঁড়ি এবং আটজন বরকন্দাজ পাইবে। ইহা আমার নিজস্ব বজরা জানিবে। আমি বলি কি, পারো তো একবার তুমিও চলিয়া আইস।...

চিঠি লেখা শেষ করে হরদয়াল গোবর্ধনকে ডেকে পাঠাল, সে এলে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ডাকের থলে কবে যাবে, সদরে পৌঁছে কলকাতার ডাক ধরতে পারবে কি'?

গোবর্ধন বলল যে তার ডাক দু'দিন পরে রওনা হবে এবং তারও একদিন পরে সদরে সে-ডাকের ঝোলা খোলা হবে। ফলে, কাল শুক্রবারে কলকাতা যাবার ডাক ধরতে পারবে না, তিনদিন পরে মঙ্গলবারের ডাক ধরবে।

গোবর্ধনকে বিদায় দিয়ে হরদয়াল তার খাসভৃত্যকে ডেকে পাঠাল।

'একবার সদরে যেতে হয় রে। ডাক ধরতে হবে'।

'আজই, আজ্ঞে'?

'এখনই না-বেরুলে পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে। তুই ঘোড়া চালাতে পারিস'?

'কিছু কিছু'।

'তাতেই হবে, আমারটাই নিয়ে যা'।

চিঠিটা আর-একবার পড়ে খামে ভরে খাসভৃত্যের হাতে রওনা করে দিল হরদয়াল। তখনও হরদয়ালের স্নান-আহার হয়নি।

দুপুরের রোদ পড়ে গেলে কাছারি থেকে রানীর দরবারে খবর পাঠাল দেওয়ান। দরবার মঞ্জুর হলে হরদয়াল রানীর খাসকামরায় উপস্থিত হল।

হরদয়াল বলল, 'একটু মুশকিলে পড়েছি'।

'মামলা বাধল নাকি? অনেকদিন বড় মামলার তোড়জোড় করোনি'।

'আজ্ঞে সেসব নয়, রানী। আপনার স্কুলটার বিষয় নিয়েই...'

রানী হাসলেন, 'পিয়েত্রোর সেই জ্ঞানদা বিদ্যালয়ের'?

'হ্যাঁ। ডানকানসাহেবের সঙ্গে বিবাদ-না লেগে যায়'।

'কেন'?

'হেডমাস্টার আসছেন একজন খ্রিস্টান মিশনারি'।

'খ্রিস্টান মিশনারি কেন'?

'ভদ্রলোক হেডমাস্টার হিসাবে উপযুক্ত হবেন মনে হচ্ছে'।

'তবে'?

'ডানকান চায় না সত্যিকাবের শিক্ষায় কেউ শিক্ষিত হয়ে ওঠে, অন্যায়কে অন্যায় বলতে শেখে। ভালো খ্রিস্টান মিশনারিদের সে সেই জন্য ঘৃণা করে। মিশনারিদের নাম শুনলে বিদ্বেষ প্রকাশ করে। যে-হেডমাস্টার আসছেন তাঁর স্ত্রী সম্ভবত ফিবিঙ্গি। আমার ভয় হচ্ছে হয়তো-বা ডানকান এসব কারণে বিবাদ শুরু করতে পারে'।

'দ্যাখো হরদয়াল, ওদের দেশ, ওরা রাজা...'

সহসা হরদয়ালের মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল, কিন্তু বানীর সঙ্গে কথা বলার সময়ে উষ্ণতা প্রকাশ করা চলে না। সে মাটির দিকে চোখ রেখে বলল, 'দেশ ইংরেজের বটে, ডানকানের নয়। যে-দেশে বার্ক জন্মায়, যে-দেশের মাটিতে ফিলিপ সিডনি জন্মায়, যে-দেশের লোক বীটনসাহেব, সে দেশে ডানকানদের মতো মূর্খ জন্মায় বটে, তাই বলে সে দেশের প্রতিনিধি হয় না'।

'কী করতে হবে'?

'আপনার আশ্রয় পেলে আমি ডানকানের বিরুদ্ধতা সহ্য করতে পারব'।

'বিরুদ্ধতা যদি শুরু করেই, পিয়েত্রোর সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ কোরো। বিদ্যালয়টাতে তো তারও কিছু কিছু উৎসাহ আছে'।

'তা আছে, কিন্তু ভদ্রলোক যেন কেমন নির্জীব'।

'ওতেই হবে। চিরকালই অমনি লোকটি, কিন্তু...'

হঠাৎ রানী কথার মাঝখানে থামলেন। মুখ নিচু করে বুটিদার জাজিমের একটা বুটিতে আঙুল ঘষতে ঘষতে বললেন, 'তোমাদের কথা শুনে শুনে লোকটিব সম্বন্ধে আমার একটা ধারণা হয়েছে, তাতে আমার মনে হয় লোকটির নির্জীব মনে হলেও তার সাহস বা শক্তির অভাব নেই'।

হরদয়াল বলল, 'আপনার কথা মনে রাখব। আজই বোট রওনা করে দিচ্ছি হেডমাস্টারকে আনার জন্য। বাতাস পেলে যেতে-আসতে পনেরো দিন, বাতাস না-পায়ও যদি তিন সপ্তাহে ফিরবে'।

হরদয়াল চলে গেল। রানী ভাবলেন, বয়সেই লোকের প্রৌঢ়ত্ব আনে না ; তা যদি আনত তবে হরদয়ালের কথায় এমন উচ্ছলতার সুর থাকত না। প্রায় প্রৌঢ় হয়েছে হরদয়াল বয়সের হিসাবে, কিন্তু বিদ্যালয়ের ব্যাপার নিয়ে সে সম্ভব-অসম্ভব কত কল্পনা করছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কোথায় কোন দেশ থেকে খ্রিস্টান হেডমাস্টার আসছে, তার নাকি আবার ফিরিঙ্গি স্ত্রী।

১৩

বুজরুক আলি ফিরে এসেছে। জেলখানার দরজায় একটা আট-বেহারার পালকি থামতে দেখে কয়েদিরা অবাক হয়েছিল, এমনকী জেলের কর্মচারীরাও। কয়েদির পোশাক পরা একটা লোক, তার নামের লেবেল-আঁটা শেরোয়ানি আচকান পরে কয়েদির পোশাক ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দাঁড়ালে নতুন বোধ হয়। ধূলিমলিন বিবর্ণপ্রায় আচকান-শেরোয়ানিতে বুজরুকের চেহারায় আশ্চর্য হবার মতো খুব বড় রকমের কিছু একটা ছিল না, বরং বিবর্ণ রুগ্ন চেহারার লোকটিকে দেখে মন বিমুখ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু অবাক করলে পালকি এবং পালকির সঙ্গে যে-লোকটি এসেছিল সে। কুল্লাযুক্ত পাগড়িটা বগলদাবা করে ন্যাড়া মাথায় বেরিয়ে জেলের লোহার দরজার বাইরে বুজরুক আলি দাঁড়াতেই ভদ্রলোকটি এগিয়ে এসে সসম্মানে তাকে গ্রহণ করল। ভদ্রলোকটি এই শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ও বিচক্ষণ উকিল বলে সুখ্যাত।

বুজরুক আলি মলিন মুখে হাসল, তারপর পালকিতে গিয়ে উঠল। উকিল তার ঘোড়ারগাড়িতে গিয়ে উঠল। পরস্পরকে শান্তি ও শুভযাত্রা কামনা করে পালকিতে বুজরুক ও টমটমে উকিল বিপরীত দিকে রওনা হল।

গ্রামে ফেরার ব্যাপারও এমনি নিঃশব্দে। বরং একটু কৌতুকের আভাস ছিল সেই নিঃশব্দতায়। ঘোড়ায় ফিরছিল রাজু পিয়েত্রোর কুঠি থেকে। কিছুদিন ধরে সে পিয়ানো নিয়ে মেতে উঠেছে। সকালে এসে খানিকটা অনুশীলন করে রোদ কড়া হবার আগেই ফিরে যায়। পিয়েত্রোর মতে মাসখানেক অনুশীলন করলে মোজার্টের সেই বিশেষ সুরটুকু তার হাতে শুনবার মতো হয়ে ফুটবে।

রোজকার মতো ফিরতে ফিরতে রাজু ঘোড়ার গতি কমাতে বাধ্য হল। পথটা চওড়া বটে, তাই বলে রাজুর ঘোড়া আর উল্টোদিক থেকে এগিয়ে-আসা চওড়া আট-বেহারার পালকিটা একইসঙ্গে পথের উপরে থেকে পরস্পরকে পার হবে এমন সম্ভব ছিল না। রাজু ঘোড়াটাকে একেবারে থামিয়ে দিল, কিন্তু লাগামের টান কড়া হওয়ায় কিংবা সামনের বেহারাদের হুম্‌হুম্ শব্দে বিচলিত হয়ে তার ঘোড়া পেছনের দু'পায়ে বারবার সোজা হয়ে উঠতে লাগল। ওদিকে বেহারারাও পথ ছেড়ে নিচে নামতে নারাজ।

কিন্তু সহসা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। রাজুর ঘোড়া হঠাৎ রাস্তার বাঁয়ে নেমে পড়ল, পালকির বেহারারাও তাদের বাঁদিকে নেমে পড়ে জায়গাটুকু পার হল।

রাজু রাস্তায় উঠে ভ্রূকুটি করে বলল, 'কে যায়'?

ঝাঁকুনিতে বুজরুকের তন্দ্রার ভাবটা কেটে গিয়েছিল, সে-ও বললে, 'কে চলে'?

কিন্তু ফিরে গিয়ে মান-অপমানের ফয়সালা করার মতো জেদ রাজুর তখন নেই, বুজরুকেরও তরোয়াল নিয়ে পালকি থেকে বেরুবার মতো শক্তি ছিল না। পরস্পরের পথ অতিক্রম করার কালে যে হাসি, গল্প ও হৃদয়োল্লাস স্বাভাবিক হতো সেটা একটা নিঃশব্দ দ্বন্দ্বের মধ্যে অতিক্রান্ত হল।

পরদিন পিয়েত্রোর ঘরে ঢুকে রাজু দেখল, পিয়েত্রো গালে হাত দিয়ে বসে চিন্তা করছে।

'বড্ড চিন্তা করছেন যেন'।

'বুজরুক এসেছে কাল'।

'কখন এল'?

'তুমি যাবার কিছু পরে'।

'কোথায়, কোথায় সে'?

'ওই ঘরে ঘুমুচ্ছে ; থাক-থাক, আর-একটু ঘুমিয়ে নিক'।

'সে কি, এখন তো আলি খাঁর এক-প্রহর বেলা। জেল খেটে কি সময়ের জ্ঞানও নষ্ট হয়েছে নাকি'?

পিয়েত্রোর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল।

রাজু বলতে যাচ্ছিল—অসুখ করেছে নাকি, কিন্তু মাঝপথে তাকে থামতে হল। ঘরের দরজা খুলে বুজরুক আলি প্রবেশ করল। খালি গা, একটা প্রকাণ্ড কাঠামো বলেই শীর্ণতা যেন অত প্রকট। রাজু তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দু-হাতে বুজরুক আলির দু-হাত ধরে বলল, 'আলি খাঁ'।

সহসা রাজুর কী হল ; কী জন্য বলা কঠিন, তার চোখ দুটি ছলছল করে উঠল। কথা বলতে কষ্ট হতে লাগল।

বুজরুক হাসল।

রাজু চোখের জল হাতের পিঠে মুছে বলল, 'এ হে, জেলখানায় খেতে দেয়নি'।

বুজরুক হেসে বলল, 'শ্বশুরবাড়িতে খেতে দেয় না, এ কি বিশ্বাস্য'?

'কিন্তু শরীর সারতে অনেকদিন লাগবে! এখন কিছুদিন খাওয়া-দাওয়া করো আব শুয়ে থাকো'।

'তা বটে। শুধু তাই নয়। ঘুম, ঘুম, কেবল দিনরাত্রি ঘুমব'!

'জেলখানায় ঘুমুতে না'?

'ওইটি কিছুতেই পারতাম না। ঘুমনোর আগে ওদের এক ঘুম-তাড়ানি মন্ত্র পড়তে হতো, তারপব আর ঘুম আসত না'।

'কী সে মন্তর'?

'ওদের সরকারকে সেলাম কিংবা ওইরকম একটা কথা ভাঙা ভাঙা উর্দুতে বলাতো'।

পিয়েত্রো বললে, 'বুজরুক, আর কথা বোলো না। বোসো। আগে খাও'।

একান্ত বাধ্য ছেলের মতো টেবিলে বসল বুজরুক। বাবুর্চি প্রস্তুত ছিল। পবাতে করে একটা বাটি সুরুয়া এনে দিল।

বুজরুক মুখ কাঁদো কাঁদো করে বলল, 'আজও এই'?

পিয়েত্রো শাসনের ভঙ্গিতে বলল, 'আগে খেয়ে নাও। ওই খেয়ে নাপোলেওঁর সেনাপতিরা দিনের পর দিন যুদ্ধ করেছে ; আর যুদ্ধ নেই, তবু ওটুকুতে তোমার পোষায় না'।

চামচ দিয়ে সুরুয়া নাড়তে নাড়তে সেটুকু শেষ করে বুজরুক বলল, 'আমাব উপরে খুব ঘৃণা হয়েছে, না বাজাভাই? ঘৃণা হওয়া খুব স্বাভাবিক। মন্‌সেনের মুখে শুনে ভারি ভালো লাগল। এমন যদি দেশের রাজা হয় তবে আবার হাতিয়ার ধরি'।

রাজু কী বলতে যাচ্ছিল এমন সময়ে আবার বাবুর্চি ঢুকল। থালায় করে পাখির মাংসে আর চালে রান্না করা কী-একটা খাদ্য। পিয়েত্রো উঠে এসে পরীক্ষার নজর দিয়ে দেখল।

পিয়েত্রো আবাব বলল, 'আগে খেয়ে নাও'।

বুজরুক সুবোধ বালকের মতো আহারে মন দিল। হুঁকাবরদার হুঁকা দিয়ে গেল। গড়গড়ার নলটা নিয়ে পিয়েত্রো ধোঁয়ায় ডুবে গেল!

আহার শেষ হলে বুজরুক বলল, 'কাল থেকেই এইরকম শুরু হয়েছে। বাবুর্চি বলছে স্বাভাবিক খাদ্যে পৌঁছুতে আমার একপক্ষ কাল যাবে। মন্‌সেনেব চোখে আমার আর সাবালক হওয়া হল না'।

রাজু বলল, 'তুমি বাইরে আসায় আমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত খুশি হয়েছি'।

'কে বলবে হননি। আমার বাইরে আসার পদ্ধতিটা অনুমোদন করেননি। আমি নিজেও খুব একটা করিনি। কিন্তু উকিলসাহেবের সঙ্গে কথায় পারবে কে! শিবাজির গল্প শুনিয়ে দিল। আলমগিরকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিল শিবাজি, কাজেই যে-কেউ ছল করে পালাতে পারে শত্রুর কয়েদখানা থেকে'।

'কিন্তু ওদের কী রকম দম্ভ দ্যাখো! ওদের নিশানকে সেলাম না-করলে ওরা তোমাকে ছাড়ত না'।

'তা করলেও ছাড়ত না। ওরা দাম্ভিক বটে, কিন্তু যত না দাম্ভিক তার চাইতেও বেশি ধূর্ত। নিশান-সেলাম ছলমাত্র। আসলে সবটুকুই আমাদের উকিলের প্যাঁচ। মামলা নিয়ে কলকাতার বড় আদালতে

এবং সেখান থেকে বিলেতের কোর্টে যাবার তোড়জোড় করছিল। আর এদিকে মামলায় সাক্ষী-সাবুদে নাকি গোলযোগ ছিল। সেকথা জানলাম পরে। ততক্ষণে উকিল এবং কালেক্টরে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। আমিও ক্ষমা প্রার্থনা করব, ওরাও আমার অপরাধ মকুফ করবে। আসলে যে আমার অপরাধ পিনালকোডের আওতায় পড়েনি এটা ওরা স্বীকার করলে না। এছাড়াও আসলে কী হয়েছে কে বলবে! জালিয়াতিতে ওরা সবাই ক্লাইভের চেলা। প্রয়োজন হলে সব কাগজ জাল করতে পারে। এতসব কথা কেন বললাম, জানেন রাজাভাই? অন্য লোকে ঘৃণা করলে আমার কষ্ট নেই, কিন্তু আপনি ঘৃণা পোষণ করলে কষ্ট হবে'।

রাজু একমনে বুজরুক আলির কথা শুনছিল। সে বলল, 'আলি খাঁ, তুমি ভয় পেয়ে অন্যায়কে মেনে নেবে এ-বিশ্বাস আমি কোনোদিনই করব না'।

বুজরুকের ইচ্ছা হল সে একটু রসিকতা করে, ব্যাপারটা লঘু করে আনার চেষ্টাও করল, কিন্তু পারল না। বলল, 'আপনার এ-বিশ্বাস যেন রাখতে পারি ভাই'।

অবশেষে আবহাওয়াটা হাল্কা করে দিল পিয়েত্রো গ্রামের কথা তুলে। রাজবাড়ির নাচের কথা বলল সে, রাজুর পিয়ানো শেখার কথা, ডানকানের সঙ্গে রাজুদের কী রকম সদ্ভাব হয়েছে। সাধারণ ঘটনাকে গল্পের মতো জমিয়ে তোলা একটা অনন্যসাধারণ ক্ষমতা, পিয়েত্রোর এ ক্ষমতা ছিল। ঘটনাগুলি বুজরুকের কাছে তো নতুন লাগবারই কথা, রাজুর কাছেও নতুন লাগতে লাগল।

তারপর দেওয়ানের স্কুলের কথাও উঠল।

বুজরুক বলল, 'ইংরেজি শেখার জন্যই স্কুল'?

পিয়েত্রো বলল, 'ভাষা নয় শুধু, জ্ঞান-বিজ্ঞান'।

'তা বটে, ওরা রেলগাড়ি টেলিগ্রাফ ইত্যাদি আবিষ্কার করেছে। স্কুলে কি রেলগাড়ি তৈরি করাও শেখানো হবে'?

'তা হবে না? ভাষাটা আয়ত্ত করতে পারলে ওদের জ্ঞানভাণ্ডারের খোঁজ-খবরও ছাত্ররা নেবে'। রাজচন্দ্র বলল।

পিয়েত্রো হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি কি ভয় পাচ্ছ সারা দেশ খ্রিস্টান হয়ে যাবে'?

'হতে পারে তো'।

'এদেশে সবই উল্টো। আর যা-ই হোক, এদেশে ধর্মমত বদলাবে, সারা দেশ অন্য ধর্ম মেনে নেবে, এমন মনে হয় না। দু-তিনশো বছরে খ্রিস্টান রোম সারা যুরোপকে খ্রিস্টান করেছিল, পাঁচশো বছরেও ভারত ইসলামি হয়নি। বরং এদেশে এসে কান পেতে এদের কথা শুনলে নিজেদের পৈতৃক ধর্মটাই বদলে যায়। এরা অত্যন্ত পুরনো, ঠাকুরদাদাকে যেমন আধুনিক করা যায় না যতই আধুনিক পোশাক পরাও, এও তেমনি'।

বুজরুক পিয়েত্রোর কথাগুলি ধীরভাবে শুনে বলল, 'জেলের খাঁচায় বসে এই কথাটা প্রায়ই ভাবতাম। ছোটবেলায় মৌলবিসাহেবের কাছে শুনেছিলাম মাহমুদ গজনি আর মাহমুদ ঘোরি এদেশে ইসলাম এনেছেন। কথাটা উল্টোপাল্টে দেখতে গিয়ে আমাদের পিরসাহেবের ছেলে যে কেচ্ছা বলেছিল তাও মনে পড়ল। মাহমুদ ঘোরি কুফ্রি শাসন করে গাজি হবার আগে স্বদেশে গজনিরাজ্য উৎখাত করেছিল, ভারতে প্রবেশ করেও শত-সহস্র ইসলামি বধ করে গজনি সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিল। আর তারপরও ভারতে ইসলামি বাদশারা যত যুদ্ধ করল তাতে মুসলমান সৈন্য যত বধ হয়েছে, হিন্দু সৈন্য তত নয়। রাজ্যবিস্তার আর ধর্মবিস্তার এক নয়, একসঙ্গে হয় না'।

পিয়েত্রো বলল, 'তাহলে দেওয়ানের এই স্কুল করা তুমি সমর্থন করো এদিক থেকে'?

বুজরুক হাসতে হাসতে বলল, 'দেখা যাক, দেখা যাক। দেওয়ানসাহেব যে অন্তত খ্রিস্টান নয়, এ তো আপনিই কিছুক্ষণ আগে বললেন। আমি শুধু ভাবছিলাম যুদ্ধের সময় ধর্মজ্ঞান থাকে কিনা, আর

রাজ্য মানেই যুদ্ধ। হজরৎ শের শাহের হিন্দু সেনাপতির দাপটে হুমায়ুন বাদশার প্রাণ যায় যায়। এদিকে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টানের ষড়যন্ত্রে মুসলমান নবাবি শেষ হল, মুসলমান নবাবের জন্য হিন্দু প্রাণ দিল, ফরাসি খ্রিস্টানও দিয়েছিল দু-একজন'।

পিয়েত্রো টিপ্পনি কাটল, 'যুদ্ধজ্ঞানটা তোমার ঠিক আছে, ধর্মজ্ঞান না-থাকলেও'।

বুজরুক গম্ভীর হওয়ার ভান করে বলল, 'তাও যদি থাকবে তবে কি আর জেল খাটি! দেখা যাক'।— বলে বুজরুক যতই বিষয়টিকে পিছিয়ে দেবার চেষ্টা করুক তার বক্তব্য আদৌ শেষ হয়নি। কিছুক্ষণ অন্য কথা বলে আবার সে স্কুলের কথায় ফিরে এল।

সে বলল, 'স্কুলের পণ্ডিতরা কি বলবেন না, ইংরেজ জাতের মতো এমন আর-কোনো জাত নেই'?

'তা খানিকটা বলবে বইকি'। পিয়েত্রো বলল।

'কিন্তু তাও যদি না-বলে? শুধু ইংরেজদের এই এই সদ্‌গুণ আছে, অন্য জাতের নিন্দা না-করেও যদি বলে'?

'কী ফল হবে তার'?

বুজরুক কথাটা ভেবে নিল মনে মনে, তারপব বলল, 'সে এক অদ্ভুত ব্যাপার হবে, ছাত্রবা নিজেদেব ছোট ভাবতে শিখবে। আমার এই রাজাভাইয়ের কথাই ভাবুন না! ইংরেজি ভাষাজ্ঞান আমাদের দুজনেরই সমান। আমবা তো মূর্খ ভাবতে আরম্ভ করবই নিজেদের, আর সেই ছাত্ররা যারা নিজেদের ইংবেজদেব চাইতে ছোট মনে করতে শিখবে তারাও আমাদের ছোট ভাববে'।

সেদিন আর পিয়ানোর অনুশীলন করা হল না।

রাজুকে ঘোড়ায় তুলে দিতে দিতে বলল বুজরুক, 'রাজাভাই, শরীর একটু সারলে আবার একদিন শিকার খেলতে যাব। যাবেন তো'?

'নিশ্চয় যাব'। ঘোড়ার উপরে লাফিয়ে বসতে বসতে হাসিমুখে বলল রাজু, 'কাল সকালে আবার আসব'।

রাজু চলে গেলে বুজরুকও স্নান করতে গেল। পিয়েত্রো তখন স্কুলের প্রসঙ্গটা ভাবল : পলাশি যুদ্ধের বিষয় নিয়ে কতকগুলি ছড়া রচনা কবেছে কয়েকজন সংস্কৃতিবিহীন গ্রাম্য ছড়াকার, তাতে ইংরেজ জাতিকে বীরশ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছে। যারা সত্যিকারের ইতিহাস জানে না, তারা ভাবতে শিখবে ছড়াকাররা যা বলছে সেটাই সত্য। ইংরেজ এদেশ জয় করেছে বাহুবলে। এদেশের লোকদের স্বাস্থ্য ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে, তাবপরে মনেও যদি ইংরেজদের শক্তির স্বীকৃতি বাসা বাঁধে—চিরদাসত্ব ছাড়া অন্য কোনো পথই থাকবে না এদের। ঠিক এমনিভাবেই জ্ঞান-গরিমাতেও যদি জাতি হিসাবে ইংরাজের শ্রেষ্ঠত্ব এরা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেয় তাহলে ভাবের দাসত্ব চিরস্থায়ী হবে। তার চাইতে বড় অধীনতা আব কী আছে? বিশেষ কবে ইংবেজের শিক্ষাপদ্ধতি ও তাদের কলকাতা-সংস্কৃতিকে বিচার করে দেখা দরকার।

কিন্তু হয়তো শেষ পর্যন্ত এদের মধ্যেও, এই কুশিক্ষার মধ্যেও এমন বীজ রোপিত হবে যাতে সত্যিকারের মহত্ত্ব পুষ্পিত হবে।

পিয়েত্রোর হাসি পেল কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায়। গতবার কলকাতায় বণিকমহলে সে কয়েক ঘণ্টার জন্য গিয়েছিল। সেই বণিকদের একজন দুঃখ করে বলেছিল, তার এক এতদ্দেশীয় ক্লার্ক নাকি তাদের মুখের ওপর ন্যায় ও নীতি নিয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছে। এবং সে-বক্তৃতায় সে নাকি বলেছিল—বার্ক ও শেরিডানকে আদর্শস্থানীয় বলে মনে করি বলেই যদি মিস্টার হজ্ সেই শ্রদ্ধা চান তবে তার চাইতে মূর্খতা আর-কিছুতেই নেই।

সাধারণের পক্ষে এ-শিক্ষার কিছুমাত্র যৌক্তিকতা নেই, তবে কিছু নেতা তৈরি করছে। ইংরেজি-জ্ঞানে তাদের মনকে উন্নত করছে তা নয়, তীক্ষ্ণ করছে ; প্রতিদ্বন্দ্বী হতে হলে যে যোগ্যতা দরকার সেগুলি

তারা আহরণ করছে ইংরেজদের কাছ থেকে। ঠিক যেন বারুদের ব্যবহার শত্রুর কাছে শিখে নেওয়া।

পিয়েত্রোর তামাক বদলে দিয়েছিল হুঁকাবরদার। নতুন তামাকে মুখ দিয়ে পিয়েত্রো ভাবল : যেমন ধর্মের ব্যাপারে। নিজস্ব সংস্কৃতি যাদের নেই তারাই খ্রিস্টান হয়েছে। তেমনি শিক্ষার ব্যাপারে ইংরেজদের অনুকরণ তারাই করবে যাদের শিক্ষার ঐতিহ্য নেই। যাদের সেটা আছে তাদের সঙ্গে প্রতি মিটার জমির জন্য ঝগড়া হবে। ইংরেজি শিক্ষার দ্বন্দ্বপ্রবণতা এদিক দিয়ে মন্দ নয়। রাজা চার্লসের মৃত্যুদণ্ডের কথা, ফরাসিদেশের রেভল্যুশন, বার্কের বক্তৃতা এদের জানা থাকা ভালোই। মানসিক উন্নতি না-হোক, ইংরেজদের রাজনীতির সমকক্ষ হোক।

বুজরুক স্নান শেষ করে ফিরল। সাঁতারের পরিশ্রমে তার মুখমণ্ডল রক্তাভ।

'কী ভাবছেন? স্নান কখন হবে? দুপুরের টেবিল পেতেছে দেখলাম'।

'এত বেলা হয়েছে'? পিয়েত্রো হুঁকার নল ফেলে উঠে দাঁড়াল। 'তুমি আমার জন্যে দেরি কোরো না। ওরে, গোসলখানায় জল দে'।

সেদিনটা শেষ হবার আগেই আর একবার স্কুলের কথা উঠল পিয়েত্রোর কুঠিতে।

রাত্রির আহারাদির শেষে বুজরুক টেবিলে বসেই বলল, 'একবার যাব নাকি দেওয়ানসাহেবের কাছে স্কুলের কথা বলতে'?

'কী বলবে? স্কুলের ফল ভালো হবে না'?

'এটাই তো সোজা এবং সরল এবং আসল কথাও'।

'কিন্তু দেওয়ানের কাছে প্যাঁচে তুমি এখনও শিশু, বুজরুক'।

'কী রকম'?

'স্কুলটা হচ্ছে আমাদেরই জমিতে, স্কুলের নামটাও আমাদেরই দেওয়া। বোধ হয় ট্রাস্ট-দলিলে আমাদেরও নাম থাকবে'।

'কী অন্যায় কথা, আপনি মত দিলেন'?

পিয়েত্রো তিরস্কার শুনে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

বুজরুক বিচলিত হয়ে বারংবার বলতে লাগল, 'কী অন্যায়, কী অন্যায়'!

পিয়েত্রো বললে, 'অবশ্য সে আমার ব্যক্তিগত মতই নিয়েছে, তোমার এ-বিষয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই'।

'ওটা কি আর কোনো দামের কথা হল, মন্‌সেনে'?

পিযেত্রো অতি সন্তর্পণে মদের গ্লাসটা পূর্ণ করতে করতে বলল, 'বুজরুক, যদি তুমি ইংরেজবিমুখী কিন্তু সত্যিকারের শিক্ষা দিতে চাও, আমার ওই আটচালায় স্কুল বসাও'।

'পাল্টা স্কুল'?

'মন্দ কী'?

১৪

দেখা হবার সুযোগ ছিল, তবু দেখা করেনি। দুপুরে মহাভারতে পড়া শেষ করে রানীর ঘর থেকে বেরিয়ে সোজাসুজি নিজের বাসায় না-ফিরে নয়নতারা আজকাল কখনও কখনও রাজবাড়ির আশ্রিতদের, পরিজনদের ঘরে গিয়ে বসে। তারা ডেকে নিয়ে যায়। আট-দশ দিন দেখা হয়নি রাজুর সঙ্গে। মহাভারত পড়ার সময় নয় এমনি এক সময়ে সে একদিন নয়নতারার বাড়িতে গিয়েও খুঁজে পায়নি তাকে। সে অভিমান এখনও আছে রাজুর মনে। মহাভারত পড়া শেষ করে আজ অন্য কারো ঘরে না-গিয়ে নয়নতারা

পা টিপে টিপে রাজুর ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। আশা করেছিল রাজুকে ঘরেই পাবে, কিন্তু ঘরে সে ছিল না।

নিজের বাড়িতে ফিরে, তখনও দুপুরবেলা পার হয়নি, নয়নতারা চরকা নিয়ে বসল। এটা নয়নতারার শখ। এক তাঁতির সঙ্গে কথাও বলছে। তাঁতি বলেছে সুতো দেখলে তবে সে কথা দিতে পারে। জরি তার কাছে নেই, সদর থেকে আনিয়ে নেবে। রাজুর ধুতি-চাদরের সুতো কাটছে নয়নতারা। তার চাইতে ভালো কাটুনি নেই তা নয়, দামি ভালো ধুতি কিনতে পাওয়া যায় না, এমনও নয়। দাম দিয়ে কিনে রাজকুমারকে দিতে পারে রাজকন্যা। নয়নতারার দাম দিয়ে কিনে দেওয়ার কথা মনেই হয়নি। দাম দিয়ে কেনার মধ্যে জরিটুকু আর দাম দেওয়ার মধ্যে তাঁতির মজুরি। চারখানা কাপড়ের সুতো কেটে দেবে নয়নতারা, তার পরিবর্তে নয়নতারার পরিকল্পনা মতো জরি বসিয়ে একজোড়া ধুতি-চাদর তৈরি করে দেবে তাঁতি। সুতো দেখে তাঁতি জিজ্ঞেস করেছিল—কার জন্যে মা, এত দামি জিনিস কার জন্যে হবে?

—দামি কোথায়, কাপাসের আবার দামি কী!

'কী হচ্ছে'?

কথাটা কানে গিয়েছিল নয়নতারার। সুতোর খেইটা তখনও হাতে, টাকুতে জড়িয়ে রেখে মুখ তুলে নয়নতারা হাসল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রাজকুমার।

নয়নতারা উঠে চরকা ও তুলো একটা বড় বেতের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে পালঙ্কের তলায় সরিয়ে রাখলও, উঠে এসে রাজুর কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালও। নয়নতারার ঠোঁট দুটি একটা মৃদু হাসিতে ভরে উঠল, 'বড্ডও রাগ হয়েছে। কোথায় ছিলে সারা দুপুর, খুঁজে পেলাম না। তোমার ঘরেও গিয়েছিলাম'।

রাজকুমারের মুখ বিমর্ষ।

নয়নতারা কথার সুর বদলে ফেললও, 'শিকারে যাচ্ছও? বড্ডও রোদ্দুর যেন'।

'নয়ন'!

'বলো। আমি তো তখন থেকেই শুনবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি'।

'না, কিছু না। চলো, দুজনে বেড়িয়ে আসি'।

'সে কি, এই দুপুর রোদ্দুর মাথায় করে কোথায় বেড়াতে যাবে'?

'অনেকদিন আগে যেন আমাদের এইরকম কথা হয়েছিল মনে পড়ছে। চলো। দুপুর রোদে একা একা বেড়ালাম খানিকটা। ভালো লাগল না। মনে হল তোমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ালে ভালো লাগবে। সেখানে চলো যেখানে আর-কেউ নেই। আমি রূপচাঁদকে বলে দিই, রামপিয়ারিকে সাজিয়ে আনুক'।

'এখানে বোসো, গল্প করি'।

'না, নয়ন, এখানে বসতে ইচ্ছে করছে না'।

নয়ন একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'মেয়েমানুষ কি বেড়াতে পারে! লোকে নিন্দে কববে যে, তোমাব নিন্দে হবে। সে ভালো নয়'।

'আংটি-বদল তাহলে তোমার ছল, নতুবা আমার সঙ্গে পথে কেন, নরকে যেতেও আপত্তি করতে না'।

'শোনো, শোনো'।

রাজু অভিমানে মুখ লাল করে চলে গেল।

খানিকটা সময় বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে থেকে নয়নতারা তার প্রতিবেশী একটি বালককে ডেকে পাঠাল। সে এলে বলল, 'রাজবাড়ি চিনিস তো, সেখানে রূপচাঁদ বলে একজন চাকর আছে। তাকে ডেকে আনবি। যদি খুঁজে ডেকে আনতে পারিস খইচুরের মোয়া দেব খেতে'। ছেলেটির বুদ্ধি ও তৎপরতা খইচুরের মোয়ার আকর্ষণ জাগ্রত করেছিল নিশ্চয়ই। রূপচাঁদকে সত্যি ধরে আনল ছেলেটি। তাকে মোয়া দিয়ে বিদায় করে নয়নতারা রূপচাঁদকে বলল, 'রাজকুমার কোথায় জানো রূপচাঁদ'?

'আজ্ঞে, তা জানি বইকি'।

'কোথায় আছেন'?

'রাজবাড়িতেই'।

নয়নতারার কৌতুক বোধ হল রূপচাঁদের মিথ্যা ভাষণের চেষ্টায়। সে বলল, 'তা হলে তুমি খবর রাখো না। আমি কিছুক্ষণ আগেই রাজবাড়ি থেকে এসেছি। রাজকুমার বন্দুক নিয়ে শিকারে গেছেন। কোথায় গেছেন তা জানো'?

মিথ্যা ধরা পড়ায় বিপন্ন মুখে রূপচাঁদ বললে, 'আজ্ঞে খোঁজ করে দেখি। আপনাকে খবর দেব'।

'হ্যাঁ। খবরটা আমি চাই। আর তুমি যে খবর রাখোনি, সে খবরটা আমার জানা রইল'।

আজকাল রাজকুমার বড় হয়েছেন, তিনি নিজের ইচ্ছায় চলাফেরা করেন, সঙ্গে লোক থাকা পছন্দ করেন না—এই রকম কতকগুলি কৈফিয়ত মিনমিন করে বলতে বলতে রূপচাঁদ পালাল।

বহুদিন পরেও রূপচাঁদ স্বীকার করেছে—সেই একদিনেই নয়নতারাকে চিনে নিয়েছে সে, দ্বিতীয়বার চিনবার দরকার নেই। বাকি জীবন বাধ্য হয়ে কাটিয়ে দিলেই চলবে।

সন্ধ্যার আগে রূপচাঁদ এল। সঙ্গে দুজন লোক। তাদের হাতে লাঠি ও হারিকেন। লোক দুটিকে দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে রূপচাঁদ নয়নতারার দিকে এগিয়ে এসে বলল, 'রাজকুমার শিকারে গিয়েছিলেন, মা। বড়ালের জঙ্গলে'।

'সে তো শুনেছি মস্ত বন। একা সেই বনে গিয়েছিলেন? কী সর্বনেশে ব্যাপার'!

'আর বলবেন না মা, সেই দুপুর থেকে ছুটতে ছুটতে লোকের কাছে সুধোতে সুধোতে জঙ্গলে গিয়ে তবে—সে যা হয়েছে, হয়েছে। সইস ঘোড়া নিয়ে গেছে। এবার আমরা যাচ্ছি শিকার কুড়োতে। বনজঙ্গল চষে ফেলার মতো অবস্থা। আমাকে বললেন—ঘোড়া নিয়ে আয়, আর সঙ্গে লোক আনিস, শিকার নিয়ে যাবে। পাখি যে কত মরেছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই, একটা চিতল হরিণও দেখলাম শিকার হয়ে গেছে'।

নয়নতারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শুনল, ধীরে ধীরে বলল, 'রূপচাঁদ, ফিরবার পথে তুমি একা একবার এসো। আমার একটু রাজবাড়িতে যাবার দরকার আছে'।

'আমাদের ফিরতে রাত অনেক হবে মা, এখন কাউকে ডেকে দিয়ে যাব'?

'তার দরকার নেই'।

রূপচাঁদ আবার এসে যখন ডাকল, তখন রাত হয়েছে। আকাশে একটা ধূসর জ্যোৎস্না উঠেছে। রাতের দিকে তাকিয়ে সময়ের মাপ বোঝা যাচ্ছে না, যতটা প্রকৃতপক্ষে গভীর তার চাইতেও গভীর বোধ হচ্ছে জ্যোৎস্নাটার জন্য।

রূপচাঁদের ডাক শুনে একটা মোটা বড় চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে নয়নতারা বারান্দায় এসে দাঁড়াল, ঘরের শেকলটা তুলে দিয়ে বলল, 'চলো'। নয়নতারা আগে যাচ্ছে, পেছনে নিঃশব্দে রূপচাঁদ।

রূপচাঁদ বলল, 'মা, রানীমাকে যেন বলবেন না দুপুরবেলার কথা। আমি ভেবেছিলাম রাজকুমার আপনার বাড়িতে এসেছেন'।

রূপচাঁদের কথায় একটু বিব্রত বোধ করলেও নয়নতারা স্বাভাবিক গলায় বলল, 'ভয় নেই তোমার। কিন্তু একটা কথা তুমিও মনে রেখো। খিড়কি দিয়ে ঢুকতে গিয়ে কেউ যদি আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করে, কী বলবে'?

রূপচাঁদ একটু ইতস্তত করল, তারপর বলল, 'বলব আমার মাসিমা। মা নেই, নতুবা মা-ই বলতাম'।

ধূসর একটা ছায়ার মতো রূপচাঁদের পেছন পেছন নয়নতারা খিড়কি পার হয়ে, রান্নার মহল ঝিদের মহল পার হয়ে অন্দরের চত্বরে এসে দাঁড়িয়ে রূপচাঁদকে বলল, 'এবার তুমি যাও'।

রূপচাঁদ চলে গেলে একবার ইতস্তত দেখে নিয়ে রানীমহলের পথের দিকে যেতে যেতে একটা

দেয়ালের আড়াল পেয়ে নয়নতারা রাজকুমারের ঘরগুলির দিকে চলতে আরম্ভ করল। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে দুটি ভৃত্যের গলা শুনতে পেয়ে নয়নতারা একবার থমকে দাঁড়াল, এছাড়া আর-কোনো অসুবিধা হয়নি রাজকুমারের ঘরে পৌঁছতে।

রাজকুমারের ঘরে দেয়য়ালগিরির আলো। লাল রং-করা কাচকড়ার দেয়ালগিরির ডোম, লাল আলোয় ঘরটা ভরে আছে। পালঙ্কে রাজকুমার ঘুমের মতো নিথর নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছে।

নয়নতারা মৃদু গলায় ডাকল, 'রাজকুমার, আমি এসেছি'।

'কে'? রাজু ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। 'কে তুমি'?

নয়নতারা মোটা চাদরটার অবগুণ্ঠন না-খুলে শুধুমাত্র মুখ দেখা যায় এমন করে অবগুণ্ঠনটা টেনে দিয়ে বলল, 'আমি, তোমার নয়ন'।

রাজকুমার বিছানা ছেড়ে উঠে এল, নয়নতারার কাছে এসে তার চোখে চোখ রেখে বিস্মিত হয়ে গেল। এমন চোখ আর সে কখনও দেখেনি। রাজকুমার তারপর বোকার মতো প্রশ্ন করল, 'এখন রাত্রি নয়'?

'হ্যাঁ'।

'তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে এলে'?

'হ্যাঁ। তুমি তো আমাকে অভ্যর্থনা করলে না'?

রাজকুমার করবার মতো কিছু খুঁজে না-পেয়ে নয়নতারার হাত ধরল, হাত ধরে দুজনে বিছানায় গিয়ে বসল।

নয়নতারা বলল, 'রাজকুমার, তুমি একা বনে গিয়েছিলে শিকাব কবতে? কাজটা ভালো করোনি। ভেবেছিলাম তোমাকে খাণ্ডববিজয়ী পার্থ বলব, কিন্তু খুব রাগ হল। খুব কষ্ট দিলে আমাকে। শুধু বনে যাওয়া নয়, পাখি আর হরিণ মেরে জ্বালিয়ে দেওয়াব মতো নাকি কবেছ'?

'এসব কথা তোমাকে কে বললে'?

'তুমি ভাবো আমার বুঝি দূত নেই'?

'দূত'?

'রাজকুমার, রাজকন্যেরও দূত থাকে'। আমি রাজকন্যে নই, তবু আমারও দূত বাখতে হবে। কিন্তু এমন বেপরোয়া হয়ে তুমি বেড়াবে তা কি আমার ভালো লাগে'।

'তোমার ভয় কী নয়ন, পাখি বা হরিণ মানুষের কিছু করতে পারে'।

'তা পারে না। তুমি কি মদ খাওনি'?

'না তো। মদ খাব কেন? মন খারাপ ছিল। তখন কি আর মদ খেতে ইচ্ছে করে। আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু করি'।

'কেন এমন মন খারাপ হয়? এত কী মন খারাপ হল যে পাগলের মতো ছুটে বেড়াতে হবে'?

'সে কিছু নয়, নয়ন'।

'কিছু নয় কি হতে পারে! আমার কাছে কি গোপন করতে আছে'!

'তুমি কি সত্যি আমার'?

'তা না-হলে এত রাত্রিতে আর-কারো ঘরে আমি যেতে পারি'?

'তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞের চাইতেও বেশি। এ ঋণ কোনোকালে শোধ হবে না'। রাজু ধীরে ধীরে বলল।

রাজকুমার একটু চিন্তা করল।

'একটু কৌতুকের ব্যাপার হয়েছে, নয়ন, তুমি নিজে বিদ্বান, তোমাকে তো কেউ বলবে না। বলবার কী-বা আছে তাদের'।

'হেসে বাঁচি না। তোমাকে কে কী বলেছে'?

'কিছু বলেনি। কিন্তু ভাবছি লোকে ধীরে ধীরে তাই ভাবতে শুরু করবে। স্কুলের কথা শুনেছ'?

'শুনিনি তো'।

'গ্রামে স্কুল হচ্ছে। সেখানে ইংরিজি পড়ানো হবে। গ্রামের সকলকেই বিনা বেতনে শিখতে দেওয়া হবে। কিছুদিন বাদে গ্রামের ছোটছেলেরাও যা জানবে আমি তা জানব না। মূর্খ রাজকুমার। সে-রকম একটা গল্প শুনেছ তো'?

'এরই জন্যে মন খারাপ'?

'মন খারাপ হওয়ার কথা নয়'? রাজু হাসি হাসি মুখে বলল।

নয়ন বলল, 'রাজকুমার'।

'তুমি আমাকে প্রবোধ দিতে পারো, কিন্তু সত্যিটাকে মিথ্যে করতে পারবে না'।

নয়নতারা ঝিকমিক করে হাসল, বলল, 'রাজকুমার, আমি কি মিথ্যে'?

'তা নয়'।

'আমাকে ভালোবাসতে কি তোমার বিদ্যার দরকার হয়েছিল'?

'তা কারো হয় না'।

'প্রজাদের ভালোবাসতে কি তোমাব বিদ্যার দরকার হবে'?

'তাও হয় না'।

'তাহলেই আমাব হবে। বাকি জীবনটা আমার তাতেই চলবে'।

রাজকুমার নয়নতারার চোখ দুটির দিকে চেয়ে চেয়ে খানিকটা চিন্তা কবে নিল।

'কি আশ্চর্য। নয়ন, তুমি আমার মনের কষ্ট দূর করার জন্যই এমন করে এসেছ'?

সোজাসুজি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে নয়নতারা বিপন্ন বোধ করল। তার কথা হারিয়ে যেতে লাগল।

রাজু বলল, 'নয়ন, আর তোমাকে আমি যেতে দেব না'।

'সে কি কথা, লোকে বলবে কী'?

'যা বলার তা এতক্ষণে তারা বলছে। তুমি ভেবেছ তারা জানে না তুমি আমার বন্ধু'?

'তা হয়তো কেউ কেউ জানে। আজ নয়, আর-একদিন এসে তখন থাকব অনেকক্ষণ'।

'কিন্তু তুমি যাবে কী কবে? এতটা পথ একা একা! চলো আমি এগিয়ে দিয়ে আসি'।

'তুমিই-বা একা একা কী করে আসবে'?

'আসব কেন। আসার দরকাব কী? তুমি রান্না কববে, দুজনে একসঙ্গে খাব, তারপর অনেকক্ষণ ধরে গল্প করব'।

'তা কেন করব না? কাল দুপুরে আমার ঘরে তোমার নিমন্ত্রণ বইল'।

একটা ছোট দীর্ঘঃনিশ্বাস ফেলে রাজকুমার বলল, 'কিন্তু এখনই তো যাচ্ছ না। আর একটু বোসো'।

দুজনে পাশাপাশি বসে এ-কথা সে-কথায় আলাপ শুরু করল। পিয়েত্রোর কথা হল, বুজরুকের কথা হল। বুজরুকের কথায় আবার লেখাপড়ার কথা উঠল। নয়নতারা বুঝল এ-বিষয়ে কোথায় একটা লুকানো বেদনা আছে রাজচন্দ্রর। সান্ত্বনা দিতে দিতে একসময়ে সে বলল, 'রাজ্যটা চালাতে, লোকের উপকার করতে যে দয়ার দরকাব, অন্যায়কে চুরমার কবে দিতে যে সাহস থাকা দরকার তা বিদ্যালয়ে না-পড়েই পাওয়া যায়'।

তারপর শিকারের কথা উঠল। রাজু বলল, সে বনকে ভয়ও যেমন করে, ভালোও তেমনি বাসে।

তখন নয়ন বলল, যে সে একদিন যাবে।

'কী করে যাবে, তুমি তো ঘোড়ায় চড়বে না'!

'কে বলল চড়ব না'।

'সে কি! তুমি আমাকে আজ শুধু অবাক করেই দেবে! কবে যাবে শিকারে তাই বলো'।

'এরপর আবার যেদিন কখনও তোমার মন খারাপ হবে'।

'তাহলে সেদিন দুটো ঘোড়া নিয়ে তোমার বাড়ি যাব। বন্দুক যে একটা। মানে, ভালো বন্দুক। হাসছ মনে মনে, না'?

'না, হাসব কেন'!

'এইজন্য যে, মন খারাপ হলে কারো লটবহর সাজিয়ে শিকারে যাবার কথা মনে থাকে না। একদিন কিন্তু সত্যি তোমাকে নিয়ে বনে বেড়াতে যাব। গাছের ছায়ায় ছায়ায় কী ভালো যে লাগে, কী বলব তোমাকে। তখন তোমার কথা মনে হয়, নয়ন। তুমি সঙ্গে থাকলে হাঁটতে হাঁটতে বনের শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায়'।

'বেশ, তাই হবে একদিন'।

নয়নতারা উঠে দাঁড়াল।

রাজু বলল, 'তুমি কী করে যাবে এ ভেবে আমার লাভ নেই। তুমি নিজেই বুদ্ধি করে ফিরে যাবে আমি জানি'।

নয়নতারা চলে গেল।

নিজের বাড়িতে ফিরে নয়নতারা চাদর খুলে ফেলে ছায়ায় বসে একটু জিরিয়ে নিয়ে এক গ্লাস জল খেল। কেমন একটা চাপা গরম লাগছে।

কিন্তু তার অভিসারপর্ব তখনও শেষ হয়নি। অত রাত্রিতে রাঁধবার ইচ্ছা ছিল না। দরজা দিয়ে প্রদীপটা নিভিয়ে সে শুতে যাবে এমন সময়ে পাড়ার সব কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। নয়নতারার প্রতিবেশী পুরুষদের গলার সাড়া পাওয়া গেল। নয়নতারার ভয় ভয় করল কিন্তু তার মধ্যেও অন্য ধরনের এক আশঙ্কা হল, রাজু নয়তো!

সে জানলায় দাঁড়িয়ে দেখল পাঁচ-ছজন সশস্ত্র লোক তার আঙিনায় এগিয়ে আসছে। কিন্তু রূপচাঁদকে চিনতে পারা গেল।

রূপচাঁদও নয়নতারাকে দেখতে পেয়েছিল। সে বলল, 'মা, ঘরে ফিরেছেন'?

'হ্যাঁ। কী খবর'?

'আজ্ঞে আপনি ফিরেছেন কিনা জানতে এলাম'।

'এত লোক কেন'?

'আজ্ঞে তাই হুকুম। আমরা চললাম মা'।

রূপচাঁদ চলে গেল হ্যাই-হ্যাই করে কুকুর তাড়াতে তাড়াতে।

প্রতিবেশীদের একটি জোয়ান ছেলে ডাকল, 'দিদি ঘরে'?

'হ্যাঁ বলা, ঘরেই আছি'। নয়নতারা আবার জানলার কাছে এল, 'ওরা রাজবাড়ির লোক। আমি ফিরেছি কিনা খোঁজ নিতে এসেছিল'।

'রাজবাড়িতে কাজ ছিল বুঝি'?

'একটু দরকার ছিল'।

বলাই লাঠিটা কাঁধের উপরে ফেলে চলে গেল।

নয়নতারা শুতে গিয়ে হাসি হাসি মুখে ভাবল, ভাগ্যে কুকুরগুলো রাজুকে দেখলে ভয় পায় না, নতুবা কবে কোন কৌতুকের ব্যাপার ঘটে যেত ঠিক ছিল না।

কিন্তু সে-রাত্রিতে ভালো ঘুম হল না রাজুর। এক-একটা অদ্ভুত দিন আসে মানুষের রোজকার দিনগুলির সঙ্গে মিলেমিশে। আজ তেমনি একটা দিন এসেছিল রাজুর। সকালে গিয়ে দেখা হল বুজরুকের

সঙ্গে। দীর্ঘ দিনের পরে বুজরুকের সঙ্গে দেখা হওয়াই এমন একটা ঘটনা যা সে কোনো একটি দিনকে বহুদিনের মধ্যে বিশিষ্ট করে চিহ্নিত করে দিতে পারে। তারপর সেই উষ্ণ ক্ষোভের জন্ম। এটা বুজরুকের সঙ্গে দেখা হওয়া বা অন্যান্য ঘটনাগুলির মতো সুস্পষ্ট নয়, প্রত্যক্ষ নয়, কিন্তু অনুভবের গভীরতায় অনন্যসাধারণ। বিদ্যালয়ে গ্রামের প্রজাসাধারণ শিক্ষিত হবে। কিন্তু শিক্ষিত হবার বয়স তার চলে গেছে। মর্মবেদনায় উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল মন। নয়নতারার অভাববোধ কী করে এর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। যেন নয়নতারাও এজন্যই দূরে থাকছে। স্বপ্নে একটা গভীর খাদে ডুবে যাওয়ার মতো অনুভব হয়েছিল তার। তারপর শিকার। শিকার নয়, সে-উদ্দেশ্য ছিল না—নিজেকে ক্লান্ত করা, ভয়ংকর কিছু ঘটিয়ে দেওয়ার প্রয়াস ছিল। নৃশংস হওয়ার মতো মনের অদম্যতা ছিল, নিজেকে রেহাই দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না। পাখি শিকার করতে গিয়ে কাঁটার খোঁচায় পা দিয়ে রক্ত পড়েছে, এক-হাঁটু কাদায় দাঁড়াতেও ঘৃণা করেনি। বরং বেদনা ও ঘৃণার অনুভূতিতে মনের অন্য একটি অংশকে পীড়ন করেই সুখ পাচ্ছিল। চিতল হরিণটাব মৃত্যুতেই চূড়ান্ততায় উঠল ব্যাপারটা। আহত হরিণটার সঙ্গে ছুটোছুটি করে ঘর্মাক্ত ও ক্লান্ত হয়েছিল রাজু, হরিণটা যখন পড়ে গেল তখন সে-ও বসে পড়েছিল একটা শুকনো গাছের গুঁড়িতে। দেহের সঙ্গে-সঙ্গে মন। হরিণটার চোখে জলের ধারা ছিল। মুমূর্ষু অবস্থায় প্রাণীমাত্রেরই চোখে জল আসে নাকি? কিন্তু ঈষৎ রৌদ্রতপ্ত সবুজ পৃথিবীতে যে-অভিজ্ঞতা সে পেয়েছে, সেটা শিকারের চাইতে বড়, তার মানসিক ক্ষোভের তুলনায় তা অনন্ত। তাব পদশব্দের প্রতিধ্বনিও যখন ডুবে গেল তখন বনের মর্মর শব্দের সঙ্গে পাখির ভাষা জেগে উঠল ; পাখি নয় শুধু—পতঙ্গের ভাষাও। দূরে কোথায় দুটি বনবিড়াল অনেকক্ষণ ধবে ঝগড়া করল। কতকটা মেনিবিড়ালের মতো, কিন্তু তাদের স্বরে মেনিবিড়ালের আভাসটুকুই আছে। হরিণকে সাধারণত বোবা মনে করা হয় এ-অঞ্চলে, কিন্তু চিতলের ডাকও কানে এল তার। পাতাগুলো গাছের থেকে পড়ার সময়ে ঘুরে ঘুরে পড়ছে, যেন এ-গাছ থেকে ও-গাছে উড়ে যাওয়ার একটা চেষ্টাও আছে তাদের গতিতে। বনের নেশা কথাটা জানা ছিল না রাজুর, কিন্তু একটা বোবা-আনন্দে সে বার-বার শিহরিত হয়ে উঠেছিল।

আর তারপব এল, সবার শেষে উত্তুঙ্গ আনন্দের মতো নয়নতারা। কেউ কী কল্পনা করতে পারে সে এমন করে আসতে পারে! শুধু দুটি মধুর কথা বলার জন্যই এসেছিল। শাদা চাদরে আপাদমস্তক ঢাকা কঠিন আবরণের মধ্যে মুক্তার মতো নয়নতারা। অবগুণ্ঠন সরালে নয়নতারার মুখ ঘরের রাঙা আলোয় যে-রকম দেখিয়েছিল তার তুলনা নেই। ভেবে দেখতে গিয়ে রাজুর মনে হল, সবচাইতে মধুর এ লুকোচুরি, এই গোপনতা। গোপনে এসেছিল বলেই বোধ হয় এমন সৌরভ রেখে গেছে সে। সৌরভ ছাড়া অন্য কোনো কথায় অনুভবটা প্রকাশ করা যায় না।

'আমাকে ভালোবাসতে কি তোমার বিদ্যার দরকার হয়েছিল'?

রাজু কথাটা এবং সেই সুবটা মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল। এমন কথা রাজু আর কারো কাছে শোনেনি। পিয়েত্রোর যখন খেয়াল হয় তখন সে ভাষায় শ্যাম্পেনের ঝাঁজ আনতে পারে, বুজরুক আনতে পারে অসীম ঔদ্ধত্যে ভরা দুঃসাহস। কিন্তু এমন স্নিগ্ধ কথা!

রূপচাঁদ ঘরে ঢুকল।

'হুজুর, মা ঘরে গেছেন'।

'কাল সকালে মনে করিস—তোর বকশিশ নিবি'।

রূপচাঁদ চলে গেলে রাজুর মনে হল এতক্ষণে নয়নতারা বিশ্রাম নিচ্ছে। কিন্তু মোটা চাদরে তাকে যেমন অপূর্ব দেখিয়েছিল এমন-আর কোনোদিন তাকে দেখেনি সে।

ঘাটে পাহারায় লোক ছিল। পালা করে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শেষরাত্রিতে যে পাহারায় ছিল তারই কপাল খুলল। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বজরাটা তার চোখে পড়েছে। পালে হাওয়া পেয়েছে। শনশন করে এগিয়ে আসছে বজরা, পেছনে সূর্যের গোলক। তাকালে অন্ধকার লাগে, তবু ঠাহর করে দেখল সে, এবং তারপর ছুটে খবর দিতে চলল দেওয়ানকে। অবশ্য তার আগে ঘাটের অন্যান্য পাহারাওয়ালাকে সে জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

দেওয়ান শুনে বলল, 'ঠিক দেখেছিস'?

'হুজুর, এত বড় বজরা এ-অঞ্চলে আর কার'।

'তুই বুঝি বকশিশ চাস'?

পাহারাওয়ালা বরকন্দজটি বোকা বোকা মুখে চেয়ে রইল, কিন্তু পায়ের কাছে হলুদ বঙের টাকার চাইতে ছোট একটা কী ঠুং করে মাটিতে পড়ল এসে। সে কুড়িয়ে নিযে ভাবল—একেই কি মোহর বলে!

আয়োজন ঠিক করাই ছিল। দেওয়ান খাসভৃত্যকে ডেকে বলল, 'পোশাক আন'।

চুনট-করা ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি, গরদের চাদর, পায়ে কালো পাম্প-শু, দেওযান পালকিতে উঠল। আগে-পেছনে দুজন-দুজন চারজন বরকন্দাজ দৌড়তে লাগল। নদীর ধাবে ঘাটের উপবে ইতিমধ্যে শামিয়ানা টাঙানো হয়ে গেছে। সদর-নায়েব তার খাসআমলাদের সঙ্গে নিয়ে সব ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। বড় বজরা তীরে ভেড়ে না। জলের মধ্যে খুঁটি পুঁতে পুঁতে তার উপবে পাটাতন ফেলে জেটি তৈরি হয়েছে। তিন হাত চওড়া সমতল কাঠের রাস্তা শামিয়ানার নিচে পর্যন্ত।

শামিয়ানার নিচে দাঁড়িয়ে হরদয়াল, তবে বাঁ দিকে সদর-নায়েব অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। নৌকো ততক্ষণে জেটির গায়ে লেগেছে।

নৌকো থেকে প্রথমে কালো পোশাক পরা কালো চেহারার একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক নামলেন, মুখের পাইপ থেকে তামাকের ধোঁয়া উড়ছে। তারপর একরাশ শুভ্র ফেনার মতো শাদা মসলিনেব লেস আর পাইপিং-এর মধ্যে ডুবন্ত অবস্থায় মেমসাহেব নামল।

শামিয়ানার তলে হরদয়াল বলল, 'আমি নিশ্চয়ই মিস্টার বাগচীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি'।

বাগচীসাহেব সাগ্রহে হরদয়ালের হাত চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিযে বলল, 'দেওয়ানসাহেবের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আনন্দিত'।

মিসেস বাগচীর সঙ্গে মিস্টার বাগচী অতঃপর সকলের পরিচয় করে দিল। আর-এক দফা আনন্দের উচ্ছ্বাস।

মিস্টার বাগচী স্ত্রীকে বলল, 'কেট, আমি তোমাকে বলেছিলাম এই গ্রামে আমাদের সুখে কাটবে। এমন অভ্যর্থনা যাঁরা সামান্য লোককেও করতে পারেন তাঁরা মহাত্মা'।

মিসেস বাগচী হরদয়ালকে বলল, 'আপনার বদান্যতায় আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ, দেওয়ানসাহেব। আপনি সত্যি মহৎ'।

মিসেস বাগচী বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করে। তার কথায় হিন্দি-উর্দুর টান আছে। মিস্টার বাগচী পালকিতে উঠতে আপত্তি করল। সে বলল, 'কতটুকু আর দূর হবে, হেঁটেই যাব'।

'তাও কী হয়। পালকি প্রস্তুত'।

মিস্টার বাগচীর মুখে সংকোচের চিহ্ন প্রকাশ পেল, সে হরদয়ালের দিকে অনুমতি চাইবার ভঙ্গিতে অগ্রসর হয়ে বলল, 'আমি হেঁটে গেলে কি আপনার আপত্তি আছে দেওয়ানসাহেব, আমি পালকিতে চড়তে অভ্যস্ত নই। কেট পালকিতে যাবে'।

ক্যাথারিন বললে, 'ডার্লিং, পালকি চড়তে আমারও ভয় করে'।

ক্যাথারিনের মুখে এমন একটা আতঙ্কের ছাপ পড়ল যে সমস্যার ভাবটা আর রইল না। হরদয়াল হো-হো করে হেসে উঠল।

সে বলল, 'আমরা সকলেই হেঁটে যাব'।

ঘটনাটা সামান্য, কিন্তু ব্যঞ্জনার দিক দিয়ে পরে গুরুত্ব অর্জন করেছিল। অতঃপর শোভাযাত্রা করে নতুন হেডমাস্টার ও দেওয়ান অগ্রসর হল। প্রথম সারিতে দেওয়ান, মিস্টার বাগচী এবং তার বাহু-আশ্রিতা ক্যাথারিন, তার পেছনের সারিতে সদর-নায়েব এবং তার আমলার দল। সবার পেছনে বরকন্দাজরা ও খালি পালকিগুলো।

শোভাযাত্রাটি কিছুদূর অগ্রসর হতে-না-হতে পথের দু'ধারে ভিড় জমে গেল। বোধ হয় ক্যাথারিনই তাদের আকর্ষণ। দর্শকের দৃষ্টিতে সে বেচারা ক্রমাগত লাল হয়ে উঠতে লাগল। মিস্টার বাগচীর আনন্দের অবধি নেই। দেওয়ানের কাছে এটা-ওটার পরিচয় নিচ্ছে এবং আনন্দ প্রকাশ করছে।

দেওয়ান-ভবনে পৌঁছে কিছুটা শিষ্টাচারের পর সদর-নায়েব সদলে বিদায় নিল। রইল শুধু দেওয়ান ও বাগচী-দম্পতি। বাগচী-দম্পতি জলযোগে বসল।

হরদয়াল বলল, 'মিস্টাব বাগচী, একটা কথা আপনাকে বলে রাখি। আপনি শুধু স্কুলের হেডমাস্টার নন, প্রতিষ্ঠাতাও। আমি চাই স্কুলটি আপনার মনের মতো শিক্ষায়তন হয়ে গড়ে উঠুক। আপাতত মাত্র দুজন সহকারী আপনাকে আমি দিতে পারব। বিদ্যায় তারা নগণ্য। কিন্তু একজন অর্থাভাবের জন্য, অপরজন বয়সের গুণে বোধ হয় আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করবে। অন্যান্য শিক্ষক তৈরি করে নেওয়ার ভার আপনার নিজের। এমন নয় যে বেতন দিলেই উপযুক্ত শিক্ষক পাবেন। প্রয়োজনের অতিরিক্তই আপনাকে খাটতে হবে। তবে প্রথম দিকে ছাত্রসংখ্যা খুব বেশি হবে না'।

বাগচী বলল, 'আমি কেটের জন্য একটি ঘরের চেষ্টা করেছিলাম, আমার মনে হচ্ছে এই গ্রামে তা পাওয়া যাবে। শিক্ষকতা আমার বৃত্তি নয়, কিন্তু বৃত্তি হিসাবে সেটাকে আমি খুব উচ্চ স্থান দিই। আমার মনে হচ্ছে আপনার সাহায্য পেলে শিক্ষকতার কাজে নিজেকে উপকৃত করতে পারব'।

হরদয়াল বলল, 'এখানে শহরের আমোদ-প্রমোদের কোনো বন্দোবস্ত নেই, শহরের মতো উচ্চশিক্ষিত প্রতিবেশী কদাচিৎ পাওয়া যাবে। তাছাড়া সবচাইতে বড় অসুবিধা, এখানে চার্চ নেই। আপনাদের উপাসনার অসুবিধা হবে'।

'এসব নিয়ে আপনি আদৌ কুণ্ঠিত হবেন না। প্রথমত, আমরা এর আগে মধ্যপ্রদেশের এমন জায়গায় ছিলাম যেখানে পুস্তক জিনিসটার নামও কেউ শোনেনি ; দ্বিতীয়ত, আমোদ-প্রমোদে আমরা অভিজ্ঞ নই। চার্চের কথা যা বললেন, তার উত্তরে বলা যায় উপাসনার পক্ষে চার্চ অপরিহার্য নয়। আর তাছাড়া আমাদের চার্চ স্বতন্ত্র'।

'মানে, আপনারা রোমান ক্যাথলিক নন'?

'প্রথম আলাপেই এতটা বলে বোধ হয় আপনার আতিথ্যের প্রতি অবিচার করছি, কিন্তু দেওয়ানজি, কথাটা যখন উঠেছে বলে রাখাই ভালো। ওটা আমাদের একটা অপরাধের মধ্যে দাঁড়িয়েছে, আপনার আতিথ্যে আর-বেশি জড়িয়ে পড়ার আগে স্বীকার করাই ভালো। আমরা রোমান ক্যাথলিক নই, প্রোটেস্ট্যান্টও নই, আমরা ইউনিটেরিয়ান। শুনেছি য়ুরোপে কোথাও কোথাও আমাদের মতবাদের লোক চার্চ তৈরি করছে, ভারতে তা নেই'।

'ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না'।

'আমরা রোমান ক্যাথলিকদের ও প্রোটেস্ট্যান্টদের মতো বহু ঈশ্বরে বিশ্বাস করি
মতবাদে যিশাস ক্রাইস্ট মহামানব কিন্তু দেবতা নন, দেবতার পুত্রও নন। আমরা ৲

অর্থে ঈশ্বরের সন্তান বলে নিজেকে মনে করতেন তাঁর জীবনচরিতকাররা সে-অর্থ বুঝতে পারেননি। আমরা মনে করি ঈশ্বর একমাত্র এবং অদ্বিতীয়, এবং তিনিই মাত্র মানুষের উপাস্য'।

'আপনাদের ধর্ম তাহলে ইসলামধর্মের মতো কতকটা...'

'ইসলামধর্ম কেন বলছেন, সনাতন হিন্দুধর্মও বলতে পারেন'।

'সে কি'!

'আপনি রাজা রামমোহনের নাম নিশ্চয়ই শুনছেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর লেখা খান দু-তিন চিঠির প্রতিলিপি পাই কেটদের বাড়িতে। আমার শ্বশুর ফাদার অ্যাণ্ড্রুজ তখন জীবিত ছিলেন। তাঁকে কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করায় রাজার লেখা খানকয়েক বই তিনি আমাকে পড়তে দেন। আমার এত ভালো লাগে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি যে, তিনি জীবিত থাকলে বোধ হয় তাঁর কাছে গিয়ে ধর্মশিক্ষা করার চেষ্টা করতাম। আমার শ্বশুরের সঙ্গে আলাপ হতো, দেখতাম, তিনিও রাজার মতকে সমর্থন করেন। আমার শ্বশুর এবং আমিই বোধ হয় মধ্যপ্রদেশের প্রথম ইউনিটেরিয়ান। আমার শ্বশুর তাঁর স্টাইপেন্ড প্রত্যাখ্যান করেন এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ ছেড়ে দিয়ে মধ্যপ্রদেশের ভিলদের এক গ্রামে চলে যান'।

বাগচী পাইপ ধরাল।

হরদয়াল বলল, 'এখন আপনাদের স্নান ও বিশ্রামের সময়। পরে কিন্তু আপনার শ্বশুর ও এই ধর্মের কথা নিশ্চয়ই আমাকে বলতে হবে। আশা করছি আমাদের বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হবে'।

বাগচী ধর্মভীরু খ্রিস্টানের মতো বলল, 'আমেন'।

হরদয়াল অতঃপর কেটকে বলল, 'মিসেস বাগচী, আপনার স্বামীর কাজে আপনার সহায়তা আমি আশা করছি। গ্রামের পুঁটে পুঁটে ছোঁড়াদের মানুষ করার ভার আপনাদের'।

ক্যাথারিন বলল, 'ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হোক'।

বাগচী দম্পতির জন্য দেওয়ান-ভবনের দুখানা ঘর আপাতত নির্দিষ্ট হয়েছে। তাদের নিজেদের জন্য যে-বাড়ি উঠেছে সেটার কাঠের রং এখনও কাঁচা আছে। এখনও তেমন ভালো করে ঝাড়পোঁছ হয়নি। যতক্ষণ না তারা নিজের বাড়িতে উঠে যায় ততদিন একই টেবিলে খাবে হরদয়ালের সঙ্গে।

হরদয়াল কাছারিতে গিয়ে বলল, 'আজ তোমাদের ছুটি। তোমরা বাড়ি যাও'। কাছারি থেকে ফিরতে ফিরতে হরদয়াল বলল, 'ওরে, কে আছিস'?

সবচাইতে কাছের বরকন্দাজটি ছুটে এল।

'পিয়েত্রোসাহেবকে একটু খবর দিবি, আচ্ছা একখানা চিঠি নিয়ে যা'।

ঘরে ফিরে হরদয়াল পিয়েত্রোকে চিঠি লিখে দিল :

> হেডমাস্টারমশাই সস্ত্রীক এসে পৌঁছেছেন। আগামী সোমবার, অর্থাৎ পরশু দিনটি খুব ভালো। সেদিন থেকেই স্কুল বসবে। সকালে স্কুলের উদ্বোধন করতে হবে আপনাকে।

কয়েকদিন নৌকোর দুলুনিতে কষ্ট হয়েছে, দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর বাগচী দম্পতি একটু ঘুমিয়েছিল।

দুপুরবেলা ছোট একটা ঘুম দেওয়া অভ্যাস ছিল হরদয়ালের। কিন্তু আজ সে ঘুমুতে পারেনি। শুয়ে শুয়ে স্কুলের কথাই ভাবছিল। মাঝে মাঝে বাগচী দম্পতিদের খবরও করছিল। বহুদিনের একটা পরিকল্পনা আজ সার্থক হতে চলেছে। বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত এই যে বেঁচে থাকা, সবগুলি দিন যেন আজকে এসেই মূল্যবান হয়ে উঠল।

চমৎকার লোক এই বাগচীরা। যেমনটি কল্পনা করা গিয়েছিল তার চাইতেও যেন ভালো। কথা বলার কী সরল ধরন। গ্রামের মধ্যে এদের উপস্থিতি সমগ্র গ্রামকেই আলোকিত করে রাখবে।

ভৃত্য এসে খবর দিল বাগচীসাহেবের ঘুম ভেঙেছে। পাইপে তামাক ভরছেন।

হরদয়াল চোখে-মুখে জল দিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিল। হরদয়ালের গলার শব্দ পেয়ে বাগচী নিজেই উঠে এল।

'আসুন, শরীর খানিকটা ঝরঝরে হল তো'?

'তা হয়েছে। আচ্ছা দেওয়ানজি, স্কুলের পাঠ্যবিষয় নির্বাচন সম্বন্ধে নিশ্চয় আপনি স্থির করে ফেলেছেন ইতিমধ্যে'?

'না। এমন কিছু স্থির করিনি। আপনিই করবেন। হিন্দু স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের একটা তালিকা যোগাড় করে রেখেছি। আপনি অনুমোদন করলে সেসব বই আনিয়ে নিতে হবে'।

পুস্তক ও পাঠ্যবিষয় নিয়ে আলাপ করতে করতে ছাত্রদের বিষয়ে কথা উঠে পড়ল। হরদয়াল বলল, 'ছাত্রদের মধ্যে বেশিরভাগই হবে চলতি ভাষায় যাদের অন্ত্যজ বলে। অবশ্য উচ্চশ্রেণীর কিছু কিছু ছাত্রও পাবেন না এমন নয়। যাতে ছাত্ররা আসে সেজন্যই স্কুল অবৈতনিক রাখার ইচ্ছা আছে'।

বাগচী বলল, 'গ্রামটা কি খুব পুরনো'?

'তা দেড়শো বছর হবে। আমি যেটুকু খবর সংগ্রহ করেছি তাতে মনে হয় নদীর গতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে। পশ্চিম দিক থেকে ক্রমশ উত্তর-পূর্ব দিকে গ্রাম সরে সরে এসেছে। এই রাজবাড়ির পত্তন হয়েছে প্রায় একশো বছর আগে। এঁদের পারিবারিক বাড়ি পশ্চিম দিকে মাইল তিন-চার দূরে'।

'গ্রামের লোকসংখ্যা কী রকম হবে'?

'নিজগ্রামে প্রায় চার হাজার। তারপর আশেপাশে আরও চাষিপল্লী আছে। এছাড়া এই গ্রামেরই লাগোয়া দুটি য়ুরোপীয় আবাদ আছে। একটি ফরাসি, অপরটি ইংরেজদের'।

'আপনার এই চার হাজারের মধ্যে উচ্চবর্ণের সংখ্যা বোধ করি চার-পাঁচশো হবে, না'?

'প্রায় সে রকমই হবে'।

বাগচী লঘুস্বরে প্রশ্ন করল, 'আপনার স্কুলে কুমোর কামার তাঁতিদের ছেলেরা পড়লে ব্রাহ্মণ-কায়স্থ পড়তে আপত্তি করবে না তো'?

হরদয়াল বলল, 'যারা পড়বে না তাদের আর আমরা কীভাবে উপকার করতে পারি'?

হরদয়ালের নিজের একটু কাজ ছিল। কিছু চিঠি লেখা, কিছু হিসাবপত্র দেখা, কিছুটা একা একা চিন্তার দরকার ছিল তার। রোদ পড়তে বাগচীসাহেব সস্ত্রীক একজন বরকন্দাজ সঙ্গে করে স্কুলবাড়ি দেখার নাম করে বেরিয়ে ছিল। কিছুক্ষণ চলার পরই বাগচী সাহেব টের পেল—তারা দু'জনেই গ্রামের লোকদের কাছে দর্শনীয় ব্যাপার।

বাগচীর মন অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিল, সে হাসতে হাসতে মৃদুস্বরে বলল, 'এটা অ-খ্রিস্টানের কাজ হচ্ছে কেট। এদের এমন করে প্রলুব্ধ করা কি উচিত হচ্ছে তোমার'?

কেট সলজ্জ কণ্ঠে কিছু বলে বাগচীর আর-একটু গা ঘেঁষে চলতে লাগল। বাগচী ইংরেজিতেই আবার বলল, 'কেট, এখানে কি তুমি সুখী হবে'?

'তুমি কি স্থির হতে পারবে'?

'পারব কিনা বলতে পারি না, চেষ্টা করব। মনে হচ্ছে এক্ষেত্রে মনিব মিশনারি সোসাইটির মতো টাকাটাকে শর্তকণ্টকিত করে তুলবে না'।

'একটা কথা তোমাকে বলি ডিয়ার, এখানে কিন্তু তোমার মতবাদগুলো অত প্রখর করে প্রচার কোরো না'।

'না,-না, তা করব কেন? তখন ওরা সকলে আমাকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিল, তারই প্রত্যুত্তর দিয়েছিলাম বই তো নয়'।

'সেই কথাই তো তোমাকে আমি বলেছি। প্রকৃতপক্ষে তোমার রক্তে ব্রাহ্মণদের তর্কযুদ্ধের ধারা এখনও আছে'।

ওরা আলাপ করতে করতে স্কুলবাড়ির ঘরের কাছে এসে পড়েছিল। সঙ্গের বরকন্দাজটিকে বাগচী জিজ্ঞেস করল, 'হেডমাস্টারের বাড়িটা কোথায় জানো'? বরকন্দাজ দেখিয়ে দিল।

'চলো কেট, তোমার ঘরদোর দেখে আসি'।

'কিন্তু ওরা কি আমাদের অত্যন্ত লোভী ভাববে না'?

'বাহ্, আমার লোভ হয়েছে, তখন ওদের ভাবতে দোষ কী? এসো'।

কেট ও বাগচী ঘুরে ঘুরে ঘরদোরগুলি দেখল।

'কী'?

'বাড়িটার গড়ন দেওয়ানের বাড়ির মতো নয়। না-না, তাঁর ঘরের দামি আসবাব বা ইট-পাথরের কাজের কথা বলছি না, হেডমাস্টারের বাড়ি আর দেওয়ানের বাড়ি এক হওয়া উচিত নয়; বলছি ঘরগুলির বিন্যাসের কথা। তোমার মনে আছে রাইগড়ের বাংলোর কথা'?

'কতকটা যেন সেই রকমই। নয়'?

'ভারি মজার ব্যাপার তো, এ যেন তোমার মন জেনে তৈরি করেছে'।

'তা হবে কেন'?

'তাই হয়েছে। জানো কেট, এমনি একটা বাড়িতে সারাজীবন কাটানো মন্দ নয়'।

'কেন বলো তো'?

'এটা আমার কয়েক দিন থেকেই মনে হচ্ছে। নৌকো নদী পথ বেয়ে যতই গ্রামের দিকে যেতে লাগল আমার ততই মনে হচ্ছিল—দেশের অন্তঃকরণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। প্রকৃতপক্ষে আমি তো গ্রামেরই ছেলে'।

'বেশ তো। আমি এতদিন শুনেই এলাম তোমার দর্শন। এবার সেটা কাজে লাগুক দেখি। শান্তি কত গভীর হতে পারে তাই অনুভব করা যাবে'।

ওরা রাজবাড়ির দিকে ফিরছিল। তখন আলো পড়ে আসছে। সহসা ঘোড়ার খুরের প্রচণ্ড শব্দ কানে এল ওদের। কেট পেছন ফিরে সওয়ারদের দেখতে পেয়ে বলল, 'সরে এসো'।

'কী ব্যাপার'?

'সরে এসো বাপু, ঘোড়া আসছে'।

'ঘোড়ার ভয়ে মানুষ পথ ছেড়ে জঙ্গলে যায় সে কোন দেশ'?

'আহ্'!

কেট বাগচীকে টেনে নিয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড়াল, আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ধুলোর ঝড় সৃষ্টি করে পাশাপাশি দুটি ঘোড়া রাজবাড়ির সদরের দিকে উড়ে গেল।

'বেশ ঘোড়া তো'! বাগচী বলল।

'তা না-হয় দেখলাম, কিন্তু এই নাকি তোমার শান্তি'?

'কেন, কী হয়েছে, কী অন্যায় করেছি'?

'ঘাটে নামতে নামতেই পালকিতে ওঠার ব্যাপারে একবার, এখন ঘোড়ার পথে দাঁড়ানোতে আর-একবার দেখা দিল'।

বাগচী হো-হো করে হেসে উঠল, 'দ্যাখো, পালকিতে উঠি না কেন জানো, সে এক মজার গল্প। শুনলে পালকি চড়বে না। রাজা নহুষ ছিল মস্ত বড় রাজা। তার ভারি শখ হল পালকি চড়ে স্বর্গে যাবে। কিন্তু কী হল জানো? কিছুদূর গিয়ে সে সাপ হয়ে মাটির দিকে পড়তে লাগল। সেই চিরকালের সাপের ব্যাপার। সাপকে আমি বড় ভয় করি'।

কেট শিউরে উঠল, 'তুমি কি সেই সাপের কথা বলছ'?

'তা নয়তো কি? সে ছাড়া আর কার শখ হতে পারে মানুষের কাঁধে চেপে স্বর্গে যায়'?

'তা বটে। তুমি কি গল্পটা বানালে'?

'আরে, কী বিপদ! এটা হিন্দু মিথোলজিতে আছে, তুমি যাচাই করে দেখো'।

'তুমি তাহলে সাপের ভয়ে পালকি চাপো না? কিন্তু এ কথা যেন বোলো না কাউকে। এদেশে যারা পালকি চড়ে সবাই বড়লোক'।

'বড়লোক সম্বন্ধে ক্রাইস্টের মত ভালো ছিল না'।

আর কিছুদূর গিয়ে বাগচী বলল, 'সাপকে কখনও কখনও আমি ভালোও বাসি'।

'কী রকম'?

'যখন সাপরা তোমাদের বিপথে চালনা করে। তোমরা ফলটা-আসটা তোলো'?

'সবটাই তোমার রসিকতা, তাই নয়'?

বাগচী প্রাণ খুলে হেসে উঠল।

হরদয়াল তার ঘরে বসে বই পড়ছিল। 'আসতে পারি'—বলে বাগচী ঢুকল সেই ঘরে।

'বেড়ানো হল'?

'হ্যাঁ। আমার থাকবার জায়গাও দেখে এলাম'।

'কী রকম লাগল? অসুবিধা হবে একটু একটু, পরে পাল্টে নেওয়া যাবে ধীরে ধীরে'।

'পাল্টাতেই বরং আমার আপত্তি। কেট বলছিল এমন নকশা কোথায় পাওয়া গেল ঘরের'?

'মিসেস বাগচীর পছন্দ হয়েছে'?

'খুব। নিজেই আপনাকে ধন্যবাদ দেবে'।

'ওতে আমাদের কৃতিত্ব কিছু নেই। আমাদের প্রতিবেশী মরেলগঞ্জের সাহেবদের কুঠির নকশায় করা। কেবল তাঁদের ঘরগুলো আরো উঁচু ও বড়। নকশা ও মালমশলা এক'।

খানিকটা সময় চুপ করে রইল বাগচী। অন্য কথায় গিয়ে বলল, 'আপনার কাছে একটা অনুমতি নেওয়া হয়নি'।

'কী ব্যাপারে'?

'আমার ছাত্রদের মধ্যে জ্বরজারি এবং অন্যান্য পীড়া কী রকম'?

'মাঝে-মাঝে প্রাদুর্ভাব হয়। বিশেষ করে দুর্গাপূজার পর থেকে অনেক জ্বরে ভোগে'।

'আমি যদি তাদের চিকিৎসা করি আপনার আপত্তি আছে'?

'আপত্তি কী, সে তো আনন্দের কথা। রোগমুক্তি কে-না চায়'!

সেদিন রাত্রিতে কেট বলল, 'ডিয়ারি, আমাদের এই দেওয়ানজিকে কি তোমার উচ্চশিক্ষিত বলে মনে হয়নি'?

'উচ্চশিক্ষিত না-হলে শিক্ষার জন্য এত অজস্র ব্যয় কেউ করে'?

'কিন্তু কলেজের কথায় বললেন, কোনো কলেজে পড়ার সৌভাগ্য ওঁর হয়নি'।

তখন বাগচী কেটকে একলব্যের কথা বলল। ওই কাহিনীটায় যা আছে তার মূলতত্ত্ব দেওয়ানজির জীবনেও হয়তো আছে।

'তোমার মিথোলজিগুলি এত সুন্দর'!

'এটা মিথোলজি নয় কেট, মহাভারত বলে যে-মহাকাব্য আমার শ্বশুর অনুবাদ করছিলেন তারই একটা গল্প। তবে আমাদের ভালোবাসার চোখে দেখা সবটুকু দেখা নয়, কেট। যেমন তুমি আমার কালো রং দেখতে পাও না'।

'ঠিক বলা হল কি মাস্টারমশাই? কালো রং-ই যে আমার নেশা'।

স্কুলের উদ্বোধনের ব্যাপারে ভিড় হবার যতগুলি কারণ ছিল তার মধ্যে একটি হল্ল মেমসাহেবের প্রতি কৌতূহল। এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। গ্রামের প্রায় প্রত্যেক ঘরেই একবার আলোচনা হয়েছে। গ্রামে মেমসাহেব এসেছে। শিলাবৃষ্টির শিলার মতো তার রং, আলতা-টুকটুকে ঠোঁট, সোনার মতো চুল, কে? কে আবার, নতুন হেডমাস্টারের স্ত্রী। বাঙালির মেমসাহেব স্ত্রী। এদের মধ্যে যারা একটু কল্পনাপ্রবণ তারা বললে, হেডমাস্টার বিলেত থেকে বিয়ে করে এনেছে, ওদের দেশের এক জমিদারের মেয়ে। তাহলে সে হেডমাস্টারও দর্শনীয়। গোবর্ধন দত্তর দলের এক ছোকরা সুর করে বলল, 'বিবিজান চলে যান লবেজান করে'।

উদ্বোধনের ঘটনাটিতে খুব দীর্ঘ সময় লাগল না। সকাল থেকেই নহবত বাজছিল। হেডমাস্টার পালকি চড়ে না, কাজেই সস্ত্রীক হেঁটে গেল। দেওয়ানজি তার পালকিতে কবে আগেই পৌঁছেছে। পিয়েত্রোর হাঙরমুখো পালকির পাশে পাশে বুজরুক এল হাতিতে, তার সেই বেঁটেখাটো হাতি নিজেই চালিয়ে এসেছে। রাজকুমার এল ঘোড়ায়। ঘোড়ার গায়ে কিংখাবের জামা। ডানকানও ঘোড়ায় এল। ঝকঝকে চামড়ার সাজ সে-ঘোড়ার।

স্কুলবাড়ির আটচালার নিচে টেবি-া-চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লাল বনাতে জায়গাটার তিনদিক ঘেরা। বিশিষ্টদের আসন সেটা। টেবিল-চেয়ারগুলোর ডানদিকে কতকগুলি বেঞ্চে গ্রামের কৈলাস পণ্ডিত কয়েকজন পড়ুয়া নিয়ে বসে আছেন। ক্ষারে-কাচা ধুতি পবে এসেছে ছেলেগুলি, মন্দ দেখাচ্ছে না তাদের। চেয়ারগুলোর বাঁদিকে নিমন্ত্রিত ইতর-ভদ্রর আসন।

পিয়েত্রো সভাপতির আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বিদ্যালয় আজ থেকে উদ্বোধন করা হল বলে আমি ঘোষণা করছি'। বক্তৃতা আর এগুলো না। কৈলাস পণ্ডিতের একটি শিশুছাত্র নাকের উপরে আঙুল রেখে পিয়েত্রোর দিকে চেয়ে ছিল। পিয়েত্রো নাকের উপরে তার মতো আঙুল রেখে বলল, 'তোমাদের জন্য দেওয়ানজি অনেক মিষ্টির ব্যবস্থা করেছেন। আমি দেখেছি, খইচুরের মোয়া। শুধু খই নয়, তার মধ্যে শুনলাম ছানা এবং ক্ষীরও আছে'।

সকলের উচ্চহাস্যের মধ্যে পিয়েত্রো আসন গ্রহণ করার আগে বলল, 'আমাদের প্রিয় বন্ধু সম্মানার্হ মিস্টার ডানকান হোয়াইট আপনাদের কিছু বলবেন এরপর'।

বক্তা হিসাবে ডানকান হোয়াইট কোনো ইতিহাসেই বিখ্যাত নয়। উঠে দাঁড়িয়ে নিজের বুট জুতোর উপরে রুপো-বাঁধানো ঘোড়ার চাবুকেব ডাঁটটা ঠুকতে ঠুকতে যা বলল তার সারমর্ম এই রকম : ইংরাজ তার বাহু ও বুদ্ধিবলে অর্ধ পৃথিবীর ঈশ্বর। তার সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না। এদেশে যে নৈরাজ্য ছিল তার থেকে ইংরাজশাসন এদেশের লোকদেব রক্ষা করছে। বর্তমানে ভারতে এমন কোনো শক্তিই নেই যা ইংরাজের তোপের সম্মুখে একমুহূর্তও দাঁড়াতে পারে। এদেশের লোকদের যে ইংরাজরা রক্ষা করছে শুধু, এমন নয়। তারা এদেশের লোককে ভালোও বাসে। তারা চায় এরা শিক্ষিত হয়ে উঠুক। নতুবা আফ্রিকার লোকদের মতো এদেরও জাহাজে করে নিয়ে গিয়ে অন্য দেশে বিক্রি করতে পারত। তা করেনি ইংরাজরা। ইংরাজ এবং ঈশ্বরের সহায়তায় এদের মঙ্গল হোক।

সভাপতি পিয়েত্রো অতঃপর দেওয়ানজিকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আহ্বান করল। হরদয়ালের মনে হল সে মাটিতে মিশে যাবে। কী আশ্চর্য ব্যাপার! যে-মাটির উপরে জীবনের এতগুলো বৎসর কেটে গেল সেটা কেন পায়ের তলায় টলে টলে ওঠে! অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে টেবিলটা চেপে ধরে কথা বলতে গিয়ে তার কথা জড়িয়ে যেতে লাগল। অনেক কষ্টে সে বলল, 'আমি নিজে কেউ নই। আমি একজনের কর্মচারীমাত্র। এখানে রাজকুমার আছেন আমাদের মধ্যে, সমুচিত হতো যদি তিনি বলতেন। সকলের পেছনে রয়েছেন আমাদের রানী, যাঁর দয়ায় আমি এই গ্রামে আশ্রয় পেয়েছি। পিয়েত্রোসাহেব

এই জমি দিয়েছেন। এই স্কুলের নাম তাঁর মত অনুসারে হয়েছে 'জ্ঞানদা বিদ্যালয়'। তাঁকে সহস্র ধন্যবাদ। আমাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিবেশী ডানকানসাহেবের সহৃদয়তার আশ্বাসও আমরা পাচ্ছি। কৈলাস পণ্ডিতমহাশয়কেও ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তিনি নিজে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করবেন'।

বলতে বলতে দেওয়ানের গলা ধরে এল, চোখ ছলছল করে উঠল। সে আসন গ্রহণ করল। সদর-নায়েবের দল প্রস্তুত হয়ে ছিল। বহু কণ্ঠে একত্রিত জয়ধ্বনি উঠল : রানীমার জয় হোক, রাজকুমারের জয় হোক, দেওয়ানজির জয় হোক।

কিন্তু সেদিনকার সভায় বাগচীও কথা বলল। সে বক্তৃতায় অভ্যস্ত এবং সুবক্তা। কেটের কথা মেনে নিলে সে তার্কিক। বাগচী উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্যার প্রয়োজন নিয়ে অত্যন্ত সহজ ভাষায় তার নিজের মতগুলি ব্যক্ত করল। ইংরাজি শিক্ষা ও সংস্কৃত শিক্ষার পারস্পরিক সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা করল। অবশেষে বলল, 'বিদ্যার জাতি ও ধর্ম নেই। বিদ্যুৎতরঙ্গ যেমন সকলের চোখেই প্রতিভাত হয়, শূদ্র ভদ্র বিচার করে না, বিদ্যার আলো তেমনি। এ কথা আমাদের ভুলে যেতে হবে বিদ্যা কারো ক্ষতি করতে পারে। বিদ্যা বিভক্ত করে না, বিদ্যা দ্বেষ করে না, বিদ্যা অসূয়াপরায়ণ নয়। ঈশ্বর সহায়তা করলে আমরা বিশ্ববিদ্যা আহরণের ভিত্তিস্থাপন করতে পারব—যে-বিদ্যা ইংরাজদের আছে, যে-বিদ্যা ফরাসিপ্রমুখ অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতির আছে, আর যে-বিদ্যা আমাদের ঘরে সংস্কৃত কাব্য দর্শনে ছড়িয়ে আছে'।

গোবর্ধন দত্তর দল তুমুল করতালি দিয়ে উঠল।

সভাভঙ্গ হল। কৈলাস পণ্ডিতকে আজ আর তাঁর ছাত্ররা ভয় করছে না। খইচুরের ঝুড়িগুলোর উপরে তারা হৈ-হৈ করে এল।

সদর-নায়েবের তত্ত্বাবধানে কাছারির বারান্দায় আসন পেতে গ্রামের ভদ্র ব্যক্তিরা জলযোগে বসল।

দেওয়ান-ভবনের বড় হলঘরটায় পিয়েত্রো ও ডানকান প্রমুখেরা। আর-সকলে ঠিক খেয়াল করতে পারেনি, রাজকুমার বুজরুকের খোঁজ করতে গিয়ে দেখল, হাতি এবং তার সওয়ার নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে।

১৬

রবিবার ধর্মের দিন। ছ-দিন কাজ করে একদিন বিশ্রাম করবে এবং বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের নাম করবে। প্রথাটা প্রথা হিসাবে গ্রহণ না-করে পৃথিবীর জনসংখ্যার একটা অংশ ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করেছে। নারদমুনি তেলের বাটি নিয়ে পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে গিয়ে ধর্মের কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। নারদমুনির সেই বিভ্রাটে যাদেব সহানুভূতি ছিল তাদেরই একজন রবিবারে ধর্মের প্রথার কারণ। আর যারা নারদমুনির দুর্দশায় অপার আনন্দ লাভ করেছিল তারাই এখনও হিন্দু হয়ে, সময় নেই অসময় নেই, সুযোগ পেলেই ভগবানের নাম করে।

পথে চলতে চলতে বাগচী এই কথাগুলিই ভাবছিল। তার চিন্তার উদ্দেশ্য নিজেকে বোঝানো নয়, বাড়ি ফিরে কেটকে তাক লাগিয়ে দিয়ে হাসাহাসি করা।

ডানকান হোয়াইট খবর পাঠিয়েছে—বাগচী-দম্পতি ইচ্ছা করলেই মরেলগঞ্জের ছোট চার্চটায় ডানকান পরিবারের পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিতে পারে। বাগচী অবশ্য পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিতে যাচ্ছে না। কারণ কোনো চার্চেই সে উপাসনা করে না। শীতের সকাল বলে সময়টা তত অনুভব করা যাচ্ছে না, কিন্তু বাগচীর ট্যাকঘড়িতে তখন বেশ বেলা হয়েছে। এতক্ষণে পারিবারিক উপাসনা শেষ হয়ে যাবারই কথা।

শনিবার দিন একটা ঘটনা ঘটে গেছে। ঘটনাটা সামান্যই, কিন্তু বাগচীর মনে হয়েছে তার জন্য

একবার ডানকানের কাছে যাওয়া দরকার। মরেলগঞ্জ থেকে তিনটি ছেলে বাগচীর স্কুলে পড়তে আসত। শনিবার দিন সংখ্যাটা বেড়ে পাঁচে দাঁড়াল। বাড়তি ছেলে দুটি স্কুলের আটচালার বাইরে বসে ছেলেদের পড়া দেখছিল। প্রথমে তারা গোবর্ধন দত্তর চোখে পড়ল, তারপর বাগচীর।

বাগচী ক্লাস থেকে বেরিয়ে এসে বলল, 'তোরা কী করছিস রে'?

ছেলে দুটির মুখ ভয়ে কালো হয়ে গেল।

বাগচী বলল, 'পড়া শুনবি, আয়'।

ছেলে দুটিকে নিচু ক্লাসের একটিতে বসিয়ে দিয়েছিল বাগচী। ঠিক এমন সময়ে মরেলগঞ্জের দুজন পেয়াদা এসে উপস্থিত। তাদের হাঁক-ডাকে আবাব বাগচী বেরিয়ে এল।

'কী হয়েছে'?

'ওই ছোকরা দুটোকে চাই'।

'কেন, ওবা কী করল'?

'ওদের চিনা-কল চালানোর কথা'।

'চিনা-কল? সেটা কী'?

'হৌসে জল তোলার কল'।

'তাই ওবা চালাতে পারে? বেশ তো। আচ্ছা, আজ ওরা এত দূর চলে এসেছে, থাক না-হয়। অন্য কোনো লোক নিয়ে কাজ চালিয়ে নিলে হতো'।

'তাহলে কুঠি নিলেম হয়ে যাবে'।

'ওরে তোরা তাহলে যা। চিনা-কলেব কাজ শেষ হলে আসিস'। পেয়াদাবা যে কী বস্তু তা বাগচীব জানা ছিল না।

ছেলে দুটি বেরিয়ে আটচালার বাইবে দাঁড়াতেই একজন পেযাদা হাতের কাছে যেটিকে পেল তার গালে এক চড় বসিয়ে দিল। অত্যন্ত বেদনায সে হাঁ করল কিন্তু কাঁদতে পারল না। অন্য ছেলেটি চতুর, সে দৌড়তে আরম্ভ করেছিল। একটি পেয়াদা একটা ঢিল তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল তার দিকে। ঢিলটির লক্ষ্য অব্যর্থ, কিন্তু সৌভাগ্য এই, মাথায় লাগল না। পায়ে লাগায় সে অব্যক্ত যন্ত্রণায পা ধরে একই জায়গায় লাফাতে লাগল। বাগচী দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে দেখে আবার ক্লাসে ঢুকল।

স্কুলের পর ক্যাথারিনের কাছে ঘটনাটা উল্লেখ করে বলেছিল বাগচী—কাল একবার ডানকানের কাছে যাব।

না-না, ডার্লিং ; এ কি শান্তির পথ?

—শান্তির জন্যই তো যাব। কাল রবিবারের উপাসনার নিমন্ত্রণ আছে। সেই সুযোগে শান্তিস্থাপন করা যায় কিনা চেষ্টা করব।

দোহাই তোমার, বিপদের সূচনা কোরো না। এই তো সেদিনমাত্র এসেছি।

বাগচী হেসে বলেছিল—পাগল! আমি কি অত বোকা!

ছাতি মাথায় বাগচী গুটিগুটি ডানকানের কুঠিতে প্রবেশ করল। একজন ভদ্র চেহারার লোককে দেখতে পেয়ে বাগচী বলল, 'বড় হুজুর কোথায় গো? একটু বলবে বাগচীমাস্টার দেখা করতে চায়'।

'আজ্ঞে যান না, উদিকে যান। নীলের হাউসের কাছে আছেন সাহেব'।

লোকটি বোধ হয় বাগচীর বিনয়ে বিস্মিত হল। যার বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হয়ে ইংরেজ ললনা তার গলায় মালা দেয় সে লোকটির এমন বিনয় যেন অস্বাভাবিক।

নীলের হাউসগুলির কাছে ডানকানের দেখা পাওয়া গেল।

পাশাপাশি আটটা চৌবাচ্চা, চৌবাচ্চা না-বলে ট্যাংকই বলা উচিত। মানুষের বুক সমান উঁচু

দেয়ালের মধ্যে বিশ-ত্রিশ হাত লম্বা ও প্রায় তদনুরূপ চওড়া চৌবাচ্চা। সেই চৌবাচ্চাগুলিতে নীলের কাজ হচ্ছে।

ডানকানের কাছে গিয়ে বাগচী বলল, 'আমি বাগচীমাস্টার, হুজুর, দেখা করতে এলাম'।

'আসুন'।

কথোপকথন ইংরেজিতে হতে লাগল।

বাগচী বলল, 'আপনাদের কাজগুলো দেখতে খুব কৌতূহল আছে আমার। গাছ থেকে কী করে নীল হয় ভাবতেও অবাক লাগে'।

'যান না, দেখে আসুন'।

একজন সরকারকে ডেকে ডানকান বললে, 'বাগচীকে হাউসগুলো ঘুরিয়ে আনো'।

সরকারের পেছন পেছন বাগচী সবচাইতে দূরের চৌবাচ্চাটার কাছে গেল।

'এটা জলের চৌবাচ্চা। এটার মেঝে অত্যন্ত উঁচু। নদীর জল তুলে রাখা হয় এখানে। আজ জল তোলা হচ্ছে না। ঢেঁকি-কলে জল উঠিয়ে এটাকে ভরে রাখা হয়। প্রয়োজন মতো নল দিয়ে এটা থেকে জল অন্য চৌবাচ্চায় চালান করা হয়। এই দেখুন, এটায় নীলের গাছ জাগ দেওয়া আছে। এটাতেও নীলের গাছ পচছে। এইখানে দেখুন কেমন কাজ হচ্ছে'।

বাগচী দেখল হাউসটার চারদিকে অন্তত পঞ্চাশজন লোক বসেছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে বইঠা। তারা হাউসের জলে বইঠা মারছে। যেন হাউসটাই একটা বিরাট নৌকো, কোনো অদৃশ্য সমুদ্রে তীরবেগে অগ্রসর হচ্ছে। একটা দুর্গন্ধে চারদিক আচ্ছন্ন।

'কাছে যাবেন না'।

নিষেধ না-শুনে বাগচী কাছে এগিয়ে গেল। হাউসটার ভেতরে ফেনিল দুর্গন্ধ জল বইঠার তাড়নায় উত্তাল হয়ে ঘুরছে। লোকগুলোর কনুই অবধি তো বটেই, মুখে-চোখেও সেই ফেনিল দুর্গন্ধ জলের বুদবুদ। কয়েক পা গিয়ে বাগচী থামল। সেই ছেলে দুটিই বটে। একেই তাহলে চিনা-কল বলে। কাঠের ঘোড়ার মতো আসনে বসে তারা অবিরত পা ছুঁড়ছে একটা চৌবাচ্চার ধারে। বাগচী জিজ্ঞেস করল, 'এটায় কী হয়'?

'জলের স্রোত চালানো হচ্ছে নীলের উপর দিয়ে। নীল থিতিয়ে যাবার আগে এই চৌবাচ্চায় নীল ধোয়া হয়'।

বাগচী লক্ষ্য করে দেখল, একটি ছেলের পিঠে তখনও কালশিরের দাগ। তারপর সরকারকে বলল, 'চলুন, সাহেবের কাছে যাই'।

ডানকানের কাছে আসতে ডানকান বলল, 'কেমন দেখলে মিস্টার বাগচী'?

'ভালো, খুবই ভালো বন্দোবস্ত'।

একটু পরে বাগচী বলল, 'হুজুর, কাল আপনার হাউসের দুটি ছোকরা অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছিল'।

'কী করেছিল'?

'হুজুর, তারা আমার স্কুলে পড়তে গিয়েছিল'।

'তাই নাকি? তাহলে তো ভালো নয়। কোন ছোকরারা'?

'আজ্ঞে ওই চিনা-কল চালাচ্ছে, ওরা'।

'তারপর কী হল'?

'পেয়াদারা ওদের মেরেছে। একটির পায়ের পেছন দিকটায় একটা কাটা দাগ দেখলাম, আর-একটির পিঠে এখনও কালশিরে পড়ে আছে'।

'দ্যাখো বাগচী, মারধোরটা অনেকসময়ে বাধ্য হয়েই করতে হয়'।

'তা হয়, হয় বইকি। আমি সেজন্যই ক্ষমা চাইতে এসেছি আপনার কাছে'।

'তুমি ক্ষমা চাইবে কেন? তুমি কী অন্যায় করেছ'?

'যারা মেরেছে এবং যারা মার খেয়েছে, সকলের জন্যই ক্ষমা চাচ্ছি হুজুর। আমার নিজের জন্যও'।

'কী বিপদ! দোষ যদি কিছু করেও থাকে, ক্ষমা তারা চাইতে পারে। তুমি কী জন্য ক্ষমা চাইবে এ আমি বুঝতে পারছি না'।

ডানকানের মেজাজ ভালো ছিল, সে চুরুট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, 'চুরুট খাবে'?

'অনুমতি করেন তো আমি পাইপ খাই'।

'স্বচ্ছন্দে, স্বচ্ছন্দে'।

বাগচী পাইপে তামাক ভবতে লাগল।

ডানকান বাগচীর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইল। লোকটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ভারতীয়দের মতো রং কিন্তু সুশ্রী চেহারা। কালো টেইল-কোট, টাই ও টপ-হ্যাটে নিখুঁত ও পরিচ্ছন্নভাবে সজ্জিত।

তামাক টানতে টানতে বাগচী বলল, 'সম্পূর্ণ ব্যাপারটাতে যে-গভীর অপরাধপ্রবণতা ছিল, আপনি নিশ্চয়ই এতক্ষণে তার জন্য আমাকে ক্ষমা করেছেন'।

ডানকান হাসিমুখে বলল, 'তোমার মুখে ইংরেজি ভাষা এত নিখুঁত যে ক্ষমা কথাটাব অর্থ তুমি জানো না বলতে দ্বিধা হয়। কিন্তু তোমার প্রস্তাব শুনে মনে হচ্ছে, তুমি ও কথাটিকে অন্য-কোনো কথার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছ'।

'আজ্ঞে না, সম্পূর্ণ ব্যাপারটার জন্য আমিই দায়ী। প্রথমত এই স্কুলে আমি শিক্ষকতা না-করলে ছেলেরা যেত না, দ্বিতীয়ত আমি তাদের ডেকে নিজে ভেতরে না-বসালে তারা বসত না, তৃতীয়ত আমি তাদের পেয়াদাদের হাতে মার খেতে দেখেও থামাতে পারিনি, এবং শেষ কথা ওদের দুঃখ দূর করবার কোনো চেষ্টাই আমি করিনি'।

'আমার মাথা ঘুরছে, বাগচী, থামো, থামো। তুমি কী চাও সংক্ষেপে বল'।

'ওই তো বললাম, আমাকে ক্ষমা করুন। নতুবা আপনার প্রতি যে-বিদ্বেষ হয়েছে আমার তা যাবে না'।

ডানকান কৌতুকের সুরে বলল, 'আচ্ছা ক্ষমা করলাম। কিন্তু তোমার বিদ্বেষ আমার কী ক্ষতি কবতে পারে'? ডানকান হো-হো করে হাসল।

বাগচী বলল, 'করবেনই তো। এত বড় কারবার ভগবান আপনার হাতে দিয়েছেন, এত লোকের সঙ্গে আপনার দৈনন্দিন সংস্রব। এমন ক্ষমাগুণ যদি আপনার না-ই থাকবে, ঈশ্বর আপনাকে এত শক্তি দেবেন কেন'!

ডানকান বলল, 'তোমরা খ্রিস্টান নিশ্চয়ই'?

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্রাইস্টের ধর্মই আমাদের ধর্ম'।

'তোমাদের ওদিকে তো চার্চ নেই'।

'আপনার নিমন্ত্রণ আমরা পেয়েছি। কিন্তু আমরা চার্চে যাবার কোনো যোগ্যতা এখনও অর্জন করিনি বলে কোথাও যাই না'।

'তোমার কি পিপাসা পেয়েছে, বাগচী? বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন'?

'আজ্ঞে, সুরা আমার সহ্য হয় না। যদি কিছু মনে না-করেন, সেই ছোকরা দুটি আর পেয়াদা দুটিকে আমার কাছে আসতে দেবেন'?

ডানকান একটু চিন্তা করে বলল, 'তুমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে চাও'?

'আপনি ক্ষমা করেছেন, সেই কথাটা বলব'।

'আচ্ছা যাও, ওদের সঙ্গে কথা বলো গে। কিন্তু বেশি কথা বোলো না, লাই পেয়ে যাবে'।

'কথাটা আপনার সামনে হলেই ভালো হতো'।

ডানকান বলল, 'আমার সামনে আমার অধস্তনদের বাজে কথা বলা উচিত মনে করি না'।

'তা বটে। কথাটাও ঠিক। আমিই যাচ্ছি'।

চিনা-কলের কাছে গিয়ে বাগচী ছেলে দুটির মাথায় ও পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। তারপর বলল, 'কাজ থামা, একটু কথা বলি'।

ছেলে দুটি বিস্মিত হয়ে কাজ থামাল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কাজ না-করলে বিপদ আছে, মাস্টারসাহেব'।

'মারবে? তা মারবে বইকি। কাজ না-করলে আমিও বকে দিই ছেলেদের। তোরা আমার স্কুলে পড়তে গিয়েছিলি'?

'দেখতে গিছলাম'।

'খইচুরের মোয়ার লোভে'?

ছেলে দুটি হাসল।

'তা বেশ করেছিলি। পালিযে গেলি কেন? বলে গেলি না কেন'?

'বললে কি যেতে দেয়'?

'সে আবার কী কথা! তোর যাওয়ার ইচ্ছে কে ঠেকাতে পারে? বলবি—যাব। মারবে তো? মারুক। তবু বলবি—যাব। যদি আরো মারে তবু বলবি—যাব'।

'পিঠের ছাল তুলে দেবে'।

'দিক না, যাওয়া বন্ধ কববে কী কবে'?

'বেঁধে রাখবে'।

'বসে বসে বলবি—'যাব, যাব, যাব"। বাগচী হাসল। ছেলেদের বায়না ধরার সুরটা সে নিখুঁত নকল করেছিল।

ছেলে দুটিও হাসল।

'তা শোন, আর কখনও পালিয়ে যাবি নে। আর একটা কথা, যারা তোদের মেরেছে তাদের মুখ ভ্যাঙাস নে কিন্তু। আমি খইচুবের মোযা পাঠিয়ে দেব তোদেব সেথোদের হাতে। যদি তারা খেয়ে ফেলে দেয় আমাকে খবর দিস। আচ্ছা, কাজ কর'।

পেয়াদাদের খুঁজে বাব করতে দেরি হল। একজনকেই পাওয়া গেল।

'কাজটা তুমি অন্যায় করেছ। উদ্দেশ্য ভালোই ছিল, নিয়মানুবর্তিতা খুব ভালো জিনিস, কিন্তু শিশুকে মারতে নেই ওভাবে। বড্ড জোর মার হয়েছিল, কী বলো'?

'ওরা ভারি বাঁদর'।

'একশোবার বাঁদব। বাঁদর সব ছেলেই। ছোটবেলায় বাঁদর থাকাটাই উচিত। তুমি-আমিও বাঁদর ছিলাম। শাসন করো, করবে বইকি। ছেলেকেও তো শাসন করে লোকে। তেমনি আর কি, বুঝলে না? তা শোনো, একটা কথা বলি। ওরা যদি আবার তোমাদের মুখ ভ্যাঙায়, মেরো না যেন। যাও, কাজে যাও'।

বাগচী খুশি মনে ডানকানের কাছে উপস্থিত হল।

'আলাপ হল'?

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার দয়া মনে থাকবে'।

বাগচী বিদায় নিল। টপ-হ্যাটটা মাথায় ফেলে ছাতিটা দোলাতে দোলাতে দ্রুতগতিতে সে রাস্তা পার হতে লাগল।

ডানকানের হঠাৎ হাসি পেল। বদ্ধ উন্মাদ লোকটা। সামনের টেবিলটায় পা তুলে দিয়ে ডানকান সিলিং-এর গায়ে চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে দিল। নীলের চৌবাচ্চায় বইঠা মারার থাড়্-থাড়্-থাস্ শব্দ ভেসে

আসছে, চিনা-কল ঘর্ঘর শব্দে চলছে।

কিন্তু, ডানকান ভাবল, মেয়েটি এমন বাঁদরের হাতে পড়েছে। ফুলের মতো সুন্দর মেয়েটি একটা দেশীয় উন্মাদের হাতে পড়ল। ডানকান অনেকটা সময় ক্যাথারিনের কথা চিন্তা করল। মেয়েটি প্রকৃতপক্ষে লাবণ্যময়ী। এমন সুন্দরী যে, চট করে তুলনা দেবার মতো কউকে পাওয়া যায় না।

বাগচী ডখন ডানকানের কুঠিতে গিয়েছিল তখন কেটও একা ছিল না। সে তার পোশাক পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করছে, এমন সময় বাইরের ঘরে কে ডাকল, 'মাস্টারমশাই'। কেট উঁকি মেরে দেখল, একটি অপূর্ব সুন্দরী। ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল, গলায় জড়োয়ার চিক ঝকঝক করছে। ছোট্ট কপালে ঢাকা সিল্কের মতো চকচকে চুল। কী অদ্ভুত গড়ন, ঠিক যেন খোদাই-করা একটি মূর্তি। বয়েস হয়েছে, কিন্তু এ বয়সের সাধারণ হিন্দু মেয়ের মতো কপালে সিঁদুর নেই, মাথায় ঘোমটা নেই। স্নিগ্ধ ডাগর চোখ। কেট যেন তাকে দেখামাত্র ভালোবেসে ফেলল। বাইরের ঘবের ভেতরের দিকের দরজার কাছে গিয়ে সে বলল, 'আসুন, মাস্টারমশাই বাড়ি নেই'।

'তবে তো ভালোই হল। আমরা দুজনে গল্প করতে পারব অনেকক্ষণ'।

'আর আমি বুঝি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব'? বাইবের ঘরের দরজার বাইরে থেকে একটি সুবেশ সুঠাম তরুণ মুখ বাড়িয়ে বলল।

কেট দেখল এবং দেখে চিনতে পারল, স্কুলের সভায় একেই রাজকুমার বলে সম্বোধন কবেছিল দেওয়ানজি।

কেট বলল, 'আপনিও আসুন। আমাদের অসীম সৌভাগ্য'।

রাজকুমার ঘরের ভিতর গিয়ে বসে হাসতে হাসতে বলল, 'আপনি বাংলা জানেন না, আর আমবা জানি না ইংরেজি'।

'এটুকু বোঝার মতো বাংলা আমি বুঝি। বলতে কষ্ট হয়। ব্যাকরণদোষ হয়ে যায়'।

'তা হোক। ব্যাকরণের দোষ না-হলে কবিতাই হয় না'। বলল নয়নতাবা।

কেট বলল, 'বাগচীকে কত বলছি আমাকে ভালো করে বাংলা শিখিয়ে দিতে, তিনি বলেন, ও শেখাতে হবে না, আপনি শিখবে'।

নয়নতারা বলল, 'আপনার সম্বন্ধে আমাদের অত্যন্ত কৌতূহল। আপনি কেমন লোক জানার জন্য আমরা দুজনে এসেছি'।

হাসতে হাসতে কেট বলল, 'আমি আপনাদের মতো মানুষ, তবে গরিব মানুষ, এই যা'।

'তাই ভেবে বুঝি জড়োসড়ো হয়ে আছেন? বলুন তো আমি কে, আমরা কে'? নয়নতারা প্রশ্ন করল।

'উনি রাজকুমার। আমাদের মনিব। আর আপনি...'

'বলুন। চট করে তো বলে দিলেন আমরা বড়লোক'।

'আপনি...আপনাকে আমি ঠিক ঠাহর করতে পারছি নে। রাজকুমারের খুব নিকট কেউ নিশ্চয়'।

'তাহলে আমাকেই বলতে হল'। নয়নতারা বলল, 'আমি এই গ্রামের একটি ব্রাহ্মণকন্যে। এবং অত্যন্ত দরিদ্র। আর আপনাদের মনিব সম্বন্ধে একটা কথা বলে রাখি, ভবিষ্যতে আপনার কাজে লাগবে। দরিদ্রদের ঘরে চড়াও হওয়া ওঁর মস্ত একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। এখানে আসতে আসতে সেসব গল্পই হচ্ছিল। দারিদ্র্যে ওঁর ভয়ংকর লোভ'।

দুটি চতুর মেয়ের চঞ্চল দৃষ্টি ও মধুর জিহ্বার আওতার মধ্যে রাজু অস্বস্তি বোধ করছিল। সে বলল, 'নয়ন, আর যদি আমাকে খুঁড়বে আমি কিন্তু অনেক কথা বলে দেব। তুমি কত দরিদ্র আর কেমন দীন ব্রাহ্মণকন্যা, এ জানতে কারো বাকি থাকবে না'।

'কি সর্বনাশ'! নয়ন কপট ত্রাস অভিনয় করল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খানিকটা ভীতও হল। বলা যায়

না, রাজকুমার সেই আংটির গল্পটা উত্থাপন করে বসতে পারে। সে বলল, 'আচ্ছা বাপু, আমরা অন্য কথা বলছি'।

এদের এই মধুর কলহে কেট রিনরিন করে হেসে উঠল এবং এদের সম্পর্ক সম্বন্ধেও একটা ধারণা করে নিল।

নয়নতারা বলল, 'আপনি কী করে সময় কাটান ভাই? বাগচীসাহেবের সম্বন্ধে যা শুনলাম, তাতে তিনি ঘরে খুব একটা থাকেন বলে মনে হয় না। ছাত্র পড়ান আর গ্রামের লোকের কথাবার্তা নিয়ে মেতে থাকেন। তখন আপনি কী করেন'?

'একার সংসার। কাজ, নেই বলতে নেই, ধরতে গেলে শেষ হয় না। তাই নিয়ে থাকি'।

'আজ তো স্কুলের ছুটি, আজও বাগচীসাহেব বাড়িতে নেই। আমি কিন্তু এসব পছন্দ করি না'।

কেট মনিবপক্ষের কথায় বিব্রত হল। কী অপছন্দ হল কে জানে। 'কী বললেন ঠিক ধরতে পারলাম না'—সে বলল।

নয়নতারা বলল, 'কর্তাকে কিন্তু ছুটিছাটার দিনে বার হতে দিই নে, যদি আমি হতাম'।

কেটের মুখ লাল হল। সে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

রাজু বলল, 'আপনি গান জানেন'?

রাজু শুনেছিল, গান জানা, সাহেবি বাজনা বাজানো মেমদের একটা সাধারণ গুণ।

কেট লজ্জিত মুখে বলল, 'জানি না। ইনি বোধ হয় ভালো জানেন'?

'কে, নয়ন? গানের গ-ও নেই ওর মধ্যে। কিন্তু আপনি বাজাতে জানেন, যেমন ধরুন, পিয়ানো'?

'তাকে জানা বলে না'।

'তাহলেও কিছু জানেন'।

'ওটা অত্যন্ত দামি যন্ত্র। নিজের যন্ত্র আমার কোনোদিনই ছিল না। ভালো করে শেখা হয়নি'।

রাজু ঝোঁকের মাথায় একটা প্রস্তাব করে ফেলল, 'আপনি যদি নিজে অভ্যেস করার সঙ্গে সঙ্গে এই অকেজো মেয়েটিকেও কিছু কিছু শিখিয়ে দেন, আমি একটা পিয়ানো যোগাড় করে দিতে পারি'।

'দুজনে একসঙ্গে অভ্যেস করতে পারি, শেখানোর দায়িত্ব নিতে পারি না'।

নয়ন বলল, 'আর-একটা কাজ করতে হবে। আমাকে খানিকটা ইংরেজিও শিখিয়ে দিতে হবে'।

'হঠাৎ'? রাজু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল।

'গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও বিদ্বান হয়ে বসে থাকে, তাদের মতো হয়ে থাকব নাকি'? নয়নতারা রাজুর কথা বলার ভঙ্গিও অনুকরণ করল।

'তুমি তো ভয়ংকর লোক নয়ন, তোমাকে বিশ্বাস করে কারো কোনো কথা বলা উচিত নয়'।

নয়নতারা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসি থামলে বলল, 'আপনি কিছু মনে করবেন না বাগচীজায়া, এটা আমাদের একটা ঘরোয়া রসিকতা'।

আরো কিছুক্ষণ আলাপ করে কেটের কাছে বিদায় নিয়ে রাজু ও নয়নতারা পথে বেরুল।

রাজু বলল, 'বেশ লোকটি'।

'আমার চাইতেও ভালো'?

রাজু হাসিমুখে নয়নতারার দিকে মুখ তুলে চাইল।

'বলব'?

'না, বলতে হবে না'।

দুজনে নীরবে পাশাপাশি চলল খানিকটা পথ।

রাজু বলল, 'এই হার কোথায় পেলে নয়ন, এমনি একটির কথা আমিও ভাবছিলাম'।

'রানী দিয়েছেন'।

'পারিশ্রমিক বুঝি মহাভারত পড়ার'?

'হ্যাঁ, রানীর হুকুমে পরে থাকতে হয়, যেমন তোমার হুকুমে মেমসাহেব হয়ে দিনের বেলার পথেও তোমার পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছি'।

'কী সুন্দর বিনয় তোমার! নয়ান কবরেজ কি এর আগে গ্রামের পথে হাঁটত না'?

'সঙ্গে তখন রাজকুমার থাকত না'।

'তাহলে রাজকুমারেরই ঘোমটা দেওয়া উচিত'।

পথের বাঁক নিয়ে বলল নয়নতারা, 'আচ্ছা, রাজকুমার, আমরা কেন গিয়েছিলাম বলতে পারো কেটের সঙ্গে আলাপ করতে'?

'আলাপ করার জন্যই'।

'ও কি তোমার সাধারণ একজন কর্মচারীর স্ত্রী নয়? ওর স্বামীর বিদ্যাবত্তার জন্যেই কি গিয়েছিলাম'?

'তুমি কি এই কথাই ভাবছিলে এতক্ষণ'?

'হ্যাঁ, হঠাৎ আমার মনে হল। কেট তোমাব কথায় বার বার মনিব বলে উল্লেখ কবেছিল। তখন ভাবিনি। পরে পথ চলতে চলতে মনে হল, ও য়ুরোপীয় বলেই গিয়েছিলাম কি? কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সে কৌতূহল যদি স্ত্রীলোক বলে হতো, তুমি বোধ হয় আমাকে নিযে যেতে না'।

'নয়নতারা, তুমি কী বলছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না'।

'আমার মনে হয় রাজকুমার, ও ইংরেজ অথচ দেশি লোকের স্ত্রী, এ-ঘটনাটায এক মোহ সৃষ্টি করেছে। তোমার কী মনে হয়'?

'আমার কিছু মনে হয না। বেশ লাগল ; তুমি ছিলে, কেট ছিল, বেশ কাটল সময়টা। যদি তুমি শেখো, আমি পিয়ানোর ব্যবস্থা সত্যিই করব'।

নয়নতারা ঈষৎ হেসে বলল, 'ইংরেজিও শেখাবে'?

'একটু দাঁড়াও'—বলে রাজকুমার পাশের জঙ্গলটার দিকে গেল এবং কিছুক্ষণ পবে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে ফিরে এল।

'সে কী! ঘোড়া কি এখানে বাঁধা ছিল নাকি'?

রাজু বলল, 'এখন যাই, তুমি এ-পথটুকু একা একা যাও, বরং আমি দাঁড়িযে দেখি। তুমি বাড়িতে ঢুকলে আমি ঘোড়ায় চড়ব'।

নয়নতারা বলল, 'স্নানাহারটা আজ আমার বাড়িতে হলে হতো না? আচ্ছা, তুমি যাও। বেলা হয়েছে। বিকেলে যেন একবার দেখা পাই'।

বাগচী ফিরে এসে দেখল রান্না শেষ কবে কেট একটা পুরনো পত্রিকা নিয়ে পড়ছে। হ্যাট কোট ভেস্ট খুলে শার্ট গায়ে কেটের পাশে গিয়ে বসল বাগচী।

মুখের সামনে থেকে কাগজ সরিয়ে কেট বলল, 'কাজ হল'?

'হল। নীল কী করে তৈরি হয় শিখে এলাম'।

'তাই শিখতে গিয়েছিলে নাকি'?

'দূর, তা হবে কেন ; কালকের সেই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করে এলাম। মনে খুব অশান্তি ছিল। প্রচলিত ব্যবস্থার উপর বিদ্বেষ বোধ হচ্ছিল। ডানকানের কাছে ক্ষমা চাইলাম। ছেলে দুটির সঙ্গে কথা বললাম, তাদের তিরস্কার করলাম। নিয়মানুবর্তিতা লঙ্ঘন করা অন্যায়, তা বুঝিয়ে দিলাম। পেয়াদাদের একজনকে পেয়েছিলাম, তার কাছে সেই সাধারণ কথাটার পুনরুক্তি করলাম—শাসনে স্নেহ থাকা চাই'।

'বেশ করেছ'।

'তা মন্দ নয়, ডানকানের উপর যে রাগটা হচ্ছিল সেটা আর নেই। বেশ লোক ডানকান। আমি

তো জানি আমাদের দেশের লোকেরা কেমন নিয়মানুবর্তিতাজ্ঞানশূন্য'।

'এবার খাবে তো'?

বাগচী জুতো মোজা খুলে স্লিপার পায়ে দিয়ে টেবিলে গিয়ে বসল, তারপর বলল, 'কেট, তুমি একা একা কী করলে, কাগজ পড়ছিলে'?

'না। আজ রবিবারটা আমার ভালোই কাটল। দুজন লোক এসেছিলেন। একটি মেয়ে, একটি পুরুষ। আন্দাজ করতে পারো কারা'?

'কী রকম চেহারা'?

'দুজনেই রূপে অসাধারণ। মনে হয় দুজনে প্রেমে ডুবে আছে। এবং সে প্রেম মলিন নয়'।

'বটে! কিন্তু রূপে অসাধারণ কাকে পেলে তুমি'?

'আজ আমি বলব না। তুমি ঠাহর করার চেষ্টা করো'।

'দেখা যাক। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে চোখে পড়ে কিনা। অসাধারণ রূপ দূর থেকেই চোখে পড়বে'।

আহার শেষ হলে মুখ ধুয়ে এসে বাগচী বলল, 'কেট, ডার্লিং, আমি কি ধর্ম থেকে সরে যাচ্ছি'?

'এ-কথা কেন মনে হল'?

'আজ এপর্যন্ত একবারও ঈশ্বরের কথা মনে হয়নি'।

'আজ মনে না-হওয়ার কারণ আছে। রবিবার আজ। তোমার উপাসনা রবিবার-বিমুখ। ওটা তোমার বিদ্রোহের ফল'। কেট হাসল।

'কী সাংঘাতিক কথা'! বাগচীও হাসল, 'আমাকে রবিবার-বিদ্বেষ পেয়ে বসেছে'।

'তা খানিকটা সত্যি। রবিবারে তুমি ধর্মচিন্তা থেকে সরে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গেছ। রবিবারের ধর্মের অভ্যেস থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে আর-এক অভ্যেসে জড়িয়ে পড়লে'।

'সেটা আদৌ ভালো নয়। অভ্যেসমাত্রই খারাপ। এসো, একটু ঈশ্বরকে ডাকি' বলতে বলতে ঘরের খালি মেঝেতে জানু পেতে বসল বাগচী, কেটকেও বসতে হল। বাগচী উপাসনা শুরু করল :

> হে ঈশ্বর, হে পরম পিতা, আমাকে এত সুখ তুমি কেন দিলে আমি জানি না। আমি যেন দর্পিত না-হই। আমার যেন অহংকার না-আসে। আমার ইতিমধ্যে মনে হচ্ছে ডানকানের কাছে ক্ষমা চাইতে গিয়ে সত্যিকার বিনত হতে আমি পারিনি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল আমি তার কাছে অকারণে নত হচ্ছি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল আমি মিথ্যা ব্যবহার করছি, কারো শেখানো বাঁধা বুলি বলছি। হে ঈশ্বর, তুমি আমার অন্তরের অভ্যন্তরে যা দেখেছ তাই সত্য। আমি যেন তোমার কাছে মিথ্যা না-বলি। ক্ষমা চাইবার মতো মহৎ না-হয়েও ক্ষমা চাইতে গিয়ে কিছু অপমানিত বোধ করেছি, আমাকে ক্ষমা করো।

উপাসনা শেষ হলে বাগচী উঠে দাঁড়াল, বলল, 'কেট ফিরে আসতে আসতে ভারি একটা কৌতুকের অনুভূতি হয়েছে। চলো, বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করতে করতে বলব'।

দু'হাতে দু'গাল রেখে মাথা উঁচু করে বাগচীর মুখ দেখতে দেখতে অর্ধশায়িতা কেট বলল, 'কী মনে হয়েছিল'?

'প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের একটা কথা'।

'কী কথা, সেই নহুষের মতো ব্যাপার নাকি'?

'মিথোলজি নয়, মনস্তত্ত্ব। তাতে লিখেছে, মা সন্তানকে ভালোবাসে নিজের জন্য, স্ত্রী স্বামীকে শ্রদ্ধা করে নিজের জন্য। এমনি সব ব্যাপার'।

'সেটা আবার নতুন কী! নিজের স্বামী ছাড়া আর-কাউকে স্বামীর শ্রদ্ধা কি মেয়েরা দিতে পারে'?

'তা নয়, তা নয়'। বাগচী হাসল, 'মা সন্তানকে স্তন্য দেয় স্তন্য দেওয়াটা সুখজনক বলে, স্ত্রী স্বামীকে শ্রদ্ধা করে শ্রদ্ধা করা সুখজনক বলে। আমরা যদি ভগবানকে ভালোবাসি সেটাও স্বার্থের জন্য'।

'তা হবে। কিন্তু হঠাৎ সে-কথা মনে হল কেন'?

'ভাবলাম কেটকে আমি ভালোবাসি, ভালোবেসে আমার তৃপ্তি ব'লে ; সেখানে কেটের অপেক্ষা আমিই প্রধান। কেটের মঙ্গলের চাইতে আমার তৃপ্তিই বড়'।

'কী সাংঘাতিক'!

'না-না, কথাটা ঠিকভাবে ভেবে দ্যাখো। ধরো, যদি তোমার মঙ্গলই ভাবতাম তাহলে যে-নীলকর তোমার পাণিপ্রার্থী হয়েছিল, আমার উচিত হতো তার হাতে তোমাকে দিয়ে আসা। ঐশ্বর্যে ও ক্ষমতায় নীলকর আর আমাতে অনেক পার্থক্য। আজ তা উপলব্ধি করলাম'।

কেট খিলখিল করে হাসল। 'আমার স্বার্থেই আমি তোমাকে ছাড়তাম না, তা ভুলে যাচ্ছ কেন? আমার ভালোবাসাও তো স্বার্থপর, যদি তোমার মনস্তত্ত্ব সত্যি হয়'।

কিছু সময় বাগচী মুগ্ধ আনন্দে নির্বাক রইল। একটু পরে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী ভাবছ'?

'শান্তির নামে কি অশান্তির বীজ বুনে এসেছ তাই আন্দাজ করার চেষ্টা করছি'। বলল কেট।

১৭

অর্ধজাগ্রত অবস্থায় পিয়েত্রোর কানে সুরগুলি ভেসে আসছিল—স্ট্রাম, স্ট্রাম। ঠিক পরিচিত বলা যায় না সুরটা, অথচ অনেকদিনের পুরনো মনে হয়। এমনকী সুরটা কোনো যন্ত্রের তাও মনে হয়, হয় না।

হঠাৎ ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল পিয়েত্রো, পিয়ানোটায় কে হাত দিল? এমন দুঃসাহস হল কার?

শোবার ঘরে দরজা খুলে পিয়েত্রো অবাক হয়ে দেখল রাজুকে। সে মাথা নিচু করে এক অদ্ভুত ছন্দে পিয়ানো বাজাচ্ছে।

'তুমি? তাও ভালো, আমি ভাবি কে হাত দেয় পিয়ানোতে'!

'আপনার ঘুম ভাঙল অসময়ে'।

'না, সময় ঠিকই আছে। একটু জ্বর-জ্বর বোধ হয়েছিল কাল রাত্রিতে, তাই উঠতে দেরি হয়েছে। তুমি বাজাও, আমি আসছি'।

সেই নাচের সুরটায় এখানে-ওখানে পরিশোধন করে পিয়েত্রো একটা সুর খাড়া করেছিল, রাজু সেটা বাজাচ্ছিল নিজে কিছু সংযোজন করে। পিয়েত্রো ফিরে এসে বসল রাজুর কাছে।

'জ্বর-জ্বর মতো নয়, তাহলে জ্বরই হয়েছে। মুখ অত্যন্ত শুকনো দেখাচ্ছে আপনার'।

'ও কিছু নয়। কুইনাইন ও কিছু ব্র্যান্ডিতে চলে যাবে। তোমাদের খবর বলো। একোল্ কেমন চলছে'?

'স্কুল ভালোই চলবে। হেডমাস্টারটি উচ্চশিক্ষিত। এরই মধ্যে গ্রামের লোকদের মনোহরণ করেছেন। ছাত্রসংখ্যা প্রায় পঞ্চাশজন হয়েছে। তিনটি ছোট মেয়েও স্কুলে পড়ছে'।

'কৈলাস পণ্ডিতের পাঠশালার চাইতে উন্নতি হয়েছে তাহলে'?

'কৈলাস পণ্ডিত একা ত্রিশজন পড়ুয়াকে পড়াত, এখন তিনজনে পঞ্চাশজনকে পড়াচ্ছে। গোবর্ধন দত্ত ওদের বাংলা পড়ায়। লোকটার বুদ্ধি আছে। পাড়ার লোকরা অবশ্য বলাবলি করে, ছেলেদের ওতে অপকারই হবে। দ্বিতীয় ভাগ একদম পড়ায় না। দেওয়ান সেদিন আমার সামনে জিজ্ঞেস করেছিলেন। গোবর্ধন বললে—অযথা সময় নষ্ট করে কী হবে আর্কফলা মুখস্থ ক'রে। যে ক'টি অপরিহার্য তাই শিখুক। বরং কলকাতায় খোঁজ করে গল্পের বই আনিয়ে দিতে হবে ছেলেদের'।

'তোমাদের বাগচী কিন্তু একটু পাগলাটে। ইতিমধ্যে এক মজার ব্যাপার ঘটিয়েছে সে'।

'কী করেছে'?

'ডানকানের কুঠিতে গিয়েছিল। তুমি শুনেছ নাকি ডানকানের দুজন পেয়াদা এসে একোলের দুটি ছেলেকে মেরেছিল ; তারই প্রতিবাদ করতে গিয়েছিল বাগচী'।

'তারপর'?

'প্রতিবাদ করেছে কিনা জানি না। তবে মরেলগঞ্জে বাগচী যত পরিচিত হয়েছে আমরা ত্রিশ বছরেও তা পারিনি। কুঠির লোকজন তো বটেই, ডানকানের সব চাষিরা পর্যন্ত বাগচীর নাম উল্লেখ করে আলোচনা করছে, হাসাহাসিও করছে। ডানকানের এলেকায় যেসব লোক রেখেছি তারাই বলছিল'।

'কী বলছে তারা'?

'তাদের একদল তাকে ঘোর উন্মাদ বলছে। কিন্তু সে যে সেই ছেলে দুটির পিঠে হাত বুলিয়ে দেওয়ার জন্যে ডানকানের কুঠিতে ঢুকেছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলেছে, এটাই কাবো কারো কাছে বড় হয়ে উঠেছে। আমাদের এখান থেকে দুটি ছেলে পড়তে যায়। তারা বই কেনার টাকা চাইতে এসেছিল। তাদের কাছে শুনলাম সেই মার-খাওয়া ছেলে দুটির জন্য মুড়কি-মোয়াও পাঠিয়ে দিয়েছিল। মোদ্দা কথা, বাগচী খুব জনপ্রিয় হবে বলে মনে হয়'।

'ভদ্রলোক লোকের উপকারও করছে, কাল শুনলাম ডাক্তারিও করে'। কথাটা মনে পড়ায় রাজু আগ্রহভবে উত্থাপন করল প্রশ্নটা। 'শুনলাম স্কুলের নামকরণ আপনি করেছেন'।

'শুধু কি তাই'? পিয়েত্রো মৃদু হেসে বলল, 'আমি যে ট্রাস্টিও বটে তার শর্ত ওই নামটুকু'।

'লোকে বলছে "জ্ঞানদা" নাম পিয়েত্রোসাহেব কেন রাখল বোঝা যাচ্ছে না। গোবর্ধন বলছিল— পিয়েত্রোসাহেব যদি বাঙালি হতেন, তাহলে বলা যেত তাঁর কোনো নিকট-আত্মীয়ার নামে স্কুলের নাম রেখেছেন'।

'তোমার কী মনে হয় রাজু'?

'আমি জানি আপনি বাঙালি মায়ের সন্তান। সে-কথা আমি আর কাউকে বলিনি। শুনেই মনে হল ওটা আপনার মায়ের নাম হতে পারে। বলুন তো সেটা ঠিক কিনা'?

'তুমি ঠিকই ধরেছ'।

রাজুর খুব আনন্দ হল। একটু পরে সে বললে, 'আপনি যে কত ভালো লোক এটা তারই পরিচয়'।

'আমি যে ভালো লোক নই তারও অসংখ্য প্রমাণ আছে'।

'খ্রিস্টানদের সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলাতে শুরু করেছে'।

'হঠাৎ এ রকম মনে হল যে'?

'আপনি খ্রিস্টান হয়েও যদি আপনার ব্রাহ্মণ মাকে এত ভালোবাসতে পারেন, বাগচীর স্ত্রী কেট য়ুরোপীয় হয়েও যদি অমন খুশিমনে স্বামীর সংসার করতে পারে, তা হলে খ্রিস্টানধর্ম কখনও উচ্ছৃঙ্খল ধর্ম নয়। মন্‌সেনে...'

'বলো, শুনছি'।

'আপনি আমাকে বলেননি কিন্তু আরো একটা নাম আমি আবিষ্কার করেছি'। আপনার পিয়ানোর ডালার ভেতর দিকে অস্পষ্ট অক্ষরে আর-একটা নাম লেখা আছে। সেটা আপনার কোনো নিকট-আত্মীয়ার। আমি উচ্চারণ করতে পারি না। কিন্তু অক্ষরগুলো প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। বাজাতে বাজাতে প্রায়ই আমার চোখ দুটি লেখাটির উপরে গিয়ে পড়ে'।

পিয়েত্রোর চোখ দুটি চকচক করে উঠল। পরে শান্ত স্বাভাবিক স্বরে সে বলল, 'এখনও আছে নাকি? যখন পিয়ানোটা কিনি তখনও ওই নামটি আমার খুব মনে পড়ত। ওটা ইটালি দেশের এক কবির মানস-সুন্দরীর নাম। বোধ হয় বাইস্ লেখা আছে, নয়'?

'সেজন্য তো আর নামটি লেখেননি'!

মনে হল পিয়েত্রো কিছু বলবে, কিন্তু কথা না-বলে দাড়িতে হাত বুলোতে লাগল। একটু পরে বলল,

'রাজু, তুমি পিয়ানোটা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলে না? কবে নিয়ে যাব বলো। আমি লোকজনকে বলে দেব'।

'পিয়ানো বাজানোর আর-একজন লোক হল এ অঞ্চলে'।

'তাই নাকি, কে? ডানকানের কুঠিতেও আছে নাকি'?

'না, আপনাদের স্কুলে'।

'বাগচী, না বাগচীর স্ত্রী'?

'পরেরটি'।

'বাহ্, বেশ ভালো কথা তো! একদিন গিয়ে শুনে আসব। তাঁর কি পিয়ানো আছে'?

'না, নেই'।

'তাহলে তো অভ্যেস নষ্ট হয়ে যাবে'।

রাজু দুষ্টুমির সুরে বলল, 'আমি ভাবছি একটা বাজনার স্কুল খুলব, আপনি আমাকে একটা পিয়ানো আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন'।

'সে তো চট করে হবে না। কলকাতার কোনো দোকানে তেমনটি পাওয়া যায় না'।

'তাহলে যখন আবার আপনার জাহাজ যাবে, বলে দেবেন'।

'দেব। কিন্তু ততদিন বাগচীব স্ত্রীকে তোমাব পিযানোতেই বাজাতে দিযো। কিছু কিছু স্বরলিপির বই বোধ হয় আমি আনিয়ে দিতে পাবব'।

'যদি পিয়ানোটা বাগচীর বৈঠকখানায় আপাতত রাখি'?

পিয়েত্রো হো-হো কবে হেসে উঠল, 'জিনিসটা দুষ্প্রাপ্য বটে, তাই বলে অত সতর্ক হবার দরকার নেই। তোমার জিনিস, তুমি যে-কোনো জায়গায় রাখতে পাবো। আমার অনুমতি নিতে হবে না'।

'আর-একটা কারণ আছে বলার। আপনাকে মাঝে মাঝে গিয়ে শিখিয়ে দিতে হবে'।

'সেটা কতদূর হয়ে উঠবে বলতে পারছি না'।

ঠিক এমন সময় সদরের দিকে ঘোড়ার খুবের শব্দ পাওয়া গেল। তাবপরই ভারি জুতোব শব্দ এবং মোটা গলায় কে পিয়েত্রোর খোঁজ করল।

একজন ভৃত্য এসে খবর দিল, 'ডানকানসাহেব এসেছেন'।

'নিয়ে এসো'। পিয়েত্রো নিজেও উঠে গেল এগিয়ে আনার জন্যে।

'হাল্লো, নেইবার! হাউ ডু ডু'?

'থ্যাংক ইউ ফর দ্য অনার'।

ডানকানের করমর্দন করে পিয়েত্রো তাকে বসবার ঘরে নিয়ে এল। রাজুকে দেখে ডানকান তার করমর্দন করল, 'গুড মর্নিং প্রিন্স'।

ডানকানের এত আনন্দিত হবার কাবণ বোঝা গেল না।

পিয়েত্রো বলল, 'আপনি চিবকালই আমার কুটিরে স্বাগত, কিন্তু আজ আমি আপনার জন্য কী করতে পারি'?

ডানকান বললে, 'কিছু না। গল্পসল্প কবতে এলাম। এ-পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, একটু পিপাসা বোধ হল। ভাবলাম, পথের ধারে প্রতিবেশী পিয়েত্রো আছেন, এই সুযোগে তাঁব সঙ্গে দেখা করে আসি। দু'বছর হল এসেছি, এখন পর্যন্ত একবারও যাওয়া হয়নি'।

'আমার এক মিনিট অনুপস্থিতির অপরাধ ক্ষমা করবেন'।

পিয়েত্রো চলে গেল এবং এক মিনিট পরেই ফিরে এল।

তার পেছনে পেছনে একজন উর্দি পরা ভৃত্য হাতে ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকল। ট্রেতে সুরা ও গ্লাস। ডানকানের চেয়ারের পাশে একটা টিপয়ে ট্রেটা রেখে দিল।

পরস্পরের স্বাস্থ্য ও সুখ কামনা করে সুরাপান শুরু হল।

ডানকান বললে, 'মঁসিয়ে, ভালো স্কুলই করেছেন। হেডমাস্টারটি বদ্ধ উন্মাদ। তার খামোকা ক্ষমা চাওয়ার বহর দেখলে বুঝতেন ব্যাপারটা'।

'আমারও মনে হয় পাদরিদের কারো কারো মতো লোকটার কতকগুলো কৌণিক বৃত্তি আছে'।

'কিন্তু তবু ভালো পাদরি নয়। কয়েকটা পাদরি যা করছে ক্যালকাটায় ও চব্বিশ পরগনায় তাতে দস্তুরমতো বিরক্ত বোধ হয়। আমি অ্যাংলো-বেঙ্গলিরা হেট্ করি। তারা অত্যন্ত উদ্ধত। খাঁটি বেঙ্গলিরা সাধারণত ভালো। তাদের ছল-চাতুরি-নেই। কিন্তু এই দো-আঁশলা শিক্ষায় শিক্ষিতরা অত্যন্ত কুটিলপ্রকৃতি। আপনি শুনে থাকবেন, ফাদার লং বলে একজন নীলকরদের কাজের সমালোচনা করছে'।

'সমালোচনায় দোষ কী'?

'পার্লামেন্টে ভালো, পড়ার ক্লাসে ভালো, কিন্তু সমাজে যাতে দুর্নাম হয় এমন কাজ করা উচিত নয়'।

'তা বটে'।

'আপনার বাগচী অবশ্য সেসব বিষয়ে ভালো। সে সম্মান রেখে কথা বলতে জানে। এ-রকম লোককে মেনে নিতে আমিও প্রস্তুত। সে ছোকরাদের কাছে নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধে যে-বক্তৃতা দিয়েছে তাতে আমি খুশি হয়েছি'।

পিয়েত্রো বলল, 'দেখা যাচ্ছে দেওয়ান কাজটা ভালোই করেছে'।

'কিন্তু একটা কাজ বাগচী করছে যেটা না-করাই উচিত হতো। সে হিদেনদের চিকিৎসা করছে। ওষুধ বলে জল খাওয়াচ্ছে'।

'তাতে কি রোগ সারছে'?

'কিছু কিছু সারছে বইকি'।

'তাহলে তো খুব ভালো কথা'।

'কিন্তু একটা বিপদ আছে। লোকে ওটাকে অন্য-কিছু মনে না-করে'।

'কী মনে করবে'?

'ওষুধের নাম করে খ্রিস্টানের জল খাওয়াচ্ছে'।

'তা হবে না। লোকে তো ইচ্ছে করেই খাচ্ছে তার ওষুধ'।

'বয়স্করা কেউ খাচ্ছে না এখনও। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুদেরই চিকিৎসা করে সে'।

'এ তার খুব দয়ার পরিচয়। কিন্তু আপনি যেন তথাকথিত হিদেনদের খ্রিস্টানদের ছোঁয়া থেকে বাঁচানোর জন্য বদ্ধপরিকর'।

'হিদেনদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া, তাদের সতীদাহ প্রভৃতি প্রথা লোপ করা ভালো বলে মনে করি না। আনন্দের কথা বিধবা-বিল পাস হয়নি'।

পিয়েত্রো হেসে বলল, 'তাতে আমাদের কি ক্ষতি হতে পারত? ন্যায়কে সমর্থন করা কী উচিত নয়'?

ডানকান বলল, 'একটা আনরেস্ট হতে পারে, ন্যায় করতে গিয়ে রাজ্য বিসর্জন দেওয়া চলে না'।

রাজু বলল, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আমি পিয়েত্রোকে দেখবার জন্য বাগচীকে একবার নিয়ে আসব'।

'আপনার অসুখ নাকি? তাহলে তো...'

'ও কিছু নয়। সামান্য জ্বরভাব। আমি কুইনাইন ও ব্র্যান্ডিতেই আশ্বাস রাখি'।

ডানকান উঠে দাঁড়াল।

পিয়েত্রো বলল, 'আর-একটা হোক'।

ডানকানের গ্লাসে পিয়েত্রো নিজেই মদ ঢেলে দিল।

ডানকান গ্লাসটি নিঃশেষ করে বলল, 'কেটের বাপ-মার রুচি ভালো নয়। কাজটা তারা ভালো করেনি। একটি ইংরেজ মহিলাকে এভাবে এদেশীয় লোকের সঙ্গে বিয়ে দেবার ফল ভালো হয় না'।

'কেন বলুন তো? কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদেশের মেয়েদের সঙ্গে য়ুরোপীয় পুরুষদের বিয়ে হচ্ছেও তো আজকাল'।

'সেগুলো কি বিয়ে'?

'তা বটে। বিবাহ সম্বন্ধে আপনার মতটা বুঝতে পারলাম'।

ডানকান ঘোড়ার লাগামে হাত দিয়ে বলল, 'আমার একটা সন্দেহ কী হয় জানেন, এর ভেতরে একটা কিন্তু আছে। এদেশে ইংরেজমহিলা এত প্রচুর নেই যে তাদের বর জুটবে না স্বজাতির মধ্যে। তারা এখনও এত শস্তা নয় যে, যে-কোনো মর্কটের গলায় ঝুলে পড়বে'।

ডানকান চলে গেলে রাজু বলল, 'লোকটির যেন রাগ হয়েছে'।

'রাগ নয়। এটা ওদের জাতের বৈশিষ্ট্য। লন্ডন ও পারীতে মৌলিক তফাত ওই বৈশিষ্ট্যে। ছোট একটা দ্বীপের লোক দৈবক্রমে বাইবে বেরিয়েছে। না-পাবে অন্য কোনো লোককে বুঝতে, না-পারে নতুন ধরনের চিন্তা করতে। কেট বাগচীকে বিয়ে করায় ওদের আত্মম্ভরিতায় আঘাত লেগেছে'।

'স্বামী লোকটা বাড়ির কর্তা, তার কাছে মেয়েটি মাথা নিচু কবেছে, এতেই বোধ হয় অপমান'।

'তবু কেট তোমাদের মেয়ের মতো পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম বোধ হয় করে না। আসলে স্ত্রীলোককে এখনও ডানকানরা সম্পত্তি বলে মনে করে। ইংরেজ-সম্পত্তি তোমাদের দেশের লোক নিলে যে-রকম রাগ হতো, তেমন ধরনের রাগ হয়েছে ডানকানের'।

রাজু উঠে দাঁড়াল।

'বাজাবে না আর'?

'না। সুর ছিঁড়ে দিল ডানকান। তাহলে পিয়োনোটা নিয়ে যাবাব ব্যবস্থা করি'।

'রাজকুমার নিয়ে যাবে কি গো, আমি পৌঁছে দেব। কাল সকালের দিকে পাঠিয়ে দেব বাগচীব বাড়িতে। আমাব লোকরাই বসিয়ে দিয়ে আসবে। শুধু একদিন কেটের বাজনা আমাকে শুনিয়ো, যদি শোনাবার মতো বোধ করো'।

'কিন্তু আজ আলি খাঁকে দেখলাম না একবারও'। বারান্দায় এসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলল রাজু।

পিয়েত্রো কথাটা মনে করে বলার আগেই হেসে ফেলল। 'সদরে গিযেছে'।

'কেন? উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করতে'?

'না, বরকন্দাজদের বন্দুক আনতে। দু'হাতে টাকা ওড়াচ্ছে'।

'হঠাৎ? লাঠিসোঁটায় মানায় না নাকি বরকন্দাজদের'?

'বললে, আজকাল ডাকাত-ঠ্যাঙাড়েরাও বন্দুক ব্যবহার কবে, তাদের সামনে লাঠিয়াল কী করবে'?

রাজু হাসিমুখে বলল, 'বন্দুকের দালালি করছে কিনা কে জানে'।

কয়েকটা মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন বসন্তকাল। আমগাছগুলির মাথায় এবং বনের শালগাছগুলির সর্বাঙ্গে চৈত্র মাসের সূচনা দেখা দিয়েছে। পদ্মা ও বিলের দেশ, শেষরাতে এখনও শীত শীত করে। দুপুরের রোদে হাত মুখ খড়খড় করে শুকিয়ে। কিন্তু ঘরে বসে সহসা মনটা কেমন হালকা বোধ হয়। পথের ধুলোর ছোট ছোট ঘূর্ণিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকার ব্যাপারে যেমন, আম গাছে ডেকে-ওঠা কোকিলের ডাকে সহসা উৎকর্ণ হওয়াতেও তেমনি রোজকার দিনের বাইরে এমন একটি অনুভব আছে যেটাকে অতিশয়োক্তি করতে পারলে কবিপ্রসিদ্ধির গদ্যরূপগুলি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

বনদুর্গা ও চরণদাসের বিবাহ হয়ে গেছে। খুব সহজেই হয়েছে বিবাহটা। গোবর্ধন একদিন বাগচীকে বলেছিল কথায় কথায়। বাগচী বলল দেওয়ানকে। দেওয়ান বলল, ‘এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। ছোকরাটা ভয় পাচ্ছে কেন? লাগিয়ে দিন বিয়ে’।

বিবাহের পর চরণদাসের মা বাগচীর বাড়িতে এসে কেঁদে পড়েছিল। বিপন্ন বাগচী আবার দেওয়ানের কাছে গিয়েছিল। অনুমতি পেয়ে একদিন বুড়ি দেওয়ানের ঘরে গিয়ে কেঁদে পড়ল—বুক চাপড়াতে লাগল। চরণদাস তার একমাত্র ছেলে, শ্বশুরকুলের একমাত্র বংশধর। এ কী হল? রাজা হয়ে এ কী করল, হরদয়াল। কিছুক্ষণ কান্না শুনে হরদয়াল বলেছিল—শোনো চরণের মা, টাকা চাও? কাশী যাবে? কাশীতে যাও, টাকাও পাবে। রাজি? খবরদার, আর কাঁদবে না। গুনতে জানো? গুনে দ্যাখো পঞ্চাশ আছে ওখানে। ওঠো, পড়শি ঠিক করো গে। কাশীতে যাবার টাকা পাবে।

চরণের মা কাশী চলে গিয়েছে। যাবার সময় নাকি তার বাড়ির দরজা ধরে আর-একবার চরণের হাত ধবে এমন কেঁদেছিল যে, বনদুর্গার চোখ বেয়েও ধারা নেমেছিল। এখন সবাই জানে চরণদাসের ব্যাপারটা। বনদুর্গা কপালে সিঁদুর দিয়ে শাঁখা হাতে জল আনতে যায় নদীতে । পড়শিদের মধ্যে অনেক নথে আঙুল দিয়ে অবাক হয়ে তাকে দ্যাখে। তার সিঁদুররঞ্জিত সিঁথি ও সমুন্নত গর্ভের দিকে চেয়ে থাকে।

দ্বিতীয় খবর, একটা টাট্টুঘোড়া কিনেছে বাগচী। বড় ঘোড়া দিতে চেয়েছিল হরদয়াল, বাগচী রাজি হয়নি। সে ছোট টাট্টুঘোড়াটায় বসে স্কুল বসার আগে একবার, পরে একবার গ্রাম ঘুরতে বার হয়। তার পকেট-বোঝাই ছোট ছোট শিশি ভরা ওষুধ থাকে। শুধু যে নিজেদের গ্রামেই ঘোরে তা নয়, ডানকানের গ্রামে যায়, পিয়েত্রোর গ্রামেও।

ডানকানের গ্রামের উপরে তার যেন একটা টান আছে। ইতিমধ্যে একদিন সে একটা কৌতুকের সৃষ্টি করেছিল সেই গ্রামে। একটি চাষির জ্বর হয়েছিল। তাকে ওষুধ দিচ্ছিল বাগচী। এমন একটা রোগের নাম করেছে সে, যে লোকে উচ্চারণ করতে পারে না। রোগটা নাকি টাইফয়েড। দু'বেলা লেগে ছিল জোঁকের মতো বাগচী। চাষিটি সাতদিন হল অন্নপথ্য ক'রেছে। ডানকানের কুঠি থেকে লোক এসেছিল ডাকতে। বাগচী বলেছিল—সে কি! একমাসের আগে ওর যাওয়া বারণ।

—বারণটা করল কে?

—কেন, আমি ডাক্তারি করলাম, আমিই বারণ করেছি।

—ভালো কথায় না-যায় জোর করে নিয়ে যাব।

—বটে? ভেবেছ আমি রাগতে জানি না। যাই দেখি সদরে।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে টাট্টু চড়ে সেই অস্নাত অভুক্ত মুহূর্তেই রওনা হয়ে বাগচী সদরে পৌঁছে কালেক্টরের কাছে নালিশ করেছিল। এবং ব্যাপারটা যে প্রকৃত, তার প্রমাণস্বরূপ ডানকানের কাছে কালেক্টরের চিঠি এসেছিল ব্যাপারটার অনুসন্ধান ক'রে। অবশ্য সে চিঠিতে মামুলি উপদেশ অপেক্ষা হাসাহাসি ছিল বেশি।

এই ঘটনার পরে একদিন তার রোগীটি এসে বাগচীকে বলেছিল—সাহেব, বিশটা টাকা দরকার।

—কেন রে?

—প্রায়শ্চিত্ত করে সমাজে উঠতে হবে।

—প্রায়শ্চিত্ত? তা বটে, অনেক দিন রোগভোগ করলে করে বটে।

—আজ্ঞে না। জাত মেরে দিয়েছেন আপনি। আপনি জল খাইয়েছেন আমাকে ওষুধের সঙ্গে। আমরা জাতিতে সদ্‌গোপ। আমার ছেলের অন্নপ্রাশনে কেউ আসছে না।

—বটে! গেট-আউট, গেট-আউট! অন্নপ্রাশন টু হেল!

লোকটা বাগচীর রাগ ও তার বিস্তৃত বক্ষের ওঠা-নামা দেখে ভয় পেয়ে স্কুলবাড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে বাগচী তার ছোকরা সহিসটাকে পাঠিয়ে দিল—লোকটাকে ডেকে আন তো। বলবি, সাহেবের কাছে না-এলে আরো চটে যাবে সাহেব।

লোকটি এলে তাকে টাকা দিয়ে বলছিল বাগচী—দ্যাখো বাপু, আমি বুঝতে ভুল করেছিলাম। সমাজের সঙ্গে বিবাদ করার চাইতে শান্তিটা ভালো।

ডানকানের সঙ্গেও একদিন দেখা হয়েছিল বাগচীর।

ডানকান বলেছিল—এত কষ্ট করলে বাগচী, কী লাভ হল? নিমকহারামটা নাকি তোমার কাছ থেকে টাকাও নিয়ে এসেছে'?

—আপনি ঠিকই বলেছেন, আমাদের দেশের লোক এমনি বটে।

—এতে তোমার শিক্ষা হওয়া উচিত।

—হয়েছে বইকি। আমি একজন হিন্দু কম্পাউন্ডার খুঁজছি। ওষুধ সে-ই দেবে, আমি দেব না।

টাট্টু-আরূঢ় বাগচীর পিঠের দিকে চেয়ে ডানকান হো-হো করে হেসে উঠল, কী কথার কী উত্তর! জড়বুদ্ধি!

তৃতীয় ঘটনাটা ঘটিয়েছে বুজরুক আলি। সে নৌকো বোঝাই করবে এক নৌকো দেশি বন্দুক এনেছে পশ্চিম থেকে। বন্দুক বিক্রিই এখন তার পেশা বলে মনে হয়। শুধু বিক্রি করাই নয়, প্রয়োজন হলে ব্যবহারও শিখিয়ে দেয়। কিন্তু দামের কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। রাজুর কাছে এসেছিল—বন্দুক নেবে গো?

রাজু হেসে বাঁচে না। দিয়ো দশটা। কত দাম নেবে?

এক হাজার টাকা দিয়ো।

কেনা-বেচা হয়ে গেল। পরদিন সকালে বুজরুকের একটি লোক এসে বন্দুক নিয়ে হাজির। সদর-নায়েব টাকা গুনে দিতে দিতে বলল, এতে কী হবে?

হুজুর, বরকন্দাজরা লাঠির বদলে এই নিক না।

ওরা কি ছুঁড়তে জানবে?

আলি খাঁ শিখিয়ে দেবে।

বুজরুক আলি শেখানোর ব্যবস্থাও সত্যি সত্যি করেছে। আজকাল যেমন সেলাইয়ের কলওয়ালারা সেলাই শেখায়।

কিন্তু গোবর্ধন দত্ত শখ করে একটা বন্দুক কিনতে গিয়েছিল—পাঁচশো দাম হেঁকে বসেছে বুজরুক আলি।

ঘটনা ঠিক বলা যায় না। ঘটনার আয়োজন। এটা করেছে হরদয়াল। দু'বিঘে জমির মাটি কেটে ইটের ভাটা বসেছিল। এখন রোজই কিছু কিছু করে ইট এসে জমা হচ্ছে স্কুলবাড়িটার কাছে। বহু দূর থেকে সেই ইটের পাঁজাগুলো চোখে পড়ে। বর্ষার পর হাজার-মনি নৌকোয় চুন এসেছে। বাঁশের চাটাইয়ের ঢাকা চুনের স্তূপের পাশে সুরকির কল বসেছে। কলুর বলদের চালে ঘুরে ঘুরে দুটি বলদ প্রকাণ্ড একটি লোহার চাকা ঘুরিয়ে সুরকি তৈরি করছে। আর এসেছে কাচ। সেগুলো সযত্নে তোলা আছে দেওয়ান-ভবনে। স্কুলবাড়ি বোধ হয় শিশার মহল হবে।

এসব ঘটনার পরে।

রাজু তার হাতিটায় চেপে পিয়েত্রোর আবাদ থেকে ফিরছিল একদিন। খেলা দেখার নিমন্ত্রণ ছিল রাজুর। বুজরুক আলি দুদিন ধরে খেলার বন্দোবস্ত করেছে। রাজবাড়ির বরকন্দাজ এবং পিয়েত্রোর বরকন্দাজদের মধ্যে খেলা। দুদিকেই দশজন-দশজন করে খেলুড়ে। পিয়েত্রোর কুঠির নিচেই তিন-চার বিঘা মতো জমি থেকে আগাছা ও ঘাস উপড়ে ফেলে খেলার জায়গা করা হয়েছে, সুরকি ও নীল মেশানো চা-খড়ির গুঁড়ো দিয়ে বড় বড় চৌখুপি আঁকা হয়েছে মাটির উপর। যেন মস্ত একখানি দাবার ছক।

রাজুর বরকন্দাজরা রাত থাকতে উঠে চলে গেছে। রাজু গিয়ে দেখল পিয়েত্রোর বরকন্দাজদের সঙ্গে মিলে তারা সেই মাঠের ধারে দৌড়চ্ছে ; সকলেরই খালি গা। অত সকালেও তারা ঘর্মাক্ত হয়ে উঠেছে। হাতি থেকে নেমে রাজু দেখতে পেল বুজরুক আলি বরকন্দাজদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাদের উৎসাহিত করছে।

'খেলা শুরু হয়েছে নাকি'?

'না, রাত্রির জড়তা কাটাচ্ছে এরা। আপনার বরকন্দাজরা ভেবেছিলাম ভেতো, এখন দেখছি তা নয়, রাজকুমার। বেশ দৌড়চ্ছে। আপনি এসেছেন, এখন খেলা আরম্ভ হবে। দাবার নিয়মে খেলা। পেছনে বল না-থাকলে, নিজের কৌশলে বন্দী কিংবা নিরস্ত্র করে ঘর দখল করা যেতে পারবে। আমি ওদের সকলকে কৌশলটা বুঝিয়ে দিয়েছি। দেখলাম প্রায় সকলেই জানে দাবা খেলার নিয়ম। ওরা নিজেরাই খেলতে পারে। তবু ওদের চালালে, মানে বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করলে, ভালো হয়। আপনি একদিকে চালাবেন আর আমি একদিক। রাজি'?

'ঠিক আছে। কিন্তু দঙ্গলে মিশে গেলে কী করে চেনা যাবে কোন দলে কে'?

'তারও ব্যবস্থা আছে। এমনকী ওরা মাঠে নেমে অন্যায় যাতে না-করে তার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। মাঠের মাঝখানে থাকবেন পিয়েত্রো নিজে'।

কয়েক পা গিয়ে তারা পিয়েত্রোর আটচালায় বসল। একজন ভৃত্য পাঠিয়ে বরকন্দাজদের ডেকে আনা হল। তারা একটু বিশ্রাম করলে তাদের কিছু কিছু আহার্য দেওয়া হল। বরকন্দাজদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান ছিল। হিন্দু ও মুসলমানরা খানিকটা দূর তফাতে দুই দলে বসে হিন্দু ও মুসলমান রাঁধুনির হাত থেকে গরম হালুয়া ও রুটি খেল। তারপর তাদের পোশাক দেওয়া হল। নিজের নিজের ধুতির উপরে দল হিসাবে তারা লাল নীল কুর্তা বেছে নিল, মাথায় বাঁধার লাল, নীল গামছা। দুই দলেরই নিজেদের সর্দার ঠিক করা আছে দেখা গেল। রং পছন্দের ব্যাপারে তারাই সকলের হয়ে মত দিল। পিয়েত্রোর দল পেল নীল, রাজবাড়ির দল লাল। সর্দারদের ডেকে জিজ্ঞেস করা হল তারা দাবার নিয়ম

অনুসারে পদাতিক চালাতে জানে কিনা। তারা মাথা নেড়ে জানাল, জানে। তখন তাদের প্রত্যেককে ছোট ছোট বেতের ঢাল ও ছোট ছোট তলোয়ার দেওয়া হল। রাজু পরীক্ষা করে দেখল, তলোয়ারগুলোর ধার মোটা, খেলার তলোয়ার সেগুলো। কিন্তু মানুষের প্রাণ তাতেই যেতে পারে। রাজু তার এই আশঙ্কার কথাও জানাল।

বুজরুক বলল, 'যেখানে বল আছে সেখানে কেউ যদি আক্রমণ করে তবে তো সে দু-তিনজনের সঙ্গে লড়ছে, তার ক্ষমতা কী সে কাউকে ঘায়েল করে। যেখানে একা একা লড়াই হবে সেখানে বিচারক নিজে তাঁর লম্বা তলোয়ার নিয়ে উপস্থিত থাকবেন। তাছাড়া মাঠে নামার আগে প্রত্যেককে বলে দেওয়া হবে খুন জখম যাতে না-হয়'।

দু-দল বরকন্দাজ মুখোমুখি দাঁড়াল। খেলা শুরু হল। দু-দলের মাঝখানে লম্বা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে পিয়েত্রো।

দাবার চালে খেলা চলল। রাজুর বয়স বুজরুক আলির চাইতে কম হলেও দেখা গেল, দাবার চালে সে-ও প্রায় তুল্য বিচক্ষণ। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে যুদ্ধ লেগে গেল। রাজুর একটি পদাতিককে একা পেয়ে বুজরুক তাকে মারবার জন্য একটি পদাতিক এগিয়ে দিল। রাজুর পদাতিকও ঝাঁ করে খাপ থেকে তলোয়ার বার করে দাঁড়াল, কিন্তু টেরচা একটা ফাঁক পেয়ে রাজু তার সর্দারকে এগিয়ে দিল তার সেই আক্রান্ত পদাতিকের কাছে। বুজরুকের যুযুৎসু পদাতিক খাপে তলোয়ার ভরে ফেলল। তখন রাজুর পদাতিকও তলোয়ার খাপে ভরতে ভরতে খেলার আনন্দে বললে, 'ইন্সা আল্লা'। কিন্তু রাজু যখন এই প্যাঁচটার মুখে আর-একটার কথা ভাবছে তখন দেখতে পেল, একেবারে বাঁ দিকে বুজরুকের একটি চাল মারাত্মক হয়ে উঠেছে , বুজরুকের সর্দারের সহায়তা পেয়ে তার এক পদাতিক রাজুর এক নির্বল পদাতিককে পেয়ে বসেছে। এদিকে রাজু সর্দার সরাতে পারে না, এদিকের ঘর হাতছাড়া হয়। রাজু হাতি ঘুরিয়ে নিয়ে সেদিকে পৌঁছতে পৌঁছতে একটি যুদ্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধটা মারাত্মক হতে পারত, ওদিকে দুজন, এদিকে একজন। শান্তিরক্ষক পিয়েত্রো লম্বা তলোয়ার হাতে পাশে গিয়ে দাঁড়াল তাদের, কিন্তু রাজুর মাথায় আর-এক চাল এল। এবার তার চালের সময়, সে তার সর্দারকে দু-ঘর পিছিয়ে দিল টেরচা করে। বুজরুক তার ঘোড়ায় বসে সেটা দেখতে পেয়ে হাঁ-হাঁ করে ওদিকের যুদ্ধ থামিয়ে ছুটে এল। রাজুর সর্দারের সামনে তখন উন্মুক্ত ব্যূহ। পরের চালে, হয় সে পিয়েত্রোর একটা আনকোরা নতুন বরকন্দাজকে ঘায়েল করবে, কিংবা সে তার পদাতিক সঙ্গীদের দুটিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। চাল দেবার আগে বুজরুককে সারা মাঠের চারদিকে বার দু-এক ঘোড়া ছুটিয়ে পদাতিকদের অবস্থান বিচার করতে হল।

প্রায় এক ঘণ্টা খেলা চলল কিন্তু খেলা থামাতে হল। একটা কাগজের ছকে উভয় পক্ষের পদাতিকগুলির অবস্থান চিহ্নিত করে নিয়ে বুজরুক বলল, 'আজ এই খেলা এই পর্যন্ত'। রাজুর পক্ষের দুটি, বুজরুকের একটি পদাতিক মার গিয়েছিল। বুজরুকের পদাতিকটি প্রায় পাঁচ মিনিট রাজুর সর্দারের সঙ্গে লড়েছে। সে একটু আঘাতও পেয়েছে। বেচারার বাহুমূল দিয়ে রক্ত পড়ছিল। বুজরুক তার হাত বেঁধে দিয়ে বলল, 'সবাই বিশ্রাম করে নাও। এরপর ফৌজ-ফৌজ খেলা'।

'সেটা কী রকম ব্যাপার'? রাজু কৌতুকভরে প্রশ্ন করল।

'বন্দুক নিয়ে খেলা। যে সবচাইতে তাড়াতাড়ি বন্দুক গেদে ছুঁড়তে পারবে আর যার নিশানা সবচাইতে ভালো তারা এক-এক মোহর করে বকশিশ পাবে'।

রাজু হাসতে হাসতে বলল, 'আমাদের বরকন্দাজরা কি বন্দুক ধরতে শিখেছে'?

'দেখুন না কী হয়'।

চারজন বরকন্দাজ বুজরুকের ঘর থেকে রাশি রাশি বন্দুক বার করে আনল।

বুজরুকের ফৌজি খেলা দু'ভাগে ভাগ করা যায় ; এক হচ্ছে, দূরের একটা গাছের গায়ে ঝোলানো

বালিভরা চামড়ার থলেতে গুলি বেঁধা। দ্বিতীয় হচ্ছে, পাঁচ মিনিটে কে কতবার বন্দুক গেদে ছুঁড়তে পারে।

খেলা শুরু হল। রাজু ভেবেছিল তার বরকন্দাজরা পারবে না। দেখা গেল নিশানার বিষয়ে চতুর্থ, পঞ্চম ও অষ্টম স্থান তারা পেয়েছে এবং গুলি ছুঁড়বার ব্যাপারে প্রথম হয়েছে তারই এক ছোকরা বরকন্দাজ। পাঁচ মিনিটে সে পাঁচবার গুলি ছুঁড়েছে এবং ষষ্ঠবারের জন্য গাদা শেষ করেছে।

এরপর পাচকরা এসে দু-পক্ষের বরকন্দাজদের ডেকে নিয়ে গেল। তারা শরবৎ খেয়ে যার যার বাড়ির দিকে সেই রঙিন কুর্তা গায়েই চলে গেল।

বুজরুকেরও পিপাসা পেয়েছিল। খানিকটা নামে সিরাজি কিন্তু আসলে ফরাসি মদ খেয়ে পিপাসা জুড়িয়ে সে পিয়েত্রোকে বলল, 'একটা সমস্যার সমাধান করতে আমি পারছি না'।

'কী সমস্যা'?

'যদি একদল ডাকাত এনফিল্ড রাইফেল নিয়ে চড়াও হয়, আমাদেব এই বরকন্দাজরা কী কবে আমাদের বাঁচাবে'?

পিয়েত্রো হো-হো করে হেসে উঠল।

'জেলখানায় কি তোমাকে পাগলের সঙ্গে থাকতে হতো'? রাজু প্রশ্ন করল।

বুজরকও হাসল। কিন্তু সে বলল, 'এনফিল্ড বাইফেল থেকে প্রতি মিনিটে ওস্তাদ বন্দুকবাজ কখনও কখনও দুটো গুলি ছুঁড়তে পারে'।

'কেন, ফরাসি বিট্‌লোডারগুলি কী রকম মনে হয় তোমার'?

'ভালো। কিন্তু মাত্র তিনটি আছে। একটি আপনার, একটি আমাব, একটি রাজাভাইয়ের'।

রাজু হাসতে হাসতে বলল, 'ডাকাত এলে তিনটেই তোমাকে দেওয়া হবে, আলি খাঁ'।

রাজু হাতিতে ফিরতে ফিরতে ভাবছিল বুজরুকের কথা। প্রকৃতপক্ষে কেমন যেন একবগ্‌গা হয়েছে বুজরুক আলি জেলখানা থেকে বেরিয়ে। পাগল নয়। তার বুদ্ধিবৃত্তি কোথাও এতটুকু ভোঁতা হয়নি। বন্দুকের ব্যবসা ভালোই করছে। ইতিমধ্যে এদিকে-ওদিকে আরো বন্দুক বিক্রি করেছে সে কয়েকজন সম্পন্ন-গৃহস্থকে। বন্দুকের নেশা ধরেছে লোকের।

দূর থেকে ইটের স্তূপগুলো চোখে পড়ছিল রাজুর। আট-দশ জন লোক বসে বসে হাতুড়ি দিয়ে ইট ভেঙে ভেঙে টুকরো করছে, সুরকিকলের লোহার চাকা ঘুরছে বলদ দুটির টানে। স্কুলবাড়ির হলঘর উঠতে শুরু করেছে আটচালাটার পাশে। কত বড় হবে বলা যায় না এখনই। হরদয়ালের পরিকল্পনা, হরদয়ালই জানে। কিন্তু লোকটি বোধ হয় নিজের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ব্যয় না-করে থামবে না।

স্কুলবাড়ির পাশ দিয়ে যেতে-যেতে রাজু দেখতে পেল, কেট তাকে দেখতে পেয়ে তাদের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে নয়নতারাকে কী বলছে।

মাহুতকে হাতি থামাতে বলে রাজু সেখানেই নেমে পড়ল। মাহুত হাতি নিয়ে চলে গেল।

নয়নতারা বলল, 'এই এক প্রহর বেলায় কে তোমাকে নামতে বলল—নট আই। ইউ গো ইয়োর ওন ওয়ে'।

রাজু বলল, 'অবাক করলে নয়ন, তুমি ঘটর ঘটর করে ইংরেজি বলছ। আমি তো এতদিনেও পারলাম না। বাট টু বিউটিজ আর মাচ মেনি ফর এ ম্যান।

কেট হেসে উঠল। একটু থেমে বলল, 'রাজকুমার, নয়নতারার পাশে আমাকে সুন্দরী বলা তাকে অপমান করার মতো'।

হঠাৎ রাজুর কণ্ঠে সরস্বতী আশ্রয় নিলেন, সে বলল, 'মাতা, দুহিতা, পত্নী, ভগ্নী রূপে, হে নারী,

তোমাদের সৌন্দর্যের হুকুমে পুরুষ জাতকে চালাচ্ছ। কেউ নয়নতারা, কেউ মাথার মণি'।

'এত'! বলল নয়নতারা।

নয়নতারা ও কেট খিলখিল করে হেসে উঠল।

ঘরে ঢুকে রাজু পিয়ানোর পাশে গিয়ে বসল। চৈত্রের দুপুর। আকাশে-বাতাসে একটা মৃদু উত্তাপ। সে উত্তাপে আলস্য আছে। স্নানে অবহেলা আসে। যাচ্ছি-যাব করে গড়াতে ইচ্ছা করে, আড্ডাটাকে আর-একটু চালিয়ে নিতে ইচ্ছা হয়।

রাজু পিয়ানোর ডালা খুলে একটা স্বরলিপি সম্মুখে রেখে কতকগুলি ভারি ঝংকার তুলল।

ভ্রমরের পাখার আর মৌমাছির গুঞ্জনে এর সঙ্গে পার্থক্য আছে নাকি?

লাল চুলের গোছা নিজের কপাল থেকে সরিয়ে কেট জিজ্ঞেস করল, 'সনাটা'?

রাজু শুধু মোটা সুরগুলি তুলতে তুলতে বলল, 'বাজাও, কেট। তুমি বোসো। আমি শুনি'।

কেটের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি এল। ছোট একটা টিপয় ছিল হাতের কাছে, সেটা নিয়ে রাজুর গা ঘেঁষে বসে পিয়ানোয হাত রাখল। রাজু আর-একবাব প্রথম দিকের মোটা সুর বাজাতেই কেট চড়ার দিকের চাবিগুলিতে আঙুল চালাল। মোজার্টের স্বরলিপি সামনে। রাজু আবার খাদের দিকে বাজিয়ে এল, কেট মিষ্টি মধুর থেমে থেমে আনা সুরে প্রতিধ্বনি তুলল চড়ায়। অপূর্ব লাগল সে-বাজনা, শুধু নয়নতারার কাছে নয়, রাজু এবং কেটও আশ্চর্য হযে গেল। ঠিক যেন দুজনে কথা বলছে, মোটা গলায় একজন অনুনয়-বিনয় করেছে, আর-একজন মধুরকণ্ঠী কুপিতা দূরে সরে যাচ্ছে। কখনও দুজনের গলা মিলছে, সুর মিলছে, কিন্তু আবার যেন ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কখনও মনে হল দুটো প্রজাপতি, কখনও মনে হল দুটি কপোত, কখনও বা মনে হল প্রায়ান্ধকার গাছের ছায়ায় একটি ছেলের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে একটি মেয়ে। তাদের কলহ আর মিটছে না।

বাজনা শেষ হলে গাল লাল করে কেট উঠে দাঁড়াল।

নয়নতারা বলল, 'আমি যেন স্বপ্ন দেখছিলাম'।

রাজু বলল, 'তবুও তুমি শিখবে না'?

নয়নতারা প্রসন্নমুখে বলল, 'রাজকুমার, সব কাজ কি সকলে পারে'?

কাছে টেবিলের উপরে এক চুপড়ি ফল ছিল। রাজু একটা আপেল তুলে নিয়ে কামড়াতে কামড়াতে টেবিলের উপরে পা ঝুলিয়ে বসে বলল, 'তা বটে। কেট, তোমাকে একদিন নয়নের কাব্য পড়া শুনতে হবে'।

কেট বলল, 'কী কাব্য'?

'যে-কোনো একটা'।

'আপনি তো আমাকে বলেননি'।

নয়নতারা বলল, 'আপনি বুঝি তা জানেন না? কোকিলার কাকবিনিন্দিত গলার স্বরও কোকিল সহ্য করে। পাশাপাশি থাকলে ও-রকম মোহ হয়'।

কেট বলল, 'আমি তো কোকিলাগোষ্ঠীরই একজন। কিন্তু আপনার খুব খিদে পেয়েছে রাজকুমার। আপনাকে কয়েকটা ফল ছাড়িয়ে দেব'?

রাজু নিজে বিস্মিত ও লজ্জিত হল—খ্রিস্টানের বাড়িতে বসে সে খাচ্ছে? অন্যমনস্ক হয়েই আপেলটা সে খেতে আরম্ভ করেছিল। জবাব দিল, 'ছাড়াতে হবে কেন, এমনি খাচ্ছি'।

কিন্তু আড্ডা ভাঙতে হল। রূপচাঁদ এসে উপস্থিত।

'কী রে'?

'আজ্ঞে, রানীমা খোঁজ করছিলেন'।

'কেন রে'?

'বেলা অনেক হল, খালি হাতি ফিরে গেল। ছাতা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন রানীমা'।

'তাহলে চল। চলি কেট। যাবে নাকি নয়ন'?

'চলো। বাগচী এখুনি ক্লান্ত হয়ে ফিরবেন'।

পথে বেরিয়ে রূপচাঁদ রাজুর মাথায় ছাতি ধরে পেছন পেছন চলছিল।

নয়নতারা রোদ-মাথায় পেছনে আসছিল।

রূপচাঁদ বলল, 'মা, ছাতার তলায় আসুন। রোদে কষ্ট হচ্ছে'।

নয়নতারাকে বাধ্য হয়ে ছাতার তলায় আসতে হল। প্রকাণ্ড ছাতা। লাল সিল্কের উপর জরির কাজ করা।

রানী বললেন, 'কোথায় ছিলি রাজু? বেলা হল, স্নান-আহার নেই। শরীরের কী দশা করেছিস, দেখতে পাস নে'?

আদুড় গায়ে দাঁড়িয়ে রাজু আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখল। কাঁধ ও বুককে অত্যন্ত চওড়া বলে মনে হচ্ছে কোমরের তুলনায়। কিছুদিন আগে বুক কোমর কাঁধের পরিমাপে এত পার্থক্য ছিল না। ঠোঁটের উপরে গোঁফের রং কালো হয়ে উঠছে, নীল নীল নরম দাড়িতে গাল ও চিবুক ঢেকে আছে।

রানী বললেন, 'সময়মতো আহার, সময়মতো স্নান না-করলে পরে কষ্ট পাবি'।

'সময়মতোই সব করি'।

'তাহলে আর ভাবনা কী ছিল। এত বেলা ছিলি কোথায়'?

'তুমি ভেবেছ রোদ মাথায় গাঁয়ের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম? তা নয়। পিয়েত্রোর বাড়িতে দাবা খেলার নিমন্ত্রণ ছিল। বুজরক আলি বরকন্দাজ নিয়ে দাবা খেলতে বলেছিল। সে ভারি মজার খেলা'।

'তুই নাকি বাগচীমাস্টারের বাড়িতে যাস'?

'তা যাই, প্রায়ই যাই। এতক্ষণ সেখানেই কাটিয়ে এলাম'।

'ওরা তোর কর্মচারী, প্রজার সামিল ; এত ঘন-ঘন ওদের বাড়ি যাওয়া ভালো দেখায়'?

'কর্মচারী হবে কেন? বাগচী তো হেডমাস্টার, শিক্ষার ব্যাপারে সে কারো কর্মচারী নয়। না, কর্মচারী নয়'।

'ওরা তো খ্রিস্টান ; ওদের চালচলন আর আমাদের চালচলন তো এক নয়'।

'হুবহু এক। তুমি একদিন গিয়ে দেখে এসো, মা। কেটকে একখানা ভালো শাড়ি পাঠিয়ে দিয়ো। দেখবে কোনো পার্থক্য নেই'।

'যা, স্নান করে আয়, আজ আমার ঘরে খাবি'।

'তখন কিন্তু ওদের রান্নাঘর থেকে এটা-ওটা আনিয়ে নিতে পারবে না'।

'না, তুই যা, দেরি করিস নে আর'। রানী হাসলেন।

বিকেলের দিকে রানী হরদয়ালকে ডেকে পাঠালেন।

'আমাকে ডেকেছেন'?

'হ্যাঁ। এইবার তোমাকে একটা কাজের ভার দেব'।

'আজ্ঞা করুন'।

'একজন ভালো ঘটক চাই'।

'ঘটক? কী হবে, কার জন্যে'?

'তোমাদের রাজকুমারের বয়েস হয়েছে। আমি ভালো ঘটক চাই। সে যেন মূর্খ না-হয় এবং মানুষ সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকা চাই। আজকালকার নতুন রাজা-মহারাজার ঘরে আমার কাজ হবে না। তোমার

উৎসাহের একটু অভাব দেখতে পাচ্ছি'।

'এত কম বয়েসে বিয়ে দেওয়াটা ভালো বলে মনে করতে পারছি না। আচ্ছা, রানীমা, ঘটকের খোঁজ করব'।

আর ঠিক এমনি সময়ে রাজু বলল, 'নয়ন, এর পরদিন যখন ফরাসডাঙা থেকে খেলার নিমন্ত্রণ আসবে তোমাকে নিয়ে যাব'।

সামনে দাবার ছক। ঠোঁট কামড়ে চিন্তা করতে করতে নীল গজের মাথা ধরে গোনাগুনতি তিন ঘর এগিয়ে দিয়ে বলল, 'সে-কথা পরে হবে রাজকুমার, কিস্তি সামাল'।

রাজু নয়নতারার গলা চুল ঠোঁট প্রভৃতি থেকে তার চোখ ফিরিয়ে এনে দাবায় চোখ দিয়ে বলল, 'কী সর্বনাশ, তুমি ফাঁকি দিয়ে দু-এক চাল এগিয়ে দিয়েছ'।

রাজুর চালে নয়নতারার গজ ঢাকা পড়ল, তার একটি কিস্তি বেসামাল। রাজু বলল দাবার দিকে চোখ রেখে, 'এর পরদিন আরো বড় দাবার ছক হবে, আর রাজবাড়ির পদাতিক চালনা করবে তুমি হাতির পিঠে বসে'।

নয়নতারা চাল খুঁজতে খুঁজতে বলল, 'ওরা বলবে, রাজার রাজ্যে পুরুষরা ভেড়ুয়া হয়ে গেছে, তাই'।

রাজু বলল, 'রাজবাড়ির লোকরা উত্তর দেবে, এ সামান্য খেলায় মেয়েলি বুদ্ধিই যথেষ্ট'।

রাজু দাবা থেকে চোখ তুলল, কিন্তু নয়নতারা তার বাঁ দিকে তুরুক-সওয়ারের আড়াই পায়ের দু' দিকের ঝোঁক বুঝে নিয়ে চাল দিয়ে বলল, 'অত গর্ব তো ভালো নয়, রাজকুমার। রূপচাঁদকে দিয়ে রানীমার কাছে ঘোড়া আর বন্দুক চেয়ে পাঠাতে হল দেখছি'।

খেলা আর হল না। রাজু বলল 'কী বললে'?

নয়নতারা সম্ভবত কল্পনায় নিজের অশ্বারূঢ়া বন্দুকধারিণী মূর্তি প্রত্যক্ষের মতো দেখতে পেয়েছিল। তার গালে লজ্জা নামল, কিন্তু সে বলল, 'রাজকুমার, তোমার রাজ্যে যদি হামলা হয় আমি বোধ হয় বোরখায় মুখ ঢেকে পালাতে পারব না'।

দাবার ছক সরিয়ে রাজু বলল, 'বুজরুক আলিকে তোমার অসাধারণ বলে মনে হয় না'?

'তার খেলাটা অবশ্য অভূতপূর্ব নয়। বাদশাহি আমলে মানুষ নিয়ে সতরঞ্চ খেলা হতো। খেলার হার-জিতে বাঁদি হস্তান্তর হতো'।

'তা হতো,' বলে রাজু একটু চিন্তা করল। 'একদিকে দেওয়ান হরদয়াল, অন্যদিকে পিয়েত্রো। দুজনের পক্ষ থেকে দুজন লোক গ্রামগুলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাগচীমাস্টার করছে ওষুধ বিতরণ, আর বুজরুক করছে বন্দুকি ব্যবসা'।

নয়নতারা চিন্তা করল, তারপর ভ্রূ দুটিকে কিছু বাঁকা করে বলল, 'এই দুইয়ের মধ্যে নীলসাহেব ডানকান নিজের অবস্থা ফিরিয়ে নিচ্ছে। সে নাকি জমিন্দারি খরিদ করার চেষ্টায় আছে'।

'তাই নাকি'?

'তাহলে এ ডামাডোলের বাজারে লাভ কার'?

সে আকাশ-বাতাসে চৈত্রের পড়ন্ত বেলায় কিছু ছিল অবশ্যই। নয়নতারা রাজুর একখানা হাত নিজের দুখানি কোমলস্পর্শ হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'কেটকে জিজ্ঞেস করব? না, তার দরকার নেই'?

বাগচী যা বলে, তা করে। চরণদাসকে সে তার কম্পাউন্ডার করেছে। খ্রিস্টানের জল পাছে কাউকে খেতে হয়, কোনো রোগী রোগযন্ত্রণায় ওষুধ খেতে গিয়ে যদি সমাজে অপাঙ্‌ক্তেয় হবার যন্ত্রণাও অনুভব করে তার তুলনায় শুধু রোগযন্ত্রণা দুঃসহ। চরণদাসের বাইরের দিকের একটা ডিসপেনসারি তৈরি হয়েছে। কয়েকটি কাঠের বাক্সে তার ছোট ছোট শিশি সাজিয়ে চরণদাস বাগচীর প্রেসক্রিপসন অনুযায়ী ওষুধ দেয়। চরণদাসের ওষুধ দেবার জল সারারাত ফোটে, সারাদিন থিতোয়, পরদিন কাচের বড় বড় বোতলে সেগুলো ভরে বনদুর্গা। কোনোদিন ওষুধ দিতে গিয়ে জল নেই দেখে চরণদাস ডাকে—বনদুর্গা, আর-একটা জল দিয়ে যাও তো।

তার ঘরের বারান্দায় লম্বা দুটো বেঞ্চি পাতা, রোগীদের বসার জন্য। কখন-কখন অন্যথা হলেও সকালের দিকে প্রায়ই ঘণ্টাখানেক এখানে এসে বসে বাগচী।

একদিন সে হাসতে-হাসতে এক রোগিণীকে বলেছিল—কী বলিস বুড়ি মা, এখানে এখন-আর জাত যাবার ভয় নেই, কেমন?

সেই ডিসপেনসারিতে এখন আড্ডা বসে, গোবর্ধনের পোস্ট আপিসের আড্ডা উঠে এসেছে। গোবর্ধন কলকাতা থেকে এক সহচরকে লিখে একখানা পত্রিকা আনিয়েছে। তার মতো জ্ঞান চরণদাসের নেই। গোবর্ধন বলে, 'এ পত্রিকা মেয়েদের জন্যেই। রাধা শিকদার আর কালীপ্রসন্নর। পড়তে দিস, হতভাগা, পড়তে দিস বনদুর্গাকে'।

'পড়বে কি রে? ও কি পড়তে জানে'?

'কৈলাস পণ্ডিতের পাঠশালায় ক-খ কি শেখেনি'?

'তা জানে'।

'তবে'?

বনদুর্গাকে উঁচু গলায় ডাকে গোবর্ধন, বনদুর্গা বেরিয়ে আসে। বই নিয়ে যায়। চরণদাস নিঃশ্বাস বন্ধ করে থাকে। কী একটা অজ্ঞাত আশঙ্কার মতো, দুঃসাহসের মতো মনে হয় যখন আড্ডার বন্ধু ক'টির সামনে বনদুর্গা হেসে-হেসে কথা বলে।

বন্ধুদের মনোভাবকে প্রীতির চোখে দেখলেও ঠিক ভদ্র বলা যায় না। বনদুর্গা যদি কম বয়সের হতো, যদি সে শিশু হতো তাহলে বোধ হয় তাকে নিয়ে ময়দার একটা তালের মতো লোফালুফি করত সকলে। বনদুর্গা যেন তাদের বিজয়ের নিশানা। তাকে অবলম্বন করে কমবয়সীর দল সমাজের মাথাদের উপরে নিজেদের প্রমাণ করেছে। ইতিমধ্যে চরণদাসের অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত এক বন্ধু তাকে একটি শাড়ি কিনেও দিয়েছে।

সেই আসরে গোবর্ধন একদিন ঘোষণা করল, 'আমরা সকলে খ্রিস্টান হই না কেন'।

'কেন, কেন, খ্রিস্টান হবি কেন'?

আসর যতক্ষণ থাকল কেউ কিছু বলল না। আড্ডা ভাঙলে গোবর্ধন নিচু গলায় বলল, 'চরণ, তুই আমার বাল্যবন্ধু, প্রাণের প্রাণ, তোকে আমি বলতে পারি'।

'বল না!'

'তোর বউ ধারে কাছে নেই তো, খবরদার, যেন বউকে বলবি নে'।

'না, তুই বল। তোর জন্য যে-বউ পেলাম, তার দাম কি তোর চাইতে বেশি'?

'বিয়ে করতে চাই'।

'তার জন্য খ্রিস্টান হবি কেন'?

'নোলক পরা, মূর্খ গবেট, কান্না-প্যাচপেচে একটা বারো বছরের মেয়েকে বউ বলতে পারব না'।

'তোরা তো কায়স্থ। কায়স্থদের ঘরে কি বড়সড় মেয়ে পাওয়া যায় না'?

'না'।

'কিন্তু খ্রিস্টান হলেই যে পাবি এমন কী কথা আছে। জাত খোয়ানোটা আমি পছন্দ করি নে। তোর বন্ধু-বউও করে না। তুই কী রকম মেয়ে হলে বিয়ে করিস, বল। আমরা খোঁজ করি'।

'শুনলে তোর ভয় লাগবে'।

'তোর অনেক ডাকাতে-কথা আমি জানি'।

বনদুর্গার মতো যদি মেয়ে পাই বিয়ে করি'।

কথাটা শুনে চরণের মুখ মলিন হল। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, 'বনকে তুই ভালোবাসিস গোবরা'?

'দূর পাগল! সে আর-একজন। তাকে দেখিনি। তবে আমার কী মত জানিস? নোলক পরা আদুরি কোনো কুমারী মেয়ের চাইতে শাদা কাপড় পরা নিরাভরণ অল্পবয়েসি বিধবারাই যেন বেশি আপন মনে হয়। তোর বনদুর্গার রূপের ঐশ্বর্য আমি চাই নে ভাই। তবে তার মতো দুঃখ-পাওয়া মেয়ে যদি হয়, তার দুঃখ দূর করার চেষ্টা করি'।

চরণ বসে বসে দুলে দুলে ভাবল। তার মনে হল, কোথায় যেন শুনেছে কথাটা। একটা ফারসি বয়েৎ বোধ হয় আছে। শ্বেতকরবী ফুলের সঙ্গে কে-এক কবি নিরাভরণার তুলনা দিয়েছে।

চরণ হেসে বলল, 'তুই খ্রিস্টান হ। কিন্তু ভাই, বিয়ে করার আগে আমাদের বলিস। আমি আর বনদুর্গা দুজনে পছন্দ করে দেব'।

গোবর্ধন বলল, 'কিন্তু যা বললাম তা যেন কখনও বনদুর্গা শোনে না। তোর মতো যদি যা-তা ঠাওরায় আমাকে, লজ্জায় অপমানে মেয়েদের মতো জলে ডুবে মরতে হবে'।

হিন্দু সমাজে পাওয়া কঠিন'।

চরণ বলল, 'একটু ধৈর্য ধর। আমি বুঝতে পারছি তোর রুচিমাফিক মেয়ে হিন্দু সমাজে পাওয়া কঠিন'।

ডিসপেন্সারি ঘরে চরণ একদিন বাগচীকে বলল, 'মাস্টারমশাই, আমাদের গোবর্ধন খ্রিস্টান হতে চায়'।

'কেন? খ্রিস্টান হবে কেন? ড্যাম ফেলিওর, দ্য হোল প্রসেস ইজ এ ফেলিওর। গাধা ঠকা, সারা ব্যাপারটাই ঠকার ব্যাপার। দ্যাখো হে, তোমার বন্ধুকে বলে দিয়ো নিজে আমি খ্রিস্টান হতে পারিনি। বড় কঠিন ব্যাপার। আচ্ছা, তোমার বন্ধুর মেজাজ কেমন, তোমার মেজাজ কেমন? যদি কেউ তোমার বন্ধুর এক গালে চড় মারে, আর-এক গাল বাড়িয়ে দিতে পারবে'?

'তা দেবে কেন'?

'ধরো, তোমার বউকে কেউ চুরি করল, তাকে খুন না-করে তুমি থামবে'?

'আজ্ঞে না, বোধ হয় খুন করা কিংবা খুন হওয়া ছাড়া আর-কোনো উপায় থাকবে না'।

'পথে এসো বাছা। বন্ধুকে বুঝিয়ে বোলো। আমি বুঝছি খ্রিস্টান হয়ে কী আহাম্মুকি করেছি। ধর্মের নাগাল পেলাম না। ক্রাইস্ট যা বলেছেন সেগুলি কতকগুলি থিয়োরিমাত্র, ক্রাইস্ট ছাড়া আর-কেউ পারে? এসব নিজের মনের কথা, কাউকে বলতে নেই। হঠাৎ বলে ফেললাম তোমাকে'।

বাগচী তার টাট্টুতে চেপে বলল, 'চরণ, তুমি এক কাজ করো তো বাপু। নতুন শিলনোড়াটায় গাঁদাপাতা ছেঁচে একশিশি রস করে রাখো। খানিকটা তুলো যোগাড় করে রেখো, আমি কিছুক্ষণ বাদেই আসছি'।

দু-তিন ঘণ্টা বাদে বাগচী একা একা ফিরে এল।

'কেউ এল না তো'?

'দরকার হল না। ডানকান নিজেই ব্যবস্থা করেছে। লোকটা বড় ভালো হে, চরণ। সে ভুল স্বীকার করল। বলল, চাবুক মারতে গিয়েছিল, চাবুকের চামড়ার লেস্ গায়ে না-লেগে চাবুকের পেতল বাঁধা ডাঁটটা লেগে গেছে। আমি বললাম—মারধোর করা ভালো নয়। সে বলল—নিশ্চয়, ভালো কে বলে। প্রয়োজনে করতে হয়। তা ও নিজেই লোকটার কপালে কী কী ওষুধপত্র দিয়ে বেঁধে দিয়েছে'।

চরণ ফস্ করে বলে বসল, 'ডানকান ভালো নয়, ডাকাত! তবে এর আগের সাহেবের আমলে মারধোর বেশি ছিল। এর আমলে অন্য ব্যবস্থা। এ কৃষকদের জমিছাড়া করছে। তারা জেরবার হল'।

'আহা, কী বলো তুমি চরণ!'

বাগচী অসন্তুষ্ট মুখে বিদায় নিল।

চরণদাস সেদিন বিকেলবেলায় নিজের জমির তদারক করে ফিরছিল, সদর-নায়েবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তেমাথার কাছে, যেখানে রানীর কাছ থেকে জমি চেয়ে নিয়ে সদর-নায়েবের স্ত্রী ছোটখাটো একটা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে। বাদ্যভাণ্ডও হয়নি, হাঁকডাকও হয়নি। সদর-নায়েব বলেছিল—সর্বনাশ কোরো না গিন্নি, যা করো ধীরেসুস্থে করো, চোখে পড়ে যেয়ো না। দেওয়ানজি করছেন ইস্কুলের পিতিষ্ঠে, সেখানে সাগরপারের শিবোদুগ্‌গা।

নায়েব-গিন্নি ছলছল চোখে বলেছিল—বড়লোকের ছেলের বিয়ে হয় বলে গরিবের ছেলের বিয়েতে ঢোল-ডগরও বাজবে না?

কিন্তু ভারি কৌতুক হয়েছিল একটা। বলতে হয় তাই রানীকে একবার মুখ ফুটে বলেছিল নায়েব-গিন্নি। সদ্য-প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের মাথায় দুধ ঢেলে ফিরতেই নায়েব-গিন্নি দেখল আর-একজন কে শাদামাটা গরদের থান পরে শিবের মাথায় তার ছোট ঘটিটা থেকে গঙ্গাজল ঢালছে। কী সর্বনাশ, রানীমা!

'গোল কোরো না বড়বউ, চুপ করে এসেছি চুপচাপ চলে যাব'।

একটা মধুর হাসিতে কথা শেষ করে মস্ত ঘোমটায় মুখ ঢেকে রানী চলে গেলেন।

সদর-নায়েব দাঁড়িয়ে মন্দিরের পূজারি ছোকরার সঙ্গে কথা বলেছিল। চরণদাসকে দেখে নায়েব বললে, 'চরণ, দাঁড়িয়ো, কথা আছে'।

পূজারির সঙ্গে কথা শেষ করে সদর-নায়েব চরণকে বললে, 'চলো, হাঁটতে হাঁটতে কথা হবে। আচ্ছা, গোবর্ধন তো তোমার বন্ধু, তুমিই সেই বনদুর্গার স্বামী না'?

'হ্যাঁ'।

'তোমার কাছে খবরটা পাব তাহলে। তুমি না-জানলেও আলাপে-টালাপে বনদুর্গা জানতে পারবে। গোবর্ধনের মামি খুব ধরেছে, ছোঁড়ার বিয়ে দেবে; বুঝতেই তো পারো ছেলেপিলে হয়নি বেচারার, কী নিয়ে থাকে। ছেলে বলতে ওই ছোঁড়া। তা আজকাল ভালো হয়েছে। ডাকঘর আর ইস্কুল দুটো কাজ মিলিয়ে তিন কুড়ি টাকা মাইনে পাচ্ছে। কিন্তু ওই মামিই মাথা খেয়েছে। আমাদের বাপু অত আনখাই ছিল না, অত আশনাইও নয়। বাপ বলল, বে করো। করলাম। তোমাদের মামির তখন আট আর আমার বয়েস একুশ হবে। তারপর এই দু-কুড়ি বছর কাটালাম একসঙ্গে। খারাপ কাটালাম কি'?

'গোবর্ধনের বিয়ে দিতে চান'?

'তা অন্যায়ই-বা কী করে বলি। ছেলে সমখ হয়েছে। বাইশ-তেইশ বোধ হয় পার হল'।

'বউ আসুক—এ আমরাও চাই, কিন্তু চট করে কোথাও কথা দেবেন না যেন'।

'তাহলে তো বাপু, ওর মনের কথা কিছু কিছু জানো মনে হচ্ছে'।

'তা জানি'।

'এই মরেছে, বিয়ের কথা খুলে-খেলে বলেছে! হায়-হায়, কোন্ গোঘাটায়-বা মাথা মুড়িয়েছে রে!'

সদর-নায়েব দুর্ধর্ষ বলে খ্যাত। ডানকানের আগেকার মরেলগঞ্জের কুঠির ফ্যাক্টর মামলা করতে

গিয়ে তার সেই দুর্ধর্ষ রূপের সাক্ষাৎ একবার পেয়েছিল। দিনকে রাত, রাতকে দিন হয়ে গেল দেওয়ানিতে। সেই নায়েবের বিচলিত ভাব দেখে চরণদাসের হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু যথাসম্ভব গম্ভীরভাবে বলল, 'না, সে কোথাও মাথা মুড়োয়নি। তবে জোর করে কিছু করতে যাবেন না। ধীরে ধীরে আমি কথাটা তুলে দেখব। আপনি পাত্রী ঠিক করার সময়ে মেয়ের যেন একটু বেশি বয়েস হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন'।

'কুলীন কায়স্থের ঘরে ঘাঘি মেয়ে কোথায় পাব, বাপু। সে আর হবে না। আমি আজ তোমাদের মামিকে খুব ধমকে দেব। লোকে কথায় বলে—যম জামাই ভাগ্না, তিন নয় আপ্না। তুমি কি বলতে চাও, তোমরা গিয়ে মেয়ে দেখে পছন্দ করলে তবে আমরা কথা ঠিক করব'?

'তাহলেই যেন ভালো হয়'।

'নতুবা'?

'নতুবা, ধরুন, গোবর্ধনকে কিছুদিন কলকাতায় রেখেই গোল হয়েছে যে। কলকাতায় আজকাল জাত খোয়ানোটা ডাল-ভাত। লেখাপড়া জানা একটু বেশি বয়সের মেয়ে ছাড়া ওর মনে ধরবে না'।

সদর-নায়েব হায়-হায় করতে-করতে চলে গেল।

মাসখানেক পরে এক সন্ধ্যায় গোবর্ধন এসে চরণকে বলল, 'বন্দুক কিনেছি রে'।

'অত টাকা কোথায় পেলি? পাঁচশো না দাম চেয়েছিল'?

'পেয়েছি। মামিকে বললাম, খেতে বুনো শুযোরের উৎপাত। তবে অত লাগেনি'।

'তোর মামার সঙ্গে আলাপ হল। বিয়ের কথা বলছিলেন'।

'তুই কিছু বলেছিস'?

'বললাম, চট করে কোথাও কথা যেন না-দেন। এইরকম সব কথা হল'।

'ভালো করেছিস বলে'।

'তোর পছন্দ তো জানতে পেরেছি, না-বলে উপায় কী'?

'সেজন্যে নয়। এখন বিয়ের কথা থাক'।

চরণ ক্ষুণ্ণ হল। গোবর্ধন মত বদলায় বটে কথায় কথায়, কিন্তু পুবনো মতে ফেরে না। অর্থাৎ যখন সে বলেছিল বড় বয়সের মেয়ে বিয়ে করবে, তখন সে কোনোদিনই আর অল্প বয়সের একটি মেয়েকে বিয়ে করে আনবে না, এ-সম্বন্ধে চরণ নিশ্চিত ছিল। বিয়েতে যখন আগ্রহ নেই বলেছে তখন তার মনের মতো হল, হয়তো তার বন্ধু বনদুর্গাকেই ভালোবেসেছে। তাই বলছে বিবাহই সে করবে না। চরণ চুপ করে রইল শুধু বেদনাটাকে অনুভব করার জন্য।

সহসা গোবর্ধন বলল, 'চরণ, তোর বউকে ডাক, কিছু খাবার আনতে বল। সকালবেলায় বেরিয়েছিলাম, দাম-দস্তুর করে এই গ্রামে ফিরলাম'।

চরণদাস উঠে গিয়ে কিছু মুড়ি ও নারকেল নাড়ুতক্তি নিয়ে এল।

গোবর্ধন মুড়ির কাঠাটা কোলের উপর তুলে নিয়ে খেতে খেতে বলল, 'তোর বউ এল না? আমার পছন্দের কথা তাকে বলেছিস বুঝি'?

চরণ অপরাধীর মতো মাথা নিচু করল।

'ভালো করিসনি বলে। বেচারা আর-কোনো দিনই আমার সঙ্গে সহজ হয়ে কথা বলতে পারবে না। তুই বড় বোকা'।

চরণ বললে, 'দাঁড়া, ডেকে আনি'।

'থাক,-থাক, আজই দরকার নেই। পরে একসময়ে তাকে বুঝিয়ে বলিস। তার চাইতে একটা মজার কথা শোন, একটা ঘোড়াও কিনেছি'।

'হেডমাস্টার টাট্টু আর তুই ঘোড়া'?

'না রে, দেখে পছন্দ হয়ে গেল। আলি খাঁ গছিয়ে দিল। এখন ভাবছি, চড়ে দেখি স্বাস্থ্যটা ভালো হয় কিনা। রাজকুমারের স্বাস্থ্য দেখেছিস, আমাদের প্রায় দ্বিগুণ দেখায়'।

মুড়ি আর জল খেয়ে তারপর বনদুর্গার হাতের সাজা পান চিবোতে চিবোতে গোবর্ধন চলে গেল।

চরণ চুপ করে বসেছিল, বনদুর্গা এসে বলল, 'পোস্টমাস্টার এসেছিল বুঝি? তা বললে না কেন, ছানার পায়েস করা ছিল'।

চরণ বলল, 'তোমার আর গোবর্ধনের মধ্যে পড়ে আমিই বোকা হয়ে গেছি। তখন ভাবলাম খাবার চাইতে গিয়ে তার নাম করলে যদি তুমি অসন্তুষ্ট হও। এখন দেখছি তাই বলাই ভালো ছিল'।

খানিকটা চুপ করে থেকে বনদুর্গা বলল, 'চরণ, আমি একটা মানত করেছি। একটু খরচ করতে হবে। হাতের কাছে অন্য-কোনো ঠাকুর না-পেয়ে নতুন পিতিষ্ঠে শিবকেই বলেছিলাম'।

'কী মানত, কেন'?

'তুমি শুনে হাসবে না তো? মনে মনে বলেছিলাম, সেদিনকার সেসব কথা বলার পর যদি পোস্টমাস্টার আবার আসে ঠাকুরকে বাতাসা ভোগ দেব'।

চরণ মানতের হেতু ও উপকরণ শুনে হেসে ফেলল।

'ব্যবস্থা করে দেবে তো'?

'দেব। পূজারিকে গিয়ে বলব'।

আবাল্য বন্ধুর জন্য চরণের কষ্টও হতে লাগল।

কিন্তু বৈশাখ যেমন নির্মম হয়ে চৈত্রের বসন্তকে উড়িয়ে নিয়ে যায় তেমন করে পোস্টমাস্টার গোবর্ধন একদিন এল।

ডিসপেন্সারি-ঘরটায় চরণ একা ছিল, গোবর্ধনের গলার সাড়া পেয়ে বনদুর্গা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এল। দীর্ঘ দু-তিনটি পল সে ভাবল কী বলে গোবর্ধনকে সম্বোধন করা যায় ; কিছু মনের মতো খুঁজে না-পেয়ে চরণকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমরা ভিতরে এসে বোসো। দুজনেই তো আছ'।

ভেতরে বসে এ-কথা ও-কথার পর চরণ বলল, 'তোর মন ভালো নেই গোবরা, তোর মুখটা থমথম করছে'।

গোবর্ধন লুকানোর চেষ্টা করল না। সে যা বলল সংক্ষেপে তা এই রকম :

সদর-নায়েব কয়েকদিন আগে তাকে কতকগুলো পুরনো চিঠি পড়তে দিয়েছিল। তার মধ্যে অনেকগুলি ছিল গোবর্ধনের বাবার লেখা। গোবর্ধন তার বাবাকে দেখেনি। মুর্শিদাবাদের কাছে বাড়ি ছিল, এই জানত। খুব বাল্যে গোবর্ধন তার মাকে দেখেছে। তিনি মাঝে মাঝে কাঁদতেন এ কথা গোবর্ধনের মনে আছে। বাবার লেখা চিঠি পেয়ে গোবর্ধনের খুব আনন্দই হয়েছিল। কিন্তু একটি চিঠি পড়ে তার সব আনন্দ পুড়ে গেছে। চিঠিতে একটি ঘটনার উল্লেখ ছিল। গোবর্ধনের বাবা তার শ্যালককে লিখেছিলেন পত্রবাহকের সঙ্গে সঙ্গে রওনা হতে, গোবর্ধনের মাকে তাঁর বাপের বাড়ি এই গ্রামে নিয়ে আসার জন্যে। বার বার দেরি করতে নিষেধ করে শেষ লাইনে লিখেছেন গোবর্ধনের বাবা : দেরি করলে কী হবে জানি না। কয়েক লাইন কাটাকুটি করে অবশেষে আবার লিখেছেন : দু-পুরুষ ইংরেজ-সেবার ফল ফলেছে, প্রকাশ্যে বাজারের রাস্তায় রায়তদের সম্মুখে কুঠির ছোটসাহেব...। এই জায়গাটায় চিঠিতে লেখা কয়েকটি কথা কাটা। তারপরে আবার পড়া যায়—এরপরে বাঁচতে আর ইচ্ছে নেই। ঘটনার কারণও তোমার জানা দরকার—এই বলে গোবর্ধনের বাবা লিখেছেন : আমার অপরাধ, কতকগুলি মাতাল গোরা—দোল-পূর্ণিমার রাত্রিতে দোলমঞ্চে উঠবার চেষ্টা করেছিল, আমি তাদের বাড়ি থেকে বার করে দিই।

ঘটনাটা বর্ণনা করে বোকার মতো হেসে গোবর্ধন বলল, 'কথাটা মামাকে বলতে তিনি চিঠিটা ফেরত

নিয়ে বলেছেন—চিঠিটা তোর হাতে পড়া উচিত হয়নি। বাবা আমার কাছে অপরিচিত একজন দত্তমশাইমাত্র ; কিন্তু, চরণ, চিঠিটা পড়ার পর থেকে এই ক'দিন মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে বাবার অকাল-মৃত্যুর কারণ কি ওই অপমান? তিনি কি আত্মহত্যা করেছিলেন'?

'এসব কথা মনে করে কষ্ট পাবি কেন'?

'থেকে থেকে অত্যন্ত বিদ্বেষ হচ্ছে। যেন ব্যাপারটা এইমাত্র ঘটল বলে মনে হচ্ছে'।

'তোর মন ভালো নেই'।

'না-না, মন খুব যে খারাপ হয়েছে তাও নয়। মন খারাপ হলে তো মানুষ ভেঙে পড়ে, কই সে-রকম কিছু হচ্ছে না। অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। বনদুর্গার প্রথম বিয়ের কথা মনে আছে'?

বনদুর্গা ও চরণদাসের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল।

'না, মুখ অমন করিস কেন। সে-বেচারা মৃত্যুকালে কিশোর ছিল, তোর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। আর তাছাড়া আমার মত তো জানিস—বনদুর্গা তাকে স্মরণ করে বসে থাকবে এমন মতও নয় আমার। তোরা যদি তার এককালীন অস্তিত্ব সম্বন্ধে চোখ বুঁজে থাকতে চাস তাহলেই ঠকবি। বরং আর-দশজনের মতো সেও ছিল, এটা দুজনের মধ্যে খোলাখুলি মেনে নেওয়াই ভালো। সেসব কথা নয়। সে-বেচারাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ডানকানের আগের এক সাহেব তার নীলকুঠিতে জোর করে খাটাতো—সেই কথাই মনে পড়ছে'।

মনে হল বনদুর্গা কিছু বলবে। চরণ বোকার মতো ইতি-উতি করতে লাগল।

প্রেম নয়, তার কাছাকাছি অন্য-কোনো অর্ধস্ফুট বৃত্তিও নয়। একটা উত্তাপ বিকীর্ণ করতে লাগল যেন গোবর্ধন নিঃশব্দে বসে থেকে।

খানিকটা সময় পরে গোবর্ধন বলল, 'একটা পান দাও বনদুর্গা, উঠি'।

২০

সদর-নায়েব গিয়েছিল জেলার সদরে মোকদ্দমার তদবিরে। নদীর এপারে এসে সে পালকিতে উঠতে যাবে এমন সময়ে থমকে দাঁড়াল। খালি টমটমটায় ডানকান এসে চাপল। ডানকান আগেই নদী পার হয়েছিল, বোধ হয় সহিসের ঘোড়া জুততে দেরি হচ্ছিল বলে পায়চারি করছিল।

নায়েব বেহারাদের বলল, 'দাঁড়া, সাহেব আগে গাড়ি হাঁকিয়ে যাক'।

কিন্তু টমটমে বসে ডানকান ডাকল, 'হাল্লো, নায়িব'।

'হুজুর'।

'ইধর আও'।

নায়েব টমটমের কাছ যেতেই বলল, 'উঠো, উঠো। চোলো একসাথে যাই'।

'হুজুর!'

'ডরো মৎ'।

নায়েব করুণ নয়নে পালকির বেহারাদের দিকে তাকাল, কথা বলতে সাহস হল না। অবশেষে মরিয়া হয়ে বলল, 'দেখিস বাপারা, অন্তত রসকদম্বগুলো যেন গিন্নির কাছে পৌঁছয়'।

সে নিজে পৌঁছতে পারবে কিনা এ-বিষয়ে তার কিছু সন্দেহ হয়েছিল।

ডানকান নিজে টমটম চালাচ্ছে। সকালের প্রথম দিকটায় তার বোধ হয় মনটা ভালো ছিল, সে শিস দিতেও লাগল। একসময়ে সে নায়েবকে বলল, 'নায়িব, টুমি জানো, টোমাদের মাস্টার কী আছে'?

'আজ্ঞে না, তা জানা নেই'।

'ওটা খ্রিস্টান না-আছে'।

'হুজুর'! নায়েব দৃশ্যতই অবাক হল।

'সেই কথা বলার কারণ টোমাকে টমটমে টুললাম। ওটা ডেভিল আছে। ডেভিল চেনো'?

'আজ্ঞে না, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি'।

'গুড, ভেরি গুড। ইউ আর্‌ এ জেনুইন হিন্ডু'।

অতঃপর ডানকান তার ভাঙা বাংলায় বিবৃত করল কী করে সে খবর নেবার চেষ্টা করেছে, অবশেষ আজ সহসা কী করে এক সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেছে তার। সেই সাহেব বলেছে—এবং নায়েব বোধ হয় জানে সাহেবরা মিথ্যা বলে না—কেটের বাবা এক পাদরি ছিল যাকে শুধু পাদরির পদ থেকে নয়, ইংরেজ সমাজ থেকেও বহিষ্কৃত করা হয়েছিল তার অ-খ্রিস্টানি মতের জন্য। বাগচী তারই শিষ্য। এবং বাগচীও খ্রিস্টান নয়। সে চার্চে যায় না, সে রবিবারে কাজ করে, সেদিন বেশি করে ছাত্র পডায় এবং বিশেষ কবে সেদিনটায় সে রোগী দেখে বেড়ায়। সে ভগবানেও বিশ্বাস করে না। সে হিন্দুদের চাইতেও খারাপ। এখন বলো, সে কী রকম লোক হতে পাবে।

'সে কি স্যার, সে কি নাস্তিক'?

'ইয়েস'।

'তার কি নিরীশ্বরবাদ'?

'ইয়েস'।

'সাংখ্য দর্শনের লোক নয় তো স্যার? তারা আবার ঈশ্বরকে অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। নাকি চার্বাকপন্থী'?

এবার ডানকান 'ইয়েস' বলার আগে থামল। কী জানি কী বলছে নায়েব। সে বললে, 'পন্টি বুঝি না। পনি চড়ে ও। কিন্টু ডেভিলস ইম্প্‌'।

নায়েব টমটমের দোলায় দুলতে দুলতে ভাবতে লাগল। মজার সংবাদ তো! একজন খ্রিস্টান বলছে, বাগচী খ্রিস্টান নয়। লোকটা দেখছি বর্ণচোরা আম। নায়েব কিছুক্ষণ পরে বলল, 'তা যদি না-হবে স্যাব, যদি বাগচী খ্রিস্টান না-হয় তাহলে—'

নায়েব কথাটা গিলে ফেলল। সে শুনেছিল ইংরেজরা মহিলা সম্বন্ধে আলোচনা করে না, বিশেষ করে মেমসাহেব সম্বন্ধে। সে বলতে যাচ্ছিল, তাহলে কেটকে কী করে বিয়ে করল বাগচী, কিন্তু সাহস হল না।

ডানকানের মুখ লাল হল। বোধ করি কথাটা আন্দাজ করতে পেবেছিল সে, বললে, 'টুমি বাগচীর বিবাহের কথা বলছ'?

'হুজুর, ঠিক তা নয়, তবে...' নায়েব সাহেবকে বিচলিত হতে দেখে ভয়ে ঢোক গিলল, কিন্তু মনের তলায় কোথায় যেন খুশিও হল।

'কেট সেই গড-ফরসেক্‌ন সাহেবের কন্যা। সমাজে উহার বিবাহ হয় নাই সেইজন্য। নটুবা একটা হিন্ডুকে কোনো ইংরেজ মহিলা বিবাহ কবে'।

'তা ঠিক, তা ঠিক। গড্‌ ফরস্কিনসাহেব যে অত্যন্ত অন্যায় করেছে তাতে আর সন্দেহ কী'।

'ইহাতে আরো গোলমাল আছে। আমি সংবাদ নিবো'।

টমটমের ঘোড়ায় চাবুক কশলো ডানকান।

আরো কিছুদূর গিয়ে ডানকান বলল, 'টোমাদের সমাজ থেকে যে-মহিলা বাহির হয়ে যায় সে যদি কোনো বাগডি ডোম বিবাহ করে'?

'সমাজ থেকে বেরিয়ে গেলে সে সবই পরে'।

'বাগচীকে আমরা বাগডি মনে করি'।

সাহেব নিজের রসিকতায় হো-হো করে হেসে উঠল। যেটুকু সংবাদ দেবার জন্য ডানকান ছটফট করছিল, সেটুকু তার দেওয়া হয়েছিল। মরেলগঞ্জের তখনও ক্রোশ দু'এক বাকি। টমটমের গতি কমিয়ে ডানকান বলল, 'নায়িব, টোমার গ্রাম তো কাছেই আছে'।

'তা হুজুর ক্রোশ তিন-চার হবে'।

'ভালো আছে, আমি টমটম থামাই, তুমি নামো'।

ডানকান লাগাম কষে টমটম থামাল।

সদর-নায়েব টমটম থেকে নেমে পড়ল। টমটম ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

নায়েবের বয়স হয়েছে। সেরেস্তায় বসে বসে কাজ করে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহে মেদও হয়েছে। সামনে দুপুর এবং চার ক্রোশ পথ। অন্যদিন হলে হয়তো নায়েব বলত—বড়র পিরিতি বালির বাঁধ, কিন্তু আজ তার সেসব কথা তৎক্ষণাৎ মনে হল না। বাগচীর সম্বন্ধে যে-খবরগুলি সে শুনেছিল সেগুলি মাথায় রিমঝিম করতে লাগল।

তাই বলো, না-হলে খাস ইংরেজের অমন সুন্দর মেয়ে—সে কিনা ভেতো বাঙালির গলায় ঝোলে। না-হয় দু'পাতা ইংরেজি পড়েছে, তাই কী ওটা সম্ভব হয়! ধরতে গেলে কেন, প্রকৃতপক্ষে ইংরেজরাই দেশের রাজা। লোকটা তাহলে নাস্তিক। আর তার সঙ্গেই গোবর্ধনের ওঠা-বসা। তা বাপু একদিকে ভালো, খ্রিস্টান নয় তো।

এই কথা ক'টি নানাভাবে নানা দিক দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চিন্তা করে ক্রোশটাক পথ পার হল নায়েব।

কিন্তু তারপরই কষ্ট অনুভব হতে লাগল। মনে মনে ডানকানের চোদ্দপুরুষের হিন্দুশাস্ত্রমতে সদ্‌গতির ব্যবস্থা করতে লাগল। কেন রে বাপু সেধে টমটমে তুললি? তুললি যদি, আমার কালো রঙে কি তোর ঘোড়া ভয় পেত আর দু'ক্রোশ পথ গেলে!

দুপুরের পর সদর-নায়েব স্ব-ভবনে পৌঁছল। গিন্নি চোখের জল মুছতে-মুছতে পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগল।

'সাহেবদের সঙ্গে কেন বিবাদ করতে যাও'?

'আমি কী বিবাদ করতে গেলাম!'

'বিবাদ নয় তো কী? বিবাদ না-করলে তোমাকে গ্রিফতার করে'?

নায়েব বলল, 'তা করেনি। লোকটা অতিশয় পাজি নতুবা ঘোর উন্মাদ'।

'কোন লোকটা'?

'ওই ডানকান। নতুবা আজেবাজে কথা বলার জন্য একজন লোককে এত কষ্ট দিতে পারে! সেধে জামাইয়ের মতো টমটমে তুলে মাঝপথে নামিয়ে দেয় কেউ, পাগল ছাড়া! বিবাদ করিনি, দাঁও পেলে একবার দেখিয়ে দেব'।

আহারাদির পর নায়েব বলল, 'বড়বউ, গোবর্ধনকে একটা কথা বলে দিয়ো। তার বাগচীমাস্টার কোনো ধর্মই মানে না। সে একটা ম্লেচ্ছ'।

'সে আর নতুন খবর কী'?

'নতুন নয়? তোমরা তো জানতে খ্রিস্টান। এখন শুনছি, সে খ্রিস্টান নয়। ঈশ্বরই মানে না'।

সন্ধ্যার পর দেওয়ানকে মামলার কথা বোঝাতে গিয়ে সদর-নায়েব এই কথাটা আর-একবার তুলল। নায়েবের বক্তব্য শুনে হরদয়াল বলল, 'আপনারা জানতেন না বুঝি? বাগচী আমাকে প্রথমদিনেই

বলেছে, সে ইউনিটেরিয়ান মতাবলম্বী। কোনো চার্চে সে যায় না। সাধারণ খ্রিস্টান নয়'।

'এটা আপনার জানা ছিল, আজ্ঞা'?

'তা ছিল বইকি। শিক্ষকের পক্ষে কোনো বিশেষ ধর্মের সংস্কারগ্রস্ত না-হওয়াই ভালো। আপনারা শুনেছেন কিনা জানি না, কলকাতার এককালে সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক ডিরোজিও নিজে খ্রিস্টান ছিলেন, অথচ তাঁর ছাত্ররা প্রায় সকলেই একসময়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান ছিল'।

চারদিকে কাছারির আমলারা ছিল। কেটের কথাটা নায়েব তখন-তখন বলল না। দেওয়ান কাছারি থেকে তার বাড়ির দিকে রওনা হলে সুযোগ মিলল, দেওয়ান পালকিতে চাপল না।

তখন নায়েব তার সঙ্গে-সঙ্গে যেতে-যেতে বলল, 'ডানকান বললে ওদের বিবাহের ব্যাপারটা ঠিক...'

'কী হয়েছে'?

'কেট নাকি সমাজের বাইরের মেয়ে, তাই'।

দেওয়ান কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, তারপর বলল, 'আপনি একটা ব্যাপার ধরতে পারেননি, নায়েবমশাই। ডানকান বাগচীর প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষপরায়ণ। এর আগে যেখানে বাগচী ছিল সেখানেও কয়েকজন ইউরোপীয় তার ক্ষতি করার চেষ্টা করত। এসব আমায় একজন লোক কলকাতা থেকে লিখেছে। তবে তারা এমন মেয়েলি কলঙ্ক রটানোর চেষ্টা করেনি। বিদ্বেষের কারণটা কী বুঝতে পেরেছেন? কলকাতায় থাকলে ধরতে পারতেন সহজে। ইংরেজ মহিলা বিয়ে করে সাধারণের চোখে বাগচী প্রমাণ করে দিয়েছে ইংরেজরা অতিমানব নয়। তারা গুণপনায় বাঙালির চাইতে বড়ও নয় সবক্ষেত্রে'।

নায়েব তার পদের উপযুক্ত চাল চালল। গোবর্ধনের বিবাহ সম্বন্ধে বিশিষ্ট মতের জন্য বাগচীকে দায়ী করে নিয়ে ডানকানের দেওয়া খবরটা কানে লাগানোর চেষ্টা সে করেছিল। সেটা যখন হল না, হরদয়াল যখন বাগচীকে সমর্থন করল তখন হরদয়ালের মনোভাব ডানকানের বিরুদ্ধে ঘুরিয়ে দিল ডানকানের বাঁদুরে রসিকতার প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য। সে বলল, 'নীলসাহেবটার জিভকে শাসন করে দিতে হয়'।

'দেখা যাক'।

নায়েব ফিরে এসে তার গৃহিণীকে হরদয়ালের মতামতও জানাল। সব কথা বলে শেষে বলল, 'একটা কথা মনে রেখো বড়বউ, আমাদের দেওয়ান বাগচীর আশ্রয়দাতা এবং তার যে-কোনো বিপদেই তার পক্ষে দাঁড়াবে। কিন্তু নীলে-বাঁদরটার বিরুদ্ধে লাগিয়ে এসেছি'।

নদীর ঘাটে কথাটা নায়েব-গৃহিণীর মুখে দু'একজন শুনল না এমন নয়। কলঙ্কের মতো এত দ্রুত সঞ্চরণশীল আর কী আছে।

একদিন সকালে নায়েব-গৃহিণী যখন স্নান করতে যাচ্ছে গোবর্ধনের সঙ্গে দেখা হল বাইরের দরজার কাছে। ঘোড়ার জিন কষছে সে।

'তোর না আজ ছুটি বলেছিলি? আমি ভাবলাম চান করে এসে খাবার করে দিই। তুই এখন যাচ্ছিস কোথায়? এত সকালে তোর কোন রাজ্য জয় করতে হবে'?

'একটু ঘুরে আসি'।

'ঘোড়ায় চড়ে কেউ একটু ঘুরতে যায় না। আমি আর ঢুকব না ভাঁড়ারে। তুই হাত-পা ধুয়ে যা

পাস খেয়ে যাস'।

'আচ্ছা যাব'।

'একটু সকাল-সকাল ফিরবি আজ'?

'কেন বলো তো, শিবমন্দিরে যাবে? আমি তো বলেছি, ওসব করার সময় নেই আমার'।

'তোর তো ঠাকুর-দেবতায় এমন অগ্রাহ্যি ছিল না গোবরা কোনোদিন!'

গোবর্ধন হাসতে-হাসতে বলল, 'সবদিন কি সমান যায়, মামিমা? এরপরে একদিন হয়তো সবসুদ্ধ খ্রিস্টানই হব'।

'কী বললি? ছি-ছি, গোবরা, মা'র সামনে অমন সব কথা মুখে আনতে আছে'?

'তুমি খ্রিস্টান না-হলে আমি কেন হতে গেলাম? গাছের শিকড়ও যা, ফলও তাই'। এই বলে গোবর্ধন লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ল।

'খেয়ে গেলি নে'?

'আসছি, আসছি'।

নায়েব-গৃহিণীর সুখও হল, দুঃখও হল।

নদীর পথে যেতে-যেতে একটা কথা তার মনে খচখচ কবতে লাগল। খারাপ মেয়েদের উপরে পুরুষের কেমন একটা টান আছে। তাদের ছল করার, ছলনা করার কতকগুলো ক্ষমতা থাকে যা ভদ্রঘরের মেয়েরা পারেও না, করেও না। কিন্তু সেই সব ছল-কলাই যেন ফাঁদের দড়ি। তাতেই আটকে যায় পুরুষরা। এর চাইতে কেউ যদি ভালো খ্রিস্টান হতো তাই বোধ হয় ভালো ছিল। সেটাও তো একটা ধর্ম। অখাদ্য খায়, দেব-দ্বিজে ভক্তি থাকে না, কিন্তু নিশ্চয়ই তাদের মধ্যেও সামাজিক বিধান আছে, নতুবা ছেলে কী করে মানুষ হয়। মাকে ভালো না-বাসলে ছেলে বড় হয় না।

এই তো গোবরাকে দ্যাখো। সে তো নিজের পেটের ছেলেও নয়, তবু গ্রামে সব ক'টি ছেলের মাথা হয়ে উঠেছে, এমনি কী হতো যদি মামিকে প্রাণ দিয়ে ভালো না-বাসত?

কিন্তু কী রীতি ভগবানের। একসময় আসে যখন মায়ের চাইতেও বড় হয় আর-একটি মেয়ে।

নায়েব-গৃহিণী তাব নিজের প্রতি গোবর্ধনের শ্রদ্ধা ও ভক্তি দিয়ে যে-দুর্গ রচনার প্রয়াস করছিল এ কথাটায় যেন তার প্রাকারভিত্তি টলে উঠল।

নায়েব-গৃহিণী চিন্তা করতে অভ্যস্ত নয়। অনুভব ক'রে ঠাহর ক'রে কাজ করে। গোবর্ধন কয়েকদিন আগে ঘটকী আসার কথায় বলেছে 'মামিমা, বিয়ে আমি করব না'। সাধারণভাবে ছেলেরা যেমন বলে তেমন করে বলা নয়। কী হতে পারে এর অর্থ? যদি ধর্ম নিয়ে মেতে উঠত তাহলে বোঝা যেত হয়তো বা সন্ন্যাসী হওয়ার যুক্তি আঁটছে। সংখ্যায় খুব কম হলেও গৃহস্থঘরের ছেলের কোনো কোনো সময়ে সন্ন্যাসের ঝোঁক আসে। ধর্মের সঙ্গে ওই ইস্কুলের কোনো সম্বন্ধই নেই। সেক্ষেত্রে ছেলের মতিগতি অস্পষ্ট ও আশঙ্কাজনক হচ্ছে।

কিন্তু ছেলে যদি কোনো স্ত্রীলোককে ভালোবাসে তবে তার মুখ দেখে কী আঁচ করা যায় না? হয়তো যায় না। কিন্তু গোবরা তার কাছে কোনো আবদার করে কোনোদিনই বিমুখ হয়নি। সে কী জানাত না? নায়েব-গৃহিণী মনে মনে গ্রামের সবক'টি মেয়ের মুখ পরীক্ষা করে এল। দূর করো, কারো এ গ্রামে সে-রকম মেয়ে নেই। এটা সে-ব্যাপার নয়। কীতা হলে? ঘোড়ায় চড়ে কোথায় যায়? সেদিন অতগুলো টাকা নিল বন্দুক না কী কেনার জন্য। সদর-নায়েবকে আজ বলতে হবে, নায়েবি করো, শুনতে পাই পরগনাটা তোমার হাতের তেলো। নিজের ঘরে কী হয় তাই বলো। নদীর ঘাটের কাছে এসে নায়েব-গিন্নির মনে প্রশ্ন জাগল, ডাকাতির দল খুলছে নাকি ঠগীদের মতো? কথাটা মনে হতেই চঞ্চল হয়ে উঠল। নায়েব-গৃহিণীর চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট ও বাষ্পসংকুল।

রাজচন্দ্র খবর পেয়েছিল পিয়েত্রো একটু বেশি অসুস্থ। এক বিকেলে সে পিয়েত্রো-আবাদে উপস্থিত হল।

কুঠিতে ঢুকবার দরজার পাশের একটা ঘরে বসে একটি ভৃত্য লণ্ঠনের বড় বড় ডোম ও চিমনিগুলো মেজে-ঘষে সাফ করছিল। তার উপরে রাজুর চোখ পড়ায় সে উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করল।

'সাহেব কোথায়, ঘরে'?

'না হুজুর, তিনি আটচালার পাশের আখড়ায় আছেন'।

রাজু কুঠিতে না-ঢুকে আটচালাব দিকে গেল।

আটচালায় পৌঁছনোর আগেই ব্যাপারটা তাব চোখে পড়ল। দৃশ্যটা অপূর্ব, দাঁড়িয়ে দেখার মতো। পিয়েত্রোর ববকন্দাজরা একটু দূবে দল বেঁধে বসে আছে। এদিকে একটা ছোট টিপয়েব উপবে পিয়েত্রোর চিরসাথী সুরার সরঞ্জাম। টিপয়ের কাছে একখানা চেয়ার, তার সম্মুখে পিয়েত্রোর গড়গড়া। পিয়েত্রো নিজে তলোবাব হাতে পাশেব খোলা জায়গাটার মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তার বিপক্ষ হয়ে দাঁড়িযে বুজরুক আলি, তাব হাতেও তলোযার। রাজু যে-মুহূর্তে দেখেছিল প্রথম সেটায় এই পরিস্থিতিই ছিল, পরমুহূর্তে অবস্থান বদলে গেল। তলোয়াব দুটি বিদ্যুতের মে্যে ডাইনে-বাঁয়ে বিচিত্র কয়েকটি বৃত্ত ও বৃত্তভাগ সূচনা করল, ইস্পাতে ইস্পাতের আঘাতে শব্দ হতে লাগল। সহসা বুজরুককে নিবস্ত্র হয়ে দাঁড়াতে দেখা গেল, পিযেত্রো তার হাতেব তলোযারে ভর দিয়ে দাঁড়াল। পিয়েত্রোর কপাল দিয়ে টপটপ করে ঘাম পডছে। পরিশ্রমে মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে। বুজরুকও রুমাল বাব কবে ঘাম মুছল। পবিশ্রমে তার বুকটা ওঠানামা করছে।

পিয়েত্রো বলল, 'আর এক প্যাঁচ'?

'না উস্তাদ, আপনার তবিযত ভালো নেই। আপনি বসুন'।

পিয়েত্রো ধীরে-ধীরে এসে তার চেয়ারে বসল।

রাজুকে দেখে হেসে বলল, 'এসো রাজকুমার, অনেক দিন পরে এলে'।

'এসব কী, শুনলাম আপনার অসুখ, এখন তো ভালোই দেখছি'।

'ভালোই দেখছো, না? (পিয়েত্রো যেন খুশি হল কথাটা শুনে)। আমারও ভালোই লাগছিল। কিছুদিন থেকেই বুজরুক বলছে লম্বা তলোয়ারের খেলার জন্য। আজ দিনটাও ভালো, তাই একটু হল'।

ততক্ষণে রাজুর জন্যে আটচালা থেকে চেয়ার এসে গেছে।

পিয়েত্রো বলল, 'বোসো রাজু, বুজরুক বোধ হয় আবো কিছুক্ষণ খেলবে। বুজরুক বলছিল, তোমাকে অনুরোধ করে তোমার বরকন্দাজদের মাঝে-মাঝে আনিযে নেওয়ার জন্য'।

'তারা কী করবে, তলোয়ার খেলা শিখবে'? রাজু হাসল। 'বরং আমাকে শেখান। কিন্তু আপনাব অসুখটা কী'?

'সেই জ্বর। মাঝে মাঝে হচ্ছে, কুইনাইনে যাচ্ছে না। জ্বর যখন খুব বাড়ে তখন বুজরুক জল ঢালে মাথায়'।

পরিশ্রমের রক্তাভা ততক্ষণে মুখ থেকে সরে গিযেছিল, বাজু এবার দেখল পিয়েত্রোর কপাল চোখ মুখের দৃশ্যমান অংশটুকু ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আঙুলের লম্বা নখগুলোতে যেন হলুদ মাথা। দাড়িগুলোও যেন বেশি শাদা।

রাজু বলল, 'চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়'।

পিয়েত্রো বলল, 'তোমার ডাক্তারকে পাঠিয়ে দেবে নাকি একবার'?

'বাগচীকে বলব আসতে'।

'বাগচীর কথায় মনে পড়ে গেল রাজু, জ্ঞানদা বিদ্যালয়ের খবর কী'?

'ভালোই চলছে, ছাত্রসংখ্যা বেড়ে একশোতে দাঁড়িয়েছে বলছিল বাগচী'।

'ভালো, খুব ভালো। দ্যাখো রাজু, একটা কথা বলে রাখছি তোমাকে। আমরা বুড়োদের দল থাকব না। কিন্তু স্কুল থাকতে পারে। পুরনো মাস্টার থাকবে না, পুরনো পরিচালকরা থাকবে না, আজ যা পাঠ্য, আজ যাকে আবশ্যিক মনে হয়, কাল তাকে অর্থহীন বোধ হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠান থাকা চাই। সেটা যেন থাকে'।

'উদ্দেশ্যই যদি বদলে যায়'?

'স্কুলের উদ্দেশ্য বিদ্যা বিতরণ, সেটা তো আর বদলাবে না। বদলায় শিক্ষকের রুচি, তার শিক্ষাপদ্ধতি'।

'কিন্তু আপনি এখনি বিদায় নেবার কথা ভাবছেন কেন'?

ভৃত্যের হাত থেকে গড়গড়ার নল নিয়ে পিয়েত্রো বলল, 'না-না, আমি কি তাই বলছি? বুজরুক, তোমার শাকরেদদের খেলা হোক এইবার'।

'হ্যাঁ, এই হবে'।

বুজরুকের ডাকে যে তলোয়ার হাতে উঠে এল তাকে চেনা-চেনা বোধ হল রাজুর। পিয়েত্রোকে সে জিজ্ঞেস করল, 'একে যেন কোথায় দেখেছি'।

'তোমাদের স্কুলের মাস্টার'।

'গোবর্ধন? ওই পোশাকে চেনাই যাচ্ছে না'।

গোবর্ধন শিক্ষানবিশ, বুজরুক থেমে-থেমে তাকে বুঝিয়ে-বুঝিয়ে তাব সঙ্গে খেলতে লাগল।

রাজু বললে, 'লম্বা তলোয়ারে বুঝি বুজরুক আপনার শিষ্য'?

'না, ও নিজেই জানত। (পিয়েত্রোর গাল লজ্জায় লাল হয়ে উঠল)। ওটা ওবই পৈতৃক সম্পত্তি। উসমান খাঁ লম্বা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়ালে আট-দশজন তলোয়াববাজ দুশমনও কাছে ঘেঁষত না। তার কাছে আমি শিখেছিলাম। বুজরুক সে সুযোগ পায়নি'।

রাজু বললে, 'কিন্তু আলি খাঁর বন্দুক-তলোয়ারের কারবার দেখে আমার কী মনে হচ্ছে জানেন? ডাকাত-ঠ্যাঙাড়েব দলকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে এসব নয়। নিজেরাই ঠগীদের মতো দল গড়ার জন্যে'।

'তা অস্বাভাবিক নয়'।

পিয়েত্রো ও রাজু দুজনেই হাসল।

গোবর্ধনের খেলা হলে কিংবা তার শিক্ষার আর-একটি পাঠ শেষ হলে বুজরুক বরকন্দাজদের বিদায় দিল। তারা চলে গেলে রাজুর কাছে ভঙ্গি ভরে কুর্নিশ করে দাঁড়াল বুজরুক।

রাজু হাসি হাসি মুখে বলল, 'স্কুলের মাস্টার, চিরকালই নিরীহ জীব, তাকে আবার এসবে জড়াচ্ছ কেন, আলি খাঁ? বেচারা বুঝি বন্দুকের লোভে তোমার পেছনে ঘুরছে? দিয়ে দাও। কাঁহাতক আর তলোয়ার খেলবে। বন্দুক নিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরুক'।

গোবর্ধন হাসিমুখে বলল, 'বন্দুক আমি পেয়েছি রাজকুমার'।

'তাহলে আর এই ঝকমারি কেন'?

পিয়েত্রো বলল, 'বিনা পয়সায় বন্দুক পেলে একটু তলোয়ার খেলতেই হয়'।

'বিনা পয়সায়? বলো কী আলি খাঁ? ব্যবসা তাহলে এইরকম করছ'?

'আর বলো কেন রাজু, আমার টাকা ক'টি শেষ করে দিল'—বলে পিয়েত্রো হাসল আবার।

ঈষৎ তপ্ত ঘাসের উপরে বসে পড়ল বুজরুক, তার পাশে গোবর্ধন। রাজু বললে, 'তোমরা কি পিণ্ডারিদের মতো আর-এক দল তৈরি করছ'?

বুজরুক তার সুর্মা-আঁকা ঈষৎ লাল বড় বড় চোখ দুটি মেলে রাজুর দিকে খানিকটা সময় চেয়ে রইল।

হঠাৎ বুজরুক বলল, 'রাজাভাই গোবর্ধন আমার সঙ্গে তর্ক করছিল, আপনি বলুন তো ভারতবর্ষের সম্রাট কে'?

'ইংরেজ'।

'এটা ঠিক হল না, ভারতের সম্রাট বাহাদুর শাহ্। ইংরেজরা বাংলার দেওয়ান এবং কোনো কোনো প্রদেশের লুণ্ঠনকারী'।

'এই তোমার ধারণা? তবে বাহাদুর শাহ্ তার অন্যান্য প্রদেশকে লুঠ করতে দেয় কেন? দেওয়ানকে পদচ্যুত করলেই হয়'। রাজু কৌতুক করে বলল।

বুজরুকের চোখ দুটি জ্বলে উঠল।

'যদি তাই করেন সম্রাট শাহান শা বাহাদুর শাহ্ আপনি কি খুশি হন না'?

'ব্যক্তিগতভাবে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি কী হবে তা তো বুঝি না। বাহাদুর শাহ্ কিছু আমাকে দেবে না, ইংরেজরাও কিছু দিচ্ছে না'।

'কিন্তু ইংরেজরা আপনার জায়গির কেড়ে নিতে পারে'।

'তা পারে'।

'কী করবেন তাহলে'?

'আপাতত তার কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। যদি তাই নেয়, সহ্য করা ছাড়া কী গত্যন্তর'?

সাপের ফণা তোলার মতো উত্তেজিত হয়ে উঠল বুজরুক, 'রাজাভাই, আপনি না বাঙালি? আপনি না বাঙালি ভুঁইয়া? আপনার উর্ধ্বতন দশ পুরুষে কেউ কি গত্যন্তর নেই বলত? রাজকুমার, আর-একটু চিন্তা করে বলুন। দুর্দান্ত বাদশা আলমগিরের সময়ও তো কোনো ভুঁইয়া এমন কথা কখনও বলেনি'।

'তুমি কি স্বাধীন হয়ে যুদ্ধ করার কথা বলছ'?

'তাই কি ভালো নয়? যতদিন বাঁচবেন, রাজা হয়ে থাকুন। কোনোদিন ছোট হতে যাবেন কেন'?

'কিন্তু তোমার বাহাদুর শাহ্ সম্রাট কি আমার স্বাধীন হয়ে থাকা বরদাস্ত করবে? তা করবে না। তখনকার দিনেও কি জায়গিরদারের জায়গির কেড়ে নেওয়া হতো না? কী করত জায়গিরদার'?

'সম্রাটের অধীনে জায়গিরদার, ভুঁইয়া রাজা হওয়া আর ইংরেজ কোম্পানির অধীনে ভয়ে ভয়ে থাকা কি এক কথা'?

'এ রকম সব স্বপ্ন তুমি কতদিন থেকে দেখছ, আলি খাঁ'? রাজু হাসল।

পিয়েত্রোকে বলল, 'এসব কি আলি খাঁর স্বাধীন হবার চেষ্টা? নবাব মিরকাসেম যা পারেনি, হৈদার আলি যা পারেনি সে কাজ করতে যাওয়া কি ভালো? লাখ-লাখ সৈন্য আর লাখ-লাখ বন্দুকের বিরুদ্ধে দশজন বরকন্দাজ দাঁড় করানোর পাগলামি কি সত্যিই হয়েছে আলি খাঁর? কী 'দুঃখের কথা!'

বুজরুক আশায় জ্বলে উঠল, 'রাজাভাই, সেই লাখ-লাখ সৈন্য যদি বন্দুক না-চালায়'?

'বাইশ মন তেল পুড়লে রাধা কখনও-কখনও নাচে শুনেছি'।

'কিন্তু,' পিয়েত্রো বলল, 'শিবাজি রাজা কত সৈন্য নিয়ে আলমগির বাদশার বিরুদ্ধে নেমেছিলেন? কিংবা জায়গিরদার শের শাহ্ কত সৈন্য নিয়ে সারা ভারতের সম্রাট হয়েছিলেন'?

বুজরুকের কথা আর পিয়েত্রোর কথা এক নয়।

রাজু পিয়েত্রোর মুখের দিকে বিস্মিত হয়ে চেয়ে রইল।

পিয়েত্রো বলল, 'অমন করে চেয়ে আছো কেন'?

'আপনি কী বললেন, ধরতে পারলাম না'।

'খুব সোজা কথা তো। তুমি যদি এ-জেলাটা ইংরেজের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারো এবং তারপর পঁচিশ বছর ক্রমাগত যুদ্ধ করার মতো শক্তি অর্জন করতে পারো তাহলে কঠিন কী? যখন ক্লাইভ জালিয়াতি করতে আসছিল মুর্শিদাবাদের দিকে তখনও কি সে ভেবেছে দেওয়ানি করতে পারবে তারা?

তবে তার আগে অন্তত এক হাজার দুর্ধর্ষ সৈনিক তৈরি করতে পারা চাই। এক হাজার সৈনিক নিয়ে কাজ শুরু করলে ইংরেজকে বাংলা ছাড়া-করা কঠিন নয়, সময়সাপেক্ষ হতে পারে'।

'ইংরেজ বীরের জাত'।

পিয়েত্রো হো-হো করে হেসে উঠল, 'কোথায় তারা বীরত্ব দেখাল, পলাশিতে'?

বৃদ্ধ, রুগ্ন, অর্ধ-বিদেশি আবাল্য-পরিচিত এই লোকটির দিকে চেয়ে চেয়ে রাজু অন্ত পেল না। কিছুক্ষণ আগেই বৃদ্ধের তলোয়ার চালনা দেখেছে, এখন সেই খেলা অন্য আর-একটি অর্থ নিয়ে তার চোখের সম্মুখে দাঁড়াল। রাজু পিয়েত্রোর কাছেই শুনেছে বৃদ্ধ হৈদার আলির কথা। তার কল্পনায় হৈদার আলি-পিয়েত্রো কিছুক্ষণের জন্য এক হয়ে মিলে গেল। পিয়েত্রোর মুখেই সে শুনেছে আর্কের এক কুমারীর কথা। সে তাড়িয়েছিল বটে ইংরেজকে তার দেশ থেকে। সে শুনেছে ঈশা খাঁব কথা।

রাজু বলল, 'রাজা কি ইচ্ছে করলেই হওয়া যায়, সেটা ইতিহাসেব ব্যাপার'।

পিয়েত্রো বলল, 'রাজু, তুমি রাজা হও বা না-হও, বাহাদুর শাহ্ সম্রাট হোক কিংবা ইংল্যান্ডের বানী, আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, তবে এ কথা আমাকে বলতেই হবে রাজত্ব স্থাপনাব মূলে অভূতপূর্বতা কিছু নেই ; অপরিসীম কষ্ট সহ্য করতে পারলেই হল, নেতৃত্ব করার ক্ষমতা থাকলেই হল, যুদ্ধেব জ্ঞান থাকা চাই, আর বোধ করি কতকগুলো ঘটনাপরম্পরা, যাকে ভাগ্য বলে। তুমি যদি চেষ্টা কবে ব্যর্থ হও তোমাকে লোকে পাগল বলবে, হয়তো মৃত্যুই হবে সেই বোকামির পরিণাম। কিন্তু যদি জযলাভ করো, শিবাজি ও প্রতাপের সম্মান তুমি পাবে। যুদ্ধটা একটা বড় রকমেব খেলা বই তো আর-কিছুই নয়'।

পিয়েত্রোর পিপাসা পেয়েছিল, সে পান করল। তারপর হেসে বলল, 'রাজু, তোমাকে আমি তাই বলে যুদ্ধ করার পরামর্শ দিচ্ছি না। আলোচনা করতে ভালো লাগে এখন, তাই করলাম। আলোচনা ছাড়া আমার আর কী করার আছে'।

পিয়েত্রো থামল, আবার গড়গড়ার নল তুলে নিল।

তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। ঝিরঝির করে একটা হাওয়া দিচ্ছে। গড়গড়ার শব্দ ছাড়া আর-কোনো শব্দ নেই। পিয়েত্রোর তলোয়ারটা খাপে-ঢাকা অবস্থায় টিপয়ের উপবে বেখেছিল বুজরুক। রাজুর মনে হল, ওই তলোয়ারের মতো পিয়েত্রো। তীব্রধার তলোয়ার, বিবর্ণ মখমলের খাপে ঢাকা। তলোয়ারের ঝালরের সিল্কও বিবর্ণ। কিন্তু তখন আবার পিয়েত্রো যেন তার ধূসর খাপে মাথা ঢুকিয়ে নিয়েছে।

পিয়েত্রো উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ঠাণ্ডা পড়বে, আমি ঘরে যাচ্ছি। রাজু, তুমি আর বুজরুক কি এখনই আসবে'?

বুজরুক বলল, 'আমরা একটু থাকি'।

পিয়েত্রো চলে গেল।

রাজু বললে, 'আলি খাঁ, এসব পাগলামি ত্যাগ কবো ভাই। যদি সত্যি ভেবে থাকো তুমি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করবে...'

বুজরুক বলল, 'আমি স্বাধীন বাজ্য স্থাপন কবতে চাই না। এই ইতব ধর্মহীন নিমকহারাম জাতটাকে বাংলা দেশ থেকে তাড়াতে চাই'।

'অন্য দূরের কথা, তুমি ডানকানকে পারো তাড়াতে'?

'এক রাত্রিতে'।

'সে তো সাধারণ একটা খুনিও পারে। তা নয়, জেলার সদর থেকে কালেক্টর আসবে, সে না-পারে, কলকাতা থেকে লাট আসবে। অযোধ্যার নবাব কী করতে পারল'?

বুজরুক বলল, 'সে অপদার্থের খাপে বোধ হয় তলোয়ার ছিল না, যেটা কোমরে ঝুলত সেটা বোধ

হয় প্রকৃতপক্ষে মদের বোতল, সময়-অসময়ে চুমুক দিত। ইংরেজ আমাদের শাসন করে আমাদের দিয়েই। আমরাই সিপাই হয়ে আমাদের দিকে গুলি ছুঁড়ি'।

'তা বটে। পলাশির যুদ্ধে আমরাই আমাদের পায়ে কুড়ুল মেরেছি'।

'আমরা যদি আমাদের দিকে ফিরে চাই, যদি সিপাইরা বলে আর তারা ইংরেজের হয়ে যুদ্ধ করবে না'?

'তাহলে হয়'।

বুজরুক উঠে রাজুর মুখোমুখি দাঁড়াল, 'রাজাভাই, যদি কখনও সেদিন আসে আপনার সাহায্য আমি নিশ্চয় পাব। কিন্তু আজ আর আলোচনা নয়। ইংরেজের চর সর্বত্র আছে। প্রকাশ পেলে আমার কী হবে তা বুঝতে পেরেছেন'?

'ফাঁসি'।

'তা যদি বুঝে থাকেন, আমি নিশ্চিন্ত'।

কুঠিতে ফিবে গিয়ে পিয়েত্রো তখন শয্যা নিয়েছে। রাজু গিয়ে তার শয্যার পাশে একটা চেয়াব টেনে নিয়ে বসল।

পিয়েত্রো বলল, 'রাজু, এ এক অদ্ভুত জ্বর। সাধারণত গরিবদের মধ্যেই হতে দেখেছি। হঠাৎ যাকে ধরে তাকে আর ছাড়ে না'।

রাজু বলল, 'কাল আমি বাগচীকে পাঠাব। সে তো কালাজ্বরও সারাচ্ছে, তাতেও যদি না-হয়, আমি সদব থেকে সাহেব-ডাক্তার আনাব'।

'তা তোমার যা ইচ্ছে হয় কোরো বাবা, যদি জ্বব না-সাবে তাতেও দুঃখ নেই। কী মূল্য এই দেহটাব? কে শোক করবে বলো'।

রাজুর চোখ দুটো ছলছল করতে লাগল, সে বলল, 'আপনি এসব কথা ভাবছেন কেন? আমি কি আপনার কেউ নই'?

মুহূর্তের একটা দুর্বলতা যেন এসে পড়েছিল। সেটা কাটিয়ে উঠল পিয়েত্রো। বলল, 'তোমাব মনে কষ্ট দিলাম দেখছি। কথাগুলো কাউকে বলার জন্য একটা আগ্রহ বোধ করছিলাম। তাই বলে ফেলেছি। অন্য কথা বলো রাজু। তুমি কি বুজরুকের সব কথা শুনেছ'?

'হ্যাঁ'।

'ওর মনে যে বদ্ধমূল প্রতিশোধ স্পৃহা আছে সেটা বড় ভয়ংকর। খুব বড় বংশেব ছেলে। উসমান খাঁকে আমার বাবা সঙ্গে-সঙ্গে বাখতেন। ঠিক জানি না, কী একটা সূত্রে ইংরেজদের সঙ্গে উসমান খাঁর শত্রুতা ছিল। উসমান খাঁ ফবাসি উপনিবেশে থাকতেন। এদেশে তাঁর সত্যিকাবেব পরিচয় কারো জানা ছিল না। উসমান খাঁও বুজরুকের মতোই কী একটা অদ্ভুত ব্যবসা কবতেন'।

'আপনি এবার চুপ করুন। জ্বরের সময়ে বেশি কথা বলতে নেই'।

'হ্যাঁ, এবার আমিও ঘুমব। জ্বব এলেই ঘুম পায়। আজ একটু পরিশ্রম হয়েছে, জ্বরটা আগেই এল'।

রাজু উঠে দাঁড়াল। মোটা একটা চাদর পিয়েত্রোর পায়ের কাছে ভাঁজ হয়ে পড়ে ছিল, সেটাকে তুলে এনে পিয়েত্রোব কোমর অবধি ঢেকে দিল।

পিয়েত্রো হেসে বলল, 'রাজকুমারের হাতের সেবাও পেলাম। ফরাসি সম্রাটরা পেয়েছেন কিনা সন্দেহ। চাকরদের ডেকে দিয়ে যেয়ো কিন্তু'।

রাজু ঘর থেকে বিষণ্ণ মনে বেরিয়ে এল। সে দেখতে পেল দুজন ভৃত্য পিয়েত্রোব ঘরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। চাকররা পিয়েত্রোকে ভালোবাসে। কিন্তু হঠাৎ বাজুর মনে হল পিয়ানোর গায়ে লেখা যার নাম সেই মেয়েটির কথা। সে হয়তো ফরাসি দেশে কোথাও সন্তানসন্ততিবেষ্টিত হয়ে সুখে ঘরকন্না করছে।

ফিরতে-ফিরতে হাওদার চেয়ারে বসে বসে পিয়েত্রোর কথা মনে হতে লাগল তার।

কিন্তু রাজুর সর্বাঙ্গে এবং মনে ভরা-যৌবন। বাড়িতে পৌঁছে রূপচাঁদকে বলল, 'কাপড়-চাদর নিয়ে আয়'।

'বেরবেন, হুজুর'?

'হ্যাঁ। স্নানের জল দিয়েছে'?

রূপচাঁদ কাপড়-চাদর আনতে গেল, রাজু স্নানের ঘরের উদ্দেশ্যে চলে গেল। স্নানের ঘর থেকে বেরিয়ে রাজু দেখল, রূপচাঁদ তখনও আসেনি। সে তখন রানীর মহলে গেল। রানীর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললে, 'আমার ফিরতে দেবি হবে মা, তুমি যেন আবার ভেবো না'।

'খাবি কখন'?

'নেমন্তন্ন আছে'।

রাজু নিজের ঘবে ফিরে দেখল কোঁচানো কাপড নিয়ে রূপচাঁদ দাঁডিয়ে আছে। কাপড পবে চাদর হাতে নিয়ে রাজু বলল, 'এ কী রে, এত মোটা জরি কেন, এ কোন দিশি চাদর, খবখব কবছে যে। নকল নাকি রে'?

'আজ্ঞে সরকারমশাইকে বলব সকাল হলেই'। রূপচাঁদ ভযে ঘামতে লাগল।

'থাক-থাক, বেচারা ঠিক ঠাহর করতে পাবেনি'।

পাযের কাছে এগিয়ে ধরা জুতোজোড়া পবে রাজু ঘর থেকে বেব হল। নযনতাবাব বাড়ির দরজায রূপচাঁদকে বিদায় দিয়ে রাজু বলল, 'তোকে আর আসতে হবে না, জোছনা উঠবে। আলো নিযে যা'।

নয়নতারা তখন তুলোট-কাগজে লেখা কী একটা পুঁথি পড়ছিল।

রাজু বলল, 'বাড়িতে অতিথি যে'।

'কখন এলে, এইমাত্র'?

'তা হোক। আগে কিছু খেতে দাও। তারপর রাত্রিব রান্না চাপাও'।

'সে কী'?

'খুব সহজ ব্যাপার, অনেক কথা বলার আছে। কথা শেষ করে অত রাত্রিতে গিয়ে খেতে পারব না। জানো তো, রাজকুমারেরা না-খেয়েও থাকে না'।

'মাছ মাংস কিছু নেই, তুমি খাবে কী? কাল দিনের বেলা রেঁধে খাওয়াব। আজ নয়'।

'সেই গল্পটা জানো? এক শ্রেণীর ছেলে একমুঠো শালিধান নিয়ে গৃহিণীর খোঁজে বার হয়েছিল'?

'তুমি যখন গৃহিণীর খোঁজে বেরুবে তখন আমি বউ পছন্দ করার আরো অনেক ফিকির তোমাকে শিখিযে দেব। কিন্তু রান্না কি আমাকে নিশ্চয়ই করতে হবে? তাহলে ততক্ষণ তুমি কি বসে বসে বই পড়বে'?

'আমি যে ব্রাহ্মণ, তোমার রান্নাঘরেও আমি যেতে পারি'।

নয়নতারা প্রদীপ তুলে নিয়ে বলল, 'এসো তাহলে'।

নয়নতারা উনুন জ্বালাল, জানু পেতে বসে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আগুনটাকে বাড়িয়ে তুলল। উনুনে কড়া চাপিয়ে রান্নার উদ্যোগ করল।

'ওটা কি দুধ? ভালো, দুধ আমি খুব ভালোবাসি। কিন্তু অতটুকুতে কি দুজনের হবে'?

নয়নতারা হেসে বলল, 'আর উপায় কী? তুমি দুধটা পাহারা দাও, আমি জল তুলে আনি'।

'ওটা আমিও পারি। পাত্‌কো কোথায়'?

'বেশ, আনো। বাইরের কাজ তো তোমাকেই করতে হয়। তাই বলে কাপড়-চাদর ভিজিয়ে এসো না যেন'।

চাঁদের আলোয় রাজু ছোট কলসিটায় করে জল নিয়ে এল।

দুধ নামিয়ে উনুনে জল চাপাল নয়নতারা।

'এই সেরেছে, ওটা ডাল নাকি? ও আমি খাই নে বাপু'।

নয়নতারা এক মুহূর্ত ভাবল, তারপর বলল, 'ভাতই চড়াই। বোসো, চাল ধুয়ে আনি'।

নয়নতারা চাল ধুয়ে এনে দেখলে, হাতা দিয়ে হাঁড়ির জল তুলে দেখছে রাজু। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নয়নতারা দৃশ্যটা উপভোগ করল, তারপর জিজ্ঞেস করলে, 'কী রাঁধছ'?

'রাঁধব কী? ওতে কী আছে? দেখছিলাম যাতে উতলে না-পড়ে'।

'জল ওতলায় বটে!' নয়নতারা খিলখিল করে হেসে উঠল।

রাজু বলল, 'নয়ন, আমি যদি রাজা হতাম'।

'রাজা তো হবেই'।

'সে-রকম নয়, সত্যিকারের রাজা, যেমন ছিল শিবাজি'।

নয়নতারা বিস্মিত হল। বলল, 'তা কি হয়, আমাদের সেই শক্তি কোথায়'?

'তাহলে তুমি সুখী হও কিনা বলো? কী করো তাহলে'?

'তাহলে বোধ হয় তোমার সভায় বসে কবিতা লিখি। বোধ হয় তোমাকে সিংহাসনে দেখলে কবিতা লিখতে পারব। তোমার রানীর চিরদিনের সহচরী হই'।

রাজু নয়নের উচ্চভিলাষের পরিমাপ দেখে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

'কী হল? কোথায় লাগল'? নয়নতারা মধুর উপহাসের ভঙ্গিতে বলল।

রাজু সামলে নিল নিজেকে, বলল, 'দিবাস্বপ্ন'।

'হঠাৎ এ কথা মনে হল কেন, রাজকুমার'?

'আমাকে বুজরুক বলতে নিষেধ করেছে, কিন্তু তোমাকে আমি বলব'। এই বলে রাজু যতদূর বুজরুকের কাছে শুনেছিল বলল নয়নতারাকে।

শুনে নয়নতারা বলল, 'রাজকুমার তোমাকে আমি ওসব কাজে ছেড়ে দিতে পারব না। আমি বিশ্বাস করতে পারি না বাহাদুর শাহ্ সম্রাট হলে আমার-তোমার কিছু লাভ হবে। আমরা অন্য রাজার কী ধার ধারি! আমাদের রাজা তুমি। কেউ রাজা হল, কোনো রাজা চলে গেল, এতে আমাদের কী পরিবর্তন হয়েছে? আমরা মেনে নিচ্ছি, ভাবছি, পুঁথিপত্র নিয়ে দিন কাটাচ্ছি'।

'যদি পুঁথিপত্র নিয়ে দিন কাটাতে না-দেয়'?

'তাহলে অবশ্য ভাববার কথা। তখন যে মারামারি শুরু হবে তাকে বলব মাৎস্যন্যায়। তাতে কোনো রাজার রাজ্যই টেকে না'।

নয়নতারা আসন পেতে দিয়ে রাজুকে বলল, 'হাত মুখ ধোবে চলো। এখন খেতে দেব'।

রাজু খেতে-খেতে বলল, 'তুমি এমন রান্না কোথায় শিখলে? ঠিক আমার মায়ের মতো'।

রাজুর খাওয়া দেখে নয়নতারার মনের মধ্যে কষ্ট হচ্ছিল। কষ্টটা নিছক মেয়েলি বলা চলে। প্রিয়জনকে বাধ্য হয়ে সিদ্ধ ভাত খেতে দিতে হলে সব মেয়েরই বোধ হয় এমন হয়। নয়নতারা বুঝতে পারল ব্রহ্মচারিণী রানীর স্বল্প উপচারের আহার্যে রাজুর এখনও বালকোচিত মোহ আছে।

রাজু আবার বলল, 'মাঝে মাঝে জোর-জবরদস্তি করে মা'র ঘরে এমন খেতে পাই'।

তবুও নয়নতারার মুখে কথা সরে না। রাজু খেয়ে উঠে বলল, 'কিন্তু তোমার বাসনগুলো কালো পাথরের কেন? আমি শাদা পাথরের বাসন কাল রূপচাঁদকে দিয়ে যেতে বলব'।

'না-না'।

'তাও কী হয়! আমি প্রায়ই যে এখানে খাব এখন থেকে। তুমি খেয়ে এসো, আমি ঘরে বসছি'।

পান নিয়ে ঘরে এসে নয়নতারা বলল, 'তুমি কি তামাকও খাও নাকি'?

'না'।

'বাঁচিয়েছ। গড়গড়ার যোগাড় করা সম্ভব হতো না। কিন্তু ভারি একটা দুঃখের কথা আছে। অনেকক্ষণ থেকেই মনে হচ্ছিল বলি, খাওয়া শেষ না-হলে বলতে পারিনি'।

'তুমি ভালো গিন্নি হবে'।

'রসিকতা নয়, শোনো'।

'তার আগে ওদিকে মিটিয়ে এসো'।

মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে নয়নতারা পড়শিদের মুখে শোনা কাহিনীটা ব্যক্ত করল। সেটা ক্যাথারিনের চরিত্র সম্বন্ধে ইঙ্গিতময় একটা মনগড়া কুৎসা। হিন্দু সমাজে বাগদিরা যে-স্তরের, প্রকৃতপক্ষে ক্যাথারিনের পিতাও খ্রিস্টানদের সমাজে তার চাইতে উচ্চবর্ণ নয়। সেইজন্যই বাগচীর পক্ষে কেটকে বিয়ে করা সম্ভব হয়েছে। সমাজের বাইরে থাকা, কুড়িয়ে আনা মেয়ে কেটকে'।

রাজু বলল, 'কেটকে ওরা কুলটা বলছে'?

'তা বলেনি, তবে প্রায় সে রকমই। ওদের নাকি ধর্মাধর্ম জ্ঞানও নেই, ঈশ্বরকেই মানে না। নীতিজ্ঞান কী করে থাকবে!'

'তোমার কী মনে হয়'?

'আমি বিশ্বাস করতে পারি না, রাজকুমার। শুনে অনেকক্ষণ একা একা কেঁদেছিলাম'।

'ভয় কোরো না নয়ন, ওসব নিন্দায় কেট সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলাবে না'।

রাজুর মুখটা থমথম করতে লাগল। সে বললে, 'কাল সকালেই আমি যাব তাদের কাছে। তারাও হয়তো শুনেছে। তাদের বলে আসব যাতে ভয় না-পায়। কী সাংঘাতিক কথা, এরা তো তোমার নামেও কলঙ্ক রটাতে পারে'।

'তা পারে না এমন নয়'।

'তুমি কি তাও ভেবেছ'?

'আমার নিজের কথা ভাবি না। ওরা আমাকে কী বলবে? রাজাদের উপপত্নী থাকে। লোকে হয়তো তা-ই ভাবতে শুরু করেছে'।

'নয়ন, নয়ন!'

নয়নতারা বলল, 'মিতা, তুমি তো ভাববে না। আর-একজন যাকে বুঝতে হবে সে তোমার রানী'।

'নয়নতারা!'

জানলার পাশে দাঁড়িয়েছিল নয়নতারা। রাজু উঠে গিয়ে তার কাছে দাঁড়িয়ে তার একখানা হাত ধরে ধীরে ধীরে নিজের দিকে টেনে নিল তাকে, 'রানি! কই, মুখ তোলো তো'?

নয়নতারা মুখটা আরো নামিয়ে নিল।

রাজু নয়নতারার চিবুক স্পর্শ করে তার মুখটা নিজের দিকে তুলে ধরল, 'এ কী নয়ন, তোমার দু'চোখ ভরা জল!'

রাজু উদ্যত-কথাটা চেপে গিয়ে হাসিমুখে বলল, 'নয়ন, আমরা আরো কতদিন বাঁচব, কত অভিজ্ঞতা আসবে আমাদের জীবনে, কিন্তু তুমি এত সহজে নিজের কাঁধে অপবাদের বোঝা টেনে নেবার যে-সাহস দেখালে সহজে তা ভুলতে পারব না'।

তারপর রাজুর চোখ দুটি আনন্দে চিকচিক করে উঠল, 'একটা বিপ্লবের সময় এসেছে বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু সেসব বিপ্লবের চাইতেও তুমি অপূর্ব'।

ততক্ষণে নয়নতারা সম্বিত পেয়েছে। কথা বাড়াতে না-দিয়ে সে বলল, 'কথা একরাতে ফুরোবে না। আপাতত তুমি কেটকে দেখো। রাত গভীর হল কিন্তু'।

রাজু যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে বলল, 'আমি ভাবছি দেওয়ান এসব শুনলে কী-বা করে বসে।

ভদ্রলোকের ক্রোধ বড় বিষম'।

রাজচন্দ্র আজ খুব সকালেই শয্যাত্যাগ করেছে। ধীরে-সুস্থে কাজ করার সময় যেন আজ নেই। প্রথমে পিয়েত্রোর চিকিৎসার ব্যবস্থা হাতে নেওয়া, কাল রাত্রিতে শুয়ে ভাবতে ভাবতে তার মনে হয়েছে, সব-চাইতে বড় এবং প্রথম কর্তব্য এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। তারপর কেটের কথা। কেটের দুঃখের কথা ভাবতে গিয়ে তার মনে হল, তার স্বামী আছে, বন্ধুস্থানীয়া নয়নতারা আছে, মিথ্যা কলঙ্ক তার মনে কষ্ট দিতে পারবে—অপকার করতে পারবে না। কিন্তু পিয়েত্রোর ব্যাপারটা অন্যরকম।

ঘর থেকে বেরিয়ে সোজাসুজি সে তার মায়ের কাছে গিয়েছিল। রানী সব শুনে বললেন, 'তাহলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়'।

'আমি ভাবছিলাম, তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসি। সেবা-শুশ্রূষার তো দরকার'।

'তার তো লোকজন যথেষ্ট রয়েছে'।

'তাই কি হয়? লোকজন কবে কার সেবা করতে পারে। ভদ্রলোক মায়ের কথা বলছিল, তেমনি কারো শুশ্রূষার আকাঙ্ক্ষা হয়েছে মনে'।

রানী একমুহূর্ত কী ভাবলেন। তারপর অত্যন্ত দৃঢ় কিন্তু ধীব গলায় বললেন, 'রাজু, আমারও মা নেই, অসুখ হলে আমাবও মায়ের কথা মনে হবে। সব প্রৌঢ় বৃদ্ধই কোনো-না-কোনো সময়ে ওই অভাবটা অনুভব করে। তুই কি আমার সেই অভাব দূব করতে পারিস'?

তথাপি রাজু বলল, 'আমার নিজের জন্য অতগুলো ঘরের দরকার নেই, দু'এক মাস পিয়েত্রো যদি থাকত আমার ঘরের পাশে, তাহলে আমি আর নয়নতারা ওঁকে দেখতাম'।

'সে কী কথা! নয়নতারা ব্রাহ্মণের কুমারী। তোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপ আছে আমি জানি। তাই, তুই কি মনে করিস একটা বিধর্মীকে সে শুশ্রূষা করতে পারে। তা হয় না। আমাদের ঘরদোর সবই দেবতাদের কাজের সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে একজন বিধর্মীকে আনা যায় না'।

রাজু খানিকটা অভিমান নিয়ে বাড়ি থেকে রওনা হয়েছিল।

বাগচীকে ডেকে বলল, 'মাস্টারমশাই, আপনার ওষুধে কি রোগ সারে'?

'রোগ কি কেউ সারাতে পারে'?

'তবেই হয়েছে। শুনুন, আপনি মন্সেনে পিয়েত্রোকে চেনেন তো, তাঁকে একবার দেখা দরকার। তিনি অসুস্থ। যদি তাঁকে সুস্থ করতে পারেন, আমি আপনাকে একটা ভালো ডিসপেনসারি করে দেব'।

'চলুন, দেখে আসি'।

রাজুর ঘোড়ার পাশে বাগচীর টাট্টু চলতে লাগল।

বাগচীকে দেখে পিয়েত্রো বলল, 'এসো ফাদার, এসো'।

'আজ্ঞে, আমি তো ফাদার নই'।

'তোমাকে দেখামাত্র ফাদার বলে মনে হচ্ছে'।

'হয়তো আপনার কোনো পরিচিত ফাদারের সঙ্গে আমার চেহারার সাদৃশ্য আছে বলেই আপনার এ রকম মনে হচ্ছে মন্সেনে। আমি আপনাদের জ্ঞানদা বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক'।

বাগচী পিয়েত্রোর রোগের বিবরণ নিল। ওষুধ দিল। বলল, 'আমি এখন থেকে রোজ সকালে আসব। আপনাকে সারিয়ে তুলতে পারলে আমার লাভ আছে, আমার একটা ভালো ডিস্‌পেনসারি হবে'।

পিয়েত্রো বলল, 'তুমি কি তখন মাস্টারি ছেড়ে দেবে'?

'আজ্ঞে, না। কলকাতা থেকে একজন বড় ডাক্তার আনিয়ে নেব। আপনি দয়া করে আমার ওষুধ

খাবেন কিন্তু'।

'তা খাব। তোমার ডিসপেনসারির আশা নষ্ট করব না। কিন্তু ফাদার বাগচী, আমি যদি তোমাকেই আমার গোপন কথাগুলো জানিয়ে যাই সেটা কি কনফেশ্যন হয় না'?

'আজ্ঞে, আমাকে'?

'তুমি আর দ্বিধা কোরো না, এর মধ্যে একদিন এসো। আমি বলব তোমাকে। সব বলা সম্ভব নয়। যতদূর অন্যের ক্ষতি না-করে পারি বলব। ওর চাইতে ভালো কনফেশ্যানের সুযোগ আমার হবে না'।

পথে বেরিয়ে রাজু বলল, 'কী রকম দেখলেন মাস্টারমশাই'?

বাগচী বলল, 'খুব খারাপ নয়'।

'আরোগ্য করতে পারবেন'?

'দেখুন, এমন অমূল্য জীবনের ভার আমার উপবে রাখা কিছু কাজের কথা নয়। যার উপায় নেই, যে বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকে, তার চিকিৎসা আমি করি। সাবে সারল, না-সারে নালিশ করবার কিছু নেই। কিন্তু এঁর জন্যে আপনি সদরের ডাক্তারসাহেবকে আনিয়ে নিন। গ্রেশাম নাকি আজকাল ভালো চিকিৎসা করে'।

রাজবাড়িব দিকে ফিরতে ফিবতে ভালোবাসা ও ধর্মে যাদের জীবনে বিবোধ সৃষ্টি করেছে তাদের অনেকের মতো ভাবল রাজু—ধর্ম কেন মানুষকে অস্পৃশ্য করবে।

২২

না-আছে পাথরের গায়ে লেখা ঐতিহাসিক উপাদান, না-আছে ফারসি ভাষায় লেখা কোনো রোজনামচা। ঘটনার পারম্পর্য অনেকক্ষেত্রেই কল্পনা করে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।

যে-দৃশ্যপটটা এখন দেখা যাচ্ছে সেটা মশালের আলোকে উদ্ভাসিত এক রাত্রির প্রাথমিক অবস্থাব। সে-দৃশ্যপটে রাজু আছে, গোবর্ধন আছে, বুজরুক রয়েছে, চরণের স্ত্রী বনদুর্গা আছে। পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে মনে হয় এদের সমাবেশ অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং সম্ভাব্য, কিন্তু এই পরিস্থিতিতে হবদয়ালকে মানাচ্ছে না। অথচ হরদয়াল যে ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ করতে গেলে তার অস্তিত্বের অনেকাংশে অবিশ্বাস আনতে হয়। কী সূত্রে হরদয়াল সেখানে উপস্থিত হল বোঝা কঠিন। ধরে নেওয়া যায় যদি তার চর ছিল, (বিচক্ষণ একটি দেওয়ানের পক্ষে তা থাকা অস্বাভাবিক নয়) এবং চরের মুখে সংবাদ পেয়ে কর্তব্যবোধে সে ছুটে এসেছিল, তাহলে বিষয়টিকে আলোচনা করা সহজ হয়। বুজরুকের যে আগ্রহ ছিল, দেওয়ান হরদয়ালের আগ্রহ গভীরতায় তাব সমতুল্য, কিন্তু আগ্রহের বিষয় পরস্পরবিরোধী।

বনদুর্গা তার শিশুটিকে ঘুম পাড়িয়ে তার শোবার ঘবে খোলা জানলার কাছে দাঁড়িয়ে কপালে গোল করে সিঁদুর আঁকছে। এইমাত্র সে গা ধুয়ে এসেছে। তাঁর কপালের উপরের চুলগুলি জলে ভিজে চকচক করছে। এমন সময় কে ডাকল, 'চরণ আছিস'?

'পোস্টমাস্টার'! বলে বনদুর্গা হাসিমুখে বেরিয়ে এল।

'আমি অনেক দূরে যাচ্ছি, তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। চরণ কোথায়'?

'আপনি বসুন, এখুনি আসবে সে'।

'না। তার সময় হবে না। তোমার সঙ্গে যখন দেখা হল, কথাটা তোমাকেই বলে যাই। আমি যদি ফিরে না-আসি...'

'ফিরবেন না কেন পোস্টমাস্টার'? বনদুর্গা গোবর্ধনের কাছে এসে দাঁড়াল।

'অনেক দূরের পথ, কী হয় তা বলা যায় না। যদি না-ফিরি একটা কথা তুমি মনে রেখো, তোমাকে না-পেয়েই এমন চলে গেলাম তা যেন তুমি মনে কোরো না'।

বনদুর্গা আরো এগিয়ে এসে দু'হাতে গোবর্ধনের দুখানি হাত ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।

গোবর্ধন বললে, 'কাঁদছ কেন? তুমি কাঁদবে, চরণ কাঁদবে, তাহলে আমি কী করে জোর পাব'?

শিশুকে যেমন ক'রে আদর করে তেমনি ক'রে গোবর্ধন বনদুর্গার গালে হাত বুলিয়ে দিল।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বলল, 'যদি ফিরি বনদুর্গা, তখন এই কান্নার কথা বলে আমি আর চরণ দুজনেই খ্যাপাব তোমাকে'।

'কোথায় যাচ্ছ বলে যাবে না'? বারান্দায় দাঁড়িয়ে বনদুর্গা বলল।

'পরে জানতে পারবে'—বলে গোবর্ধন দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। সে পিছন ফিরেও চাইল একবার।

সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজবাড়ির দরজায় সান্ত্রিকে পেরিয়ে, সামনে যাকে পেল তাকেই গোবর্ধন বললে, 'রাজকুমারকে একটু খবর দিতে হবে, আলি খাঁর কাছ থেকে গোবর্ধন এসেছে'।

রাজু বোধ হয় কাছে কোথাও ছিল।

'কী খবর গোবর্ধন, এমন অসময়ে'?

গোবর্ধন ফিসফিস করে বলল, 'আমরা রওনা হচ্ছি, আপনার বরকন্দাজদের কি আমাদের সঙ্গে দিতে পারেন'?

'কোথায় রওনা হচ্ছ, ফিসফিস না-করে খুলে বলো'।

'বারিকপুরে সিপাহিরা যুদ্ধে নেমেছে। এবার আমরা রওনা হব'।

'কী মন্ত্র তোমাকে আলি খাঁ দিল জানি না। তুমি কি তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মত নিয়েছ'?

'রাজকুমার, সদরে এখনও খবর পৌঁছয়নি, তার আগেই আমাদের এই জেলার বাইরে যেতে হবে'।

'তোমরা কোথায় যাবে'?

'বলতে পারব না'।

'এখুনি যাবে, এই রাত্রিতে'?

'দশ মিনিটের মধ্যে আমরা রওনা হব। ঘোড়ার শব্দ পাচ্ছেন? আলি খাঁ সম্ভবত আমার দেরি দেখে অধৈর্য হয়ে এদিকে আসছেন'।

'কিন্তু আমার বরকন্দাজদের কি আমি ছেড়ে দিতে পারি? তারা কি যাও বললেই যাবে'?

সঙ্গে একজন মশালচি নিয়ে বুজরুক আলি সদরে এসে ঘোড়া থেকে নামল। মশালচি বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। তার ঘোড়া মশালের আলোয় অভ্যস্ত নয়, নাচতে লাগল সেটা। বুজরুকের ঘোড়াও যেন অনুভব করছে। সেটাও ডাইনে-বাঁয়ে ল্যাজ দোলাতে লাগল।

বুজরুক হেসে বলল, 'রাজকুমার বন্দেগি, পরে সমাচার—মেহেরবান আল্লাহের কুদরত—কাল সকলে বারিকপুরে সিপাহিরা তাদের আজাদি কায়েম করেছে'।

'এ সময়ে তোমার রসিকতা ভালো লাগে না আলি খাঁ, সহজভাবে কথা বলো'।

'আপনার কয়েকজন বরকন্দাজ আমাদের সঙ্গে দিন'।

'তারা যাবে কেন'?

'তারা কি ভীরু? দুঃসাহসের কাজে তারা কি নামতে পারে না? প্রচুর অর্থের, শহর লুটের প্রতিশ্রুতি যদি দিতে পারি? সিপাহিরা আর কী চায়'?

'তাই কি যথেষ্ট? সিপাহিদেরও পরিবার-পরিজন আছে'।

'তাদের ভার আপনি নেবেন, রাজাভাই'।

ঠিক এই সময়েই অন্ধকারের একপ্রান্ত থেকে হরদয়ালের গলা শোনা গেল।

'আলি খাঁ, কথাটা আমি বিশ্বাস করি। যেসব সিপাহি তাদের দেশ ছেড়ে বহুদূরে ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে তারাও এমন কিছু মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ঘর থেকে বার হয় না। সৈনিকমাত্রই যন্ত্রের মতো কাজ করে। আমাদের স্কুলবাড়ির কাজে মিস্ত্রিদের যেমন অর্থ উপার্জন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই, স্কুলের মস্ত আদর্শটা যেমন তাদের কাছে অর্থহীন, যুদ্ধটা সৈনিকমাত্রেরই কাছে তাই। সেদিক দিয়ে বরকন্দাজরা যেতে রাজি হবে এটা স্বাভাবিক'।

'তবে আর দেরি কেন দেওয়ানসাহেব'?

'কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। এই উত্তেজনার মুহূর্তে নাচুনে মশালের আলোয় সেটা আপনাদের চোখে পড়ছে না। বরকন্দাজরা যুদ্ধক্ষেত্রে আপনাদের বাধ্য থাকবে এমন কোনো নৈতিক পৃষ্ঠপোষক নেই আপনাদের কাজের। রাজা যুদ্ধ করে, তার শাসন-ভয় তার সৈন্যদের সুশৃঙ্খল রাখে। আপনাদের? তারা যথেষ্ট লুটপাট করে বেড়াবে। প্রয়োজন বোধ করলে আপনাদের ত্যাগ করবে না, এমন আশ্বাস আপনি কোথায় পেলেন'?

আলি খাঁর হাসিতে তার অবজ্ঞা ফুটে উঠল, কিন্তু প্রত্যুত্তরে গোবর্ধন বললে, 'দেওয়ানজি, আমাদের নৈতিক আদর্শ আছে। সেই নীতি সামনে রেখেই ব্যারিকপুরে সিপাহিরা বিদ্রোহ করেছে। এবং সে-নীতি ইংরেজকে বিতাড়িত করা'।

উত্তাপহীন কণ্ঠে হরদয়াল বললে, 'কিন্তু, গোবর্ধনমাস্টার, কিছুক্ষণ আগেই আমরা মেনে নিয়েছি, সৈন্যদের কোনো আদর্শ কোনো নীতি থাকে না। নতুবা টাকার জন্য একজন বিদেশির কথায় দেশি লোকের বুকে বন্দুক তাক করতে পারে না। যদি এ-সত্যটুকু স্বীকার করে নাও তবেই বলব, বড় সেনাপতি হওয়ার যোগ্যতা সত্যি আছে আলি খাঁর। তুমি তার পরের কথা বলো। ইংরেজকে তোমরা বিতাড়িত করবে কেন? কী করেছে তারা'?

'দেওয়ানজি, আপনি খ্রিস্টান'। বুজরুক উত্তর দিল ঘৃণাভরে।

'এর সঙ্গে ধর্মেরও যোগ আছে নাকি? সিপাহিরা তবে ধর্ম মানে? আমার ধারণা ছিল অন্যরকম'।

'আপনার ধারণা যাই থাক, আপনি জেনে রাখুন দেওয়ানজি, ইংরেজ সারা ভারতকে খ্রিস্টান না করে ছাড়বে না। আপনাদের মতো ইংরেজওয়ালারা খ্রিস্টান আগেই হয়েছেন। বাকি ছিল সাধারণ লোক, এবার তারাও হবে। আপনি কি জানেন এন্‌ফিল্ড রাইফেলে টোটার কী কারসাজি হয়েছে'?

'না, জানি না'।

'তাতে গোরু ও শুয়োরের চর্বি মাখানো থাকে। হিন্দু ও মুসলমান সিপাহিকে তাই দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ভরতে হয়'।

'এটা ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করে বটে'।

'আপনি কি জানেন, ইংরেজ হিন্দুদের সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেছে, বিধবা বিবাহের আইন পাস করেছে'? বুজরুক বলল।

হরদয়াল হেসে বলল, 'গোবর্ধনমাস্টার, তুমি কি বিধবা বিবাহ-আইন মানতে চাও না? বনদুর্গা-চরণের বিয়েতে তুমি কি খুশি নও? ফাঁকি দিয়ে কি কোনো বড় কাজ হয়? আমি মানতে পারি এমন কোনো আদর্শই কি তোমাদের নেই'?

রাজু বললে, 'আছে বইকি। বিদেশি শাসনের হাত থেকে মুক্তি'।

হরদয়াল বিস্মিত হল। একটু থেমে বলল, 'রাজার উপযুক্ত কথা বলছেন, রাজকুমার। আলি খাঁ, আপনারও বোধ হয় ইংরেজ বিতাড়নের উদ্দেশ্য মুক্তিলাভ'?

'তা-ই যদি হয়'?

'আনন্দের কথাই হবে। ইংরেজরা নিজেরাও এমনি মুক্তির কথা নিজেদের দেশে বলে। কিন্তু মুক্তির পর কে রাজা হবে? দিল্লিতে কি কেউ সম্রাট আছেন? তাঁর রাষ্ট্রশক্তি কি বাংলাদেশ ও নিজাম একইসঙ্গে

মেনে নেবে'?

'সে যাই হোক, বিশ্বাসঘাতক ইংরেজ, আর তাদের বিশ্বাসী দেশদ্রোহী মিরজাফররা থাকবে না। জালিয়াত ক্লাইভের কুকীর্তি ধ্বংস হবে'। গোবর্ধন বলল।

'কথায় কথায় তোমাদের দেরি করে দিচ্ছি। ক্লাইভ জালিয়াত ছিল, কিন্তু মিরজাফর বিশ্বাসঘাতক কেন? নবাবকে সরিয়ে নিজে নবাব হয়েছিল বলে? তা যদি হয় আলিবর্দি কি বিশ্বাসহন্তা নয়? প্রভুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যদি দোষ না-হয়, মিরজাফরের কী দোষ আমি বুঝি না'।

'আর মহারাজ নন্দকুমারকে যারা হত্যা করে'? গোবর্ধন প্রশ্ন করল।

'তুমি বার্কও পড়েছ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু মহারাজ নন্দকুমার হুগলির ফৌজদার ছিলেন। তিনি কি দু-হাজার সৈন্য নিয়েও ক্লাইভের গতিরোধ করে দাঁড়াতে পারতেন না? পলাশিতে মিরজাফর তাহলে কী করত? আসল কথা কি জানো, ইংরেজ এসে আমরা বেঁচেছি। তৃতীয় পক্ষের দরকার ছিল'।

'ছি-ছি, এ কী বলছেন দেওয়ানজি'? রাজু ঘৃণাভরে বলল।

'আমার জ্ঞানমতো কথা বলেছি, রাজকুমার। আমি অনেকদিন ধরে ভেবেছি ইংরেজ আমাদের কাম্য ছিল। কালিদাসের যুগে ভারতবর্ষ য়ুরোপের তুলনায় কাব্য ও সাহিত্য হীন ছিল না। ইংরেজ পণ্ডিতদের গবেষণায় জানতে পারি খলিফারা সংস্কৃত থেকে শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, সেই জ্ঞান য়ুরোপেও প্রচারের পথ করে দিয়েছিল। তখনও ভারতের জ্ঞান য়ুরোপে মহার্ঘ্য ছিল। তারপর পাঁচশো বছর কী হয়েছে? জাতিটা শুধু যুদ্ধই করল। কখনও পাঠানের বিরুদ্ধে, কখনও মোগলের, কখনও বা পাঠানের হয়ে মোগলের বিরুদ্ধে, কিন্তু যুদ্ধের শেষ হল না। শুধু ধ্বংসই হল, সৃষ্টি হল না। এ তো ভালোই হয়েছে রাজকুমার, কিছুদিন ধ্বংসের শেষ হোক। কিছুদিন না-হয় পরাধীনই রইলাম'।

বুজরুক বললে, 'রাজকুমার, আপনারও কি এই মত'?

'দাঁড়াও আলি খাঁ, আমি আসছি'।

'রাজকুমার, আমাকে ইংরেজের সাহায্য নিতে হবে আপনি যদি বিদ্রোহীদের সাহায্য করতে চান'। হরদয়াল বলল।

'দেওয়ান!' রাজকুমার গর্জন করে উঠল।

'থামুন, রাজাভাই থামুন! আর-একটা বিশ্বাসঘাতককে ইংরেজদের শিবিরে যেতে দিন। আমাদের এই বিদায় দৃশ্যটা বেশ নাটকীয় হল। আপনার এই গর্জন বহুদিন আমার মনে থাকবে, অবশ্য যদি বহুদিন বাঁচি'।

রাজকুমার দ্রুতপদে রাজবাড়ির দিকে চলে গেল।

বুজরুক বলল, 'দেওয়ানজি, বরকন্দাজদের আমি নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তারা গেলে ঘটনাটা আপনি আমার রাজাভাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারবেন'। তারপর বুজরুক হেসে বলল, 'শেরের বাচ্চাই শের হয়। দেওয়ানজি, আপনার পূর্বপুরুষরা বোধ হয় নবাবি আমলে সিহাই নিয়ে কারবার করত। তারও আগে তারা বোধ হয় বৌদ্ধ ছিল'।

একজন ভৃত্য ছুটতে-ছুটতে এসে খবর দিল, রাজকুমার গোবর্ধনকে ডাকছেন।

রাজু তার নিজের ঘরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিল। গোবর্ধন সামনে আসতে তার হাতে পিয়েত্রোর দেওয়া বন্দুকটা তুলে দিয়ে বলল, 'মাস্টার, আলি খাঁকে দেখে রেখো ভাই'।

রাজু পেছন ফিরে চলে গেল। গোবর্ধন কথা বলার সুযোগ পেল না।

গোবর্ধন ফিরে এলে বুজরুক বলল, 'রাজাভাই আসবেন না। চলো, আবার দেখা হলেও দেখার শেষ কখনও হবে না। দেওয়ানজি, আমরা হাসিমুখেই চললাম'।

হরদয়াল এগিয়ে এসে বলল, 'গোবর্ধন, তুমি আর-একটু ভেবে দ্যাখো'।

'দেওয়ানজি, আপনার মতো ধীশক্তি আমার নেই। কিন্তু আপনি কি ডানকানদের মতো

কুঠিয়ালদেরও দেখতে পান না? আপনি কি আপনার গ্রামের নিঃসম্বল তাঁতিদের দেখেও বুঝতে পারছেন না'?

সদরের বাইরে থেকে বুজরুক ডাকল, 'এসো গোবর্ধনমাস্টার, এসো'।

রাজু দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখল—কালো রাত্রির গায়ে লাল মশালগুলো দুলছে। তার মনে হল মশালগুলো যেন গাঢ় অন্ধকারের জ্বলন্ত অগ্নিক্ষরা হৃৎপিণ্ড।

২৩

সে-রাত্রিতে রাজুর ভালো ঘুম হয়নি। দেওয়ানের ঘুম বার বার ভেঙে গিয়েছিল। বনদুর্গা অনেক রাত অবধি কান্নাকাটি করেছিল। চরণদাস সবই জানে, বনদুর্গা নিজেই তাকে বলেছে, তবু কিছু-যেন সে লুকাতে চায়। বনদুর্গার প্রথম স্বামীর, সেই বালক-স্বামীর সঙ্গে উপভুক্ত কোনো-এক আনন্দেব স্মৃতির ব্যাপারে কতকটা এ রকম অনুভব তার হয়েছে। বর্তমানে সে কেউ নয়, তাব কথা বলা যায় না চরণকে, গোপনে থেকে সে-স্মৃতি তার নিজের শিশুটির মতো বোবা আগ্রহ জানাতে থাকে। গোবর্ধনমাস্টাবেব কথাগুলোও ভোলা যায় না। লোককে বলার মতো কথাও নয়। সে কী কখনও কল্পনা করেছিল তাব সেই বালক-স্বামী অন্যায়ের প্রতিকার করার মতো বলিষ্ঠ হয়ে ফিরে আসবে?

ভোরের দিকে রাজু ঘুমিয়ে পড়েছিল। রূপচাঁদ এসে তাকে ডেকে গেছে। অনেকটা বেলায় ঘুম থেকে উঠে রাজু তখনও বিছানাতে বসে আছে। রূপচাঁদ আবার ডাকল।

'কী রে'?

'মন্‌সেনে পিয়েত্রোর লোক ভোর থেকে বসে আছে'।

'কী চায়'?

'পিয়েত্রো একটু বেশি অসুস্থ। আপনাকে একবার যেতে বলেছেন'।

'তাকে যেতে বলে দাও। পালকি-বেহারাদের খবর দিয়ো'।

পালকিতে চেপে রাজু পিয়েত্রোর বাড়িতে গিয়েছিল। পিয়েত্রোর স্বাস্থ্যের অবনতি রোধ করতে পারেনি বাগচীর চিকিৎসা। কিংবা বিশেষ করে বুজরুকের চলে যাওয়ার ঘটনাটা যেন তার অসুস্থতা বাড়িয়ে দিয়েছে। রাজু শুনতে পেল এক পরিচারকের মুখে, কাল সারা রাত অসুস্থ প্রৌঢ় ঘর-বার করেছে অস্বস্তিতে।

'সদর থেকে ডাক্তার আনাই'?

'তোমার ইচ্ছে রাজু। আমি কাল সারারাত্রি ভেবে এইটেই শান্তির হবে বলে বোধ করেছি। আমার জন্য আমি চিন্তা-না কবে সেগুলো তোমার উপরে ছেড়ে দেব (পিয়েত্রো এই জায়গায় একটু হাসল)। আমার ছেলে থাকলেও এ রকম ব্যবস্থাই হতো তাই নয়'? একটু থেমে সে আবার বলল, 'পৃথিবীতে আমার মায়ের মতো আপন কেউ ছিল না। অন্তত এখন এই অবস্থায় তাঁর কথাই মনে হচ্ছে। আমার এ দেহটা তাঁর রক্তমাংসে গড়া, এর সৎকার কোরো। কবরের শীতলতা আমার ভালো লাগবে না'।

রাজু বলল, 'এমন করে এসব কথা বলতে নেই'।

পিয়েত্রো নিজেও সরে এল এ-আলাপ থেকে। পুরন কথা তুললো সে। শিকার খেলা, পিয়ানো শেখা, স্কুলের কথা। কী সুন্দরই-না তার কথা বলার ভঙ্গি। কিন্তু পিয়েত্রোর বারংবার যে-কথা বলার ইচ্ছা হল, যে-কথা শুনবার আগ্রহ রাজচন্দ্র অতিকষ্টে দমন করছিল, সেটা পিয়েত্রো সন্তর্পণে এড়িয়ে গেল। বুজরুক যেন কেউ নয়।

রাজু যখন বিদায় নিচ্ছে পিয়েত্রো বলল, 'একটা অনুরোধ করব তোমাকে, রাজু, রাগ কোরো না। এখন কিছুদিন আমার এখানে না-এলেই ভালো হয়'। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার।

বাড়িতে ফিরে রানীর কাছে গিয়ে রাজু বললে, 'কী করি মা? পিয়েত্রো যেন একখানা কঙ্কাল হয়ে গেছে। তাঁকে কি বাঁচানো যাবে না'?

রানী চুপ করে থেকে অবশেষে বললেন, 'চেষ্টা করে দ্যাখো'।

'আমি এখুনি একটু সদরে যাব ভাবছি। সেখানে গ্রেশাম নামে এক ডাক্তার আছে। তাকে নিয়ে আসি'।

'তোমাকে যেতে হবে না, লোক পাঠিয়ে দাও'।

রাজু অতঃপর মনের মতো লোক খুঁজতে লাগল। দেওয়ান হলে সবচাইতে ভালো হতো। কিন্তু গত রাত্রির তীব্র বিমুখতা এখনও সে বিস্মৃত হয়নি, বরং নামটা মনে হতেই রাজুর চোয়াল দুটি কঠিন হয়ে উঠল। সদর-নায়েবকে দিয়ে এ-কাজ হবে না। বিশেষ করে গোবর্ধন হঠাৎ চলে যাওয়ায় তার সংসারের অবস্থা কী রকম হয়েছে কে জানে। রাজু ভেবে স্থির করল বাগচীর কাছে প্রস্তাব করবে।

দুপুরে নিজের ঘরে বসে রাজুর সহসা দুঃসহভাবে একা বোধ হল। এমন নয় যে গোবর্ধনের সঙ্গে তার রোজ সাক্ষাৎ হতো। তবু মনে হল এই গ্রামে গোবর্ধন নেই। আলি খাঁর কথা মনে হতে তার মন উৎকণ্ঠায় ক্লিষ্ট হয়ে উঠল। যেন বুজরুক একা সেখানে, যেন তার সঙ্গী নেই যথেষ্ট—এ চিন্তাই উৎকণ্ঠার কেন্দ্রে। তার চোখের কোণ দুটিও ভিজে উঠল। আর পিয়েত্রো। তার অত বড় বাংলোটা আজ অদ্ভুতভাবে নির্জন ছিল। একটি বরকন্দাজও চোখে পড়েনি। সেই নিস্তব্ধতায় আরামকেদারায় স্তব্ধ হয়ে পিয়েত্রো। রোগ বটে, তার চাইতেও বেশি অবসাদ। কেন এমন হল? আলি খাঁকে যদি এর জন্যই সে প্রস্তুত করে থাকে এখন তবে প্রফুল্ল হয়ে ওঠার কথা। অথচ কোথাও যেন স্পৃহা নেই, কোথাও যেন আর আকর্ষণের কিছু অবশিষ্ট নেই, সবটাই একটা নৈর্ব্যক্তিকতার সূচনা করছে। শিকারের কথা, স্কুলের কথা, সেকালের বাণিজ্যের কথা—কত কথাই তো সে বলল। কিন্তু কোথাও ব্যক্তিত্বের উত্তাপ সঞ্চারিত হল না। যেটুকু আবেগ সেটুকুও যেন কথার ধ্বনি, তারই প্রাণের ব্যঞ্জনা। বক্তার কিছুমাত্র অভীপ্সা তাতে নেই। এমনই বোধ করি হয় নিঃসঙ্গ মানুষের, নিজের উপরেও মায়া থাকে না। নতুবা নিজের দেহটাকে দাহ করার কথা বলতে গিয়েও এতটুকু উঁচু-নিচু হল না কণ্ঠস্বর।

দেওয়ান সকালে উঠে স্নান শেষ করে কাছারিতে গিয়েছিল। ভৃত্য এসে খবর দিল, প্রাতরাশ দেওয়া হয়েছে। দেওয়ান অভ্যাসমতো দেওয়ান-ভবনে ফিরেছিল, কিন্তু প্রাতরাশ সম্মুখে রেখে দীর্ঘসময় বসে রইল। কাল রাত্রির অতগুলি কথার মধ্যে দুটি কথা তার মনে গেঁথে আছে। বুজরুক আলি তাকে বলেছিল প্রকারান্তরে মসীজীবী। আর গোবর্ধন উল্লেখ করেছিল ডানকানের কথা।

নিজেকে দুর্বল বোধ হল হরদয়ালের। রাত্রিতে ঘুম না-হলে দেহ ক্লান্ত হয়, মনও ক্লান্ত হয়, এটা হরদয়ালের মনে হল না। ইতিহাসে পড়া দুঃসাহসী দেশপ্রেমিকদের সঙ্গে বুজরুকের সান্নিধ্য অনুভব করল সে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বিদ্বেষ ছাড়া ইংরেজের বিরুদ্ধে কোনো যুক্তিই তার নেই। বাহাদুর শাহ্‌ সম্রাট হলে তার লাভ নেই, যেমন নেই ইংরেজের রাজত্বে ক্ষতি। কিন্তু জোয়ান অব আর্ক ইংরেজদের বিতাড়িত করেছিল কেন? আপাতদৃষ্টিতে অপদার্থ বাহাদুর শা-র মতো একজন রাজকুমারকে রাজা করার জন্যই। তবু জোয়ান নাপোলেয়ঁর চাইতেও বড়।

কিন্তু গোবর্ধনের স্বল্পোচ্চারিত অনুযোগের ভাষাটা বুজরুকের শ্লেষের চাইতে তীব্র। ডানকানদের অত্যাচারের কথা হরদয়াল জানে। ডানকানদের মনোভাবও সে জানে। হরদয়ালের মনে হল, গোবর্ধনমাস্টার যেন মাস্টারি-ভাষায় তার অঙ্কের হিসাবে গোড়ার ভুলটা দেখিয়ে দিয়েছে।

'খাব না। এগুলো নিয়ে যা। রাত্রিতে ঘুম হয়নি, অরুচি বোধ হচ্ছে'। ভৃত্য এলে হরদয়াল বলল,

'পিপাসা পেয়েছে'।

কিছুক্ষণ পরে সে মদের ছোট গ্লাসটি হাতে নিয়ে তার লাইব্রেরি ঘরটার জানলার এপারে গিয়ে দাঁড়াল। তাকে-শেল্‌ফে কয়েক মাসের মধ্যে অনেক বই জমে উঠেছে। জানলার তাকে মদের গ্লাসটি রেখে হরদয়াল লাইব্রেরিতে ঢুকল। খানিকটা সময় কাটিয়ে তার মন অনেকটা সুস্থির হল। বসবার ঘরে ফিরে এসে আরামকেদারায় শুয়ে ভৃত্যের হাত থেকে গড়গড়ার নলটা নিল।

কিন্তু যুদ্ধ আর চাই না। পাঁচশো বছরের যুদ্ধই যথেষ্ট। এখন মস্তিষ্কে অগ্রসর হতে হবে।

নলটা রেখে হরদয়াল ভৃত্যকে ছাতা আনতে বলল।

'বাইরে যাবেন, হুজুর'?

'হ্যাঁ, অনেকদিন স্কুলে যাইনি'।

হরদয়াল স্কুলে গিয়ে স্কুলের ঘর তৈরির কাছেই সাধারণত দাঁড়িয়ে থাকে। আজ সে পড়বার আটচালায় গিয়ে উঠল। বাগচী তখন কতকগুলি অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ছেলেকে কী একটা অঙ্ক কষাচ্ছে। আটচালার অপর প্রান্তে কৈলাস পণ্ডিত কয়েকটি ছেলেকে গোলমাল করতে নিষেধ করছে, কিন্তু তাদের কোলাহল থামছে না।

বিচক্ষণ দেওয়ান হরদয়াল স্কুলঘরটার চারদিকে চেয়ে নিল, তারপর বলল, 'আপনাদেব একজন শিক্ষককে অনুপস্থিত দেখছি। সেইজন্যই গোলমাল'?

বাগচী বলল, 'দেওয়ানজি, আমাদের গোবর্ধন তীর্থ করতে গেছে, ফিরতে দেবি হবে'।

'তাহলে একজন নতুন শিক্ষকের খোঁজ করুন'।

'আপনার হুকুম হলেই করব'।

'স্কুলবাড়িটা তৈরি শেষ হলে আর দুজন দবকার হতো। আপাতত একজনকেই নিয়োগ করুন। আপনার স্কুলে ইতিহাস পড়ানো হয়'?

'কিছু কিছু হচ্ছিল। গোবর্ধনই পড়াত'।

'যদি মাস্টার তাড়াতাড়ি না-পান, আমাকে খবর দেবেন'।

হরদয়াল স্কুলঘর থেকে নামল।

একটা ছেলে এগিয়ে এসে বলল, 'হুজুর, আজ আমাদের ছুটি'।

'ছুটি! ছুটি কেন'?

ছেলেরা হরদয়ালের চারদিকে ততক্ষণে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। একজন বললে, 'হুজুর, আপনি এসেছেন বলে'।

হরদয়াল হাসল। বললে, 'আমি এসেছি বলে? আচ্ছা, যাও, দু'দিন ছুটি তোমাদের'।

ছেলেরা বন্যার মতো ছুটতে শুরু করল। বাগচী ও হরদয়াল সেই বন্যায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য পথ খুঁজতে লাগল।

স্কুলঘর থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে হরদযাল ভাবল, বন্ধুদের কাছে অনেকদিন চিঠি দেয়া হয় না। চিঠি দেয়া দরকার হয়ে পড়েছে।

সদরের ডাক্তার গ্রেশাম আসতে পারেনি। কী একটা রাজ্য-সংক্রান্ত কাজে কালেক্টর কলকাতা গিয়েছিল, সেদিকে নাকি খুব গোলযোগ, তার কাজ চালাচ্ছে গ্রেশাম। সে তার এক সহকারীকে পাঠিয়ে দিয়েছিল, তার নাম লী হাউস। লী হাউসের বয়স কম কিন্তু দেশে সে একজন অ্যাপথিক্যারির কাছে শিক্ষানবিশ হিসাবে ছিল। ডাক্তারি জানে, তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। পিয়েত্রো একটু-যেন ভালো আছে।

লী হাউসকে বাগচী নিজের বাসায় একবেলা রেখেছিল, কিন্তু বিকেলের দিকে ডানকান খবর পেয়ে নিজেই এসেছিল। বাগচীদের বাসা থেকে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে সইসকে পাঠিয়ে দিল ডাক্তারকে খবর দেওয়ার জন্য।

লী হাউস বেরিয়ে এলে সে বলল, 'হ্যালো ডক্। তুমি এসেছ আমি এ-খবরটা সকালে পাইনি। এখন চলো তো আমার কুঠিতে'।

লী হাউস বললে, 'আপনাকে আমি ঠিক চিনতে পারলাম না'।

ডানকান হো-হো করে হাসতে-হাসতে বলল, 'একজন ইংরেজ কৃষক'।

'তা তো বুঝতে পারছি'।

'আমি থাকতে আপনার কি একটা হিদেনের বাড়িতে ওঠা ভালো দেখায়'?

বাগচীর মুখটা ম্লান হয়ে গেল।

'এরা তো হিদেন নয়, খ্রিস্টান'।

ডানকান আবার হাসল, 'আপনি গ্রেশামের ছাত্র এবং গ্রেশাম আমার বন্ধু, আমি সেই হিসেবে আপনাকে আহ্বান করছি'।

'কিন্তু তা কি ভালো দেখায়? এঁদের রোগী। রোগী দেখতে এসেছি তো। অবশ্য আপনার কুঠিতে গেলেও রোগী দেখতে অসুবিধা হবে না। আপনি এঁদের বলুন না'।

ডানকান বলল, 'অবশ্যই আমি এমন যুক্তি দেখাতে পারতাম যার পর আপনি ও-বাড়িতে থাকতে রাজি হতেন না। আমি কারো মনে আঘাত দিতে চাই না। আপনি আমার কুঠিতে আসুন। গ্রামের লোকরাই তাদের আলাপে এমন অনেক কথা বলবে যাতে আপনি বুঝতে পারবেন কেন বাগচীর বাড়িতে কোনো ভদ্রলোকের থাকা উচিত নয়'।

লী হাউস একটু দ্বিধায় পড়ল। বাগচী এগিয়ে এসে বলল, 'মিস্টার লী হাউস, কথাটা একদিক দিয়ে খুব সত্যি। আমার মনে হচ্ছে এখানে থাকলে আপনার মানসিক শান্তি নষ্ট করার মতো অনেক ঘটনা ঘটতে পারে। ডাক্তারের মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হওয়া রোগীর পক্ষে ক্ষতিকর। আপনি ডানকানসাহেবের কুঠিতে যান'।

লী হাউস চলে যাবার পর একদিন কেট বলেছিল, 'বাগচী, তোমার কি লজ্জা বলেও কিছু দেহে নেই'? বাগচী তার বার্লি-স্যাপের বাটিটায় চুমুক দিচ্ছিল, হেসে বললে, 'আমাদের দেশে একটা কথা আছে, লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়'।

'ওরকম কাপ্লেট আমাদের দেশের কৃষকদের মুখেও শুনতে পাবে। তাই বলে তারা যা বলে সেটাই মানুষের নীতি নয়'।

'কী অন্যায় করেছি, বুঝিয়ে বলো'।

'লী হাউস তোমার ডাক্তারিকে অপমান করেনি'?

'করেছে'।

'সে তোমার আতিথ্য প্রত্যাখ্যান করেছে'।

'তা বটে'।

'তুমি তবু তার কম্পাউন্ডারি করবে? সে কি বুঝেছে তোমার ডাক্তারির পেছনে কত বড় হৃদয় রয়েছে? তুমি তবু তারই ব্যবস্থামতো ওষুধ ঢেলে ঢেলে খাওয়াবার জন্যই পিয়েত্রোর কাছে যাবে'।

'তাই তো বটে, কেট। তাহলে আমি যাব না। আমার যাওয়া উচিত নয়। সে তো টাকা নিয়ে গেছে, তিনদিনে সে পাঁচশো টাকা নিয়ে গেল। আর আমি বিনি পয়সায় চিকিৎসা করে বেড়াই'।

বাগচী তার প্রিয় সোফাটায় বসে পাইপ ধরাল। তার ভঙ্গিতে মনে হল, আর-কেউই তাকে তুলতে পারবে না। কেট গৃহকাজে চলে গেল।

কিন্তু আধঘণ্টা পরে কেট কী একটা কাজে ঘরে এসে দেখল বাগচী নেই। দেখল, তার তামাকের ছাই ঢালবার পাত্রটা দিয়ে একটা কাগজ চাপা দিয়ে রেখে গেছে সোফার উপরে। বাগচী চিঠি লিখেছে :

ডার্লিং কেট, সুইটি, তুমি রাগ কোরো না। কথাটা তামাক খেতে-খেতে মনে হল। লী হাউস আমাকে অপমান করেছে বটে কিন্তু আমি লী হাউসের কাছে যাচ্ছি না। পিয়েত্রোকে ওষুধ দেওয়া দরকার, সেইজন্যই যাচ্ছি। আজ পিয়েত্রোর বাড়িতে উপাসনা করব। ফিরতে রাত হবে। তোমার...

চিঠিটা পড়ে কেটের হাসি পেয়েছিল।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বাগচী বলল, 'কেট, পিয়েত্রোর মতো চরিত্র আমি আর দেখিনি। কাল সন্ধেবেলা তুলে বসিয়ে দিলাম বাইরের চেয়ারে। বললেন—বাগচী, একটু মদ খেতে পারি? গ্লাসে মেপে একটুখানি দেওয়া হল। আবার বললেন—তামাক খেতেও পারি নিশ্চয়। তামাক তো খানই। গড়গড়া এল। গড়গড়া টানতে টানতে অনেক গল্প করলেন। সেকালের কথা। অদ্ভুত ব্যাপার সেসব। ইংরেজ ও ফরাসিদের যুদ্ধের কথা এমন নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেন, যেন চোখের সম্মুখে ঘটছে'।

'বুড়োরা অনেক সময়ে ওরকম বলতে পারেন'।

'কিন্তু পিয়েত্রো সাধারণ বুড়ো নয়। সন্ধেবেলার আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বাইস্ নামে একটি মেয়ের গল্প তিনি বললেন। অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। কাজিন ছিল বোধ হয় পিয়েত্রোর। মামার মেয়ে হবে বলে আমি আন্দাজ করেছি'।

'বাইস্ তার কেউ ছিল, এ আমরাও আন্দাজ করেছি'।

'কিন্তু সবটুকু নিশ্চয়ই জানো না। বাইস্‌কে পিয়েত্রো ভালোবাসতেন, কিন্তু বিয়ে হয়নি। এদেশি এক রাজার বাড়িতে আছে বাইস্ কোনো-এক অখ্যাত রাজার স্ত্রী হয়ে। প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার ঘটনা'।

'অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা। ধনরত্নের লোভে মেয়েটি বিয়ে করেছিল। ভারতীয় রাজাদের ধনরত্ন প্রবাদে বিখ্যাত'।

'একটু অসাধারণত্ব আছে। ভারতীয় রাজাদের একাধিক বিবাহ হয়'।

'তাহলে তো আরো খারাপ। তাহলে বাইস্ উপপত্নীদের একজন। তুমি নিশ্চয় বহুবিবাহের সমর্থনে বক্তৃতা দেবে না'।

'কেট, তোমার আজ মন ভালো নেই। বিষয়টা তুমি ধরতে পারছ না। বাইস্ কর্তব্যবোধে বিবাহ করেছিল, ভালোবেসে নয়, অথচ পিয়েত্রো বলেন, বিবাহের কথা উঠতেই যদি তিনি সরে না-দাঁড়াতেন, যদি বাইস্‌কে জানাতেন তাঁর ভালোবাসার কথা, হয়তো বাইস্ রাজি হতো'।

'তাহলে তো পিয়েত্রো কাপুরুষ'।

বাগচী ব্যথিত দৃষ্টিতে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'তা আমি মনে করতে পারছি না। পিয়েত্রো তাঁর মামার কথা ভেবেই পিছিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মামা ভারতীয়। এ-বিবাহ হলে তাঁর মামার সমাজে অসুবিধা হতো'।

'বাইস্ ভারতীয় মহিলা? পিয়েত্রোর মামা ভারতীয়'?

'হ্যাঁ। আমাদের স্কুলটি পিয়েত্রোর মা'র নামে উৎসর্গ করা'।

কৌতূহলে কেটের বিরক্তিবোধটা কমে গিয়েছিল।

'কী আশ্চর্য!'

'রাজকুমার পিয়েত্রোর মামার কথা জানতেন ; বাইসের কথা আমার সঙ্গে একত্রেই শুনেছেন। তিনি শুনে প্রস্তাব করলেন, সেই রাজাকে খবর দিলেই হয়। পিয়েত্রো নিষেধ করলেন'।

'কেন, অপমান হওয়ার ভয়'?

'না। বরং বাইস্ খবর পেলে আসবার জন্য প্রাণপণ করবে অথচ আসতে না-পেরে কষ্ট পাবে। রাজবাড়ির ঠিকানা পিয়েত্রো বলেননি, কাউকে জানতে দেওয়া তাঁর ইচ্ছে নয়'।

কেট বিরস মুখে আহার্য নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। অপ্রতিভের সুরে বাগচী বলল, 'তুমি লী হাউসকে লেখা চিঠিটা ভুলতে পারছ না, কেট'।

একটু ইতস্তত করে কেট বলল, 'লী হাউস রাজার জাতি আর তুমি বাঙালি বলেই কী বিনয়ের এই আতিশয্য'?

হাসির চেষ্টা কবে বাগচী বলল, 'কুটুম্ব দেশের লোক তো!'

অন্য অনেকসময়ে বাগচীর এই উক্তি কাজ করলেও আজ কেটের মুখের স্বাভাবিক হাসি ফিরল না। বাগচী বলল, 'তুমি তো জানো কেট, শ্বশুর মৃত্যুশয্যায় আমাকে কয়েকটি কর্তব্যের ভার দিয়ে গেছেন। তাদের মধ্যে একটির কথা বলি তোমাকে : লী হাউসকে ক্ষমা করা, তিনি লী হাউসকে ক্ষমা করেছেন, মৃত্যুশয্যায় তার জন্যই প্রার্থনা করেছেন এ কথা জানানো দরকার, তবে এ লী হাউস নয়, তার নাম অ্যামব্রোসিয়াস। যদি এর কাছে খোঁজ পাওয়া যায়, এজন্যই চেষ্টা করছি'।

কেটের চোখ দুটি ঝকঝক করতে লাগল বটে, কিন্তু তার মনোভাব কিছু বোঝা গেল না।

বাগচী উঠে দাঁড়াল।

'কখন ফিরবে? এবেলাতেই আসবে তো'?

'হ্যাঁ, ভালো দেখি তো তাড়াতাড়ি চলে আসব। তোমার মন ভালো নেই, রাজকুমারকে ধরে আনব'।

ভ্রূকুটি করে কেট বলল, 'কেন'?

'অনেকদিন তোমরা বাজাও না। আচ্ছা, একদিন নাচের ব্যবস্থা করলে পারো'।

'পাদরির স্ত্রী নাচে না'।

'রাম কহো, আমি কি পাদরি নাকি'?

বাগচীর বাসায় কথাটা উঠেছিল ডানকানের রচনা নিয়ে। সেখানে রাজুও ছিল। বাগচী পিয়েত্রোর বাসা থেকে ফিরতি পথে তাকে ডেকে এনেছিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়।

পথে যে-আলোচনাটা হচ্ছিল, তারই জের টেনে এনে বাগচী বলল, 'ডানকান যা বলেছে তার সবটুকু মিথ্যা এ আমি বলতে পারব না। প্রতিবাদ আমি কী করে করি। আমার মনে হয়, তার অনেকাংশই সত্য। ভারতে কেটের মতো এমন রূপসী ইংরেজ মহিলা কজন আছে? সিভিলিয়ান স্বামী পাবার উপযুক্ত রূপ গুণ নিশ্চয়ই আছে কেটের। তারা যদি কেটকে পাবার চেষ্টা করত, সাধ্য কি আমার, আমি এগিয়ে যাই। খ্রিস্টান সমাজে যদি আমার শ্বশুরের স্থানচ্যুতি না-হতো তবে আমি কোন সাহসে আমার হৃদয় নিয়ে অগ্রসর হতাম, রাজকুমার'?

রাজু বলল, 'কিন্তু এক্ষেত্রে সমাজে পরিত্যক্ত হওয়ার কারণ গর্হিত কোনো অপরাধ নয়। আপনার শ্বশুরের ধর্মমত, আপনার কাছে যা শুনলাম, তথাকথিত সভ্য য়ুরোপে হয়তো তার জন্য জীবন্ত দগ্ধ করার ব্যবস্থা ছিল এককালে ; কিন্তু আমাদের দেশে শাক্তর ছেলে বৈষ্ণব হয়, বৈষ্ণবের ছেলে শৈব

হয়। তাতে তার আত্মীয়স্বজন হয়তো কষ্ট পায়, কিন্তু তাই বলে তাকে গর্হিত অপরাধ বলে না। সমাজে তাকে সমাদর করার লোকও থাকে'।

'আমিও অপরাধ বলি না। কিন্তু এ-কথা অস্বীকার করব কী করে, সাধারণ অবস্থায় কেটকে পাবার সৌভাগ্য আমার মতো লোকের হতো না। ডানকান যা বলছে তা ঘটনা। হয়তো সে বিদ্বেষপ্রসূত হয়ে রটাচ্ছে, কিন্তু যা রটাচ্ছে তার সবটা মিথ্যে নয়'।

রাজু বিরক্ত হয়ে বলল, 'এতক্ষণ আপনি তাই বুঝিয়েছেন। কিন্তু আমার একটা মত আপনাকে জানাতে হচ্ছে মাস্টারমশাই। সত্যের প্রতি আপনার অসীম শ্রদ্ধা আছে, তাই বলে সবসময় সেটার প্রযোগ ভালো নয়। লক্ষ্য করতে হবে সত্যের প্রয়োগে কাবো মনে বেদনা হচ্ছে কিনা'।

বাগচী তিরস্কারটা নিঃশব্দে মেনে নিল। ট্যাকঘড়িটা খুলে সে বোকা-বোকা মুখ করে বলল, 'রাজকুমাব, আপনাকে পথে বলেছি, দেওয়ানজি আমাকে ডেকেছিলেন, অনুমতি করুন, আমি একটু ঘুবে আসি। আমি যাচ্ছি, কেট। পৃথিবীর সর্বোত্তম সঙ্গীদেব একজন তোমার কাছে রইল। রাজকুমার, আপনি যা বললেন, আমি যাওয়া-আসাব পথে চিন্তা করব। নিশ্চয় আপনাব কথাব মূলে কোনো বিবাট সত্য আছে'।

বাগচী চলে গেলে রাজু বলল, 'কাজটা আমি ভালো কবলাম না, কেট। মাস্টাবমশাইয়েব মতো একজন জ্ঞানী লোককে অমন করে কথা বলাব অধিকাব আমাব নেই। কীসে মানুষেব অপকাব হয় তা বোধ হয় তিনি আমার চাইতে বেশি বোঝেন। তোমার ছলছল চোখ দেখেই আমাব কষ্ট হযেছিল। আর সেজন্যই তাঁর মনে কষ্ট দিতে বাধ্য হলাম'।

কেট বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়েছিল, এবার সে তিক্ত হেসে বলল, 'তার জন্য কি আপনি খ্রিস্টানি কাযদায় ক্ষমাও চাইবেন'?

'না কেট। ক্ষমা চাইতে আমি পারব না। তবে চেষ্টা কবব যাতে তিনি ব্যাপাবটাকে আমাব ঔদ্ধত্য মনে করে অপমানিত বোধ না-করেন। একটা কথা কি জানো, কোথায যেন একটা ভুল হযে যাচ্ছে। তুমি সমাজে পরিত্যক্তা ছিলে এর প্রচারটাই হচ্ছে, লোকে বুঝতে পাবছে না তোমাদের সামাজিক দীনতা এমন নয যে কোনো পুরুষ তোমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হবে'।

রাজচন্দ্রর মনে হল কেট যেন মূর্ছিত হবে। তাব মুখে বক্তেব চাপ কখনও বাডছে, কখনও কমছে। কিন্তু টেবিলেব একটি কোণ শক্ত কবে চেপে ধবে কেট বলল, 'রাজকুমার, আমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করায় কোনো পুরুষেবই কুণ্ঠিত হওযার কিছু নেই'?

হয়তো কোনো বাঙালি মেয়ে কথাটাকে আরো মধুব করে বলতে পাবত।

রাজু বলল, 'না কেট, তুমি রমণীবত্ন'।

একটু চুপ করে থেকে কেট বলল আবার, 'রাজকুমার, আপনাদেব ভাষায রত্ন কথাটা বোধ হয় খুব মূল্যবান নয়'।

'কেন কেট'?

'মূল্যবান হলে কি আর রং জ্বলে যায় এত তাড়াতাড়ি'?

রাজুর মনে হল হযতো-বা বাগচী অনাদর করে কেটকে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মনোমালিন্যের কথা মনে হতেই সে কুণ্ঠিত হল। সে বলল কথাটাকে লঘু কবাব জন্যই, 'কেট, বত্ন যখন নিজের আযত্তে আসে তখন মানুষ সবসময়ে তার কথা মনে করে বসে থাকে না। সে-রকম যদি কেউ থাকে তবে তাকে অস্বাভাবিক বলতে হবে। কেট, তোমার ওই চোখ দুটি, ওব মূল্য কি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মণির চাইতেও বেশি নয়? কিন্তু তুমি কি দিনরাত চোখের মণির কথা ভাবো'?

'তা ভাবি না'।

'আচ্ছা, আমি এখন চলি'। হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল রাজু।

'এখন আপনাকে যেতে দিতে ইচ্ছে নেই। এখন না-গেলে কি খুব ক্ষতি হবে'?

'তা হবে না। কিন্তু আমি তোমাদের ভয় করতে আরম্ভ করেছি। বিশেষ করে তোমার কর্তাটিকে। তাঁর ধীর শান্ত স্বভাবের আড়াল থেকে তাঁর সত্য ভাষণগুলি গুপ্তির তীক্ষ্ণধার জিহ্বার মতো প্রকাশ পায়। বুড়ো হলে মানাত'।

'রাজকুমার!'

'কী হল, স্বামীনিন্দা সহ্য হচ্ছে না'?

'তা একটু না-হয় সহ্যই করি। এইমাত্র যা বলতে যাচ্ছিলাম সেটা শুনলে বোধ হয় আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণাটাই বদলে যেত। আমি সত্যি বাগচীর মতো ক্ষমা করতে পারি না। তার মতো সত্যের খাতির করি না। মাঝে মাঝে মনে হয় আর-একটু কম খ্রিস্টান হলে বোধ হয় আমার পক্ষে ভালো হতো। অন্যসময়ে ভাবি, খ্রিস্টানরা ভালোবাসতে জানে না'।

রাজু অস্বস্তি বোধ করল, কিন্তু হাসিতে সেটা আড়াল করে বলল, 'এটাকে কি তোমাদের কনফেশ্যন বলে'?

কথাটা সে বাগচীর কাছে সদ্য শিখেছে।

'না রাজকুমার, অত বড় সাহস আমার নেই। আমি দ্বিধায় পড়েছি। কতগুলি লোককে আমি ঘৃণা করতাম, অন্য কয়েকজন লোককে আমি ভালোবাসতাম। যদি এতদিন পরে সেই ভালোবাসার পাত্রগুলিও ঘৃণার হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমি কী করব ভেবে পাই না'।

'এমন হঠাৎ হল কেন, কেট? তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে। আচ্ছা, এখন থাক, পরে একসময়ে আমি তোমার কথা শুনব'।

কেট দ্বিধা করল, বলল, 'আপনি বসুন, আমি আসছি'।

খানিকটা সময় বাদে কেট ফিরল। ইতিমধ্যে সে চোখেমুখে জল দিয়ে নিজেকে সুস্থির করার চেষ্টা করেছে বোঝা গেল।

রাজু বলল, 'বাহ্, এই তো আমাদের পুরনো কেট। একটু পিয়ানো বাজাও, মন ভালো করে বাড়ি যাই'।

'রাজকুমার, আপনি বাইসের গল্প শুনেছেন? তেমনি আর-একটি গল্প আমি আপনাকে বলব। প্রেমের গল্প, যা একটি ভদ্রলোককে একটি ভদ্রমহিলার হয়তো বলা উচিত নয়'।

রাজু বোধ করি সন্ধ্যাটাকে লঘু করার জন্যই বদ্ধপরিকর ছিল। সে বলল, 'ভদ্রমহিলারা প্রেমের গল্প আদৌ যদি বলেন তবে সেটা ভদ্রলোককেই বলা উচিত'।

কেট বলল, 'বাইসের কথা শুনেই আমার মনে হল গল্পটা আপনি তো জানেন, এ দেশে ইংরেজদের সমাজে সুন্দরী মহিলাদের অত্যন্ত চাহিদা আছে। কাজেই যার স্ত্রী সুন্দরী ও মধুরস্বভাবা সে স্বভাবতই সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান পায়। তেমনি এক পাদরি দম্পতির কথা বলছি। বিবাহের অল্পপরে ইংল্যান্ড থেকে এসে সহজেই সমাজে একটা উঁচু স্থান করে নিল তারা। পুরুষটি ছিল শান্তস্বভাব, মৃদুভাষী, ধর্মভীরু। লেখাপড়া নিয়েই থাকত। কিছুদিন পরে সেই দম্পতির বাড়িতে এক অতিথি এল। লোকটির আত্মীয়স্বজনের ধারণা ছিল সে আর বেঁচে নেই। কিন্তু দূরপ্রাচ্যে, চীনদেশে তলোয়ার-বন্দুক সম্বল করে সে ঘুরে বেড়াত। তাকে দেখে পাদরি-দম্পতির আর আনন্দ ধরে না। তারা দেশে খবর দিল, হারানো মানুষ পাওয়া গেছে। পাদরি তার ধর্মপ্রচারে দূর-দূর দেশে ঘুরে বেড়ায় আর তার কমলালেবুর বাগানে-ঘেরা বাংলোতে সুখে দিন কাটায় সেই হারানো-মানুষ পাদরি-স্ত্রীর মনোরম সাহচর্যে। এখানে আপনার জেনে রাখা উচিত রাজকুমার, সেই মানুষটি পাদরি-জায়ার মামাতো ভাই-ই নয় শুধু প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকও বটে'।

কেট থেমে থেমে বলে গল্পটার প্রথম পর্ব শেষ করল।

রাজচন্দ্র বলল, 'তোমার গল্প নরনারীর সম্বন্ধের যেদিকে যাচ্ছে তার উত্তর দিতে আমি কি পারব, কেট'?

'আপনি না-পারলে চলছে না রাজকুমার, কোনো একজনকে জিজ্ঞেস না-করে প্রশ্নটার সমাধান করতে পারছি না'।

কেট তার গল্প শুরু করল, 'প্রায় ছ'মাস পরে স্বামীটি বলল, ঘুরে এসো কিছুদিন দেশ থেকে। স্বাস্থ্যটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। লোকটি আবার প্রায় এক বৎসরের জন্য উধাও হয়ে গেল। হয়তো সে তার নিজের দুর্বলতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যই পালিয়েছিল। এক বৎসর পর স্বামীটি আবার তাকে আবিষ্কার করল একটি কুৎসিত জায়গা থেকে। হলুদ রঙের একটি কঙ্কাল সে তখন। আবার তাকে বাড়ি নিয়ে এল। স্ত্রীটি ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল। সে তখন মা হয়েছে। কিন্তু আত্মীয় যে, তাকে কি ত্যাগ করা যায়। স্বামীটি তাকে সেবা করে সারিয়ে তুলল। আর তার চাইতে বড় কথা, অনিচ্ছুক স্ত্রীকে উপদেশ দিয়ে ঘৃণা জয় করতে সাহায্য করল, উপদেশ দিল ঘৃণিতকে সাহচর্য দিতে'।

'তারপর'?

'তারপর, মনে করুন, সেই হারানো মানুষটির নাম লী হাউস। আফিম ছাড়ল সে পাদরি-জায়ার সঙ্গ পেয়ে, আর আফিমে যা চাপা ছিল সে আবাল্য ব্যর্থ কামনা দুঃসহ হয়ে প্রকাশ পেল। একদিন হারানো লী হাউসের সঙ্গে মহিলাটি দেশে চলে গেল'।

'সেই মেয়েটিকে ফেলে! এই কুৎসিত ঘেঁটে লাভ কী, কেট।'

কেটের চোখ দুটি চকচক করে উঠল। সে বলল, 'রাজকুমার, প্রেমের জাতি নেই, তার সময়-অসময়ও নেই। নতুবা আমিই-বা বাগচীকে ভালোবাসব কেন? বিবাহহীন প্রেম কুৎসিত, না প্রেমহীন বিবাহ কদর্য, এ আমার প্রশ্ন নয়। আমি শুধু ভাবছিলাম পিয়েত্রো জোর করল না, সহ্য করল, ঠকল, সে-ই বড়, না, আমার গল্পের সেই হারানো মানুষটি যে একটি বিবাহ ব্যবস্থা চূর্ণ করে প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করল'?

'প্রেমেরই প্রতিষ্ঠা কি'?

'নতুবা গল্পের স্বামীটি ঘটনাটিকে স্বীকার করে নিত না, তাই নয়'?

'ঘৃণাও হতে পারে, ক্ষমাও হতে পারে'।

'সেইটি আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, সেটা ঘৃণা, না ক্ষমা'?

'হার স্বীকারই যদি হয়!'

'তাহলে প্রেমের প্রতিষ্ঠা আপনি স্বীকার করছেন? স্বামীটি কি বুঝতে পেরেছিল তার বিবাহ ও প্রাক্‌বিবাহের আলাপের চাইতে অন্য পক্ষের আবাল্য প্রেম অনেক বেশি ক্ষমতাশালী ছিল? সেক্ষেত্রে অক্ষমের বিদ্বেষ থাকাও কি উচিত ছিল না'?

রাজু একটু চিন্তা করল। তারপর হেসে বলল, 'কেট, এটাকে আমি একটা জটিল গল্প বলে মেনে নিলাম। আপাতত তুমি তিনটি চরিত্রের কথা বলেছ, এক—পিয়েত্রো, দুই—সেই হারানো মানুষটি, তিন—সেই ধর্মপ্রচারক স্বামী। যদিও আমি স্বীকার করতে বাধ্য, আমার গবেষণা তোমার কাছে অর্থহীন হতে পারে। যদি আমাদের সমাজের কথা বলো তাহলে সেই হারানো লোকটিকে শুধু কুৎসিততম বিশেষণেই অভিহিত করা হবে না, সমাজে সে পীড়িতও হবে, যদি অবশ্য সমাজের তুলনায় সে বলশালী না-হয়। এটা কলঙ্ক ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু কেট, পাদরিটি সম্ভবত নির্লিপ্ত পুরুষ। এ রকম চরিত্রকে কাপুরুষ না-বলে মহাপুরুষ বলা যায় যদি সে সেই হতভাগ্য লী হাউস ও তার স্খলিতা স্ত্রীকে ক্ষমাই করে থাকে'।

'রাজকুমার!'

রাজচন্দ্র কেটের কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনে অবাক হল, কিন্তু বলল, 'তিনটি চরিত্রের মধ্যে পাদরিকেই মহত্তম বোধ হচ্ছে। বাগচীর কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হয় পাদরি আদর্শ খ্রিস্টান। পিয়েত্রোর কথা—

তার আদর্শ বোধ হয় অন্য রকম'।

রাজু কথাগুলি বলেছিল ভেবে-ভেবে, চোখ তুলে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। রাজুর মনে হল কেট মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাবে, সে যে টলছে তা বোঝা গেল। রাজু সরে গিয়ে তার একখানা হাত ধরতেই কেট ভেঙে পড়ল। এদিকে-ওদিকে চাইতে চাইতে সোফাটা চোখে পড়তেই রাজু ধীরে ধীরে কেটকে তার উপরে শুইয়ে দিল। তারপর কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল ঘরের মাঝখানে।

এমন সময়ে বাগচী ফিরে এল।

রাজু বলল, 'মাস্টারমশাই, কেট মূর্ছিত হয়ে পড়েছে'।

'কতক্ষণ? আমি যাবার পরেই নাকি'?

'না, এইমাত্র'।

বাগচী কেটের পাশে জানু পেতে বসল, কিন্তু তার সেবায় অগ্রসর হবার আগেই কেট উঠে বসল। রাজুকে ও বাগচীকে সেই অবস্থায় দেখে কেট লজ্জায় অধোবদন হল।

বাগচী হাততালি দিয়ে হেসে উঠল।

'কী ভয় পাইয়ে দিলে কেট! ভারি একটা আনন্দের খবর বয়ে এনেছি'।

কেট ক্লান্ত স্বরে বলল, 'একটু থামো ডার্লিং। রাজকুমার, অনেক রাত হল, এবার আপনি যান। কাল যদি অনুগ্রহ করে একবার আসেন আমি গল্পের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব'।

রাজু আর একমুহূর্তও দাঁড়াল না।

বাগচী বলল, 'কেট, সুইটি, আমাদের দেওয়ানজিকে আজ চিনতে পারলাম। ঈশ্বরে তাঁর ঘোরতর অবিশ্বাস। অথচ দ্যাখো, আমরা ভাবতাম তিনি ব্রাহ্ম। এদ্দিকে ঈশ্বরে যাঁর এত অবিশ্বাস তিনি কী বলেন জানো'?

কেট স্বপ্নচালিতের মতো বলল, 'কী বললেন'?

'বললেন—শিক্ষার অঙ্গ ধর্মশিক্ষাও বটে। ঈশ্বরের কথা ছাত্রদের কাছে বলা দরকার, তারা অত্যন্ত স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ ভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার চেষ্টা করুক। আপনারা বিশ্বাস অবিশ্বাস কোনোটিই তাদের মনের উপরে চাপিয়ে দেবেন না। যদি তারা বড় হয়ে ঈশ্বরবিশ্বাসী হয় ভালো, ঈশ্বরে যদি তাদের কিছুমাত্র বিশ্বাস না-থাকে তাও মন্দ নয়। এই প্রস্তাব। তারপর বললেন—আপনি ছাত্রদের নিয়ে সমবেতভাবে ঈশ্বর-আলোচনা করুন, প্রার্থনা করুন, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট দিন বা সময় স্থির করবেন না। ব্যাপারটি যেন ছেলেদের কাছে মধুর থাকে, আলোচনাগুলি যেন তাদের চিত্তহারী হয়'।

কেট বলল, 'ভালো'।

'আমি ভাবছি স্কুলের হলঘরে কাচ বসানো দু-চার দিনে শেষ হলে সেখানেই ছাত্রদের নিয়ে বসব। প্রথম প্রার্থনায় দেওয়ানজি থাকবেন। তোমরাও থেকো'।

কেট বলল, 'চলো, তোমাকে খেতে দিই গে, রাত হয়েছে'।

পথে বেরিয়ে রাজু এইরকম চিন্তা করল : কেট তাকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলল। এর কী কারণ হতে পারে? তারও আগে বাগচীকে থামতে অনুরোধ করেছিল। বাগচী যে-আনন্দের খবরটা বয়ে এনেছিল সেটা যেন তার কাছ থেকে আড়াল করাই উদ্দেশ্য ছিল কেটের।

একজন অনাত্মীয় যুবক ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে আর নিজের স্ত্রী মূর্ছিতা—এ অবস্থায় মানুষের মনের অবস্থা কী রকম হয় সেটা অনুভব করা শক্ত। বাগচীরও অত্যন্ত দুশ্চিন্তা হয়েছিল, তার প্রমাণ তার মুখের চেহারা। মূর্ছা ভঙ্গ হলে সে হাততালি দিয়ে হেসে উঠেছিল। এটাও তার মনের অভিভূত অবস্থারই সূচনা করে। কিন্তু এ অবস্থায় কোনো স্বামীর পক্ষে আনন্দের খবর ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক,

সেটা প্রকাশ করতে যাওয়া বিসদৃশ বইকি।

কেট কি এটা বুঝতে পেরেছিল? এই বৈসাদৃশ্য? এবং সেজন্যই তাকে তাড়াতাড়ি স্থান ত্যাগ করতে অনুরোধ করেছিল? স্বামীর এই বিসদৃশ ব্যবহার বাইরের লোকের কাছে গোপন করতে চেয়েছিল সে?

যতক্ষণ না অন্য মানুষের কোলাহল সূচনা করল যে সে রাজবাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে, ততক্ষণ রাজু কেটের গল্পটির কথা চিন্তা করল। প্রেমের শক্তি, প্রেমের মহত্ত্ব ইত্যাদি ব্যাপার সে চিন্তা করল না। তার মনে হতে লাগল, ওই গল্পটি কেটের জীবনের সঙ্গে কোনো-এক দিক দিয়ে সংশ্লিষ্ট।

২৫

বাগচী তার প্রার্থনা-সভার ব্যবস্থা করে ফেলল। প্রস্তাবটা হরদয়ালের। সে ছাত্রদেব বলে দিল, আগামী শনিবার সকালে তারা যেন সকলে একসঙ্গে নতুন হলঘরটায় সমবেত হয়। সেখানে ভগবানের নাম করা হবে। গ্রামের দু-দশজন ভদ্রলোককেও সে নিমন্ত্রণ কবল। বাজুকে করজোরে বলল, 'রাজকুমার, আপনি অবশ্য-অবশ্য থাকবেন'। এমনকী স্কুলের একটি ছেলেকে সঙ্গে করে বাগচী নয়নতাবাব বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল নিমন্ত্রণ করতে।

বাগচী হরদয়ালকে বলল, 'হলঘরটার দ্বারোদঘাটন হয়নি, দেওয়ানজি। আপনি দ্বারোদঘাটন কবলে তারপর আমরা প্রার্থনা-সভার আয়োজন করব'।

'না-না, সেসব করবেন না। দরজার চাবি থাকবে স্কুলের মালির কাছে। বোজকাব মতো সে-ই ঘর খুলে দেবে। তবে যদি প্রার্থনা-সভা সাজানোর প্রয়োজন থাকে, বলুন, আমি লোক দিচ্ছি'।

'কিন্তু দেওয়ানজি, এমন হলঘর, এটাই একটা ইনস্টিটিউশন। সেদিক দিয়ে এঁর একটা দ্বাবোদঘাটন উৎসব করা...'

দেওয়ান হেসে বলল, 'সে আমার ভারি লজ্জা করবে। তার কোনো দরকার নেই। আপনি দাঁড়ান, আমি লোক দিচ্ছি'।

রাজবাড়ির উৎসব ইত্যাদির ব্যাপারে যে কর্মচাবীরা গৃহসজ্জার ভার নেয় তাদের দুজনকে দেওয়ান বাগচীর সঙ্গে দিয়েছিল।

শুক্রবার অনেক রাত্রি পর্যন্ত তারা দুজনে হলঘরটা বাগচীর তত্ত্বাবধানে সাজাল। হলের একপাশে একটি জলচৌকি পাতা হয়েছে। ছাত্রদের জন্য মেঝে-জোড়া জাজিম পাতা। অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের জন্য জাজিমের চারদিকে কিছু চেয়ার। বলা বাহুল্য, এগুলো সবই দেওয়ান-ভবন থেকে আসছে। অন্যান্য গৃহসজ্জার ব্যাপারে লোক দুটিকে স্বাধীনতা দিয়েছিল বাগচী। তারা চাঁদমালায়, পুষ্পস্তবকে হলঘরটি সুসজ্জিত করেছে। শনিবার দিন সকাল হতেই কৌতূহলী ছেলেরা এসে হলঘর জুড়ে বসল। ফুলদার জাজিম নিমেষে তাদের ধূলিভরা খালি পায়ের ছাপে মলিন হয়ে গেল। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদেব মধ্যে অধিকাংশই দ্বিধা করতে লাগল। কিন্তু তাদের মধ্যে রাজসরকারের কর্মচারীরা জানত দেওয়ানজি সকলকে অভ্যর্থনা করার জন্য দরজায় থাকবেন। তারা এক-এক করে সকলেই হলঘরের দিকে রওনা হল। তাদের দেখাদেখি এবং দেওয়ানজি অভ্যর্থনা করার জন্য থাকবেন একথা শুনে অন্যান্য নিমন্ত্রিত ভদ্রব্যক্তি, এমনকী দেওয়ানজির সান্নিধ্য-প্রয়াসী অনিমন্ত্রিত দু'একজনও সভায় উপস্থিত হল।

কেট বাগচীর সঙ্গে-সঙ্গেই সভায় ঢুকছিল, কিন্তু এ-সভায় সে-ই একমাত্র স্ত্রীলোক, এটা তাকে অস্বস্তি দিতে লাগল, বিশেষ করে শিশুদের সঙ্গে-সঙ্গে বয়স্কদের কৌতূহলী দৃষ্টি তাকে বিব্রত করে তুলল। এমন সময় সে দেখল রাজকুমারের সঙ্গে নয়নতারা প্রবেশ করছে। লাল মসলিনের অপূর্বতা ছিল নয়নতারার, মাথায় অদৃষ্টপূর্ব অবগুণ্ঠন ছিল, নয়নতারার চোখ দুটি কিছু-বা ব্রীড়াবনত। দূরের দুখানা

চেয়ারে রাজকুমার ও নয়নতারা বসলে কেটও সেদিকে এগিয়ে গেল। রাজকুমার উঠে দাঁড়িয়ে কেটের জন্য একখানা চেয়ার টেনে নিজেদের আসনের দিকে এনে দিল। কেট রাজকুমারের অপর পার্শ্বে বসল।

প্রার্থনা-সভার কাজ আরম্ভ হল। বাগচী প্রার্থনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রারম্ভিক একটা ভাষণ দিল। সে বলল, 'ঈশ্বর আমাদের দর্শন দেবেন কিনা জানি না, প্রার্থনা পূর্ণ করেন কিনা এ বিষয়ে কারো-কারো সন্দেহ আছে, কিন্তু প্রার্থনা শান্তি দেয়, প্রার্থনা মনকে স্থির করে, এবং সেই শান্তি ও স্থিরতায় মানুষ তাঁর হৃদয় ও মনকে অসম্ভব শক্তিশালী করতে পারে'।

এই ভাষণটি প্রায় আধঘণ্টা ধরে নানা গ্রন্থ ও ধর্মশাস্ত্র থেকে উদাহরণ উদ্ধৃত করে বাগচী উপস্থাপিত করল। তার কণ্ঠ ভালো, তার বলবার ভঙ্গিটি আড়ম্বরহীন, এবং শব্দগঠন সম্বন্ধে তার রুচি ইংরেজদের মতো। ছোট কথায় গভীর ভাব প্রকাশের চেষ্টা ছিল।

বাগচী থামলে রাজু নয়নতারাকে মৃদুস্বরে বলল, 'তোমাদের ন্যায়দর্শন কী বলে, নয়ন'?

নয়নতারা মৃদু হেসে মৃদুতর গলায় বলল, 'এগুলি সাংখ্য-ন্যায়ের ব্যাপার নয়। ভক্তিযোগের কথা'।

'কিন্তু রাধা-হীন লক্ষ্য করো'। বলে রাজু গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করল।

তারপর প্রার্থনা শুরু হল। জলচৌকিটায় বসে বাগচী বলল, 'এবার আমরা প্রার্থনা করব। নিজের জন্য ভগবানের কৃপা চাইবার পর আমরা অসুস্থ পিয়েত্রোর জন্য প্রার্থনা করব। আমরা শুনেছি চরণদাসের শিশুটি অসুস্থ, তার জন্যও প্রার্থনা করব'।

এমন সময় ছোট একটা ঘটনা ঘটল। জাজিমে বসা স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে থেকে রোগাটে মলিন চেহারার একটি ছোট ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'মাস্টারমশাই, আমার বাবার জন্য প্রার্থনা করবেন'।

কৈলাস পণ্ডিত হাঁ-হাঁ করে এই বদ ছেলেটিকে শাসন করতে যাচ্ছিলেন। কি বিপদ, দেওয়ান রাজকুমার প্রভৃতির সম্মুখে এ কী বেয়াদবি!

বাগচী তার আসন থেকে নেমে এসে বলল, 'কী হয়েছে তোমার বাবার'?

ছেলেটি নীরবে কাঁদতে শুরু করল। বলল, 'বাবা বুজরুক আলির সঙ্গে কোথায় গেছে জানি না। মা দিনরাত কাঁদেন। মা জানেন কিন্তু বলেন না'।

'নিশ্চয় প্রার্থনা করব বাবা, তাঁর জন্যই সর্বাগ্রে প্রার্থনা করব আমরা। বোসো তুমি। তুমিও প্রার্থনা করো'।

ঈশ্বরের অসীম করুণা বর্ণনা করে বাগচী তাঁর কাছে নিজেদের অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইল। নিজেদের বুদ্ধি ও কর্তব্যজ্ঞানের স্বল্পতা ইত্যাদির উল্লেখ করল। তারপর হলঘরের অপার নৈস্তব্ধ্যের মধ্যে সে ধীরে-ধীরে বলতে শুরু করল, 'যারা তীর্থযাত্রা করেছে, যারা কর্তব্যের জন্য বিদেশে গিয়েছে, তুমি পথের ধূলায় তাদের সঙ্গে থেকো। তোমার বটগাছগুলি যেমন গ্রীষ্মে সুশীতলশীতের সুখদায়করূপে উষ্ণ, হে ঈশ্বর, তেমনি স্নেহ দিয়ে তুমি পথযাত্রীদের সঙ্গী হও। হে পিতঃ, সমুদ্রের পরিশ্রান্ত নাবিক তোমার করুণা অনুভব করুক। হে ঈশ্বর, রোগীদের, শোকগ্রস্তদের তুমি শান্তি দাও'।

বাগচীর চোখ থেকে দু-তিন ফোঁটা জল তার গালে গড়িয়ে আসতেই সে সহসা প্রার্থনা বন্ধ করল। রুমাল বার করে চোখ দুটো মুছে ফেলল।

তার কিছু দূরে একটি অল্পবয়সী মেয়ে বসে ছিল। তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'শঙ্খ বাজাও চারু। আজ উপাসনা শেষ হল'।

চারুকে গ্রামের অনেকেই চিনত। কৈলাস পণ্ডিতের গেছো-মেয়ে। চারু শঙ্খ বাজাল। বাগচী জলচৌকি থেকে নেমে এল। সভাস্থ ছেলেরা কৈলাস পণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে স্কুলের আটচালার দিকে ছুটল। সেখানে তাদের সামান্য জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরাও ধীরে-ধীরে সকলে চলে গেলেন। দেওয়ান একটি লজ্জিত মেয়ের মতো বসে ছিল। সে কখন চলে গেছে কারো চোখে পড়েনি। ভিড় কমার অপেক্ষায় নয়নতারা ও রাজু তখনও বসে ছিল, কেট তাদের সামনে দাঁড়িয়ে কথা

বলছিল।

বাগচী সেখানে এল, লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমার একটা চশমা নেওয়া দরকার রাজকুমার, আলো লেগে চোখ দিয়ে জল পড়ে'।

নয়নতারা মৃদু হেসে বলল, 'এটা কি সত্যভাষণ পাদরির পক্ষে'?

'না-না, বিশ্বাস করুন, চোখ দিয়ে জল পড়তেই ভয় হল, চক্ষুরোগীদের কথা মনে হল'।

কেট বিপর্যস্ত বাগচীকে বাঁচাল। সে বলল, 'কৈলাস পণ্ডিতের গলা শুনছ! সে নিশ্চয় বেত হাতে চেঁচাচ্ছে, ছেলেরা মানছে না। ওদিকে চলো'।

'তা বটে, তা বটে। রাজকুমার, আমি চলি'।

কেট নয়নতারার অনুকরণে ক্ষুদ্র একটা নমস্কার করে চলে গেল বাগচীর সঙ্গে।

হলঘর থেকে বেরুতে-বেরুতে রাজু বলল, 'অদ্ভুত লোক বাগচী'।

নয়নতারা বলল, 'ভদ্রলোক কি সত্যি বিশ্বাস করেন না ঈশ্বরের করুণার উপলব্ধিতে ওঁর চোখে জল আসছিল'।

রাজু সহসা উত্তর দিল না।

দরজার গোড়ায় দুজনে যাবার মতো পালকি ও ষোলোজন বেহারা দাঁড়িয়ে ছিল।

পালকিতে উঠতে-উঠতে বলল নয়নতারা, 'এবারও তুমি আসবে নাকি'?

'বলো, এই রোদে হেঁটে যাই'।

'এসো তাহলে। কিন্তু এতটা কি ভালো হচ্ছে'?

'পাশাপাশি এতক্ষণ বসে রইলাম, কেউ তো তিরস্কার করেনি'। রাজু হাসতে হাসতে বলল।

প্রার্থনা-সভার খ্যাতি অনেক দূর ছড়াল।

নদীর ঘাটে মেয়েরা একদিন দুর্দান্ত চারুকে বলল, 'হ্যাঁ রে চারু, তোরা নাকি খেস্টান হয়ে গেছিস'?

'হয়েছি তো'।

'আর কে-কে হলি'?

'কেন, দেওয়ানজি, রাজকুমার, নয়ন ঠাকরুন—সকলেই'।

মেয়েরা প্রতিবাদ আশা করেছিল, তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। চারুর ব্যঙ্গ বড় ধারালো।

ততক্ষণে চারু পুরুষদের ঘাটের দিকে সাঁতরাতে শুরু করেছে।

বাড়ি ফিরে রাজুর সেই ছোট ছেলেটির কথা মনে পড়ল। নয়নতারা যতক্ষণ সঙ্গে ছিল, বিষাদের স্থান ছিল না কোথাও। বরং একরকমের প্রফুল্লতা—যে মন নিয়ে বাগচীর প্রার্থনার ব্যাপারটাকে লঘু করে দেখা যায়। বাগচীকে না-হোক, তার প্রার্থনার খ্রিস্টানি রীতিকে। এখন বুজরুক আলির কথা মনে হল, গোবর্ধনের কথা মনে হল। এই দুপুরের রোদে তারা হয়তো অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় মৃত্যুর দিকে ছুটে চলেছে। তাদের জন্য আশঙ্কা আছে মনে কিন্তু তাদের মঙ্গলের জন্যই সে আশঙ্কা লুকিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। প্রার্থনা জাতীয় একটা আকুলতা মনে এল রাজুর।

কী করে খবর পাওয়া যায়? একদিন দেওয়ানজি কাছারিতে আলোচনা করছিল, সে শুনতে পেয়েছে। একখানি ইংরেজি কাগজ পড়ে সে শুনিয়েছে কাছারির কর্মচারীদের। সে কাগজ নাকি খুব বড় একজন দেশপ্রেমিক হরিশ না কার লেখা। তাতে নাকি সিপাহি বিদ্রোহকে ধিক্কৃত করা হয়েছে। সিপাহিবিদ্রোহ নাকি তাদের মতে স্বার্থসম্পন্ন কতকগুলি লোকের কারসাজি। বিধবা-বিবাহ, সতীদাহ নিবারণ ইত্যাদি সমাজ উন্নয়নের পরিকল্পনাগুলিকে জনসাধারণের চোখের সম্মুখে বিকৃত করে দেখানোই বিদ্রোহীদের স্বার্থসাধনের উপায়।

রাজু একটা বিদ্বেষ অনুভব করল দেওয়ান এবং তার কাগজওয়ালাদের প্রতি। ঘৃণাও।

'তুমি কখনও তোমার দেশে ঘুরে বেড়িয়েছ কেট'?

'খুব একটা সুযোগ ছিল না। আমি যে স্কুলে পড়তাম সেটা গরিব অনাথদের। শুধু মিশনারিদের পরিচালিত বলে আমরা না-খেয়ে মরিনি। অন্য সব শখ ও আনন্দকে তারা যথাবিহিত চেপে দিত। আমার সেসব দিনের আনন্দের মধ্যে একমাত্র আনন্দ ছিল বাবার চিঠি পাওয়া'।

'তোমার অতি শৈশবে তাহলে তোমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে'?

'আমি তাঁকে জ্ঞান হয়ে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আমাদের সেই কনভেন্টে মাঝে-মাঝে একজন যেত। সে বলত, সে নাকি আমার ধর্ম-মা। বহুদিন পর্যন্ত তাকেই আমার মা বলে মনে করতাম। অভিমান করে তাকে এমনও বলেছি—অন্য সব মেয়ে ছুটিতে বাড়ি যায়, তুমি আমাকে কেন নিয়ে যাও না? সে সবসময়ে কথাটা ঘুরিয়ে নিত'।

'তারপর বুঝি এদেশে এলে'?

'সেও প্রায় পালিয়ে। আমার তখন বছর পনেরো-ষোলো বয়েস হবে। শুনলাম, তারপরই আমাকে নান্ করবার চেষ্টা হচ্ছে। আমার বাবাও নাকি তাতেই মত দিয়েছেন। খ্রিস্টান সন্ন্যাসিনীকে নান্ বলে। নান্দের আর-সবই ভালো, কিন্তু পুরুষদের সঙ্গে দেখা হবার উপায় নেই। অথচ (দুষ্টু মেয়ের মতো হাসল কেট) পুরুষ ছাড়া একদণ্ড আমার চলে না। দেশে যাবার আগে আমার বাবা, আমার ঘোড়া, আমার কুকুর, এদেশের ছোট ছোট নোংরা পোশাক পরা সহিসের ছেলে, সবাই পুরুষ সাথি ছিল আমার। নান্দের পুরুষবর্জিত পৃথিবীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আমি পালিয়ে এলাম এক জাহাজের অল্পবয়সী সেকেন্ড অফিসারের সহায়তায়'।

'তারপর'?

'তাই বলছিলাম,' কথার ধারা পালটে দিল কেট, 'পুরনো জিনিস দেখবার শখ আমার মেটেনি। অনেকদিন বসে বসে আপনাদের প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে থাকি, ভাবি, না-জানি ওর ভেতরের ঘরগুলি কী রকম। কত অদ্ভুত রুচি ছিল আগেকার দিনে'।

'এটা আমার নতুন বাড়ি। পুরনো বাড়ি এখন জঙ্গলে ঢাকা'।

'বাড়িঘর আছে, না সব ঢেকে গেছে? দেখা যায়'?

'আচ্ছা, আমি বাগচীকে বলব, যদি সে তোমাকে যেতে দেয়'।

'রাজকুমার, যদি যাই তবে বাগচীকে বলে যাব না। সে যাওয়ায় কোনো সুখ নেই। রুটিনমাফিক চলাই যদি চলব তবে বর্তমান কী দোষ করল'?

'তাহলে তুমি অতীত কিংবা ভবিষ্যতে যেতে চাও'? রাজু হেসে প্রশ্ন করে পিয়ানোর ডালাটা বন্ধ করে দিল।

'ভবিষ্যতে যেতে পারি না, তাই অতীতে যেতে চাই'।

কথাটা এইভাবে উঠেছিল। কয়েকদিন পরে পিয়েত্রোর বাড়ির দিকে যেতে-যেতে কথায়-কথায় রাজু বাগচীকে বলল।

'হয়তো আমার সঙ্গে আর-কোনো স্ত্রীলোক নাও থাকতে পারে'।

বাগচী বলল, 'কেন, কেটই তো থাকছে, আবার স্ত্রীলোক দিয়ে কী হবে!

কিন্তু আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার কী হবে? আপনি তো কেটের হাতে খান না'।

'সে যা হয় হবে'।

রাজু ভাবল, আশ্চর্য নিরুত্তাপ।

আবার বলল রাজু, 'কিন্তু আপনি যে জানেন, আপনি যে অনুমতি দিচ্ছেন, এ কথা কিন্তু কেটকে

বলতে পারবে না। সে জিজ্ঞেস করলেও না'।

'তাই হবে'।

কেট ভাবতেও পারেনি কল্পনা সত্য হতে পারে যখন রাজু একদিন সকালে এসে বলল, 'চলো কেট, বেড়িয়ে আসি ; আমাদের পুরনো গড় দেখতে চেয়েছিলে...'

'সত্যি'?

'হ্যাঁ, প্রস্তুত হয়ে এসো। মেলা জবড়জং পোশাক পরো না। বনজঙ্গলের পথ, কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হবে'।

কেট রাজুর পোশাকটা দেখল। য়ুরোপীয় পোশাকে তাকে লম্বা দেখাচ্ছে। তাদের দেশের সেই কনভেন্টের প্রাচীরের পাশ দিয়ে যারা হৈ-রৈ করে চলত সেইসব আন্ডার গ্র্যাজুয়েটদের কেউ যেন।

কেট প্রস্তুত হয়ে এল। সবজে রঙের পেটিকোটের উপরে গাঢ় সবুজ জ্যাকেট।

হাতি দাঁড়িয়ে ছিল দরজায়, কেট হাতিতে চাপল।

'ভয় পাবে না তো'?

কেট মুখ নিচু করে বলল, 'ভয়-ভয় করছে'।

'দাঁড়াও, আমি আসি'।

গ্রামের লোকরা অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে অবাক হল। দু একজন বলল, 'আমাদের রাজকুমারকে একেবারে সাহেবের মতো দেখায়'।

যেখানে গ্রামের বাড়িগুলি কম হয়ে এল, কেট বলল, 'নয়নতাবা আসবেন না'?

রাজু বলল, 'নয়নের এসব শখ নেই'।

গ্রামের সীমানা পার হয়ে ছোট একটা খাল পাওয়া গেল। জল নেই, শুকিয়ে খটখট করছে। হাতিটা এপার থেকে ওপারে উঠল। ঝাঁকুনিতে ভয় পেয়ে কেট প্রায় কেঁদে ফেলেছিল, আসনচ্যুত হয়ে সে হাওদার রেলিঙের উপরে পড়ে যাচ্ছিল, রাজু হাত বাড়িয়ে তাকে ধরে ফেলল।

লজ্জায় লাল হয়ে কেট ক্ষমা চাইল ; বলল, 'আপনাদের দেশেব মেয়েরা বোধ হয় এমন ছিটকে যায় না'।

'তারাও যায়। তোমাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল। এটা ছিল পরিখা'।

পরিখা কাকে বলে তা কেটকে বুঝিয়ে দিল রাজু। কেট বিষয়টি কল্পনা করার চেষ্টা করতে লাগল।

আরো কিছুদূর গিয়ে কয়েকটি পর্ণকুটির চোখে পড়ল। হাতি দাঁড়াল সেখানে। মাহুত রাজুর সম্মতি নিয়ে হাতিকে বসাল, হাওদার গায়ে মই লাগিয়ে দিল। রাজুর হাত ধরে ধরে কেট নামল।

'এটা তো বন'।

রাজু হেসে বলল, 'ভয় পাচ্ছ না তো? এটা বাগান ছিল এককালে। এখনও বাগানই আছে। পুরনো, বহু পুরনো আমগাছ এসব। এই ঘরগুলোতে ফলের সময়ে পাহারাদাররা থাকে'।

'আমরা কোন দিকে যাব'?

'এখান থেকে এক মাইল পথ হবে। হেঁটে যেতে পারবে'?

'খুব পারব'।

'চলো তাহলে'।

মাহুতকে ফেরা না-পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলে রাজু অগ্রসর হল।

কিছুদূর গিয়ে রাজু বলল, 'এরকম অবস্থায় কখনও পড়েছ—কাছের লোকটিও সিকি মাইল দূরে। তাছাড়া সেই-বা আছে এমন প্রমাণ কী'?

কেট ভয় পেয়ে রাজুর দিকে এগিয়ে এল। বলল, 'এ বনে টাইগার নেই'?

'আছে বলে জানি না। চিতল হরিণের চাইতে বড় প্রাণী বোধ হয় নেই'।

'নেই টাইগার, এ কথা বলতে পারছেন না কেন? অন্য বন থেকে কি এ-বনে তারা ঢুকতে পারে না'?

রাজু হাসতে হাসতে বলল, 'তারা কি রাজশাসন মানে না মনে করেছ? ওগুলো কী ডাকছে বলো তো'?

'পাখি'?

'তাই। ঠিক যেন মনে হয়, হেঁড়ে-গলায় কথা বলছে ডানকানের মতো'।

একসময়ে কেট বলল, 'রাজকুমার, পায়ের নিচে ইটের টুকরো বলে মনে হচ্ছে'।

'হতে পারে। হয়তো কোনো চবুতরা ছিল'।

'আপনার এক মাইল যে শেষ হয় না'।

'তোমার নান্ হওয়াই উচিত ছিল কেট'।

রাজু আর-খানিকটা পথ গিয়ে বলল, 'তুমি ছুটতে পাবো কেট? ধরো যদি তোমার সেই সাধের টাইগার আসে'?

'টাইগার আমাব সাধেব নয। কিন্তু ভারি একটা সুন্দর দৃশ্য মনে পড়ে গেল। একটা কবিতা। জামসিদের প্রাসাদের ভগ্নস্তূপে সিংহ শাবকদের নিয়ে বাস করছে!'

'কবিতাটা কী রকম কেট? আমি কখনও ইংরেজি কবিতা শুনিনি। তুমি আবৃত্তি করতে পারো'?

কেট ইতস্তত করতে লাগল।

বাজু বলল, 'এখানে আমরা দুজন, লজ্জা কী'?

কেট নিচু গলা দু-তিনটি চরণ আবৃত্তি করল।

বাজু গম্ভীর মুখে শুনল, তারপর বলল, 'অর্থবোধ হল না। কী অর্থ'?

কেট বলল, 'এই গাছের ছায়ায় এক টুকরো রুটি, এক পাত্র মদ আর তুমি পাশে আছ; এই বন এখন স্বর্গ'।

রাজু অনুভব করল, তাবপর তার চোখ দুটি কোমল হাসিতে ভরে গেল, 'এ কী সাংঘাতিক কথা, কেট! এ কথা কি এখন আমাকে শোনাতে আছে'?

কিছুদূর চলে কেট বলল, 'রাজকুমার, আপনি আমাকে নিশ্চয় ক্ষমা করেছেন'।

'কী অপরাধ'?

কেট লজ্জিত হল ঘটনাটার পুনরুল্লেখ করতে, কিন্তু রাজুর দৃঢ় পদক্ষেপের ভঙ্গি থেকে দৃঢ়তা কুড়িয়ে নিয়ে বলল, 'সেদিনের সেই গল্প শুনবার পর আমার রুচি সম্বন্ধে আপনার অত্যন্ত হীন ধারণা হওয়াই সংগত'।

রাজু কেটের মনোভাব বুঝতে পারল না, সে বলল, 'তোমার বলায় দুঃসাহস ছিল, তুমি উত্তেজিত ছিলে কেট, কিন্তু কুরুচির কোথাও কিছু ছিল না'।

কেট নীরবে কিছুকাল অতিবাহিত করে বলল, 'অথচ ইংল্যান্ডের বাটলার শ্রেণীর লোকদেরও শালীনতা ওতে শিউরে ওঠে'।

কিছুদূরে গিয়ে রাস্তাটি ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে। রাস্তা নয় ঠিক, পায়ে চলার পথটি যেন সবুজে ঢাকা একটা ছোট পাহাড়ের অসমান গা বেয়ে-উঠছে। ছোট খাদ আছে, ছোট ছোট চূড়া আছে। দূর থেকে চোখে পড়ছে।

রাজু টুপিটা খুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'ও কী'?

'অনভ্যাস। গরম লাগছে'।

'তা বটে। গাছের ছায়া হলেও গরম'।

'পেছনে চেয়ে দ্যাখো, বুঝতে পারবে'।

'আমরা তাহলে এতক্ষণ উপরে উঠছিলাম'?

'হ্যাঁ, এবার নামব। অমরা গড়ের প্রাচীর পার হলাম। মাটির প্রাচীর ছিল। যদি তুমি আপত্তি না-করো, টাইটা আর কোটটা খুলি'।

'না, আপত্তি করব কেন'? কিন্তু অভ্যাসের ফলে ভিক্টোরিয়া যুগের শালীনতা কিছুটা আহত হল কেটের।

'একটু দাঁড়াও'। রাজু দাঁড়িয়ে কোটটা খুলল। টাই খুলল। টাইটা কোটের পকেটে পুরে টুপির মতোই একান্ত অনাদরে কোটটা পথের ঘাসে ফেলে দিল।

কেট বলল, 'আজ বুঝি অপচয় আপনাকে পেয়ে বসেছে'?

'হাতে করে পোশাকের বোঝা বইতে আমি নারাজ। ও কি তুমি যে আমাব দিকে চাইতে পারছ না!' রাজু শার্টের আস্তিন গুটিয়ে নিল।

কেট খানিকটা জোর করে রাজুর দিকে চাইল। তারপরে বলল, 'সামনে কোনো ইংরেজ মহিলা থাকলে আপনার নিন্দে করত'।

'তা করত। এবার শক্ত করে পা ফেলো মাটিতে। আমরা প্রাসাদে উঠতে আবম্ভ করেছি। তোমার সেই বর্তমানের গণ্ডির বাইরে পা দিচ্ছি আমরা। আমরা এখন অন্য লোক। পায়ের দিকে লক্ষ্য রেখো, খানা-খন্দে পড়ে যেয়ো না যেন। আর...'

'আর কী'?

'সাপের গায়ে যেন পা না-পড়ে'।

কেট শিউরে উঠল।

প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ ঘাসে ঢাকা। তার উপরে ছোট ছোট গাছও উঠেছে।

কেট বলল, 'দাঁড়ান, রাজকুমার'।

কেট পটপট করে তার জ্যাকেটের বোতামগুলো খুলে ফেলল। রাজুর অনুকরণ করে সেটাকে ফেলেও দিল মাটিতে।

সবজে একটা ফ্রক জাতীয় পোশাকে দাঁড়াল কেট। এর আগে আর-একদিন প্রায় অনুরূপ পরিচ্ছদে দেখেছে রাজু তাকে। কিন্তু সেদিন যেন এমন দেখায়নি কেটকে। কোমরে পরা কোমরবন্ধটির জন্যই আজ অন্যরকম দেখাচ্ছে সাব্যস্ত করল রাজু। মসৃণ বাহু, কাঁধের খানিকটা, খানিকটা পিঠ চোখে পড়ছে। রাজু জানত না, রোমান মহিলাদের অনেক ছবিতে এ-রকম ধরনের ঘরোয়া পোশাক দেখা যায়।

রাজু বলল, 'পরির নির্মোক ত্যাগে বিস্মিত হব এমন লোক নই আমি, কিন্তু জামাটি মাটি হল'।

'সঙ্গে রাজা আছেন, তুচ্ছ জামার মায়া কেন'?

কেট আর-একটু পরে বলল, 'রাজকুমার, হিদেনরা কি সবাই আপনার মতো সাহসী'?

'বাংলা বলতে বলতে চট করে ইংরেজি বোলো না। আমি বুঝি না'।

কেট বলল, 'আপনারা এতদূর অগ্রসর, এতদূর সাহসী, এ আমি কল্পনাও করতে পারিনি'।

'তুমি আমাকে অবাক করলে কেট। আমরা ভাবছি, তোমরা অগ্রসর, তোমরা সাহসী ; আমরা পিছিয়ে আছি ; আর তুমি বলছ তার উল্টো। তুমি কি হরিশের কাগজ পড়ো না'?

'হরিশ্চন্দ্র? কলকাতায় থাকবার সময়ে বাগচী তার কাগজের খুব প্রশংসা করত বটে। এখানে আসার পরে পড়িনি। কিন্তু রাজকুমার, এই যে আমরা দুজন চলছি, আপনি কি জানেন এরই জন্য আমাদের সমজে ধিক্কৃত হতে হতো—আমার জ্যাকেট নেই, আর আপনি শার্ট পরেছেন বলে'?

'তাই নাকি? তাহলে তো বিদ্রোহ করেছ তুমি'।

কেট কয়েক পা তাড়াতাড়ি চলে রাজকুমারের ডান হাতখানি ধরল ; বলল, 'রাজকুমার, মাঝে-

মাঝে মনে হয়, এমন বিদ্রোহ করি যে বহুদিন তা লোকের মনে থাকে। শুভ্র জীবন দেখে দেখে মনে হয়, ছিন্ন বিধ্বস্ত কলঙ্কিত হয়ে যাক জীবন'।

বর্ষার জল উঁচু থেকে গড়িয়ে পড়বার সময় বেশ বড় একটা ফাটল সৃষ্টি করেছে। রাজু বললে, 'আর এগোনো যাবে না। তুমি কি এটা পার হতে পারবে'?

কেট পেটিকোটটা দু-পাশ থেকে চেপে ধরে একটু উঁচু করে লাফিয়ে ফাটলটা পার হয়ে গেল। রাজুকে লাফাতে হল না, লম্বা পায়ে এপার থেকে ওপারে চলে এল।

'তুমি সাহসিকা কেট'।

আর কিছুদূর যাবার পর স্তূপটির প্রায় চূড়ায় পৌঁছল তারা। চূড়ার উপরে দুটি গাছ। গাছের থেকে একটু দূরে একটি সিঁড়ির দুটি থাক চোখে পড়ে। সর্বোচ্চ চূড়ার থেকে মহাশূন্যে উঠবার পথ দুটি গোড়ার ধাপ যেন। সিঁড়ি দুটি মার্বেল পাথরের। একটু হলদে হয়েছে রং, এবং শ্যাওলা পড়ে কালচে হয়েছে অনেকটা, তবু মার্বেল তো বোঝা যায়।

সেটির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে কেট বলল, 'রাজকুমার, প্রয়োজন হলে আপনি আমাকে কোলে করে ফাটলটা পার করে দিতে পারতেন না'?

'যদি তুমি অসুস্থ হয়ে পড়ো, কোলে করে বাড়ি পর্যন্তও যেতে হতে পারে। কিন্তু এ কথা কেন মনে হল'?

'আমাদের কনভেন্টের হিসেবে সেটা পাপ হতো, শয়তানের প্রলোভন হতো'। কেট আগে আগে যাচ্ছে, তার মাথার চুলগুলিতে আলো পড়ে সেগুলি চকচক করছে। পরিশ্রমে তাব গ্রীবার পাশে, কাঁধের উপরে, গলায় রক্তের আভা দেখা দিয়েছে। রাজুর মনে হল, মেয়েটি যেন আগুনের মতো জ্বলছে।

চূড়ায় উঠে গাছ দুটির ছায়ায় তারা বসতে পারল না। গাছের তলায় একটা কাঁটালতা বহুপুরুষ ধরে বংশবিস্তার করেছে ; জীবন্ত পুরুষটি যেমন সবুজ ও মসৃণ, মৃত পুরুষগুলির কঙ্কাল তেমনি খরধার।

চূড়ার উল্টোদিকে দিয়ে নেমে একটা পালিশ করা বড় টালির টুকরো পেয়ে কেট বসে পড়ল, জুতো খুলল।

রাজু চূড়ার গা বেয়ে নেমে গেল কয়েক পা। খানিকটা জায়গা পরিচ্ছন্ন ঘাসে ভরা, ফাটলহীন মসৃণ ঢালু জায়গাটায় বসে ক্রমশ লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল রাজু।

কেট বলল, 'আমার গা শিরশির করছে। গড়িয়ে পড়ে যাবেন। আপনি বরং এখানে আসুন। সূর্যের তাপ চূড়া পার হয়ে আসতে দেরি আছে'।

রাজু মুখ না-ঘুরিয়ে বলল, 'তুমি আজ একটা ঝগড়া না-করে বাড়ি ফিরবে না। কাছাকাছি বসে প্রকৃত ঝগড়া হয় না'।

কিছুক্ষণ কেট চুপ কবে বসে রইল, তারপর বলল, 'রাজকুমার, সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে জীবন কাটাতে চাওয়াকে কি আপনি ঝগড়া বলেন'?

'তা বলি না, গেছো-মেয়ে বলি, কখনও একবগ্‌গা বউ বলি'—বলে রাজু হাসল।

কথা থেমে গেল। রাজু বলল একটু পরে, 'কেট, তোমার একটু কষ্ট আছে। এ শুধু ভিক্টোরিয়া আমলের শাসনের বিরুদ্ধে নয়, এ-বিদ্রোহ এমন একটির বিরুদ্ধে যার কাছে তুমি অসহায়। নতুবা নিজেকে ছিন্ন বিধ্বস্ত করার সাধ কারো হয় না'।

কথাটা বলে খানিকটা সময় উত্তরের প্রতীক্ষা করল রাজু, তারপর মনে হল কেটের চোখ দুটি অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। রাজু মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে নিচের দিকে চেয়ে রইল।

সূর্য চূড়া ডিঙিয়ে এপারে আসতেই রাজু বলল, 'চলো কেট, ফিরি'। কেটও উঠে দাঁড়াল। তার মুখে কথা নেই। ঢালু দিয়ে ওঠার চাইতে নামা কঠিন। একবার কেটের পা একটু হড়কে গেল। রাজু কেটের হাত ধরল। তার মুখের দিকে চেয়ে দেখল, কেটের মুখখানা যেন অনেকটা স্নিগ্ধ হয়েছে।

রাজু বললে, 'কিছুই তো দেখা হল না'।

'হয়েছে, হয়েছে ; সে আপনি বুঝবেন না'।

খুশি হয়ে রাজু বলল, 'হলেই হল। একদিন তোমাকে টাইগার দেখাব। পিয়েত্রো একটু সেরে উঠুক। হাতির সামনে দিয়ে তীরের গতিতে হরিণ ছুটে পালাবে। ঘাসবনের থেকে হলুদ মখমলে মোড়া একটা কামানের গোলার মতো সত্যিকারের টাইগার তোমার দিকে ছুটে আসবে'।

কেট শিউরে উঠে রাজুর গা ঘেঁষে দাঁড়াল।

সহসা রাজু বলল, 'আরে পালকি যে মানুষ দেখছি। এ পথে মানুষ এল কী করে'?

'আসুক না-ক্ষতি কী'?

'ক্ষতি কিছু নয়। ওরা এ-যুগের লোক তো? অতীত কালের কেউ না-হয'।

কেট হেসে বলল, 'পেগানদের খুব ভূতের ভয় থাকে, তাই নয়? কিন্তু ওরা ভবিষ্যতেব লোকও হতে পারে'।

রাজু হা-হা করে হেসে উঠল।

আর-কিছুদূর নেমে কেটের পরিত্যক্ত জ্যাকেটটার কাছে এসে রাজু সেটা নিচু হযে কুড়িযে নিল।

কেট বলল, 'রাজকুমার বড় কৃপণ'।

পালকি বাহকদের রব কানে এল। রাজু বলল, 'কেট, ওরা যদি আমাদের সঙ্গে কথা বলে তুমি উত্তব দিয়ো'।

কয়েক পা যেতেই ওদের দেখে পালকি বাহকরা থেমে গেল। বন্দুকধারী একজন বরকন্দাজ ছুটে এল। পালকির খোলা দরজা দিয়ে একজন মুখ বাড়াল। সে যে চূড়ান্তরূপে বিস্মিত এবং খানিকটা মুগ্ধ হয়েছে তা বোঝা গেল।

পালকির ভেতরের লোকটি বলল, 'সরি টু ডিসটার্ব ইউ। বাট ক্যান আই স্পিক টু ইউ'?

'ইয়েস, ইউ ক্যান। উইল নট মেল্ট ইনটু থিন এয়ার'। কেট হাসলেন।

তখন লোকটি বলল, 'আমি রাজার গড়ে যেতে চেয়েছিলাম। এক ভদ্রলোক এই পথটি দেখিয়ে দিলেন। আধঘণ্টা ধরে চলেও বন শেষ হল না। আমরা কি ভুল পথে যাচ্ছি'?

'না, এইটেই রাজার গড়। আপনি কি অতীত কাল থেকে হঠাৎ এযুগে এসে পড়েছেন? অতীত কালের কোনো রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য যাচ্ছিলেন'?

'না ম্যাডাম, আমি বর্তমানের, আমি বর্তমানের রানীসাহেবার কাছে যাচ্ছি'।

'তাহলে এটা ভুল পথ। বর্তমানে গড় নেই, রাজবাড়ি আছে'।

'ফিরে যেতে বলেন'?

'না, সিধে চলে যান, বনের শেষ পাবেন'।

আরোহীর ইঙ্গিতে পালকি হৈ-হৈ করে ছুটে চলল প্রাণপণ করে। বলা বাহুল্য, কেটের সঙ্গে ভদ্রলোকটির কথা ইংরেজিতে হয়েছিল।

পালকি এগিয়ে যেতে রাজু হো-হো কবে হেসে উঠল।

'আঃ, ও কী'?

'আমি কী অসভ্যের মতো হাসলাম'?

'না-না, দেবতার মতো। কিন্তু ও-লোকটি আমাদের কী ভাবল কে জানে!'

কেট ইতিমধ্যে রাজুর কোট কুড়িয়ে নিয়ে বগলদাবা করেছিল। আর কিছুদূর গিয়ে টুপিটা কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় দিল রাজু। জ্যাকেটটা কেটের হাতে দিয়ে বলল, 'এবার জামাটা পরো'।

কেট জ্যাকেট পরতে-পরতে বলল, 'হ্যাঁ, অনেক বিদ্রোহ হয়েছে'।

'তুমি খুশি হয়েছ, কেট'?

'আজকের এই ক্লান্তিটার মতো সুখ আমি কোনোদিনই আর পাইনি'।

বাগচীর বাড়ির দরজায় কেটকে নামিয়ে দিয়ে রাজু ডাকল, 'মাস্টারমশাই'।

বাগচী বেরিয়ে এলে রাজু বলল, 'এবার যাও কেট, ধীরে সুস্থে রান্না-বান্না করো। আমি গিয়ে দেখি পালকিওয়ালা রাজবাড়িতে কী করছে'।

সেই দৃশ্যটা মনে করে কেট খিলখিল করে হেসে উঠল।

সদরে নেমে বাড়ির দিকে যেতে যেতে রাজু দেখে একটু আশ্চর্য হল পালকিদার লোকটি কাছারির বারান্দায় একটা চেয়ার চেপে বসে আছে এবং দেওয়ান তার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে, তার সঙ্গে আলাপ করছে। রাজুর কাঁধেব উপরে কোট, তার শার্টের অস্তিন গুটানো। জামা-প্যান্টে শুকনো ঘাসের টুকরো এখানে-ওখানে লেগে আছে। রাজু লম্বা লম্বা পা ফেলে কাছারির চত্বর পার হয়ে গেল।

লোকটি হাঁ করে তার দিকে চেয়ে রইল।

২৭

'আমাব মনে হয় কী জানো, নযন, এ-ব্যাপারটায় এত হালকা একটা মনোভাব যে, তাকে ধরা যায় না, অথচ তা থেকে ধাবাবর্ষণ হয়, বিদ্যুদ্দাম-উদ্ভাসিত একখানি মেঘ। কেট বাগচীকে ভালোবাসে, অত্যন্ত উষ্ণ সে ভালোবাসা। কিন্তু নিজেদের চিরাচরিত জীবনযাত্রায় সে হাঁপিয়ে উঠেছে, এবং তা বোধ হয় তোমাকে দেখে'।

'বাজু, তোমাব কথায় কথায় কেট ছোট হযে যাচ্ছে। আমাকে দেখে হাঁপিয়ে উঠবে কেন? আমরা জানি না, হয়তো এব মূলে তার বিচিত্র জীবনের কোনো গভীর ব্যথা আছে'।

'তোমাকে তো গল্পটা বলেছে কেট। তোমার কি মনে হয় ওই গল্পটি কেটের আত্মজীবনী থেকে'?

'আমার সন্দেহ হয়, সেই মহিলাব পরিত্যক্ত মেয়েটি কেট নিজে। ডানকান যে-কলঙ্ক-রটনা করেছে তার চাইতে বহুগুণ বেশি গভীব কলঙ্ক ও নিজের পরিবারে দেখতে পেয়ে এত কষ্ট পায়'।

'বাগচী কি এসব জানে না'?

'খুব সম্ভব জানে। জেনে ক্ষমা কবেছে, সেজন্যই হয়তো বিদ্রোহ কেটের। যদি ক্ষমা না-করত, যদি ঘৃণা করত, তাহলে হয়তো কেটের নিজেব মনোভাবের মতো হতো ব্যাপারটা'।

একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল রাজুর। নয়নতারার কাছে যে-কথা বলতে সে এসেছিল তা বলার আগেই কেটের কথা উঠে পড়েছিল। কথাটা সঙ্গোপনে উত্থাপন করেছিল নয়নতারা। কিছুদিন হল তার চোখে অন্তত রাজুর মুখখানি ক্লিষ্ট বলে মনে হয়েছে। কেটের কথায় রাজু সুখী হবে ভেবেছিল সে। কিন্তু হল অন্যরকম।

রাজু বলল, 'আমাব কী মনে হয় জানো নয়ন, সেই পাদরি যদি কেটের বাবা হয়ে থাকেন তবে এ কথা নিশ্চিত যে সে-ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকে ভালোবাসতেন না'।

নয়নতারা সেলাই করতে লাগল। একটা সূক্ষ্ম গরদের পাঞ্জাবির পুট আস্তিনের সংযোগের সেলাইটার কাছে একটা সূক্ষ্ম লেস বুনছে ঘর গুনে-গুনে। সহসা সে কথা বলল না।

রাজু বলল, 'এখানে এসে আমাদের সমাজের সঙ্গে তুলনা করার সুযোগ পেয়েই কেট ওদের সমাজকে ওজন করতে পেরেছে'।

'তা না-হলেও হতে পারত। এমন ক্ষোভ মানুষের মনে হয়। যে-গভীর পরিতাপের ব্যাপার সেই গল্পটায় ছিল সেটা ছাড়াও এমন ক্ষোভ হতে পারত। ওদের সমাজে স্বামীপরিত্যক্তা স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। আমার মনে হয় সেটার জন্য কেট আদৌ দুঃখিত নয়, তার জন্য সে নিজের মাকে কলঙ্কিত মনে

করে না। মায়ের স্নেহ না-পাবার বেদনা আছে ওর মনে। ওর জীবনের উপরে অভিমান বোধ হয় সেইখানে'।

সন্ধ্যার আলো জ্বালল নয়নতারা। অকালের বর্ষাটা আজ ধরবে বলে মনে হয় না। রাজু এদিকে আসবার কিছুপরেই শুরু হয়েছে।

নয়নতারা বলল, 'আজ আহারাদি কি এখানে হতে পারে'?

রাজু ভাবছিল। নয়নতারার কথা সে খেয়াল করল না। একটু পরে সে বলল, 'ভারি কৌতুকের ব্যাপার, নয়ন। আসলে কেটের বিদ্রোহ সম্ভবত কোনো বিশেষ ঘটনা থেকে নয়। ওদের দেশের এ-যুগের শিক্ষাদীক্ষা, রুচি, নীতি এসব মিলিয়ে যা, সেটাকে সে সবসময়ে সহ্য করতে পারছে না। আমরা নানা উপায়ে য়ুরোপের সমাজব্যবস্থাকে নিতে যাচ্ছি, কিন্তু সেটার পরেও ক্ষোভের কারণ থাকবে দেখছি'।

'তা থাক, তুমি কী বলতে এসেছিলে রাজকুমার'?

'সে ভালো নয়, শুনে তোমার কষ্ট হবে'।

নয়ন হেসে বলল, 'রাজবাড়িতে কলকাতা থেকে লোক এসেছিল'?

'সে খবর রাখো দেখছি। তা নয়'। রাজু একটু সময় ইতস্তত করল, তারপর হঠাৎ দৃঢ় সুরে বলল, 'তোমাকে কথাটা বলব ভেবেছি অনেকদিন, বলতে পারিনি। কিছুদিন আগে স্বাধীন রাজা হওয়ার দুঃস্বপ্নের কথা আমরা বলেছিলাম, মনে আছে? তেমনি একটা ব্যাপার ঘটে গেছে'। এই বলে রাজু আলি খাঁর বিদ্রোহের কথা নয়নতারাকে বলল।

স্তব্ধ হয়ে শুনে নয়নতারা বলল, 'এখন কি বিদ্রোহ চলছে'?

'প্রায় শেষ হয়ে গেছে। ইংরেজরা এখন প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই জয়লাভ করেছে। সম্ভবত শত্রুকে তারা ক্ষমা করছে না'।

নয়নতারার চোখ ছলছল করে উঠল, 'আমাদের লোকগুলোর কী হল রাজকুমার'?

রাজু বলল, 'জানি না'।

এই ছোট্ট কথাটা যেন সমস্ত অজানা অন্ধকারের আশঙ্কাকে ফুটিয়ে তুলবে। রাজু সেই শূন্যতার দিকে চেয়েই যেন বলল, 'তোমাকে হরদয়ালের কথাও বলতে চেয়েছিলাম। সে এ-বিদ্রোহকে বিশ্বাস করে না। বরং বিপরীত। সে বলে, ইংরেজ শান্তি আনবে...তারই নাকি প্রয়োজন হয়েছে জাতিটার'। এই বলতে বলতে সেই মশালের আলোয় জ্বলে ওঠা রাত্রিটার কথাই তার মনে ফিরে এল।

রাজু যত বলল তার চাইতে বেশি চিন্তা করল। নয়নতারাও বলার কিছু খুঁজে পেল না।

অবশেষে নয়নতারা বলল, 'রাজকুমার, পিয়েত্রোকে দেখতে খুব ইচ্ছে হয়'।

দুঃখে ও হতাশাতেও মানুষ হাসে। তেমনি হেসে রাজু বলল, 'আচ্ছা, নয়ন, পিয়েত্রো কি স্বপ্ন দেখত? সেই স্বপ্ন সফল করার সুযোগ এল এমন সময়ে যখন বার্ধক্য ও রোগে সোজা হয়ে দাঁড়াতে আর সে পারে না'।

'আমি তাঁকে চিনি না। তোমার নানা কথায় তাঁর যে শান্ত আত্মসমাহিত রূপটি কল্পনা করে নিয়েছি...তার সঙ্গে এ-স্বপ্ন যেন মেলে না'।

'তাদের শিকার, তাদের দুঃসাহসিক খেলাধুলোয় যেন একটি গভীরতর সার্থকতার ইঙ্গিত আছে। আমার এখন মনে হচ্ছে নয়ন, কলঙ্ক ও রাজদণ্ড থেকে তারা আমাকে শুধু ভালোবেসে আড়াল করেনি, একটা বিশিষ্ট পরিকল্পনাও ছিল তাদের'।

রাজু মনের অস্থিরতায় ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। একসময়ে থেমে সে বলল, 'অবশ্য হরদয়ালেরও পরিকল্পনা আছে। আমরা কি অস্বীকার করতে পারি নয়ন, সে-পরিকল্পনা খানিকটা কারো অনুকরণও বটে? তা না-বলো, একটা আদর্শের অনুসরণ তো নিশ্চয়ই। কিন্তু তার পরিকল্পনা মনে করতে

গিয়ে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে কেটের মনের সেই নিগূঢ় বেদনার কথা'।

রাজু থামল। খানিকটা সময় পরে বলল, 'না, আজ কিছুতেই মন সহজ হবে না। আবার দ্যাখো সেই পুরনো কথাতেই ফিরে এলাম'।

'বসবে না'?

'না, যাই'।

জানালা দিয়ে বাইরেব দিকটা দেখে এসে নয়নতারা বলল, 'রাজু, কাউকে দিয়ে রূপচাঁদকে খবর দেব পালকি নিয়ে আসতে? পথে কাদা হয়ে গেছে'।

'না, থাক'। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রাজু বলল, 'সবচাইতে কৌতুকের হবে যদি সত্যি-সত্যি আমাদের দিক থেকে দেওয়ান ইংরেজকে টাকা দিয়ে এই ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে'।

'এ-রকম কথাও আছে নাকি'?

'একদিন মোটা-একটা টাকার অঙ্কে ওরা মায়ের সই নিয়েছে, ডানকান ও হরদয়াল দুজনে পরামর্শ ক'রে'।

রাজু চলে গেল।

সেদিনটা তখনও শেষ হয়নি। রাজু বাড়ি ফিরে দেখল, কলকাতা থেকে নৌকো ফিরেছে। অনেক জিনিস এসেছে কলকাতা থেকে। কাগজে আর খড়ে-মোড়া বড় বড় কাচের ঝাড় ও ডোম খুলছে কতকগুলি লোক কাছারির বারান্দায় বসে। রাজু তার ঘরে ঢুকে এটাই প্রত্যাশা করেছিল ... একটা কাঠের বড় বাক্সের কাছে রূপচাঁদ দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। পাহারা দেওয়ার দরকারের চাইতে পাহারার কায়দাটা দর্শনীয়।

'কী রে'?

'হুজুর, দেওয়ানজি বললেন, খবরদার, রাজকুমারের শখের জিনিস!'

'আচ্ছা, তুই এখন বিশ্রাম কর গে'।

রূপচাঁদ চলে গেলে কাঠের বাক্সটার গায়ে সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিল রাজু। পিয়েত্রোর চিঠির ফলেই সম্ভব হল। পিয়েত্রোর নিজেরটির চাইতে ছোট ; তাহলেও যে কিনেছে সে পিয়েত্রোর নিজের লোক, আধুনিক খেলো জিনিস হবে না।

এ থেকে আবার পিয়েত্রোর কথাই মনে হল তার। নিঃসঙ্গ সে। এমন নিঃসঙ্গ কেউ হয় না। কেউ তাকে বলেনি, কিন্তু মনে হল তার এমন কোনো নিঃসঙ্গতার সঙ্গীই হয়তো ছিল তার পিয়ানো, কিন্তু সেটাও সে দিয়ে দিয়েছে।

অনুরূপ আনন্দ দেওয়ান হরদয়ালেরও হয়েছিল। কলকাতা ফেরত কর্মচারীটি তার নিজের বাক্সে পুরে এনেছে। এ-সময়ে এ পাওয়া যাবে সে কল্পনা করতে পেরেছে? যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশে এ পাওয়া যায়, এ-আশা সত্যি করেনি হরদয়াল। বাদামি রঙের কাগজে মোড়া প্যাকেট খুলে হলুদ রঙের কতগুলি পত্রিকা পেল সে, আর একখানা ঝকঝকে বাঁধানো বই। পত্রিকাগুলি পুরনো। তা হোক, নতুন এদেশে কী করে পাওয়া যাবে! তবু ভালো, কামান বন্দুকের জাহাজে এখন এমন বই আসছে। 'স্পেক্টেটর' কাগজ। উত্তেজিত হয়ে দেওয়ান গড়গড়ার নলে ঘন-ঘন টান দিতে লাগল। বইটির কথা সে লিখে দেয়নি। দোকানদার নিজে থেকেই দিয়েছে। কবিতার বই। হরদয়াল বইটির মলাটে লেখা কবির নামটা পড়ল। নামটা তার অজানা। ব্রাউনিং। হবে হয়তো কোনো এক অল্পখ্যাত কবির লেখা। তা মন্দ নয়, ভাবল সে। অল্পখ্যাত কবিদের লেখায় সাহিত্যের হালের ঝোঁকটা কোনদিকে বোঝা যায়।

হরদয়াল আসন ত্যাগ করে বই ও কাগজগুলি নিয়ে তার ছোট লাইব্রেরিটাতে উপস্থিত হল। আলোটা

বাড়ির দিকে, কাগজগুলি টেবিলে রেখে, কবিতার বইটি নিয়ে শেলফের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চারদিকে ঘুরে একটির দ্বিতীয় তাকে খানিকটা জায়গা পেল। ধুলো পড়েছে নাকি? কোঁচার খুঁট তুলে জায়গাটা ঝেড়ে নিয়ে কবিতার বইটি রাখল।

হরদয়াল ফিরে এলে বাবুর্চি এসে বলল, 'রসুই কী হবে হুজুর'?

'হালকা কিছু করো'।

আরামকেদারায় গা ঢেলে দিয়ে গড়গড়ার নলে মুখ রেখে হরদয়াল ভাবতে লাগল। তার চিন্তাটা মোটামুটি পর্যায়ক্রম-অনুসারে এইরকম ছিল :

স্কুলগুলি আবাসিক করার একটি মস্ত সুফল চরিত্রগঠন। স্কুলের আদর্শ ও বাড়ির আদর্শ অনেকক্ষেত্রে বিপরীতমুখী হয়। তার ফলে অন্তর শিক্ষাটাকে গ্রহণ করে না। স্কুলে যখন আসে তখন স্কুলের মতো কথা বলে, বাড়িতে যখন বাড়ির মতো। স্কুলে বসে নিরীশ্বরবাদের কথা চিন্তা করল, বাড়ির ফিরে মায়ের কথায় নামাবলি গায়ে নারায়ণের শয়ানের ব্যবস্থা করল, এ রকম হচ্ছে। তাছাড়া সব বাপ-মা-ই ছেলেকে মানুষ করার মতো উঁচু মনের নয়। তাদের ছোট ছোট হিংসা-দ্বেষের উদাহরণগুলি শিশুকে বিপথে নেয়। ফলে কাজ হয় না। ওদিকে ছেলেরা অভিনয় করতে শেখে। মনে মনে যে পবের জন্য একটুও ভাবে না সে-ও হলঘরে উপাসনার সময়ে হাতজোড় করে অসুস্থ সঙ্গীর জন্য প্রার্থনা কবে।

কিন্তু এত বড় বাংলাদেশ। আবাসিক স্কুলে কয়টি ছাত্রকে মানুষ করা যাবে? আকাশ জোড়া অন্ধকাবে জোনাকির আলো!

আসল কথা, ভালো-মন্দ মিলে মানুষের জীবন। খানিকটা ভালোয় খানিকটা মন্দ না-মিশলে নিখাদ মানুষ নিয়ে সংসার চলে না। তাদের ভেতবে রস নেই। হয তারা শুকনো পাথর, নয নির্বোধ। কাছারির আমলাদের মধ্যে সোনাউল্লার কথা মনে হল। লোকটার দুষ্টুমিব শেষ নেই, তবু মধুব রসাল লোকটি। সকলে তাকে ভালোবাসে। সত্যিকাবের ক্ষতি সে কারো করে না, কিন্তু খোঁচাখুঁচি কবতে ওস্তাদ। হরদয়াল চেয়ারে শুয়ে এমনি সব পুরনো কথা নিজের কবে চিন্তা করতে লাগল। এই দ্যাখো, আসল কথাটাই জিজ্ঞাসা করা হয়নি। হরদয়াল ভৃত্যকে ডাকল।

'তুই একবার কলকাতা থেকে যে-বাবুটি ফিরেছে তার বাড়িতে যা তো। জিজ্ঞেস করে আয়, নতুন মাস্টারমশাইয়েব কী হল? এ-মাসের মধ্যে কারো আসার সম্ভাবনা হয়েছে কিনা'।

ভৃত্য চলে গেলে হরদয়াল স্থির করল, সদরেও খোঁজ করতে হবে কেউ আসে কি না। কিন্তু সদরের কথায় হরদয়ালের মনে পড়ল, কলকাতার বন্ধুর চিঠি। চিঠি—চিঠি লেখার কথা সে-ও ভাবছে। কলকাতায় লোক পাঠানোব সময় সে বন্ধুকে চিঠি দিয়েছিল। রানীমা চিঠি দিয়েছিলেন তাঁর এক আত্মীয়কে, পিয়েত্রো দিয়েছিল একজন আর্মানি বণিককে, বোধ হয় তা রাজুর পিয়ানোর জন্যই। সে-রকম চিঠি নয়।

কিছুদিন আগেই হরদয়াল চিঠি লিখবার একটা তাগিদ অনুভব করেছিল। আজ আবাব সেটাই ফিরে এল। বন্ধু লিখেছে—এদেশের সিপাহিরা যেমন ইংরেজ মেরেছিল এখন তেমনি ইংরেজরা সিপাহি বধ করছে। সিপাহিরা পর্যুদস্ত হয়েছে বলে বন্ধু আনন্দিত? সমাজ-জীবনে একটা আবিলতা এসে পড়েছিল, তা দূর হল বলে ক্ষণিক আনন্দ বোধ হলেও সমগ্র ব্যাপারটাই কুৎসিত।

হরদয়াল উঠল। মনে হল সে লিখবার টেবিলে যাবে। তা না-গিয়ে সে প্রভিসনের আলমারিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওয়াইন আছে সেখানে। কিন্তু সে ফিরে এল, বলল, 'ওরে, তামাক দিস'।

অল্প সময়ের মধ্যেই ভৃত্য এল ছিলিম বদলে দিতে। সে-ই বলল, মরেলগঞ্জের দেওয়ান মনোহর সিংয়ের লোক বসে আছে কাছারিতে। এ-পক্ষ থেকে সদর-নায়েবকে ডেকে দেয়া হয়েছে। দেওয়ানজির সঙ্গে দেখা করতে চায় সে।

'রাত হল তো'। হরদয়াল কুণ্ঠিত হল। কিছুদিনের মধ্যে সে মনোহর সিংহের অত্যন্ত কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। তা ভেবেই যেন এই কুণ্ঠা। কিন্তু হঠাৎ তো সরে আসা যায় না। দেখা করতেই হয়, নতুবা

বলে দিতে হয় কাল সকালে আসতে।

তামাকের নলে দু-একটি টান দিয়ে হরদয়াল ভৃত্যকে বলল, 'নিয়ে এসো দেখি তাকে। আর সদর-নায়েবকেও আসতে বলো'।

মনোহর সিংয়ের লোকটি বলল, 'কাল আমাদের দেওয়ানজি আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন, আপনার সুবিধা হবে কিনা জিজ্ঞেস করেছেন'।

'তা হবে। কিন্তু কেন কিছু জানো'?

'আজ্ঞে, ডানকান কালীপুজোর বন্দোবস্ত করেছেন'।

'ডানকান? কালীপুজো!' মনে হল হরদয়াল হাসবে, কিন্তু সে-ভাবটাকে গোপন করল সে। বলল, 'তা বেশ তো'।

লোকটি চলে গেল।

সদর-নায়েব তখনও দাঁড়িয়ে ছিল। হরদয়াল বলল, 'শুনেছেন'?

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। আমাদের রাজপুরোহিতকে রাজি করাতে অনুরোধ করছিল লোকটি। সহজে রাজি হবেন বলে মনে হয় না'।

সদর-নায়েব বোধ হয় হরদয়ালের অনুমতির জন্যই অপেক্ষা করছিল। কখনও কখনও এমন হয় মানুষের স্তব্ধভঙ্গির মধ্যে তার মনের চঞ্চল প্রশ্নগুলির ছাপ ধরা পড়ে।

হরদয়ালের মনে হল কিছুদিন থেকে সদর-নায়েবকে এ রকমই দেখাচ্ছে।

হরদয়াল বলল, 'আচ্ছা, আপনি যান'।

সদর-নায়েব চলে গেলে সে ভাবল : আশ্চর্য নয় যদি সে গোবর্ধনের কথাই ভাবে। নিজের ছেলের মতো করেই সে তাকে মানুষ করেছে। কিন্তু, চিন্তার মোড় নিয়ে ভাবল সে, ছেলেরা অনেকসময়েই অন্য রকম করে থাকে। বাপ-মা যা চায় তা হয় না। এইজন্যই যেন হরদয়াল একটা বেদনার মুখোমুখি হল—অভিভাবকের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ছেলেদের আশা-আকাঙ্ক্ষায় বৈষম্য দেখা দেয়। এর আগে চরণদাসের মা একদিন খুব কেঁদেছিল তার সামনে বসে।

কিন্তু এটা তার চিন্তার বিষয় নয় এই ভাবল সে এবং ডানকানের কালীপূজার ব্যাপারটাকেই মনে ফিরিয়ে আনল। সত্যি কি ডানকান পুজো করবে? কুঠিয়াল খ্রিস্টান ডানকান? এ যদি সত্য হয়, তবে বোঝা যাচ্ছে কী পরিমাণ ভয় সে পেয়েছিল। এই বিদ্রোহের ব্যাপারে।

বন্ধুকে চিঠি লিখে জানা যায় বিপদ-উদ্ধারের আনন্দে কালীঘাটে পুজো দিচ্ছে কিনা সাহেবরা। এর-পরে জেলার সদরে-সদরে আনন্দোৎসব হবে নাকি?

কিন্তু ইতিমধ্যেই কি বিপদ উদ্ধার হয়ে গেল?

অনুচ্চকণ্ঠে ভৃত্যকে ডাকল সে। ভৃত্য এলে হরদয়াল বলল, 'একটু ওয়াইন দিস'।

ওয়াইন-কাপটা হাতে নিয়ে আবার একটু চিন্তা করতে হল হরদয়ালকে। প্রথমেই সে ভাবল ইদানীং তার চিন্তাটা যেন অস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। কেমন একটা বিষণ্ণতাই যেন। যুক্তি দিয়ে সে বিষণ্ণতাকে প্রশ্রয় দেয়া যায় না। কিংবা মনের এই অবস্থাটাকে চিন্তার অস্বচ্ছতা বলে অন্যভাবে বর্ণনা করা যায়। একটা বিষণ্ণতার পটে যেন অন্য ব্যাপারগুলি ঘটে চলেছে।

নৈশ-আহার শেষে হরদয়াল খানিকটা প্রফুল্লতা বোধ করল। আরামকেদারার পাশে তার আলবোলা, রুপোর ঝাঁজর-ঢাকনা দিয়ে ধোঁয়া উঠছে সরু রেখায়। শয্যা এবং আরামকেদারার মাঝামাঝি জায়গায় একটা ছোট টেবিলে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে আলো।

হরদয়াল বন্ধুকে চিঠি লিখতে বসল :

তোমাকে ইতিপূর্বেই পত্র দেওয়া উচিত ছিল। তোমার প্রেরিত বইগুলি পাইয়া ধন্যবাদ দেওয়া কর্তব্য মনে করিতেছি। নতুন কবিটির কাব্য সম্বন্ধে আমার কী মত পরে জানাইব। আপাতত বোধ হয় নতুন

বলিয়াই ভালো লাগিবে। নতুন বই মাত্রেই একটা সুঘ্রাণ আছে। কবির নাম ব্রাউনিং কী? অর্থাৎ শেষের 'জি' কি উচ্চারিত হয়?

ভাবিয়াছিলাম তোমাকে একটি সুন্দর গল্প উপহার দিব। ফিল্ডিং বা স্মোলেটের উপন্যাসে দূরে থাক, স্কটেও বোধ হয় নাই। গল্পটি বাগচীমাস্টার বলিয়াছে।

এই পর্যন্ত লিখে হরদয়াল চিন্তা করল। লী হাউসের গল্পটা লেখা কি ভালো হবে? বাগচী অবশ্য বলেছে—প্রকাশ হলেও তার কিছু ক্ষতি নেই। তাহলেও...

হরদয়াল লিখল :

কিন্তু নানা কারণে বলা হইল না। অন্তত আজ নয়। আজ বরং তোমাকে আর-একটি সংবাদ দিতেছি। ইহা একেবারে তাজা। ডানকান হোয়াইট আমাদের প্রতিবেশী নীলকর। এইমাত্র সংবাদ পাইলাম সে কালীপূজা করিতেছে। তোমাদের ওদিকেও কালীঘাট আছে। তাহাব সংবাদ দিয়ো। ডানকানকে আমি এতদিন খ্রিস্টান বলিয়াই জানিতাম।

হরদয়াল আবার থামল। এতক্ষণ যা লিখেছিল তা পড়ল, চিঠিটা তার পছন্দ হল না।

চিঠিটা প্যাডেই পড়ে রইল। সে উঠে গিয়ে শেল্‌ফ থেকে নতুন বইখানি নিয়ে এসে আলোর সামনে বসল।

২৮

দেওয়ান মনোহর সিং নিজেই এসেছিল। পালকিতে নয়, ফিটনে। পালকি হলে চোপদার প্রভৃতি থাকত, ফিটনে তা হয় না। গাড়িটা বোধ হয় ডানকানের নিজেব। সহিস, কোচম্যানের পরনে লাল বনাতের সালোয়ার আচকান, জরির কাজ আছে হাতায়। মাথায় ঝকমকে কুল্লা-দেয়া পাগড়ি।

এই আধুনিকতা মনোহরের ভালো লেগে থাকবে। রাজবাড়ির সদর-দেউড়িতে যখন সে নামল তখন অন্তত কয়েকটি পথচারী তার গাড়ির কাছে এসে তাকে দেখতে লাগল। তারা আবলুশের-রং-করা গাড়ির গায়ে হাত দিয়ে পরখ করতে যাচ্ছিল। কোচম্যান হাত মেলে দাঁড়িয়ে মৃদুভাবে বাধা দিল।

দেউড়ি থেকে কাছারি, সেখান থেকে দেওয়ানের বাড়ির খাসকামরায়।

সংবাদ পেয়ে হরদয়াল বেরিয়ে এসে সংবর্ধনা করে নিয়ে গেল।

মনোহরের সম্মুখে ব্র্যান্ডি স্থাপিত হলে কথা হল।

কালীপূজার ব্যাপারটা এখন-আর কল্পনাতে নেই। মনোহর সিংয়ের চণ্ডীমণ্ডপেই তা হবে। আর চণ্ডীমণ্ডপের লাগোয়া দরদালানে হবে নাচেব আসর। সদর থেকে নাচওয়ালিকে আনতে লোক চলে গিয়েছে। নাম জম্মুবাই। মনোহর হলপ নিয়ে বলতে পারে নাচওয়ালির সঙ্গীরা তাকে জম্মুবেগম বলেই সম্মান করে।

ডানকান থাকবে বইকি। তারই তো পুজো। এর মধ্যে সে না-থাকলে সদর থেকে ডেপুটিরা, উকিলরা এবং গ্রেশাম নিজে আসতে রাজি হয়? সেই গ্রেশামই। ডাক্তার তো বটেই, তবে ম্যাজিস্ট্রেট বলাই ভালো। জেলার কালেক্টর এখন নাকি ফৈজাবাদ অঞ্চলেই আছে।

হেসে হরদয়াল বলল, 'আপনার নিমন্ত্রণ আমরা গ্রহণ করলাম'।

'কিছু কিন্তু থাকল নাকি এর মধ্যে'।

হরদয়াল বলল, 'এমন কিছু নয়, তাহলেও...'

মনোহর সিং বলল, 'বিবেচনা করুন'।

একটু থেমে সে বিষয়ান্তরে গেল, যেন বিষয়টা হঠাৎ তার মনে পড়েছে।

প্রথাসম্মত আমন্ত্রণ জানিয়ে মনোহর সিং বিদায় নিলে হরদয়াল কাছারিতে গিয়ে বসেছিল। কিছুই হয়নি এ-রকম একটা ভঙ্গিই ছিল তার। কাল পুজো এবং পরশুদিন নাচ। কিন্তু তার মনে পড়েছিল মনোহর সিংয়ের বিষয়ান্তরে যাওয়ার ব্যাপারটা খুব স্বচ্ছ ছিল।

কাজেই কাছারি ভাঙবার কিছু আগেই হরদয়াল লিখে অনুমতি চাইল রানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

রানী বললেন, 'কী সংবাদ হরদয়াল, বোসো'।

মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে তুলে হরদয়াল বলল, 'ফিরিঙ্গি ডানকান কালীপুজো করছে'।

রানী বলতে যাচ্ছিলেন, তা যদি কেউ করে...। বললেন, 'কিছু উদ্দেশ্য আছে নাকি'?

হরদয়াল বলল, 'আর কী উদ্দেশ্য আছে তা বোঝা যায় না। নিমন্ত্রণ করতে এসে মনোহর অন্য কথায় গিয়ে বলেছিল, বুজরুক বারাকপুরের সিপাহিদের সাহায্য করতে গিয়েছে এ ডানকানরা জানে। আর আমাদের রাজকুমার...'

'কী রাজকুমার...'

'অনেক বিষয়েই পিয়েত্রোর সঙ্গে একমত'।

রানী চিন্তা করলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাতে কি দোষ স্খালন হবে যদি দোষ স্পর্শ করে থাকে'?

'আমরা যে মনে-প্রাণে পিয়েত্রোর পথের পথিক নই তা প্রমাণ করা যায়। আর তা বিশ্বাস করলে বলা যেতে পারে সেটা প্রমাণ করলে সম্ভাব্য রাজরোষ এড়াতে পথ করে রাখা হবে'।

রানী আবার ভাবলেন।

বললেন তিনি, 'মনোহর কি এতই 'মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী'? এই পথ করে দেয়াই উদ্দেশ্য হতে পারে তার? তুমি খোঁজ নাও, হরদয়াল'।

'তা নেব। কিন্তু রাজকুমার কি যাবেন'?

'না-গেলে—অবশ্য ব্যাপারটাকে শাদা-মাটা একটা নিমন্ত্রণ রাখা বলে নেওয়াই ভালো। প্রতিবেশী তো'। রানী এই বলে হাসি-হাসি মুখে উঠে দাঁড়ালেন।

হরদয়াল বলল, 'আমি খোঁজ নেব। না-গেলে তারা সেটা ব্যবহার করতে পারবে। কিন্তু এমনই কী খবর ইতিমধ্যে পেল তারা যার জন্য এই উৎসব'?

রানী ততক্ষণে চলে গিয়েছেন।

হরদয়াল চিন্তিত ছিল। চিন্তাটা সুখেরও নয়। সে অনুভব করল—অন্যান্য দিন দরবারশেষে সে যে একটা সার্থকতার স্বাদ পায় নিজের মনে তাও পেল না। বিষয়টিই কী কঠিন করে তুলেছিল রানীর মনকে তাঁর মুখের হাসি সত্ত্বেও? অবশ্য এমনও হতে পারে রানীর স্বাস্থ্য আজ ভালো নেই।

সন্ধ্যায় দেখা হল রাজচন্দ্রর সঙ্গে। রূপচাঁদ খবর এনে দিয়েছিল রাজকুমার একাই আছেন খাস-কামরায়।

হরদয়াল ঘরে ঢুকতেই রাজুর কপালে ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছিল, কিন্তু প্রস্তাবটা শুনেই সে হো-হো করে হেসে উঠল। আচ্ছা ভাঁড়ামি তো! হরদয়াল জানাল, নিমন্ত্রণ রাখাই বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন রানীমা।

'মন্দ কী,' বলল রাজু, 'সঙ দেখতেও মানুষ যায়'।

ডানকানের কালীপূজায় হরদয়াল যাবে। এটা তার কর্তব্য।

শুধু রাজবাড়িই নয়, ডানকানের কালীপুজো নিয়ে গ্রামেও আলাপ হল। উৎসবটা বেশ বড় রকমেরই হবে। বাজারের বড় দোকানিরা যেমন বিক্রির উৎসাহে পুলকিত হল, যারা নিষ্কর্মা হয়ে ঘোরাফেরা করছে তারাও জল্পনা-কল্পনা শুরু করল। খবরটা হঠাৎ এসেছে, বেশি দেরি আর নেই, এরই মধ্যে অনেক খবর

নিতে হবে। বাজি পুড়বে শোনা যাচ্ছে। আর চিনেবাতি। গোটা মরেলগঞ্জই নাকি আলোতে সাজানো হবে—ইস্তক মরেলসাহেবের গোরস্থান। আর ঢাকি? মরেলগঞ্জে পাবে কোথায়? আজ সন্ধ্যাতেই শুনবে একশো আটে কাঠি পড়ছে। এই গাঁয়েরই।

সংবাদটা কিছু বৈচিত্র্য আনল।

চরণদাস খেত-খামারের কাজ শেষ করে সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখল জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বনদুর্গা। যেন আকাশেই কিছু লক্ষ্য করছে।

'কী বন'?

বনদুর্গা ফিরে দাঁড়াল। তার চোখ দুটো প্রদীপের আলোতেও লাল দেখা গেল।

চরণ বলল, 'কী হয়েছে, বনদুর্গা'?

'কিছু নয়,' বলে হাসবার চেষ্টা করল বনদুর্গা।

'না, বন, আজকাল তুমি প্রায়ই কাঁদো'।

কই না, বলতে গেল বনদুর্গা কিন্তু তার বুক ওঠা-পড়া করতে লাগল।

'শোনো, বনদুর্গা, একটা মজার খবব আছে। ডানকান কালীপুজো কবছে। আমাদেব নিমন্ত্রণ আছে রায়ত হিসাবে'।

বনদুর্গা হু-হু করে কেঁদে ফেলল।

'কেঁদো না, কেঁদো না। কবিগান হবে, বাজি পুড়বে। যাবে'?

'আ চরণ, চরণ, আমি কী করে ভুলব, কী কবে ভোলা যায়'?

চরণদাস বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। সে মনে-মনে বলল, 'বন, তোমার মুখে হাসি আনতে গিয়েই গুলিয়ে ফেলেছিলাম। আমি বুঝি না কী হয় আমার'।

খবরটা এনেছিল নয়নতারার প্রতিবেশী বলা, সেটা রূপচাঁদই পৌঁছে দিল রাজুর কাছে।

নয়নতারার বাড়িতে পৌঁছে রাজু দেখতে পেল সে তখন অলংকার পরছে।

'কী সংবাদ, ডেকে পাঠিয়েছ যে'? বলল রাজু।

'ওমা, তোমাকে ডেকে এনেছে বুঝি? এই দ্যাখো রূপচাঁদেব কাণ্ড। কথাটা মোটেই বুঝতে পারেনি। বলেছিলাম বাজকুমারের কাছে দরবার আছে, কোথাও বেবনোর আগে যেন খবব পাই'।

'রাজকুমার দরবার করতে উপস্থিত, এবাব বলো'।

'দরবার সাজাতেও তো সময় লাগে। বোসো'।

'তা বসি'।

নয়নতারা অন্য ঘর থেকে শাড়ি পালটে এল।

ফিরে এসে বলল, 'বড় প্রার্থনার আগে ছোট-একটা নিবেদন আছে। কীসে এসেছ'?

'ঘোড়ায়'।

'হল না তাহলে। ভেবেছিলাম বলব আমাকে বাগচীমাস্টাবের বাড়িতে পৌঁছে দিতে'।

'ঘোড়া বেঁধে রেখে এর আগেও তোমার সঙ্গে পায়ে হেঁটে গিয়েছি'।

'চলো তাই। পথে যেতে-যেতে নিবেদন করব প্রার্থনা'।

রাজু নয়নতারার এই ব্যস্ততায় কৌতুকবোধ করতে লাগল। পথে বেরিয়েই নয়নতারা বলল, 'কটা বাজে বলতে পারো। তোমরা কেউ কেউ আজকাল ঘড়ি ধবে চলো অথচ তার আগে তাহলে যে আমাদের একটা ঘড়ি দিতে হয় তা ভুলে যাও। একটু তাড়াতাড়ি চলো। বাগচীমাস্টার দশটায় বেরিয়ে পড়বেন'।

রাজু বলল, 'এবার তোমার প্রার্থনাটা বলো'।

'তার আগে বাগচীমাস্টারের কথা শোনো। তিনি সদরে যাচ্ছেন। অনুরোধ করছেন সম্ভব হলে নয়ন ঠাকরুন যেন কেটকে একবার দেখা দেন'।

'দেখা দিতেই তো চলেছ'।

নয়নতারা হেসে বলল, 'সেকালেও কোনো কোনো দেবতা বর দেবার জন্যই ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু সে-কথা কী পথে চলতে-চলতে বলা যাবে? কিংবা দাঁড়াও, আরো কাছাকাছি হাঁটি'।

কাছে এসে নয়নতারা বলল, 'আজ সারাদিন আমি কেটের কাছেই থাকব। আমি যে কেটকে ভালোবাসি এটাই লোকে জানুক'।

'তা আমি এবং বাগচী জানি'।

'কেটও জানুক। জানো আমার একটা ব্রত আছে'।

'জানানোটাই ব্রত নাকি? পাঁজিতে এ-রকম ব্রতর নাম দেখিনি'।

'পাঁজিতে সব পাওয়া যায় না। প্রিয়জনকে সুখী করাই এই ব্রত, বছরে একটি-দুটি দিন নিজের কথা না-ভেবে'।

'এ খুবই ভালো ব্রত দেখছি। যত তাড়াতাড়ি এটা পালন করো মঙ্গল হবে'।

'আজ এবং কাল এ-দুদিন কিন্তু তোমার কী কী কাজ আছে জানা হয়নি'।

'আমাকে দিয়ে কী দরকার'? রাজু প্রশ্ন করল।

'তা যদি বলো'— নয়নতারা ঝিকমিক করে হাসল।

'বাধা অবশ্য কিছু নেই,' বলল রাজু, 'ডানকানের কালীপুজোর নিমন্ত্রণ আছে। তা নাচ আমার ভালো লাগে না'।

'তাহলে আর কথা নেই। এটাই আমার প্রার্থনা ছিল'।

বাগচীর বাড়িতে গিয়ে তারা একটু অবাক হল। তার দরজার সামনে হাতি নিয়ে মাহুত অপেক্ষা করছে। হাতিটাকে চিনতে পারল রাজু, সেটা বুজরুকের।

অদূরে বাগচীও। বাগচীর পরনে য়ুরোপীয় পোশাক। মনে হয় সে বেরবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। নয়নতারাকে দেখে বাগচী বলল, 'এই যে এসে গেছেন'।

রাজু বলল, 'যাচ্ছেন নাকি কোথাও'?

'সদরে একটু যাব, রাজকুমার'।

'ইস্কুল সম্বন্ধে'? রাজু জিজ্ঞাসা করল।

বাগচী একটু দ্বিধা করল। তারপর বলল, 'রাজকুমার, আপনি কি এক মুহূর্তের জন্য এদিকে আসতে পারেন'?

রাজু কাছে গেলে বাগচী বলল, 'আমি সদরে যাচ্ছি গ্রেশামকে আনতে'।

'পিয়েত্রোর অসুখ বেড়েছে'?

'বুঝতে পারছি না। কাল দু-তিনজন বরকন্দাজ তাঁর সঙ্গে কী আলাপ করল গোপনে, তারপর থেকেই ভাবান্তর। অদ্ভুত রকমে স্থির হয়ে গেছেন। যেন রোগের জ্বালাযন্ত্রণাও নেই। অথচ মুখে একটা হাসি-হাসি ভাব। এ-লক্ষণগুলিই আমাকে ভীত করছে। যেন তাঁর মন আর দেহে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে'।

'বরকন্দাজরা কী বলল তা কি শুনেছেন'?

'না। তারা আমাকে বলতে চাইছিল। আমি বলেছি যদি পিয়েত্রো ছাড়া আর-কাউকে বলতে হয় সে-জন আপনি। তাদের রাজবাড়িতে যেতে বলেছি'।

বাগচী হাতিতে উঠে চলে গেল।

রাজু ঘরে এল। সে কয়েক মুহূর্ত নয়নতারা এবং কেটকে দেখল নিঃশব্দে। তারপর দুজনের মাঝামাঝি জায়গায় একটা আসনে বসল। কথা বলল নয়নতারা। বলল সে, 'জানো কেট, আজ ফিরিঙ্গি ডানকান কালীপুজো করছে'।

'তাই নাকি'?

'হ্যাঁ। সন্ধ্যায় গেঁটে ফুটবে, ঢাক বাজবে, বাজি উঠবে আকাশে, ভয় পেয়ো না যেন'।

'আপনি কাছে থাকলে আর ভয় কী'।

'তা থাকব। কিন্তু সময় কাটবে কি তোমার? এসে দেখলাম পিয়ানোর পাশে রয়েছ। বাজাবে'?

'ডানকানের পুজোর বাজনা'? কেট হাসল।

'না-হয় করুণ কিছু। করুণ নয়, কারুণ্যের ছোঁয়া-লাগা মধুর কিছু। যেমন একদিন বাজিয়েছিলে'।

'তা পারেন রাজকুমার। কিন্তু তিনি যেন আজ চুপ করেই থাকবেন'।

'এমন কিছু নয়'। বলল রাজু।

দুপুরের কিছু আগে রাজু রাজবাড়িতে ফিরেছিল। বলা বাহুল্য নয়নতারা এবং কেট দুজনের আলাপে একসময়ে একটি সুখকর পরিস্থিতিই গড়ে উঠেছিল। পিয়ানো বেজেছিল কিনা জানা যাচ্ছে না।

সন্ধ্যার কিছু পরে নয়নতারার সঙ্গে আবার রাজুর দেখা হল রাজবাড়িতেই।

'কখন এলে'?

'কিছুক্ষণ আগে। বাগচীর ফিরবার সময় হল। বাড়িতে ফিরেই সংবাদ পেলাম রানীমা ডেকেছেন'।

'পরামর্শ ছিল? একমত হতে পারোনি তো'?

'তা না-হলেও কি পরামর্শের দাম কমে'।

'তাহলে বোসো নয়ন, তোমার সঙ্গে আমারও পরামর্শ আছে'।

বাগচীর বাড়ি থেকে ফিরে আসবার কিছুক্ষণ পর থেকেই এরই জন্য অপেক্ষা করছিল সে। বরকন্দাজ কয়েকটি এসেছিল, তাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎও হয়েছে।

রাজু বলল, 'আমাদের লোকগুলির কী হয়েছে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলে, নয়ন। সে-কথা প্রকাশ্যে বলার মতো নয়। পিয়েত্রো জানে আর আমি'।

নয়নতারা ভয় পেয়ে বলল, 'তবে থাক, বোলো না'।

'তোমাকে বলব, নয়ন, তারা একান্তভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। দুজনমাত্র বরকন্দাজ ফিরে এসেছে। চোরের মতো লুকিয়ে আছে তারা। গোবর্ধন নেই। আলি খাঁ নেই। তার বরকন্দাজরা নেই'। গলাটা কেঁপে কেঁপে গেল রাজকুমারের।

নয়নতারার গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

যেন অচেনা অজানা লোকের একটি মৃত্যুঘটনা বর্ণনা করছে এমন উদাসভাবে রাজু বলল, 'প্রথম আক্রমণেই গোবর্ধনের বুকে গুলি লেগেছিল। কিন্তু আলি খাঁর মৃত্যু আরো দুঃখের। অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়। শুনতে শুনতে মনে হয়েছিল, এমন একটি বীর যোদ্ধার এমন মৃত্যু হল কেন'?

'কী হয়েছিল রাজকুমার'?

'বনের পথে যেতে যেতে সাপের বিষে মৃত্যু হয়েছে। আমি বর্ণনা করতে পারি না, নয়ন, বনের ভিতর কী দুর্জয় সাহস একদিন দেখবার সুযোগ হয়েছিল আমার'।

দুঃখ করার মতো কিংবা প্রবোধ দেয়ার মতো ভাষা সহসা নয়নতারা খুঁজে পেল না।

রাজু আবার বলল, 'কিন্তু এ-আঘাত পিয়েত্রোর কেমন লেগেছে বুঝতে পারছি না'। একটুপরে আবার সে বলল, 'এ যেন কাঁচের কিংবা অভ্রের তৈরি একটা মিনার খানখান হয়ে গেল'।

হাউই হু-হু করে উঠে ফেটে ফেটে পড়ছে। গেঁটের দাপটে ঝাড়ের স্ফটিকগুলো ঝনঝন করে উঠছে। আলোয়-আলোয় ধাঁধা লাগছে চোখে।

'ডানকান বলল, 'আমাদের প্রিন্স কোথায়, হরদলাল'?

উত্তরটা দেবার আগে হরদয়াল এদিকে-ওদিকে চাইল। ডেপুটি এবং দুজন উকিল প্রিন্স কথাটা শুনেই উৎকর্ণ হয়েছিল। হরদয়াল হাসিমুখে বলল, 'সামথিং টু ডু উইথ লাভ'।

'প্রেম? আ—ইয়ং লাভ অ্যাড্রিমিং, হুঁ-হুঁ,' ডানকান খুশি হল। 'হিয়ার্স টু লাভ'।

ঢক-ঢক করে পানপাত্র ভরে নিয়ে পান করল সে। এই বোধ হয় পাঁচের বার হল। স্বাস্থ্যপান করতে মহারানী ভিক্টোরিয়া থেকে শুরু করে এর আগে মনোহর সিংয়ের কালী মাদারে পৌঁছেছিল সে। তার চোখ দুটি রক্তাভ হয়ে উঠেছে।

ডানকান বলল, 'প্রিন্স হ্যাজ হিজ পসিবিলিটিজ, আই টেল ইউ'।

এই সময়ে লিভারি-পরা ভৃত্যরা টেবিলে ধূমায়িত কাবাব পরিবেশন করতে এল।

'রাইট ম্যান মানোয়ার, ইন দা রাইট প্লেস টু'। এই বলে ডানকান ছুরি হাতে করে উঠে দাঁড়াল। আজ সে একাই সব কথা বলবে।

ঢাকিরা ওদিকে ঢাক পিটছে নেচে-নেচে।

দৃশ্যের পরিবর্তন হল। নাটমন্দিরের অদূরে হাতি এসে থামল। হাতি বসলে গ্রেশাম আর তারপরে নামল বাগচী।

'ও, হিয়ার কামস্ গ্রেশাম'। বলে চিৎকার করে উঠল ডানকান। কোমর নুইয়ে নত হয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। 'মোস্ট সিনসিয়ারলি ওয়েলকাম, হিয়ার্স মাই মাদার কালী। অ্যান্ড বাগচী? ইউ টু'?

গ্রেশাম হেসে-হেসে বলল, 'হোয়াট ইজ ইট উই হিয়ার, আর ইউ কনভার্টেড'?

'অলমোস্ট, আই ডেয়ার সে। হুঁ, আমি ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছি'। অ-হো-হো করে হেসে উঠল ডানকান। গ্রেশামের সামনে সুরাপাত্র স্থাপন করল।

'দা ডেভিল ইউ আর'—বলে সুরাপাত্র তুলে নিল গ্রেশাম।

বাগচী স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অনেক ইতস্তত করতে হল তাকে। 'অবশেষে সে তার শালীন ইংরেজিতে বলল, 'কিন্তু মিস্টার গ্রেশাম, আপনি আমাকে আশা করার সুযোগ দিয়েছিলেন আপনার রোগীটিকে আগে দেখে আসবেন'।

'হোয়াট!' বলল ডানকান। 'তুমি আমার অতিথিকে ভুল পথে নিবে'?

'তা নয়' বলল বাগচী। 'উনি আসার ব্যাপারে খানিকটা দ্বিধা করছিলেন। রোগীর কথা শুনেই সিদ্ধান্ত নেন'।

'হো,' বলল ডানকান।

'পিয়েত্রো অসুস্থ। সাহায্য পেতে বিলম্ব হলে হয়তো তিনি বাঁচবেন না'।

'হু!' বলল ডানকান।

'মিস্টার গ্রেশাম, আপনাকে আমি করজোড়ে অনুরোধ করছি'। বাগচী বলল।

গ্রেশাম কিছু বলার আগেই ডানকান বলল, 'পিয়েত্রো? ইউ নেম হিম এগেইন! আপনারা কাহিনী জানেন'?

'বাট, হিয়ার ইজ এ ম্যান ডাইং'। বলল বাগচী।

'দা বেটার সো, উইল সেভ হিম ফ্রম দা গ্যালোজ'। বলল ডানকান। 'ফাঁসিকাঠ থেকে বাঁচিবে। বুজরুক, গোবর্ডন, পিয়েত্রো। আমি সব সংবাদ রাখি। রেবেল্‌স। ওয়েজ্‌ড্ ওঅর এগেইনস্ট ইংলিশমেন। হুঁ, তারা যুদ্ধ করিয়াছে'।

গ্রেশাম বলল, 'ইজ ইট'?

বাগচী অস্বীকার করল না। বলল, 'আপনি ডাক্তার, আপনি ক্রিশ্চিয়ান'।

গ্রেশাম বলল, 'আই নো'।

ডানকান বলল, 'ডোন্ট ট্রাই টু আউটক্রিশ্চিয়ান আস্'।

রাত হয়েছে। পালকিতে হরদয়াল ফিরে চলেছে। গাউটের কথা তুলেই বিদায় নিতে পেরেছে সে। নাচ এখনও অনেকক্ষণ চলবে।

অন্ধকার রাত্রি। বাজি পোড়ানো আজ রাত্রির মতো শেষ হয়েছে। কিংবা হয়তো সে মরেলগঞ্জের আলোকিত সীমা পার হয়েছে। পালকি-বেহারাদের একটানা সুর পথিককে সচকিত করছে। কিন্তু অভ্যাসের ফলে সওয়ারের কানে আসে না। পালকির ভিতরটা অন্ধকার।

আসর থেকে উঠে আসবার ঠিক আগে যে-কথাগুলি হয়েছিল সেগুলি মনে পড়েছে হরদয়ালের।

আসরে নতুন করে সুরা এসেছিল। অতিথিরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। আর সেই আসরের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বাগচী অবিরত বলছিল, আপনি ডাক্তার মিস্টার গ্রেশাম, আপনি ক্রিশ্চিয়ান। মন্ত্রের মতো এ-কথাটাই বারবার আবৃত্তি করছিল সে। হতাশার দয়ে পড়ে তার মনে যেন আর-কোনো কথাই তৈরি করতে পারছিল না।

গ্রেশাম দু-একবার বলেছিল—আই নো। কিন্তু পিয়েত্রোর পরিচয় পাওয়ার পর সে যে যাবে না তা তার বসবার ভঙ্গি থেকে বোঝা গিয়েছিল।

ডানকান অনেক কথা বলেছিল। সে বলেছিল, সে গোবর্ধনেব মৃত্যুব সংবাদ বাখে। বাঁ হাতের তেলোয় ডান হাতের কনুই রেখে সাপ দেখিয়ে সে বলেছিল—দ্যাট ফিনিশ্‌ড বুজরুক। কিন্তু হঠাৎ একটা ভয়ের চিহ্নই যেন তার মুখে ফুটে উঠেছিল এ কথা বলে। সে বলেছিল—আই হেট দিজ ইন্ডিয়ান কোব্‌বাজ। তার কথায় আপাত অসঙ্গতি এসে পড়েছিল। সে বলেছিল—চবণদাস, ইউ নো, আইল কিপ অ্যান আই ওপেন অন হিম।

তারপর। কথাটা হরদয়ালের মনে পড়ল। তার মন যেন এজন্য প্রস্তুত ছিল। চেষ্টা করল অন্য কথা এনে সেটাকে পিছনে সরিয়ে দিতে। সে পর্যায়ক্রমে ভাবল—চরণদাস কী করছে কে জানে! ডানকান তার সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে চায়। চরণদাস তো চাষী মাত্র। তাহলে? বাগচীকে নির্বোধ দেখাচ্ছিল। সে যে কত বড় বাগ্মী তা তার একঘেয়ে কথাগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছিল না। বুজরুক—আশ্চর্য! সাপ তো কোনো পক্ষই নয়, তবে এমন ঘটনা ঘটে কেন?

কিন্তু পালকির সেই অন্ধকারে কথাটা মনে ফিরে এল : ডানকান বলেছিল, মাই ডিয়ার হৃদলাল, তুমি বলেছিলে ইংরেজি শিক্ষার ফলে এদেশে এমন একশ্রেণী তৈরি হবে যারা বিপদে ইংরেজকে রক্ষা করবে। অন্তত হোম থেকে জাহাজ ও সৈন্য এসে পৌঁছানোর আগে। নাথিং ট্রুয়ার। তোমার স্কুল খুব ভালো। আমি পাঁচ হাজার টাকা দিব। আমি তোমাব উপরে খুশি আছি।

মনে কোথায় একটা অনির্দিষ্ট দাহ বোধ হচ্ছে হরদয়ালের।

দুরে একটা ম্লান আলো চোখে পড়ছে। সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করল হরদয়াল। কোথায় যেন আঘাত লাগছে বারেবারে। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল সে।

মিটমিটে হারিকেন হাতে কে-একজন পথ চলছে।

'কে'? হরদয়াল পালকি থেকে জিজ্ঞাসা করল।

'বাগচীমাস্টার'।

'কোথায় এত রাতে'।

'ফরাসডাঙায়'।

পালকি বাগচীকে পার হয়ে গেল।

বাগচী চিকিৎসা করে রোগনিরাময়ের চেষ্টা করে বটে।

খাসভৃত্য জেগে ছিল। পালকির শব্দেই সে দরজা খুলে দিল। দেওয়ান তাঁর ভবনে প্রবেশ করল। জামা খুলে হরদয়াল বলল আরামকেদারায়।

'রাত্রিতে...'

'এত রাতে কি কোনোদিন খাই'? বলে হেসে হরদয়াল ভৃত্যকে বিদায় দিল।

বাগচীর কথা মনে পড়ল হরদয়ালের নিজের যতটুকু সাধ্য তা দিয়ে পিয়েত্রোর প্রাণটাকে ধরে রাখবার

চেষ্টা করছে সে।

এর আগে একদিন বন্ধুকে লী হাউসের কথা লিখতে গিয়েছিল। হরদয়াল কৌতুক বোধ করল। ভালো গল্প বলেই নাকি—সে কি সাহিত্যের আড়ালে সরে যাওয়া অন্য কোনো বিষয় থেকে? কিন্তু এখন আর চিঠি লেখা যায় না।

লী হাউসের অপরপক্ষ ফাদার অ্যাম্ব্রুজ। বাগচীর তার জামাতা ও শিষ্য। আজ বাগচী যেভাবে ডানকানের আনন্দ কোলাহলের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল—উপেক্ষিত অবহেলিত বলা যায়। তাতে কী তার অপমান হয়নি? কারো-কারো যেন অপমানবোধ নেই। ফাদার অ্যাম্ব্রুজের কথাই ধরো। লী হাউস তাকে চূড়ান্তভাবেই অপমান করেছিল। কিন্তু ফাদার তাকে নাকি ক্ষমা করেছিল। এ কি ক্ষমা, ক্ষমা করা যায়? না, পরাজয়েরই অন্য নাম?

আকস্মিকভাবে কথাগুলি মনে এল হরদয়ালের : পরাজয়ই কি তাহলে মানুষকে বিশিষ্ট করে? বিজয়ী মানুষ কি ডানকানের মতো উচ্ছ্বাসসর্বস্ব? এ কি মানুষের ভাগ্য যে পরাজয়ের বেদনাই মানুষের অন্তরকে গভীর করবে। আর সে-গভীরতায় কি ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয়?

কিন্তু শুধু বাগচী নয় তো। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনটা টলমল করে উঠল। স্মৃতি আলোড়িত করে যেন কোনো-কোনো পরাজয়ের কথা মনে পড়বে। স্মৃতি কাঁপে নাকি অশ্রুর মতো? অন্য অনেক পরাজয় হয়েছে নাকি? এটাও কম বিস্ময়ের নয়, ভাবল সে, কিভাবে কাকে হার স্বীকার করতে হবে। বুজরুকের কী হল! কী হয় কে জানে!

রাত তখন অনেক হয়েছে। দেওয়ানভবন নয় শুধু, রাজবাড়ির সর্বত্রও প্রায় নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে। কোথায় যেন একটি-দুটি ভেক মকমক করছে। দেওয়ান তার শোবার ঘরে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছিল।

'দেওয়ান!'

হরদয়াল ধড়ফড় করে উঠে বসল। রানীর গলা ; বিছানার চাদরটা টেনে গায়ে দিয়ে হরদয়াল এগিয়ে বলল, 'কিছু বিপদ হয়েছে রানীমা'?

'না'। রানী হাসলেন। 'ব্যস্ত হবার কিছু নয়। রাজুর বিয়ের সম্বন্ধে দু-একটা কথা বলা দরকার'।

হরদয়াল চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন। এত রাতে কিনা, তাই বললাম'।

'রাজুর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যে-লোকটি এসেছিল এখন দেখছি সে মেয়ের কাকা। তুমি শুনলে অবাক হবে, লোকটি উচ্চশিক্ষিত এবং একজন অধ্যাপক'।

'টোলের'?

'না, কলকাতার কাছে কোন কলেজের'।

'তাহলে একেবারে অকরণীয় ঘর নয়'।

'এই চিঠিটা পড়ো। এটা আমাকে লিখেছে, কিন্তু তোমার পড়া দরকার'।

'আপনার চিঠি আমি পড়ব'?

'তোমাকে আমি পড়তে দিচ্ছি'।

হরদয়াল চিঠি পড়তে পড়তে ভ্রূ কুঞ্চিত করল। সে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছে তা বোঝা গেল।

সে বলল, 'যদি অনুমতি করেন এর যথোচিত জবাব আমি দিয়ে দেব'।

'যে লিখেছে সে আমার ভগ্নীস্থানীয়া'।

'তাহলে আমার কিছু বক্তব্য নেই, নতুবা লেখক বা লেখিকার রুচি সম্বন্ধে আমার মত ভালো নয়'।

'কিন্তু তুমি অস্বীকার করতে পারো, রাজু কেটের সঙ্গে অত্যন্ত বেশি মেলামেশা করছে আজকাল?

তারা প্রকাশ্য পথে রাজবাড়ির হাতিতে একসঙ্গে যাওয়া-আসা করছে'?

'অত্যন্ত বেশি কিনা জানি না। তবে রাজকুমারের এবং কেটের পরিচয় আছে। কে কাকে শিখিয়েছেন জানি না, কিন্তু এর মধ্যে পিয়ানো শেখার ব্যাপার আছে'।

'মেয়ের কাকা তাদের গড়ের জঙ্গলে একা বেড়াতে দেখে গেছে'।

'রানীমা, একে কি আপনি কুৎসিত বলে মনে করেন? আমি তো বুঝতে পারি না'।

'হরদয়াল, কাকে কুৎসিত বলে সে-আলোচনা আমি করতে আসিনি। তুমি কি জানো কেট তাদের নিজের সমাজে অচল বলেই বাগচীর ঘরে এসেছে'?

'শুনেছি ডানকান এরকম একটা কী রটিয়ে বেড়ায় বটে'।

'সেটা কি মিথ্যা'?

'না, ডানকানের জানা থাকলে ওর চাইতেও বেশি রটনা করাব অবকাশ ছিল। যথা, কেটেব মা গৃহত্যাগ করে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছিলেন'।

'ছি-ছি, এ তুমি জানো'?

'কিন্তু তাব সঙ্গে এ-বিবাহের কী সম্বন্ধ? মেয়ের বাপেব বাড়ি শুনছি উচ্চশিক্ষিত...'

'আছে বইকি। উচ্চশিক্ষিত হলেই সকলে সমাজত্যাগী হয় না। আমি শুনতে পাচ্ছি তোমার স্কুলে উপাসনার মন্দিরও হয়েছে'।

'ঈশ্বরের প্রার্থনা খারাপ নয়, রানীমা'।

'কিন্তু পদ্ধতি নিয়ে বহুপ্রকার বাদানুবাদ হয়েছে, অনেক যুদ্ধ হয়েছে, এও তোমার অজানা নেই। তোমার উপাসনা-মন্দিরের মতো কলকাতাতেও অনেক উপাসনা-মন্দিব হয়েছে। তুমি তাহলে চিঠিতে লিখিত অভিযোগগুলোকে গুরুত্ব দিচ্ছ না'?

'ওগুলো তো ঠিক অভিযোগ নয় ; একপক্ষকে নিন্দা করা হয়েছে। তাছাড়া স্কুলের উপাসনা-মন্দির ও কলকাতার ব্রাহ্মমন্দিরগুলি এক নয়। কিন্তু এর জন্য আপনি এত ব্যস্ত হলেন কেন রানীমা? যদিও আমি বাল্যবিবাহের পক্ষপাতী নই, সে-মেয়ের বিবাহ-উপযুক্ত বয়েস হয়েছে কিনা আমি জানি না, তথাপি এ-বিবাহেই যদি আপনার মত হয়ে থাকে, আপনি হুকুম করুন, এ-বিবাহ আমি ঘটিয়ে দেব'।

'কিন্তু সেজন্য আমি আসিনি। আমি চাই না, বাগচী বা কেট রাজবাড়ির কারো সঙ্গে কোন ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকে। তারা কি এ-গ্রাম ত্যাগ করতে পারে না'?

'স্কুল ভেঙে যাবে। বাগচীর মতো মাস্টার কোথায় পাব? সে তো কারো অপকার করেনি'।

'তুমি আর একবার ভেবে দ্যাখো। এটা আমি তোমাকে করতে বাধ্য করেছি তা লোকে জানুক এ আমি চাইনি বলেই এত গোপনে এসেছি। তোমাকে হীনমান করা আমার ইচ্ছা নয়'।

'কিন্তু তা আমি কী করে করব? এ কি কখনও সম্ভব? বিনা দোষে তাদের তাড়িয়ে দেব? এ তো অন্যায়'।

'তোমাকে আরো চিন্তা করার সময় দিতে আমি প্রস্তুত আছি'।

'চিন্তা করার সময় পেলে এ-প্রস্তাবকে আমার আরো অন্যায় বলে মনে হবে। বাগচীমাস্টার ও তার স্ত্রী এমন কিছুই করেনি যাকে অন্যায় বলা চলে'।

'তারা অন্যায় করেছে এ আমার বক্তব্য নয়, তারা রাজবাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এ আমি চাই না'।

হরদয়ালের ডান হাতের নখগুলো তার বাঁ হাতের তেলোয় কেটে বসার মতো হল। সে বলল, 'তাই-বা কী করে জড়াবে'?

'তুমি বোধ হয় জানো না, তুমি যা-কিছু করো সাধারণ প্রজা সেটাকে রাজবাড়ির মোহর-সংযুক্ত বলে মনে করে'।

'সেটা তাদের দোষ'।

'হতে পারে। কিন্তু তারা তা মনে করে আমি চাই না। এ যদি তোমার শেষ কথা হয়...

'শেষ কথা নয় রানীমা, কিন্তু এই আমার মত'।

রানী একটু থামলেন। তারপর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনুচ্চ গলায় বললেন, 'তোমাকে বরখাস্ত করা হল'।

'রানীমা!'

রানী ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে পড়েছেন ; হরদয়াল তাঁর পাশে গিয়ে বলল, 'রানী, আমার স্কুল!'

'তোমাকে গ্রাম থেকে তাড়ানো হয়নি। সাধারণ প্রজার মতো তোমার স্কুল সম্বন্ধে যা বলার আছে পেশ কোরো'।

হরদয়ালের ঘরের লণ্ঠনটি ফটফট ক'রে শব্দ করছে। হরদয়াল ফিরে এসে আলোটি নিভিয়ে দিল। টেবিলে জল ঢাকা ছিল, জল খেল হরদয়াল। অপমান ও বেদনায় তার কান্নার মতো একটু অনুভব হতে লাগল। তার ব্যক্তিগত দাস-দাসী, চাকর-বাবুর্চি, এরা কাল সকালে কী করবে এটাই যেন তার সবচাইতে পীড়াদায়ক চিন্তা হল।

খবরটা রাষ্ট্র হয়নি। দেওয়ানের খাসকামরায় মস্ত একটা তালা ঝুলছে, দেওয়ান তার ভবন থেকে বার হয় না। আমলারা এটুকুই জেনেছে। সদর-নায়েব কতকগুলি কাগজে সই করাতে গিয়েছিল। দেওয়ান বলেছে, 'রাজকুমারের বয়স হয়েছে, তাঁর সই নিন'।

হরদয়াল জানে, নতুন দেওয়ান নিযুক্ত হবার আগেই এ-ভবন তাকে ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু এত জঞ্জাল সে জমিয়েছে এক'বছরে তা সে নিজেও ভাবতে পারেনি। আর বেশিরভাগই রানীর দেওয়া। মাইনের টাকা থেকে কেনা জিনিস খুব বেশি নয়। হরদয়ালের আর-একটি সমস্যা হয়েছে, পদচ্যুতির পর এই উপহারগুলির ব্যবহার সে করতে পারে কিনা, না এগুলিও নতুন দেওয়ানের জন্যই রেখে দেওয়া উচিত।

টাকার প্রয়োজনে বাগচী এসেছিল। এ-টাকাটা প্রথা অনুসারে ও রানীর হুকুমে কাছারি থেকেই নেওয়া যায়। হরদয়ালের কামরা তালাবন্ধ দেখে বাগচী তার ভবনে এসেছিল। হরদয়াল তাকে রানীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ফিরতি পথে বাগচী এল।

'টাকা পেয়েছেন'?

'পেয়েছি'।

'আপনার শরীর ভালো'?

'ভালোই আছি'।

হরদয়াল সদর-নায়েবকে সদরে পাঠিয়েছে উকিল-বাড়িতে। শিলমোহর-করা খামে সে উকিলকে লিখেছে, তার নামে রাজকুমারের যে আমমোক্তারনামা আছে সেটা যেন নাকচ করার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর সব কাগজে রাজকুমার সই করবেন, যতদিন না নতুন আমমোক্তার স্থির হয়।

হরদয়াল সদর-নায়েবকে বলবে ভেবেছিল, পারেনি।

২৯

দুপুরের পর রাজু ঘরে বসে পিয়ানো বাজাচ্ছিল। সেও যেন ব্যাপারটায় সংকুচিত হয়ে পড়েছে। বাগচীদের সঙ্গেও দেখা করেনি। হরদয়াল পুরনো লোক বলেই নয়, রাজু তার নিজের অন্তরে যে-বিদ্বেষ অনুভব করছিল হরদয়ালের প্রতি, তার পদচ্যুতি যেন তারই বহিঃপ্রকাশ। রাজুর দু-একবার মনে হয়েছে, একটি অস্পষ্ট দ্বন্দ্বে হরদয়ালকে এক অতিমানবীয় শক্তি মুহূর্তে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। রাজু নিজে যেন

কোথায় খুশি হয়ে উঠেছিল, এবং এ খুশি হওয়াটাই যেন তার কুণ্ঠারও কারণ। ভালোই হয়েছে, কিন্তু এর চাইতেও ভালো ছিল যদি হরদয়ালের মতির পরিবর্তন হতো।

ঝিরঝিরে একটা ভিজে হাওয়া আসছে জানলা দিয়ে। আজও বর্ষা হতে পারে। এই অকালের বর্ষা কতদিন ভোগাবে কে জানে। কোনো কোনো বছর পুজোর দিন-কয়েকটিও এ-বর্ষায় স্যাঁতসেঁতে হয়ে যায়।

সহসা কয়েকটি দরজা-জানলা সশব্দে আঘাত করে জোরে বাতাস এল। রাজকুমারের ঘরে উঠতে যে-বারান্দাটা, তার গায়ে বসানো লতার কতকগুলো শুকনো পাতা উড়ে পড়ল। বাজু উঠে দবজাটা বন্ধ করে দিতে যাবে এমন সময়ে নয়নতারা ঘরে ঢুকল।

'সে কী! এ-সময়ে কী বলে বেরুলে বাড়ি থেকে? ঝড়-জল হতে পাবে'। চমকিত আনন্দে রাজু বলে ফেলল। 'রানীমা ডেকেছিলেন পরামর্শ করতে'।

'পালকির কথা বলে দেব'?

'না, পালকি ঠিক করাই আছে, চলি'।

রাজুকে কথার সুযোগ না-দিয়ে নযনতারা দরজা দিয়ে বেরুতে গেল কিন্তু তখনি পিছু হঠতে হল তাকে চোখে-মুখে ধুলো-কুটো নিয়ে। বাতাসের ঝাপটাটা বেশ জোবেই এসেছিল আবার।

দরজা বন্ধ করে রাজু দেখল, নযনতারা চোখ ডলছে।

'কী হল, এদিকে এসো দেখি'।

নয়নতারার চোখে ময়লা পড়েছিল। তার আঁচল তুলে নিয়ে রাজু বের কবে দিল। তার পব বিস্মিত হল।

অনবদ্যাঙ্গী নয়নতারার সর্বাঙ্গে অলংকার ঝলমল করছে। মাথায় সিঁথি, কোমরে চন্দ্রহার, কানে দুটি নীলাভ হীরা ঝলসে উঠছে।

'এ কী বিস্ময়!' রাজু বলল।

'রানীমার উপহার। শুধু তাই নয়, তাঁর হুকুম'।

'আর কোথায় কে অজেয় আছে? আজ কাকে ভোলানোর এই আয়োজন'? বাজু হাসল।

'কাকে ভোলালাম? ও! সে কি আমাব নিজের জন্য হতে পারে না? আর ডানকান-কুঠির নাচ কি সত্যিই তোমার ভালো লাগত'? নয়নতারা হাসল, অস্থির খঞ্জন হল তার দৃষ্টি।

দুজনে বসা যায় এমন-একটা সোফা জানলার ধারে টেনে নিয়ে রাজু বসল। নয়নতারা পাশে বসল, দুজনে জানালা দিয়ে বাইরে চাইল।

'আজ একটা ঝড় না-হয়ে যায় না'। নয়নতারা বলল।

জানলা দিয়ে, সদরের সামনে দিয়ে যে-পথটা গেছে তার অনেকটা চোখে পড়ে। একজন অশ্বারোহী দূর থেকে সদরের দিকে এগোচ্ছে দেখতে পাওয়া গেল। 'ধুলোর ঝাপটায় তারও কষ্ট হচ্ছে। পাগড়ির ঝোলানো অংশটুকু দিয়ে মাঝে মাঝে সে নিজের নাক-মুখ ঢাকছে।

বাজু বলল, 'লোকটার সাহস আছে, ঘোড়া ধাপেই রেখেছে'।

লোকটি সদরের কাছেও থামল না। কাছারির গাড়িবারান্দার নিচে ঘোড়াসুদ্ধ ঢুকে পড়ল।

রাজু নয়নতারাকে বলল, 'কী পরামর্শ হল, বিয়ের'?

'শুধু তা নয়, গ্রামের কথাও হল'।

রাজু পরিহাসের সুরে বলল, 'ইতিহাসে শুনেছি রানী ও সুলতানা পাওয়া যায়, মন্ত্রিণীর নাম শুনিনি'।

নয়নতারা ঝিকমিকিয়ে উঠল, 'আমি কী করতে পারি যদি তোমার নূরজাহাঁর কথা জানা না-থাকে'।

'হঠাৎ দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন রানী—'রাজু!'

নয়নতারা ও রাজু লজ্জিত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

'রাজু, এইমাত্র একটি লোক এসেছিল। বাগচী জানিয়েছে পিয়েত্রোর শেষ অবস্থা। হঠাৎ এ-রকম হল, জানিস কিছু? তুই যাসনি বোধ হয় কিছুদিন? পিয়েত্রো নিজেই নাকি বলেছে রাজবাড়িতে একটা খবর দিতে'।

'আমার এখুনি একবার যাওয়া দরকার মা'।

'যাবি? ঝড় উঠতে পারে'।

রানী চলে গেলেন। রাজু জানলা দিয়ে ডেকে বলল, 'রূপচাঁদ, হাতি। জয়নালকেই বল, ছুটতে হবে'।

গায়ে মেরজাইয়ের উপর চাদর জড়িয়ে রাজু বলল, 'নয়ন, তুমি যেন বেরিয়ো না। রূপচাঁদ আকাশের অবস্থাটা দেখে তোমাকে পৌঁছে দেবে'।

রাজু বেরিয়ে যেতে-না-যেতেই একজন দাসী এসে নয়নতারাকে বলল, 'রানীমা ডাকছেন'।

নিজের ঘরের মাঝখানে রানী দাঁড়িয়ে ছিলেন। নয়নতারা যেতেই বললেন, 'নয়নতারা, তোমার তো খুব সাহস আছে। তুমি কি আমার সঙ্গে পালকিতে করে পিয়েত্রোর বাড়ি যেতে পারো? অবশ্য ঝড় উঠবে এমন কোনো কথা নেই'।

নয়নতারা অত্যন্ত বিস্মিত হল।

পরদুঃখকাতরা রানীর চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু ঝরতে লাগল। নয়নতারা দেরি না-করে নিচে গিয়ে রূপচাঁদকেই পেল। সে তখন রাজুকে হাতিতে তুলে দিয়ে ফিরছে।

নয়নতারা বললে, 'দুজনে যাবার মতো পালকি চাই'।

'একটু দেরি হবে মা'।

'যতটুকু হবার হবে, তার চাইতে যেন বেশি না-হয়'।

নয়নতারা ফিরে এসে রানীকে খবর দিল, পালকি ডাকা হয়েছে।

আধঘণ্টা পরে রানী ও নয়নতারাকে নিয়ে রাজবাড়ির সবচাইতে বড় পালকিটা পিয়েত্রোর আবাদের দিকে ছুটল। ঝড় প্রচণ্ড হয়ে উঠল না। কিন্তু ওরই মধ্যে একবার পালকি থামল। একটা ছোট গাছের শুকনো ডাল ভেঙে পড়ে সামনের একটি বেহারার কপালের চামড়া খানিকটা কেটে গেল। বৃষ্টিও পড়ছে।

৩০

পিয়েত্রোর শোবার ঘরে বাগচী আর রাজু। দরজার কাছে পিয়েত্রোর খাটের পাশে অনেকগুলি চাকর-বরকন্দাজ। বাগচী তার বাক্স থেকে কী একটা ওষুধ ঢালছে। তার হাত কাঁপছে, তার চোখ লাল। রাজু স্তব্ধ হয়ে বসে আছে খাটের পাশে।

পিয়েত্রোর লম্বা শাদা চুল বাবরির মতো বালিশের উপরে ছড়ানো। দাড়ির যত্ন আর হয় না, সেগুলো বেড়ে-বেড়ে বুক পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে। সারা দেহ যেন নীলে রাঙানো।

রানীর ঠোঁট দুটি ঈষৎ কাঁপল। তিনি বললেন, 'নয়নতারা, খাটে গিয়ে বোসো। ওঁর কপালে একটু হাত রাখো। এ সময়ে বোধ হয় মেয়েদের ছোঁয়ার চাইতে বড় স্নিগ্ধতা আর-কিছুতেই দেয় না'।

নয়নতারা খাটের একপ্রান্তে বসে পিয়েত্রোর কপালে হাত রাখল। পুরনো হাতির দাঁতের মতো, তেমনি ঠাণ্ডা কপাল। রানী শিয়রের দিকে খাটের বাজু ধরে দাঁড়িয়েছিলেন। পিয়েত্রো চোখ মেলে চাইল। দৃষ্টিশক্তি তাতে অবশিষ্ট ছিল কিনা কে জানে।

বাগচীডাক্তার দু-এক বিন্দু জলে একবিন্দু ওষুধ মিশিয়ে পিয়েত্রোর ঈষৎমুক্ত ঠোঁট দুটির মাঝখানে দিল। বোধ হয় সেটাকে গ্রহণ করার চেষ্টায় হাসির মতো কেঁপে উঠল ঠোঁট। নিঃশ্বাসের প্রয়াসে পিয়েত্রোর সারা গা কেঁপে-কেঁপে উঠছিল, সহসা অস্ফুট একটা শব্দ হল। বাগচী হু-হু করে কেঁদে ফেলে

মাটিতে বসে পড়ল।

রাজু বোধ হয় এ মৃত্যুর সঙ্গে পরিচিত নয়। সে ঝুঁকে পড়ে পিয়েত্রোকে দেখবার চেষ্টা করল। রানী কম্পমান ঠোঁট দুটি দাঁতে চেপে ধরে বেরিয়ে গেলেন।

প্রায় পনেরো মিনিট বাদে নয়নতারা বেরিয়ে এসে দেখল রানীর পালকি চলে গেছে। বারান্দার কাঠের রেলিঙে একটু ভর দিয়ে দাঁড়ানো প্রয়োজন বোধ করল নয়নতারা।

পদ্মার উপরে যে-আকাশটুকু তাতে মেঘ আছে। হালকা মৃদু সঞ্চরণশীল। দিন শেষ হয়ে আসছে, এই পশ্চাৎপটের গায়ে মৌন গভীর অতিপ্রাকৃত কোনো জীবের মতো চোখে পড়ছে পিয়েত্রোর হাওয়াঘর। নয়নতারা অনুমানেই বুঝল।

রাজুর মুখে শুনে পিয়েত্রো-বুজরুকের সঙ্গে অতিবাহিত বহুদিনের ছোট-বড় ঘটনার কথা তার জানা ছিল, কিন্তু আজ সেগুলি যেন চোখের সম্মুখে ঘটছে, এমন স্পষ্ট হল।

একটি মৃত্যু চোখের সম্মুখে ঘটতে দেখা যথেষ্ট দুঃখের। কিন্তু নয়নতারার যে-অনুভবটি হল সেটা একটি শূন্যতার। গভীর একটি পূর্ব-অভ্যস্ত বিষণ্ণ পরিসমাপ্তি। নয়নতারা নিজে বুঝতে পাবল না, কিশোর বয়সে যাত্রাগানে ভীষ্মের শরশয্যার পর গভীর অনুভব হযেছিল তার। আজ এখানে দাঁড়িযে অর্ধজাগ্রত স্মৃতিতে তার মন আচ্ছন্ন হল। সে অনুভব কবল, পিয়েত্রোর পক্ষই তার পক্ষ।

মৃত্যুর পরও মানুষের কর্তব্য থাকে।

বাগচী বলল, 'রাজকুমার, আপনি বাড়ি যান ওঁকে নিয়ে। আমি এখানে রইলাম। দাহই হবে, কিন্তু খ্রিস্টানদের কতকগুলি আচাব আছে, সেগুলিও পালন করা দরকাব। যদি সম্ভব হয় দু-একজন লোক পাঠিয়ে দেবেন'।

পায়ে-পায়ে তারা বাংলোর বাইরে এসে দাঁড়াল।

মেঘমেদুর আকাশের নিচে দিনের অবসান হচ্ছে। কাছের মানুষ চেনা যায়, দূরের দৃশ্য অস্পষ্ট। অদূরে একটা গাছের নিচে অস্পষ্টতা যেন নড়ে-নড়ে উঠছে। হাতি, বোধ হয় বুজরুকের, সামনে-পিছনে দুলছে, কখন শুঁড় তুলছে আকাশে। মরেলগঞ্জের উৎসবশেষের দু-একটা হাউই এখন মৃদু আলো নিয়ে এদিকের আকাশে দেখা দিচ্ছে। তাই কি এই অস্থিরতা? কিংবা ও কি সত্যি কিছু অনুভব করতে পারে!

জায়গাটা পার হল তারা। অনেক দূর যেতে হবে তাদেব। নয়নতারা ও রাজু হেঁটে চলল। অনেক দূর যাবার পর রাজু বলল, 'নয়ন, রাজবাড়ির বাইরে আমার এমন আপন আর-কেউ ছিল না'।

নীরবে চলতে চলতে বাজু বলল একসময়ে, 'নযন, অদ্ভুতভাবে নিস্পৃহ হয়ে গিয়েছিল পিযেত্রো,' একটু থেমে আবার বলল, 'পিয়েত্রো কি বুঝতে পেরেছিল তার সাধনায় সিদ্ধি নেই? অথবা সে যেখানে পৌঁছেছিল সেখান থেকে ফিরবার উপায় ছিল না ব্যর্থতা থাকলেও'।

স্কুলবাড়িটার কাছে এলে পথে-নামা গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টিটা থামল। বাতাসটা পড়ে গেল। এদিকের মাটি অল্প বৃষ্টিতে পিছল হয়ে যায়। অবলম্বনের জন্য মাঝে মাঝে নয়নতারাকে রাজুর হাত ধরে ফিরতে হল।

তখনও সূর্য ডুবে যায়নি। এদিকে আকাশ-ভরা ছাই-নীল বঙের জল-ভরা মেঘ। একজাতীয় মেঘ চুঁইয়ে এলে যেমন কনে-দেখা আলো হয়, এ নীল মেঘ চুঁইয়ে তেমনি নীল আলো ছড়িয়ে পড়ছে। স্কুলের হলঘরটার কাচের জানলাগুলিতে সেই আলো এসে পড়েছে। সিসার তৈরি একটা অপ্রাকৃত প্রাসাদের মতো দেখাচ্ছে।

সুরকি তৈরির লোহার চাকাটা কাত হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। মনে হল কে একজন তার উপরে বসে আছে, স্কুলের দিকেই মুখ। তবু ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না।

রাজু বললে, 'কে ওখানে'?

স্বপ্নোত্থিতের মতো লোকটি উঠে দাঁড়াল। 'আমি, হরদয়াল'।

রাজু ও নয়নতারা হাঁটতে লাগল। রাজুর মনে হল স্কুলটার সঙ্গেও পিয়েত্রোর যোগ আছে। তার

মনে হতে লাগল, পিয়েত্রো-বুজরুকের সঙ্গে-সঙ্গে একটা পর্ব শেষ হল তার জীবনের। আর সে-পর্বটা এমন-কিছু যা বিচ্ছিন্ন হয়ে হারিয়ে যেতে পারে?

একদল লোক আসছিল। তাদের দলের আগে রূপচাঁদ। রাজু চিনতে পারল রূপচাঁদের পাশে যাচ্ছে রাজপুরোহিতের ছেলে। পেছনে কয়েকটি লোক সৎকারের উপকরণ বয়ে চলেছে। আতর চন্দনের গন্ধ পাওয়া গেল। রানীর ব্যবস্থা, বুঝতে পারল রাজু।

ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। অকালের বৃষ্টি হলেও ভেকরা ঠিক খবর পেয়েছে, তারা পরম উল্লাসে কোলাহল করছে। একেবারে পথের উপরেও তাদের দেখা গেল, নয়নতারা ও রাজুকে তারা গ্রাহ্যই করল না। রাজবাড়ির হাতায় বিদেশি গাছটায় সবজে-হলুদ রঙের কচি পল্লব বৃষ্টি পেয়ে দুলছে।

সহসা রাজুর দৃষ্টি আবিল হয়ে অজস্র অশ্রু নেমে এল। কী একটা বলার এবং সেটাকে গোপন করার চেষ্টায় তার ঠোঁট দুটি থরথর কেঁপে ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল।

রাজনগর

ফরাসি ফিরিঙ্গি জাঁ পিয়েত্রোর হাওয়াঘরটা ছিল নদীর দিকে মুখ ক'রে। দশ হাত উঁচু সেই হাওয়াঘর। কিছুদূরে কদমগাছের নিচে তার সেই বেঁটে হাতি। কখনও এক পা এগোয়, কখনও এক পা পিছিয়ে আসে। কখনও শুঁড় তোলে। দু পাশে কলাগাছের স্তূপ-পচা হাজা শুকনোর উপরে নতুন টাটকা গাছ। বোঝা যায় কেউ আছে যে প্রাণীটাকে আহার দিচ্ছে। কিন্তু হাওয়াঘর? কে বসবে সেখানে? কোথায় ওয়ারিশান?

একদিন দেখা গেল পিয়েত্রোর হাওয়াঘরে উঠছে শিবমন্দির। মন্দির সে তো পূজার জন্যই—আর তা গ্রামনগরেই উঠে থাকে। এখানে গ্রামের বাইরে নদীর ধারে একটেরে নিঃসঙ্গ হল না?

কিন্তু তা হচ্ছে রানীর নিজের ইচ্ছায়, সুতরাং কেন কী জিজ্ঞাসা না-করে যা হচ্ছে তা চোখে, যা হবে তা কল্পনায় দেখে নেয়া ভালো। দেখার মতো ব্যাপারও। দশ হাত উঁচু সেই হাওয়াঘরের ভিত আছে, চওড়া-চওড়া সিঁড়িগুলো আছে, মন্দির কিন্তু উঠছে নিচের মাটি থেকে, ইঁদারার মতো গেঁথে তোলা। হাওয়াঘরের মেঝে থাকবে মন্দিরের চারিদিকে বারান্দা চত্বর হয়ে। সে চত্বরে উঠতে হবে পুরনো সিঁড়ি বেয়ে, অন্য নতুন সিঁড়ি বেয়ে নামতে হবে মন্দিরের গর্ভে পুজো দিতে। অখাদ্য-খাওয়া অনাচারী সেই আধা-ফরাসির হাওয়াঘরের মেঝেতে মন্দির হয়?

দেখতে-দেখতে অনেকটা উঠেছেও মন্দিরটা। এখনই যেন আন্দাজ করা যায় আর কতদূর উঠবে, শেষ পর্যন্ত তা কী রকমের হবে। নদীর দিক থেকে সরে এসে চত্বরের শেষে কিছুটা ছেড়ে প্রায় গোলাকার হয়ে গড়ে উঠেছে মন্দির। প্রায় গোলাকার বলতে হয় কেননা মন্দিরের মেঝে যেন মধুর খোপ এমন ষট্‌কোণ। দেয়াল সোজা উঠছে। কিন্তু এখনই বোঝা যায় তা গম্বুজে শেষ হবে না, বরং যেন রথ। সেই রথের মাথায় থাকবে পদ্ম; পদ্মের একটা ভারি পিতলের গোলা—শিবলিঙ্গের মাথায় যেমন বজ্র। তা চত্বরযুক্ত মন্দিরটার গড়নই যেন গৌরীপাটসমেত আর-এক শিবলিঙ্গ।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বহু লোক কাজ করছে মন্দিরে। মন্দিরের কিছু পিছনে বাঁয়ের দিকে পিয়েত্রোর বাংলো। বাংলোর কাছে আর-একদল কর্মব্যস্ত মানুষ। তারা কুমোর। মনে হয় একটা টালির কারখানা বসিয়েছে। ছোট, বড়, নকশাদার; রোদে শুখানো হচ্ছে, পোআমে পোড়াচ্ছে।

মিস্ত্রি, যোগানদার, কুমোর মিলে অনেক লোক। কিন্তু যত লোক লাগুক, এমন-এক মঠ কি দু-চার-ছমাসে হয়? আর এক শীতই পার হয়ে যাবে হয়তো।

কিন্তু ইতিমধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। এসে পড়ল তারা। যেন হুমহাম শব্দও উঠছে এমনভাবেই ওরা গ্রামে ঢুকল। আর তা স্বাভাবিকই। কারণ তারা তো পঞ্চতীর্থের মাটিই আনেনি শুধু, প্রায় তিন হাত উঁচু তিন হাত বেড় নিকষের সেই থামটিও এনেছে যা নাকি শিব হবে।

খবর পেয়ে রাজবাড়ির স্বর্ণকার অষ্টধাতুর সেই পদ্ম তৈরি করতে লেগে গেল। সে তো থাকবে লিঙ্গের গোড়ায় মাটির নিচে, বসিয়ে দিলে তা আর চোখে দেখা যাবে না। কিন্তু সাগরেদদের বলল সে, দেখবে তো কারিগরি সেই একজনই যে সব দেখে।

আর তখন হঠাৎ শোনা গেল যে সাতদিনের মধ্যে শিব বসে যাবেন তাঁর মন্দিরে। একটু কেন, বেশ খানিকটা অবাক হওয়ারই কথা। মন্দির শেষ হল কোথায়? গ্রামের পণ্ডিতেরা পাঁজি খুলল। সার্বভৌমপাড়ায় এখনও তো টোল আছে। এমন কী মাহেন্দ্রক্ষণ বয়ে যায় যে এখনই এই অপ্রস্তুত অবস্থায় শিব বসাতে হবে? মিস্ত্রিরাজদের মধ্যেও বিস্ময় দেখা দিল। মনে করো উপর থেকে এক থান ইট খুলেই-বা পড়ে লিঙ্গের উপরে।

নরেশ ওভারশিয়ার এল। হরদয়াল শুনল। একটু ভেবে বলল 'আর কত গাঁথা বাকি?

'বারো হাত'।

'গাঁথাও তো পনেরো হল শুনেছি'। হরদয়াল আর-একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'কড়ি বরগার মতো

মোটা কাঠ বসিয়ে তার উপরে অস্থায়ী ছাদ করে, তার উপর বাকি দেয়াল গাঁথা চলে'?

মিস্ত্রিরা 'আজ্ঞা হ্যাঁ' বলে উঠে পড়ল। সোজার মধ্যে এমন পাকা বুদ্ধি বলেই না দেওয়ান।

কিন্তু এমন করে শিব বসানো অশাস্ত্রীয় যে তাও তো উড়িয়ে দেয়া যায় না। ওদিকে আবার রানীই ঠিক করেছেন তিথিটাকে।

২

দিন সাতেক আগে রানী বসবার ঘরে রূপচাঁদকে ডেকে বলেছিলেন উকিলসাহেবকে খবর দিতে।

এখনও এটাকে দেওয়ানকুঠি বলে। বাড়িটা তৈরির সময় থেকেই যে-নামে পরিচিত ছিল তা সহজেই বদলায় না। যদিও রাজবাড়ির লোকেরা এবং কাছারির আমলারা জানে এখন সেখানে হরদয়াল থাকে বটে, সে কিন্তু দেওয়ান নয় আর।

পদমর্যাদায় কিছু লাঘব হয়েছে বইকি। সেই একই লোক তো, আগে দেওয়ান ছিল, এখন আর তা নয়, যদিও তেমনই প্রায় সবই—চালচলন, কথাবার্তা। বেতনটা কমেছে, তাহলেও গ্রামের কেন, সদরের হিসাবেও এখনও তা অনেক। কোনো বিষযেই বানীর মত জানা সহজ নয়। সদর-নায়েবমশাই এই বিষয়ে একদিন শুনেছিলেন এরকম—মানী লোক তো, তাছাড়া ওই টাকাই তো ওঁব অভ্যাস ছিল। কেউ কেউ বলে উকিল। এটা একটা ব্যথার মতো ব্যাপার নাকি? রানী তাকে বরখাস্ত কবেছিলেন। দু-তিনটি বছব গড়িয়ে গেল না? ওদিকে কিন্তু তারপব আর-কেউ দেওয়ান হয়নি।

হরদয়াল ইজিচেয়ারে আধশোয়া অবস্থায়। চেয়ারের হাতলে কাঁচের গ্লাসে কিছু পানীয়। অন্ধকার হয়ে আসছে। মশালচি ওদিকের দরজায় বসে হিংকসের একটা বড় বাতিকে ঠিক কবছে। অন্ধকাবে একটা কোমল ভুলে-যাওয়া, দূবে সরে-যাওয়ার ভাব দেখা দিয়েছে। হরদয়ালেব হাত দুখানা কোলেব উপবে রাখা। কিছু ভাবছে সে।

রূপচাঁদ খুক করে কাশল।

'কে? রূপচাঁদ'? হরদয়াল মুখ তুলল, 'তুমি ছাড়া আর কে'?

রূপচাঁদ বলল, 'রানীমা একবার ডেকেছেন, আজ্ঞে'।

'এখনই'?

'আজ্ঞে, খাসকামরায়'।

'আসছি, বলো'।

রূপচাঁদ গেলে পোশাক পাল্টাল হরদযাল। মশালচিকে নির্দেশ দিল শোবার ঘরে আর লাইব্রেরিতে আলো যেন বেশি না-হয়। আলনা থেকে বালাপোশ নিয়ে হরদয়াল রাজবাড়ির দিকে গেল।

রানীব খাসকামরায় তখন ঝাড়ে আলো জ্বলছে। বোধ হয় মৃদু-মৃদু বাতাস একটা আছে ১৮৬০-এব শেষে হেমন্তের ঠাণ্ডাটাকে বাড়ানোর মতো। কিন্তু বালাপোশ অথবা শাল সত্ত্বেও বিঁধবে এমন নয়। রানীর পায়ের তলায় লাল গালিচা। তার উপবে আঙুলের ডগা চোখে পড়ে। গায়ে পান্না বঙের শাল। রানী বললেন 'এসো হরদয়াল, তোমাকে ডেকেছি আমি'। যেন-বা হাসলেন, বললেন; 'বোসো'।

রানীর হাসি সম্বন্ধে আলোচনা হয় না। কিন্তু তিনি যখন মুখ টিপে হাসেন তখন যে বাঁ দিকে সামান্য টোল খায় তা এতদিনেও হরদয়াল জানত না। এজন্য, বানী না-হলে বলা যেত, হাসিটাতে একটা অল্পবয়সী ভাব জড়িয়ে থাকে। তাঁর চুল টেনে তুলে বাঁধা, কিন্তু পাক দেখে অনুমান একসময়ে ঝাঁপটা ঢেউ তুলে থাকত তা কপালেব উপবে।

হরদয়াল বসলে তিনি বললেন, 'ব্যাপারটা একটা উৎসব'। কথার সূচনা করে চোখ তুললেন তিনি, তাঁর টানা চোখের পক্ষ্মগুলো সাধারণের চাইতে বড়। মনে হয় উপরদিকে ঈষৎ বাঁকানো।

বললেন 'তোমার মনে পড়ে হরদয়াল, মরেলগঞ্জে কালীপূজা হয়েছিল। ডানকান করেছিল। তুমি গিয়েছিলে। রাজুর নিমন্ত্রণ ছিল। সে যায়নি'।

বছর দু'এক আগে ডানকান কালীপূজা করেছিল, মরেলগঞ্জের নীলকুঠির ইংরেজ কুঠিয়াল ডানকান হোয়াইট। পূজা অবশ্য হয়েছিল তার দেওয়ান মনোহর সিংহের আটচালা চণ্ডীমণ্ডপে। আর ওদিকে যখন পূজা এদিকে ডানকানের বাংলোয় তখন আতসবাজি ফুটছে, মদ আর নাচ চলেছে।

হরদয়ালের কাছে ব্যাপারটা এখন কিম্ভুত। ঠিক হাস্যকর নয়, কেননা, শোনা যায় সেবারে সেই সিপাহী বিদ্রোহের অবসানে কলকেতার ফোর্টের কোন কোন জাঁদরেল ইংরেজও নাকি কালীঘাটে পূজা দিয়েছিল।

রানী বলে গেলেন, 'পিয়েত্রোর হাওয়াঘরে শিবমন্দির হচ্ছে শুনেছ বোধ হয়? আগামী বুধবারে, আর সাতদিনও নেই, বিগ্রহ স্থাপিত হবে। একটা উৎসব তো। ডানকানকে নিমন্ত্রণ দিলে হয়'?

হরদয়াল বলল, 'শিববিগ্রহ স্থাপনে...

থামল সে। (এ রকম মতামত দিতে পারত দেওয়ান, সে আর দেওয়ান নয়) বলল আবার, 'দিনের বেলায় তো'?

রানী বললেন, 'হ্যাঁ, নিমন্ত্রণ মন্দিরে হবে না। তোমার ভয় নেই। উপরন্তু এখনই প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে না যে ছোঁয়া লাগবে। (রানী কি হাসলেন!) পিয়েত্রোর বাংলোয় হতে পারে। দুপুরে একটা দুটোয় নাকি ডানকানেরা একবার খায়। বাগচীবাড়ি থেকে জানা গেল তাকে নাকি লাঞ্চো বলে। ডানকানকে সপরিবারে বোলো। মনোহরকে বলবে কিনা ভেবো। তোমাদের পক্ষে সস্ত্রীক বাগচী থাকবে। রাজু থাকতে পারে। তুমি থেকো। নায়েব-ই-রিয়াসৎ থাকবেন না।

রানী উঠলেন। আসনের পিছনের পর্দা ঠেলে অন্দরে যেতে যেতে দাঁড়ালেন, বললেন, 'মরেলগঞ্জে কীবল নামে এক ছোকরা সাহেব এসেছে, জানো'? হরদয়াল নিজের অজ্ঞতায় বিব্রত হল। রানী হেসে বললেন, 'তাকেও বলো'। দরবার শেষ হল।

কখন কী মনে আসবে, কোনটা আগে আসবার সুযোগ নেবে তা বলা যায় না। 'লাঞ্চো' এই শব্দটা মনে এল হরদয়ালের। উচ্চারণটা বিকৃত ; কিন্তু তা কি ইচ্ছাকৃত কিংবা না-জেনে? কৌতুক বোধ করল হরদয়াল। তারপর তার মনে এল নায়েব-ই-রিয়াসৎ এই ভারি শব্দটা। আর কেউ দেওয়ান হয়নি। পদটা শূন্য আছে। কিছুদিন আগেও তাকে সদর-নায়েব বলা হতো। এখন তার দায়িত্ব বেড়েছে, নামটাও বদলেছে। দেওয়ানের পরিবর্তে সদর-ই-রিয়াসৎ। ও, হ্যাঁ, কীবল নামে কোনো ছোকরা যদি এসে থাকে তার খোঁজ জানা তার কর্তব্য নয় আর এখন। রানী ও নায়েবের চরেরা তা করবে।

৩

সে যাই হোক, এর ফলে বিগ্রহস্থাপনের দিনটিতে ভিড়টা বেশ দর্শনীয় হয়ে উঠল। আমন্ত্রিতদের, কর্মচারী আমলা কারিগরদের সঙ্গে প্রচুর সংখ্যক রবাহূত যেমন এদিকে, ওদিকে তেমনি পিয়েত্রোর কুঠিতে লাঞ্চোর জন্য বাবুর্চি খানসামা, লাঞ্চে নিমন্ত্রিত নীলকুঠির সাহেব ডানকান, তার দেওয়ান মনোহর সিং, এ-পক্ষের বাগচীমাস্টার, তার স্ত্রী (ইংরেজ স্ত্রী ক্যাথারিন, সংক্ষেপে কেট), উকিল হরদয়াল তো বটেই, ডানকানের অতিথি সদ্য বিলেত-আগত কীবল নামে এক ছোকরা সাহেবও ভিড়টাকে বিশিষ্ট করে তুলল।

ভিড় যখন জমে উঠেছে, বেলা দ্বিপ্রহরের কিছু আগে, রানী এলেন। আগে-পিছে দুটো হাতি। হাতির আগে ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে দু'পাশে ঝোলানো লালসালুর ঝালরদার দুই দামামা, দুপাশ থেকে দু'জন তা পিটে চলেছে। তাদের পিছনে চোপদার দুই সারিতে। হাতি দুটির পিঠে হাওদা। রামপিয়ারী আগে। তার ঝুটো জরির কাজ করা লাল বনাতের জামা মাটি ছোঁবে যেন। তার চৌদোলা হাওদায় রানী। তাঁর

পাশে একজন মহিলা। ঠিক চেনা যায় না এমন অবগুণ্ঠন। কিন্তু রানীর পাশে মানায় বটে। হাওদার বাইরে রেলিং ধরে রূপচাঁদই। গায়ে তার লাল পট্টুর পিরহান। বুকে আড়াআড়ি বাঁধা নীল পশমি ধোকড়। মাথায় গাঢ় নীল মলমলের পগ্‌গ। পরের হাতিটি জয়নাল। একটু বয়স হয়েছে। রামপিয়ারীর দেড়া উঁচু, দাঁতাল। খোলা হাওদায় রাজু, রাজকুমার রাজচন্দ্র। রাজুর পরনে গলাখোলা ইংরেজি ব্লাউজ-কামিজ। হাতে বন্দুক।

ডগরের ঘোড়াই পথ করছিল। চোপদারদের দুই সারি সেই ফাঁকে ঢুকে ডাইনে-বাঁয়ে সরে-সরে চাপতেই ভিড়ের মধ্যে গলিপথটা তৈরি হল। সেই গলিপথের মাথায় হাতি থামল। প্রথমে রামপিয়ারী বসল। মাহুত নেমে রেলিংদার কাঠের সিঁড়িটা নামিয়ে হাতির গায়ে হেলান দিয়ে ধরল। রানী এবং তাঁর সঙ্গিনী আগে পিছে নামলেন।

তাঁরা এগিয়ে গেলে রাজচন্দ্র নামল তার হাতি থেকে। রূপচাঁদ এগিয়ে এসেছিল। তার হাতে বন্দুক দিয়ে রাজচন্দ্র মন্দিরের চত্বরের দিকে এগিযে গেল।

এতক্ষণ চত্বরটি খালি ছিল। সিঁড়ি বেয়ে রানীমা উঠতেই চত্বরের নিচে থেকে পুরনাবীরা উলু দিয়ে অনুসরণ করল। তাদের কারো কারো কাঁখে ঝকঝকে নতুন ঘড়া। তারা এগিয়ে যেতেই অন্য এক সিঁড়ি দিয়ে স্বগ্রামের আমন্ত্রিত পুরুষরা উঠতে লাগল চত্বরে। তখন জনতার মধ্যে গুঞ্জন উঠল—দেখা যাচ্ছে, দেখা যায়, আসছে ওই। কারা শঙ্খ বাজাল। নিকষের থামের মতো শিবলিঙ্গ বেশ দূর থেকেই দেখতে পাওয়ার কথা। ওদিকের আর-এক সিঁড়ি দিয়ে হরদয়াল আর ডানকানকে উঠতে দেখা গেল। তাদের ঠিক পিছনে বাগচীমাস্টার আর তার পাশে নতুন এক সাহেব। ভিড়ের মধ্যে ফিসফিসানি শোনা গেল, 'বাগচীর শ্বশুরকুলের নয়তো? নাকি ডানকান বেটাব মেস্‌তোভাই'। সাধারণ রবাহূতরাও একে-দুয়ে চত্বরে উঠতে শুরু করল এবার।

ততক্ষণে মিস্ত্রিরা মন্দিরেব ভিতরে ঢুকে গিয়েছে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়েছে। ভিড়ের থেকে ছোকরা বয়সের কয়েকজন বুদ্ধি করে কাছের এক গাছে গিয়ে চড়ল। তারপর গাছ ভবে উঠল মানুষে।

মন্দিরের দরজার সামনে, অর্থাৎ যেখানে দরজা বসবে, লিঙ্গকে স্নান করানো হল। মিস্ত্রিরা ততক্ষণে লিঙ্গ বসানোর গোল ফাঁদটাকে ঠিক করেছে। মন্দিরের ঘরে তখন নামলেন রানী তাঁর সঙ্গিনীকে নিয়ে—তার হাতেই পূজার উপকরণ। রানী ভিড়ের আর-একজনকে ডেকে বললেন, 'এসো, বড়গিন্নি'।

পঞ্চতীর্থের মাটি বার করে সে ফাঁদে সেই মাটি বসানো হল। প্রধান মিস্ত্রি বলল, 'এবার ..

রানী বললেন 'একটু রোসো'।

পিছন ফিরে বললেন, 'দাও এবাব যা এনেছ'।

রানীর সঙ্গিনী ফুলের সাজি থেকে একটা ছোট রুপোব বাটি দিল মিস্ত্রির হাতে। সে বাটি যেন রক্তচন্দনে টইটম্বুর। সঙ্গিনীই মিস্ত্রিকে বলে দিল, 'ওটার উপরে স্বর্ণেব শতদল বসবে, তার উপরে শিবলিঙ্গ'।

শোনা যায় মিস্ত্রিরা নলের বংশধব এবং হাতে যখন কর্ণিক তখন যোগান যে-ই দিক বাঁ হাতেই তা ধরে। এ নিয়ে সুগ্রীব না কার সঙ্গে একবার হাঙ্গামা হুজ্জত বেধেছিল। তাতে কিন্তু ধারা বদলায়নি। তীর্থের মাটি সমান করে, কর্ণিক দিয়ে গোল গর্ত করে বাটিটাকে বসিয়ে বাঁ হাতেই রানীর সঙ্গিনীর দু হাতে ধরা অত বড় স্বর্ণপদ্মটাকে নিল সে। সেটাকে বসিয়ে বলল, 'এবার তাহলে...

দু-তিনজনে মিলে নিকষের লিঙ্গটাকে সোজা করে ধরল। প্রধান মিস্ত্রি নিজেও হাত লাগাল। মেয়েরা উলু দিয়ে উঠল। ভিড় শিবের নামে জয়জয়কার দিল। ততক্ষণে কুচো ইট আর মশলার জমাট গুঁজে কর্ণিকের মাথা দিয়ে খুঁচিয়ে পোক্ত করতে লেগেছে মিস্ত্রিরা। ফুল ছড়িয়ে দিয়ে রানী পিছন ফিরলেন।

একেই তাহলে শিবপ্রতিষ্ঠা বলে। এই কি প্রথা—এ রকমই মনে হল দর্শকদের।

প্রথার কথা কজনেই-বা জানে। রোজ তো আর হয় না। দু'একজনের স্মৃতিতে অন্য কোনো-কোনো

শিবপ্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সে নিরিখে কি আজ যা হল তার বিচার হয়? রাজপুরোহিত ছিলেন। আমন্ত্রিতদের মধ্যে বৃদ্ধ শিরোমণিমশায় ছিলেন। রাজপুরোহিত প্রথমে কৌশলে কাটালেন, 'তা বাপু, আমি শিবতন্ত্র জানি না। এ শিবের জন্য তো নতুন পুরোহিতই এসেছে'। পরে আর একটু কৌশল করে বললেন, 'তোমরা যদি অন্যত্র অন্যরকম দেখেই থাকো সে কি রাজবাড়ির ব্যাপার? আমি তো বলি বাপু, তোমরা যদি প্রতিষ্ঠে করো, আর আমাকেই ডাকো, এখন জানা রইল, এমন বিধানই দেব'। শিরোমণি অত সহজে মুখ খোলেন না। মনে-মনে শাস্ত্র ঘেঁটে শিবলিঙ্গের মূলে রক্তচন্দনেরও আধার বসানোর যুক্তি খুঁজলেন। অশাস্ত্রীয়ই বোধ হল তাঁর কাছে। শিবপূজায় শ্বেতচন্দনই বিধেয়।

ভিড়ের টানে একটা মেলা বসে গেল। জিবেগজা আর দই, মুড়কি মোয়া মিঠাই, জোলাকি মাটা আর গামছা, বাঁশের দাঁড়ে বসা শোলার পাখি। মেলার টানেই মেলা চলল যেমন চলে, যদিও মন্দিরের চত্বর খালি হয়ে আসছে।

৪

মেলা থেকে ফিরতে-ফিরতে গ্রামের পোস্টমাস্টার চরণদাস বলল, 'ছিল ফরাসি সাহেবের হাওয়াঘর, হল শিবমন্দির। লাও'।

তার এক সঙ্গী বলল, 'এতদিনে পিয়েত্রোর আত্মার শান্তি হল গো'।

চরণদাস বলল, 'সে বাপু খেস্টানি আত্মা। ভারি মজেসে ঘুমোতে লেগেছে এখন। কোনো ক্ষেতিবৃদ্ধি নেই। সেই কবে রোজকিয়ামৎ হবে তখন দেখা যাবে'।

সঙ্গীরা নতুন খবরের আকর্ষণে ঘিরে ধরল চরণদাসকে।

একজন বলল, 'ইনসাল্লা, বলিস কী রে? তা চরণ তোর জানারই কথা। তুই তো আবার খেস্টান বাগচীমাস্টারের সাগরেদ'।

অন্য একে বলল, 'কী যেন রোজ বললে? তাতে কী হয়'?

চরণদাস হেসে বলল, 'সে ভারি মজার। সেই একদিন, তা সে যে কত লাখ বছর পরে আসবে এখন কেউ জানে না, সেদিন নাকি ভগবান বিচার করবেন'।

'মানে লাখ-লাখ বছর ধরে কোনো বিচারই হবে না'?

চরণদাস ঠা-ঠা করে হেসে উঠল। বলল, 'তাই তো। বলতে পারো ভগবানের এজলাসে তামাদি হয় না। কিন্তু কোটি-কোটি মানুষের পাপের হিসাব লাখ-লাখ বছর ধরে কে রাখে কে জানে। আমার তো মনে হয় ডানকান বেটা বুঝে নিয়েছে ওর আত্মার বিচারের কাগজপত্তর ততদিনে সব নিপাত্তা হয়ে যাবে। আর থাকলেও কিছু তা পড়া যাবে না'।

'ধরেছিস ঠিক'। অন্য একজন বলল, 'আমার এতদিন মনে হতো রহিমুদ্দিন যেমন বলে, সেই ইবলিশের বাচ্চা তাই। এখন এবার রহিমুদ্দিনকে বুঝিয়ে বলব—সেখানেও কাগজপত্তরের খেলা। তাছাড়া ধরো ঘুন বেনের জাত তো, অন্য কারো আত্মার ভালো কাগজ নিজের বলে হাতিয়ে নিতে পারে'।

এক সরল গ্রামবাসী গাঁক-গাঁক করে হেসে উঠল। সামনে থেকে আর-এক সরল গ্রামবাসী পিছন ফিরে বলল, 'তাই বুঝি ডানকানা কুঁদে বেড়ায়, চরণদা? তা, পিয়েত্রো কিন্তু ডানকানার মতো ছিল না। তাছাড়া তাকে তো পোড়ানো হয়েছিল। তার আত্মা ধরো যে ঘুমাবে কোথায়? আমার-তোমার আত্মার মতোই নাক দিয়ে বেরিয়েই যদি যমদূতের হাতে না-পড়ে থাকে, তবে চিতার আগুন নিবে অন্ধকার হতেই কী হয়েছে কে জানে'। সে শিউরে উঠল।

এখানে তাদের পথে আর-একটি পথ এসে মিশেছে। চরণদাস বলল, 'সে পরে ভাবিস। মেয়েরা এই পথে আসবে। তোরা এগো, আমি বউ-এর জন্য দাঁড়াই'।

হাসতে-হাসতে চরণদাসের প্রথম সঙ্গী বলল, 'তা, চরণ, গাঁয়ে তো বউ একা তোমারই, কেমন নাকি'?
চরণ বউ-এর অপেক্ষায় পথের পাশে সরে দাঁড়াল হাসতে-হাসতে।

৫

ভিড়ের প্রথম আর শেষ এক নয়। তখন আর চোপদারের সারিতে বাঁধা পথ নেই। বিশৃঙ্খলা, ঘোরাফেরা, ঠেলাঠেলি শুরু হয়েছে। ব্যাপার বুঝে চোপদাররা এগিয়ে এল। 'পথ দাও' বলে রূপচাঁদ চেঁচাতে লাগল।

রানী সামনে, পিছনে সঙ্গিনী। তার অবগুণ্ঠন কিছু শ্লথ। তিলফুল নাসা, সুগঠিত চিবুক আর টানা চোখ দুটি, নাকি লোচন বলে, চোখে পড়ছে। থেমে দাঁড়িয়েছিল তারা। পাশে চাইতে গিয়ে অদূরে রাজকুমারকে দেখতে পেল সে। কেমন বিড়ম্বনা দ্যাখো—নিঃশব্দ হাসিতে যেন এই কথাটা ছিল। রাজকুমারের শিকারের পোশাক দেখে ভ্রূটা কুঁচকে উঠল তার। কিন্তু রাজকুমারের চোখ নিজেব উপরে দেখে বরং পাশ দিয়ে টানা অবগুণ্ঠনে চিবুকের আর-কিছুটা ঢাকা পড়ল।

শিক্ষিত হাতি, ক্ষতি করে না , কিন্তু তার পায়ে তো চোখ নেই। সুতরাং তার গলার ঘণ্টা বেজে উঠতেই আপনি ভিড়টা এদিকে পাতলা হল। তখন চত্বরের শেষ ধাপ থেকে নেমে রানী বললেন, 'এসো, নয়ন'।

হাওদায় বসে আবার বললেন, 'রাজু বোধ হয় শিকারে চলেছে'। উত্তরের অপেক্ষা না-কবেই বললেন আবার, 'সাহেব দুটোর মধ্যে বুড়োটা বোধ হয় ডানকান'।

রানীকে নিয়ে রামপিয়ারী তখন খানিকটা এগিয়েছে। রামপিয়ারীর জরির জামার, চৌদোলা-হাওদার কিংখাবের ফুলকারি আলোয় চমকাচ্ছে। জয়নাল কিছু পিছনে। পাশে একটা গলিপথ। জয়নাল দাঁড়িয়ে পড়ে একটা গাছের ডাল ভাঙল। মাহুত ডাঙ্গস ঠুকল তার মাথায়। যেন হাসল এমন ভঙ্গিতে মুণ্ডু ঘুরিয়ে জয়নাল পাশের সেই গলিপথটাকে ধরল একটু দ্রুতগতিতে। ফলে সিঁদুরে খড়িতে আঁকা তার গায়ের পদ্মগুলো অস্পষ্ট হচ্ছে।

রানী আর-একবার কথা বললেন, 'বাগচীমাস্টারের স্ত্রীর কাছে শুনেই সব ব্যবস্থা হয়েছে নিশ্চয় লাঞ্চোর'?

পাড়ছাড়া দুধ-গরদের ঘেরে তাঁকে অন্যমনস্ক দেখাল। উপোস করে আছেন, মনে হল সঙ্গিনীর, হয়তো সেজন্যই একটু শুকনো দেখাচ্ছে। আব এতক্ষণে তা ঠাহর হল। রানীর সঙ্গিনীর অবগুণ্ঠন শ্লথ, নিচে থেকে বর্ণটা ঠাহর হল, তার জড়োয়ার কণ্ঠি কলার ঝিকমিক করল।

৬

লাঞ্চ শুরু হল ভাজা মাছ দিয়ে।

লাঞ্চ বটে নাম, আয়োজনটা ডিনারের। অন্যদিকে যেন হালের কক্‌টেইল পার্টির আভাসও আছে। ছ'জনের টেবিল, কিন্তু মাঝখানে সাজানো বোতল বোধ করি এক ডজন এবং তা নানা আকারের। সেগুলোকে ঘিরে কয়েক ডজন ঝকমকে কাঁচের গ্লাস। জলের গ্লাসই বরং অনুপস্থিত। সাদা ব্রোকেডের টেবলক্লথে ঝকঝকে হেমন্ত দুপুরের আলো।

পিয়েত্রোর বাংলোর একটা সাধারণ লাঞ্চ অবশ্যই ছিল না। আমন্ত্রণপত্রে স্বাক্ষর ছিল হরদয়ালের। তা কিন্তু রাজবাড়ির পক্ষ থেকেই হয়ে থাকবে এই ভেবেছিল ডানকান, কারণ উপলক্ষ তো ফরাসডাঙায় রানীমার শিবমন্দির স্থাপন। প্রটোকল নিয়ে খুব একটা চিন্তা করেনি ডানকান। কেননা মরেলগঞ্জ নীলকুঠির ম্যানেজার হিসাবে সে নিজে রাজবাড়ির ঠিক কার সমকক্ষ এ-নিয়ে কোনো নির্দিষ্ট বিধান নেই। তাছাড়া এটা এমন অনেকদিন থেকে চলে আসছে, রাজবাড়ির নিমন্ত্রণ আসে হরদয়ালের কাছ থেকে। এবং খানাপিনা হয় দেওয়ানকুঠিতে। সেও তো হরদয়ালের কুঠিই। অবশ্য রোজ-রোজ হয় না। রানীমার জন্মতিথি উৎসবে হয়।

প্রথমেই ডানকান বোতলের দিকে আঙুল তুলে ইঙ্গিত করল। বাবুর্চির সাগরেদ এগিয়ে এসে নির্দেশমতো বোতল খুলে গ্লাসে ঢেলে দিল।

এ-ব্যাপারে সম্ভবত আমাদের আশ্চর্য হওয়া সঙ্গত নয়। কারণ এ-সময়ের কাছাকাছি কলকাতায় মদ্যপান নিবারণী সমিতি স্থাপনের কথা শোনা যায় বটে ; প্রকৃতপক্ষে সেটা তখন তিনবোতলি মানুষদের ভিক্টোরীয় যুগ। তাদের উদরও নিতান্ত উদার ছিল। টেবিলের পায়া জড়িয়ে ধরে অনেকে ডিনার শেষ করার খ্যাতি অর্জন করতেন তখন।

টেবিলটা গোল। ঢুকতেই চোখে পড়ে কেটকে। পরনে চকোলেট রঙের স্কার্ট ব্লাউজ। মাথায় সাদা বনেট, তাহলেও তার লাল চুল কিছু চোখে পড়ছে। কনুই অবধি সাদা গ্লাবস ছিল, এখন পাশে খুলে রাখা। তার বিপরীত দিকে তার স্বামী বাগচী—'চন্দ্রকান্ত এড্রুজ বাগচী'। হালকা কালো ওরস্টেডের ব্রিচেস, কালো ভেলভেটের কোট, গলার সাদা বো। তার চিবুকে এখন দু-চারটে সাদা দাড়ি চোখ পড়ে। তাকে কালোই দেখায়।

কিন্তু সুবিচাল করতে হলে বলতে হবে হরদয়ালের গায়ের রং আরো কালো। সে রং আরো দৃষ্টি আকর্ষণ করে এজন্য যে তার নাক নিখুঁত এবং ধারালো। চোখ দুটি টানা। চিবুক সুগঠিত। ঠোঁট দুটি বিশেষ পাতলা এবং পরস্পরসংবদ্ধ। তার মুখটা শুকনো দেখাচ্ছে। চোখের কোণে কিছু কালি। তা কি অস্বাস্থ্যের? বরং হয়তো কাল রাতের লাল মদের ফলে। তার গায়ে গরদ রঙের গলাবন্ধ কোট।

কেট বলল, 'আজকের আবহাওয়াটা খুব সুন্দর'।

হরদয়াল বলল, 'তাপটা কোমল এবং আরামদায়ক'।

কেটের বাঁয়ে হরদয়াল ডাইনে ডানকান। রং যদি দেখতে হয় তাকেই লক্ষ্য করতে হবে যদিও তার পদবী হোয়াইট। গাজরের মতো রং। মাথার বিরল চুল তামার ভাবযুক্ত হলুদ। কাছে থেকে দেখার ফলে বোঝা যাচ্ছে তার নাকের মাথাটা মোটা এবং লাল। মুখে যথেষ্ট গর্ত গাড়া এবং গুটি। টুইডের কোট এবং ফ্ল্যানেল ব্রিচস। ঘরে ঢুকে সে রুপো-বাঁধানো-মালাক্কা লাঠি জমা রেখেছে দরজার পাশে স্ট্যান্ডে। সে যে মরেলগঞ্জের ইন্ডিয়া লিমিটেডের ম্যানেজার তা তার ঘোরাফেরা ওঠাবসায় প্রমাণ, যদিও ইদানীং তার মধ্যে কিছু আড়ষ্টতা ফুটছে ; সেই উনবিংশ শতকীয় বাত—যা ইংরেজ ভদ্রলোকের লক্ষণ।

ডানকান বলল, 'মৃদু এবং মধুর'।

কেটের বিপরীতে বাগচী। বাগচী এবং হরদয়ালের মধ্যে মনোহর সিং, বাগচী এবং ডানকানের মধ্যে কীবল। মন্দির দেখতে যাওয়ার আগেই হরদয়াল কেটকে আওয়ার হোস্টেস বলে পরিচিত করে দিয়েছিল।

মনোহর চোগা চাপকান পরেছে। মাথায় জরির কাজ করা শামলা। তার মুখের গড়ন রোগাটে, কিন্তু গালের মাঝামাঝি তক্ নেমে আসা চওড়া জুলফি, এবং ঠোঁটের কোণ বেয়ে ঝুলে পড়া ঝোরা-ঝোরা গোঁফ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কীবল এখানে বয়ঃকনিষ্ঠ। যেন খড়ির তৈরি এমন সাদা। মুখের গড়নে চৌকো চোয়াল এবং প্রয়োজনের চাইতে বড় নাক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একেবারে কটা চোখ, চুল তামাটের চাইতে লাল। বাদামি—লালে ডোরাকাটা টুইডের কোটে, গলাখোলা কামিজে দেখাচ্ছে যেন তাদের দেশের একজন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট।

হরদয়ালের মুখোমুখি সে।

হরদয়াল বলল, 'মাছটা কি কিছু শক্ত ভেজেছে মনে হয়'?

'ডেলিশাস'। বলল কীবল।

কারোকারো চরিত্র তার প্রথম কথাতেই প্রকাশ পায়। মনোহর সিং বলল, 'কিন্তু তা বলে কি সার, এ কি আর টেমসের হেরিং'।

কীবল বলল, 'ইউ নো টেমস'?

সে কিছুটা অবাক। মনোহর কৃতার্থ।

'বাট', বলল হেসে কীবল, 'টেমস ওঅজ নেবার ফেমাস ফর ফিশ। ইজ ইট হিলসা দো'?

বলা বাহুল্য তাদের ইংরেজি আলাপে ভাঙাচোরা বাংলা ও রংছুট বাঙালি-ইংরেজির মিশেল থাকছিল।

হো-হো করে হেসে উঠে ডানকান বলল, 'অ্যাংলো-ক্যালকাটানদের রোগ টোমাকে ঢরেছে আমি ডেকছি। কিন্তু হিলসা টোমার টামির পক্ষে ভালো যথেষ্ট নয়। ডিসেন্ট্রি ঘটায়। হোঅট ফিশ দিস হৃদলাল'?

হরদয়াল, 'উচিত ছিল রুই, দেখছি কাতল'।

মিষ্টি হেসে কেট বলল, 'আমি যে তার ব্যাপারে বিশেষ নস্ট্যালজিক তা নয়। বাট টেমস হ্যাজ হার ফিশেস দো হেরিং ইজন্ট এ গুড ফ্রাই'।

মাছের গ্রাসটাকে চিবিয়ে নিয়ে কীবল বলল হাসিমুখে, 'হয়তো, হয়তো। হোয়েন ইউ লাস্ট স্ব হার। দা ব্ল্যাক ব্রাকিশ ওঅটর দ্যাটস নাউ টেমস ইজ এ ডেড রিভার ফর অল পারপাসেস। (এখন যে কালো বিস্বাদ জলকে টেমস বলা হয় তা সবরকমেই এক মৃত নদী)।

ডানকান যে-বোতলটাকে খুলিয়েছিল কীবল সেটাকে পছন্দ না-করে ক্লারাট লেখা বোতলটাকে ইঙ্গিত করতে সেটা খুলে দিল এক খানাবরদার। কীবল নিজের হাতে গ্লাস ভরে নিল।

বাগচী আলাপে যোগ দিতে বলল, 'এরকম হল কেন'?

কীবল-এর বক্তব্যর অনুবাদ এই রকম : সবই কালো হতে চলেছে এখন, নদীর জল একসেপ্‌সন নয়। তাতে দুঃখও নেই। কারণ এ-যুগটা কয়লা এবং লোহার, বোথ ব্ল্যাক। নয় কি? অন্য রং যদি কোথাও থাকে তবে তা হোয়াইটের নীলে।

সে হাসল। ডানকান এই মৃদু রসিকতায় বলল, 'হ'।

আলাপটা দ্বিতীয় কোর্সে লোহা-কয়লা কারখানার দিকে গড়িয়ে তা থেকে স্টিম এঞ্জিন অবশেষে স্টিমারের গল্পে পৌঁছাল। স্টিমার যা নাকি বাষ্পের সাহায্যে সমুদ্রে চলে। কিমাশ্চর্যম্ অতঃপরং।

ডানকান বলল, 'কাম কাম, ফলমাউথের খেলনাগুলো ভালো কিংবা কলকেতা বন্দরে কিন্তু আমাদের বয়সে...

কীবল বলল, মিটমিট করে হেসে, সে নিজের চোখে প্লীমাথেও স্টিমার দেখেছে এবং তা ম্যান অব ওআরদের মধ্যে ঘুরতে। এই শীতে ব্রিন্ডিসি পর্যন্ত আসবে স্টিমার যদি না আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত পারে'।

'হোয়াট ডু ই' মিন ব্রিন্ডিসি', ডানকান বলল, 'তুমি ডেখো, এই সমুদায় টয়েস সাহায্যে বড়জোর ব্রিন্ডিসি আসা যাইবে কারণ তা ভূমধ্যসাগর'।

কীবল হেসে বলল, 'ভূমধ্য হলেও তা সাগর'।

ডানকান বলল, 'আটলান্টিক, প্যাসিফিক অথবা ভারতসাগরে স্টিমার আসিবে? ও নো, তুমি তেমন বলো না। কিংবা তা স্টিমারই থাকে কিন্তু হার ম্যাজেস্টির শিপ অফ দ্য লাইন হয় না। তুমি কি বলো

ব্রিটেন ওন্ট সেইল দা সিস্'।

কীবল বলল, 'ইনডিড, শি উইল। কিন্তু সেইল-এর অর্থ হবে তখন স্টিম অ্যাক্রস'।

হরদয়াল বলল, 'জুলাই-এর টাইমসে এ রকম একটা কথা সে দেখেছে বটে। কিন্তু তা কি সত্যি হবে? তা কি একটা সায়েন্টিফিক ফিকশনমাত্র নয়'?

ডানকান টাইমস পড়ে না। কলকেতার 'ইংলিশম্যান' বরং কেনে। কিন্তু ইতিপূর্বে সে কীবলের কাছে স্টিমারের উন্নতি সম্বন্ধে অবশ্যই জেনে থাকবে। তার কথায় বিস্ময়ের পরপরই যে কৌতূহলী অবিশ্বাস আসে তা দেখা দিয়েছে এখন।

মনোহর সিং বলল, 'ভগবানের কী সুবিচার। ইংরেজদের পক্ষেই এমন আবিষ্কার সম্ভব'।

সে যে ইতিমধ্যে নতুন এক জমিদারবংশ স্থাপনের স্বপ্ন দেখছে তা ভিত্তিহীন নয়।

বাগচী কেটের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। বলল, 'এও যদি সত্যি, বিস্ময় বলতে আর-কিছু রইল না'।

মৃদুস্বরে কেট বলল, 'আশ্চর্য, ইউ নেভার ক্যান টেল'।

বাগচী বলল, 'মানুষ হয়তো শূন্যপথেও চলবে আর ইঞ্জিনই তা পারবে'।

কেট হেসে বলল, 'তা কি সম্ভব যে মানুষ এঞ্জেল হবে? উই আর নট অব দি এয়ার'।

স্টিম, তার শক্তি, ইংরেজদের স্বজাতি-প্রীতি, মনোহরেব ইংরেজ প্রশংসা নিয়ে আলাপ জমে উঠল। তখন তৃতীয় কোর্স চলেছে।

কিন্তু কেউ কেউ থাকে যাদের শৈশবে নাক টিপে ধরে নিঃশ্বাসে সমতা রাখতে শেখানো হয়েছে। মৃদু হেসে হরদয়াল বলল, 'বাট দি ওয়াইন উইল চাইড'! সে একটা নতুন গ্লাসে ক্লারাট ঢেলে কেটকে এগিয়ে দিল। নিজের গ্লাসটা পূর্ণ করে নিয়ে বলল, 'লেটস ড্রিঙ্ক টু হিউম্যান উইজডম অ্যান্ড বিউটি'।

টেবলের দু-তিনটি গ্লাস শূন্যে চিন্‌ক্ করে উঠল।

লাঞ্চের ভার তার নিজের বাবুর্চির উপরেই যদিও তাকে সাহায্য করতে পিযেত্রোর বাবুর্চি বন্দাকে পাওয়া গিয়েছিল। তার বাবুর্চি নিশ্চয়ই তার পদ শেষের ইঙ্গিত বোঝে। তখন তাদের রোস্ট-বিরিয়ানি নিয়ে আসতে দেখা গেল।

ডানকান বলল, 'হৃদলাল, মাই ফ্রেন্ড হিয়ার ইজ এ সোলজার, এ সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড এ সেন্ট অল ইন উয়ান। ইউ উইল লাভ টু নো হিম'।

কীবল হাসিমুখে বলল, 'এ সোলজার ইয়েস, এ সায়েন্টিস্ট মে বি, বাট হাউ এ সেন্ট'?

'এইন্ট ইউ উয়ান অব দোজ এভানজেলিস্ট'?

এই রসিকতা করতে পেরে ডানকান আত্মপ্রীতিতে হু-হু করে হেসে উঠল।

কীবল দু'এক মুহূর্ত যেন এই রসিকতাটাকে অনুভব করল, তারপর আলাপের ধারাটা বদলে নিল। বলল : নিমন্ত্রণের কথায় সে আশঙ্কা করেছিল কী ভয়ঙ্কর টেবলম্যানার্সের মধ্যে না-পড়তে হয়, কিন্তু এখানে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই। ইট্‌স এ বিলিফ'। বোঝা গেল সে লাঞ্চটাকে প্রকৃতপক্ষে উপভোগ্যই মনে করছে।

হরদয়াল চিন্তা করল একই টেবলে বসে অন্যের টেবলম্যানার্স নিয়ে আলোচনা করা ইংরেজ আভিজাত্য কিনা তা ঠিক তার জানা নেই। যদিও ও-ছোকরার ইংরেজিটা উচ্চারণে ও শব্দ বাছাইতে ভালো। কিন্তু তার কোনো-কোনো চিন্তা জিহ্বায় ধারালো না-হয়ে চোখের কোণে ঝকঝক করে।

বাগচীও তখন কিছু সমস্যায় পড়ল। মনস্তত্ত্বগত কারণ হয়তো কীবলের কথা এবং কীবলের কথার মূলেও হয়তো মনস্তত্ত্বগত এই কারণ ছিল যে সদ্য বিলেত-আগত তার চোখে এখানকার টেবলম্যানার্স ঠিক বিলেতি নয়। বাগচী ভাবল : টেবলের মাথায় সে, যদিও এটা তার বাড়ির ভোজ নয়। সে কি প্রথম ছুরি বসাবে রোস্টে?

সমস্যার সমাধান করল ডানকান। সেই প্রথম ছুরি বসাল বাদামি করে ভাজা পিগ্‌লেট রোস্টে। মরেলগঞ্জ ইন্ডিগোর ম্যানেজার হিসাবে সে-ই কি এদিকের সব আসরের হেড নয়।

যেন এটাকে, ডানকানের এই ম্যানার্স বিচ্যুতিকে ঢাকতেই বাগচী বলল তাড়াতাড়ি, 'এটা উৎসব বটে, কিন্তু আমাদের স্বীকার করতেই হবে মরেলগঞ্জের সেই উৎসবের তুলনায় এটা কিছু নয়'।

খুশি ডানকান বলল, 'কোনটে মনে করছো বাগচী'?

'লোকে যাকে এখনও হোআইট সাহেবের কালীপূজা বলে'।

কীবল বিস্ময়ে ভ্রূ তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'কী বললেন, কী পুজো?

বাগচীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মনোহর সিং বলল, 'সে যে কী নাচগান, কী পুজো আর কত হাউই তুবড়ি'।

'এঃ! কীবল বিস্ময়ে থই পাচ্ছে না'।

মনোহর বলল, 'নট অনলি বেঙ্গল লাইটস সার, রকেটস, বুমবুম, থাউজান্ড রুপি ড্যান্সিং ফাউন্টেন্স অব ফায়ার'। সে এই জায়গায় হাউই ও তুবড়ির উৎক্ষেপ বোঝাতে হাত ও আঙুলের যথোচিত ভঙ্গি করতে ছাড়ল না।

কীবলের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটল, 'সব্লাড়! ওঅজ ইট এ পেগান গড হোয়াইট'?

ডানকান হাসল, 'দি হেল ইট ওঅজ। এ গডেস দো। সাম টাইমস ইউ হ্যাভ টু ইন্ড্ টু দ্য নাইট'।

কৌতুক বুঝে কীবল বলল, 'অ্যান্ড হিয়ার ইন ইন্ডিয়া নাইট হ্যাজ হার ওয়ে। কি, এসব কি মিউটিনির পরে ঘটিয়া থাকে'?

ডানকান বলল (তার স্বরবর্ণ কখনও কখনও বিশেষ চওড়া), 'ওয়াল, সব পেগান ভালো না-আছে। মানোআর এখানে ভালো পেগান হয়। ওয়াল তুমি কি জানো তাহার তিন ইস্ত্রি থাকে। সব ছোটটি তেরো হবে। সি মাস্ট হ্যাভ হার ওন সুইট্‌স'।

কীবল কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু থমকে গিয়ে বলল, 'উই আর এ মিক্সড কোম্পানি, হোয়াইট'। সে কেটের দিকে তাকাল। তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কেয়ার না-করে সেই রূপ তাব ভাল লাগল। সে বলল, 'ডেলিশাস। ইজ ইট পোলট্রি দো'? হরদয়াল কেটকে সাহায্য কবে বলল, 'নো, ফ্রম এ হান্টার্স ব্যাগ'।

কিন্তু ডানকান বলল, 'হুঃ'।

কিন্তু যেন সে মত বদলাল। কেটের উপস্থিতিকে মর্যাদা দিল। ইতিমধ্যে কি তার মন টেবিলের সময়ের চাইতে ধীরে চলছে? বলল, 'কিন্তু মনোআর রাজপুট আছে। রিঅ্যাল রাজপুট। দে হেল্পড আস, দা রাজপুটস। ইউ নো'।

সে যেন সোৎসাহে পাশে দাঁড়ানো খানাবরদারকে ক্লারাট দিতে ইঙ্গিত কবল। কীবল বলল, 'কিন্তু এসবে তোমার পেগান গডেস পূজা করার আর্গুমেন্ট নেই। হোয়াইট, এখানে কি পিওর স্টিকিং-এর সুবিধা আছে ডেওয়ানজি'?

ক্লারাটটা হাতে নিয়ে ডানকান বক্তৃতার ঢঙে বলল, 'আনঅ্যালোয়েড পেগানরা ভালো হয় যাহারা ক্যালিকে মাদার বলে। অবশ্যই বিঅতিক্রম আছে। হৃদলাল এথা, আমি টোমাকে আবার ধন্যবাদি হৃদলাল, তোমার স্কুল ভালো চলে তো? এবং প্রিন্সও। ইহাদের মতো না-থাকিলে, জানো, এ জেলাতেই লাখনাউ হইয়া যেত। দ্যাট ব্ল্যাগার্ড সন অব এ বিচ পিয়েত্রো। কিন্তু ভালো খুবই ভালো। অ্যাডোলেসেন্স পার হওয়া কালে ঘটে। মিউটিনি ওঅজ গডসেন্ট'।

শামলাসহ মাথা নুইয়ে মনোহর বলল, 'না-না, সার। কেন, সার, কীভাবে, সার? ঈশ্বরের ইচ্ছা হবে কেন মিউটিনি'?

ডানকান বলল, 'ডেখো, মানোয়ার তুমি সব জানে না, ডেখো; ক্রিমিয়ায় মার খাইয়ে ব্রিটিশ আর্মসের লজ্জা হইয়েছে। ভালো লজ্জা। মিউটিনিতে লজ্জা ধুইয়া গেল। কেমন, কীবল'?

ডানকান হাত ধোয়ার ভঙ্গি করল। ক্লারাটের বোতল উপুড় করে গ্লাস ভরে নিল।

একটু ভেবে, প্লেটটাকে বুড়ো আঙুল দিয়ে একটু ঠেলে দিয়ে কীবল বলল, 'তাহলেও আমি রিফর্ম সম্বন্ধে কিন্তু এখনও কেউ ভাবছে না, হোয়াইট। এটা দরকার, যদিও মিস নাইটিঙ্গেলই সেদিকে হয়তো একদিন দৃষ্টি দেবেন। আর তাহলে তা হবেও, অ্যান্ড বাই ডাবল কুইক মার্চেস'। বিস্মিত কেট বলল, 'ক্রিমিয়ায় কি এর মধ্যে যুদ্ধ হয়ে গেল নাকি'? সংবাদটা যে তার কাছে নতুন সে-বিষয়ে সন্দেহ রইল না।

বিস্ময়টা বাগচীরও। তার ভ্রূ উঠল। ক্রিমিয়া সম্বন্ধে ভাসা-ভাসা কিছু সে শুনেছে, কিন্তু সেখানে কি বড় যুদ্ধ হয়েছে! কী হয়েছে সে যুদ্ধে? একবার কীবল আর-একবার ডানকানের মুখের দিকে চাইল সে। পরে হেসে বলল, দ্যোখো, ডার্লিং, কেমন আছি আমরা। যুদ্ধের এসব খবর তাও আমাদের কানে পৌঁছায় না। আমরা ঘড়ির বিপরীত গতিতে চলছি না তো'?

ডানকান বলল, 'এইটা কি সত্য অজানিত ছিল? স্ট্রেঞ্জ! ভালো, আমার ধারণা ফরাসিরা জানিত। যেমন সেই ওয়ালি ফক্স পিয়েত্রো ফর উয়ান। এবং তাহাদের কাছে মারাঠিবা এবং দিল্লীর সেই বুড্ডা শয়তান। নিশ্চয়ই তাহারা সেকালে জানে আমরা ক্রিমিয়াব বেকায়দা পড়ি, ভালো বেকায়দা। আর তখন তাহারা মিউটিনি করে'।

কীবল হেসে বলল, 'এখন আর বেকায়দা নেই হোয়াইট। আর তোমার পেগান গডেস পূজার কথাও অনেক লোক জানে না। কিন্তু তুমি যে বলছিলে এখানে কি সত্যি স্কুল আছে অর্থাৎ যাকে ইংরেজিতে স্কুল বলে'?

ডানকান বলল, 'আ, সার উইলিয়াম, নিশ্চয়। এখানে এই হৃদলালেব স্কুল। আমি তাকে সাহায্য করিব. তুমি ডেখো। এটা হৃদলালেরই থিয়োরি যে এইসব স্কুল আমাদের বিপদে আমাদের পাশে দাঁড়াবে. এই থিয়োরিতে কিছু আছে। হুঁ-হুঁ। দি জেন্টুস ইন ক্যালকাটা গেভ আস মর‍্যাল সাপোর্ট'।

কীবল বলল, 'দেয়ার্স নাথিং রং উইথ স্যার উইলিয়াম জোনস। ইজ দেয়ার? আমি বাস্তবিক স্কুলের ব্যাপারে ইনট্রেস্টেড। এবং স্যাংস্ক্রিট পড়িতে চাই'।

হরদয়াল প্লেটের উপবে কাঁটা-চামচ শুইয়ে রেখেছিল। এবার প্লেটটাকে মৃদুভাবে ঠেলেও দিল। তাব মুখ যেন বিবস, কিন্তু হেসে বলল সে, 'আসুন একদিন স্কুলে। জাস্ট এ বিগিনিং দো'।

বাবুর্চিরা সম্ভবত হরদয়ালের ভঙ্গির উপরেই চোখ রাখছিল, তারা প্লেট বদলাতে শুরু করল।

নতুন কোর্সের সঙ্গে আলাপটা ঝুঁকল আজকের উৎসব শিবলিঙ্গ স্থাপনের কথায়। ততক্ষণে প্রত্যেকের প্লেটের সামনে একাধিক পানীয়ের গ্লাস জমেছে। কারো বেশি, কারো কম। বোঝা যাচ্ছে তারা প্রায় প্রত্যেকেই নানারকমের পানীয়ের স্বাদ নিয়েছে; কেউ হয়তো একই পানীয় গ্লাস বদলে একাধিকবার, অন্য কেউ-বা একই গ্লাসে একাধিক পানীয় মিশিয়ে।

কীবল বলল, 'মিস্টার হৃদলাল, ধর্ম নিয়ে কথা বললে আশা করছি এ টেবলে কেউ দুঃখ্ পায় না। আজ যা দেখিলাম তা হয় অর্থোডক্স পেগানিজম, পাথরপূজা, না? আর আমাদের হোয়াইট হয়তো রিফর্মড পেগানিজমের উপাসক হয়'।

ডানকান পোর্ট ঢেলে নিয়েছে এক গ্লাসে. অন্যটিতে শ্যাম্পেন। যেন তা মাপ করে মিশালে নতুন কিছু হয়। সে হোয়া-হোয়া করে হাসল। বলল, 'সইত্য। এ, মানোয়ার, তোমার আইডল ছিল। দ্যাট ব্ল্যাক নেকেড গ্যাল্, ওয়েলফর্মড দো। শি ওঅজ অ্যান আইফুল, আই বেট'। মনোহর তাদেরই একজন যারা নিজের জ্ঞান সম্বন্ধে সচেতন। সে বলল, 'এটাও একরকমের আইডল, সার, তবে একে বরং ফ্যালাস অর্শিপ বলতে হবে'।

কীবল যেন শিউরে উঠল। বলল, 'আক্ গশ'।

বাগচীর মুখে কী একটা হাড়ের কুচি পড়েছিল, কিছু সময় যেন সেজন্যই বিব্রত রইল। কিন্তু হঠাৎ

সে বলল, 'বাট মাচ অব ইট ইজ সিম্বলিজম। অ্যান্ড ইন এভরি রিলিজিআন দেয়ার আর সিম্বলস দ্যাট ক্যান বি মিসইন্টারপ্রিটেড'। (ইহার অনেকাংশই প্রতীক ব্যবহার। সব ধর্মেই প্রতীক ব্যবহার হয় যার কদর্য ব্যাখ্যা করা সম্ভব)।

কীবল বলল, 'ইন পেগানিজম ডু ইউ সে'?

বাগচী হাসতে হাসতেই বলল, 'হোয়াই, মাচ অব আওয়ার স্যাক্রামেন্ট ইজ সিম্বলিক। হাউ ডু ইউ ইন্টারপ্রেট ইউক্যারিস্ট ওয়েফার'? (কেন, স্যাক্রামেন্টের অনেকটা সিম্বলিক। ইউক্যারিস্টের রুটির কী ব্যাখ্যা হবে)?

কীবলের মুখ লাল হয়ে উঠল। স্যাক্রামেন্ট—ইউক্যারিস্টকে লিঙ্গোপাসনার মতো অপবিত্র বিষয়ের সঙ্গে তুলনা? সে বেশ শক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্টার বাগচী তা'লে ক্রিশ্চিয়ান নয়'?

বাগচী কাঁটা-চামচ রাখল।

ডানকান চোখ দিয়ে ইশারা করল কীবলকে। এমনকী স্পষ্ট করেই বলল, 'নাও মিট হিম'। অবশ্যই ইতিপূর্বে কীবলকে বাগচী সম্বন্ধে কিছু বলছে সে, আব এখন তা মিলেও যাচ্ছে যেন।

হেসে হরদয়াল বলল, 'বাগচী বলে থাকেন এখনও ক্রিশ্চিয়ান হতে পারলাম না'।

বাগচী হাসল। বলল, 'দেওয়ানজি, কথাটা মিথ্যাও নয়। লাখনাউ কিংবা দিল্লী কিলিং কোনোটাকেই অন্তর থেকে ক্ষমা করতে পারিনি। এ রকম আর আছে?

ডানকান যেন চেয়ার ঘুরিয়ে বসল। ঝাঁজেব সঙ্গে বলল, 'হোয়াট ডু ইউ মিন, 'দিল্লী কিলিং'!

বাগচী বলল, 'লাখনাউতে যদি নরহত্যা হয়ে থাকে দিল্লীতেও হয়েছে। লেটস্ ড্রপ ইট'।

অস্তস্তি বোধ করে গলা সাফ কবল হরদযাল। অনেকসময়ে সুযোগ পাওয়ামাত্র তা ধবতে হয়। এই সময়ে বাবুর্চিরা ঢুকল। ট্রের দিকে চেয়েই হবদয়াল উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, 'চিকেন প্যাটিস আর দে? ওয়েল, মিস্টার হোয়াইট, আই স্পেশ্যালি ইনভাইট ইউ টু দেম। দে আর সামহোয়াট অভ এ স্পেশ্যালিটি অব মাই সোলটান আহমেদ'।

হঠাৎ কী হয়ে গেল! এই সাজানো-গোছানো ঝকঝকে টেবলের পাশের মানুষগুলোকে আর-যেন উৎসবের অঙ্গ বলে মনে হবে না। তাদের কথাগুলো তাদের চিন্তা যেন চীনামাটির ও কাঁচেব পাত্রগুলোতে পুরনো ফাটল সৃষ্টি করছে। কেট অদ্ভুত সাহসে হোস্টেসেব কাজ করল। মধুর হেসে বলল, 'মিস্টার কীবল, ক্রিমিয়ায় প্রভিশ্যন কেমন ছিল? আপনাদের নিশ্চয়ই কষ্ট হয়েছে'?

কীবলও বোধ হয় সেই মুহূর্তেই সম্বিৎ পেয়েছে। সে একটু জোর দিয়ে বলল, 'রাম ফর ব্রেকফাস্ট, রাম ফর ডিনার, রাম ফর ব্রোকেন লিম্বস। মিস নাইটিঙ্গেল ইজ থিংকিং অ্যাবাউট লাইস অ্যান্ড ভার্মিন অন দ্য সোলজার্স, ওয়েল সামাদার লেডি উইল্যাব টু থিংক আউট হোয়াট গোস্ ইনসাইড দেম। (প্রাতরাশে রাম, ডিনারে রাম, হাত-পা গুঁড়োলে রাম। মিস নাইটিঙ্গেল সৈনিকদের গায়ের উকুন আর পোকার কথা ভাবছে। আর কাউকে ভাবতে হবে তাদের ভিতরে কী যায়)। সে হাসল।

ডানকান তার উত্তেজনার বিষয়টা থেকে সরতে পেরেছিল, কিন্তু ভিতরে ছিল বিরক্তি। সে বিরক্তমুখে বলল, 'শি উইল আনম্যান দি সোলজার্স, দ্যাটস হোয়াট শি ইজ আফটার'। (সৈনিকদের সে স্ত্রীলোক না-করে ছাড়বে না। সেটাই তার উদ্দেশ্য)।

'কে'? কীবল জিজ্ঞাসা করল।

'ইওর লেডি উইথ দা ল্যান্টার্ন'।

কীবল হো-হো করে হেসে উঠল। 'গশ, হোয়াইট? মিস নাইটিঙ্গেলকে লেডি উইথ দ্য ল্যাম্পই তো বলেছে। তুমি তার হাতে লণ্ঠন দিলে'?

সুতরাং প্যাটিসে কাঁটা ছোঁয়াল তারা।

প্যাটির পর ফল—ফল আর মিষ্টি। তখন একটা যোগাযোগ ঘটে গেল হরদয়ালের বাবুর্চির

অসাবধানতায়। যেহেতু সে দেওয়ানকুঠি থেকে আনা মদের বোতলগুলোকে ভোরের অন্ধকার থাকতেই পিয়েত্রোর প্রভিশনের আলমারিতে তুলেছিল, এবং টেবল প্রায় মদশূন্য অবস্থায় দেখে মদের আর-একটা বোতল আনতে গিয়ে তাড়াতাড়িতে খেয়াল করল না যেটা সে নিয়ে যাচ্ছে তার গায়ে অনেক মাকড়সার জাল, যা থাকা উচিত নয়। এবং বোতলটাও কালচে কাচের বেঁটে, মোটা এবং বেশ বড়। পিয়েত্রোর বাবুর্চি বন্দা লক্ষ্য করেছিল, কিন্তু তার হাতের ইশারা হরদয়ালের বাবুর্চি সোলটান বুঝতে পারল না।

বোতলটাকে কোমরের ঝাড়নে মুছে টেবলে রাখতে যে প্রথম অবাক হল সে হরদয়াল। সে হাতে নিয়ে দেখল ভিনটেজের তারিখটা ১৮৩৫। শব্দগুলো অপরিচিত।

ডানকান অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কী এটা'? হাতে নিয়ে পড়ল, উচ্চারণ করল চ্যাম্বার্টিন। প্রকৃত ইংরেজ কখনও ফরাসি পড়ার সুযোগ ছাড়ে না।

মদটা লাল রঙের। ইঙ্গিতে বাবুর্চি খুলে দিল। নতুন গ্লাস দিল সকলের সামনে।

ডানকান হয়তো আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল যে এই আসরে অন্তত একবাব তা করতেই হবে কেননা সে ইংবেজ। গ্লাস হাতে নিয়ে সে বলল, 'আসুন আমরা স্বাস্থ্য পান করি'।

সে গ্লাস হাতে উঠে দাঁড়াল। দেখে কীবল এবং হরদয়ালও দাঁড়াল। গ্লাসগুলো মৃদু ঝনৎকাব তুলে টেবিলের উপরে শূন্যে একত্র হল।

অট্টহাস্য করে ডানকান বলল, 'হিয়ার্স টু হাব ম্যাজেস্টি কুইন বিক্টোরিযা'। কীবল ও হবদযাল যুগপৎ বলল, 'টু হার ম্যাজিস্টি'। বাগচী, কেট ও মনোহরকেও উঠতে হল।

ফবাসি মদটা গলায ঢেলে বসতে-বসতে সশব্দে গ্লাসটা বসাল টেবলে ডানকান। সেটা তার হাতের নিচে ফাটলো কি?

সে কি ফরাসি নাম থেকে মদটা পিয়েত্রোর ভাঁড়ারের এমন আন্দাজ করেছিল? অথবা ফবাসি শব্দগুলোই একজন পরিচিত ফরাসির কণ্ঠ মনে আনতে পারে?

হরদয়াল তাব গ্লাসে আবার একটু মদ নিল। একাই উঠে দাঁড়াল। শূন্যে হাত তুলে বলল, 'দিস্ টু রানীমাতা। মে গড ব্লেস হার'। পান শেষে গ্লাসটাকে সে কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে ছুঁড়ে দিল। দেয়ালে লেগে সেটা ঝনঝন করে ভেঙে পডল।

ফলে হাত দিল সবাই। সেগুলি অবশ্যই দুষ্প্রাপ্য এ-অঞ্চলে এবং ইউবোপেও। হবদযালের ইঙ্গিতে বাবুর্চি তার চুরুটের বাক্স বার করল। কীবলের দিকে তা এগিয়ে ধরল হরদয়াল।

কীবল এক্সকিউজ মি বলে প্রত্যাখ্যান করল।

মনোহবই আবার সকলের চাইতে বেশি বিস্মিত হল, 'সে কী সার, সোলজার হয়েও খান না। ভালো জিনিস কিন্তু। আমাদের দেওয়ানসাহেব বিশেষ সৌখীন জানবেন'।

কীবল হাসিমুখে বলল, 'ক্রিমিয়া-ফেরত সোলজাররা দাড়ি এবং তামাক ইংল্যান্ডে আবাব ফিরিযে আনছে বটে। আমি কিন্তু পাইওনিয়ার্সদেব একজন নই'।

স্বচ্ছ কৌতুকের আশ্বাসে বাগচী বলল, 'ফিরিয়ে আনছে কী বকম'?

মৃদু হেসে কীবল বলল, 'এইভাবে ফ্যাশান যাওয়া-আসা করে। ইংল্যান্ডে তামাক ও দাড়ির আদর সত্তর আশি বছর ছিল না। আবার প্রাদুর্ভাব হয়েছে। নস্য নয়, ধোঁয়া। এবং তা ক্রিমিয়ার পব'।

ডানকান বলল, 'ইহার জন্যও কি তোমাব উওম্যান উইথ ল্যাম্পকে ধন্যবাদি'?

কীবল হো-হো করে হেসে উঠল। 'হোয়াইট, তুমি লেডি উইথ দ্য ল্যাম্পকে নিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়েছ। কিন্তু অসুস্থ আহত ক্রিমিয়ার সেই সৈন্যদলের শয্যার পাশে তাঁকে কিন্তু এ্যাঞ্জেল বলেই মনে হতো। আর আমাদের মতো ভুক্তভোগী কে'?

হরদয়াল বলল, 'গত সপ্তাহে টাইমসে একটি সংবাদ পড়ছিলাম। লন্ডনে সেন্ট টমাসের হসপিট্যালে নার্স ট্রেনিং স্কুল খোলা হয়েছে। এবং আশা করা হচ্ছে তা গোটা পাশ্চাত্য জগতে নার্সিং-এর ব্যাপারে

আমূল পরিবর্তন আনবে। স্যার সিডনি হার্বার্টের সহানুভূতি আকৃষ্ট হয়েছে। এসবের মূলেও মে-ফেয়ারের এক মিস নাইটিঙ্গেল'।

কীবল বিশেষ বিস্মিত হল। সে বলল, 'বটে? স্যার সিডনি যখন, তখন সংবাদের এই মহিলাই মিস নাইটিঙ্গেল। কিন্তু...'এটা বিশেষ আশ্চর্যের ব্যাপার যে এই গ্রামে এক ব্যক্তি টাইমস কাগজ পড়ে। এবং সেন্ট টমাস হাসপাতালে নার্সিং স্কুলের খবর একেবারেই নতুন তার নিজের কাছে।

সে বলল, 'আশ্চর্য! এখানে টাইমস আসে? সেন্ট টমাসে নার্সিং স্কুল হচ্ছে'?

হরদয়াল লজ্জায় পড়ল। সে বলল, 'তাকে সাবসক্রাইবার হওয়া বলে না। আর কাগজগুলো আসতেও সময় নেয়। গত সপ্তাহে পড়েছি, কিন্তু সংবাদটা বেশ পুরনো'।

'কিন্তু', কীবল বলল, 'তাহলেও সংবাদটা এদিকে নতুন। আমি জানতাম না। ছ'মাস পিছিয়ে হলেও আধুনিক ইংল্যান্ডের খবর আপনি রাখছেন যা আমরাও অনেকে জানি না। না, ক্যালকাটাতেও অনেকেই নয়'।

হরদয়াল মৃদু হেসে বলল, 'না-জানলে মোকাবিলা হয় না'।

লাঞ্চ কিংবা সে-নামেরই অন্য কিছু হোক ঘণ্টাদুয়েক শেষ হয়েছে। দিনের আলো তখনও উজ্জ্বল। জানলা ও পর্দার ফাঁকে একটা আলোর ফলক এসে পড়ল টেবিলের কাচের উপর।

সিগার ধরাল হরদয়াল এবং ডানকান। বাগচী তার পাইপ।

ডানকান বলল, 'হৃদলাল, তোমাকে আবার পুনরায় ধন্যবাদি। হঁ- হঁ মরেলগঞ্জের পক্ষ হইয়া ধন্যবাদ। ফাইন কুকিং, ফাইন ওয়াইন'।

ডানকানের ঘাড়টা কি একটু নড়ল কথা বলতে গিয়ে। সেই চ্যাম্বার্টিনের বোতলটার দুপাশে টেবিলের উপরে তার হাত দুটো ছড়ানো। মনে হল আঙুলগুলো যেন টেবিলের উপরে ড্রাম বাজানোর চেষ্টায় আছে। তার মুখ তো বটেই চোখ দুটোও লাল। সে বোতলটাকে তুলে আলোয় ধরল। তলায় কিছু মদ আছে তখন'।

হরদয়াল বলল, 'আর-একটা আনিয়ে নেব'?

ডানকান বলল, 'ও নো। উই মাস্ট লিভ। আমাদের যাইতে হইবে। বৈকাল হয়'।

কীবল রসিকতা করে জিজ্ঞাসা করল, 'আর উই স্যুয়োর'।

ডানকান বলল, 'যদি না স্কুলমাস্টারের বউ-এর প্রেমে পড়ে থাকো। ইজিন্ট শি বিউটিফুল'? হো-হো করে সে হাসল।

সে উঠে দাঁড়াল। এবং সেজন্যই তার হিক্কা উঠল। মনোহরের পাশে গিয়ে তার বগলের তলে হাত দিয়ে ঠেলে তোলার চেষ্টা করল। বলল 'ওয়াল মাই ডার্লিং গার্ল'।

হরদয়াল অল্প, বাগচী ঠোঁট টিপে, কেট হাত দিয়ে মুখ ঢেকে, কীবল প্রকাশে হো-হো করে হেসে উঠল। হরদয়াল ভাবল, এই খুশির ভাবটা কি লাঞ্চকে সার্থক করল!

ডানকান হোয়াইটের রসিকতার কারণটা কী—তা কি নারীবর্জিত কুঠিতে দীর্ঘদিন থাকার ফল? অথবা বার্গান্ডি যার ভিনটেজ ১৮৩৫? সে দস্তানা আর চাবুক সংগ্রহ করল। একটু কি অসমান পড়ল তার পা? যখন এইসব বিষয়ে ভাবা যাবে এক অপ্রত্যাশিত পরিসমাপ্তির সূচনা করল বাগচী।

ডানকান ও কীবলের ঘোড়া। রাজবাড়ির ভৃত্যরাই ঘোড়াদুটিকে এগিয়ে আনল। তাদের পিছনে হরদয়ালের পালকি নিয়ে বেহারারা, শেষে মনোহর সিং-এর একা নিয়ে তার সহিস এগোল।

বাংলোর সিঁড়ি দিয়ে নামছে মনোহর আর ডানকান তখন। বাগচী বারান্দায় কীবলের পাশে। বাগচী বলল, 'মিস্টার কীবল, আপনি কি আমাকে ক্ষমা করতে পেরেছেন? আমি এই পেগান রাইটের সঙ্গে স্যাক্রামেন্ট ইউক্যারিস্টের কথা বলে আপনার অনুভবকে আঘাত দিয়ে থাকব। আমি দুঃখিত'।

কীবল বাগচীর দিকে মুখ তুলল। কিন্তু কী বলা উচিত চট করে তা যেন খুঁজে পেল না। এক্ষেত্রে

এদেশে কিছু বলাই কি প্রথা?

শেষ সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে ডানকান পিছন ফিরল।

সে বলল, 'গুডবাই হৃদলাল, গুডবাই বাগচী। আইস, কীবল। বাগচী, তোমাব বোধ হয় অনুতাপে স্মরণ হয় (হিক্কা) অসাম্প্রদায়িক ক্রিশ্চিয়ানিটি আই মিন (হিক্কা) চার্চ ছাড়া যাহা তোমার তাহা মানুষকে সভ্য করে না। মানুষ হিদেনই রহে। টোমার মতো হইবে বাগডিব ন্যায়'।

হাসতে গেলে আবার হিক্কা উঠল তার।

'হয়তো, হয়তো'—বাগচী বাও করল। তার ঠোঁটের কোণে একটা হাসি স্পষ্ট হল। কীবল ও কেটের মধ্যে নামতে-নামতে সে বলল, ধর্মের সিম্বলগুলোর লৌকিক ব্যাখ্যা দেওয়াই বোকামি। ইউক্যারিস্টের ওয়েফার ছিঁড়ে মুখে দেওয়াকে নিশ্চয়ই কেউ নরমাংস ভক্ষণ মনে করে না, সত্যি তো সেটা ক্রাইস্টেব মাংস নয়।

সিঁড়িব ধাপে দাঁড়িয়েই ঘোড়ার লাগাম ধরল ডানকান, ঘোড়ায় উঠতে যে জোরটা লাগে তা যেন তার মুখে প্রকাশ পেল। হঠাৎ রেগে উঠে বলল, 'চওপ্! ফের বলিলে হাড্ডি গুড়াগুড়া করিব'।

কী যেন একটা ভেঙে পড়বে, যেন লাঞ্চটাই। বাগচীর মুখ এত কালো যেন তাকে চেনাই যাবে না। মনে হল পাদরিদের পক্ষে তাব কাঁধটা বিশেষ চওড়া দেখাচ্ছে। কিন্তু হো-হো করে হেসে উঠল বাগচী. বলল, 'লেট হিম স্লিপ ইট অফ, মিস্টার কীবল'। (ঘুমিয়ে নেশাটা কাটাক)।

সিঁড়ির পাশে তখন কীবলের ঘোড়াটাও। সে কি কিছু বলবে? কিছু ভাবছে কি সে? ডানকানের ঘোড়াটা উল্টোপাল্টা নির্দেশেব জন্য ল্যাজ দুলিযে মাথা ঝাঁকিযে একটা পাক খেয়ে সিঁডিব দিকে ফিবে এল। হরদযাল হেসে বলল, 'গুডবাই মিস্টাব হোয়াইট'।

ডানকান বলল, 'আই'ম অ' রাইট'।

কিছুদূরে যখন কীবল ডানকানের কাছে পৌঁছেছে, মনে হল ডানকান কিছু বলল, আর তা শুনে কীবল হাসল। পবে ডানকানও হো-হো কবে মদো গলায় হাসল। ঘোড়াব উপবে একবার সে শোয়ার চেষ্টা করল যেন, পবে সেটাকে কাটিয়ে উঠল। হাজাব হলেও ইংরেজ তো।

২

সস্ত্রীক বাগচী পিয়েত্রোর বাংলোর বাবান্দায গাড়িব জন্য অপেক্ষা কবল। গাড়ি অর্থাৎ গোরুর গাডি। জেনে রাখা ভালো, মরেলগঞ্জে দু-তিনখানা ঘোড়ায় টানা গাডি আছে। রাজার গ্রামে যানবাহন বলতে পালকি, ডুলি, গোরুর গাড়ি, হাতি, ঘোড়া বুঝিয়ে থাকে। মরেলগঞ্জেব ওরা কুঠি তৈরি করার সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম যোগচিহ্নের মতো দুটো সুরকির সড়ক তৈরি কবেছে। সে জন্যই কি ঘোড়াব গাড়ি? যদিও বর্ষা ছাড়া অন্যসময়ে প্রচুব ধুলো উড়িয়ে মরেলগঞ্জের বাইবে এ-গ্রামে ও-গ্রামে মরেলগঞ্জের এক্কা-ফিটনগুলি চলে। এটা এক আধুনিকতা যা রাজার গ্রামে এসেও আসছে না।

'কথা বলছ না যে'? কেট বলল।

'বলছি তো। আমি বেশ একটু অবাক বোধ করছি'। বাগচী বলল, 'রেলগাড়ি হলে স্টিমার জাহাজও হতে পারে, কিন্তু কত তাড়াতাড়ি হল তা দ্যাখো। কিছুদিন আগেই হয়েছে, আমরা খবর রাখিনি। কলকাতা থেকে দূরে'।

কেট হুঁ বলে নিজের চিন্তায় আবার ফিরল। চিন্তার অনেক বিষযই থাকতে পারে। পিয়েত্রোর বাংলোর বারান্দায় দাঁড়িয়ে যে অনুভূতি তার হচ্ছে তা নিয়ে কি আলাপ করা যায়? কখনও সে পিয়েত্রোকে দেখেনি। কিন্তু এটা পিয়েত্রোর বাংলো, যার মতো আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এদিকে কম দেখা যায়। সামনে

পিয়েত্রোর হাওয়াঘর যেখানে মন্দিরটা উঠছে, আর, গুজব অনুসারে, যেখানে সিপাহিবিদ্রোহের আগুনের আভা দেখা দিয়েছিল। বাগচী কিছু জানে। কিন্তু বাগচী বলল, আমরা ক্রিমিয়ার কথা কতটুকু জানতাম'?

'আমরা ইংরেজি সংবাদপত্র পড়ি না'।

'হুঁ। কেন পড়ি না? ইংলিশম্যান পছন্দ হয় না? রোসো, আজ থেকেই ব্যবস্থা হবে। দেওয়ানসাহেবের টাইমস আসে। চেয়ে আনলেই হল'।

'আচ্ছা, লন্ডনের মে-ফেয়ারের মহিলা হসপিট্যালে সোলজারদের নার্স করছে, এটা কি সমাজে আলোড়ন আনে না'?

'আনে। বোধ হয় স্টিমারের চাইতে কম নয়। যদিও আমি জানি না স্যার সিডনি এখন ঠিক কোন পদে আছেন। মনে হয় এটা লন্ডনের একেবারে নতুন খবরের একটা। আর সেজন্যই কীবলের বিস্ময়'।

বাগচীও যেন কিছু ভাবছে। তা কি লন্ডনে যে-পরিবর্তন হচ্ছে তার কথা?

কিছুক্ষণ পরে কেট আবার বলল, 'আচ্ছা, মোকাবেলা কথাটার মানে কী'?

'দেওয়ানজি যা বলেছিলেন, সামনা-সামনি হওয়া বলতে পারো। তবে তোমার আমার মুখোমুখি হওয়া নয়। সাধারণত একটা বিপদ বা আশঙ্কার আভাস পিছনে থাকা চাই'।

অল্পসময়েই তাদের গাড়িটা এল। গোরুগাড়িটা অসাধারণ কিছু নয়। কিন্তু তখনকাব দিনে অর্থবান লোকেরা ব্যবহার করত বলে পরিচ্ছন্ন এবং চোখের পক্ষে তৃপ্তিকর বাখার চেষ্টা ছিল।

বাগচী হাসল, 'কিন্তু, ডার্লিং, এটাও কি একরকমের টাইমলেসনেস নয়—ওই কাগজ না-পড়া'?

কেট বারান্দা থেকে নেমে গাড়ির দিকে রওনা হল, বলল, 'এসো, আমি কিন্তু এই সময়হীনের শকট থেকে হেঁটে যাওয়া পছন্দ করতাম'।

কেটকে হাত ধরে গাড়িতে তুলতে গিয়ে বাগচী বলল, 'এর চাইতে ভালো হতো ঘোড়া। এরপরে এ রকম কোথাও যেতে হলে দেওয়ানজিকে জোড়া ঘোড়ার কথা বলব'।

কেট বলেছিল, 'সে তো পরে। আজ এ-ব্যাপাবটাকে সামলে নিই'।

তার মুখ সত্যি কিছু বিবর্ণ।

এখন, গোরুর গাড়ির এই অভ্যাস যে তা আরোহীকে নানারকমে পরীক্ষা করে থাকে। এপাশ থেকে ওপাশে গড়িয়ে, সাধারণভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে, উপর থেকে নিচে ছোটখাটো আছাড় দিয়ে সে-পরীক্ষা। তখন কোনো চিন্তা করা যায় না, করলেও চিন্তাই বরং ভেঙে টুকরো হয়ে যায়।

দু'একবার বাগচী হেসে উঠল গাড়ির রসিকতায়, কেট অনেকবার ভ্রূকুটি করল। একবার কেট মনে করল রানীমার এই লাঞ্চ সম্বন্ধে আলোচনা করবে—এটা তাঁর রাজনীতি হতে পারে যার স্বরূপ কিছু না-বুঝে তাকে সার্থক করতে তারা আজ সহায়তা করেছে। যদিও তারা রাজকর্মচারী নয়। কেন আদৌ তাদের এ-লাঞ্চে যোগ দিতে হল। বাগচী বলেছিল দেওয়ানজি বলেছেন। আর তোমাকেই হোস্টেসের দায়িত্ব নিতে হবে। দেওয়ানজি শুধু নিয়োগকর্তা নন। বলা যেতে পারে, বন্ধু, পেট্রন। কিন্তু তাদের নিজেদের মনের মধ্যে কি দ্বিধা ছিল না? কিন্তু ঠিক তখনই গাড়ির আচ্ছাদন, যাকে ছই বলে, কেটের মাথা তাতে ঠুকে গেল। কেট মুখ লাল করে সামলাল কিন্তু চিন্তাটা ভেঙে গেল।

গাড়িটা যখন রাজার গ্রামে ঢুকছে কেট তখন বলল, 'তুমি কি এর মধ্যে মরেলগঞ্জে যাচ্ছ নাকি'?

'কেন? সেখানে কী'?

'যদি ক্ষমা চাইতে ইচ্ছা হয়'।

'এই দ্যাখো! কী অন্যায় করেছি কখন? তা মদ একটু বেশিই হয়েছে আজ। তার জন্য কার কাছে ক্ষমা চাইব'?

'আমার ধারণা ছিল পাদরিরা সত্য বলে থাকে'।

বাগচী হেসে উঠল। 'আ ডার্লিং, যদি সত্যি পাদরি হতাম'!

অনেকসময়ে কিন্তু সাধারণ একটা দিনেও চিন্তা গুরুতর হয়ে যায়। বাগচীর মনে খানিকটা অনুতাপ দেখা দিল। মদ খাওয়ার কথা মনে এল তার। মদ স্পর্শ করব না বলাটার মধ্যে একরকমের গোঁড়ামি দেখা দিচ্ছিল বলে মদ একটু খেয়েছিল সে। তখন সে ভেবেছিল খাওয়া, না-খাওয়া কোনোটাকেই সে মূল্যবান করতে চায় না। কিন্তু তার ফলে কি খাওয়ার দিকে ঝোঁক আসছে? বিষণ্ণ লাগছে না? এই দ্যাখো, আমি ভাবতাম আমার চরিত্র ইতিমধ্যে কিছু স্থির হয়েছে।

কেট বলল, 'যা তার্কিক তুমি। তোমার মনে হতে পারে, ইউক্যারিস্ট নিয়ে কীবলের সঙ্গে কথা বলা দরকার'।

'এঃ'? বলে হাসল বাগচী। কিন্তু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে সে ভাবল, খ্রিশ্চিয়ান স্যাক্রামেন্টের আচরণ বিধিতে যে-প্রতীকরূপে ইউক্যারিস্টের মদ আর রুটির কথা আছে তা তার কাছে কিছু স্থূল ব্যাপার মনে হয়। কিন্তু তাহলেও তার সঙ্গে শিবপূজার প্রতীকময়তার তুলনা দেওয়াটা ঠিক হয়নি। বিষণ্ণ হল সে!

সে নিজে ইউক্যারিস্ট মানে না। এটা কি আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা যে, সে, নিজের অজ্ঞাতেই প্রায়, স্যাক্রামেন্টের প্রতীককে আর-এক স্থূল প্রতীকের সঙ্গে তুলনায় এনেছে? অর্থাৎ যেন এই কারণেই সে স্যাক্রামেন্ট থেকে দূরে থাকে?

তার বিষণ্ণ মন কিছুক্ষণের জন্য যেন চিন্তাশূন্য হল। অন্য কথায় তার মন চোখের দেখা বিষয়গুলিকে অবলম্বন করল। গাড়িটা চলছে। যেমন শব্দ করার ও ঝাঁকি দেবার তা হচ্ছে। রাস্তা দিক বদলাচ্ছে। পথের ধারে কোথাও ফাঁকা, কোথাও ছায়ার গাছ। ছইয়ের ভিতরে সবসময়েই দুপুরের আলো। তাহলেও তা কিছুটা তীক্ষ্ণ, অথবা ম্যাটমেটে হচ্ছে থেকে থেকে। একবার একটা বড় গোছের ঝাঁকুনি কেট ছইয়ের বাতা ধরে সামলে নিল।

বাগচী ভাবল   বোসো, বোসো। কোথায় ঠিক মনে পড়ছে না, সে শুনেছে শালগ্রামশিলাতেও শিবপূজা হয়ে থাকে। তাহলে? পূজার জন্য এই স্থূল প্রতীকটাই অনিবার্য না-ও হতে পারে। শালগ্রামশিলা শোনা যায় অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক, আর বৃত্তের চাইতে, স্ফিয়ারের চাইতে পরিপূর্ণ কী-আর কল্পনা করেছে মানুষ?

আসল কথা—আরো কিছু লেখাপড়া দরকার। বেশ কিছুদিন থেকে সে যা পড়ছে তা ধর্মগ্রন্থ নয়, চিকিৎসাশাস্ত্র। এটা ভালো নয়। বাগচী হেসে ফেলল আপন মনে। রোসো, আর-একবার কাম্পানেলা থেকে শুরু করতে হবে। গ্রীকরাও গোলককে পরিপূর্ণ মনে করত।

কেট বলল, 'কথা বলছ না যে'?

'না, ডার্লিং, গুঁতো খাওয়া, না-খাওয়ার মধ্যে যখন কাগজের মতো পাতলা সতর্কতা, তখন অন্যমনস্ক হতে চাই না'।

সে হেসে নিল। ভাবল : হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে বিলেতি খানা নিষিদ্ধ খানাই বলতে পারো। তারা রাজি হল কেন? দেওয়ানজি, যিনি বন্ধু ও পেট্রন, বলেছিলেন বলে? ডানকান তাকে বিদ্বেষ করে, বিদ্রূপ করে, কেটের নামে চূড়ান্ত কুৎসা রটায়। অথচ এখানে কেট আজ হোস্টেস! প্রমাণ করা হল তারা ক্রিশ্চিয়ান?

সে অবাক হল।

৩

শিব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে-এয়োস্ত্রীরা এসেছিল তাদের পুরোধা ছিল নায়েবমশায়ের স্ত্রী। রানী যাকে বড়বউ বলেন। রানী চলে গেলেও তার কিছু কাজ ছিল। এয়োস্ত্রীদের সবাইকে পান, গন্ধতেলের মশলা, বাতাসা প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে বিতরণ করা সেই কাজের একটি। বিশেষ করে রাজবাড়ির ব্যাপারে এয়োদের সংখ্যার শেষ নেই। কিন্তু সে-কাজও একসময়ে শেষ হল।

ভিড় এখন কমে গিয়েছে, যে-মেলা জমে উঠেছিল তাও এখন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, যদিও দু-চারজন করে লোক এখন আসছে। সিঁড়ি বেয়ে সেকালের হাওয়াঘর একালের মন্দিরের চত্বরে ওঠাও কম কৌতুক নয়। মিস্ত্রিরা কাজ করছে, নিচে কুমোর ছবি-টালি বানাচ্ছে—এসবই কৌতূহলের ব্যাপার। এমন সময়ে নায়েবমশায় এলেন গিন্নিকে বাড়ি নিয়ে যেতে। অনেক বেলা হয়েছে, স্নানাহার হয়নি।

নায়েবমশায় দেখলেন, ভিড়ের থেকে কিছু দূরে, চত্বরের উপরে, নদীর দিকে এগিয়ে, রোদ মাথায় একা দাঁড়িয়ে আছে তাঁর স্ত্রী। যেন নদীর দিকে কিছু দেখছে। কিন্তু এখন সেখানে কী-বা দেখা যাবে! রোদে জল ঝলমল করছে। আসলে তো বালু। চোখে ধাঁধা লাগবে। শেষ হেমন্তের দুপুর শেষ হচ্ছে।

নায়েবমশায়ের মনে হল সেই কবে এসেছিল তাঁর সংসারে আট-ন বছরের খুকিটি; তারপর এই চল্লিশ বছর গেল চার দেয়ালের মধ্যে ; এতটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে এতখানি নদীই-বা কবে দেখেছে! অথচ...না, ভঙ্গিটা ভালো লাগল না যেন।

কিন্তু সে-ও তো নায়েব। কথায় বলে পরগনাগুলো তার হাতের তেলো। সে তাড়াতাড়ি বলল, 'গাড়ি এসেছে, এসো'।

মনে-মনে বলল, 'স্মঃ'।

হাওয়াঘরের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সে বলল আবার, 'তাছাড়া দ্যাখো, তোমাকে তো বলেছি তাঁতিকে বলে দিও। ধুতির ঝুল সে ক্রমেই বাড়াচ্ছে। কোঁচার নিচেয় দ্যাখো কাদামাটিতে একসা। নয মিলেন খাটো ধুতিই দেখো। তাই তো পরে সকলে আজকাল'।

নায়েবগিন্নি চোখ নামিয়ে আনল। চত্বরের নিচে কিছুদূরে নায়েবমশায়ের সাদা ক্যানভাসের ছইসমেত গোরুগাড়িটা চোখে পড়ল। বলল, 'অনেক বেলা হল। চলো, তোমার স্নান খাওয়া হয়নি'।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাড়ির কাছাকাছি এসে মৃদু হেসে, নায়েবগিন্নি বলল, 'একটু রোসো, পুরুতঠাকুরের সঙ্গে একটা কথা ক'য়ে আসি'। নায়েবগিন্নি পূজারীদের জন্য তৈরি ঘরগুলোর দিকে হাঁটতে শুরু করল। পাশে নায়েবমশায়।

নায়েবগিন্নি হাসতে হাসতে বলল, 'লাঞ্চো করলেও পারতে। না-খেয়ে কষ্ট হতো না। কিন্তু ভাগ্যে তুমি লাঞ্চো করতে যাওনি, একা একা ফাঁপরে পড়তেম'।

নায়েব বলল, 'স্মঃ'!

পুরুতঠাকুরের ঘরে কাছে এসে নায়েবগিন্নি বলল, 'শিবপূজায় রক্তচন্দন কেন লাগে তা একটু জিজ্ঞাসা করব। আমরাও তো গ্রামে একটা পিতিষ্ঠে করেছি, আর সার্বভৌমঠাকুরই তখন বিধান দিয়েছিলেন। রক্তচন্দনের বাটির উপরে অষ্টধাতুর শতদোল রাখার বিধান দেননি কিন্তু'।

নায়েব বলল, 'প্রথা, তায় আবার কথা'।

পুরুতঠাকুরের দরজায় এসে নায়েবগিন্নি বলল, 'তুমি কিন্তু, বাপু বাইরে থাকো। স্নান করোনি, পায়ে জুতো'।

দরজার বাইরে নায়েব। তা দাঁড়ানোই-বা কেন? তারই-বা কাজের অভাব কী? এখানেও তো রাজবাড়ির টাকাতেই কাজ হচ্ছে, আর এসবের হিসাবও যাবে যথাকালে তার সেরেস্তাতেই। যদিও তার হিসেবি মনে গোড়া থেকেই এটা অপচয়। কার বাড়ি, কে করে মেরামত! এই বাংলোরই ওদিকে হচ্ছে

লাঞ্চ। সবই তো সেই বেওয়ারিশ ফৌত ফিরিঙ্গি পিয়েত্রোর। ঘরগুলোর দেয়াল পাকা, ছাদ খড়ের। তিনপো হাত পুরু খড়ের ছাদ। নতুন খড়ে ছাওয়া চলছে। চৌচালার জোড়গুলি বাঁশের জাফরি করে চেপে বসানো চলছে। দেয়ালে রং পড়বে, ভাঙা শার্সিগুলোকে পাল্টানো হচ্ছে। কিন্তু মিস্ত্রি-কারিগরদের এখন কেউ নেই। ছাদে দু'চারজন আছে, হাতের কাজ শেষ না-করে গেলে যাদের অসুবিধা। তা বেলা হয়েছে বৈইকি। রোদটা আর মিষ্টি নয়। লাঞ্চের জন্যই মেরামত, সে তো কাবার, কিন্তু মেরামত আরো দু'চার দিন চলবে। তো, রানীর হুকমৎ।

মিনিট দশেক পরে নায়েবগিন্নি ফিরল। দুপুর রোদের ঘাসে ঢাকা মাঠ পার হয়ে নায়েব তার পিছনে গোরুর গাড়িতে গিয়ে বসল।

গাড়ির বাইরেটা যেমন সুদৃশ্য, ভেতরটা তেমনি সযত্নে গোছানো। পুরু করে খড় বিছানো, খড়ের চাটাই, তার উপরে সতরঞ্চ তোশক, তার উপরে সাদা জাজিমের ধবধবে ফরাস। দু-তিনটে তাকিয়া গির্দা। দুজন তো বসে-শুয়ে সুখে যেতে পারবে। ধাক্কাধাক্কি, ঝাঁকি-ঝাপ্টা নিশ্চয়ই কম।

প্রথমে গিন্নি পরে নায়েব গাড়িতে উঠলে গাড়োয়ান বলদ এনে জুতল। দুই-ই সাদা, দুটোই বেশ বড়।

নায়েবগিন্নি বলল, 'আরাম করে বোসো, না-হয় এই তাকিয়া নিয়ে শোও। গাড়ির পাশেই নগদী। নায়েবগিন্নি মুখ বাড়িয়ে বলল, 'বাবুমশায়কে তামুক দিও'।

নগদী প্রস্তুতই ছিল। গাড়ি ছাড়বার আগে নায়েবমশাই-এর রুপোর ডাবায় তামার ঢাকনদার ছিলিম পরিয়ে হাতে ধরিয়ে দিল। নায়েব জোড়াসনে বসে ডাবায় মুখ দিল।

গাড়ি ছাড়লে নায়েবগিন্নি হাসল, বলল, 'রক্তচন্দন না ছাই! রাজবাড়ির শিবপূজাতেও শ্বেতচন্দনই লাগে যেমন আমরা দিই। লাল রঙের জন্য একছিটে লালই লাগে। কিন্তু তাই-বা কেন বলো'?

'কী?

'সে নাকি...বলব কথাটা? তোমাকে বলতে আর কী? আর পুরুত যেমন মুখপাতলা দেখলাম সবাই জানবে ক্রেমে।

'কী'? বলল নায়েব।

সে ভাবল : এই চিরদিনের স্বভাব, আধখানা করে কথা বলে আস্ত মানুষকে পাগল করে। তা ভালো বাপু, দুপুরে অমন করে একদৃষ্টে নদী দেখার চাইতে এও ভালো।

বলল নায়েব আবার, 'বলো শুনছি'।

'সে নাকি', নায়েবগিন্নি বলল গাড়োয়ান না-শোনে এমন করে গলা নামিয়ে, 'রানীর নিজের বুকের রক্ত'!

নায়েবগিন্নি কতদূর অবাক হয়েছে তা বোঝানোর জন্য গালে হাত রেখে মুখটাকেও চট করে ঘোরালো একদিকে। বুকের রক্ত? রানীমার? পিয়েত্রোর হাওয়াঘরে বসানো শিবলিঙ্গের গোড়ায়!

নায়েবগিন্নি বলল, 'শুনছ'?

নায়েব ভাবল, কী যেন সে ভাবছিল, তাই তো, কেমন হল না! এরকম সময়ে সে সাধারণত যা বলে তাই সে বলল, 'হুঁ, তা হবে'।

গাড়ি চলছে; এখনও এক-দেড় ঘণ্টার পথ। নায়েবগিন্নি বাইরের দিকে চাইল। বলদ দুটো দেখার মতোই। একটু ভালো করে দেখলে কিন্তু বোঝা যায়, দুটোই সমান সাদা নয়। একটার ঝুঁটির কাছে পিঠে বেশ খানিকটা কালচে দাগ আছে। ওদিকে দুটোর শিঙেই একরকমের পিতলের তাগা পরানো। গলাতে ঘণ্টা বাজছে টিং-টিং করে।

চোখ সরিয়ে আনল নায়েবগিন্নি। নগদীকে ডাবা ফিরিয়ে দিয়ে নায়েব তখন থেকেই তাকিয়ায় মাথা রেখে চিত হয়ে শুয়েছে। ঘুম নয়। অনুমান হয়, ছইয়ের ভিতর দিকের বাঁশ ও বেতের কাজ একদৃষ্টিতে

দেখছে। তা দেখার মতোই, বাঁশের বাতা দিয়ে যেন বালুচরীর নকসা তুলেছে।

নায়েবগিন্নি শায়িত নায়েব-ই-রিয়াসৎকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখল। পদের সঙ্গে এখন পোশাকে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। যেমন হাতের হীরার আংটি, হাতির দাঁতের ছড়ি, গরদের পিরহান। এসবে রানীমা খুশি হয়েছেন। নায়েবগিন্নিকে প্রকাশ্যে সুগৃহিণী বলেছেন। কিন্তু ধুতি? দ্যাখো ব্যাপারটা। চওড়া কালোপাড় ধুতিটার পাড় বরাবর সত্যি খানিকটা ধুলো-কাদায় ময়লা। চিরদিনই তো এ-রকম ধুতিই পরেন। তাহলে কি চালটা বদলেছে? আগের তুলনায় অতটাই ঝুঁকে পড়েই হাঁটেন নাকি?

নায়েবগিন্নির চোখ দুটি পিটপিট করল। মণির চারিদিকে সাদা জায়গাটা ব্যথা করে উঠল। গোপনে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল সে। ঠোঁট চেপে ধরা যায় দাঁত দিয়ে, কিন্তু মণিব চারিদিকে সাদা জায়গাগুলোতে যখন জল আসছে মনে হয়, বুকের মধ্যে অনেক জলের ঢেউয়ে গলা বন্ধ হয়ে আসে, তখন চোখের কোণ প্রায়ই শুকনো থাকে না। বুকের ওঠাপড়াও গোপন রাখা যায় কি? তখন আবার বুজরুক, পিয়েত্রো, গোবর্ধনদের সেই ব্যাপারটা মনে ফিরে এল নায়েব এখন ঝুঁকে পড়ে হাঁটেন তা ভাবতে গিয়েই যেন! যেন সে-ব্যাপারটাই দশাসই মানুষটাকে নুইয়ে দিয়েছে।

নায়েব নিশ্চিতই ছইয়ের বাঁশের সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখছিল, কিন্তু সে তো নায়েবও বটে। সে কি নায়েবগিন্নির বুকের ওঠাপড়া দেখেনি? সে মুখ ঘুরিয়ে পাশ ফিবে শুল।

নায়েবগিন্নি বলল, 'আর', পুরুষের কী বুদ্ধি দ্যাখো! ঘোড়া আর বন্দুক কেনাব টাকা আমিই তো দিয়েছিলাম ছেলেকে। ভাবতাম, যে কালের যা। একদিন, দ্যাখো, খামে পুবে সেসব টাকা ফেরত পাঠাল পেত্রো। বলো, তখন কি আর গোপন রইল? টাকা নেয়াটা ছিল, তাহলে, আমাব ছেলেকে পরখ করা'।

নায়েব এদিকে ফিরল। বলল সে, 'ঝকমাবি করেছে, এ কি নগদীর কাজ বে বাপু! গাড়িই থামাক, তামুক খাব যে'।

নগদী সঙ্গে-সঙ্গে ছিল। দৌড়ে এল। গাড়োয়ানের কাছে জানল তামাক চেয়েছেন। তামাক সেজে আনতে আর কতক্ষণ, নইলে কীসের নগদী। নায়েব উঠে বসে তামাকে মন দিল। গাড়ি ছাড়ল। তেমন লোকের কাছে ডাবায় ভোমরার শব্দ ওঠে। তা উঠলে নাযেব বলল, ঠোঁট থেকে ডাবা সরিয়ে, 'গোপন আর কী, গ্রামের সবাই অল্পবিস্তর জানেও এখন'।

ডাবাটা গাড়োয়ানের হাতে দিল নায়েব, গাড়োয়ান গোরুর পিঠের উপর দিয়ে তা নগদীকে পৌঁছে দিল। নায়েব যেন আবার গির্দায় কাত হবে। কিন্তু সে বসেই রইল। বরং গির্দা টেনে নিল। একটু-বা চিন্তাকুল দেখাল তাকে।

হঠাৎ সে বেশ আগ্রহ নিয়ে বলল, 'দ্যাখো, গিন্নি, সেই আট বছরের এয়েছিলে। শাড়ি নিয়ে বলতে পরিয়ে দাও। তারপর চল্লিশ বছর কাটল সুখে-দুখে। এখন তো আর ছোট্টটি নও, কেমন কিনা? নির্যাস কথা বলি শোনো। নদীর কাছে এলে কারো মাছের কথা মনে হয়, কেউ ভাবে তপ্পন করি। যাদৃশী ভাবনা যস্য। কিন্তু ভাবনা তো আগেই ছিল, নদী দেখেই-না মনে আসে? তা তোমার তো এখানে এসে মনে পড়ছে গোবরার কথা সব নতুন করে। কারণ তুমি আর আমি এই প্রথম এলেম সেখানে, যেখানে গোবরা সেপাই-টেরনিং নিত। আরে, বাবা, আমার কাছে গোপন! এখন সুড় সুড় করে সবই বেরিয়ে আসছে। বুজরুক ছিল গোঁয়ার। তা সাহস ছিল বইকি। রাবণরাজার কি সাহস ছিল না? আসল মন্ত্রের নারদমুনি কিন্তু বুড়ো পিয়েত্রো। আর এসবই তোমার মনে হয়েছে। কিন্তু ভস্মীভূতস্য পুনরাগমনং কুতঃ। ফেরে না। ফিরল এই তিন বছরে? আর, দ্যাখো, শোকও ভোলার কথা। নিজের ছেলের শোক ভোলে না? এ তো পরের ছেলে, ভাগনা। তুমি তাকে মানুষ করেছিলে বলেই কি বেশিদিন শোক করবে? অ্যাঁ? আমার মতো শক্ত হতে পারো না? আর তাছাড়া গ্রামের সব লোক জানে সে তো রাজদ্রোহ'। নায়েব থামল। বক্তৃতা সামলাতেই যেন বুক ওঠানামা করছে তার। নায়েবগিন্নি বলদ দুটোর মাথার উপর দিয়ে তাকাল পথের দিকে। চওড়া কিন্তু মাটির পথ। এখানে-ওখানে বাতাস লেগে ধুলো উড়ছে। নায়েব বুকের

তলায় গির্দা টেনে নিল। নায়েবগিন্নি ভাবল ব্যাপারটা নায়েব ঠিকই ধরেছে। খুব সহজ করেই তো বলা যায়। তাদের ভাগনা গোবর্ধন বুজরুকের সঙ্গে সিপাহিদের যুদ্ধে গিয়েছিল, আর ফিরবে না। আর আজ সে-কথা আবার মনে হয়েছে নতুন করে পেত্রোর হাওয়াঘরে। কিন্তু শক্ত হওয়া? তোমার মতো দশাসই পুরুষটা যে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে হাঁটছ সে কীসের বোঝার চাপে? সে আঙুলের ডগায় চোখ মুছল।

কাঁচা পথ। পথের ধারে কোথাও আকন্দর ঝোপ, একটা-দুটো বাবলা গাছ, কোথাও-বা প্রকাণ্ড সেগুন। সংখ্যায় বটগুলোই কম, কিন্তু তার তলায় পালকি নামায়, গোরুগাড়ি থামিয়ে বলদকেও জিরিয়ে নেওয়া হয়।

পথটা ফরাসডাঙা থেকে মরেলগঞ্জের ধার ঘেঁষে রাজার গ্রামের দিকে গিয়েছে। চওড়া, যার ফলে রাট্‌ বাদ দিয়ে চলা যায়। ঝাঁকুনি কম। সেজন্যই এ-পথে আসা। নায়েবগিন্নি দেখতে পেল, গাড়ির রাস্তার উপরে ডানদিক থেকে একটা ছোটপথ এসে মিশেছে। পথটা কি অপেক্ষাকৃত নতুন? কারণ সেটার এক জায়গায় যেন মাটিকাটার কাজ হচ্ছে এখন, হয়তো পথটাকে আরো উঁচু আরো চওড়া করবার চেষ্টা। গাড়িটা আর-একটু এগোলে আর-একটু ঝুঁকে দেখল নায়েবগিন্নি। যেখানে মাটি কাটা হচ্ছে সেটা ধানের ক্ষেত। আধপাকা ধান আছে। তার এত কাছে মাটি পড়ছে যে মনে হবে পাকা ধানও চাপা দেবে মাটি। কৌতুকের ব্যাপার তো! আরো ভিতর দিকে, যেখানে মাটি পড়ছে তারও ওদিকে রাস্তাটাকে সুরকির মনে হয়। বেশ লাল, চারিদিকের সবুজ-কালচে-মেটের মধ্যে বেশ রঙিন। ভাবল সে : তুষের আগুনের কাছে দু মিনিট হাত রেখেছ, সেই ছাইচাপার কী তেজ? আর তার এক হাঁড়ি যদি বুকের মধ্যে জ্বলে? বলার উপায় নেই, কাঁদার উপায় নেই। আমার তবু তো পোষ্য আর এই পুরুষটার তো রক্তের সম্বন্ধ, ভাগনা। সে তাড়াতাড়ি ভাবল, না, এ নয়, অন্য কথা ভালো। লুকিয়ে চোখ মোছা তার অভ্যাসেই আছে। কর্তার গায়ে আঙুল দিয়ে সে বলল, 'ওটা কোন পাকা সড়ক গো, সদরের বুঝি? দ্যাখো, দ্যাখো'।

নায়েব না-দেখেই বলল, 'সদর? সদর কোথায় এখানে? সে তো আগে যাকে বৈরামপুর দিয়ারা বলত কায়েতবাড়ি ছআনিদের সেখানে। সদর ছিল বটে এটাই, তা সে কি আজকের কথা? তখন খাঁয়েরাই ছিল নায়েব-নাজিম। আর গড়ের জঙ্গলে ছিল তাদের কিল্লা'।

'তা বলছি না। এ-পথে কি সদরে যাওয়া যায়? লাল সুরকির'।

'সব পথই সদরে যায়। নরেশ ওভারসিয়ারের কাজ হবে, রাজবাড়ির হাতা থেকে শুরু, দ্যাখো কী'?

নায়েবগিন্নি হেসে ধাক্কা দিল নায়েবের গায়ে, 'স্বপ্ন দেখছ নাকি, স্বপ্নে কথা কইছ? দ্যাখো না, ওই যে পথটা। এখানে রাজবাড়ি কোথায়'?

তাকিয়া থেকে মাথা তুলতে হল নায়েবের এবার। 'ওটা, তা ওটা তো সকালেই দেখেছ। মরেলগঞ্জের সাহেবরা করছে'। আবার তাকিয়ার মাথা রাখল নায়েব। বলল, 'তা এখানেই সদর থাকলে খুব সুবিধার দিন ছিল না বোধ হয়। শুনেছি, শুধু খাঁয়েরা না, তাদের অনেক আমলাও কোমরে কিরিচ বেঁধে তবে রাস্তায় নামত। রিসালা ছাড়া মেয়েরা স্নানে যেত না'।

'তখন কি বিচার ছিল না'?

'ছিল না আবার'! নায়েব বলল, 'এখানকার পথেই কাজির তুরুকদের সঙ্গে বেঁধে গেলেই হল। তা এরাও বিচার চাইত না। বরং ধরে নিয়েছিল মারকাট করতে-করতে বংশে গড়ে একজন পুরুষ থাকলেই হল। ছোটকালে মাসিদিদিমার কোলে রাখো লুকে। তারপর সে-ও আবার কোমরে কিরিচ বেঁধে হাঁটবে। তা বাপু সেসব দিনের চাইতে নাকি এ-রাজ্য ভালো। এই তো দ্যাখো, অত বড় মন্দির উঠছে, কেউ ভাঙতে এগোচ্ছে না'।

গাড়ি একটু এগিয়ে গেল। হঠাৎ নায়েব খাড়া হয়ে বসল। 'তা দ্যাখো, এরাও তো রাজা। আর তার বিদ্বেষী তোমার ছেলে। বলো, রাজদ্রোহ তো পাপ। দ্যাখো, কত লোকের ছেলে কমিসরিঅটে চাকরি করে কলকেতাতেই কত বাড়বাড়ন্ত। আর তোমার ছেলে? ফিরল বলো তোমার তিন সালের কান্নায়?

পাপ নয়? লুকে রাখতে হয় না? কেমন কিনা! তাহলেই দ্যাখো, চোরের মায়ের কাঁদন নেই'।

হঠাৎ নায়েব হা-হা করে হেসে উঠল। আর তখনই যেন তার উত্তাপ লেগে তার নিজেরই সারা মুখ ঝলসে গেল। বলল, 'ওরে, তোরা তামুক দিতে ভুলছিস। না থাক। আরে ও গাড়োয়ান, থামা বাপা, থামা। নামব একটুকুন। চারিভিত উজল যে। লালে লাল দেখি। শিমূল নাকি অকালের'?

গাড়ি থামল। নামল গাড়ি থেকে নায়েব। কয়েক পা এগিয়ে পাকা সুরকির সড়কটার মুখে যেখানে মাটি পড়ছে সেই বরাবর গিয়ে দাঁড়াল সে। ঝুড়ি করে মাটি ফেলছে পাঁচ-সাতজন, কোদালে মাটি কাটছে জনাপাঁচেক। একজন তো পথের ধারেই।

নায়েব ইশারায় তাকেই ডাকল। সে এলে বলল, 'লাল সড়কের ধারে উই ছাতনা গাছ নাকি বাদামগাছ, ওটাই না মরেলগঞ্জের সীমানা? বটে তো? ওখানেই তো মনোহর সিংয়ের মকান। তা, এখানে এ রাস্তা পাতে কে'?

'শুনি তো সিংজী, আসলে নীলেসাহেব আজ্ঞা। শুনি যে কুতঘাট তক যাবে'।

'বাঃ। একেবারে ফরাসডাঙা ফুঁড়ে? আহা বড় ভালো গো। তোমাদের আর কষ্ট থাকবে না। তা বলি, এই যে জমির মাটি কাটছ আর যে-ধানের উপরে মাটি ঢালছ, 'এ সবই বুঝি নীলসাহেবের'!

লোকটি ভয়ে ভয়ে বলল, 'জমিটা কর্তা ওই মাথায় করে মাটি ঢালছে—ওরই'।

এই বলে সে থামল। কেমন যেন ভাষা না বাবুটির? আর মুখের সঙ্গে তাও মানায় না। ফিনফিনে ধবধবে জামা-পিরহান। কিন্তু পিতলের গরম পিদিমের মতো যেন চোখ দুটি।

'তাহলে নিজের ধানে মাটি ঢালে কেন'? নায়েব হো-হো করে হাসল। 'একদম বেহেড দেখছি'। লোকটি এদিক-ওদিক দেখে স্বর নিচু করে বলল, 'ধান তো গেয়েই আছে। কাল নয় পরশু আসবে মনোহরের লোক ধান কেটতে। তা সামচাচা কইলে মরার বাড়া গাল নেই, দে গোরে ধান'।

'সাফ মাথা। তা মনোহর তোমরা চাচার জমির ধান কাটে? তার বর্গা বুঝি? নাকি তারও চাচেরা লাগে'?

সাদা ধবধবে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে রাজার গ্রামে যাওয়ার সড়কে। এই ভদ্রলোক তাদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে তাদের একজনের সঙ্গে কথা বলছে। যারা কাজ করছিল তারা এই আকর্ষণেই কাজ ফেলে ক্রমশ নায়েবমশায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

তাদের একজন বলল, 'কও না, সামচাচা, মনোহরমশাইয়ের ফয়সলা। কেন ধানে মাটি? ডানকানের সুবিধার জন্যেই এই সড়ক হবে মনোহরের বাড়ির তল দে কুতঘাট পর্যন্তক'।

নায়েব খুক করে হাসল। 'তা সামসুদ্দি নাকি শ্যামচাঁদ, তা যাই হোক, জমির খাজনা নেয় কে'?

'জী? সামসুদ্দিন, হুজুর। খাজনা লেয় না'।

'লাখেরাজ বুঝি'? নায়েব হেসে উঠল। কিন্তু হঠাৎ থামল সে। কিছু যেন তার মনে এল, কপালটা কোঁচকালো। তারপর তার বোধ হয় মনে হল অনেক বেলা হয়েছে, সে গাড়ির দিকে ফিরল। লোকগুলি কী করা উচিত বুঝতে না-পেরে পায়ে পায়ে তার পিছন পিছন হেঁটে এল গাড়ির দিকেই।

নায়েব যখন গাড়িতে উঠছে, সামসুদ্দিনের কী মনে হল। ঝপ করে সত্যটা প্রকাশ করে ফেলল। 'আজ্ঞে, পেত্রোসাহেবকে খাজনা দিতাম না। বাপ ছিল কারিগর। চাকরান স্বত্ব এই পাঁচ বিঘার। ফরাসডাঙার ছিটমহলে আজ্ঞা'।

নায়েব বলল, 'এদিক-ওদিক বুঝি সবই পেত্রোর ব্রহ্মোত্তর'?

'আজ্ঞে, ব্রহ্মোত্তর? মানে তিনি তো খেস্টান; তা উদিকে রাস্তার পুবে হৈ শিমূল গাছ থেকে ইদিকেও রাজবাড়ির রাস্তার পুবে আর পশ্চিমে তাই। এ দুশো বিঘার টৌকটা পেত্রোর ছিট শুনি'।

নায়েব কী ভাবল। বলল, 'শোনো সামসুদ্দিন, আর এক কোদাল মাটিও উঠবে না। কাল প্রেভাতে আমিন আসবে, চেন আসবে। পেত্রোর ফরাসডাঙা এখানে ফালা হয়ে সেঁধিয়েছে, না? টৌক? সাতপুরুষে জোলা,

জমি বোঝো? কার জমিতে কে সড়ক বাঁধে, হ্যাঁ'?

শেষ কথায় নায়েব হঠাৎ সাপ্‌টে উঠল। 'আরে বাপ'—বলে সামচাচা দুধাপ পিছিয়ে গেল। গাড়ি চলতে শুরু করল। চলতি গাড়িটার পিছনে সেলাম আদাব বলে সামসুদ্দির দল খানিকটা হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এই সাপ্‌টেই যেন চেনা-চেনা লাগল। দেওয়ানজি নিজেই নাকি?

গাড়ির ভিতরে বসে নায়েব নিজের বাঁ হাতের তেলোটা চোখের সামনে মেলে ধরল। গাড়ি চলতে ঝাঁকুনি লাগে তাতেই যেন তার মুখটা আরো একবার কঠিন হয়ে উঠল।

সে বলল, 'গিন্নি, সেই থেকে বসে ঝাঁকুনি খাচ্ছ। বাড়ি গিয়ে মাজা খুঁজে পাবে না; শোও দেখি'। প্রায় জোর করে সে শুইয়ে দিল স্ত্রীকে।

বলল, 'এখন আর তামুক না, কী বলো। বেলা গড়িয়ে গেল'।

'তুমিই তো না-হোক সময় নষ্ট করে এলে'।

'তাও বটে'। নায়েব হাসল। কিন্তু যেন রোদ লাগার ফলেই তার মুখটা শুধু থমথমে নয়, পোড়া পোড়া দেখাল। 'তা তুমিও বাপু কম নও। সেই থেকে পাকা সড়ক লাল সড়ক করছিলে। এটা তোমার ধাত হল দেখছি, কাঁথার নকশা নিয়েও এমন রাতভর বকর-বকর করো। তাছাড়া ইংরেজ দেশের রাজা। ডানকানই দ্যাখো লাল সড়ক করছে। সেই গল্প, সব লাল হো যায় গা। হুঃ'!

গাড়ি তখন রাজার গ্রামেই ঢুকছে। নায়েব বলল, 'বড়বউ, তুমি কিন্তু কান্নাকাটা একটু কম ক'রে করো'।

'কেন নিজের ঘরে-মধ্যে কাঁদব না'?

'এই দ্যাখো বাপু, তা আমাকে দুযো না। আমি কিন্তু আর একজনকে পরপরই এনে দিয়েছিলাম। আর সে-ও আমার আপন বোনেরই ছেলে—গোবর্ধনের মতোই ভাগনা'।

'তোমাকে দুষব কেন'?

নায়েবগিন্নির মনে হল এ-সময়ে—সে হয়তো স্বার্থপর, তাই নিজের খালিঘরের কথাই ভাবে।

আর এই ভদ্রলোক? লোকের মুখে-মুখে শোনা আগের চাইতে নাকি দপ্তরে দশগুণ কড়া হয়েছেন। আমলা-ফয়লা রাগের ভয়ে তটস্থ। কিন্তু তারাও নাকি বোঝে না। হুঃ বলে উঠলে গলদঘর্ম হয়। কার ভিতরটা কতখানি পুড়েছে তা বোধ হয় বোঝা যায় না। নায়েবগিন্নি ভয় পেল। সে বলল, 'ওখানে কী করে এলে? তোমার কথার পাত আমি বুঝি। রাগের মাথায় সড়ক বন্ধ করে এলে নাকি নীলসাহেবের'?

নায়েব বলল, 'মেয়েমানুষ আর কাকে বলে। রাগের মাথায় কাজ হয়'!

এখানে সময়ের দিক দিয়ে অসামঞ্জস্যের হলেও পরের দিন সকাল হতেই যা ঘটতে শুরু করেছিল তা বলা মন্দ হবে না।

সামচাচা ভেবে-ভেবে কিনারা পায়নি, লাভের মধ্যে ঘুম বরবাদ। হাসিখুশি লোকটি যে হঠাৎ সাপটে উঠেছিল তা ভোলা গেল কোথায়? মোরগের ডাকেই সে উঠে বসেছিল। বাইরে বেরিয়ে সে দেখল তার সেই সড়কে গ্রাস করা জমিটার উপরে যেন হাজার লোক পিলপিল করছে। তাব জমি ছাড়িযেও নতুন সড়ক বরাবর আরো অনেকে।

'কী আপদ' বলে সে এগিয়ে যা দেখল তা বরং দূর থেকে হাজার লোকের ভিড় কল্পনার চাইতেও খারাপ। অন্তত পঞ্চাশটা কাস্তে চলছে তারই ধানে। এর মধ্যে বারো আনা কাটা শেষ, আঁটিতেও বাঁধা হয়েছে। ওদিকে মরেলগঞ্জের সীমা ঘেঁষে নতুন সড়কের আড়াআড়ি খাম্বা বাঁশের খোঁটা বসেছে সারিসারি। আর তার এপারে ঝপঝাপ ত্রিশখানা কোদাল পড়ছে, নতুন সড়ক কেটে মিশিয়ে দিচ্ছে দু'পারের জমি বরাবর। ফর্দাফাঁই মাঠান জমি। দু'মাসের সড়ক একবেলায় মাঠ।

ভয়ে হাত-পা সেঁধিয়ে যাওয়া বোধ হয় একেই বলে। বাড়িতে ফিরে তবু তারই মধ্যে ভাবল সে একবার মনোহর সিংকে একটা খবর দেওয়া উচিত ; অন্তত বলা দরকার 'আমি এসবে নেই'। একটু

বেলা হলেই তা করবে সে, এই ঠিক করল। কিন্তু তাই-বা কী, এতক্ষণ মনোহর সিং কি আর খবর পেয়ে যায়নি? আর এতক্ষণে সে-বা কী মূর্তি ধরেছে! কাল যে গোরুগাড়িওয়ালা ভদ্দরলোকের সঙ্গে সে কথা বলেছিল তা কি আর ছুপানো আছে? সে কল্পনায় লাল সূর্যে কখনও মনোহর সিং-এর চোখ, কখনও নীলসাহেবের মুখ দেখতে লাগল। আর তা হবেই, কারণ বাঁধা সড়ক কেটে নামিয়ে দেওয়া তা গিয়ে লাথ ঝাড়ারই সামিল আর তা জোরসে এবং নাক বরাবর। বাঁদরামির হাসির মুখে ডান হাতের এক থাপ্পড়।

কথায় বলে হস্তিমূর্খ পণ্ডিত আর বলদবোকাই তাঁতি। নীলবাবুদের রেশমদাদন মেটাতে না-পেরে ডানকানের নীলের দাদন। বোঝো এখন? পণ্ডিত তার শাস্ত্রের বাইরে কানা, তাঁতিও তার তাঁতের নকশার বাইরে কী-বা দেখে? সামসুদ্দিনের তাঁতও নেই, কিন্তু টানা দেখে বালুচরীর নকশা কেউ ধরতে পারে না—এ সে বোঝে। তার গোটা বুকের মধ্যে সাতপুরুষের ভাবনা উথাল-পাথাল করে উঠল। নইলে তাঁতের ভুলে যাওয়া কথা এমন করে মনে আসে? লোকে বলে মাথায় বাড়ি পড়লে ভিরমি যাওয়ার আগে শৈশবকালের ঘটনাও নাকি মনে ফেরে। সূচনা আর পরিণতি, টানা আর নকশায় অনেক তফাত। কালকের সেই সাদা ছইয়ের গাড়ি আর আজ সকালের এই দৃশ্য। কিছু কি বোঝা গিয়েছিল কতটা রাগ? একবারই সাপটেছিল বটে!

কিন্তু আরো আছে। জমি থেকে ধানের বোঝা সব মাথায় উঠছে এবার। রাস্তা চৌরস করে এবার ধানকাটা জমিতে কোদাল দিচ্ছে। কোদালেই চাষ। ক্রমে তারা জমি আর সড়ক ছেড়ে উঠে আসছে। সরষেও ছিটায় নাকি? আল্লা! এগিয়ে আসছে আর সামসুদ্দিনের ঘরের সামনেই ঝুপঝাপ ফেলছে কাঁচাপাকা ধানের বোঝাগুলি। ডাঁই করে ফেলছে। সামসুদ্দিন ফকির-দরবেশের মতো নির্ভাঁজ হয়ে বসে রইল। কে কাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে?

ধানের বোঝা ফেলা শেষ হলে লোকগুলি দল বেঁধে ফরাসডাঙার দিকে হাঁটতে শুরু করল। তখন হঠাৎ এক বুদ্ধি খেলে গেল সামসুদ্দিনের। বাড়িব ভিতরে গিয়ে বউকে বলল, 'বেরো তো। বেরো, আয় আমার সঙ্গে'। ছোটমেয়েটা দাওয়ায় খেলছিল, তাকে টেনে কোলে তুলল। ছেলেটা মায়ের আঁচল ধরে কী বায়না করছিল, আঁচলসমেতই তার হাতে চেপে ধরল, 'আয় আমার পিছনে'। বলল বউকে,' 'আয় বলছি'।

যারা দল বেঁধে ফরাসডাঙার দিকে যাচ্ছিল তাদের লাগ ধরবার জন্য সামসুদ্দিন লম্বালম্বা পায়ে হাঁটতে শুরু করল বউ-এর আঁচলসমেত ছেলের হাত চেপে ধরে মেয়ে-কাঁকালে।

বউ বলল, 'আরে আরে, করো কী? ছাড়ো, আঃ'!

'শ্বশুরের বাড়ি যাই'।

তা শ্বশুরের বাড়ি বটে ফরাসডাঙার অন্য প্রান্তে নদীর ধারে।

বউ বলল, 'এক বস্ত্রে? করো কী? খেপলে? ছাড়ো। লোক'।

'চপ্'। সাপটে উঠল সামসুদ্দিন।

সামসুদ্দিন জানে টানা টানাই, নকশা নকশা। এই তো সবে সূচনা। অথচ ভাবো একবার, কাল সেই বাবুমশায় রাস্তা সড়ক হচ্ছে দেখে কত প্রশংসা না করল নীলেদের। কেমন হল না? আকাশে ভাসা মেঘ দেখে বিদ্যুতের পোড়ানি বোঝো? ওদিকে আবার ডানকান আর মনোহর। তাদের লেঠেলরাও বোধ হয় এতক্ষণ বেড়ার গায়ে হুমড়ে পড়েছে।

এসবই পরের দিন ঘটেছিল।

৪

শেষ হেমন্তের দুপুর দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যায়, ১৮৬০, মতান্তরে ১৮৬১-র সেই দুপুরও হয়েছে। এখন সবকিছুই কাছের হলে বাদামি, দূরের হলে কালচে।

জয়নালের বয়স হয়েছে। তার গায়ে চকখড়ি এবং সিঁদুরের আলপনা যেটুকু সকালে দেখা গিয়েছিল এখন চোখে পড়ছে না, বনজঙ্গলের ডালপালায় ঘষে উঠে গিয়ে থাকবে। কিংবা বাতাসে এখন রং থাকায় সেই নকশা এখন অস্পষ্ট। জয়নালের শুঁড়ে জড়ানো বেশ মোটা কিন্তু খাটো একটা কলাগাছের ডুমো। তার হাঁটা দেখে মনে হয় যেন সে ভাবছে কতক্ষণে হাওদা খুলবে, আর সে সেই নরম ডুমোটাকে সদ্ব্যবহার করবে। সেজন্য তার চলার মধ্যে যেন একটা খুশির ভাব।

হাওদায় রাজু—রাজকুমার, রাজচন্দ্র। সারাদিনের পরে শিকার থেকে ফিরছে সে।

রাজুর সকালের কথা মনে হল। শিবমন্দিরটা অনেকটা উঁচুই হবে। মেঝে থেকে অন্তত বিশ-বাইশ হাত উঁচুতে থাকবে চূড়া। আর সেই মেঝে, যা সেই হাওয়াঘরের, তা না কোন দশ হাত। রাজবাড়ির চূড়া শোনা যায় মাটি থেকে পঁচিশ হাত। কিন্তু রাজবাড়ির চূড়াটা গম্বুজের। মন্দিরের চূড়া যেন রথ। রাজবাড়ির গম্বুজের কাছে দাঁড়ালে সেই চূড়া চোখে পড়বে কি?

গোটা মন্দির কী রকম হবে তার ছবি রাজু দেখেছে। রানী নিজেই দেখিয়েছিলেন। জয়পুরী সেই মিস্ত্রির নকশা।

হঠাৎ মনে হল রাজুর, হাওয়াঘরটা থাকবে না। বলতে পারো এখনই নেই। কিছুদিন আগেই টেনে নামানো হয়েছে খড়ের সেই পুরু ছাদ, লোহা আর কাঠের তির বরগা। যেন হঠাৎ একটা ধাক্কা লেগে শূন্য হয়ে গেল তার মন।

ওখানেই, ওই হাওয়াঘরেই, প্রথম বন্দুক চালাতে শিখেছিল সে। শিখিয়েছিল বুজরুক। কত তাড়াতাড়ি বর্তমান অতীত হয়ে যায়!

আর অতীত এমন বিষয় যে বর্তমানে পৌঁছে সবকিছু যেমন করে ঘটেছিল পরপর তেমন করে দেখবারও উপায় থাকে না।

শাখা-পথটার কাছে জয়নাল দাঁড়াল না।

আর এই শাখা-পথের উপরেই কিছুদূরে এগিয়ে গিয়ে সেই ঘটনাটা ঘটেছিল। পালকি-বেহারার হুমহাম শব্দে তার ঘোড়া বারবার পিষপায়ে দাঁড়াচ্ছে। ঘোড়ার উপর থেকে সে যেমন, পালকির ভিতর থেকেও তেমন বিরক্ত বুজরুক 'কে যায়' বলে ঝেঁঝে উঠেছিল। সারাক্ষণ বুজরুকের কথাই ছিল মনের কাছে, ইংরেজের জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরছে বুজরুক। অথচ তখন সেই পালকিতেই বুজরুক তা সে ভাবতেও পারেনি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল রাজুর। তখন দেখা হয়ে গেলে কী-না কৌতুকের হতো! সন্ধ্যার ম্লানভাবটা রাজু অনুভব করল তার মনে। আসলে বোঝা যায় না। একই পথের উপরে মুখোমুখি অবস্থান করলেও চেনা যায় না, জানাও যায় না কী কার পরিণতি হবে। কেউ কি জানে পিয়েত্রো ঠিক কী আশা করেছিল? তা কি ইংরেজদের প্রতি ফরাসির মিথ্যা অর্থহীন আক্রোশ? একদিন গল্পের ঝোঁকে বলেছিলেন বটে, এক হাজার লোক নিয়ে শুরু করে এক রাজ্য স্থাপন করা যায়, 'ভাগ্য সহায়তা করলে এবং অশেষ কষ্ট সহ্য করার উৎসাহ থাকলে।

রাজু হাসল। হাওয়াঘরের কথাটাই আবার ঘুরে এল মনে। সে অনুভব করল ছাদ টেনে নামানোর পরেও সেদিকে চাইলে যেন হাওয়াঘরটার ছায়া সেখানে এতদিন দেখা যেত। এরপর সেদিকে চাইলে নিরেট বিপুল শিবমন্দিরটাই চোখে পড়বে। এরপর পিয়েত্রোর বলা কোনো প্রতিধ্বনিও মনে আসতে আসতে হয়তো মন্দিরে ঘণ্টাশব্দে ছিঁড়েছিঁড়ে যাবে।

হাতের উপরে চিবুক রেখে সামনের দিকে চাইল রাজু। তাহলে শব্দটা উঠছে জয়নালের গলায় ঝুলনো ঘণ্টা থেকেই? গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছে হাতি। শিকারের হাতির ঘণ্টা বাজালে চলে না। গ্রামে ঢুকেই সোভান দড়ির বাঁধনটা ছাড়িয়ে দিতেই বড় পিতলের ঘণ্টাটা হাতির গলার ডোর থেকে দোল খেয়ে খেয়ে বাজছে।

আর জয়নাল এখন গতিও বাড়িয়েছে যেন। বাড়ি ফেরার পথ, মাহুতকে অঙ্কুশ ব্যবহার করতে হচ্ছে না। কানের পিছনে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে খোঁচা দিচ্ছে মাঝে মাঝে। কিন্তু অঙ্কুশটাও হাতে আছে। গ্রামে ঢুকে পিলখানার দিকে ছুটতে পারে, রাজবাড়ির দিকে না-গিয়ে।

হ্যাঁ, গ্রামেই তো। খুব তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা নামছে এখন। তাহলেও পথ চেনা যাচ্ছে। লোকজন আছে পথে। তারা সরে সরে যাচ্ছে হাতি বাঁচিয়ে।

হাওদায় বসে দুলুনিটা ডাইনে-বাঁয়ে লাগে ঠিকই, কিন্তু কাঁধের কাছে বসা মাহুত অনবরত উঠছে আর নামছে সন্ধ্যার অন্ধকারে।

এমন অন্ধকারেই পিয়েত্রোর হাতিটা একা একা এক গাছতলায় সামনে পিছনে দোলে। শুঁড় তোলে। কী ধরতে চায়? কিছু যেন শুঁড়ে টেনে পায়ে ফেলছে মনে হবে। মিথ্যা কিংবা উদ্দেশ্যহীন আক্রোশে।

পিয়েত্রোর হাতিটা ছোট। তার পিঠে হাওদা, হাওদায় পিয়েত্রো। অন্য হাতিতে ছিল বুজরুক।

রাজু ভাবল সে-শিকারের তুলনায় অন্য কোনোদিনের কোনো শিকারকেই সে নাম দেওয়া যায় না। অথবা তাকে কি শিকার বলা হবে? আহত বাঘের দিকে বুজরুক যেভাবে খোলা কিরিচ হাতে ছুটে গিয়েছিল? সেটা হয়তো তার পক্ষে শিকার-খেলার অংশমাত্র ছিল। কিন্তু আহত বাঘের সঙ্গে—ঘটনাটা যেন রাজুকে বলতে পারে—দ্যাখো, পুরুষের কত সাহস হতে পারে, নিজের হাতের কিরিচে কত বিশ্বাস রাখতে হয়!

আজকের হরিণটা কিছুমাত্র খেলেনি। পাকা ধান খেতে বনের ধার-ঘেঁষা ধানক্ষেতে ঢুকেছিল। বেশি খেয়ে যেন ছুটতেও পারছিল না।

এ জাতের হরিণ, অবশ্য, ক্বচিৎ মেলে জঙ্গলে। প্রচলিত গল্প মানতে হলে বলতে হবে, রাজুর বৃদ্ধ পিতামহের সময়ে পুরনো বাড়িতে বন্যার জল পৌঁছলে হাতার চিড়িয়াখানার হরিণগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এ-হরিণ তাদেরই জ্ঞাতিগুষ্টি হবে।

রাজু ভাবল, বনে বুনোমোষও আছে। বাঘও আসে হরিণের লোভে। তারপর বনের ধারে গ্রামে গোরু-বলদের উপরেও হামলা করে।

হরিণ যদি তেমনভাবে এসে থাকে বুনোমোষও কি তবে গৃহস্থের হারিয়ে যাওয়া মোষ থেকেই এ-অঞ্চলের বনে তৈরি হয়েছে? কিন্তু তা কি সত্যি হয়—পুরনো ঝাড় থেকে একেবারে নতুন বেপরোয়া এক বংশ। তা কি হতে পারে? গৃহস্থ মানুষ থেকে স্বাধীন এক পুরুষ!

এখন গ্রামের প্রধানপথে উঠেছে হাতি। তাই এ-সন্ধ্যাতেও লোকচলাচল একটু বেশি এখানে, তাদের কারো-কারো কাঁধে অথবা মাথায় ধামা। ওদিকে কাঠুরেপাড়ার হাট ছিল তবে। দু-একজন এ-গলি ও-গলি থেকে বেরিয়ে হনহন করে হেঁটে হাতির পাশ দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে উল্টোদিকে। শেষ হাটে কিছু কিনতে আশা রাখে। তাদের কেউ কেউ আবার দাঁড়িয়ে পড়ে হাতি ও হাতির পিঠের শিকার-করা জানোয়ারটাকে দেখে নিচ্ছে। এমন অস্পষ্ট আলোয় তা কি ঠাহর হবে?

প্রধান পথই সুরকির রং ধরেছে চোখে, সুরেন ওভারশিয়ারের রাস্তা। এখান থেকেই সার্বভৌমপাড়া শুরু। কাঠুরেপাড়াটা বরং সাহেবপাড়ার পিছনে। নাম সার্বভৌমপাড়া। তার অর্থ এই নয়, এ-পাড়ায় একাধিক সার্বভৌম থাকেন। একজনই ছিলেন। তাতেই এই নাম। ব্রাহ্মণপ্রধান পল্লী এখন।

কিন্তু সবসময় তাও হয় না। যেমন কাঠুরেপাড়াটা খুব পুরনো হলেও সেখানে এখন যারা থাকে তাদের অধিকাংশ রাজকাছারির আমলা। আর সাহেবপাড়া তো এখন কাগজপত্রে ওঠেনি, মুখে মুখে চলছে। আগে নাম ছিল গঞ্জ। প্রধান হাট বসত। সুতোর হাট, কাপড়ের হাট। এদিক-ওদিকে এখন কয়েকজন মহাজনের স্থায়ী আড়ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওখানে স্কুল, 'হরদয়ালের। স্কুলের হেডমাস্টার বাগচীসাহেবের বাসা। তা থেকেই সাহেবপাড়া বলছে। এটাও নতুন হওয়ার ঘটনা বইকি।

ইতিমধ্যে রাজবাড়ির দোতলার কোনো কোনো জানলার আলো চোখে পড়ছে। রাজু দীর্ঘনিঃশ্বাস

ফেলল, কিন্তু সোজা হয়েও বসল। প্রায় সারাটা দিন কেটেছে হাতির পিঠে, এবার নামতে হবে। আসল কথা, এই অত্যন্ত পুরনো কথাটাকে টানা সুরে ভাবলে সে বদলে যায়, পুরনোকে ধরে রাখা যায় না।

মাহুত বলল, 'হুজুর'!

'কিছু বলবে'?

'হাতি নিয়ে কইবেন বলেছিলেন'।

'ও, হ্যাঁ। ওর বাঁ কানটার কথা'।

সোভান মাহুত যা বলল : তিন-চার বছর আগে জয়নাল সেই যে একটু খ্যাপাটে হয়, তখন বাগে আনতে তার উপরে অত্যাচার হয়েছিল। বাঁ কানের নিচে চার-পাঁচ আঙুল চেরা, সে-সময়ের বল্লমের চিহ্ন। আর দাঁত দুটোর ডগা গোল নয়, মাপেও ছোট-বড়। সেও খ্যাপামির ফল। সে-সময়ে একটা দাঁতের আগা বেশ খানিকটা ফেটে গিয়েছিল। আসাম থেকে লোক আনিয়ে সমান করে কাটিয়ে নিতে হয়েছে। একবার কথা উঠেছিল দাঁত দুটোয় সোনার বিং পরানো হবে। এখন কিন্তু খুব ছুটতে পারে জয়নাল।

কারণটা মনে পড়ল বাজুরও। রিং পরানোর কথা হযেছিল, পরে কিছু-আর করা হয়নি। কে ব্যবহার করবে জয়নালকে? কিছুদিন তার একমাত্র কাজ ছিল বিলমহলে যাওয়ার জন্য কর্মচারীদের বাহন হওয়া। রাজুই ইদানীং তাকে তুলে এনে নতুন কবে কাজে লাগাচ্ছে। এমন শিকারি হাতি হয় না, যদিও কানের ক্ষত চিহ্ন আব মুছবে না, দাঁতের গোল ডগাটা আর ফিবে পাবে না। দ্যাখো, এতদিন পরেও বনের স্মৃতি খেপিয়ে তোলে নাকি?

বাজু বলল, 'সোভান, হাতিটার গায়ে রং দিতে হয'।

'জী, তাই দেব'।

'পুরনো রং বেশ রগড়ে ঘষে তুলে দিও। বামপিয়াবী বা চন্দনের গায়ে যেমন অবিকল তেমন কোরো না। নকশাটা ভিন্ন কোবো। এখন তো জয়নাল আমার কাজেই লাগছে। ও আর খেপবে না, দেখো। সবকিছু মেনে নেবে'।

'জী, হুজুর'।

একটুপরে আবাব বলল রাজু, 'পিযেত্রোর হাতিটার কী অবস্থা, সোভান'?

'ওর মাহুতই ওকে দেখে, হুজুর'। মাহুত মানে বন্দা, পেত্রোর বাবুর্চি।

'সে কী? তার বেতন, তন্‌খা'?

'শুনি শেযমেস অনেককে চাকরান দিয়ে গিয়েছে পিয়েত্রো'।

'আচ্ছা, সোভান, তোমাদের পিলখানাতে পিয়েত্রোব হাতিটাকে এনে রাখলে হয়'।

'তা হয়, হুজুর'।

'আমাব তো মনে হয়, একা একা প্রাণীরাও বোঝে'।

'হাতি তা বুঝবে, হুজুর'।

রাজু ভাবল : হ্যাঁ, কী আব কাজে লাগবে! তাব নিজের হাতি তো নয়। কোথায় যেন পথের ধারের ঘাস-ঝোপ থেকে ঝিঁঝিঁ ডেকে উঠল। ঝিঁঝির ডাকের এই এক কৌতুক, তাতে যেন একটা ইশাবা থাকে। যদিও বোঝা যায় না, কিন্তু যেন টানে, যেন দূরে নিতে চায়। আর তখন মন উদাস হয়।

রাজবাড়ির দরজায় হাতি বসছে, ভিতবে যেতে পাবছে না। সদরদরজার কাছেই গোলমাল। ভারা বেঁধে কাজ করছে মিস্ত্রিরা। যদিও আগেরটাই যথেষ্ট সুন্দর এবং উঁচু ছিল। এখন নাকি বিশ হাত ওপবে, চওড়াতেও বারো হাত আব সেই অনুপাতে কিছু হচ্ছে। রাজু মনে মনে হাসল। এইসবই সে এবার ফিবে আসার পর দেখছে। ছ'মাসের উপর ছিল না সে। হঠাৎ একদিন স্থির হয়েছিল। হঠাৎ একদিন বোট ভেসেছিল তাকে নিয়ে। পাটনা, মুঙ্গের কাশী ; এদিকে লক্ষ্ণৌ, দিল্লি, আলমোড়া। লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সি দেখেছে সে। অনেক কবর, গোলাগুলির চিহ্ন অনেক। দিল্লির ভাঙা প্রাসাদগুলো, ভাঙা দরওয়াজাগুলো।

ওহো, এটাই তো বুলন্দ দরওয়াজার নকল বলছিল সুরেন। মাকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, হাতে কাজ নেই বুঝি? পুরনোকে ভেঙে নতুন করছ সব? পুরনোকে ভাঙলে নতুন হওয়া যায় বুঝি? সে আবার মনে মনে হাসল।

ভারা থেকে মিস্ত্রি মজুররা নামছে। রাজু হাওদা থেকে লক্ষ্য করল, কয়েকজন কর্মচারী বেরিয়ে আসছে কাজ শেষ করে। তাদের মধ্যে সোনাউল্লা কাজিকে চিনতে পারল সে। হাতির উপর থেকে সে বলল, 'আমিনসাহেব, শোনো'। আমলারা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, এখন তটস্থ হল।

হাতি থেকে নেমে রাজু বলল, 'হাতির উপরে হরিণ আছে'।

সোনাউল্লা বলল, 'জী মেহেরবান'।

'ওটার সদ্‌গতি করো তোমরা। চামড়াটা শুধু'...

'জী, রাজবাড়িতে পাঠাব'?

'না'। একটু হেসে রাজু বলল, 'শিবমন্দিরের পুরোহিতকে বরং পাঠিয়ে দিও। যদি তাঁর কাজে লাগে। কেউ কেউ নাকি অজিন পছন্দ করে'।

'বহোৎ খুব, হুজুর'।

৫

রাজবাড়িতে মশালচিরা তখন আলো জ্বালিয়ে ফিরছে। অন্দরে সামনে দরদালানের সিঁড়ির গোড়ায় বেশ ধোঁয়া। ওখানে দাসীরা ধুনুচি ঠিক করছে তাহলে। সব ঘরে ধূপ দেওয়া শেষ করতে পারেনি।

রাজু তার মহলের সিঁড়ির কাছে পৌঁছতেই রূপচাঁদের সঙ্গে দেখা হল। হাত বাড়িয়ে বন্দুক নিল সে, গুলির বেল্টও। পিছন পিছন যেতে যেতে সে বলল, 'মাসি বললেন .

রূপচাঁদ ভয়ে ভয়ে বলছিল। রাজুও অন্যমনস্ক ছিল। সে বলল, 'কে, হৈমী'? সে ভাবল, দ্যাখো, পাটনায় যখন তার বোটে এল তখন কী করুণ অবস্থা! ইতিমধ্যে কিন্তু সামলে নিয়েছে। তার সুখ-সুবিধার বিশেষ ভার নিয়েছে। রূপচাঁদ বলল, 'আজ্ঞে না, মাসি'!

'তোমার মাসি? কে? নয়নতারা? সে কি ফিরেছে'?

'বললেন তিনি রাজবাড়িতেই আছেন'।

কয়েক ধাপ উঠে বলল রাজু, 'রূপচাঁদ, স্নানের ব্যবস্থা করো'।

'গরম জল তো'?

'আ, রূপচাঁদ, এখন আমি বেশ বড়ই হয়েছি। তাছাড়া সাতদিন আগে যে ঠাণ্ডা লেগেছিল. . না-না, থাক, গরম জলই দাও স্নানের ঘরে। এখন আর মাকে বিরক্ত করে মত আনতে যেতে হবে না। মা কোথায় রে, রূপচাঁদ'?

'জেনে আসি, হুজুর'।

'না। শেষ কী করতে দেখেছিলে'? রাজু হাসল রূপচাঁদের চালাকিতে।

'আজ্ঞে, রানীমা বোধ হয় মহাভারত শুনছিলেন'।

'আর তোমার মাসিই পড়ছিলেন নিশ্চয়'?

হ্যাঁ, না—কোনটা ভালো হবে তা ঠাহর করতে পারল না রূপচাঁদ। মহাভারত পড়ার সব ব্যাপারটাই তার অনুমান।

এক মশালচি দোতলার সিঁড়ির দেয়ালে দেয়ালগিরি জ্বালছে। বেশ খানিকটা কসরত সেটা। এপাশের রেলিং-এ উঠে দাঁড়িয়ে মশালবাঁধা লাঠি দিয়ে দেয়ালগিরির উপরেই যেন ভর রাখতে হয়। যেন একটা পতঙ্গ, মশাল-লাঠিটা যার একটা শুঁড়ো। আসলে নিশ্চিন্তই তা নয়। তাহলে দেয়ালগিরির করবী ফুলের

মতো চেহারার লাল কাচের ডোমটা, যা নাকি পিতলের কয়েক প্যাঁচে মাত্র বসানো, খানখান হয়ে ভেঙে পড়ত!

একটু দাঁড়াতে হল রাজুকে।

মশালচি আলো জ্বেলে নেমে দাঁড়িয়ে সেলাম করল।

রাজু নিজের ঘরের দিকে চলল।

এ-ঘরের আসবাব খুব কম, কিংবা এমন হতে পারে ঘরখানি বিশেষ বড় বলেই তেমন দেখায়। দেয়ালে বসানো আলমারিটা বেশ বড়। অপরিচিত লোকের কাছে আর-একটা দরজা মনে হবে। শুধু তার পাল্লাগুলোর মেহগ্নি রং দরজার পালিশের চাইতে উজ্জ্বল এবং গভীর। বরং তা রঙের দিক দিয়ে খাট, চেয়ার, দেরাজের ডেস্কটার সঙ্গে মেলে। কিন্তু গাঢ় রং দেখতে গেলে মস্ত পিয়ানোটাকে লক্ষ্যে আনতে হবে যা উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে।

ঘরেব মাঝামাঝি থেকে কিছু পিছিয়ে রাজুব খাট। স্বভাবতই তাতে নেটের মশারি এবং দুধে-সাদা চাদর। দেয়াল-আলমারি থেকে কিছু দূরে একটা ছোট র‍্যাক। রূপচাঁদ তাতে বন্দুকটা রাখল। আরো বন্দুক সেখানে। ডেস্কের সামনে খান দু-তিন চেয়ার। পিয়ানোর সামনে গদিদার টুল। ডেস্কের উপরে হিংকসের বড় টেবল-ল্যাম্পটা জ্বালানো হয়নি। ঘরের ঠিক মাঝখানে ছাত থেকে ঝোলানো ঝাড়টাও জ্বলছে না, যদিও দেয়ালের দেয়ালগিরির আলোয় ঝাডেব ত্রিশিরা কাচগুলো ঝিকমিক করছে। ঝাড়টার ঠিক নিচে গালিচা।

ঠিক এই সময়েই সে-ব্যাপারটা ঘটল। একটা হীরা-বসানো বাঁটের সোনাব কিন্তু তীব্র ধার তরোয়াল রাজুর মনের মধ্যে হিংস্র হয়ে উঠল। যেন প্রতিদ্বন্দ্বীর বুকের রক্তে তার পিপাসা। কিন্তু অবাক, সে রক্ত যেন তার নিজেব চোখেব জল যার ফলে তার বলতে ইচ্ছা হচ্ছে : কথা রাখোনি।

কিন্তু এখন ঠোঁটকে ফুলতে দেওয়া যায় না। এই কয়েক মাস গঙ্গায় বোটে কাটিয়ে তার ঠোঁটের উপবে সরু কালো গোঁফেব রেখা বেশ স্পষ্ট। গালেও ইম্পিরিয়াল দাড়ি।

হেঁটে গিয়ে ডেস্কের সামনে চেয়ারে বসতে বসতে ডেস্কের উপরে আখরোট কাঠের বারকোশটায় চোখ পড়ল। ধাবগুলো কারুকার্য করা। কাঠের অথচ স্বর্ণকারের কাজ মনে হয়। কিন্তু বারকোশে ফলও। রাজু কয়েকটা তুলে মুখে দিল।

খেতে খেতে জুতো খুলতে গেল রাজু। রূপচাঁদ তখন হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল। নিচু হয়ে বসে জুতো খুলতে খুলতে বলল, 'জুতোয় হাত দেবেন, হুজুর, খাচ্ছেন যে'।

'তুমি বুঝি হাট থেকে এনেছ? বেশ তো'।

'না, হুজুর, পিয়েত্রো কুঠির লাঞ্চোর জন্য সদর থেকে এসেছিল। হৈমীদিদি ছাড়িয়ে হুজুরেব ঘরে রাখতে দিলেন'।

জুতো খুলে, চটিজোড়া পায়ের কাছে এগিয়ে দিয়ে রূপচাঁদ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'স্নানের জল তৈরিই থাকবে, দিতে বলি। আর এখন কি খাবারঘরে যাবেন? সারাটা দুপুর না-খেয়ে কাটল হুজুর'।

'তাই তো দেখছি। স্নানটাই এখন দরকার'।

ফিতে-কষা জুতো-মোজা খুলে ঢিলে চটি পরার একটা সুখ আছে। শিরশির করে রক্ত বয়ে যায় যেন আরাম দিয়ে দিয়ে পায়ের আঙুলগুলোতে। রূপচাঁদ চলে গেলে একটু পায়চাবি করল রাজু, বিছানার পাশ দিয়ে গিয়ে ওদিকের গরাদটার একটা জানলা খুলল। এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া এল ঘরে। জানলা দিয়ে বাইরে চেয়েও খানিকটা সময় কাটল। সে কি কিছু প্রত্যাশা করছে? সে কি জিজ্ঞাসা করবে, এই এক বছর কোথায় থাকলে? কিছু না-বলে চলে গেলে কেন?

দরজার কাছে মৃদু শব্দ হল।

একজন কে ঢুকছে। অল্পবয়সী, মুখটা ভরাভরা, চোখ দুটো বড়, ছোট নাক, তাতে ঝুটা মুক্তার

নোলক। চুল টেনে বাঁধা, সম্ভবত বেশি তেল দেওয়ায় আলোয় চকচক করছে। দু'হাতে সাদা শাঁখার বালা। গায়ের উপর দিয়ে টেনে কোমরে এনে জড়ানো রাজবাড়ির ধোসা। কাজ করছে বলে হাত দু'খানা প্রায় কাঁধ থেকেই আবরণের বাইরে। তার হাতে ধুনুচি ধোঁয়াচ্ছে। রাজুকে দেখে সে শশব্যস্তে ফিরে যাচ্ছিল। রাজু বলল, 'ধূপ দেবে? দাও, আমি স্নানে যাচ্ছি'। সে বেরিয়ে গেল। কেমন ঠকল সে আবার!

বিধান এই—ঝিরা রাজপরিবারের পুরুষদের সামনে চলতে ভয় পায়। বিধানও এই, যে-ঘরে তাঁরা থাকবেন না-ডাকলে সেখানে যাবে না। বিধানটা নতুন। ভৃত্যদের বেলায় এ-বিধানটা খানিকটা শিথিল, কারণ তাদের সংবাদ আদানপ্রদান করতে হয়।

ঝিটি এখানে-ওখানে ধূপ দিল ধুনুচি দুলিয়ে। কিন্তু কেমন একটা অস্বস্তি লাগছে তার। সে কি বেআইনি কিছু করে ফেলেছে?

তবু কর্তব্য তো করতে হবে। ডেস্কের কাছে এল সে ধূপ দিতে দিতে। ডেস্কের চারপাশে, তার উপরে দেয়ালের গায়ে ধূপ দিতে দিতে সে যেন সৌন্দর্যে অবাক হয়ে গেল। বারকোশটা আর বারকোশে সাজানো ফল। ধুনুচি দোলাতে দোলাতে সে সরে গেল। এখন সে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে পিয়ানোর দিকে ধূপ দেওয়া শেষ হলে। কিন্তু পিয়ানোর দিকে না-গিয়ে বরং সে ডেস্কের কাছে সরে এসেই আবার ধুনুচি দোলাল। আর সেই সুযোগে বারকোশ এবং বারকোশের উপরে রাখা ফলগুলোকে আবার দেখল। ধূপ দেওয়া কি আর হয়নি? দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে এদিক-ওদিক দেখল। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে ধুনুচিটা মেঝেতে রাখল। বারকোশের উপর থেকে একমুঠো যা উঠল একবারে তুলে নিয়ে আঁচলে বাঁধল। আঁচল কোমরে জড়িয়ে ধোসা দিয়ে ঢাকল। তার মনে হল এগুলোকেই কাবুলি মেওয়া বলে। না-জানি কী অমর্ত সোয়াদ। কিন্তু ঘর থেকে বেরোতে-না-বেরোতে কিছু যেন তার বুক চেপে ধরল। রক্ত চলাচলের অভাবে তার হাত-পা বিবশ হয়ে আসছে, মুখ বিবর্ণ।

দুড়দাড় করে সে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেল। সেখানে প্রাচীনা একজন অন্য ঝিদের দিয়ে এদিক ওদিক ধূপ দেওয়াচ্ছে। প্রাচীনা বলল, 'কী রে, হাঁপাচ্ছিস কেন'?

'রাজকুমার ঘরে ছিলেন'। তার পেটের কাছে বাঁধা মেওয়াগুলো লোহার দলার মতো ভারী আর শক্ত বোধ হল।

'তা রাজকুমার ঘরে থাকলে', প্রাচীনা বলল, 'আমি কিন্তু দরজার বাইরে পর্যন্ত গিয়েছিলাম তোর সঙ্গে, তাই না'?

'ছাই গিয়েছিলে'।

এবার প্রাচীনার মুখও বিবর্ণ হল। সে ভাবতে লাগল : রানীমাকে কি এখনই গিয়ে বলা উচিত, সে যায়নি? বলে কি ক্ষমা পাওয়া যাবে? রানীমার হুকুমই এই—নতুন নতুন ঝিয়েরা যখন কাজ করবে পুরনো বিশ্বাসী ঝিয়েরা তখন সঙ্গে থাকবে।

তাদের সে-অবস্থায় দেখে কিছু একটা ঘটেছে আন্দাজ করে অন্য ঝিয়েরা এগিয়ে আসছিল কৌতুহলের টানে। প্রাচীনা ঝেঁজে উঠে বলল, 'যা-যা, কাজ শেষ কর। আমি ক'টাকে সামলাই বল। এটাকে বললাম দাঁড়া, তো ওটা একাই ছুটল রাজকুমারের ঘরের দিকে'।

অন্য ঝিয়েরা নিজের গালে হাত দিয়ে এদিক-ওদিক মুখ ফেরাল যেন ঘটনাটায় কী না বিস্ময়কর অভাবনীয়তা আছে, কী না গা-শিরশির করা ঘটেছে।

নতুন ঝিটি যেন প্রাচীনার এই বিড়ম্বনার পিছনেই নিজের বিবশতাকে আড়াল করতে পারল। পরামর্শ করার ভঙ্গিতে বলল, 'তা দিদি, তুমি তো ছিলেই দরজার কাছে। ধোঁয়ায় আমরা ঠাহর করতে পারিনি রাজকুমার ছিলেন ঘরে'।

'তাই বল। তুই যে কখন কী ভয় দেখাস না'!

কিন্তু তার গা তখন কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে একবার ভাবল : কিন্তু বারকোশটা কি বেশি খালি

হয়ে যায়নি! প্রাচীনা তার মুখের দিকে চাইল আবার। জিজ্ঞাসা করল, 'তোর শরীরটা কি খারাপ নাকি লো'?

'মাথাটা ধরেছে খুব'।

'তাহলে বাড়ি যাবি? সেই ভালো'। প্রাচীনা এই বলে ভাবল : একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছে। দূরে দূরে থাকে এখন তাই ভালো। সামলে নেওয়ার সময় পাওয়া যাবে। নবীনা ধুনুচি নামিয়ে রেখে বাড়ির দিকে চলল।

রাজবাড়িতে যারা কাজ করে তাদের সকলের ছুটি একসঙ্গে হয় না। এবং বর্তমানে ঝি বলতে যা বোঝায় সকলেই সে স্তরের ছিল না। ঝি এবং কন্যায় যে কোথাও-কোথাও মিলের আভাস আছে তা তখন এখানে অযুক্তির ছিল না।

প্রথম পরিচারিকা পথে বেরিয়ে একজন সঙ্গী পেল। এই দ্বিতীয়ার নাম সুন্দরী বামনি, এবং প্রকৃতপক্ষে তাকে সুন্দরীই বলা যায়। প্রথমার চাইতেও সে কিছু বয়সে বড়। সেজন্যই হয়তো সে সাহসিকা এবং হয়তো-বা সেজন্যই তার সৌন্দর্য লোকের চোখে লাগে। টানা চোখ, নাকে ঝুটা পান্নার ফুল, কানে মাকড়ি। সবসময়েই সে পরিচ্ছন্ন কিন্তু অনেকসময়ে যেন ক্লান্ত দেখায় তাকে।

একই রাস্তায় যাবে তারা, আগে সুন্দরীর বাড়ি পড়বে।

খানিকটা দূরে গিয়ে সুন্দরী খুব ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করল, 'সৌভাগ্য নাকি লো'?

প্রথমা ঝি অবাক হল। 'কীসের? কী সৌভাগ্য দিদি'?

'রাজকুমারের ঘর থেকে এসে অমন হাঁপাচ্ছিলি'।

'সুখ? ও? আ, 'ছি-ছি! তুমি একমুঠো ছাই ধরেছ সুন্দরীদি'।

দুজনে আর কথা না-বলে হাঁটতে লাগল। সুন্দরীকে যেন বিবর্ণ দেখাল। সুন্দরী বামনির বাড়ি এসে পড়েছিল। বাড়ির দরজায় তার ফুটফুটে ছেলেটি আলো নিয়ে দাঁড়িয়ে। বোঝা যায় স্বামীও আছে কাছাকাছি। সুন্দরী তাড়াতাড়ি এগিয়ে ছেলেকে কোলে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরল। একটু বেশি জোরে।

প্রথমা ঝি ভাবল, না, তার ছেলে খেতে পারে না। তার দাঁত ওঠেনি। অন্যান্যরা প্রায়ই লোভের জিনিস এটা-ওটা ছেলেমেয়ের নাম করে চেয়ে নেয়। আঁটকুড়ি ব্রজবালার কথা সকলেই জানে। স্বামীর অসুখ বলে তো সে রানীমার মঞ্জুরই নিয়ে রেখেছে—মাছটা, দুধটা, ভালো খাবারের একটু বেশি বাড়িতে নিয়ে যাবেই। কিন্তু, না, তার স্বামীকেও সে দিতে পারবে না এই কাবুলি-মেওয়া। স্বামী তাকে কী ভাববে? চোখে জল এসে গেল তার। না, শেষ পর্যন্ত লুকিয়ে লুকিয়ে একাই খেতে হবে, এখানে অন্ধকার হলেও ফেলে দেওয়া যায় না। কার চোখে পড়বে কাল। আর সোয়াদে অমর্ত।

কিন্তু তা কি পাপ, যা তার মনে আসছে? সুন্দরীর জিভে পাপ আছে। পরিচারিকা বিবাহিতা। সে জানে পুরুষের কামনা কখনও কখনও একটা কোমল স্নিগ্ধ প্রার্থনার মতো। সুকুমার সুবেশ রাজকুমারের যদি তেমন নিঃশব্দ অনুরোধ—পরিচারিকা হাঁপাতে লাগল। আ, 'ছি, ছি-ছি, না।

রাজু যখন স্নান করে ফিরল অন্ধকার গাঢ় হয়েছে বলেই যেন ঘরের দেয়ালগিরিগুলিকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

এখন আলগা জামার উপরে শাল। এখনই স্নান করে এসেছে ঠাণ্ডায়, মুখটা লালচে দেখাচ্ছে দাড়ি সত্ত্বেও। এখন তাকে কি একটু অন্যরকমই দেখায়, আট-দশ মাস আগে যারা দেখেছে তাদের চোখেও আট-দশ মাস আগে কুড়ি ছিল না, এবার কুড়ি পার হল।

রূপচাঁদ এসে জিজ্ঞাসা করল ডেস্কের আলোটা জ্বেলে দেবে কিনা।

'না'। বলে রাজু খাটের দিকে এগিয়ে গেল। বলল, 'আর-কিছু দরকার নেই এখন'।

রূপচাঁদ চলে গেলে সে ভাবল, 'কিংবা আরো স্পষ্ট করে বলতে হলে তার এই কথাটা মনে হল, 'নয়নতারা ফিরেছে'। কথাটার আগে এবং পরে যেন আর-কিছু নেই।

ডেস্কের সামনে চেয়ার টেনে সে বসল। যেন তার ভ্রূকুটি চিন্তায় কুটিল হবে, কিন্তু সে হাসল। দু-এক মিনিটেই উঠে গিয়ে পিয়ানোর ডালা খুলে টুলের উপর বসল। ডানার ভিতর দিকে একটা খাপে স্বরলিপি। কয়েকখানা বার করে কোলের উপর রেখে উল্টেপাল্টে দেখল। ভাব দেখে মনে হল কোনোটাই যেন তার পছন্দ হচ্ছে না। অথচ এগুলো তার খুবই পছন্দের জিনিস।

ব্যাপারটা যেন এই রকম : সদ্য স্নানশেষে শরীর থেকে যে-সারাদিনটাকে সে সরিয়ে দিতে পেরেছে সেটাই তার বন, রৌদ্র, জনতা, উত্তাপ, ক্লান্তি, মৃত হরিণ, তার ব্যথা সব নিয়ে যেন তার শরীরের বাইরে অথচ মনের সামনে এসে পড়েছে। বাজানো যায় পিয়ানোতে সেই অনুভূতি? এদিকে-ওদিকে এ-ঘাট ও-ঘাটে ঘা দিয়ে দিয়ে সে অন্যমনস্কের মতো শব্দঝঙ্কার তুলল, যার সবটুকু তার নিজের কানেও ধবা দিল কিনা বলা কঠিন।

তারপর সে কিছু ভেবে স্থির করে নিল। বেশ কিছুদিন আগে নয়নতারা ঘবে ঢুকতে ঢুকতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল, সে বোধ হয় তার কাশী না কোথায় যাওযারও কিছুদিন আগে, সে তখন বাজাচ্ছিল। হাতে লেখা স্ববলিপির পাতাগুলো আবার কোলের উপরে নামাল সে। উল্টে উল্টে দেখতে দেখতে সেই ঝঙ্কারগুলো যেন স্মৃতিতে ফিরল, স্কোর-শীটটাকে খুঁজে পেল সে। ডালার খাঁজে সেটিকে বসাল, ডাইনে থেকে বাঁয়ে চেয়ে যেন সবগুলি ঘাট দেখে নিল এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত।

বাজাতে শুরু করলে অবশ্য সমস্ত মনটাই বাজনাতে রাখতে হয়। প্রায় মুখস্থই পাতাখানা, পিয়েত্রো যা বলেছিল তাও মনে আছে—এঁদের সম্বন্ধে কখনই অতি সাহস দেখাবে না ; তা হেন্ডেল, অথবা বাখ যে-ই হোন। নোটেশন সামনে রাখা চাই।

চারিদিক স্তব্ধ। পিয়ানোর সুর সে-স্তব্ধতায় অনেকটা দূর দূর ছড়ায়। কেউ যদি অনুমান কবে রাজবাড়ির বাইরে দেওয়ানেব কুঠিতে বসে হরদয়াল তা শুনতে পাবে কিংবা পাচ্ছে তাহলে সে অনুমান অন্তত অযুক্তির হবে না।

৬

রূপচাঁদ রাজকুমারের ঘর থেকে বেরিয়ে রানীর মহলের দিকে চলল। ঠিক এখন আব তার কোনো কাজ নেই। তাছাড়া কেউ তাকে কিছু করতেও বলেনি। তবু পাযে পাযে সে রানীব ঘবেব দিকে এগোল। চলতে-চলতে তার মনে হল একটা কাজ সে করতে পারে, নয়নঠাককনেব সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে খবব দিতে পারে রাজকুমার শিকার থেকে নিরাপদে ফিরে এসেছেন।

দুটো অলিন্দ যেখানে মিশেছে সেখানে তাকে থেমে দাঁড়াতে হল। বানীমার ঘবের থেকে একটা আলোর বৃত্ত দরজার বাইরে এসে পড়েছে। এদিকে পাশে সিঁড়ির উপবে বড় হিংকসের লণ্ঠন। সে আলোও একটা বৃত্ত তৈরি করেছে। বৃত্ত দুটি যেখানে পরস্পরকে ছেদ করেছে সেখানে একটু আগে-পিছে তিনজোড়া পা লক্ষ্য করল সে। আলো বডজোর হাঁটু পর্যন্ত উজ্জ্বল। উপরের দিকে তিনজনেরই প্রায় একই রকম চাদরমোড়া ঘোমটা-দেওয়া আকৃতি। কিছু যেন রঙের তফাত চাদরে—তার কোনটি কাশ্মীরি শাল, কোনটি আলোয়ান তা ধরা যায় না।

রানী বললেন (অনেক দূর থেকেই এই গলা রাজবাড়ির লোকেরা ঠাহর করতে পারে, যদিও তা কখনই উঁচু নয়), 'নয়ন, ইচ্ছা তো একটা শক্তি, তোমার কি মনে হয় যে অন্যের যা আছে তার উপরে লোভ থেকেই ইচ্ছার জন্ম, আর অন্যের যা আছে তা না-দেখলে লোভ জন্মায় না'?

রানীমা বোধ হয় হাসলেন নিঃশব্দে। রূপচাঁদ আন্দাজ করল, নতুবা নয়নঠাকরুণের হাসি শোনা যেত না। উঁচু গলার না-হলেও কথায় হাসি জড়িয়ে থাকলে তা বোঝা যায় বইকি।

'আমি কিন্তু সব ইচ্ছাকেই পরশ্রীকাতরতা বলিনি। তাছাড়া সদরদরজার পুরনো চেহারা ভেঙে নতুন

নকশায় যা হচ্ছে তাতে অন্য কারো দরজা দেখে আপনার লোভ এমন না-ও হতে পারে। কবি-কল্পনা বলে কিছু আছে। যদিও দুপুরের লাঞ্চে খাওয়ার যে-বর্ণনা শুনলাম হয়তো একদিন আমাদের সেসব নানাবিধ মদ্য ও খাদ্যে লোভ হতে পারে'।

রানী হেসে বললেন, 'দুষ্টু মেয়ে, তোমার কথায় মনে হবে লোভ যখন অসমর্থ তখন তা পরশ্রীকাতর হয়ে পড়তে পারে। কিন্তু নয়ন, সত্যি ভেবে দেখো কথাটা, কতটা আমাদের সত্যিকারের অভাব আর কতটুকু তা বণিকের তৈরি'।

'রানীমা, হিংকসের হারিকেন দেখা দেবার আগেও আলোর অভাব ছিল। তা হয়তো প্রদীপ, মশালে মিটত। কিন্তু হিংকসের হারিকেনে যদি তার চাইতে ভালো মেটে তাহলে বণিককে দোষ দেব কেন'?

রানী বলতে শুরু করলেন, 'সত্যিকারের অভাবটা হবে সত্যিকারের মানুষটার। তার তেমন চোখ নেই যে প্রদীপ আর লণ্ঠনে তফাত বোঝে'। কিন্তু হঠাৎ এক কৌতুকবোধে তিনি হেসে উঠলেন। বললেন, 'জানো নয়ন, কায়েতবাড়িতে নাকি নকল পাথুরে তৈজস ব্যবহার হবে। নাকি চীনামাটি বলে। বিলেতে নাকি তৈরি। শুনে নায়েবমশাই খোঁজ করেছিলেন যদি রুপোর কিছু তৈজস দরকার হয়ে থাকে। দূর করো। রুপোর দামেই নাকি সেসব চীনামাটি'।

রানীর অন্য সঙ্গিনী বলল, 'আপনি তো হাসতে হাসতেই মঞ্জুরি দিলেন'। 'ওটা আমরা আলোচনা করি না' বলে রানী আবার হাসলেন। বললেন আবার, 'যাকগে, খুব কথা তুলেছ, নয়ন, পারো তো দু'একদিনের মধ্যে আবার এসো। তোমার বিদেশবাসের গল্পই শোনা হয়নি। সাবি, তুমি কি একা পারবে নয়নকে পৌঁছে দিতে? আচ্ছা, না-হয় রূপচাঁদকে দ্যাখো। আমরা এখানে দাঁড়াই'।

রূপচাঁদ খুক করে কাশল। সাড়া দিল, সে এসে পড়েছে। হিংকসের লণ্ঠনটা যে নয়নতারাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে তা বোঝা গেল।

রূপচাঁদ আগে আগে চলল। এই সময়ে কথাটা তার অনুভূতিতে এসেছিল। একটু পরিবর্তন হয়েছে। আগেও নয়নঠাকরুন ঠাকুরানীদের মতোই ছিলেন। কিন্তু যেন ঘরোয়া, লক্ষ্মীঠাকরুন যেন। আসলে হয়তো এখনও তেমনি মিষ্টি করে হাসেন। কিন্তু চেহারা হালকা হলে কী হয়, যেন চালির মধ্যে দুর্গা। হয়তো এ কয়েকমাস ছিলেন না বলেই ধরা পড়ছে। কতকটা যেন রানীমার মতো হয়ে উঠতে লেগেছেন।

লণ্ঠন হাতে রূপচাঁদ। পিছনে নয়নতারা। নিজের বাড়ির দিকে চলতে চলতে নয়নতারা ভাবল : অন্যের যা আছে তা দেখে তাকে পেতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এটার অন্য দিক আছে। কাব্য তো সকলেই দেখে, পাঠ করে, কিন্তু সকলেই কি কবি হতে চায়? ইতিহাসের গল্প অনেকেই শোনে, কিন্তু বালক-বয়স পার হলে সকলেই কি রাজা হতে চায়?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজচন্দ্র বলল, 'কেট, ডার্লিং, রবিবার কথাটা শিখলাম তোমরা গ্রামে আসার পরেই। জানলাম সেটা সপ্তাহের প্রথমে না-এসে শেষে আসে, বিশ্রামের দিন হয়ে। কিন্তু হায়, দ্যাখো, রবিবারেই তোমার কর্তা কর্মব্যস্ত। ইতিমধ্যে শিবস্থাপন দশদিনের পুরনো ব্যাপার'।

'আপনার কি কাজ ছিল, রাজকুমার'? কেট বলল।

'রাজকুমারের কাজ থাকে এ-সংবাদ তোমাকে কে দিয়েছে মনস্বিনী'?

ডেস্কের উপরে একগোছা খবরের কাগজ। পায়চারি থামিয়ে রাজচন্দ্র কাগজের গোছাটাকে কোলের উপরে তুলে নিয়ে একবার ডেস্কের উপরে পা ঝুলিয়ে বসল।

স্থানটা হেডমাস্টার চন্দ্রকান্ত এন্ড্রুজ বাগচীর বসবার ঘর। তখন রবিবারের সকাল আটটা হবে।

কেট বলল হেসে, 'ওটা কী সম্বোধন হল'?

'কোনটা? মনস্বিনী? ওর মানে তুমি এক মনের অধিকারিণী। রূপসী বলে সম্বোধন করলে কেউ আপত্তি করতে পারে, তাই মনকে সম্বোধন। কিন্তু এই কাগজগুলো কী? কী-বা লেখে তা বলো বরং'।

কেট সেলাই-এর ঝুড়িতে উল-কাঁটা রেখে রাজুর দিকে চাইল। সে উঠে রাজকুমারের কাছে এসে দাঁড়াল। ঠিক এই সময়ে সদরদরজায় বাঁধা রাজকুমারের ঘোড়া হুঁউই করে নাক ঝাড়ল। তার সাজ-লাগামের মৃদু শব্দ উঠল।

তা শুনে হাসিমুখে বলল কেট, 'কী চঞ্চল'!

রাজকুমারের দিকে চেয়ে তার কিন্তু একটু অবাক লাগল। ন-দশ মাস পরে সে আবার রাজচন্দ্রকে দেখছে কাছে। ইতিমধ্যে বোধ হয় সে আর একদিনই দেখেছিল তাকে জানলায়। পথের ধার ঘেঁষে কী যেন ভাবনা নিয়ে চলেছিল রাজকুমার। অন্যদিকে, রাজচন্দ্র নিজে কেটদের বাড়িতে না-এলেও বাগচী গত একমাসে অনেকদিনই রাজবাড়িতে গিয়েছে সন্ধ্যায়। তার অনেকগুলিই রাজকুমারের বৈঠকখানায় কেটেছে তা কেট জানে। কথাটা এখানে এই : কিছু সময়ের ব্যবধানে দেখে অবাক লাগছে আজ। পাহাড়ি শহরে হাওয়া বদলে এলে পরিচিত লোককে এমন দেখায় নাকি? গাঢ় হয়েছে রংটা। সরু জুলফি দাড়ি চিবুকের নিচে ছোট এক ইম্পিরিয়ালে মিশেছে। অনুমান, মানুষটিও বেশ কিছুটা উচ্চতায় যেন বেড়েছে। এসবেরই এই কারণ হতে পারে, যেমন বাগচী বলেছে, যে দিনের বেশিরভাগ সময় রাজকুমারের মাঠে-জঙ্গলে কাটে শিকারের খোঁজে অথবা নিছক ঘোড়া ছুটিয়ে। কিংবা সময় কাটে উত্তর-পশ্চিম সংযুক্ত প্রদেশে বেড়িয়ে।

'কিন্তু এগুলো তো পুরনো কাগজ'। বলল কেট, 'রাজবাড়ি থেকেই এসেছে'।

'তা হোক না। কিংবা বলো কী ভাবছ অমন গাল লাল করে'?

'কই, কোথায়? কিংবা যদি বলি অনেকদিন পরে দেখছি, এখন রাজকুমারকে আরো সুন্দর দেখায়। কিন্তু এখন কাগজ থাক। তার চাইতে বলুন কর্তার খোঁজ কেন'?

'এই দ্যাখো, পুরুষের কত দরকারি কথা থাকে'। বলল রাজকুমার। একটু পরেই আবার হেসে বলল, 'তাই বলে তুমি ব্যস্ত হয়ো না। এখন এখানে নিছক আড্ডা। আড্ডার খোঁজেই এসেছি'।

'সে তো রোজ সন্ধ্যাতেই হয়'।

'রোজ নয়, সুভগে, মাঝে মাঝে বলতে পারো। তাও ইদানীং'।

'রোজ হলেও আপত্তি নেই। কিন্তু আমাব খুব জানতে ইচ্ছা হয় কী করেন আপনারা আড্ডায়'?

রাজু হাসল, 'বলতে পারো খুব ভালো ক্লারাট আর সত্যিকারের টার্কিশ। অথবা তোমার জানাই ভালো, কর্তাকে তোমার বিপথে নিচ্ছি না। আপাতত পিয়েত্রোর স্বজাতি অর্থাৎ ফরাসিদের সম্বন্ধে কিছু জানার চেষ্টা চলছে। ভারি কৌতুকের, জানো? পিয়েত্রো ফরাসিদের সম্বন্ধে অনেক কথা আমাকে বলতেন, কিন্তু যাকে ফরাসিদের বিদ্রোহ বলে সে-সম্বন্ধে দেখছি বিশেষ কিছুই বলেননি'।

'আপনার কি সেসব গল্প ভালো লাগত? অত রক্ত আর শানানো ধারালো গিলোটিন'?

'তা জানতে পারলে গল্পটা অত করে শোনার দরকার হতো না। আমার তো মনে হয়েছে ওটা এক ধরনের ব্যর্থতা। কিছু পুরনো ধারণা বদলেছে। রাজাকে বরতরফ করে ওরা বুঝতে চেয়েছিল রাজা আর ঈশ্বর এক নয়। কিন্তু তা বুঝতে অত নরহত্যা দরকার ছিল না। পিয়েত্রো এজন্যই বোধ হয় আলাপে আনত না ওটাকে'।

একটু ভেবে আবার বলল রাজচন্দ্র, 'কার কোন গল্প ভালো লাগবে তা কি আগে বলা যায়? বেশ লাগে তোমাদের রাজা চার্লসকে। তোমাদের রাজা চার্লস আর ফরাসিদের সেই সব মার্কুইস, কাউন্ট কেউ মৃত্যুভয়ে কাঁদেনি বলেই গল্পগুলো ভালো লেগে থাকবে আমার'।

কথাটা শুনে কেট অবাক হয়ে গেল।

রাজু বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই জানো রানী মারিকে ওরা যখন নিয়ে যাবে গিলোটিনে, তখন কিন্তু তিনি তাঁর সাজপোশাকে ত্রুটি করেননি। তাঁরা কেউ কিন্তু বলেননি, যা করেছি ভুল করেছি। সূর্য-ডোবার মতো ব্যাপাব নয়? তেমনি ম্লান হয়ে যাওয়া কিন্তু অনেক রঙের মধ্যে। কোনো অনুতাপ নেই'।

'এসবই আড্ডার বিষয় নাকি আপনাদের'। বিষণ্ণ শোনাল কেটকে।

'বিষয়টা দু-পক্ষের জানা না-থাকলে কি আলোচনা হয়? বাগচী বলেন, আমি শুনি। এলোপাথাড়ি প্রশ্ন করে কখনও তাঁর অসুবিধা ঘটাই। ভেবেছ তাঁর সঙ্গে আমার মত মেলে? তাঁর কাছে সব ব্যাপারটাই খারাপ। মানুষকে সমাজের চাপে বিকলাঙ্গ করে দেওয়া হয়েছিল। তারা যখন চাপ থেকে বেরিয়ে এল তখন তাদের স্বভাবতই বিকলাঙ্গ সুতরাং কুৎসিতই দেখা গিয়েছিল। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, তোমাদের রাজা চার্লস, ফরাসিদের রাজা লুই আর এদেশের রাজা বাহাদুর শা-এর মধ্যে কত তফাত! শুনেছি সে বুড়ো। জীবন ভোগ করার কোনো ক্ষমতাই আব নেই। কিন্তু মরতে জানল না, ছি! অবশ্য একা বাহাদুর শা নয়। অনেক নকল নবাব, অনেক নকল রাজা কেউ এ-শহবে, কেউ অন্য শহরে বৃত্তি ভোগ করছে। জানো কলকাতায় এক ভালো গাইয়ে নবাব আছেন? ভালো ঠুংরি গান'?

'যুদ্ধে জয়-পরাজয় আছেই। হেরে গেলে কী করা যায়'?

'ও কেট! তুমি রীতিমতো মেয়েমানুষ'। রাজু হেসে উঠল। 'রাজা সন্ধি করতে পারে, কিন্তু নিজেকে বন্দী করতে দেবে কেন? তাও ব্যবসাদারদের বেনিয়ানেব মতো বৃত্তি ভোগ করতে'?

কেট বলল, 'বাহাদুর শা-এর উপরে আপনার ভয়ানক রাগ'।

'যথেষ্ট, যথেষ্ট'। হাসি হাসি মুখে বলল বাজু, 'মাঝে মাঝে বরং মনে হয়, অনেকদিন থেকেই মোমভরা নকল মোতির মতো নকল বাদশা ছিলেন দিল্লির ভদ্রলোকেরা। কী যেন, দিল্লিসে পালাম তক। যেমন অন্য কোথাও কেউ নকল রাজকুমার থাকতে পারে'।

কেট রাজুর মুখের দিকে চাইল।

কিন্তু তখনই আবার বলল রাজকুমার, 'অয়ি স্বর্ণলোচনে, গৃহকর্তা আসছেন না, তোমার হাতের সেবা চাই। রাজকুমার তো বটি। এসো এই কাগজটা পড়ো, নয় পিয়ানোর টুলে যাও, এসো না-হয় একসঙ্গে বাজাই, অথবা কী-যেন সেই উষ্ণ পানীয়, কফি নয়'?

কেট হেসে বলল, 'হবে রাজকুমার'। এই বলে সে ত্বরায় কফি আনতে গেল।

কেট যতক্ষণ কফি করে আনতে গেল রাজু উঠে পায়চারি করছিল। বাগচীর টেবলে এবং শেল্‌ফে অনেক বই। রাজু হাত দিয়ে না-ছুঁয়ে দেখল। বাংলা হরফের বইও আছে। তার একবার ইচ্ছা হল উল্টেপাল্টে দেখে কী আছে এসব বইয়ে। এতসব লেখা, এ কি লেখকের নিজের অভিজ্ঞতার বর্ণনাই শুধু, না, অন্যের মতামতেব সংকলন? অন্যের মত বললেই কি বাসি মনে হয় না? কলকাতায় যে নানা মতের প্রচার চলছে তা নিয়ে একদিন আলোচনা হয়েছিল, 'তখন হঠাৎ মনে হয়েছিল রাজুর—কী আশ্চর্য, সকলেই যেন নিজের মত দিয়ে সত্যটাকে ঢাকতে চায়।

সেসব মত দিয়ে জীবনের কোনো গূঢ় সূত্র খুঁজে পাওয়া দূরের কথা, নিজের চারপাশটাকেও চেনা যায় না। ভাবতে ইচ্ছা করে, কিন্তু লক্ষ্য করেছে যে কোনো বিষয়ে ভাবতে গেলেই অন্য কারো মত এসে যেন মাঝখানে দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে যায়। অনেকসময়ে মনে হতে পারে সে দেয়ালের গোড়ায় পৌঁছে যাওয়াই যেন চিন্তার ভবিতব্য।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাজকুমারের জন্য কফিসেট সাজিয়ে আনল কেট।

রাজু চেয়ারে বসলে কফি করতে করতে সে ভাবল ভাগ্যে কফিটা সকালেই ভাজা হয়েছিল। কফি ঢেলে দিয়ে বলল, 'আপনি বাহাদুর শা হলে কী করতেন, রাজকুমার? আচ্ছা, এখন এত সকাল, আপনার ছোটহাজরি হয়েছে তো? কিংবা রাজকুমার, বাহাদুর শা একা কেন? নেপোলিয়ন কি বন্দীদশা স্বীকার

করবেননি'? কেট পাশের চেয়ারে বসল নিজের জন্য ছোট্ট একটা কাপ ভরে নিয়ে।

'যা প্রমাণ করা যায় না, বলে লাভ নেই। আমি হয়তো বাহাদুর শা-এর চাইতেও নিরেস কিছু করতাম'।

'কিন্তু এরকম প্রবাদ আছে, বাঁচতে সবাই চায়। যুদ্ধক্ষেত্রে যার বুকে গুলি লেগেছে সে-ও'। কেট হাসিমুখে আলাপটা চালিয়ে গেল।

পেয়ালা হাতে নিয়ে রাজু বলল, 'প্রবন্ধটা শুনলাম, কিন্তু যুক্তিতে আমার সন্দেহ আছে কেট। আঘাতটা যার সত্যি ভয়ংকর, তার সেই অবস্থায় সে বোধ হয় বাঁচা-মরার কথা ভাবে না। হয়তো জল চায়, সেটা শরীর ; হয়তো বলে শীত লাগছে, সেটা শরীর। বর্তমানটাই তখন তার কাছে প্রবল, যদি তার চিন্তা করার ক্ষমতা থাকেই'।

কেট বলল, 'রাজাও তো মানুষ। তারও শরীর আছে। তারও তো ব্যথা লাগে'।

রাজকুমার হেসে উঠল, 'এতদিন তুমি তাই জেনেছ? রাজা একটা ধারণামাত্র, তার শরীর কোথায়? সব রাজা জানে না, কিন্তু জানা তো উচিত যে রাজা অনেকগুলি মানুষের স্বাধীনতার ধারণা ; শক্তির ধারণা। সেটা গেলে রাজাই-বা কোথায়? শরীরটা? তোমাকে একটা খুব গোপন কথা বলে দিই। তরকারি কাটতে কখনও আঙুল কেটেছ? কিংবা রান্না করতে আঙুল পুড়িয়েছ? গলা কেটে গেলে তার চাইতে বেশি যন্ত্রণা হয় না। কিন্তু তাই-বা কেন? সকলে কী চায়, আর রাজা কী চায় তার মধ্যে পার্থক্য থাকবে না? সারা জীবন সকলের থেকে পৃথক, আর মৃত্যুর সম্মুখে একাকার তা হয না, হলে অন্যায় হবে'।

রাজুর হাতে কফির কাপ, সামনে কেট, রবিবারের আবহাওয়াই। তবু মুখটা এমন দেখাল রাজুর যে অনুমান হবে, সে অন্তত কিছুক্ষণেব জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে।

কেট বলল, 'এটা একটু খেয়ে দেখবেন'? এই বলে সে নিজে হাতে একটা পেস্ট্রি তুলে বাজকুমাবের হাতে দিল।

বলল আবার, 'শুনেছি লুই-এর রাজত্বে প্রজার কষ্টের সীমা ছিল না। জনসাধারণ অত্যাচারী রাজার বদলে নিজেদের শাসন চাইছিল'।

'তোমারও তাই মত? কেক দেখে মনে হচ্ছে? কিন্তু বলো তো, 'আবার নেপোলিয়ন অত সহজে সম্রাট হলেন কী করে? তাঁর অধীনে যুদ্ধ করতে গর্ববোধ করেছিল তারাই যারা ব্যাস্টিল ভেঙেছিল। সেই প্রজাদের অত্যাচারী এক দলকে সবানোর ইচ্ছা ছিল। তাদের দোষ দেওয়ার কিছু নেই। তাদের নিশ্চয় নিজের ইচ্ছাকে কাজে লাগানোর অধিকার আছে। অত্যাচার তাদের অমানুযের স্তরে পৌঁছে দিয়েছিল, তাদের ঘৃণায় হিংসায় রাক্ষুসে চেহারা ধবা পড়েছিল। কিন্তু সেটা আমাদেম আলোচনাব বিষয় নয়। অন্যপক্ষ কী করেছিল, যা করলে তাদের মানায় তা করেছিল কিনা আমবা এতক্ষণ তাই ভাবছিলাম। রাজা লুই মরতে জেনেছিল তা মনে করো আবার'।

'তাহলে কি বলব নেপোলিয়ন লুই-এর চাইতে ছোট ছিলেন'?

'দ্যাখো, খটকা আছে। তিনি একবার যেমন নির্বাসন থেকে প্যারিসে ফিরেছিলেন শেষ পর্যন্ত আবার তেমন ফেরার আশা করেছিলেন হয়তো। ওদিকে ইংরেজরা যে তাঁকে সেঁকো বিষ দিচ্ছে তা জানতে পারেননি। আমার মনে হয়, ইংল্যান্ডে তখন রানী না-থেকে রাজা থাকলে এমন কাণ্ডটা ঘটত না'।

'কী সর্বনাশ'!

'কোনটি? সেঁকো বিষ, না মেয়েলি চক্রান্ত? দ্যাখো, সেঁকো বিষের কথা বাগচী বিশ্বাস করেন না। আমি করি, কারণ পিয়েত্রো বলেছে বলেও বটে'। রাজু হাসল। বলল, আবার, 'দূর করো ইতিহাস। তুমি কি মনে করো আড্ডাটা আমাদের পাঠশালা? সেখানে ক্লারাট নেই? আর এখানে তুমি ক্লারাট-গ্লাসের চাইতেও মনোহরা, তোমার কফি এবং পিঠেও। তুমি বোধহয় এদেশি পিঠে খাওনি। এই শীতকাল, নয়নতারার এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। শুনলাম তিনি গ্রামে ফিরেছেন'।

'এসেছেন? আর-একটু কফি দিই'? কেটের মুখ উজ্জ্বল হল।

'অবশ্যই নয়। বরং ডেস্কে চলো। তোমরা কি ভেবে দ্যাখো না, কারোই দৃষ্টি নেই যে, কিছুদিনের মধ্যেই এ-গ্রামের বইপড়া লোকেরা তোমার স্বামীর স্কুলের কল্যাণে অনায়াসে আমাকে মূর্খ বলতে পারবে। বুঝতে পারছি তুমি আমার প্রেমিকা নও'।

'তা আমি জানি'। কেট বলল, 'নতুবা নয়নঠাকরুন যতদিন ছিলেন না তখন অন্তত একবারও দেখা পেতাম। বরং উল্টো'।

কেট হাসল। হাসতে গিয়ে কি তার গালে রং লাগল? আর সেজন্যই যেন এক মুহূর্ত আগে সে যা ভাবছিল কথার আড়ালে তা অবিশ্বাস্য হল। স্বভাবতই চিন্তাটা মাতৃভাষাতেই হয়। কিংবা তাকে চিন্তা না-বলে অনুভূতি বলা সঙ্গত, একটা অনুভূতি যা শব্দের আকৃতি নিচ্ছে। হঠাৎ কথাটা মনে এসেছিল কেটের নিজের ভাষাতেই, 'সিড অব ডেথ। এখন আবার রাজকুমারের মুখের দিকে চেয়ে তার মনে হল তা কি হয়? মৃত্যুর বীজ কি এমন একজনে লুকিয়ে থাকে'?

রাজচন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে ডেস্কের দিকে গেল। তাতে যেন ঘরের আলোটা নড়ে উঠে উজ্জ্বল হল।

কেট তখন ভাবল পরের ভাবনাটা। এই যে রাজকুমার বললেন লেখাপড়ার কথা, এর মধ্যে সত্যি কি গ্লানি আছে? গ্রামের কথাই নয়। কলকাতাসমেত গোটা দেশটাকে একটা সমাজ মনে করলে আধুনিক মানুষদের বই পড়াটাই একটা লক্ষণ। রাজকুমার পড়েন না। কিন্তু এ-বিষয়ে তুমি নিশ্চিত কিছু বলতে পারো না। কথাগুলো কি তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করে? কিংবা সিনিসিজম? যেন কোনো বিষয়েই আস্থা নেই। সেজন্য সবকিছু এমনকী নিজের অস্তিত্বও ঠাট্টার বিষয় হতে পারে।

'আচ্ছা, রাজকুমার', এই বলে সে থামল। কথাটা গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল, সুতরাং একটু চেষ্টা করে হেসে বলল, 'আর কী বলবে আমার স্বামীর ছাত্রেরা'?

ডেস্কের সামনে দুখানা চেয়ারে বসল দুজনে।

'কী বলবে রাজকুমার? আমাদের জমিদার অন্য জমিদারের চাইতে ভালো'।

রাজচন্দ্র ভাবল, কেটের জানার কথা নয় জমিদার জাগিরদারে কী তফাত থাকতে পারে, আর এখন তফাতও নেই। এ ভাবটাকে বরং তাড়াতাড়ি অন্য কথার আড়ালে ফেলে দেওয়া ভালো।

সে বলল, 'বেশ, বলুক। এখন তুমি বলো লাঞ্চো কাকে বলে'?

'আর রাজকুমার'!

'ঠিক বলিনি তবে? আমার কী হবে? ওদিকে শুনেছি কলকাতায় যেতে হবে কিছুদিনের মধ্যে যেখানে নাকি ওসবই ব্যবস্থা। আমার অবস্থাও দেখছি তাহলে ডানকানের মতোই। সে শুনেছি মনোহরকে মানোআর, কালীমাঈকে কুল্লিমাদার, বাঈকে পাই বলে'।

'ঠিক শিখলেই-বা দোষ কী? কথাটা লাঞ্চ আর এটা ডেস্কো নয় ডেস্ক'।

'আর এই কাগজটা টাইমেস নয় টাইমস। অগ্রসর হও। কিংবা থাকো। লাঞ্চোর বয়ান একদিন আমাকে শুনতেই হবে, দু-দুবার বড্ড বেশি হবে। কাগজটাই পড়ো'।

'কিন্তু কাগজটা তো অনেক পুরনো'।

'হায়, বরাননে'!

কাগজটা টাইমসই বটে। কেটের বাড়িতে নতুন। হরদয়ালের কাছ থেকে কালই মাত্র সংগ্রহ করেছে বাগচী। এবং তার মূলে লাঞ্চে কীবলের আলাপ। অন্যদিকে কাগজের তারিখটা ছ'মাসের পুরনো। ইংল্যান্ড থেকে আসতেই তো সময় নিয়েছে।

এখানে একটা চমৎকার যোগাযোগের ব্যাপার ঘটে গেল। কাগজের প্রথম পাতার ডানদিকে বিশেষ টাইপে একটা সংবাদ। রাজচন্দ্র আঙুল দিয়ে সেটাকে দেখিয়ে বলল, 'এখানে নিশ্চয় কিছু মজার খবর থাকবে। ফ্লোরেন্সের খবর নাকি? বাগচী বলছিলেন ফ্লোরেন্স নাকি ভাস্কর্যের পীঠস্থান। সেটা কি ইংল্যান্ডের কাছে? নাকি নাইটইনজেল। দ্যাখো দ্যাখো, ঠিক পড়লাম নাকি'।

কেট রাজুর কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে কাগজ দেখতে শুরু করল। সে অবাক হল। নামটা সে-ও এই সেদিনমাত্র শুনেছে কীবলের মুখে। কাগজ খুলে তারই সংবাদ পাওয়া যাবে ভাবতে অবাক লাগে না? খবর ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের। অন্যদিকে এতে বিস্ময়ের কী-বা আছে! প্রায় ছ মাসের কাগজ একত্রে। তখনকার ইংল্যান্ডে দু মাসে একবারও ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল সম্বন্ধে ছোট-বড় কোনো সংবাদ থাকবে না এমন সম্ভব ছিল না।

'লও, পড়ো', 'বলে রাজু কাগজটা কেটের হাতে দিল'।

কেট কাগজ নিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। অবাক হলে যেমন হয়, মনে মনে পড়তে ভুলে গেল। প্রোপোজ্যাল ফর ওপনিং এ ট্রেনিং স্কুল ফর নার্সেস অ্যাট সেন্ট টমাসেস হসপিট্যাল। (সেন্ট টমাসের হসপিট্যালে নার্সদের জন্য ট্রেনিং স্কুল খোলার প্রস্তাব)।

'বাংলায় বলো'। বলল রাজু।

কেট পড়ে বাংলায় অর্থ করে সংবাদটাকে এইরকম দাঁড় করালো। ক্রিমিয়ার অভিজ্ঞতার পর এই ধরনের প্রস্তাব যা মিস নাইটিঙ্গেলের দূরদৃষ্টি ও সাহসিকতার পরিচয় এবং একমাত্র তার কাছে থেকেই আশা করা যায়। এ-বিষয়ে এ-রকম মনে করা হচ্ছে স্যার সিডনি হার্বার্টের সহানুভূতি পাওয়া যাবে। কবি আর্থার ক্লাপ এ-বিষয়ে অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। সেন্ট টমাসের এই ট্রেনিং স্কুল যে গোটা পাশ্চাত্য জগতের হসপিট্যালে নার্সিং-এর ব্যাপারে আমূল পরিবর্তন আনবে তাতে সন্দেহ নেই। মে-ফেয়ারের এই মহিলার অন্যান্য ব্যাপারে যেমন দেখা গিয়েছে নার্স ট্রেনিং-এর ব্যাপারেও নিশ্চয়ই অনেক সদ্বংশজা কুমারী এগিয়ে আসবেন।

রাজু বলল, 'কী রকম হল ব্যাপারটা? নার্স কারে কয়? খুলে বলো'।

সংবাদটা কেটকেও ভাবিয়ে তুলেছিল, সে বলল, 'নার্স মানে জানি, কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে হতভম্ব করছে। সদ্বংশের এক মহিলার পক্ষে কেন, কোনো সৎ মহিলার পক্ষেই কি নিজের বাবা ভাই স্বামী ছাড়া আর-কাউকে সেবা করা সম্ভব? বলুন, তা যায়? আর তিনি কিনা মে-ফেয়ারের মহিলা'!

কেট ভাবল, কীবল তাহলে উল্লেখযোগ্য খবর হিসাবেই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নাম করে থাকবে। কিন্তু এ-বিষয়ে আলাপ এগোয় না, কারণ রাজু হসপিট্যাল দেখেনি, নার্স দূরের কথা। কেট রাজচন্দ্রকে বোঝানোর জন্য তুলনা দিল, 'মনে করুন মিস নাইটিঙ্গেল নয়নতারার মতোই একজন রুচিবতী সুন্দরী মহিলা, যাঁর স্যার সিডনি হার্বার্টের মতো একজন শক্তিশালী বন্ধু আছেন'।

রাজু হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, 'তাহলে আমাকেও তো একটা হসপিট্যাল করে দিতে হয়। সেখানে একা ফ্লোরেন্স, এখানে তুমি আর নয়ন'।

রাজু বলল, 'দ্যাখো আর কী খবর আছে। চীনের খবর নাকি? টাইপিং কী? বিদ্রোহ বলছে নাকি? তাহলে একপক্ষে চীন? অন্যপক্ষে ইংরেজ নাকি? থাক-থাক। কী যেন বললে, স্যার সিডনি হার্বার্ট না কী? তা তিনি আবার কীসের কারবারি? তুলো, না কয়লা'?

'সিডনি হার্বার্ট বোঝা যাচ্ছে মন্ত্রী। তাছাড়া তিনি নাইট ; জানেন রাজকুমার, আমাদের দেশে নাইটদের কিন্তু খুব সম্মান'।

'বটে? আমি শুনছিলাম তোমাদের দেশে কলওয়ালারাও আজকাল নাইট, লর্ড এসব হচ্ছেন'।

'বাঃ কলওয়ালা কি মানুষ নয়'?

রাজচন্দ্র দুষ্টুমি করে চোখ সংকীর্ণ করল, বলল, 'নিশ্চয়ই, আমারই ভুল। নেপোলিয়নও তো একজন সৈনিক ছিলেন মাত্র। তাছাড়া আমাদের দেশেও এখন অনেক নুনের বেনিয়ান, মুদি ইত্যাদি আকছার রাজা হচ্ছেন। কলকাতা আর লন্ডনে একই রীতি দ্যাখো। সেখানেও কি দশশালা'?

খবরের কাগজ পড়া আর হল না। রাজুর কিছু মনে পড়ল যেন। চেনে ঝোলানো ঘড়িটাকে বার করে সময় দেখে আবার তা জেবে ঢোকাল। এটা নিশ্চয়ই আলাপে একটা ছেদ।

রাজচন্দ্র উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ওটা আমারই ভুল, কেট। তুমিই ঠিক বলেছ। বেঁচে থাকতেই হয়। নেপোলিয়নও অনেকদিন তাঁর সেই মেঘে অন্ধকার দ্বীপে বেঁচে ছিলেন, বন্দী হয়েও, সেঁকো বিষ সত্ত্বেও।

আপাতত আমি বিদায় নিচ্ছি, স্বর্ণময়ী, হেডমাস্টারকে বোলো আজ যে, দাবাখেলার কথা ছিল সন্ধ্যায় তা হবে না। আজ হৈমী তাস খেলবে বলেছে। তাই সকালেই মিটিয়ে নিতে এসেছিলাম'।

দরজার কাছে কেট বলল, 'এখন কোথায় যাবেন'?

'বিলপাড় থেকে ওদের আসবার কথা। গোটাকয়েক কুমির নাকি ভারি উপদ্রব করছে। শিউরে উঠলে তো? যদি পাই চামড়াটা তোমাকে উপহার দেব। এতদিন তো ক্রোকোডাইল নামটাই শুনেছ'।

'রাজকুমার, ক্রোকোডাইল মানুষের ক্ষতি করে না'?

রাজু হেসে বলল, 'শক্ত চোয়ালে দু'সারি ছুরির ফলা। সেই চোয়ালে মানুষকে ধরে জলের তলায় নিয়ে শুধু কি চুম্বন করে'?

সদরদরজার আড়কাঠে বাঁধা লাগাম খুলে ঘোড়াটাকে সড়ক অবধি হাঁটিয়ে নিল রাজু। ঘোড়াটা নতুন। গাঢ় খয়ের রং। আর বেশ উঁচু।

রাজু রাস্তা বরাবর চেয়ে হাসিমুখে ভাবল, ও-ব্যাপারে সে কেটের কাছে ঠকেছে—ওই জীবন-মৃত্যুর কথায়। নির্জন, সবসময়ে মেঘ আর স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার একটা দ্বীপের কথাই মনে হল। নিঃসঙ্গ নয়? খুবই নিঃসঙ্গ, নিকটজন কয়েকজন থাকা সত্ত্বেও। কেন ঠিক বলা যায় না বটে, কিন্তু বেঁচে থাকতেই হয়। আমাদের চিন্তাভাবনা সত্ত্বেও, জীবনের যেন নিজস্ব একটা টান আছে। মনে হয় যার জীবন আর যে ভাবে তারা এক নয় যেন।

তার মুখের হাসিটা সরে গেল।

কেট রাজকুমারের পাশে পথের উপরে এসে দাঁড়িয়েছিল। এমনটা সে বাগচীর জন্যও পারত না। (সে অবশ্য এটাকে চিন্তাতেও আনল না)। ঠিক এ-সময়ে সে নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল বোধ করল। সে রাজকুমারকে কিছুতেই বিপজ্জনক কুমিরগুলো থেকে দূরে রাখতে পারে না। কোনো জোরই নেই।

সামনে দিকে চাইতেই সে দেখতে পেল, একজন তাদের দিকে হনহন করে আসছে। দূর থেকে তাকে ইউরোপীয় পোশাক পরেছে মনে হয়। কারো কারো হাঁটায় এমন বৈশিষ্ট্য থাকে যে তা-ই তাকে চিনিয়ে দেয়।

কেট বলল, 'রাজকুমার, স্কুলের নতুন ইংরেজি মাস্টারমশায় কি আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েছিল'?

রাজুও সামনের দিকে চেয়েছিল। বলল, 'কে, মিস্টার নিওগি? তিনিই তো আসছেন মনে হচ্ছে। এবং যথারীতি খুবই ব্যস্ত'।

কেট বলল, 'ভদ্রলোক যেন সবসময়েই সময়ের অভাবে বিব্রত'।

রাজু হেসে বলল, 'দুষ্টু মেয়ে, তা তুমি ওঁকে বলতে পারো, 'আমার এত সময় আছে, তা থেকে ওঁকে আমি বেশ কিছুটা দান করতে পারি'।

রাজচন্দ্র সওয়ার হতেই ঘোড়া চলতে শুরু করল।

কেট ততক্ষণই দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ ঘোড়া এবং সওয়ার অদৃশ্য না-হল। তারপর সে আবার বসবার ঘরেই ফিরল। এখন তার কাজ আছে বটে, লাঞ্চের যোগাড় করতে হবে। তাহলেও একটু বসে নিতে পারে। উল-কাঁটার ঝুড়িটাকে সে কাছে টেনে নিল।

মিস নাইটিঙ্গেলের কথাই কি সে ভাবছিল? সে আর কোনোদিনই হয়তো ইংল্যান্ডে যাবে না, কিন্তু মে-ফেয়ারের এই মহিলার ব্যাপারটা কিন্তু ভারি কৌতূহলের।

কিন্তু রাজকুমার? (যেন সে ঘোড়া এবং তার সওয়ারকে আবার দেখতে পেল)। তাঁর কথাগুলো কি আজকের সকালের মেজাজই মাত্র? চার্লস ও নেপোলিয়নের মৃত্যু নিয়ে বলা কথাগুলো?

এবার তার মনে এল যা সে যেন মনে মনে খুঁজছিল। বিষণ্ন হল তার চোখ দুটি। সত্যি কি তা মৃত্যুর

বীজ হতে পারে? সিড অব ডেথ যার ইংরেজি হবে? যা রাজকুমারের মনে আছে?

কেটের এখন মনে হল রাজকুমার এখন ঘোড়াতেই চলেছেন বটে, তা কিন্তু পথের পাশ দিয়ে, আর অমন তেজি ঘোড়াটাও যেন ধীরে চলেছে।

২

সেদিন শিকার হয়নি, দিন সাতেক পরের এক সকালে দেউড়িতে বিলমহলের লোকেরা রাজচন্দ্রের জন্য অপেক্ষা করছিল।

কিন্তু তার আগে আর-একদিন সেই একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক এসেছিল রাজবাড়িতে। তার কথা বলে নিতে হবে।

দুপুরের কিছু আগে পিলখানা তদারক করে রাজু তখন সবেমাত্র ঘরে এসেছে। পিয়েত্রোর হাতিকে পিলখানায় আনা হয়েছে এখন। এমন সময়ে রানী তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

নিজের বসবার ঘরে ছিলেন রানী। রাজচন্দ্র যেতেই তিনি একটু সরে বসে নিজের সোফাতেই পাশের জায়গাটাকে দেখিয়ে বলেছিলেন—বসো, রাজু।

রানীমার আসনের কিছু দূরে গালিচার উপরে একজন বর্ষীয়সী। রানীমা বলেছিলেন—এই আমার ছেলে রাজচন্দ্র, আমাদের রাজকুমার। কেমন, দেখবার মতো হয়ে ওঠেনি?

অথবা এমন কিছুই বলেছিলেন যদি রাজুর স্মৃতিকে আমরা অনুসবণ করি। রাজু তখন লক্ষ্য করেছিল রানীব এই আসনটা নতুন। বিঘৎ পরিমাণ সিংহ-থাবা পায়ার উপরে নিচু চওড়া সোফা। চাঁপা রঙের উপরে সবুজ তুলোর পাতা ও ফুল আঁকা ছিটে মোড়া। এসব নিয়েই ব্যস্ত হল রাজচন্দ্রের মন, এবং তখনই যেন এই গুরুতর সিদ্ধান্ত করল সে, এটাও সেই বুড়ো চীনাটার কাজ। কিন্তু ততটা নিচু আসনে রাজুর প্যান্ট পরে বসতে অসুবিধা হচ্ছিল মনে আছে।

এ-ও রাজুর মনে আছে যে সেই বর্ষীয়সীর কপালের উপরে ঘোমটার বাইরে কিছু চুল ধবধবে সাদা, এবং সেই সাদার মধ্যে মোটা করে দেওয়া সিন্দুর। আর সে সাধারণের তুলনায় স্থূলাঙ্গী হওয়ায় তার চিবুক বোধ হয় যাকে জোড়া চিবুক বলে তেমন ছিল। কতকটা ধানরঙের ত্বক।

সে ঘরে আরো স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিল। তারা বসেছিল একটু দূরে বরং দেয়াল ঘেঁষে, গালিচার উপরেই, কিন্তু রাজকুমারের দিকে পাশ দিয়ে। ঘোমটায় মুখগুলি আধাআধি ঢাকা, গায়ে চাদর। স্ত্রীলোক কয়েকটি সুরূপা, তাদের নানা বয়স সত্ত্বেও। বিশেষ কবে লক্ষ্য না-করলেও তাদের কারো কানের গহনায় উজ্জ্বল পাথর, কারো-বা কপালের উপরে লতানো চুলের ঝাঁপটা, কারো চিবুকের তিল চোখে পড়া স্বাভাবিক।

রাজু লক্ষ্য করেছিল যেন রামধনুরই একটা টুকরো, যা তার জুতোর উপবে, পাইপ-ধরা হাতের উপর দিয়ে সোফায় গিয়ে পড়েছে। সেই বর্ষীয়সী এবং রানী আলাপ শুরু করলেন। রাজু তখন রামধনুর উৎস খোঁজ করল। এই সিদ্ধান্ত হল তার, সিলিং-এর বেলদার ঝাড়ে সূর্যের আলো পড়েই এমন হয়েছে। চুলের ঝাঁপটায় নিচে চোখ দুটি নয়নতারার নয়? চিবুকের তিল, যা আঁকা মনে হয়, হৈমীরই হবে।

বোধহয় রানী বলেছিলেন—রাজু, তোমাদের স্কুলের নতুন মাস্টারমশাই নিয়োগীর বোন উনি।

রাজু নিজের হাতের পাইপের বউল থেকে ওঠা অলস ধোঁয়াটাকে লক্ষ্য রাখছিল। আর কী কথা হয়েছিল সেখানে?

রানী কি বলেছিলেন, ইনি তোমার বিয়ের সম্বন্ধ এনেছেন একটি? বোধ হয় এমন কিছু বলে থাকবেন। তারপর তিনি বললেন—তোমার স্নান হয়নি রাজু? হৈম, তুমি একটু দ্যাখো তো।

রাজু উঠে এসেছিল সে-ঘর থেকে।

নিজের মহলের যাওয়ার অলিন্দ দিয়ে চলতে চলতে রাজু একবার পিছন ফিরে চেয়েছিল। সে দেখেছিল হৈমী পিছন পিছন আসছে। তাহলে সেই কি কিছুদিন যাবৎ রূপচাঁদের পিছনে থেকে তার স্নানাহারাদির ব্যাপারে তদারক করছে?

রাজচন্দ্র স্নানে গেলে সেই দরবার আরো কিছুক্ষণ চলেছিল। তারই একসময়ে মহিলাদের একজন বলেছিল—কনের গড়ন কী রকম? বয়স তো ষোলো বললেন। আমাদের হৈম, কিংবা নয়নতারা এদের পাশে কি দাঁড় করানো যাবে? যিনি গেলেন তিনি হৈম, আর ইনি নয়নতারা।

নিয়োগীর বোন বলল একটু ভেবে—যে বয়সের যা। পনেরো-ষোলো বছরের মেয়ের গড়ন হালকা হবে এঁদের চাইতে।

—খুব ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ দেখাবে না তো?

বিদ্যাপতির সেই অল্পবয়সী বালা শুনেছেন তো?

গম্ভীর রানী বললেন—আচ্ছা, এখন এই পর্যন্ত। তিনি উঠলেন। বললেন—নয়ন, তুমি একটু কষ্ট করো, বাছা। এঁর জন্য পালকি যোগাড় করে দাও। আর তারপর আজ তুমি আমার ঘরে খেয়ো। দুপুরে তোমার সঙ্গে কথা আছে'।

রানী চলে গেলে ঘটকীকে নিয়ে নয়নতারা বার হল ঘর থেকে। দোতলা থেকে একতলায় পৌঁছনোর আগেই একজন পরিচারিকাকে দেখতে পেয়ে পালকির ব্যবস্থা করে ফেলল। বলে দিল, 'আমরা নিচের হলঘরে দাঁড়াই। পালকি এলে খবর দিও'।

নিচের হলঘরে পালকি আসার আগে ঘটকী বলল—দেখুন তো কী কথা! ষোলো বছরের মেয়ে যত সুন্দরীই হোক, আর এ-মেয়ে সুন্দরী কিনা তা আপনারা যাচাই করুন, কিন্তু ষোলো বছরে কখনও পঁচিশের রূপ হয়? কথায় বলে কুঁড়ি আর ফুল।

নয়নতারা হেসে বলল—তাতে আর কী হয়েছে? বিয়েতে লাখ কথা খরচ হয় শুনেছি। রানীমার সঙ্গে আপনার পাঁচশো কথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ। আপনি কনের চিত্র পাঠানোর ব্যবস্থা করুন।

ঘটকী বলল—আসল ব্যাপার কী, টকটকে একটা লাল গোলাপ সব পুরুষের চোখেই পড়ে, তার পাশের ছোট কলিটা তখন নজরে আসে না। কিন্তু আমাদের রাজকুমার তো বছর বিশ বাইশ হবেন। ষোলোর বেশি কী করে মানাবে তাঁর সঙ্গে? পুরুষের বিশ-বাইশ আর স্ত্রীলোকের পঁচিশ-ছাব্বিশে তেমন তফাত থাকে না। কিন্তু পুরুষের ত্রিশ আর স্ত্রীলোকের তেত্রিশ-চৌত্রিশে? তখন তফাতটা আগের চাইতে বেশি মনে হয় না? তারপরেও পুরুষের যখন চল্লিশ তখন চুয়াল্লিশ বছরে স্ত্রীলোক তো বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছে। সে কি চল্লিশ বছরের পুরুষের কাছে বোঝা হয়ে পড়ে না?

নয়নতারা বলল—এসব আমি ঠিক বুঝি না।

ঘটকী হেসে বলল—তাহলেও, রানীমা, আপনার কথাকেই মূল্য দেন আমার মনে হল। কথাটা ভেবে দেখুন। এই হৈমী, 'সুন্দরী, খুব সুন্দরী, আহা বেচারা বিধবা। এমন রূপ রাজকুমারদের পাশেই মানাত। আমি শুধু মানানোর অর্থে বলছি। কিন্তু এখন থেকে বিশ বছর বাদে চল্লিশ-বেয়াল্লিশে আমাদের এই রাজকুমার তো যুবকই থাকবেন। কিন্তু হৈমীর মতো একজন কি তখন পাপড়ি-ঝরে-যাওয়া ফুলের মতো হবেন না?

যেন নয়নতারার মুখই শুকিয়ে উঠেছিল। এমন অনুভব করেই সে বলল—আমি তো বললুম আমি বুঝি না। আর রানীমার কাছে আপনার এসব যুক্তিও আমি তুলতে পারি না। এ-বাড়িতে তেমন প্রথা নেই।

ঘটকীর কথাগুলি অত্যন্ত হিসাবী, যেন-বা দোকানে শোনা যাবে এমন। কিছুদিন আগেও, সেসব গল্প যদি সত্যি হয়, ক্রীতদাসী বিক্রি হতো। সেই বাজারে যাদের আনাগোনা ছিল তারা এমন সব হিসাব করত কিনা ক্রীতদাসীদের বয়স নিয়ে তা বলা সহজ হচ্ছে না। সত্যর মতো এমন রূঢ় আর কী?

সে যাই হোক, আমরা রাজকুমারের কুমির শিকারের গল্প বলতে যাচ্ছিলাম। কেটকে এক রবিবারে যা সে বলে এসেছিল। আজ আবার রবিবার।

সংবাদটায় ভুল নেই। বেশ বড় কুমিরই। বিলে মানুষ নামে জলের জন্য, স্নান করতেও ; মাছ না-ধরলে চলে না ; তাছাড়া গোরু-বাছুর বিলেব মাঝে মাঝে জেগে থাকা ডাঙায় ঘাসের লোভে জল পেরিয়ে যাওয়া-আসা করে। যা রটেছে তা সত্য হলে পাঁচ-সাতটি গোরু-বাছুর খোয়া গিয়েছে ইতিমধ্যে এবং একজন মানুষ।

রাজচন্দ্র কর্মচারীটিকে বলল, 'এদের যেতে বলে দাও, জলযোগ করিয়ে দিও। পিলখানায়, পিয়েত্রোর হাতিটাকে দিতে বলো তার মাহুতকে। আজই কাজে লেগে যাক'।

রাজচন্দ্র যখন নিজের মহলে ঢুকছে তখন দেউড়ির পেটাঘড়িতে এগারোটা বাজতে শুরু করল। শব্দ তার উৎসর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে ; কিন্তু ততক্ষণে রাজু যেখানে পৌঁছেছে সেখান থেকে দেউড়ি চোখে পড়ার কথা নয়, বরং শব্দটা খুঁজতে গিয়ে একটা টুকরো গোলাপি দেয়াল চোখে পড়ল তার। এটার প্রয়োজনীয়তা কী? এটা ছাড়া কি এতদিন ল্যান্ডিংটাকে ন্যাড়া মনে হতো, এই চৌকোনা খাড়া দেয়ালটা ছাড়া? এটা নতুন দেখছে সে ফিরে।

শোবার ঘরে ঢুকল সে। পেটাঘড়ির শব্দ তাকে অন্যমনস্ক করেছিল। সম্ভবত সেজন্যই ব্যাপারটা ঘটল। সে যখন দেয়াল-আলমারি খুলে গুলির বেল্ট একটা বেছে নিয়েছে তখন তার চোখে পড়ল পালঙ্কের ওপারে ফ্রেঞ্চ উইনডোটা খোলা, তার ওপারে ঝুলবারান্দায় কেউ যেন দু'হাতে কান চেপে ধরে ঘরের দিকে পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো ঝি কি? কিংবা হৈম? এই ভেবে সে চোখ সরিয়ে নিতে গেল, কিন্তু মস্ত এলোখোঁপা, এবং খোঁপার নিচে সাদা ঘাড় তাকে আকৃষ্ট করল। আর ডালিমফুলি শাড়িটাও। রাজুর বুকের ভিতরে...

রাজু তাড়াতাড়ি আলমাবির পাল্লা বন্ধ করল। বলল, 'ও, তা, শব্দটা কি এখন লাগছে কানেও'?

যে মুখ ফিরাল সে নয়নতারাই বটে।

হাসি-হাসি মুখে সে বলল, 'আপনাকে দেউড়িতে দেখেই এসেছিলাম, রাজকুমার। ঝুলবারান্দায় এসে পুকুরে মাছধরা চোখে পড়ল। ঘড়ির ওই বাক্কুসে শব্দ না-হলে পায়ের শব্দ কানে যেত'।

রাজচন্দ্র ঝুলবারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। নিচে খিড়কির পুকুরের জলে নৌকো, জাল টানছে জেলেরা। তীরের গাছগুলোর ফাঁকে রোদ। চিল ও বক উড়ছে, মাছ চমকাচ্ছে, মাছরাঙা ঝুপ করে জলে নেমেই উড়ে যাচ্ছে আবার। কিন্তু এই মসলিন ডালিমফুলি!

সেদিকে পিঠ দিয়ে নয়নতারা রাজুর দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল।

সে বলল, 'অনেক বেলা হল। এ-পোশাকগুলো এখন পাল্টালে হয় না'? তার ভ্রূ কিছু বাঁকা হল।

'অহো, বিস্ময়! তুমি কি আমার খানসামাকে বরতরফ করেছ ললনা? কিংবা এই জানলাম হৈমী নাকি তদারক করে। ইতিমধ্যে সে কোথায় গেল'?

'এটা কী রকম হল? ডানকানের কাছে গিয়েছিলেন নাকি সকালে'?

'তার কাছে'? রাজু বিস্মিতই হল। পবক্ষণেই ইঙ্গিতটা ধবতে পেরে বরং হাসিমুখেই বলল, 'তোমার কি ধারণা একজন রাজকুমারকে সামান্য মদের জন্য নিজের ঘরের বাইরে যেতে হয়! রূপচাঁদ পর্যন্ত জানে ডানকানটা হুইস্কি আর রম ছাড়া কিছু চেনে না'।

'বলতে চান এমন ভাষাই আজকাল স্বাভাবিক'?

'এই দ্যাখো। রাজকুমারের ভাষা একটু পৃথক হবে না'?

নয়নতারা যেন নিজেকে সামলে নিল।

রাজু ঝুলবারান্দা থেকে ঘরে ফিরল। দেয়াল-আলমারিটা খুলল। র‍্যাকের গায়ে রাখা বন্দুকগুলোর বাড়তি আরো দু-একটা সেখানে। কাগজের কাঠের বাক্সে গুলি। রাজু চামড়ার বেল্টটাতে কিছু গুলি

বসিয়ে নিল।

পিছন পিছন এসে নয়নতারা রাজচন্দ্রকে লক্ষ্য করছিল। বলল, 'সময়মতো স্নানাহার করাটাকে কি আজকাল অন্যায় মনে হয়'?

রাজু বলল, 'রূপচাঁদ নালিশ করেছে বুঝি? হতভাগাটার বাড় হয়েছে বিশেষ। ভেবেছিলাম আজ ও সঙ্গে যাবে। ওকে না-নিয়ে শাস্তি দিতে হচ্ছে'।

নয়নতারা বলল, 'আপনি কি শিকারে যাবেন এখন? তাহলে কথা ছিল'।

'শিকার থেকে ফিরে এসে হয় না'?

নয়নতারা ভাবল। তার হাসি-হাসি ঠোঁটের একটা কোণ দাঁতের ডগায় চাপা।

সে বলল, 'অনেকদিনের কথা তো, হয়তো প্রতিশ্রুতিটা মনে নেই'।

রাজু একটা বন্দুক বাছাই করে র‍্যাকের কাছে থেকে সরে এসে বলল, 'বলো কেকয়কন্যা'।

সে রুমাল দিয়ে বন্দুকের চোং মুছল। তেলকালিতে রুমালটা বিশ্রী হতেই 'অ্যাঃ' বলে রুমালটাকে মেঝেতে ফেলে দিল।

নয়নতাবা বলল, 'আজ আমি শিকারে যাব'।

'তুমি'? রাজু হাসিমুখে বলল।

'হ্যাঁ, অনেক অনেকদিন আগে এমন কথা ছিল বটে'।

হো-হো করে হেসে উঠল সে। সেই পুরনো পবিস্থিতিটাকে মনে এনেই যেন। বলল, 'কিন্তু না, আজ হয় না, অন্তত'।

'এতে আর এমন চিন্তার কী আছে? টোপর-হাওদা দিতে বলুন। আমি রানীমাকে বলে আসি'।

রাজচন্দ্র উঠে দাঁড়াল সেই ভঙ্গিতে নয়নতারার প্রস্তাব নাকচ ক'রে।

'কিন্তু স্নানাহারও হল না। একবেলায় কখনও বিলমহলের কুমির মেরে ফেরা যায় না'।

রাজচন্দ্র দরজা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হালকা গলায় বলল, 'স্নান সকালেই হয়। আর মাঝে মাঝে একবেলা না-খেলে মানুষের ক্ষতির চাইতে লাভই বেশি হয়ে থাকে'।

হঠাৎ একেবারে ঘরটা শূন্য হয়ে গেল এই অনুভূতি নিয়ে নয়নতারা ধীরে ধীরে রানীর মহলের দিকে চলে গেল।

পিয়েত্রোর বেঁটে হাতিটাকে ওরা হাওদার সাজিয়ে এনেছিল। কিন্তু পাইপ ধরানোর অজুহাতে রাজু খানিকটা সময় যেন অপেক্ষা করল প্রথমে গাড়িবারান্দায়, তারপর হাতি যেখানে দাঁড়িয়েছে সেই চবুতরায়। কিংবা বোদটাই কি ভালো লাগল? অবশেষে সে নয়নতারার চমকে দেওয়া শিকারে যাওয়াব প্রস্তাবের রসিকতাটাকে মনে করে হাসিমুখে হাতিকে বসতে বলার ইঙ্গিত করল। কিন্তু এবার হাতিকেই একটু দেরি করতে হল, কারণ তখনই অন্দরমহলের থেকে একটা ছোট পালকি বেরিয়ে হাতির সম্মুখ দিয়ে আড়াআড়ি পার হচ্ছে। এটা সাধারণ পালকি। সাধারণ কোনো পুরস্ত্রী রাজবাড়িব বাইরে যেতে ব্যবহার করে থাকে। পরে হাতি যখন নিজের পথ নিয়েছে সে ভাবল একবার, এটা কেমন হয়ে গেল না? নয়নতারাকে কুশল প্রশ্নই করা হল না। আজই তো প্রথম দেখা হল কতদিন পরে। কতদিন হবে? গোটা বর্ষাকালটাই নয় কি? এবং শরৎও। আট-দশ মাস কম করেও ; প্রায় বছরই ঘুরে আসে।

গ্রামের বাইরে এখন ক্রোশটাক পথ চলে এসেছে হাতি। পথটা এখানে ঘুরে গিয়েছে একটা ফলের বাগানকে বেষ্টন করে। বাঁশের অনেক কঞ্চি এদিকে এমন ঝুঁকে রয়েছে যে হাওদায় লাগছে। মাহুত ধারালো দা দিয়ে কখনও কখনও পথের উপরে ঝুঁকে-পড়া সেই বেয়াড়া কঞ্চি কেটেও দিচ্ছে। ফলের বাগানের বেড়া সব সময়ে রাখা যায় না। গাছ বড় হয়ে গেলে সেটাকে নতুন করে দেওয়ার চেষ্টাও থাকে না। বাগানের গাছগুলোর নিচে নিচে বরং পায়ে চলা পথ।

একটা হঁই-হাঁই শব্দ শোনা গেল একবার। হাতি এগিয়ে চলল। হঠাৎ দেখতে পেল রাজু বাগানটার

পাশ ঘেঁষে রাস্তা যেখানে মোড় নিচ্ছে সেদিকে একটা পালকি বাগানের গাছগুলোর ফাঁক থেকে বেরোচ্ছে। সেই পালকিটাই বটে। ভাবল রাজু, রাজবাড়ি থেকে কেউ ফরাসডাঙায় যাচ্ছে পালকিতে। হয়তো তা রানীর শিবমন্দিরের সঙ্গে যুক্ত কোনো ব্যাপারে। কিন্তু কিছুদূর যেতে-না-যেতেই হাতিকেই থামতে হল। কী মুশকিল! পালকিটা পথের উপরে নামানো। এমন ছুটে চলেছিল সেটা যে ইতিমধ্যে শীতের দিনেও গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছে বেহারারা। তাদেরই একজন পথের ঠিক মাঝখানে হাতিকে দেখামাত্র হাত তুলে দাঁড়াল।

'কী ব্যাপার'? বলল রাজু, 'যেন শীতের রোদে ভিরমি'!

কাছাকাছি এসে মাহুত জিজ্ঞাসা করল বেহারাটি কিছু বলবে কিনা।

বেহারা বলল, 'হুজুরের খাবার আর জল'।

'খাবার'? বিরক্ত রাজু জিজ্ঞাসা করল।

বেহারাটির মুখ শুকিয়ে গেল। মাহুত দ্বিধা করতে লাগল। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই এ রকম ভঙ্গিতে রাজু বলল, 'তুলে লও'। বেহারা ভয়ে ভয়ে পালকির দিকে এগোল। আর ঠিক তখনই পালকির দরজাটাও খুলল।

মোটা একটা রেশমের চাদরেই বটে—মাথা, মুখ, কাঁধ ঘিরে ঘেরাটোপের মতোই। কিন্তু নামতে দেখে, দাঁড়াতে দেখে রাজুর সন্দেহ রইল না। রাজু কিছু বলার আগেই নয়নতারা বলল, 'মই আনেননি তো? এখন? নাকি হাত ধরবেন'?

'কিন্তু...

নয়নতারা হাতির গা ঘেঁষে হাত উঁচু করে দাঁড়াল।

একটু টানাটানি করেই তুলতে হল। হাতি বসল। হাতির পিছনের পায়ের উপরে উঠে দাঁড়াতে হল নয়নতারাকে। পালকি ফিরে গেল। হাওদার আসনে বসে অবগুণ্ঠন একটু সরালো নয়নতারা। হাঁপাতে হাঁপাতে হাসল। বলল, 'বাব্বা, কী ভয় লেগেছিল'!

রাজচন্দ্র বলল, 'কিন্তু, নয়ন'...

নয়নতারা তাড়াতাড়ি নিঃশব্দে আঙুল দিয়ে মাহুতকে দেখাল। যেন সে বলতে চায় লোকটির কান আছে, কৌতূহল সে-কানকে বরং সজাগ রাখবে। কিন্তু তখনকার দিনে এমন একটা প্রসিদ্ধি ছিল যে যখন এরা তাড়াতাড়ি নিজেদের মধ্যে একটু বিশুদ্ধ বাংলায় কথা বলে তার সবটুকু বেহারা বা মাহুতরা বোঝে না। আন্দাজ কি করে না? করে, এবং তাতেই তো নানা রূপকথা ও কাহিনীর সৃষ্টি।

'কিন্তু কীসের? আমি কি এর আগে কোনোদিন হাতির দশ হাতের মধ্যেও গিয়েছি? আর এ একেবারে তার গায়ের উপরে দাঁড়ানো'!

রাজচন্দ্র কিছু ভাবল।

নয়নতারা বলল, 'গল্পটা বলব? টেনে তুলতে পারবেন ভাবিনি'।

'তার আবার গল্প কী'?

নয়নতারা একটু হাঁপাচ্ছে। সেজন্য ঠোঁটের ফাঁকেও নিঃশ্বাস নিচ্ছে, দাঁতের নিচে জিভের লাল ডগার আভাস যেন চোখে পড়বে। নয়নতারা বলল, 'ঠাকুমারদের মুখে শোনা। বাল্যবিবাহ খুব খারাপ জিনিস, জানেন? ছোট ছেলেমেয়েরা ব্রতর কী-বা বোঝে তাই ঠাকুমার দুপাশে বর-কনে শুয়ে থাকে। এদিকে তাদের ভারি ইচ্ছা গল্পগাছা করে। একবার সারাদিন দুজনায় পরামর্শ হল। ধনুকের ছবি দেখেছেন? কাঠের দু'কোটি উপরের দিকে বাঁকানো থাকে না? গভীর রাতে ছেলেটি ঠাকুমার গায়ের উপর দিয়ে ধনুকের কাঠটিই এগিয়ে দিল। মেয়েটি ধনুকের এক কোটির ভাঁজ নিজের কোমরের নিচে দিয়ে এমনভাবে রইল যে ভারটা এদিক-ওদিক না-হয়। তারপর ধনুকের অন্য ডগা ধরে ছেলেটি ধনুক তুলতে শুরু করল। কপাল আর কাকে বলে! অনেকটা উঠেছে মেয়েটি, আর-একটু তুলে ঘুরিয়ে নিতে পারলেই হয়। মচ করে

একটা শব্দ। ধনুকটার মাঝখানটায় ভেঙে গেল। ঠাকুমারা এমনি ঠাকুমা হয় না। সবই বুঝল সে। বলল— আউর কুছ দের বা। এই বলে বুড়ি পাশ ফিরে ঘুমল'।

রাজু অনুভব করল গল্পটা আশ্চর্য রকমে বলা হয়েছে। এক মুহূর্ত যেন মাধুর্য অনুভব করে পরে সে হাসল। বলল, 'এবার সংগ্রহ করা নাকি'?

নয়নতারা বলল, 'ঠাট্টা মনে করলেন'?

'না'।

'কেমন টেনে তোলার গল্প নয়। উদ্বহন। উদ্বাহ'।

'সন্দেহ কী? ধনুকের ডগায় কনেকে তুলে আনার শক্তি না-হলে বিয়ে হয়নি মনে করতে হবে। কিন্তু নয়ন...

'কী'?

'এদিকে দ্যাখো কী করে ফেলেছি'!

'বটে'?

'কারো হাত যে টেনে তোলার মতো শক্ত তা প্রমাণ করে ফেলেছি'।

নয়নতারার মুখের খানিকটা রক্তাক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু সে ঝটিতি বলল, 'সেজন্যই তো ব্রহ্মময়ীর আসা-যাওয়া। জানেন, ব্রহ্মময়ী কিন্তু বেশ অঙ্কের ধাঁধা বানাতে পারেন'!

'অঙ্কের ধাঁধা'?

বেশ একটা কৌতুকের ব্যাপার ঘটল। ঘটকী ব্রহ্মময়ী একটা অঙ্কের হিসাবই বলেছিল বটে। সেটাই মনে এসেছিল নয়নতারার। যখন সে প্রায় বলে ফেলেছে হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে থামল সে।

'কই, বললে না'?

নয়নতারা তাড়াতাড়ি বলল, 'আচ্ছা, রাজকুমার, আপনি যে একবার পিয়েত্রো বুজরুকের সঙ্গে শিকারে গিয়েছিলেন সে কি এই পথ? সামনে ঘাসের জঙ্গল। হাতিটাও পথ চেনে যেন। রাতে যেমন ভূতের গল্প, এ-জঙ্গলেও শিকারের গল্প তেমন'।

রাজু বলতে যাচ্ছিল, বাব্বা, কোথায় ঘটকীর অঙ্কের ফাঁদ আর কোথায় শিকারের গল্প, কিন্তু ঘাসের জঙ্গলটা তারও নজরে পড়েছে। বুজরুক পিয়েত্রোর সঙ্গে সে শিকারে গিয়েছিল এমনই ঘাসের জঙ্গল পার হয়ে। সে দৃশ্যটা--যা দুটি অত্যন্ত প্রিয় মানুষের স্মৃতিতে জড়ানো তা ভোলার নয়, আর এখন তা মনে করাই হচ্ছে। রাজচন্দ্রর উজ্জ্বল মুখের উপরে একটা হালকা ছায়া পড়ল যেন।

তা দেখে নয়নতারা সময় নিয়ে পরে বলল, 'বাহ্, আমার শিকারের গল্পটা কী হল'? রাজু বলল, 'তোমাকে বরং একটা মজার কথা বলি। জানো নয়ন, পিয়েত্রো আর বুজরুক দুজনেই আমার চাইতে বয়সে বড় ছিলেন। সুতরাং তাঁদের কাল আর আমার কাল এক হতে পারে না প্রকৃতপক্ষে। কিন্তু কখনও কখনও মনে হয়...

'কী'?

'ঠিক বলতে পারছি না। একালে আমার নিজের ঘরবাড়ি নেই বললে তো ভাষা হয় না'।

'বেশ কথাটা তো'! চটুল সুরে নয়নতারা বলল। কিন্তু ভাবল সে। হঠাৎ এসে পড়া এই একটা কথা রাজকুমারের যাতে কোথাও ঠাট্টা নেই। লুকিয়ে রাজুর মুখ দেখবে নাকি? কিন্তু বরং সে মন থেকে বাইরে চলে এল। বলল, 'দ্যাখো-দ্যাখো রাজকুমার, হাতি ডুবে যাচ্ছে এমন ঘাস। গ্রামের কাছে এমন দেখিনি। এমন ঘাস। ধানও হতে পারে তাহলে'।

রাজুর দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। কিন্তু বাস্তবের ধাক্কায় হেসে সে বলল, 'কেন ধান হয় না জানি না। হাত দিও না। ধার আছে ঘাসের। দ্যাখো হাতির গায়ে দাগ পড়ছে'। একটু পরে সে আবার বলল, 'নয়নতারা, আমি কিন্তু তোমাকে কুশল প্রশ্ন করিনি'।

'এতক্ষণে বুঝি মনে পড়ছে? ধাক্কাটা সামলে নিয়েছ বলো'।

'কীসের ধাক্কা? ও! এত গর্ব নাকি রূপের'?

নয়নতারা ঠোঁটে আঙুল রেখে চোখের ইশারায় মাহুতকে দেখিয়ে দিল। বলল, 'সবার কাছে শুনছি, নাকি বেড়েছে। তাই বললাম'।

ঘাসের জঙ্গল কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্নও বটে। সামনে কিছুটা ফাঁকা। তাতে ছোট ঝোপঝাড় কাঁটাগাছ। লতা উঠেই যেন তাকে আরো দর্শনীয় করেছে।

রাজু তাড়াতাড়ি বলল, 'ওটা কি খদির, কবরেজ মহোদয়া'?

'খয়ের? তাই কী'? নয়নতারা বুঝতে পারল রাজকুমার আন্দাজ করছে কবরেজি শিখতেই সে এতদিন গ্রামের বাইরে ছিল। সে কি নিজেই বলতে পারে স্পষ্ট করে কেন সে দূরে চলে গিয়েছিল? সে তাড়াতাড়ি বলল, 'আচ্ছা রাজকুমার, না হয় এক কাজ করুন, আপনার এদিকের তহশিলটাই না-হয় আমাকে পত্তনি দিন। শুনেছি এদিকের তহশিল কাছারি নাকি একটা ভালো বাংলো। সেটাই পত্তনিদারের বাড়ি হতে পারবে। দিন না'।

রাজু বলল, 'শুনেছি, উচ্চ অভিলাষ মহত্ত্বের ভিত্তিভূমি। আমি ভুল করেছি। সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল এতদিন কোথায় ছিলে, কেনই-বা তেমন না-বলে চলে গেলে'?

'রাজু, মানুষ শুধু কি বেড়াতে যায় না'?

নয়নতারার চোখের কাছে কি ছায়া পড়ল? কিন্তু হাতির চলাব একটা দোলা লাগল কি, না-লাগল—নয়নতারা হাসল। আর তখন মনে হল তার মতো চোখকেই খঞ্জন আঁখিও বলা যায়।

সে বলল, 'ওটা কী? বিল? কী সুন্দর যে! যদি না-হাসেন বিল সম্বন্ধে আপনাকে একটা কথা বলি'।

রাজু সম্মুখে চাইল। দিগন্তের নীলরেখাটা যা বনের জন্য বিচ্ছিন্ন হওয়ায় আরো বেশি বাঁকা মনে হচ্ছে সেটা মেঘ নয়।

নয়নতারা বলল, 'বিল নাকি কচ্ছপের মতো চলে বেড়ায়'।

রাজু হো-হো করে হেসে উঠল।

'এদিকে বর্ষা নেই, তবু কখন কখন বিলের জল বেড়ে ওঠে, তা থেকেই মনে হয় বিল গুটিগুটি এগোচ্ছে। তা থেকেই এই প্রবাদ। আসলে হয়তো তা মরা নদীর খাত বেয়ে উত্তরের বর্ষার জল এসে পড়ার ফলেই'।

এই বলল নয়নতারা, কিন্তু ভাবল : এখানে রাজকুমারের সামনে কখনই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা উচিত হবে না।

হাতি এগিয়ে চলল।

নয়ন বলল, 'রাজকুমার, গরম লাগছে'।

'তা লাগতেই পারে। এই খোলা হাওদাটা মহিলাদের জন্য নয়'।

নয়ন এদিক-ওদিক চেয়ে একটা বড় গাছ দেখতে পেয়ে মাহুতকে সেদিকে হাতি নিতে বলল। ছায়ায় জিরিয়ে নেওয়া দরকার। সেখানে হাতি পৌঁছলে নয়ন বলল হাতিকে বসাতে। হাতি বসলে জানাল তার পিপাসা পেয়েছে। বাজু কিছু বলতে গেলে সে গলা নামিয়ে বলল, 'ভুল যা করেছি, করেছিই। তুমি জল না-খেলে আমি খাই কী করে'?

এটা একটা সাধারণ কৌশল যা মহিলারা অবলম্বন করে। আহার্য ও পানীয় তো রাজবাড়ি থেকেই এসেছে। মাহুতকে যথেষ্ট খাবার দিয়ে তাকে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিল। সে কিছুদূরে আড়ালে গেলে নয়ন বলল, 'বাজকুমার বন্দুক ধরে থেকে তোমার হাতে তেলকালি। এসো আমি খাইয়ে দিই'।

রাজু অবাক হল। সত্যি নয়নতারা তার মুখের কাছে খাবার তুলে ধরল। যেন অভিমান হবে রাজুর।

যেন জিজ্ঞাসা করবে, 'তাহলে এতদিন? কিন্তু নয়নতারা বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি, মাহুতটার খাওয়া তাড়াতাড়ি হয়ে যেতে পারে'।

রাজুর খাওয়া শেষ হলে তবে হাতি উঠল। মনে হতে পারে এটাই সবচাইতে মূল্যবান, অন্তত এটাই অন্যতম কারণ যার জন্য নয়নতারা আজ শিকারে এসেছে।

এক কৌতুকের ব্যাপার হল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে দেখা বিলের বাঁক। তার একাংশ যখন প্রায় দিগন্তরেখায়, অন্য অংশ তখন হঠাৎ একেবারে চোখের সামনে খুলে গেল। হাওদা পিছন দিকে ঝুঁকে ছিল বলে অনুমান হচ্ছিল বটে হাতি উপরে চড়ছে, নতুবা ঘাস, কাশ, নল, মাঝে মাঝে শিমুল, বাবলা, কচিৎ অশ্বত্থ হিজল, কদাচিৎ কিছু দূর ধরে বেতজঙ্গল, সব জায়গাতেই হাতির উচ্চতার তুলনায় সমান উঁচু বন।

ডানদিকে গড়ানে-জমি শ্যাওলা জমেনি এমন জলের দিকে নেমে গিয়েছে। পারে এক অল্পবয়সী বট, যদি-বা মানুষের অনুপাতে তাকে বিশেষ বৃদ্ধই বলতে হয়। বটের একটা ডাল জলের উপরে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। ডালটাকে অতদূর এগিয়ে যেতে দেওয়ার সুবিধা করে দিতেই যেন জলের একেবারে ধার ঘেঁষে একটা মাঝারি মোটা বট। এগিয়ে যাওয়া ডালটা থেকেও অনেক ঝুরি জলের উপরে জালের মতো ছড়িয়ে আছে অথচ জল বলেই যেন আবো নামছে না। তেমন একটা ঝুবিতে একটা মাছরাঙাকে দেখতে পাওয়া গেল। দেখতে দেখতে সোনা লাল সবুজের ঝিলিক দিয়ে এক পাক উড়ে ঝুপ করে জলে পড়ে আবার ঝুরিতে এসে বসল। তখন দেখা গেল কালো কালো গলা দিয়ে জল সেলাই করছে অনেক পানকৌড়ি। তাদের কার্যকলাপই ছিল মাছরাঙার নিশানায়।

নয়নতারা বলল, 'এমন সুন্দর দেখিনি'।

তাব চোখ দুটি ডাগর, তার লাল ঠোঁট দুটি একটু উন্মুক্ত, স্নিগ্ধ হাসিতে তার উজ্জ্বল দাঁতের দু একটি ডগা চোখে পড়ছে। দেখে বাজুর মনে হল এমন পাশ থেকে সে নয়নতারাকে কখনও দেখেনি। কী আশ্চর্য!

সে সোৎসাহে বলল, 'দ্যাখো দ্যাখো নয়ন, ডাহুক বোধ হয়, যাদের টিট্টিভ বলে'।

হাতি বিলের পাশ ঘেঁষে এগিয়ে চলেছে। যেন একটা পায়ে-চলা পথও আছে সেখানে। অনুমান হয় তা থেকে এদিকে একটা গ্রাম থাকবে।

হঠাৎ নয়নতারা বলল, বলার আগেই হাসি ফুটল তার মুখে, 'আচ্ছা রাজকুমার, টিট্টিভ না ডাহুক, কে ভালো'?

রাজু বলল, 'নয়ন, তোমাদের রাজকুমার যে মূর্খ এটা প্রমাণ না-করেই তা বলা যায়'।

'আ, বাজু, আমি কি? দ্যাখো...নয়নতারা মুহূর্তের জন্য ভাবল, সে কি বুঝিয়ে বলবে ডাহুক কথাটা অনেক বাংলা গানে আছে, টিট্টিভের সাক্ষাৎ বিষ্ণুশর্মার উপদেশের বাইরে নেই। সেজন্যই সে জিজ্ঞাসা করেছিল।

কিন্তু বিলের দিকে চোখ রেখে রাজু বলল, 'ও কী, মুখের কেন অমন চেহারা? তুমি কি সত্যি ভেবেছ তোমাদের রাজকুমার মূর্খ থেকে যাচ্ছে? যদি তুমি সেই আড্ডাগুলো দেখতে নয়ন যা অনেক সন্ধ্যায় আমার বৈঠকখানায় বসে। কী শ্যাম্পেন! আর কত শের্ আমি শ্যারমাঁ, আঁশাটে কত ঘনঘন! আমাদের বাগচী মাস্টারমশায় কিন্তু যত গম্ভীর দেখায় তত গম্ভীর নন'।

নয়নতারা বলল, 'নিজের ব্যাপারে এখন দেখছি আপনার সব কথাই বাঁকা হয়ে যাচ্ছে'।

রাজচন্দ্র হাসল। বিলে সৌন্দর্যের প্রফুল্লতাই যেন তার মুখে। সে বলল, 'কে বলেছে? আমার এই বন্দুকের রেঞ্জ ভেলোসিটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করো কিংবা পিয়ানো সম্বন্ধে, দেখবে আমার কোনো কথাই বাঁকা নয়'।

রাজকুমারের মুখের থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে নয়নতারা চিন্তা করল। কথার সুরে কোথাও কোথাও

সুখ জড়ানো আছে, কিন্তু শেষ কথাটার চাইতে বাঁকা আর কী?

কিন্তু মাহুত, যে এতক্ষণ নিজেকে লুপ্ত করে রেখেছিল, কথা বলল, 'সামনে লোকজন দেখছি'।

'হ্যাঁ, ওরাই পথ দেখাবে'।

নয়নতারাও লোকগুলিকে দেখতে পেয়েছিল। হঠাৎ যেন তার মুখ রাঙা হয়ে উঠল।

'কী ভাবছ'?

মৃদুস্বরে নয়নতারা বলল, 'কাজটা ভালো হয়নি। হাওদায় কবরেজকে দেখে না-জানি অন্যে কী ভাবে। তাছাড়া আমি বোধ হয় ভুলে আপনাকে কয়েকবার তুমি বলেছি'।

রাজকুমারের চোখ দুটিতে দুষ্টুমি দেখা দিল। সে বলল, 'তাই তো, এখন আর অন্তর্ধানেরও উপায় নেই। একেই অগত্যা বলে, দেবী? মনে হয় করণ বুঝি, কিংবা হেত্বর্থে। কিন্তু আসলে প্রকৃত্যাদিভিঃ'।

হাতি এগিয়ে চলল।

নয়নতারা ঠোঁট কামড়ে ধরে ভাবল, সামনের লোকগুলি ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তার মধ্যেই মনে হল তার একবার, এটা কি রাজুর একটা ঝকঝকে বাক্য তৈরির নেশা কিংবা শ্লেষ করে কিছু বলছে? স্ত্রীলোককেই তো প্রকৃতি বলে। সত্যি কী হেতু ছিল এই শিকারে আসার তার পক্ষে?

৪

কীবল কেন এসেছিল এই অঞ্চলে? নানা দিকে বিচার-বিবেচনা করার পর অনুমান হয়: তার অনেকটা জীবিকা অনুসন্ধান, কিছুটা পলাতকবৃত্তি। ক্রিমিয়া ফেরত সে তাইপিং বিদ্রোহ দমনে চীনে যেতে অনিচ্ছুক ছিল কি? পরবর্তী জীবনে এদেশে আইন ব্যবসায় সে খ্যাতি ইত্যাদি লাভ করেছিল। তার স্বদেশে কি তা হতে পারত না? অথবা ভারতে তখন কয়েকটি হাইকোর্ট স্থাপিত হচ্ছে, সেইসব নতুন হাইকোর্টে নতুন আইনজীবীদের প্রতিযোগিতা করার সুবিধা ছিল। অন্যদিকে তাহলে এই প্রশ্ন থাকে, কিছু বেশি টাকার জন্যই কি সহজে স্বদেশ ত্যাগ করা যায়? আসলে একথাও মনে রাখতে হবে, কারো কারো কাছে সাজানো-গোছানো লন্ডন সভ্যতার কেন্দ্রর চাইতে অসভ্যতার প্রান্তে যেখানে সভ্যতা গড়ে উঠছে এমন সংযোগস্থলেই আকর্ষণীয় বোধ হয়।

আপাতত সে রাজারগ্রামে চিঠি দিতে এসেছিল ডাকে। কিন্তু সেটা এমন ব্যাপার নয় যে তাকে আসতেই হতো। মবেলগঞ্জের নিজস্ব ডাকহরকরা আছে। ঝোঁকের মাথায় কীবল কাল অনেক রাত পর্যন্ত একখানা চিঠি লিখেছে, এবং দ্বিতীয়বার না-পড়েই তা পোস্ট করতে ঝোঁকের মাথাতেই ডাকঘরে এসেছিল। অনুপ্রেরণার স্বভাব এই যে দ্বিতীয়বার পড়লে তার অনেক কথাই বর্জনীয় মনে হয়।

কীবল চিঠি লিখেছিল তার আত্মিক ভগ্নীকে। তাদের রোমান ক্যাথলিক ভিকারের বিধবা মেয়ে। বয়সে কীবলের চাইতে কিছু বড় হতে না-ও পারে, কিন্তু সম্মানে কীবলের চোখে গগনচুম্বী। তাকে চুম্বন করতে সুতরাং গগনই পারে। বিধবা এই মহিলাকে, তার নাম ম্যাগি হওয়ার সুবাদে, কীবলের চোখে ম্যাগডালেনের ঘোর লাগে। কিন্তু কী করে কী হয় বলা যায় না। বাইবেল নিয়েই বসা। কিন্তু সেই বিকেলের উজ্জ্বল আলোয় তারা বেশি বয়সে অল্পবয়সী ভাইবোনের মতো হাত কাড়াকাড়ি করছিল। জাপ্টাজাপ্টি শেষে বইটা দখল করে কীবল চেয়ারে বসতেই মুখোমুখি বসল ম্যাগি। তখন সে হাঁপাচ্ছে। হঠাৎ দেখতে পেয়েছিল তখন কীবল। ব্লাউজের হুক খুলে গিয়েছে, চাঁপারঙের অর্গান্ডির আন্ডারগার্মেন্টের শাসনবিচ্যুত সুপক্ক পুষ্ট স্তনের অর্ধাংশ, যা নাকি স্বর্গের মতো। আর তখন হাঁপাচ্ছিলও ম্যাগি।

কিন্তু তারা অবশ্যই নতুন সুতরাং ক্যাথলিক কীবল তার আত্মিক ভগ্নীকেই চিঠি লিখতে অভ্যস্ত। কেননা চিঠিতে যেমন এই আত্মিক-ভগ্নীত্বের গভীরতা ছুঁয়ে চলা সম্ভব পাশাপাশির নৈকট্যে ততটা সাহস হয় না যেন।

চিঠি দেওয়ার পরে হাতে এখন অনেক সময়। সুতরাং সে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘণ্টাতিনেক আগে ব্রেকফাস্ট হয়েছে। ঋতুটা এখন এমন যে চারিদিক থেকেই সূর্যের আলো তার গায়ে পড়ছে। ধুলো নয়, প্রচুর ঘাস ; কাদা নয়, ট্যালকমের মতো মাটি। উপরন্তু যেদিকে তাকাও সবুজ, ময়ূরের পেখমের মতো নীলে জড়ানো সবুজ এবং উজ্জ্বল।

ঘোড়া ক্যানটারে চলছে। সে শিস দিতেও শুরু করেছিল। তা এখানকার জলটাও ভালো, ক্যালকাটার তুলনায় বটেই। আর ক্যালকাটার নেটিভপাড়ার, এবং ক্যালকাটার বেশিরভাগই তাই, সেই খোলা পচা জলের নর্দমাগুলোর চাইতে এই বুনোপথও ভালো। ডিসাইডেড্‌লি। এখন আবার চিঠির কথাটা অথবা চিঠির প্রশ্নের কথাই তার মনে এল। দুটো প্রশ্ন আছে এই চিঠিতে। সে প্রশ্ন দুটির বিষয়ে ম্যাগির ধারণা জানতে চেয়েছে : (১) সেন্ট পলের হাতে স্বর্গের যে-চাবি আছে তা কি সোনার তৈরি? (২) সে-হাত কি এঞ্জেলদের হাতের মতো? বস্তুত এই প্রশ্ন দুটো তৈরি না-হলে গত সপ্তাহের পর আজই আবার চিঠি কেন?

এখন মনে হল, কীবলের এঞ্জেলদের হাতই-বা কী? তা কি স্বচ্ছ একটা জমাটবাঁধা আলো? কিংবা অ্যামব্রোসিয়ায় তৈরি? কী আশ্চর্য, এ-সম্বন্ধেও তার ধারণা স্বচ্ছ নয়।

কিন্তু চিঠিতে প্রশ্ন ছাড়াও অন্য কিছু থাকে। কীবল তার অভিজ্ঞতার কথাও কিছু লিখেছে। এটাকে মানে ইন্ডিয়াকে ন্যাংটো সন্ন্যাসী ও সাপুড়ের দেশ মনে করে বটে লোকে। এখানে অন্য অভিজ্ঞতাও হতে পারে। তোমাকে বলতে পারব না সবটুকু। কিন্তু এখানে জননেন্দ্রিয় পূজা হয়ে থাকে। হ্যাঁ, আমি তা নিজের চোখে দেখেছি। তবে তুমি নিশ্চিন্ত থেকো। তোমার মুখখানি আমার স্মৃতির দিগন্তে। আমি বিপথে যাব না। তবে এ দেশটা, যা আমাদের সাম্রাজ্যের কোহিনূর, সত্যি অদ্ভুত। এখানে আমার পরিচিত ইংরেজ ভদ্রলোক কালীপূজা করেছিল। এই কালী নাকি এক কালো ন্যুড গার্ল। এখানে এক কালো ভদ্রলোক আছে যার স্ত্রী বৃটিশ। এই কালো ভদ্রলোককে কখন কোয়েকার মনে হয়। কখন বিধর্মী। কিন্তু সবচাইতে বড় কথা একটি বৃটিশ গার্ল কী করে তার সঙ্গে টেব্‌লে বসে এবং ঘুমায়।

এটা বোধ হয় বেতের ঝোপ। ডানকানের কথা বিশ্বাস করতে হলে মালাক্কা কেইন্ আর এই বেত একই জিনিস। একটা নালার বরাবর তার দু'পারে মানুষের মাথা ছাড়িয়ে উঁচু বেতঝোপ। ধারে-কাছের গাছের ডালপালা আঁকড়ে ধরেও বেত উঠে পড়েছে। দু'একটি বড় গাছের মাথা ছাড়িয়ে রোদে ঝলমল করছে বেতের চূড়া।

ঘোড়াটা চমকে উঠল। কারণ খুঁজে এদিক ওদিক চাইতেই কীবল হাতি, হাওদা ও হাওদায় মানুষ দেখতে পেল। বেশ দ্রুত চলেছে হাতি, আর তার ঘোড়াও ক্যানটার করছে। আরো ভালো করে দেখতে হলে লাগাম টানতে হয়।

সে অনুভব করল : মাই, স্প্লেনডিড! এর আগে কি হাতি দেখেছি, না তার সওয়ার!

আচমকা এরকম অনুভব করার পর তার মন যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে শুরু করল। তুমি স্বপ্নও দ্যাখোনি। এমন রূপ সম্বন্ধে। কী আশ্চর্য, এমন রূপ কি হিদেন-নেটিভদের হয়? আচ্ছা, পুরুষটি রাজকুমার কি? কারণ প্রিন্সই হাতি চড়তে ভালোবাসে। পরবর্তী পর্যায়ে সে যুক্তি দিল, মহিলাটি প্রকৃতপক্ষে ক্যাথারিনই? নতুন পোশাকেই তাকে তেমন দেখিয়েছে? অবশ্যই জেনুইন ব্রিটিশ ব্লাড। নতুবা এত রূপ হয়! কীবলের চাপা ঠোঁটে ভাঙচুর দেখা দিল, কিন্তু এই রাজকুমার অবশ্য হার ম্যাজিস্টির একজন সাবজেক্টমাত্র। বৃথা জাঁকজমক। এই সময়ে তার সদ্য শোনা প্রবাদটা মনে পড়ল : ইন্ডিয়ান প্রিন্সরা হাতিতে চড়ানোর লোভ দেখিয়ে স্ত্রীলোকদের সিডিউস করে। না, তাহলে কেট হয় না! প্রকৃতপক্ষে সে রাজচন্দ্র আর নয়নতারাকে দেখেছিল।

এখন তার মরেলগঞ্জে ফেরারও তাড়া নেই। এদিকে দ্যাখো, সামনের ওই রাস্তাটা চওড়া। সে লাগাম

টানতে ঘোড়াটা চওড়া পথটা ধরল। কিছুদূরে গিয়েই গোল, সাদা, প্রকাণ্ড একটা ছাতার মতো গম্বুজ চোখে পড়ল। আচ্ছা! ওটাই নাকি রাজবাড়ি?

অতঃপর সে আবার রাজবাড়ির গম্বুজের টানেই যেন রাজারগ্রামের দিকে ফিরতে শুরু করল।

তখন তার মনেও একটা উল্টো পাক দেখা দিয়েছে। সে ভাবল, (যেন সে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধেই উৎসুক) আসল কথা এদেশে অর্থাৎ এই ইন্ডিয়ায় বিভিন্ন রকমের মানুষ থাকাই স্বাভাবিক। অর্থাৎ মানুষের যত রকমের দেহবর্ণ হতে পারে বোধ হয় সবরকমই এখানে পাওয়া যাবে আর তা হয়তো এইজন্য যে একের পরে এক মানবগোষ্ঠী এখানে তাদের বিভিন্ন বর্ণের দেহ নিয়ে এসেছে এবং থেকে গিয়েছে। হয়তো একদিন তেমন ইংরেজদেরও কিছু চিহ্ন পড়ে থাকবে। কীবলের মন থেমে দাঁড়াল। না-না, অবশ্য তা প্রকৃতপক্ষে হবে না। কেননা কোন-এমন জাত আছে পৃথিবীতে যা ইংবেজদের পরেও আবার এদেশে রাজ্য পাবে? অর্থাৎ ইংবেজ অপেক্ষা উন্নত ও শ্বেতকায়? রাজকুমাব হয়তো এবং হয়তো-বা রাজকুমারের সঙ্গীও তেমন কোনো অভিযাত্রী দলের বংশধর। তারা কি এরিযান ছিল?

৫

অনেকসময়ে যোগাযোগ ঘটে যায়। চন্দ্রকান্ত এণ্ড্রুজ বাগচী তখন চবণদাসের বাড়ি থেকে নিজের কুঠিতে ফিরছিল লাঞ্চের জন্য। তার পনিটা বেশ মোটা, গতিটাও শ্লথ। যদি কেউ দু-এক বছব আগে দেখে থাকে তবে তার অনুমান হবে বাগচীর যত্নেই তার এই দৈহিক উন্নতি। হাঁটুর কাছে থোপা-থোপা পশম, ঘাড়ে সিংহসম কেশর ও লেজের মাটিছোঁয়া বালামচি দূর থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ কবে। বাগচীব পোশাকও গ্রামে লক্ষণীয়। স্প্যাটস, ক্র্যাভ্যাট সমন্বিত পুরো ইংলন্ডীয় তার পোশাক। শুধু মাথার ফেল্টহ্যাট যেন বেশ বড়। পনি মাথা ঝাঁকিয়ে টিকটিক করে চলেছে। বাগচীর লম্বমান পা দুখানা মাটির কয়েক আঙুল উপরে। দুষ্টু ছেলেরা গোপনে মন্তব্য করে ঘোড়া ও সওযার দুজনেই একসঙ্গে হাঁটে। কিন্তু তা গোপনে, খুবই গোপনে।

চরণদাসের বাড়িতে একটা দাতব্য হোমিওপ্যাথিক ডিস্‌পেনসারি গডে উঠেছে। সেখানে সপ্তাহের অন্যান্য দিন সকালে কিংবা বিকেলে অন্তত একবার সে যায়ই। ছুটি ও রবিবারে দু'বেলাই।

রবিবারে আজ রোগীর ভিড় ছিল। ফিরতে কিছু দেরি হয়েছে বাগচীর। বিলমহল থেকে, ফরাসডাঙা থেকে দু-চার ক্রোশ পায়ে হেঁটে কয়েকজন রোগী এসেছিল। কাবো বাত, কারো স্থাযী মাথাধরা, একজনের তো ক্ষয়রোগ বলেই সন্দেহ হয়েছে, অজীর্ণ, আমাশা তো বটেই।

প্রশ্নের উত্তরে রোগীরা যে-রোগলক্ষণ বলে চরণদাস তা সংক্ষেপে টুকে নেয়। বাগচী কিছুদিন যাবৎ চবণদাসকে প্রশ্ন করে, তুমি হলে কী দিতে? চরণদাস যদি সাহস করে কিছু বলে বাগচী কোনোক্ষেত্রে তার ভুল দেখিয়ে দেয়, কোনোক্ষেত্রে বলে-দাও, দেখা যাক ; অন্য কখনও বলে, ঠিক বলেছ, আমারই ভুল হয়ে যাচ্ছিল। এ সেই চরণদাস যে গ্রামের পোস্টমাস্টার, বাগচীর স্কুলে শিক্ষকতাও করে ; এবং দেখা যাচ্ছে ডানকানের আত্মা বিচারের আগে লাখ-লাখ বছর ঘুমিয়ে থাকার সুযোগ পাবে এমন গল্পও বানায়।

ডিস্‌পেনসারির কাজ ভালোই চলেছিল। বাগচী কখন হেসে কখন তিরস্কার করে রোগী দেখা শেষ করছিল এবং চরণদাস ওষুধ দিয়ে চলেছিল।

দেখা যাচ্ছে গুজবের মতো রসিকতাও ছড়িয়ে পড়তে পারে। এক্ষেত্রে কৌতুকের এই হল : চরণদাসের সেই আত্মার বিচার নিয়ে রসিকতা অন্যের মুখে ঘুরে চরণদাসের কানেই ফিরে এল।

বিলমহলের সেই চিরস্থায়ী মাথাধরা রোগী, যার কপালে সুতোর ডোরে একটা সরু শিকড় বাঁধা, সেই বলল, 'চরণ কবরেজ, শুনেছ নাকি ডানকানাব নাকি নরকেরও ভয় নেই'।

চরণদাস ওষুধের ফোঁটা ঢালছিল জলের শিশিতে।

বাগচী জিজ্ঞাসা করল, 'কে? কার কথা বলছ? ডানকানা কে'? কিন্তু বাগচী নিজেই বুঝতে পারল। সে হো-হো করে হেসে উঠল। এরা ডানকান সাহেবকে একটামাত্র আকার দিয়েই কানা করে ছেড়েছে। রোগীটি বাগচীর সামনে লঘু কথা বলে ফেলে অপ্রস্তুত বোধ করছিল। বাগচী হাসলেও রসিকতাটা আবার করা উচিত হবে কিনা এ-বিষয়ে তার যথেষ্ট সন্দেহ হল।

বাগচীই বরং বলল হাসতে হাসতে, 'সে আবার কী গো, নরকের ভয় কার নেই'?

সাহস পেয়ে রোগীটি বলল, 'নরকে তো আত্মাই যায়। তা সে-আত্মা যদি লাখ লাখ বছর ঘুমিয়েই থাকে তার তবে কিন্তু ভয় কমে গেল।

এই কৌতুকের জনক চরণদাস কিন্তু বিব্রত বোধ করল। সে ব্যাপারটাকে হালকা করার জন্য বলল, 'পাপ কি কেউ এড়াতে পারে? ওর আর তামাদি নেই'।

রোগীটি যা শুনেছে তা ভোলেনি। বলল সে, 'তামাদি নয় নেই। কিন্তু তুমিই বলো ; হলই-বা ইংরেজ চিত্রগুপ্ত। তার সেরিস্তায় কাগজ কি লাখ লাখ বছর পরের পর ঠিক থাকে? বিচার তো করে সেই শেষের একদিনে'।

বাগচী অবাক। একবার মনে হল সে আবার হেসে উঠবে। কিন্তু রসিকতা হলেও এটা কি ভালো রুচির? একটু গম্ভীর মুখেই সে বলল, 'সব ধর্মেই এমন কিছু থাকে যা অন্য ধর্মের লোকেরা সহজে বুঝতে পারে না। ওষুধটা ওকে দিয়ে দাও চরণ। দেরি হচ্ছে'।

একটু হেসে সে রোগীটিকে বলল, 'ওষুধটা কীসের তৈরি জানো? স্রেফ ঘোল। তাই বলে ঘোল খেলে মাথা ধরা সারবে না। হুঁ হুঁ'।

ওষুধ নিয়ে রোগীটি উঠে দাঁড়াল। ট্যাঁক থেকে পাঁচসিকে পয়সা বার করে বাগচীর জুতোর সামনে রেখে বলল, 'কবে আবার আসব, সার'?

বাগচী বলল, 'ও কী, পয়সা কেন'?

'সার কত গরিব লোককে পথ্য দেন শুনি। পয়সা কটা সেই ধর্মভাণ্ডারে দেবেন'। দেখা যাচ্ছে ছাত্রদের দেখাদেখি রোগীরাও কখনও কখনও তাকে সার বলে।

বাগচী রোগীটির মুখের দিকে চাইল। এই পরার্থপরতা তার ভালো লাগল। সে সস্নেহে বলল, 'ফের রবিবারে এসো। নিজে আসতে না-পারো কাউকে পাঠিও, খবর দিয়ো। আবার হেসে বলল, 'তোমাকে ঘোল খাওয়াচ্ছি বলে আবার কেউ ঠাট্টা করবে না তো, হে'?

'তা করবে, সার, মেন্ডুজা শুনতে পেলে রক্ষা রাখবে না'।

কিন্তু রসিকতা কখন নাছোড়বান্দা হয়। দাওয়া থেকে পৈঠায় নামতে অন্য আব-এক রোগী বলল আবার, 'তা চরণ, যাই বলো ভাই, ভাগ্যটাই ওদের ভালো। এদিকে ইহকালে রাজা হয়েই জেঁতে বসেছে, ওদিকে দ্যাখো পরকালেরও সাজার ভয় নেই। মজা আর কাকে বলে'।

ওদিকের বেঞ্চের উপরে স্বগ্রামের কয়েকজন রোগী ছিল। তাদের একজন রসিকতার সুরেই বলল, 'তা, ভূতোদা মিথ্যে বলোনি। কিন্তুক এক কাজ করা যায়। সবসমেত পুড়িয়ে দিলে হয় একদিন। তাহলে আত্মা ঘুমুতে জায়গা পায় না। সরাসরি নরকে পৌঁছায়'।

সকলেই হেসে উঠল।

রোগীর ভিড় পাতলা হয়ে এসেছে। বাগচী কিছু ভাবল। তার মুখে হাসি ফুটেছিল, মিলিয়ে গেল। পাইপ বার করে ধরাল। বরং পায়ের উপরে পা তুলে আয়েশ করে নেয়ার ভঙ্গিতে বসে বলল, 'চরণ, ডাবা টেনে নাও। ওতে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। কিন্তু একটা কথা, চরণ'।

চরণ বলল, 'বলুন সার'।

'এই এখনই যা বলা হল'।

চরণদাস উত্তর দেয়ার আগে চিন্তা করল। তামাক, শোলা, চকমকির বাক্সটাকে আঙুলে নির্দেশ করে একজন রোগীকে বলল, 'তামাক খাও, চেরোকাকা'।

তারপর হঠাৎ বাগচীর দিকে ফিরে বলল, 'যদি লাগাই হয়, সার, সবসমেত পুড়িয়ে দেয়াই মন্দ নয়। যাকে সৎকার বলে। আর তা করতে হবে পাপ কবে উঠেছে ঠিক এমন সময়ে। অনুশোচনা করে পাপ কাটানোর সুযোগ যাতে না-পায়'।

বাগচীর মুখে কথা নেই। সে যেন ভেবেই পেল না সে হাসবে, না চটে উঠবে। একবার তার মনে হল সেদিন সে আর রোগী দেখতে পারবে না, পরে একবার ভাবল যত তাড়াতাড়ি এদের বিদায় করা যায় ততই ভালো। কী সাংঘাতিক কথা!

তাই করল সে। রোগীদের বিদায় করে পাইপটা জ্বালাল সে আবার। ভাবল এটা কি পরধর্মবিদ্বেষ চরণের? তাই কি?

কথাটা তখন মনে পড়ল তার। মূল ব্যাপারটা ধরে ফেলেছে এমন ভঙ্গিতে সে মনে মনে হেসে বলল, 'তা, চরণ, তুমি কি হিন্দু পেট্রিয়টের নাম শুনেছ'?

'তা শুনেছি, সার। ডাকঘরে একখানা নিয়মিত আসে দেওয়ানসাহেবের নামে'।

'পড়েছ'?

'দেওয়ানসাহেবের কাগজ কি খোলা যায়, সার'?

বাগচী অনুমান করেছিল চরণদাস হয়তো 'হিন্দু পেট্রিয়ট' থেকেই নীলকরের প্রতি একটা গভীর বিদ্বেষ সংগ্রহ করে থাকবে, কারণ বাগচীর ধারণা ছিল হিন্দু পেট্রিয়টের হরিশ নীলকরদের কঠোব সমালোচক। বিশেষত গত একবছর থেকে।

সে বলল, 'আচ্ছা, চরণ, তুমি কি কলকাতার নরেশবাবু, সুরেনবাবু এঁদের সঙ্গে আলাপ করোনি? দেখতে কলকাতার শিক্ষিত লোকেরা ক্রিশ্চান ধর্ম নিয়ে বিদ্রূপ করে না। বেশি কথা কী—আমাদের নিয়োগীমশায়, তোমার কি মনে হয় না তিনি খ্রিস্টকে ঈশ্বর মনে করেন'?

পথে বেরিয়ে ভাবল বাগচী : এদিকেও লক্ষ্য করো, শেষ বিচার, অনুতাপ এমন সব বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানা না-থাকলে তেমন বলা যায় না যা চরণদাস বলেছে। ভেবে দেখতে গেলে এটাকেই বরং বেশি আশ্চর্য মনে হওয়ার কথা। এখানে নীলকর অত্যাচার করে থাকলে হিন্দু পেট্রিয়টের সাহায্য ছাড়াই বিদ্বেষ জন্মানো সম্ভব। হিন্দু পেট্রিয়ট বরং দূরে, এরাই কাছে। কিন্তু ধর্মের তত্ত্ব কোথায় শেখে চরণ? বাগচী অনুমান করার চেষ্টায় স্কুলেব নতুন মাস্টাবমশাই নিয়োগী খুঁজে পেল। তার কাছে কি শিখেছে চরণ অনুতাপে পাপমুক্তির তত্ত্ব? আচ্ছা।

কিছুদূর গিয়ে বাগচী এ-ব্যাপারটা থেকে অন্যদিকে সরে গেল। সে অনুভব করল আজ ছুটির দিন। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাঞ্চ আর বিশ্রাম।

মনের এই ঢিলে ভঙ্গীতে প্রিয় কিছু চিন্তা করা ভালো। এই ভাবতে-না-ভাবতে সে অন্য চিন্তায় ঢুকে গেল। বিষয়টা তার স্কুলের পরীক্ষা সম্বন্ধে। প্রশ্নটা এই : জ্ঞানের বিষয়কে মূল্য দেয়া হবে, না যে-ভাষায় বিষয়টাকে বলা হয়েছে তাকে মূল্য দেযা হবে? কোনো ছাত্র যদি হীমালয়, জমুনা, গংগা প্রভৃতি বানান লিখেও পর্বত নদীগুলোর যথাযথ পরিচয় দিতে পারে তাহলে কি তা মূল্যহীন? তার মনে হচ্ছে কলকাতার আধুনিক শিক্ষাও ভাষাজ্ঞানের উপরেই জোর দিচ্ছে। সে তার স্কুলের পরীক্ষায় ভাষা ও বানানের উপরে জোর না-দেয় যদি, যদি সে লিখিত পরীক্ষার বদলে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করে উঁচু শ্রেণীতেও? ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞানের কথা শেখাই কি আসল কথা নয়? আর সাহিত্যই যদি বলো, তাতেই কি বানান আর ব্যাকরণের চাইতে বস বিষয়টা মূল্য পাবে না? শেকস্‌পীয়রের ব্যাকরণ আর বানান এখনকার কোনো ছাত্র ব্যবহার করলে সেসব প্রশ্নেই কি জিরোর বেশি পাবে? কিংবা এদেশের কৃষকের ধর্মজ্ঞানের কথা ভাবো। এক অক্ষর পড়তে-লিখতে জানে না, কিন্তু শুনো দেখি তার কথা? মূর্খ বলবে? অথচ

কলকাতার ভাষাজ্ঞানের নিরিখে তারা মূর্খের অধম। অবশ্যই দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে।

চিন্তার বিষয়টা তার বিশেষ প্রিয়। মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু মনের একটা কৌশলও যেন এখানে ধরা পড়ছে। সে ঠিক এখন এ-বিষয়টাকে কেন ভাবছে? অন্য কোনো চিন্তাকে দূরে রাখতে কি? সেই অন্য চিন্তাটা নতুন চিন্তার দুপাশে অন্ধকার ঝোপের মতো থেকে যায় কিন্তু।

খানিকটা যেতে-না-যেতে বাগচী একা-একাই হো-হো করে হেসে উঠল : দ্যাখো কাণ্ড, শুধু নামে একটা আকার যোগ করেই কেমন তিরস্কার তৈরি করেছে। ডানদিকে কানা। ডানকানা। আর কেমন সে, বিচারের কল্পনাও করেছে কোর্টের মতো।

ওদিকে কিন্তু লজ্জা হল তার। কেউ দেখে ফেলেনি তো তাকে হাসতে? সে তাড়াতাড়ি হ্যাটটাকে কপালের উপরে টেনে নামাল। মুখটাকেও গম্ভীর করল।

টকাটক করে চলছে পনি। মাটির কাছাকাছি বাগচীব সুদৃশ্য জুতো ও সুদৃশ্যতর সকস্-পরা পা দুখানা দুলছে তালে-তালে।

বাগচী হঠাৎ অবাক হয়ে স্বগতোক্তি করল . আমিই কি শেষ বিচার কিংবা ইটারন্যাল ড্যামনেশন সম্বন্ধে কিছু জানি? ওসব কিন্তু আমাব কাছেও ঠিক পরিষ্কার নয়। সেটা, সেই ইটারন্যাল ড্যামনেশন কি মিল্টনের জ্বলন্ত গন্ধক ও কালো আগুন, ব্রিমস্টোন অ্যান্ড ব্ল্যাক ফায়ার? নাকি সে এক ঈশ্বরের সম্পর্কহীন অন্ধকারে বায়ুভূত নিরালম্ব অবস্থা? নাকি ছবিতে যেমন?

তার দুখানা ছবিকে মনে পড়ল। সে দুটিই বিশ্ববিখ্যাত। মাইকেলএঞ্জেলো এবং রুবেন্স নামক চিত্রীদ্বয়ের আঁকা দুখানা 'শেষ বিচাবের' ছবি। বিশেষ করে মাইকেলএঞ্জেলো। পরমপিতার সিংহাসনের নিচে ক্রাইস্টের ভঙ্গিতেও সেদিন ক্রোধ। ক্রাইস্টের পাশে ভার্জিন মেরিও যেন ক্রাইস্টের অটল গাম্ভীর্যকে, তার রুদ্র রূপকে স্নিগ্ধ করতে পারছে না। দণ্ডিত পাপীদের আত্মা নিচে কেবনের নৌকোর দিকেই ঘুরে-ঘুরে পড়ছে দেখা যাচ্ছে, অথবা তাদের সবলে টেনে নেওয়া হচ্ছে সেই বিভীষিকার দিকে। বাগচী নিজের ডান হাত তুলে চোখের সামনে রাখল। যেন তাতে স্মৃতি থেকে সেই ছবিগুলোকে মুছে দেওয়া যায়, সেই ভয়ংকর সুন্দর আর্য ন্যুড আকৃতিগুলিকে।

কী আশ্চর্য, এ কি সে বিশ্বাস কবে? সে অনুভব করল, নিজের বিশ্বাস নিয়ে চিন্তা করলে মন বরং খারাপ হয়ে যায়। তাই নয়?

এ রকম কিছু বিশ্বাস করতে পারলে তো ভগবান ছ-দিনে বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করে একদিন বিশ্রাম করেছিলেন তা-ও বিশ্বাস করা যায়। অথচ সে মনপ্রাণ দিয়ে আজও এ-তথ্যে বিশ্বাস আনতে পারল না। রবিবারেই সে কি প্রার্থনা করে?

তার মুখের গাম্ভীর্য কমে গিয়ে একটা স্বপ্নময় দুঃখার্ততার ছাপ পড়ল। লুকনো চিন্তাটা আত্মপ্রকাশ করল। ডানকান তার স্ত্রীর সম্বন্ধে চূড়ান্ত কুৎসা রটিয়েছে, তাকেও প্রতি সুযোগে অপমান কবেছে, সেজন্যই কি ডানকানকে এরা বিদ্রূপ করায় সে হাসছিল?

কিন্তু চোখ তুলতেই যোগাযোগটা ঘটে গেল। ঘোড়ার পিঠে কীবলকে দেখতে পেল বাগচী, গলির মুখে বড়রাস্তাটা পার হয়ে যাচ্ছে তার ঘোড়া। কীবল কি প্রকৃত ইভান্‌জেলিস্ট, যেমন ডানকান বলেছিল?

৬

চন্দ্রকান্ত এণ্ড্রুজ বাগচী তাব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানে ইংরেজ ঠোঁটটেপা জাত, গায়ে পড়ে আলাপ করে না, অন্য কেউ তেমন করে তাও চায় না। তা সত্ত্বেও কীবলের সঙ্গে আলাপ করার আগ্রহ দেখা দিল তার মনে, নিছক ভদ্রতার চাইতে বরং বেশি গভীর সে-আগ্রহ, কী কারণ তার? মনের বিচিত্র গতি বলা হবে? কিংবা চরণের রসিকতায় উল্লেখ করা লাস্ট জাজমেন্ট ও ড্যামনেশন, ধর্ম সম্বন্ধে নিজের

বিশ্বাস ও অবিশ্বাস, কিংবা কীবল এই নামটা কি তার আগ্রহের মূলে ছিল? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মকে কেন্দ্র করে আন্দোলন হয়েছিল তার মধ্যে কীবল নামে প্রধান একজন ছিলেন বটে। এবং অক্সফোর্ডের সে-আন্দোলন নিয়ে সে এবং তার শ্বশুর ফাদার এণ্ড্রুজ একসময়ে বহু আলোচনা করেছে। কখনও কখনও আবেগের সঙ্গে।

পনিকে দ্রুত চালানোর চেষ্টা করল বাগচী। সে তার রাশি-রাশি বালামচিসহ ঘাড় এবং মাথা এমনভাবে নাড়ল যেন তখনই ধাপে ছুটবে। অথচ সে অসহায়। হায় আদরপুষ্টতা!

কিন্তু কীবলও তাকে দেখতে পেয়েছিল। ক্রিমিয়াখ্যাত লাইট বিগ্রেডের সওয়ারের কায়দাতেই যেন রাশ টেনে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে আনল সে।

'হ্যালো ফাদার, গুডমর্নিং'! এই বলে সে হাসল। সুন্দর এবং স্বাস্থ্যবান তার দন্তপংক্তি এখনও। গুডমর্নিং বলতে গিয়ে কি সময়ের কথা মনে পড়ল বাগচীর? তারপরেই সে-ও হাসিমুখে বলল, 'গুডমর্নিং মিস্টার কীবল, কিন্তু আমাকে ফাদার বলা বৃথা। আমি একজন ভিলেজ স্কুলমাস্টারমাত্র। এদিকে যখন এসেছেনই আসুন আমার কুটিরে, অতি নিকটেই। যদি আপনার আপত্তি না-থাকে লাঞ্চের সময়টাকে আমরা এগিয়ে নেব'।

ইংল্যান্ডে অনুশীলিত কীবলের মনের ইংরেজি অভ্যাস অস্ফুট স্বরে একবার চিন্তা করল : ইটস্ নট ডান্ (এ-প্রকার প্রথা না-হয়)। কিন্তু পরক্ষণেই তার কী মনে হল · আফটার অল দি ওনলি ইংলিশ গার্ল দিস সাইড অব ক্যালক্যাটা? (কলকাতার বাইরে ইংরেজদুহিতা আর কে?)। প্রকৃতপক্ষে তিনিই তো সম্ভাব্য হোস্টেস এক্ষেত্রে।

সে বলল, 'কিন্তু মিসেসের উপরে নির্যাতন হবে না? আচ্ছা, বরং এক কাপ কফি'।

'আদৌ নয়-আদৌ নয়, বরং আমরা সম্মানিত জ্ঞান করব। আসুন তাহলে'। বাগচী ডান হাত প্রসারিত করে যেন তার বাংলোকে ইঙ্গিত করল।

বাগচীর বাংলোর সামনে পৌঁছতেই, আর তাতে মিনিটকয়েক লাগল, ঘোড়া দুটির ব্যবস্থা করল সহিসই। তারা যখন বসবার ঘরে ঢুকছে ম্যান্টেলপিসের উপরে বসানো চার্চের আদলে তৈরি ছোট ক্লকটায় একটা বাজতে কিছু দেরি আছে মাত্র।

ঘড়িটাতেই আগে কীবলের চোখ পড়ার একটা কারণ ছিল। ক্লকের ফিট দুয়েক উপরে হলুদ-সাদা দেয়ালের গায়ে একটা প্রাকৃতিক দৃশ্য। একটা বাড়ির, তার উপরের আকাশের, এবং একজোড়া গাছের ছবি। বাড়িটা অক্সফোর্ডের একটা কলেজের। কীবল যেটায় ছিল অবশ্যই সেটা নয়। তাহলেও চেনা লাগল তার। চিত্রকর এবং একজন অ-চিত্রকর ছাত্রের দেখায় পার্থক্য থাকেই। চিত্রকর আকাশের যে রং দেখে অথবা আকাশের যে রং লেগে কলেজবাড়ির এক বিশেষ অংশ ছবিতে আঁকার মতো হয়ে ওঠে তা চিত্রীর চোখেই ধরা পড়ে।

ততক্ষণে বাগচী 'বসুন-বসুন' বলে চেয়ার এগিয়ে দিয়েছে।

এখন শীতকাল হলেও ঘরে অনেক আলো। একটা জানলার কাচে রোদও। কীবলের ত্বকে উষ্ণতাটা যেন একটু বেশি তীক্ষ্ণ মনে হল, আরামদায়কের চাইতে তীক্ষ্ণ এবং হয়তো সেজন্যই-বা কিছু উত্তেজক।

সে বলল, 'আজ দিনটা বেশ উষ্ণ'।

'আরামদায়করূপে সে-রকম, তাই নয়'?

জানলার উপরে বসানো রঙিন কাচের স্কাইলাইট দিয়ে আলো আসছে। রঙিন জ্যামিতিক ছবির মতো মেঝেতে।

বাগচী বলল, 'আপনি তো ধূমপান করেন না। কফি কিংবা অন্য পানীয় আনাই'।

কীবল হাসিমুখে বলল, 'কফিই ভালো। যুদ্ধে খুব দামি মদ দেয় না, আর তাছাড়া অক্সফোর্ডে কিংবা ইন-এও দামি মদের যোগাড় করা কদাচিৎ সম্ভব'।

বাগচী কীবলের কথা বলার সময়ে তার মুখের দিকে চেয়েছিল। সে অনুভব করল তার পরিচিত কোনো নীলকরের মুখে এমন সরল কথা সে শোনেনি। বেশ ভালো লাগল তার। সেদিন লাঞ্চটা ভালোই হয়েছিল, বেশ আলোকোজ্জ্বল এবং আধুনিক আবহাওয়ায়। বাগচীর বাংলোটা আকারে কিছু ছোট হলেও ডানকানের বাংলোর সঙ্গে নকশায় এক, তা বুঝেছিল কীবল। কিন্তু ডানকানের বসবার ঘর নিশ্চয় এমন গোছানো, আলোক-প্রতিফলিত নয়। মানানসই ছিটের পর্দা, ম্যান্টেলপিসের কিছু উপরে রাখা কটম্যানের আদত ছবি, বেশ বড় সেই পিয়ানোটা, সেলফে সাজানো বাগচীর বই, ডেস্কের উপরে রাখা টাইমস কাগজের ফাইল, আর সবকিছুতেই জানলা ও স্কাইলাইটের আলো। আর লাঞ্চে কিছু দেরি আছে বলে ঝকঝকে পাত্রে কফি নিয়ে কেট প্রবেশ করল। সাদা প্রিন্টের স্কার্ট, তার উপরে নীল স্ট্রাইপের জ্যাকেট। তার লালচে চুল, যা বনেট পরলে ঢাকা থাকে, এখন বরং এলো-খোঁপায় জড়ানো। অত অজস্র লাল রেশমি চুল! এ কি ভারতের জলবায়ুর প্রভাব? কীবল স্বীকার করেছিল, তেমন সুন্দর পরিবেশ সে কল্পনাই করেনি। তার মনের কোথাও ঠোঁটচাপা কেউ সতর্ক করেছিল : ইটস্ নট ডান। কিন্তু তার মনের অন্য অংশ তাকে উৎসাহিত করে বলেছিল : এটা গ্রেট ব্রিটেন নয়, এখানে সীমার বাইরে যাওয়ার টান আছে। সে লাঞ্চে রাজি হয়ে টাইমস কাগজকে ইঙ্গিত করে বলেছিল, 'লন্ডনের বাইরে এই প্রথম টাইমস দেখলাম। ক্যালকাটাতেও-বা কজন রাখে?

তখন বাগচী বলেছিল, কীবলের মুখে ইংল্যান্ডের কথা শুনেই তারা দেওয়ানসাহেবের কাছ থেকে টাইমস চেয়ে এনেছে। কাগজগুলো পুরনোই। তখন আবাব বাষ্পীয় জাহাজ চললে কাগজও তাড়াতাড়ি আসবে, এবং তা কী অলৌকিক ব্যাপার তা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। কফির সঙ্গে পিয়ানোর কথা উঠেছিল। কীবল বলেছিল, এমন দামী জিনিস নিছক খেয়ালের কথা। তখন কীবল ধর্মাচরণ এবং পিয়ানো বাজনা সম্বন্ধে এই গল্পটা বলেছিল :

গল্পটা কার্ডিন্যাল নিউম্যানের প্রিয় শিষ্য ডব্লু. জি. ওয়ার্ড সম্বন্ধে। তাঁকে কীবল শেষবার দেখেছিল অক্সফোর্ডের পথেই। বছর পঁয়তাল্লিশের একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, কিন্তু ঘটনার সময়ে ওয়ার্ড যুবক। তখন ধর্মের ব্যাপারে ঝাঁজালো-ধারালো যুক্তি তৈরি এবং সঙ্গীতচর্চা এই দুইয়েতেই সমান প্রবল অনুরাগ তাঁর। কখনও তিনি ইউক্যারিস্টের গুহ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ রহস্যময়তার আঁধি তুলছেন, কখনও মোজার্টের কোনো ফিগারোর স্বরলহর ছড়িয়ে দিচ্ছেন কূজনেব মতো। এই দুইয়ের কোনটিতে তাঁর অন্তর সায় দিচ্ছে সে-বিষয়ে তাঁর ধর্মগুরু ডক্টর পুসেরও দ্বিধা ছিল। একদিন ওয়ার্ড শুকনো মুখে ডক্টর পুসের কাছে উপস্থিত হলেন। স্বীকার করলেন লেন্টের সময়ে সংগীতের মতো হালকা ব্যাপারে জড়িয়ে না-পড়ার যে প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন তা রাখতে গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছে। এ-বিষয়ে ডক্টর পুসে কি কিছু উপায় বাতলাতে পারেন?

ডক্টর স্থির করলেন, একটু-আধটু পবিত্র ধাঁচের বাজনা তেমন ক্ষতি করে না বোধ হয়। কৃতজ্ঞ ওয়ার্ড এক বন্ধুর ঘরে বাজনার আসর পাতলেন। শুরু হল হেন্ডেলের গম্ভীর সংগীত দিয়ে। চেরুবিনির ধর্মীয় স্বরলহরী তারপরে ; ম্যাজিক ফ্লুটের স্বর্গস্পর্শী স্বরগ্রাম এসে গেল। কিন্তু হায় মোজার্টে অনেক বিপদ। কেউ হয়তো পাতাটা উল্টে দিয়েছিল। আর সেইখানেই ছিল পাপাজেনো-পাপাজেনার সেই দ্বৈতসংগীত। রক্তমাংসের মানুষ আর-কত সয়! সংগীতের পর সংগীত, স্বরগ্রাম হালকা ও দ্রুততর ক্রমে। যখন শেষ হল মনে হল তখন দেয়ালের গায়ে কে মৃদু কিন্তু বারংবার টোকা দিয়ে চলেছে। হঠাৎ বন্ধুদের খেয়াল হল, সর্বনাশ! পাশের ঘরটাতেই ডক্টর পুসে থাকেন বটে।

গল্পটা ব'লে কীবল, গল্পটা শুনে কেট ও বাগচী হেসে উঠল। হাসতে হাসতে সে বলল 'না-না, আমি এমন পাদ্রী নই যে পিয়ানোতে আপত্তি থাকবে'।

গল্পের মধ্যেই কফি শেষ হয়েছিল। কেট উঠে দাঁড়াল। কফির কাপ-প্লেট ট্রেতে কুড়িয়ে নিতে নিতে বলল সে, 'আমাদের ঝি-চাকর নেই। লাঞ্চ কিছু বাকি আছে তৈরি করতে। আপনারা গল্প করুন। আমিও

মাঝে মাঝে আসব'।

কেট চলে গেলে বাগচী জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্টার ওয়ার্ড কি রোম্যান ক্যাথলিক'?

কীবল বলল, 'সম্ভবত। কিন্তু অ্যাংলো-ক্যাথলিকদের সঙ্গে বিবাদ আছে বলেও শুনিনি। আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক ধরেছি। আপনি কোয়েকার। প্রকৃতপক্ষে আমি আজই চিঠি দিলাম বাড়িতে, তাতে লিখেছি, এখানে একজন প্রকৃত কোয়েকারের সাক্ষাৎ পেয়েছি'।

বাগচী কোয়েকার শব্দ শুনে তার তাৎপর্য আবার উপলব্ধি করেই যেন শিউরে উঠল। ঈশ্বরের সান্নিধ্যের অনুভূতিতে কম্পমান! সে বলল, 'সর্বনাশ! আপনি কবেছেন কী'?

'কেন আপনি কোয়েকার নন'?

'হয়তো ডিসেন্টার। কেউ কেউ বলে ইউনিট্যারিয়ান'।

'আদৌ না। আমি এবার লিখতে পারব ইউনিট্যারিয়ানদের মধ্যে কোয়েকারের ভাব থাকে। আমি কিন্তু ইংলিশ চার্চেই অর্থাৎ অ্যাংলো-ক্যাথলিক আছি। যদিও আমার বন্ধুদের মধ্যে অনেকে এবং ক্রিমিয়ার কমরেডদের মধ্যে অনেকে, বিশেষ করে যারা আইরিশ, রোম্যান ক্যাথলিক ছিল'।

বাগচী হাসিমুখে বলল, 'ডানকান আপনাকে ইভানজেলিস্ট এবং সেন্ট বলেছিল'।

কীবল হেসে বলল, 'আমাদের বন্ধু এসব ব্যাপাবে পুরনো খবব রাখেন। তিনি অবশ্য ইভানজেলিস্টদের যে একসময়ে সেন্ট বলে ঠাট্টা করা হতো সে খবর রাখেন। কিন্তু এখন সেসব দিন বেশ বদলেছে'।

এরপরে যে-আলাপ হল তা ইংল্যান্ডের ধর্ম-আন্দোলন সম্বন্ধে। বাগচী মাঝে মাঝে প্রশ্ন ক'বে এবং কীবল তার উত্তর দিয়ে যে-আলোচনা তৈবি কবল তাকে সংক্ষেপে এরকম বলা যায় : রাষ্ট্রস্বীকৃত সুতরাং বৃত্তিপ্রাপ্ত পুরোহিত সম্প্রদায় যে ক্রমশই জনসাধারণের বিরাগভাজন হয়ে পড়েছিল, তাব প্রমাণ তৎকালীন র‍্যাডিক্যাল প্রেসের বিদ্রূপ, পরিহাস, ক্যারিকেচার। ১৮৩১-এ রিফর্ম বিলের বিরুদ্ধে হাউস অভ লর্ডসে ধর্মীয় পীয়াররা ভোট দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ধূমায়িত অসন্তোষকেই বরং জ্বালিয়ে তুললেন। সেই বছরের শীতকালে রিফর্ম-সমর্থক জনতা বিশপদের গাড়িতে ঢিল ছুঁড়ে এবং তাদেব প্রাসাদে আগুন দিয়ে শুধু ছেলেমানুষি আনন্দই করেনি, প্রাপ্তবয়স্কের ক্রোধও দেখিয়েছিল।

ভয়সন্ত্রস্ত চার্চম্যানেরা এবং তাদের্ব উল্লসিত প্রতিপক্ষও স্থির করে নিয়েছিল, ১৮৩৩-এর পার্লামেন্টের প্রথম কাজই হবে ডিসেন্টারদের স্বীকৃত অভিযোগগুলো দুর কবা।

বাগচী বলল, 'তা বটে। এঁর বাবা এণ্ড্রুজ বলতেন, তখন বরং ধর্মীয় লর্ডদের, যাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ উঁচুতলায় অন্য শ্রেণীর লর্ডদেব সঙ্গে, তাদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেও জনসাধারণের যে-কোনো একজনেরই যে বাইবেল থেকে ধর্মপ্রচারের অধিকার আছে তা প্রতিষ্ঠা পাচ্ছিল।

কীবল বলল, 'বলা বাহুল্য ডিসেন্টার এবং ইভানজেলিস্টদের জনপ্রিয়তার কারণ যতখানি ধর্ম সম্বন্ধে তাদের ঐকান্তিকতা ঠিক ততখানিই তাদের সমাজসেবার আগ্রহ। উইলবারফোর্স এবং বাক্সটন যাঁরা ক্রীতদাসপ্রথা লোপ করাব ব্যাপাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা মনে প্রাণে ইভানজেলিস্ট ছিলেন সন্দেহ নেই'।

বাগচী বলল, 'বেন্থামেব সেই কথাটাও মনে রাখতে হবে। তোমাব নিশ্চয় মনে পড়বে কেট, তিনি বলেছিলেন সমাজের অন্যায় দূর করলে যদি সেন্ট বলে বিদ্রূপ করা হয় তবে তিনি সেন্ট অথবা ইভানজেলিস্ট হতে আপত্তি করবেন না'।

কীবল বলল, 'অন্যদিকে কেউ কেউ এখনই মনে করে, ডিসেন্টারদের প্রাদুর্ভাব যে শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাতে সন্দেহ নেই। শিল্পবিপ্লবে কিছু কিছু শ্বেতকায় ক্রীতদাস তৈরি হয়েছিল। ডিসেন্টারদের সকলকেই অল্পবিত্তর তাদের উন্নতির চেষ্টা করতে দেখা গিয়েছে। এককথায় হাই চার্চ-এর তারা যেমন [illegible] জমিদার ও ব্যবসায়ীদের পক্ষে, লো চার্চ-এর ওরা তেমন মধ্যবিত্ত নিম্ন-[illegible] তলে মাথা তুলতে চাইছিল তাদের প্রতিভূ ছিল—এরকম মোটামুটি বলা যায়'।

কিন্তু কেট এল। সে ইতিমধ্যে লাঞ্চের ফ্রায়েড রাইসের জল বসিয়ে এসেছে উনুনে। বাগচীকে বলল, 'তুমি স্নান করবে তো? আমি বসি বরং অতিথির কাছে'।

বাগচী উঠল। অতিথিকে 'কিছুক্ষণের জন্য মাপ করুন' বলে স্নান করতে গেল সে।

কেট বলল, 'এখানে আপনার নিশ্চয় অসুবিধা হচ্ছে। আউটল্যান্ডিশ মনে হয় না'?

'আউটল্যান্ডিশ'? কীবল বলল, 'রোম্যান্টিক বরং, কিংবা রোম্যান্টিক বিষয়টাতেই আউটল্যান্ডিশ ভাব থাকে না? কিন্তু আপনি আমাকে মাপ করবেন যদি আমি আপনাদের ছবিগুলোকে ভালো করে দেখি'।

'স্বচ্ছন্দে'। বলে কেট উঠল। বলল, 'আসুন'।

ওয়াল-ক্লকের উপরে প্রিন্ট। বেশ খানিকটা সময় নিবিষ্ট হয়ে সেটিকে দেখল কীবল। বলল, 'ক্রাইস্ট চার্চ নাকি'?

কেট বলল, 'আগে ছবির তলায় পরিচয় লেখা ছিল। নতুন করে ফ্রেমে পরানোর সময়ে ঢেকে গিয়েছে। ঠিক বলতে পারি না। এটা বোধ হয় একারম্যানের প্রিন্ট, এরকম শুনেছিলাম মনে পড়ছে। হ্যাঁ, ক্রাইস্ট চার্চই হবে'।

'কিন্তু এসব প্রিন্ট এখন ইংল্যান্ডেও দুর্লভ'।

প্রিন্ট-ছবিটা দেখে বিপরীত দিকে দেয়ালের প্রাকৃতিক দৃশ্যের সেই জলরং ছবিটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কীবল। একটু উপরে ছবিটা। ঘাড় উঁচু করে দেখতে হয় স্বদেশের দৃশ্য। চিত্রীও সুনিপুণ। কীবল মুগ্ধ হয়ে গেল।

দেখতে দেখতেই সে জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি মূল ছবি? তাই যেন মনে হয়। টার্নার নাকি'?

কেট পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল, 'না, টার্নার নয়, এ জানতাম। এ ছবিটাও আমার বাবার সংগ্রহ। তাঁর কাছে শুনেছিলাম এটা নরউইচ স্কুলের। দস্তখতটাকে দেখুন, কটম্যান মনে হয় না'?

ছবিটাকে আর-একটু ভালো করে দেখার জন্য পিছিয়ে আসতে গিয়ে ছেলেমানুষি কেলেঙ্কারি ঘটাল কীবল। গায়ে-গায়ে লাগল কি না-লাগল, কেটের সেন্টের সৌরভ কীবলকে অন্তরে বিদ্ধ করল। এ-অবস্থায় অনেকক্ষেত্রে পুরুষের চোখে পরিবর্তন দেখা দেয়। কীবল না-বুঝে সে রকমভাবে চাইল। ফলে কেটের মুখও লাল হয়ে উঠল।

কীবল বলল, 'আমাকে ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করে ক্ষমা করুন'।

মুহূর্তের মধ্যেই হেসে কেট বলল, 'আসুন, তার চাইতে বরং আপনার যুদ্ধের কথা শুনি'।

কীবল বলল, 'দেখুন মিসেস বাগচী, এমন আশ্চর্য লাগছে আমার এখানে। আমি নিজেই ঠিক পাচ্ছি না ম্যানার্সের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছি কিনা'।

'হয়তো ক্রিমিয়ার অভিজ্ঞতা কিছুটা আপনাকে নন-কনভেনশ্যনাল করেছে'। কেট হাসল মিষ্টি করে।

বাগচী স্নান করে ফিরে এল। লাঞ্চের আগে গৃহকর্ত্রীরও বসে থাকে চলে না বিশেষ যদি সংসারের কাজ নিজে করতে হয়।

বাগচী বলল, 'এটা কিন্তু খুব মজার ব্যাপার। আমরা যখন ভাবতাম মানুষ ধর্মের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে বিজ্ঞানের আবিষ্কার এবং ইনডাস্ট্রির প্রসারের ফলে, তখনই ধর্মটা আবার সর্বত্র প্রবল হয়ে উঠছে, তাই নয়! নতুন রোম্যান ক্যাথলিকদের সঙ্গে আমাদের মত না- মিলতে পারে, কিন্তু তাদের সে-ব্যাপারটায় একটা ঐকান্তিক অনুসন্ধান ধরা পড়ে, কেমন তাই মনে হয় না'?

কীবল বলল, 'ঐকান্তিকতা তো বটেই। নিউম্যান, পুসে, কীবল, ম্যানিং প্রত্যেকেই ধর্মের ব্যাপারে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহশীল তাতে সন্দেহ কী'?

লাঞ্চে বসেও আবার এই ধর্মের কথাটা উঠে পড়ল।

বাগচী বলল, 'কি লন্ডনে কি ক্যালকাটার শিক্ষিত মানুষমাত্রেই এখন ধর্ম সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখুন। প্রচলিত পদ্ধতি যাচাই করে দেখছে অনেকেই। নতুন পথে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছে যেন ঈশ্বরের দিকে।

এসব খুবই ভালো, তুমি কী বলো কেট'?

কেট বলল, 'সত্যর কাছে পৌঁছনোর আগ্রহ বলছ?

'আমার তো তাই মনে হয়। মিস্টার কীবল, আমি শুনেছিলাম শিক্ষিত সংস্কৃতিবান যুবকদের নিউম্যান, কীবল প্রভৃতি গুণীব্যক্তিরা বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছেন। আপনার কি মনে হয় রোম্যান ক্যাথলিকদের সংখ্যা ইংল্যান্ডে এখন বিশেষভাবে বাড়বে'?

একটু জল খেয়ে নিয়ে কীবল বলল, 'তা বলা শক্ত কিন্তু। ১৮৪৫-এর পরে অর্থাৎ নিউম্যান রোম্যান-ক্যাথলিকে দীক্ষিত হওয়ার পরই অক্সফোর্ড আন্দোলন দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। পুসে ও কীবলের অ্যাংলো-ক্যাথলিক ; নিউম্যান-ম্যানিং-এর রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়'।

'কেন, তার কী দরকার ছিল'? কেট জিজ্ঞাসা করল'।

'রোম্যান ক্যাথলিকদের পক্ষে শিক্ষা, কালচার এবং ধর্মে অনুরাগ থাকলেও সেই মতবাদ যে চট করে ইংল্যান্ডে বেড়ে উঠবে তা মনে হয় না। ভেবে দেখুন ১৮৫০-এ পোপ কয়েকজন রোম্যান ক্যাথলিক বিশপের এক্তিয়ার ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে 'পোপের আক্রমণ' বলে যে-আন্দোলন তৈরি হয়েছিল তা এখনও থিতিয়ে যায়নি। ইংল্যান্ডে রোম্যান ক্যাথলিকদের সহ্য কবা হচ্ছে, কিন্তু পোপের প্রভাব রাজনীতির দিকে এগিয়েছে মনে করা মাত্র ইংল্যান্ডে প্রতিবাদের ঝড় উঠবে। তাই স্বাভাবিক নয়? এবং এই কারণেই অ্যাংলো ক্যাথলিক হয়েছেন কেউ কেউ। দেশপ্রেমের তো টান একটা আছে'। (কীবল এই জায়গায় একটু হাসল)।

বাগচী বলল, 'হ্যাঁ, তা বটে। এ রকমও শুনেছি'।

সে কৌতুক বোধ করল। যেন মনে মনে বলল : স্বাজাত্যবোধ এবং বিদেশিধর্ম, যতই বলো ধর্ম জাতি দিয়ে বিভাজ্য নয়। আসলে কিন্তু ধর্ম জাতীয়তার সীমা লঙ্ঘন করলেই মুশকিল।

তখন আলাপের থেকে লাঞ্চের সুস্বাদ তাদের আকর্ষণ করল।

পরবর্তীকালে কীবল অনুভব করেছে সেদিনকার লাঞ্চটা ভালোই হয়েছিল, যার অন্য বিশেষণটা হয়তো ইনফর্ম্যালও হতে পারে। আলাপটা, কি লাঞ্চের আগে কি লাঞ্চের সময়ে, বেশ উত্তেজক হয়ে উঠেছিল। কিংবা তার অন্য নাম ঐকান্তিক!

লাঞ্চের পরে ইউরোপের সভ্যতার উপরে পেগানদের প্রভাব কিছু আছে কিনা, রেনেশাঁয় তা কতটা খুঁজে পাওয়া যায় এমন আলোচনা হবে বলে মনে হয়েছিল একসময়ে। তারুণ্যেব ফলে কীবলের যেন আলোচনার বাতিকও আছে। কিন্তু এদেশের খাদ্য সুস্বাদু হতে পাবে, কেট বলেছিল, অতি সহজপাচ্যও, কিন্তু তা ভারী আর যেন আয়েশ করতে প্ররোচনা দেয়। লাঞ্চের ওজনটা ভারীই ছিল, মদের পরিমাণই বরং কম। এবং একটু ঝাল বেশি।

পথে বেরিয়ে, তার ঘোড়া তখন ছুট করছে, কীবলের মনে হল, সে তার আত্মিক ভগ্নীকে এরপরেই যে চিঠি লিখবে তাতে একারম্যানের প্রিন্ট সম্বন্ধে না-হোক নরউইচ স্কুলের কটম্যানের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে বলবে।

ঠিক এই সময়েই তার মনে হল : নাচতে গিয়ে সঙ্গিনীর পা মাড়িয়ে দেওয়া যেন। না, সে-কথা আত্মিক ভগ্নীকে লেখা যায় না বোধ হয় সেই কবোষ্ণ অনুভূতির কথা। অথচ এটা অ্যাকসিডেন্ট ছাড়া কিছু নয়। একটা অনুভূতিই মাত্র, যার প্রমাণ নেই। এবং ভদ্রলোকের তা মনে রাখা উচিত নয়। না, উচিত হয় না।

কীবল অন্যদিকে মন দিল, অর্থাৎ লাগাম দিয়ে আঘাত করে ঘোড়াটার গতি বাড়াল।

বাগচী বলল, 'এখন কি আমরা বিশ্রাম করব ডার্লিং'?

'যদি কাজের কথা মনে না-হয়'। কেট হাসল। 'চরণদাসের ডিসপেনসারি'?

'বেশ লাগছে। সুন্দর লাঞ্চ, সুন্দর আলাপ। কেমন লাগল কীবলকে'? বাগচী লক্ষ্য করল না, কেটের

ভ্রূতে একটা হালকা ছায়া পড়ল।

সে বলল, 'অন্যদিকে দ্যাখো কেট, মানুষ আবার তার ঈশ্বরকে ফিরে পাচ্ছে। নিছক অভ্যাসের ব্যাপারের চাইতে বেশি। ইংল্যান্ডের যাঁরা রোম্যান-ক্যাথলিক নিদেন অ্যাংলো-ক্যাথলিক হচ্ছেন, কলকাতার যাঁরা খ্রিস্টান ও ব্রাহ্ম হচ্ছেন তাঁরা সমান পিপাসা নিয়ে চলেছেন, এমন মনে হয় না? মনে হয় না যে, কি লন্ডনে, অক্সফোর্ডে, কি কলকাতায় যেন একই ঈশ্বরের প্রভাবে মানুষ ধর্মের দিকে মুখ ফিরিয়েছে। একটা কথা কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হয়নি। বিলেতের ওঁরা ইন্টারশেসনকে মূল্য দেন কিনা'।

'ইন্টারশেসন বলছ? আমার মনে হয় রোম্যান ক্যাথলিকরা তা মানবে'।

বাগচী ভাবল, 'আমি এবং আমার ঈশ্বর, আমাদের মধ্যে আমার হয়ে ঈশ্বরকে নিবেদন করার জন্য সত্যি কি অন্য কাউকে দরকার হয়? যাকে ইন্টারশেসন বলা যাবে'?

কিন্তু তখন বিশ্রামের সময়, ছুটির দিন। বাগচী পাইপ ধরাল। উল-কাঁটা নিয়ে বসল কেট।

কয়েকদিন পরে একদিন বাগচী এই প্রশ্ন তুলেছিল: বিলেতের ইভানজেলিস্ট আন্দোলন তাদের দেশের সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। সেদেশের মধ্যবিত্তদের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা তার পিছনে কাজ করছে। কলকাতায়? এখানে এই দেশে, কেউ কি বলবে না, ধর্ম আছে, যথেষ্ট ধর্ম আছে। অন্য কিছু চাই। তখন তার মন কালো থাকায় সে কলকাতার ধর্ম-আন্দোলনটাকে বিলেতিয়ানা বলে অনুভব করেছিল। বিলেতে যা হচ্ছে এখানে তা হোক এমন বিলেতিযানা নিছক নকল। কিন্তু এ-ভাবনা পরে।

তখন কেট বললে, 'উঠছ তো'?

বাগচী বলল, 'দেরি করে ফেলেছি, রোগীরা বসে আছে'।

৭

নয়নতারা বলল, 'দূরে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারাই কি শিকারের সঙ্গী'?

ইতিমধ্যে কখন ঘোমটা উঠেছে খোঁপা ঢেকে। নয়নতারা একটা হাতে ঘোমটার দুপাশ ধরল, তাতে রগ, কান, চিবুক আর-একটু ঢাকা পড়ল।

হাতি ক্রমশই লোকগুলির দিকে এগোচ্ছে।

নয়নতারা বলল, 'রাজকুমার, শুনেছি কুমির শিকার নাকি জলের বুকে করতে হয়। ওই সরু সরু নৌকোগুলোকেই ব্যবহার করা হবে'?

দূরে বিলের বুকে সরু সরু কয়েকটি নৌকো বটে।

নয়নতারা আবার বলল, 'জানো, কুমির ইচ্ছা করলেই কাঠের গুঁড়ি হতে পারে'?

রাজু বলল, 'শুনেছি, বাঘও ঝোপঝাড় হতে পারে'।

'কিন্তু...

'কী কিন্তু'?

রাজু দেখল নয়নতারার ঝুঁকে পড়া মুখটায় চাদরের ঘের বাঁ হাতে চিবুকের উপরে ধরা। ঠোঁট দুটো হাসছে। কিন্তু চোখ দুটি যেন বেশি টানা আর স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। নয়নতারা এই প্রথম রাজুর হাতের উপরে হাত রাখল যেন স্পর্শেও তেমন স্নিগ্ধ কিছু বলবে। চাপা গলায় বলল, 'আমি ক্ষত্রিয়া নই, দোহাই রাজু'।

কিন্তু ততক্ষণে হাতি দেখে গ্রামবাসীরা হৈচৈ করে এগিয়ে এল।

নয়নতারা বলল, 'আর কখনও মই ছাড়া হাতি বার করার কথা ভেব না। কী মুশকিল'!

রাজু নামল শুঁড় বেয়ে। মাটিতে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, 'তাহলে ঠাকুরানী, তোমার নতুন পত্তনিটাকে পছন্দ হয় কিনা তা দ্যাখো'। মাহুতকে বলল, 'কাছারিতে তহশিলদার না-থাকে অন্য কেউ থাকবে,

মোড়লদের বাড়িতে খবর দিও, সাহেবান কাছারির খাস-কামরায় দুপুরে থাকবেন। আমরাও কাছারির ঘাটে উঠব বিকেলে'।

পরে একদিন নয়নতারা রাজুর এই উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করেছিল।

কেউ কেউ বলে কুমিরের নানা জাত আছে এবং তারা নাকি হিংস্র। তাদের গায়ের চর্ম বর্ম, চোয়ালে বসানো সারি সারি বল্লমের ফলা, এবং জলের তলায় ডুবোজাহাজের গতিবিধি—এসবই নাকি তার গোপন হিংস্রতার কিছু কিছু প্রমাণ যা গোপন রাখতে পারেনি। কিন্তু কুমির যে বোকা সে-বিষয়েও অনেক গল্প আছে, বাঁদর, শিয়াল কার কাছেই না সে ঠকেছে। সুতরাং মানুষের সঙ্গে—যারা সশস্ত্র এবং বন্দুকও আছে যাদের—তারা যখন দলবদ্ধ, তখন প্রতিদ্বন্দ্বিতা সাময়িকভাবে আতঙ্কজনক হলেও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তীব্র ব্যথা যা সমস্ত শিরা-উপশিরা স্নায়ুকে পাগল করে তোলে, লুকোনোর পালানোর চেষ্টা যা শরীরের সব যন্ত্রকে একসঙ্গে পুরোদমে চালাতে চেষ্টা করে, তারপরের সেই বিস্ময় যখন কোনো যন্ত্র চেষ্টা সত্ত্বেও কোনোদিনই যেমন অচল অকেজো দেখা যায়নি তার চাইতেও অকেজো হয়ে যায়, আর নিজের চারপাশেই সেই রংটা দেখা দেয় জলে যা খাদ্যসংগ্রহের সার্থক চেষ্টার লক্ষণ হিসেবেই তার পরিচিত, এবং তখন খাদ্যসংগ্রহ হয়েছে কি, না-হয়েছে, শরীরের ভিতরের সেই জ্বালা খাদ্যসংগ্রহের সার্থকতাবোধই কিনা এমন অনুভব করতে করতে রোদ পোহানোর অনুভূতি আর আগ্রহ এসে মিশে যায় সেই অনুভূতিতে, স্থির হয়ে যায় কুমিরটা।

কিন্তু এর বেশি কুমিরের কথা আমরা কী বলতে পারি?

কিন্তু বিল? তা যেন একটা আলাদা জগৎ। কোথাও দু-চার-দশ বিঘা পরিমাণ দাম। দামে কাষা, হোগলা প্রভৃতি ঘাস তো আছেই, আশশেওড়া, আকন্দ, এমনকী বাবলাও জন্মেছে কোথাও। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এদিকের অধিবাসীরা দাম কেটে জলের গলিপথ বার করেছে। অন্য কোথাও টলটলে পরিষ্কার জল। সে-জলে কোথাও কলমি, কোথাও শাপলা, অন্য কোথাও দশ-বিশ বিঘা পরিমাণ পদ্মবন। দামের উপরে বক, হাড়গিলে, মাছরাঙা ; কলমি, শাপলার মাঝে মাঝে পানকৌড়ি আর মাছরাঙা।

রাজু যেখানে দাঁড়িয়েছিল তার কাছাকাছি পারের সমান্তরাল একটা চর জেগেছে যেন। চরটার ওপারে অন্তত এক ঝাঁক বুনোহাঁস।

বিলমহলে রাজুদের কাছারি আছে বটে। গ্রামের লোকেরা বলল, তা প্রায় একক্রোশের পথ হবে। কিন্তু কুমিরের আড্ডা সামনের বাঁকটা থেকেই দেখা যাবে।

রাজু জানাল কাছারিতে তার কোনো কাজই নেই, এখনই বরং কুমিরের খোঁজে যাওয়া যেতে পারে। গ্রামের লোকেরাও বলল, সেটাই ঠিক হবে। রোদের তাপ কমলে কুমিরকেও ডাঙায় পাওয়া যাবে না। তারাই স্থির করল যত লোক জমেছে সবাই গেলে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙবে, কুমির তো একচোখ খুলেই ঘুমোয়। সুতরাং শালতি আর তার সঙ্গে দুখানা ডোঙামাত্র যাবে । রাজুর সামনের যে-চরের কথা বলা হয়েছে সেই চর আর এপারের মধ্যে বিলের জল একটা ছোটখাটো নদীর মতো। শালতি বা ডোঙার পক্ষে যথেষ্ট গভীরও বটে।

শালতি একটু এগিয়ে যেতে রাজু দেখতে পেল চর একটাই নয়, আর প্রথমটিই সবচাইতে উল্লেখযোগ্য নয়। কোনো চর পারের সমান্তরাল, কোনোটি-বা কোনাকুনি পারের দিকে এগিয়ে এসেছে। যেখানে চরটা বড় এবং খালের পরিসর বরং কম সেখানে দু-তিনটি বাঁশ পাশাপাশি বেঁধে সাঁকো করা হয়েছে। এমন একটা সাঁকোর নিচে দিয়ে শালতিটা অনায়াসে গলে গেল।

এদিকের চরগুলোর বৈশিষ্ট্য আছে। নদীর নয় যে কোথায় বালি আর কোথায় পলি খুঁজতে হবে। যেদিন চর জাগে সেদিনই চাষ দেওয়া যায়, কলাই আর ধান হবেই। যেখানে চরটা বড় সেখানে চাষ

হয়েছে। কোনো কোনো চরে দু-চারটি ছোট ছোট ঘরও চোখে পড়ছে।

দিনটা পরিষ্কার। অনেক দূর পর্যন্ত খোলা আকাশ চোখে পড়ছে। নীল উঁচু আকাশে কোথাও সাদা তুলো ছড়ানো।

কোথাও জল একেবারে শান্ত কাচের ফলকের মতো। অন্য কোথাও, যেখানে জলটা অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, সেখানে বিঘৎ পরিমাণ উঁচু ঢেউ উঠছে বাতাস লেগে। কোথাও শালতি দেখে জলের ধারের হাড়গিলে আকাশে উঠল। কোথাও চাষ থামিয়ে কৃষক জলের ধারে এগিয়ে এল শালতি-ডোঙার ছোট বহরটাকে ভালো করে দেখতে। একবার একটা চর ঘুরে যেতে, না-বুঝে এক ঝাঁক বুনো হাঁসের মধ্যে গিয়ে পড়ল শালতি। ডাহুক, হাঁস, করন্ডে সে কী প্রতিবাদ!

রাজুর সঙ্গীরা স্থির করেছিল কুমিরকে তারা গ্রামের বিপরীত দিক থেকে আক্রমণ করবে। কারণ দেখিয়েছে—তাড়া খেলে গভীর জলের দিকেই ঝুঁকবে সে। যদি-বা গ্রামের দিকে যায় সেখানে এক কোমরের চাইতে বেশি জল নেই, ভাল্লা টেঁটায় সেখানে কুমিরকে ঠেকানো যাবে।

আরো আধঘণ্টা শালতি এদিক-ওদিকে চলে একটা বড় চরের দু-তিনশো গজের মধ্যে এসে পড়ল। বড় চড়টার কাছে ভিতে আরো কতগুলি ছোট ছোট চর কুমিরের পিঠের মতোই জেগে আছে।

কিন্তু কুমির তো মাটির তৈরি নয়। আরো একঘণ্টা ধরে এ-চর সে-চরকে বেষ্টন করে ঘোরা হল। কাদাখোঁচা পাখি আর টিট্টিভকে নড়তে-চড়তে দেখা গেল, মাছ ধরার আশায় ডুবিয়ে রাখা ডোঙাকে ভুল বুঝে একবার খুব সন্তর্পণে এগিয়েও গেল শালতি, কিন্তু কুমিরকে গল্প বলেই মনে হল।

তখন রাজু আবার ঘড়ি বার করে দেখল। চারটে বাজতে চলেছে। অনুমান হয় দিগন্তব বিস্তার ছোট হয়ে আসছে। জলে লগির যে-ছায়া পড়েছে তা থেকে বোঝা যায় সূর্য ইতিমধ্যে পশ্চিমে নেমে পড়েছে। ঠিক এমন সময়ে লগিওয়ালাদের একজন চাপা গলায় ইশারা করল। অন্য লগিওয়ালারা ইশারা বুঝে উল্টোদিকে লগি বসাল। সামান্য একটা ঝাঁকি দিয়ে শালতি থামল। হাতের ইশারায় ইশারায় জানাজানি হয়ে গেল। শালতির দিকে মুখ করে একটা আর তার পেটেব দিকে মুখ করে আর-একটা।

শালতির গলুইয়ের কাছে খানিকটা পাটাতন, তার উপরেই বসেছিল রাজু। তার উপরেই হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল সে। দুটো তো আর সম্ভব নয়। যেটিকে আড়াআড়ি পাওয়া গেল সেটির সামনের পা আর ঘাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় লক্ষ্য করে একবার, গুলি খেয়ে সেটা লাফিয়ে উঠেই চলতে শুরু করতে-না-করতে পা ও পেটের মাঝামাঝি নিশানা পেয়ে আর-একবার গুলি করল রাজু। অন্য কুমিরটি ভয় পেয়ে শালতির দিকেই ছুটতে শুরু করল। তার সূচলো মাথা ওপাশেব ডোঙার হাত আট-দশেব মধ্যে এসে পড়ল। ডোঙার লোকেরা চিৎকার করে উঠল। কুমিরের মুশকিল হল, কিংবা তার দুর্ভাগ্য। যেখান থেকে সে জলে নামতে ছুটছে সেখানে জল এককোমরের বেশি নয়। আর-একটু ঘুরে হাত দশেক দূর দিয়ে গেলে সে গভীর জলই পেত। ডোঙার মানুষরা তখন মরিয়া, কুমির উপরে এসে পড়লে জলে পড়বে মানুষ ; আর জলে কেউ কুমিরের সঙ্গে বিবাদ করে না। টেঁটা আর বল্লমের (সবগুলোতেই দড়িবাঁধা) খোঁচায় কুমিরকে রুখতে চেষ্টা করল তারা। কুমির ছুটে আসছিল, তার ভারি শরীরেব ওজনের সঙ্গে সেই গতি গুণ হচ্ছে। একটা ধারালো টেঁটা বিঁধতে তার শরীরের চাপেই সেটা তার মর্মে পৌঁছল। মুহূর্তে দিক বদলাল সে, টেঁটার রশিতে টান পড়ল, আর সেই টানে ডোঙা কুমিবের ডাঙায় উঠে পড়ল। রাখো-রাখো, গেল-গেল করতে করতে অন্য ডোঙাটা লগি ঠেলে শালতিকে ধাক্কা দিয়ে প্রথম ডোঙাটাকে সাহায্য করতে এগোল। সে-ডোঙা থেকেও টেঁটা ছোঁড়া হল দু-তিনটি। দৈবাৎ তার একটি মানুষকে না-বিঁধে কুমিরকেই বিঁধল। দু-দড়ির টান পড়ল কুমিরের উপরে।

চরের উপরে আড়াআড়ি দুটো নালা। অল্প জল বলেই মনে হয়। সেই নালার দিকে ততক্ষণে চলছে গুলি-খাওয়া প্রথম কুমিরটা। শালতি থেকে বেশ খানিকটা দূরে গিয়েছে। সেটা লেজ আছড়াচ্ছে। রাগে, কিংবা একটা পা ভেঙেছে বলেই, চলতে গিয়ে লেজের অমন ব্যবহার হচ্ছে।

ডোঙার লোকরা গেল-গেল রাখো-রাখো করছে, রাজু একবার সেদিকে চেয়ে দেখল। শালতিকে চরের উপরের নালায় নিতে বলল। পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করল। একমুহূর্তে কী-বা বোঝা যায়! মাথার উপরে বন্দুক আর টোটার বেল্ট এক হাতে উঁচু করে ধরে সে জলে লাফিয়ে পড়ল। ওদিকেও কুমিরের টানে ডোঙা জলে ধাক্কা মারছে।

কী করবে তা শালতির লোকরা বুঝে উঠতে পারল না। জল এখানে খুব বেশি না-থাকার কথা, তাহলেও এককোমর জল কেন, হাঁটুজলেও কি মানুষ কুমিরের সমকক্ষ? কিন্তু রাজকুমার তো, কী বিপদ! শালতির একজন চিন্তা করে জলে নামল। অন্য আর-একজন তাকে দেখে জলে লাফিয়ে পড়ল। ততক্ষণে রাজু জল ঠেলে, জল ছিটিয়ে চরের মাঝামাঝি গিয়ে পৌঁছেছে। তার ভিজে স্যুট থেকে জল গড়াচ্ছে।

রাজু একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে পরিস্থিতিটা দেখল, বন্দুকে দুটো গুলি পুরে সে আবার ছুটল হাঁটুজল ভেঙে। জল ছিটোচ্ছে পায়ে-গায়ে। জলে গতি আটকাচ্ছে। কুমিরের সঙ্গে কি ছুটে পারা যাবে! ওদিকে ডুবো ঝোপঝাড়। কুমির সেদিকে গেলে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে, কিংবা চরের ওদিকে জল পায় যদি। চর অসমান, উঁচুনিচু, গাড়াগর্তও আছে।

না, কুমিরটা তেমন ছুটতে পারছে না। চাকাভাঙা গাড়ির মতো অবস্থা তার। একটা ঢালু দেখে সে বোধ হয় আশা করল সেদিকে জল আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একটা গাড়া। নিচে নেমে গিয়ে জল না-পেয়ে কুমিরটা দিক বদ্‌লে কিংবা ভুল করে ববং রাজুব দিকে এগিয়ে এল, কিংবা পাশ কাটাতে গিয়ে দূরত্বটা কমিয়ে আনল। হাঁটু গেড়ে রাজু কাদামাটিতে বসে পড়ল। একমুহূর্ত তাক করে রাজু গুলি করল। এবার কুমিরের গতিটা থেমে গেল।

অন্য কুমিরটাকে নিয়ে ডোঙার লোকেবা বিপদেই পড়েছিল। দুটো টেঁটাব, তা অবশ্য কুমির যত টানছে ততই তার নাড়িতে টান দিচ্ছে, দড়ি ধরা বটে কিন্তু তাতে তার লেজের আছড়ানো কমছে না, চলাও বন্ধ করেনি সে। একজন সাহস করে বল্লম মারল পাশ থেকে, কিন্তু যেন ঠিকরে এল কুমিরের কাঁটার খোলা থেকে। তখন আর-একজন বরং তার মুখের দিকে এগিয়ে গিয়ে পেটের কাছাকাছি আব-একটা টেঁটা বিঁধিয়ে দিতে পারল। টেঁটাটার দড়িবাঁধা ডগাটা মাটি আর কুমিরের শরীরের চাপে পাটকাটির মতো ভেঙে গেল, কিন্তু সেই চাপেই তার ধারালো ফলাটা কুমিরের শরীরের মধ্যে এক হাত পরিমাণ বসে গেল।

তখন পশ্চিমের আকাশ লালচে হয়ে উঠেছে। শালতিটাকে চরের কোণে ভেড়ানো হয়েছে। রাজু শালতিটাতে বসে দেখল, বাদামি-বাদামি সেই আলোয় দুটো ডোঙার মতো দুটো কুমির এখন স্থির হয়ে আছে।

শালতির একজন বলল, 'পা ঝুলিয়ে বসুন, হুজুর, জুতোর কাদা ধুয়ে দিই'।

আর-একজন বলল, 'এখন হুজুর, আমাদের খুব তাড়াতাড়ি যেতে হবে। অন্ধকার হলে চরে চরে গোলকধাঁধায় পড়ব'।

রাজু বলল, 'একজন বরং বন্দুকটাকে একটু মুছে বাখো, জল লেগেছে'।

রাজু ঘড়ি বার করল। পাঁচটা পার হয়ে গিয়েছে। ম্লান হেমন্তের সন্ধ্যা ছটাতেই গাঢ় হবে বটে। ঘড়িটার গায়ে জল। রুমাল দিয়ে রাজু মুছল।

শালতির সেই লোকটি বলল, 'এখন হুজুর, শালতিব দু-মাথাতেই লগি মারা হবে, দুলবে শালতি, আপনার কি অসুবিধা হবে হুজুর'?

রাজু বলল, 'একটার চামড়া কি আমাকে পৌঁছে দিতে পারো তোমরা'?

'আজ শেষরাত তক হতে পারে হুজুর'।

রাজু হেসে বলল, 'অত তাড়াতাড়ি দরকার নেই'।

শালতি চলতে শুরু করল, শালতির আগেপিছে ডোঙা। একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে

ছুটছে সেগুলো। ডোঙায় দুজন, শালতিতে চারজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লগি মারছে। একটা শব্দমাত্র করে চারটে লগি পড়ছে জলে। বাচ্ খেলার মতো চলছে শালতি। কী-যেন একটা বিড়বিড় করছে লগিওয়ালারা, মন্ত্র যেন। হঠাৎ একসঙ্গে গানটা একটা চিৎকারে ফুটে উঠল, প্রথমে শালতিতে, পরমুহূর্তে ডোঙা দুটিতেই।

জল কালো, শালতির দু-পাশের দাম অথবা চরের আগাছার ঝোপঝাড় বরং কালচে খয়েরি। আকাশ ধোঁয়াটে আর নিচু। শীত-শীত লাগছে ভিজে স্যুটে রাজুর।

কাছারির ঘাটে পৌঁছতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়, তা হলও না। অন্ধকারে পথ হারানোর ভয় রইল না, কারণ সন্ধ্যার আগেই কাছারির সামনে বড় বড় মশাল জ্বালানো হয়েছিল, উপরন্তু কাছারির বজরাই আলো নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল রাজকুমারকে বিকেলের আলোয় ফিরতে না-দেখে।

পারে উঠল রাজু। জনতার আগ্রহই সীমা ভেঙে এগিয়ে গেল, আধো-অন্ধকাবে পায়ের উপরে পা ফেলার জায়গা রইল না। তখন হঠাৎ একজন মানুষ কোথা থেকে দুই বাহু ছড়িয়ে দিল। তার দুই ছড়ানো হাতের তেলোর মধ্যে ব্যবধানটা গজচারেক হবে। দুই তেলো দিয়ে সে ভিড়কে চাপ দিয়ে পিছু হঠতে লাগল যেন দাম কেটে নৌকোর পথ করছে। যেন সে এক অপরিচিত ইঙ্গিতে রাজুকে এগিয়ে যেতেও বলছে। তার হাঁড়ির মতো মাথা, প্রচণ্ড চৌকো চোয়ালের উপরে থাবা-থাবা মেদমাংস বসানো মুখমণ্ডল, উপরের এবং নিচের ঠোঁট-ঢাকা সিন্ধুসিংহের মতো গোঁফ সত্ত্বেও মনে হল লোকটি নাচছে যেন। অন্তত ভিড় ঠেলতে ঠেলতে তাব কাঁধ দুটো এবং বাহুর উপরিভাগ ওঠানামা করছে, মাথাটা ডাইনে-বাঁয়ে ফিরছে পা দু'খানাও ঠিক সোজা পড়ছে না। লোকটির গায়ে কাঁধকাটা পিরহান, কোমরে উড়নি জাতীয় কিছু জড়ানো, ধুতির ঝুল ছোট তাই কোঁচা হাঁটুর কাছে দুলছে।

লোকটি পিছিয়ে পিছিয়ে যেখানে থামল সেটা একটা গাছের তলা।

মশালে-মশালে গলা সোনা বং। মাটিতে একটা সরু কাজ করা চাটাই বিছানো, তার উপরে একখানা চেয়ারের মতো উঁচু জলচৌকি।

কথা বলতে গেলে বোধ হয় গোঁফ তুলে ধরতে হয়, তেমন করে গোঁফ পাকিয়ে লোকটি বলল, 'বসতে আজ্ঞা হোক, রাজকুমাব'।

ভিজে জামাকাপড়ে বসবে কিনা এই দ্বিধা করতে লাগল বাজু। কিন্তু ততক্ষণে সেই বড় মাপের লোকটি আর-এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে। সে বলল, 'জোকাব দাও'।

যারা ভিড় করছে তারা সবাই পুরুষ। অপটু, অনভ্যস্ত, পুরুষালি গলায় হুলুধ্বনির নকল করে দু'একজন ডুকরে উঠতেই হাসির গররা পড়ে গেল।

লোকটি বলল, 'চপ্'। সে এদিক-ওদিক চাইল, ভিড়ে কাউকে খুঁজে পেয়ে বলল, 'ও বামুন, ইদিকে, ইদিকে'।

শুঁটকো কালো চেহারার, কিংবা শুঁটকো না-বলে, হাড়েমাসে দড়া পাকানো একজন প্রৌঢ় এগিয়ে এসে বলল, 'তোমাব আর সুখের পারবার নেই মণ্ডল। নাও, ধরো'।

সে নিজের মুখের কাছে হাতের তেলো বেখে 'আ বাবা ইয়া' বলে ফুকরে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মেদের পাহাড়ও।

রাজুর বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। সেই শুঁটকো বামুনের গোট শরীরটাই একটা শিঙা হলে তবেই তেমন ফুকরে ওঠা সম্ভব।

এই প্রাথমিক কর্তব্য সমাপ্ত হলে মেদমাংসের সেই বালিয়াড়ি (বালিয়াড়ি বলাই ভালো, পাহাড় স্থির কঠিন, এক্ষেত্রে পাহাড়ের গা যেন সবসময় সচল, খসে খসে পড়ছে উপরের স্তর হাসি হয়ে হয়ে), সে ট্যাক থেকে হলদে কিছু একটা বার করল। ডান হাতের তেলোতে সেটা রেখে, বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত স্পর্শ করে এগিয়ে ধরল রাজুর সামনে ; গোটা শরীর কোমরের কাছে ভাঁজ করে ঝুঁকে দাঁড়াল। বলল,

'নেকনজর দিতে আজ্ঞা হোক, রাজকুমার'। দৃশ্যটা হেসে ওঠার মতো। কিন্তু ডান হাতের তর্জনী দিয়ে মোহরটাকে ছুঁতে হল রাজুকে।

রাজুর শীত-শীত লাগছিলই, এখন উত্তেজনার বদলে অস্বস্তি। কারণ সেই কাদাজল হাঁটুর উপর পর্যন্ত পৌঁছেছে। হাতির খোঁজে সে এদিক-ওদিক চাইল। নিজের অস্বস্তির কথা প্রকাশ করা যায় না। সে বলল, 'আমার সঙ্গে সদরে দেখা কোরো, মণ্ডল'।

লোকটি এবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, 'হুজুরের এই কোলের ছেলের নাম গজা। ওরে হাতি আন। হাতি আন। ভিজে পোশাকে হুজুরের খারাপ লাগছে'।

চার মণ ওজনের সেই গজা কোলের ছেলেই বটে।

কিন্তু ততক্ষণে তহশিলদার নিজে পৌঁছতে পেরেছে। ঘণ্টার শব্দও হল। তাহলে হাতি এবার নড়ছে। বোধহয় হাতিও এতক্ষণ কোণঠাসা হয়েছিল।

হাতি বসল। তহশিলদারের লোকরা আলো এগিয়ে আনল। শালতির লোকেরা শিকারের সরঞ্জাম তুলে দিল। রাজু হাতির কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই মাহুতের ইশারায় শুঁড় নামাল হাতি। রাজু শুঁড়ের উপরে দাঁড়াতেই শুঁড় উঁচু করল। রাজু হাওদায় বসতেই হাতি চলতে শুরু করল।

নয়নতারা বলল, 'একেবারে ভিজেছ তো অবেলায়'?

রাজু হাসল। বলল, 'পাইপ ধরাতে পারলে হতো'।

সেই চামড়ার পাউচ বার করতে করতে নযনতারাকে জিজ্ঞাসা কবল সে, কোলেব ছেলে গজা মণ্ডলকে দেখেছে কিনা?

মাহুতরা সাধারণত কথা বলে না। কিন্তু গজা সম্বন্ধে বোধ হয় না-বলে থাকা সহজ নয। সে বলল, 'হুজুর গজাও নয়, মণ্ডলও নয়। ওব বাপঠাকুর্দা ছিল মেণ্ডুজা। সেই মিলিযে নাম নিযেছে গজা। তা কাঁধের মাপও গজ হবে'।

রাজু দেখল দেশলাই তামাক ভেজেনি।

অন্ধকার বেশ ঘন হচ্ছে ক্রমশ। ঘাসবনে হাতিও হাওদার তলায় অস্পষ্ট। পাইপে তামাক ভরে দেশলাই জ্বালল রাজু। আর তখন তার নজবে পড়ল সেই আলোয় নয়নতারাব কপালে মস্ত একটা গোল সিঁদুরের টিপ।

রাজু হেসে বলল, 'সে কী'?

এতক্ষণে নয়নতারারও খেয়াল হল।

রাজু বলল, 'গ্রামেব মেয়েবা তাহলে দুযে-দুয়ে চার কবে সাজিয়ে দিয়েছে'?

নয়নতারা বলল, 'ছি-ছি, উৎকণ্ঠায় কিছু কী মনে ছিল! রুমালটা দিন'।

নয়নতারা আবার বলল, 'কই দাও রুমালটা'।

কপাল মুছতে মুছতে নয়নতারা বলল, 'আমি তখন জলের বুকে নৌকো খুঁজছি, ওরা এল সাজাতে।

'তা বটে', রাজু হেসে বলল, 'কী করেই-বা বলো আমি কেউই নই'।

'ব্যাপারটা ঠিক তাই-ই নয় কি? কিন্তু এবার থামো। এমন ঘন অন্ধকারে এই বনে হাতি কি পথ খুঁজে পাবে? আমাব ভয কবছে। এর চাইতে কাছাবিতে রাত কাটালেও হতো'। সে ঠোঁট টিপে হাসল।

৮

পেটাঘড়ির শব্দে রাত তখন আটটা, রূপচাঁদ হাই তুলল। রাজচন্দ্রর ঘরের সামনে আর-একবার ঘুরপাক খেলো। রানীর ঘরের দরজায় উসখুশ করল। তারপব সেই দরজার সামনেই খুকখুক কবে কাশল। শীতের রাত, রাত আটটা, মাঝরাত যেন।

ভিতরে তখন আরব্য রজনীর গল্প চলেছে। রানী হাসছিলেন মৃদু মৃদু আরব্য অভিজাত মহিলাদের আত্যন্তিক কাফ্রি ক্রীতদাস-প্রীতির কথায়। অবশ্য, তাঁর হাসি দেখে তাঁর খোশমেজাজ কিংবা বিরক্তি বোঝা গেলে তো রাজবাড়িতে অনেক কিছুই সহজ হতো।

কাশির শব্দ শুনে রানী বললেন, 'রূপচাঁদ নাকি, এসো'।

রূপচাঁদ এ-ঘরে কদাচিৎ চোখ তোলে। মেঝের নকশায় চোখ রেখেই সে জানালো রাজকুমার বিলমহলে গিয়েছেন, তখন ফেরেননি।

রানীর মুখে উদ্বেগ দেখা দেবে যেন। কিন্তু বললেন তিনি, 'তাই নাকি? হয়তো কোনো কারণে দেরি হচ্ছে'।

রূপচাঁদ সরে যেতে ফিরল। তখন রানী আবার বললেন, 'নয়নতারার খোঁজ নিয়ো তো একবার'।

রূপচাঁদ চলে গেল।

গল্প আবার শুরু হল।

কিন্তু নতুন গল্পটার মাঝখানে রানী বললেন, 'সব দেশের গল্প এক নয়। তাই মনে হচ্ছে না? মন্দ নয়, মানদা, তুমি গল্প বলতে ভালোই শিখেছ। অন্য শ্রোতাদের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কি আরো শুনবে এখন? তাহলে বাটা থেকে পান নাও'।

শ্রোতারা বাটা থেকে পান নিয়ে উঠে পড়ল।

যে গল্প বলছিল তাকে রানী বললেন, 'আবার তোমাকে খবর দেব, মানু'।

সকলে চলে গেলে রানী উঠলেন। ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে কিছু ভাবলেন। দরজা থেকে একটু দূরে একজন ঝি দরজার দিকে চোখ রেখে বসে সুপারি কুচোচ্ছিল। তার দিকে দু-পা এগিয়ে রানী বললেন, 'মোক্ষ, হরদয়ালকে এখনই একটু আসতে বলে এসো'।

রানী ঘর থেকে বেরুলেন।

রূপচাঁদ নয়নতারার বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে বুঝতে পারল সে বাড়িতে নেই। তাহলে জানলায় আলোর আভাস থাকত। সে যখন ফিরে যাচ্ছে তখন নয়নতারার দাদা ন্যায়রত্নের চতুষ্পাঠীর দাওয়ায় প্রথমে একটা প্রদীপ এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাউকে যেন বসে থাকতে দেখতে পেল।

'কে'?

'আমি, বলা'।

লোকটি উঠে এল। বলা এখন-আর রূপচাঁদের অপরিচিত নয়।

সে বলল, 'দিদি কি রাজবাড়িতে'?

'আমিও খুঁজছি। বিলমহলে রাজকুমার গিয়েছেন। হয়তো মাসিও সঙ্গে আছেন। এত রাত হয়। অবিশ্যি চোরচোট্টা আর কে এ-গ্রামে? তবে কিনা ফরাসডাঙায় এসে উঠতে বড় জঙ্গল পার হতে হবে তো'।

বলা বলল, 'এগিয়ে দেখতে হয়, না'?

'কী যে করি! দরকার হচ্ছে আলোর নিশানা'।

রূপচাঁদ রাজবাড়ির দিকে হনহন করে ফিরতে শুরু করল। পথের উপরে খানিকটা এসে বলার বাড়ি। 'রোসো, আসি, রূপদাদা' বলে সে ভিতরে গিয়ে তার লাঠিটা নিয়ে এল।

বলা বলল, 'কিন্তু সে তো ঘাসেরও জঙ্গল। হাতিডোবা ঘাস। মশাল নিলে চারপাশের ঘাসে আগুন ধরে যাবে না? আর সে জঙ্গলে কিনা মানুষ'?

রূপচাঁদ বলল, 'তাও তো'।

সে ভাবতে ভাবতে চলল।

রাজবাড়ির প্রাচীরের ভিতর দিকে একপাশে বরকন্দাজদের ছোট ছোট ঘর।

যে-তিনজন বরকন্দাজ মাঝরাতে জাগবার জন্য এখন ঘুমোতে যাচ্ছিল রূপচাঁদ তাদের আটকালো। সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিল। রাজকুমারকে এগিয়ে আনতে যেতে হবে। 'তৈরি হও, আসছি'।

মশালচিদের ঘরে গিয়ে পাঁচ-সাতটি হারিকেন জ্বালিয়ে আনল রূপচাঁদ। বলাকে দেখিয়ে পরামর্শ নিল, 'কেমন, বলা, এই ভালো নয়'?

'আগুনের ভয় থাকল না'।

বরকন্দাজ বন্দুক নিয়ে তৈরি হয়ে আসতেই ছুটতে শুরু করল রূপচাঁদের দল।

রানী খানিকটা ইতস্তত চলে বেড়ালেন তাঁর মহলে। বসবার ঘরে না-ফিরে একটু বাঁয়ে চলে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলার ছাদে গিয়ে উঠলেন।

আকাশে অনেক তারা। রাজবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আলোতে বাড়ির পরিসরটা ঠাহর হয়। প্রাচীর বলে যাকে মনে হচ্ছে তা ছাড়িয়েও গ্রামের মধ্যে এখানে-ওখানে দু'চারটি আলোর বিন্দু। গাছপালা বাড়িঘরের আকৃতি ছায়া-ছায়া, কিংবা কালিতে আঁকা ছবিতে কালি পড়ে গেলে তার কোনো কোনো রেখা তা সত্ত্বেও যেমন ফুটে ওঠে। অবশ্যই হালকা গভীর কোনো সিহাই এমন রং নিতে পাবে না—নীলেব ধার ঘেঁষা কালো একখণ্ড স্ফটিক যেন। স্ফটিক, অর্থাৎ উজ্জ্বলতাব একটা ভাব আছে। কিন্তু এখানে এরকম দেখালেও নিচে গাঢ় অন্ধকারই হবে গাছপালার কোলে বাড়িঘরের কোণে। শীতের রাত ইতিমধ্যে বেশ গভীর বাইরে। হঠাৎ তিনি দেখলেন, 'কতগুলি আলোর বিন্দু যেন খুব তাড়াতাড়ি সবে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে না, আব তাদের পরস্পরের দূরত্বও সমান থাকছে সাবিতে। এ কি রাজকুমাবের বিলম্বের সঙ্গে জড়িত কোনো ব্যাপার? বুকের মধ্যে কী যেন জোরে নড়ে উঠল তাঁর। একটু চঞ্চল হলেন বানী।

সিঁড়িতে এমন সময়ে পায়ের শব্দ হল।

রানী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে, মোক্ষ, হরদয়ালকে খবর দিয়েছ'?

ছাদের যে-প্রান্তে সিঁড়ি সেখান থেকে হরদয়াল জানাল, সে এসেছে, নিচে অপেক্ষা কবছিল, তাই দেরি।

রানী বললেন, 'হরদয়াল, বাজকুমার বিলমহলে গিয়েছিলেন, হয়তো শিকারে। এখন ফেরেননি'।

হরদয়াল বলল, 'সে কী কথা, একা নাকি'?

রানী জানালেন, 'সঙ্গে নয়নঠাকরুন থাকতে পারে। তাও ভাবনার বিষয়'।

হরদয়ালের নীরবতা তার চিন্তারই চিহ্ন। সে বলল অবশেষে, 'হাতিতে গিয়েছেন'?

'পিয়েত্রোর হাতিতেই বলে অনুমান। কিন্তু পথে একটা বড় বন আছে শুনেছি'।

'তা আছে। তবে পিয়েত্রোর হাতি, বনের পথ চিনবে ভরসা করি'।

'কিন্তু অন্ধকার রাত হল'।

'তা হচ্ছে'।

রানী একটু থেমে বললেন আবার, 'আজ গ্রামে কীবল এসেছিল'?

'হ্যাঁ, চার-পাঁচ ঘণ্টা ছিল, বাগচীমাস্টারের বাড়িতে লাঞ্চ করেছে'।

'একে কি দরকারি খবর মনে করো হরদয়াল'?

'এখন পর্যন্ত তেমন মনে করার কোনো যুক্তি দেখছি না'।

কথাটা রানীর মনঃপূত হল। খানিকটা চুপ করে থেকে আবার বললেন, 'আচ্ছা, হরদয়াল, ডানকান একটা সুরকির রাস্তা করেছিল, সে-রাস্তার খানিকটা কেটে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থানে এক রায়তের জমির ধান বিলমহলের লোকেরা কেটে তা আবার সেই রায়তের ঘরেই এমন করে রেখেছে যে রায়তের নিজেরই আর জায়গা হয়নি। রাস্তাটা কি তোমাদের রাজকুমারের জমি উপর দিয়ে হচ্ছিল'?

'সন্দেহ আছে, কিন্তু নয় তাও বলতে পারি না এখন আর। পিয়েত্রোর দরুন ফরাসডাঙারও হতে পারে'।

রানীমা বললেন, 'হঠাৎ রাস্তাটাকে কেটে উড়িয়ে দেওয়ার কী দরকার হল'?

হরদয়াল একটু ভেবে বলল, 'সাধারণত বড় রকমের নালিশ না-হলে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে রাজবাড়ি থেকে প্রশ্ন করা হয় না। এক্ষেত্রে কেউ বোধ হয় নালিশ করেনি। কিন্তু, রানী, রাজকুমারের বিলম্বের কথা বলতে বলতে এসব সংবাদ আলোচনা করার কোনো যুক্তি দেখি না'।

নিজের অমূলক আশঙ্কায় রানী কি হাসলেন? অন্ধকারে তা বোঝা গেল না।

'চলো, হরদয়াল, নিচে বসি'।

রানী ছাদের ঝরোকা-ঝিলিমিলির কাছে থেকে সরে এলেন। তাঁর শাড়ি দুধে-গরদের বলেই হয়তো একেবারে অদৃশ্য নয়, তাঁর হাতের বালার পাথর কিছু কিছু নিজের পরিচয় সেই অস্পষ্টতায় দিলেও অযুক্তির হয় না, কিন্তু কোনো কোনো দেহবর্ণও কি অন্ধকারে ঈষৎ আভাসিত হয়?

একটা সুঘ্রাণ পেল হরদয়াল, যা বিহ্বল কিন্তু মৃদু, এখন যেন বিষণ্ণ। তাড়াতাড়ি দু-পা পিছিয়ে গেল সে সিঁড়ির মুখ থেকে। রানী সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলেন। হরদয়াল ধীরে ধীরে অনুসরণ করল।

নিচের বসবার ঘরে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে রানী বললেন, 'নায়েব অবশ্যই দৃষ্টি রাখছেন, মামলা হয়ই যদি কোম্পানীর আদালতে। আচ্ছা, হরদয়াল, কলকেতায় এবারই কি হাইকোর্ট হবে? বোসো'।

প্রসঙ্গান্তরে কি যাচ্ছে কথা? কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই যেন, রাজকুমারের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা থেকে, ডানকানের সঙ্গে বিবোধ, বিরোধের হেতু হিসাবে নতুন ম্যাকাডাম রাস্তাটা কেটে দেওয়া, তার ফলে সম্ভাব্য মামলা, তা থেকে কলকাতার হাইকোর্ট।

হরদযাল সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'চেষ্টা তাই'।

'তোমার কি মনে হয় তা সবদিক দিয়েই ভালো? মুন্সেফি আদালতও নাকি হবে'?

'আমাদের গ্রামেও হতে পারে'।

'সেটা কী, আচ্ছা হরদয়াল, তুমি ভেবে দ্যাখো, তোমাদের রাজকুমারের এক্তিয়ারের মধ্যে যদি আদালত বসে সেটা কি ভালো? ওরা কী প্রস্তাব করেছে? তোমাদের তো সদর-আমিন আছেই'।

হরদয়াল বলতে যাচ্ছিল, আমাদের গ্রামের আয়তন লোকসংখ্যা ও গুরুত্বের দিক দিয়ে তেমন হওয়াটাই উচিত হবে। কিন্তু চোখ তুলতেই রানীর আয়ত চোখদুটিকে সে দেখতে পেল। কিছু ভাবছেন তিনি।

রানী বললেন, 'শুনেছি বেহার-রাজের নিজের আদালত আছে'।

দেউড়ির পেটাঘড়িতে ঘণ্টা পড়ল দশটার। এমন সময়ে মোক্ষদা-ঝি এসে বলল, 'রূপচাঁদকাকা গেছেন বরকন্দাজ নিয়ে'।

রানী শুনে বললেন, 'আচ্ছা, মোক্ষদা'।

মোক্ষদা দাঁড়াল না।

রানী একটুপরেই আবার বললেন, 'তুমি কি আজকাল তেমন বই পড়ো না? বই কি তেমন আসছে না'?

'আসছে'।

'বই-টই আনতে কি তুমি এর মধ্যে কলকাতায় যাবে'?

'তেমন স্থির করলে জানাব আপনাকে'।

হরদয়াল কান পেতে শুনল কোথাও একটা ঘড়ি টিকটিক করছে। একে প্রতীক্ষা ছাড়া আর কী বলা যাবে? কিন্তু এখনই তো একটা নির্দিষ্ট মতও প্রকাশ হল রানীর।

বললেন রানী আবার, 'আচ্ছা, রাজকুমারের বিয়ের কথা আর কী ভেবেছ'?

রানীর কি মুখ নিচু করলেন? হরদয়ালকে কি বিচলিত দেখা গেল?

হরদয়াল ভাবল ইতিপূর্বে রানী দুবার দু-রকম সুরে বলেছেন নয়নতারা সঙ্গে থাকাতেই ভাবনা। যেন ভাবনাটা দু'বারে দু'জনের জন্যে। কিন্তু এসবই কি প্রতীক্ষাকে অচঞ্চল রাখতে বলা?

সে বলল, 'আপনি হুকুম করলেই চেষ্টা করব। সে-ই পাত্রীই, যদি সে ইতিপূর্বে পাত্রস্থ না-হয়ে থাকে'।

রানী বললেন, 'না'।

তাঁর ঠোঁট দুটিতে হাসি হাসি ভাবটাই রইল, কিন্তু এই এক বর্ণের শব্দটা গোটা একটা বাক্যের মতো ভারি শোনাল। কিন্তু প্রসঙ্গান্তরে গেলেন তিনি, বললেন, 'তোমার তত্ত্ববোধিনী আর সোমপ্রকাশ পত্রিকাগুলো পড়া হয়েছে। নিয়ে যেয়ো। তোমার বইয়ের ঘরে কি একজন দপ্তরি দরকার'?

হরদয়াল বলল, 'দরকার হলে জানাব'।

ততক্ষণে রূপচাঁদের দল ফরাসডাঙা পেরিয়ে বনে ঢুকেছে। হাঁপাচ্ছে তারা দৌড়ে এসে। ছুটতে ছুটতেই ভাবছিল রূপচাঁদ : যে মাহুতই হোক সে চওড়া পথের দিকে আসবে, অন্তত আন্দাজে দিক ঠিক করে। ভয় আর-এক, 'বিলে গিয়ে না-পড়ে। সুতরাং পুরনো নদীর পার ধরে, তারপর নদীব পুরনো শুকনো খাতের ডান পারে যেতে হবে। কিন্তু আলো এনে কী হয়েছে যদি-না হাতির সওয়ার তা দেখতে পায়? বনে ঢুকলে ঘাসবন মানুষের মাথা ছাড়িয়েই উঠবে। আলো দ্যাখে কে?

সে হনহন করে চলতে চলতে বলল, 'আলো দেখানোর কি বলা'?

একটা গাছের কাছে এসে তার খেয়াল হল। একজন বরকন্দাজকে সে বলল, 'ওঠো এই গাছে। গাছে-গাছে আলো রাখা যাক'।

যে-কথা সেই কাজ। ত' দেখে বলা বলল, 'মন্দ না। আধকোশ জুড়ে গাছে-গাছে বেড় দিলে কোনো-না-কোনো আলো দেখবে হাতি আর সেদিকে কেটে উঠবে। তাছাড়া, ধবো, সেই বেড়ের কেউ-না-কেউ হাতির ঘণ্টা শুনবে'।

ঘাসবনের মধ্যে ডুবে ডুবে মানুষ কয়েকটি রাস্তার অসমান লেশমাত্র ধরে ছুটে চলল। ঘাসেই হাত-পা কাটছে, কাঁটায় কী হচ্ছে বলা বেশি।

অবশেষে বলাও এক গাছে চড়ল আলো নিয়ে। রূপচাঁদ একা ছুটল তখন। আর কিছুক্ষণ ছুটেই তার মনে পড়ল সে একা। এই মানুষ-ডোবা ঘাসবনে সে এমন একা যে মনে হয় দু-দশ ক্রোশে দ্বিতীয় প্রাণী নেই। আর এই তো পুরনো নদীর খাত, আর পার, আর চরা, আর এখানে কি সেই আদিকাল থেকে লাখ মানুষ দাহ হয়নি! নিজের ঘামেই পিরহান ভিজে ঘাসবনের ওম সত্ত্বেও তার শীত লেগে গেল। পায়ের তলায় একটা শক্ত ঢেলা লাগতেই মড়ার মাথার খুলি এই বিশ্বাস হল। সে আতঙ্কে চিৎকার করে দৌড়ল।

রাজু বলল, 'আচ্ছা বাঁদর তো, গাছে কেন'?

গলাটা রাজকুমারেরই বটে। রূপচাঁদ দেখল হাতিটা গাছের নিচেই দাঁড়িয়েছে। মাহুত বলল, 'ওখান থেকেই নামো রূপুদা হাতির পিঠে'।

রূপচাঁদ বলল, 'তা যদি ঝুপ করে পড়ি, তোমার হাতি ভয় পাবে না তো'?

মাহুতের হাতে লণ্ঠন ধরিয়ে দিয়ে রূপচাঁদ ডাল দুলিয়ে ঝুল খেয়ে নামতে গিয়ে পলকা ডালটা ভেঙে থেবড়ে পড়ল। মাহুত অন্য হাত বাড়িয়ে না-ধরলে নিচেই পড়ত।

রাজু বলল, 'একেবারে বাঁদর'।

রূপচাঁদ হেসে বলল, 'হনুমান, হুজুর। হাতি কিন্তুক ছুটে চলুক আলোর বেড় বরাবর'।

হরদয়াল ভাবল : রানী বলেছিলেন, নয়ন সঙ্গে থাকাতেই ভাবনা। তারপব বললেন কলকাতা যাওয়ার আর রাজকুমারের বিয়ের কথা। এগুলি কি রানীর মনে পরস্পব সংবদ্ধ? বলা যায় এখন তেমন সময় যখন রানী আশঙ্কায় সম্ভব-অসম্ভব সব অমঙ্গলকে যাচাই করে দেখছেন।

ঠিক এমন সময়েই দেউড়িতে এবং তারপরে বারমহলে হরদয়ালের চিন্তাকে ছিন্ন করে কলরব শোনা গেল, এবং তার মধ্যে হাতির ঘণ্টাও।

আগে হরদয়াল এবং পিছনে রানী বারমহলের দরজার দিকে এগোলেন।

হরদযাল দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, রানী কিছু পিছনে দালানের একটা দেয়ালগিরির নিচে।

তখন হাতি থেকে নেমেছে বাজু। আলোতে বোঝা গেল তার স্যুটেব এখানে-ওখানে কাদা শুকিয়ে আছে।

নয়নতারার কথা জিজ্ঞাসা করা কি উচিত হবে? ভাবল হরদয়াল।

ততক্ষণে বাজচন্দ্র এগিয়ে গিয়েছে। রূপচাঁদ তার শিকারের সরঞ্জাম নামাচ্ছে। রাজু রানীর কাছাকাছি যেতেই তিনি বললেন, 'এ কী রে? এত কাদা'?

রাজু হেসে বলল, 'বাহ্, কুমির তো কাদাতেই থাকে'।

রানী যেন একটু চমকালেন। তাঁব মুখ কিছু বিবর্ণ হল। কিন্তু তখনই বললেন, 'আচ্ছা হরদয়াল'।

বিচক্ষণ হবদয়াল তখন নিজের কুঠিব দিকে চলতে শুরু করল।

রাজুকে বললেন রানী, 'তুই জামাকাপড ছাড়, রাজু, আমার ঘরে তোর খাবার দেব'।

রানী আর দাঁড়ালেন না। রূপচাঁদকে নিযে বাজু নিজের মহলেব দিকে এগিয়ে গেল।

বাইরের জামাজোড়া ছেড়ে হবদয়াল বালাপোশ নিল। ঘড়ি না-দেখলেও বলা যায় এখন অনেকটা বাত হযেছে। কী কববে সে এখন? রানী ডেকে পাঠানোব আগে সে চিন্তা করছিল। তার কলকাতার বন্ধু চিঠি লিখেছে। তা থেকেই চিন্তাটা। এখন কি সে-চিন্তাই করবে। রাজকুমারের বিয়ের কথাই যেন। সে একবার চারদিকেব বইয়ের আলমারিগুলোর দিকে চাইল। রাত্রিব একটা এই কৌতুক যে এই লাইব্রেবি-ঘরে সময় যেন মন্থবগতিতে চলে।

কখন কোন সূত্রে কোন চিন্তা আসবে বলা যায় না। হরদযাল যেন একটা মৃদু সুবাস পেল। তাকে নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করা যায় না, উৎসটাও বোঝা যায় না। নিশ্চয়ই স্মৃতি।

হরদয়ালের হঠাৎ মনে হল : এই লাইব্রেরির অধিকাংশ বই রানীর উপহার। অর্থাৎ বই সে-ই কিনেছে বটে, টাকাটা দিয়েছে স্টেট, রানীর ইচ্ছা। আজ সকালেই সে একবার নিজেকে বলছিল, আর কত? এমন হচ্ছে দু'একখানা পড়া না-হয়েই শেলফে উঠছে।

বালাপোশটাকে বাহুর উপরে গুটিয়ে আলমারি থেকে সে একখানা বই টেনে নিল।

কিন্তু সবসময়ে ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। বইটা খুলবার আগেই চাকর এল, পিছন পিছন বাবুর্চি। বাবুর্চি-চাকরের সংসার তার। চাকর জিজ্ঞাসা করল গড়গড়া দেবে কিনা। বাবুর্চি জানাল নদীর ধার থেকে ভালো রুই পাওয়া গিয়েছে। ভাজা হয়েছে।

সামনের দেয়ালঘড়িতে রাত এগারোটার কাছে এসেছে। হরদয়াল হেসে মাথা নাড়ল। বাবুর্চি টেবিল গোছাতে গেল। অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। এমন দেরির কথা ভাবাও যায় না।

হরদয়াল লক্ষ্য করল, চাকর তার পাশেপাশে চলতে-চলতে হাসছে। সে যেন কিছু বলতে চায়।

'কিছু বলবে'?

'বাবুর্চি বলছিল, হুজুর'।

'কী'?

'নতুন মাস্টারমশাই নিউাগবাবু নাকি বাবুর্চিকে জিজ্ঞাসা করেছেন সে কী জাত'?

'তাতে হাসির কী হল'?

'ওই মগটাকে নাকি ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন'।

'আচ্ছা'?

'বাবুর্চি বলছিল সে নাকি প্রকৃতপক্ষে মুসলমানই ছিল, যদিও নমাজ পড়ে না। জিজ্ঞাসা করছিল এতদিন পরে নমাজ পড়লে আপনি রাগ করেন কিনা'।

হরদয়াল হো-হো করে হেসে উঠল খাবার ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিন্তু পরের দিনই হরদয়াল চিন্তা করার অবসর পেয়েছিল।

এখন সন্ধ্যা হচ্ছে। হরদয়ালের কুঠির বারান্দায় কাঠের মিস্ত্রি তার সরু র‍্যাঁদাটা তুলে মাথায় ঘষে নিল একবার। তাতে নাকি র‍্যাঁদা আরো তেলালো হয়। দু'বার ঘষে ফুঁ দিয়ে র‍্যাঁদায় ওঠা গুঁড়ো কাঠ ঝেড়ে ফেলল মিস্ত্রি। আব তখন সুগন্ধটা পাওযা গেল কাঠের। আসবাবটা এমন কিছু মূল্যবান নয়, একটা বুকশেল্ফ। কিন্তু যত্ন দেখে মনে হচ্ছে তা হাতির দাঁতের।

সকালেও হরদয়ালের কুঠির বারান্দায় ছুতোর মিস্ত্রি কাজ করছিল। রোদটা তখন সরে গিয়েছে, ওমটা আছে। চেয়ারে হরদয়াল। তার বাঁদিকে আলবোলা। আলবোলার সম্মুখে তেপায়ার উপরে কাগজপত্র যা ল-মোহরার গৌরী রেখে গিয়েছে।

সকালে গৌরী এসেছিল মামলার কাগজপত্র দিতেই। মুখে বলেছিল মামলাটা মরেলগঞ্জের মনোহর সিং-এর বিরুদ্ধে। ট্রেসপাস। মনোহর তার এক্তিয়ারের বাইবে গিয়ে রাস্তা তৈরি করছিল। এটাকে বলা যায় সাধারণ দপ্তর থেকে আইন-দপ্তরে ফাইল আসা। হরদয়াল বলেছিল—মামলাটার কী দরকার হল? আচ্ছা, রেখে যাও।

কিন্তু গৌরীর আসল বক্তব্য ছিল যেন এবারে রানীমার জন্মতিথি উৎসবে কাছারির কর্মচারীরা এবং তাদের বন্ধুবান্ধব মিলে একটা নাটক করতে চায়। নায়েবমশায়কে অনুরোধ করেছে। এটা তো যাত্রা নয়, নাটক—আধুনিক ব্যাপার। কাজেই হরদয়াল নিজে একটু সমর্থন না-করলে নায়েবমশায় রাজি হবেন না। হরদয়াল হাসিমুখে তাকে আশ্বাস দিয়েছিল।

এখন হরদয়ালের গায়ে মটকার গলাবন্ধ কোট। চুনোট করা ধুতির কালো পাড় তালতলার চটির উপরে। সে বৈকালিক ভ্রমণ শেষ করে ফিরেছে। তার চাকর জুতো নিয়ে চটি দিয়ে গিয়েছে। আলবোলা নিয়ে ফিরবে।

রানীমার জন্মতিথি? গৌরী চলে গেলে হরদয়াল চিন্তা কবেছিল। এবার কি একটু আগে? তা অসম্ভব নয়, তিথি অনুসারে চলে ; কখনও এগোয় কখনও পিছিয়ে যায়।

কিন্তু গৌরীর পরেই সকালেই হরদয়াল সদর-নায়েবকে দেখেছিল। কাছারির থেকে যে-রাস্তাটা তার কুঠির দিকে তার উপরে সদর-নায়েবকে দেখে সে ভৃত্যকে ডেকে চেয়ার দিতে বলেছিল। এমন নয় যে নায়েব মাঝে মাঝেই হরদয়ালের কুঠিতে আসেন, সুতরাং নায়েবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে হরদয়ালের কৌতূহল হয়েছিল।

হরদয়ালকে অবাক করে নায়েবমশায়ও নাটকের কথাই তুলেছিলেন। খুব মুশকিল তাঁর। নাটক কারে কয়? ছোকরারা খেপে উঠেছে। হরদয়াল হেসে ফেলেছিল। আমাদের দেশে যাত্রা, অন্য দেশে নাটক হয়। এতে আর মুশকিল কী—এই বলেছিল সে হেসে। কলকাতায় হচ্ছে।

—ও বাবা, না-করে থামছে না দেখছি। কিন্তু সে তো শুনি অনেক খরচ। মঞ্চ না কী-একটা করবে। নরেশও এর মধ্যে আছে। নায়েব বলেছিল।

হরদয়াল বলেছিল—তা, দিন না মঞ্জুরি।

নায়েব উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ বললেন—ভালো কথা, নরেশের কথায় মনে হল, ও তো দেখছি ক্রমে এ-কাজে ও-কাজে জড়িয়ে পড়ছে। কাজ শেষ হবে কবে? ওদিকে সুরেনও। আমার তো মনে হয় ওদের বাবদে একটা পৃথক হিসাববই খোলা দরকার। আজ গেট করে তো কাল সড়ক, সড়ক ছাড়ে তো রাজবাড়ি। তা করতে আবার এক খাবোল অন্য সড়ক।

—তা মন্দ কী? নতুন কাজ পুরনো কাজ মিলে তো পরিমাণ কম নয়।

নায়েব হাসল—মাঝে মাঝে মনে করি একটা আলাদা বিভাগ তৈরি করে দিই। নরেশ কাজ করবে। হিসাবের জন্যও না-হয় একজনকে দেওয়া গেল। কিন্তু তারা যে ঠিকঠাক কাজ করছে তা অন্তত মাসে একবার দেখা দরকাব। মাপজোখের উপরে মাপজোখ আর কি। কিন্তু দেখে কে? আমি কি সি এফটি বুঝি? যতদিন অন্য ব্যবস্থা না-হচ্ছে আপনার পক্ষে কি একটু দেখা সম্ভব হয়?

—আমাকে ভার নিতে বলছেন?

—যদি সম্ভব হয়।

হরদযালও উঠে দাঁড়িযেছিল।

নায়েব বললেন—আপনি রাজি হলে রানীমার অনুমতি চাইব।

হরদয়াল কী একটু চিন্তা করল, বলল—আপনি বললেই হবে। রানীমা পর্যন্ত যেতে হবে কেন?

তারপরে নাযেব মামলার কথায় গিয়েছিল। কাগজপত্র দেখেছেন নিশ্চয়। ও-পক্ষ একেবারে চুপচাপ। যেন রাস্তা কাটার ব্যাপারটা সম্বন্ধে ওদের ভাবনা চিন্তা এখনও শেষ হয়নি।

হরদয়াল তখন বলেছিল—গৌরী বলছিল ট্রেসপাসের প্রমাণ গোছাচ্ছে সে।

নায়েব বলেছিল—প্রমাণ হোক তা নয়, কিংবা সেটা মরেলগঞ্জের লীজভুক্ত জমি এবং লীজে এখানে-ওখানে রাস্তাঘাট তুলবার শর্ত ছিল। নাকি ফৌজদারিতে যেতে চাইছেন না? তাহলে ওরাই এগোবে? হরদয়াল বলেছিল—দেখি ফাইলটা।

তখন আর কথা হয়নি। নাযেবমশাই তিন বিষয়ে বলেছিলেন। কোন উদ্দেশ্যে দেওয়ান-কুঠি পর্যন্ত আসা তা কি বোঝা গেল? তা কি মাঝখানে যা বলেছিলেন? এখন সন্ধ্যা হচ্ছে। মিস্ত্রি কাঠগুলোকে গুছিয়ে তুলল। উঠে দাঁড়াল, তাতেই যেন সন্ধ্যার সূচনা হল। কাজটাকে গুটিয়ে তুলতে তুলতেও মিস্ত্রি তা যেন চোখের সম্মুখে মেলে দেখল। তা থেকে হরদয়ালের মনে হল, সৌন্দর্যসৃষ্টি নাকি? পরখ করে দেখছে? লোকটি রোজই কাজ করে, কিন্তু তার মধ্যে টাকা উপার্জনের বাড়তি কি কিছু থাকে?

রাজকুমারের ঘরেব আসবাবপত্র করার জন্য লোকটিকে গত বছর আনানো হয়েছে। নরেশ চিনত। তারপর থেকে কাজেব পর কাজ চলেছে। জাতে চীনা। ইতিমধ্যে একটি স্থায়ী ঘরও জুটেছে, রাজবাড়ির মালীদের ঘরের একটি। লোকটি অভ্যাসবশে হয়তো ডিজাইন তুলে যায়, কিন্তু অন্য অনেকে তার মধ্যে সৌন্দর্য আবিষ্কার করে। মৌমাছির মতো নাকি? কয়েকদিন আগে সে এক বইয়ে পড়েছিল : 'মৌমাছি গান করে না। কর্মব্যস্ততায় সে উড়ে বেড়ায়, তার পাখা কাঁপে, মানুষ তাতে গুঞ্জরণ আবিষ্কার করে।

কিন্তু দ্যাখো, এই লোকটিকে এনেছে নরেশ, অনুরূপভাবে নরেশকে এনেছিল সে নিজে। গত সনের সেই মেরামতির জন্য। নরেশের কাজের সুখ্যাতি হয়েছে।

সকালে গৌরী ও নায়েবমশায় চলে গেলে হরদয়াল ব্রেকফাস্টে বসেছিল। আর তখন সে নরেশ সম্বন্ধে চিন্তা করেছিল।

হরদয়াল তাদের মতো নয় যারা ব্রেকফাস্ট না-করে পৃথিবীর মুখ দেখে না। এ কি তার আহার-বিলাসের ফল? অথবা কোনো ব্যাপারেই তাড়াতাড়ি করে কী হয়, 'এ রকম এক মনোভাব থেকে ব্রেকফাস্টের ব্যাপারে ঢিলেমি? ওদিকে কিন্তু টেবিল দেখলে মনে হবে ভৃত্য-বাবুর্চির সংসারের পক্ষে তার ব্রেকফাস্টের ব্যাপারটা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

একটা জানলার পাল্লা খোলা। খানিকটা রোদ টেবিলে এবং সেখান থেকে রুপোলি প্লেট চামচের গায়ে মাখামাখি করছে। পাশের জানলার কাঁচ থেকে রঙিন আলো মেঝের উপরে একটা রঙিন আয়তক্ষেত্র তৈরি করে ফেলেছে। রোদে পিঠ রেখে হরদয়াল ব্রেকফাস্টে বসেছিল।

সে বাদামযুক্ত হালুয়া দিয়ে ব্রেকফাস্ট শুরু করে ভাবতে শুরু করল। কী যেন? ও, সে নরেশের কথা ভাবছিল। ভদ্রলোকের নাম নরেশ পান। তিন মাসেব কড়াবে আনা হয়েছিল। মিলিটারি-কনট্রাক্টরের এক ফার্মে এবং কখনও কখনও ফোর্ট উইলিয়ামে সবকারি এঞ্জিনীয়ারের অধীনে কাজ করত। এ-কাজটা তো নরেশের কুলকার্য নয়। চাষবাস করত। তারপর একসময়ে সে কী ক'রে-বা এইসব কাজে যুক্ত হয়। এখন এ-বিষয়ে কিছু লেখাপড়া না-করেও সে প্রায় ওস্তাদ শ্রেণীব একজন হয়ে উঠেছে। লেখাপড়া নয়ই-বা বলছ কী করে, কাগজকলমে নকশা, এস্টিমেট প্রভৃতি করতে শিখেছে। রাস্তাঘাটের কাজে যদি সুরেন, বাড়িঘরের কাজে তবে নরেশ। কোথাকার বীজ কোথায় উড়ে এসে পড়ে গাছ হয় দ্যাখো। এটাও কিন্তু কৌতুকের—তুমি বলতে পাবো না নরেশ আছে বলেই মেরামতের কাজেব বাইরে নতুন কাজ হচ্ছে, কিংবা নতুন কাজ করানো হবে বলেই তাকে রাখা হচ্ছে।

আগে প্রতি বছরেই রাজবাড়ির রং মেরামত ইত্যাদির কাজ হতো। গ্রামের গহরজান মিস্ত্রির পরিবারের পুরুষরা কাজ করত। কখনও মুর্শিদাবাদ থেকে তাদের আত্মীয়স্বজন কাজের খোঁজে এলে যেন তাদের সুবিধার জন্যই কাজ করা হতো। আজ থেকে তো মনে হচ্ছে নবেশ ও সুরেন পাকাপাকি থেকে যাচ্ছে। হয়তো কথাটা পূর্তবিভাগ না-হয়ে বাস্তুবিভাগ হলে মানাত। একটা বিভাগ যখন হয় তখন ধরে নিতে হবে অন্তত বেশ কিছুদিনের জন্য তা হল।

এবং তার ভারটা আজ থেকে এসে গেল যেন তাব নিজের দপ্তরে। আজ থেকেই। ওটাকে হুকুমই বলতে হয়। যদি তার চারিদিকে খুব নরম কিছু থেকে থাকে তবে তা নায়েবের কথা বলার কায়দা। হরদয়ালের ঠোঁটে মৃদু হাসি খেলা করে গেল। অথচ তুমি কায়দাটাকে ধরতে পারো না। কিন্তু এতদিন?

তখন ব্রেকফাস্টের টেবলের পাশে দাঁড়িয়ে তার ভৃত্য, দরজার কাছে বাবুর্চি।

হরদয়ালের হাতে চামচটা দুললো। যেন সে মিষ্টিটা পছন্দ করছে। কিন্তু চামচটা রেখে সে বরং কফির পাত্রটা টেনে নিল।

এটা কি অস্বীকার করা যায়, ভাবতে গিয়েও গলা সাফ করতে হল, নায়েবই কিছুদিন আগে তার অধস্তন কর্মচারী ছিল।

তাই তো, আজ যেন, আজই প্রথম যেন, প্রমাণ হয়ে গেল নরেশের এই ব্যাপারটায়, 'যে নায়েব একসময়ে শুধুমাত্র নায়েবই ছিলেন, এবং তখন হবদয়াল ছিল দেওয়ান।

ব্রেকফাস্টের কফিটা শেষ করে যে-জানলায় বৌদ্র আসছিল তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেন দিনটার কী রং তা দেখলে বিস্ময়টা কাটবে। নিশ্চিতই আকাশে মেঘ নেই কিংবা ঝোড়ো হাওয়াও বইছে না যে দিনটাকে গতকাল যা ছিল তা থেকে ভিন্ন দেখাবে।

সে এ-সময়ে, ব্রেকফাস্টের পরেই কাজ করে। জানলাটা থেকে সরে এসেছিল সে। লাইব্রেরিতেই তো। সে লাইব্রেরিতে ঢুকেছিল। ফাইলটা দিয়ে গিয়েছে গৌরী যাতে নায়েবেব মন্তব্য আছে মামলা সম্বন্ধে। পাশের দরজা দিয়ে ভৃত্য গড়গড়া নিয়ে ঢুকে চেয়ারের পাশে নির্দিষ্ট জায়গায় রেখেও গেল।

তখন বেলা দশটা হবে।

সম্মুখে ডেস্কের দিকে চেয়েছিল সে। সমতল অংশটার উপরে অনেককিছুই তো। একটা সুদৃশ্য ট্রের উপরে সকালের আসা ডাক তখন। চরণদাস নিজেই দিয়ে গিয়েছে। আর তখনই সে ম্যানিলা রঙের খামটাকে এবং তার উপরের ঠিকানার হরফগুলোকে লক্ষ্য করেছিল।

এখন এই সন্ধ্যায় সে তো আবার লাইব্রেরির সেই ডেস্কের সামনে। উজ্জ্বল টেবল ল্যাম্পের আলোয় একটু দ্বিধা করে সেই চিঠিখানাই হাতে নিল। চিঠিখানা তার বন্ধুর। খুলবার আগেই সে ভাবল কোনো কোনো কাজে কেমন করে যেন বাধা পড়ে যায়। বন্ধুর আগের চিঠিটার জবাব এখনও দেওয়া হয়নি। কাল রাত্রিতে একবার সে ভাবতে বসেছিল এ-বিষয়ে। কিন্তু বানী ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

চিঠিখানা খুলল সে। পুবো নোটশীট, কিন্তু বন্ধুর চিঠি সাধাবণত যত বড় হয় তেমন নয়। হরদযাল পড়ল। বন্ধু লিখেছে : তার আগের চিঠির (যার জবাব সে পাযনি) অনুসৃতিতে সে সানন্দে জানাচ্ছে পৃথক প্যাকেটে শেকসপীযর পাঠানো যায়। এক সিভিলিয়ান প্রমোশন-প্রাপ্ত ও অন্যত্র স্থাপিত হওয়ায় ফার্নিচার ইত্যাদিসহ হস্তান্তর করে। সুতরাং মবোক্কো বাঁধাই হলেও রিবে মালিকের নাম ঘযে তোলা। পৌঁছনো মাত্র প্রাপ্তিসংবাদ দেবে। পুনশ্চ বলে সে জানিযেছে, বিশ্ববিদ্যালয়-মহলে খোঁজখবরে জানতে পারা গেল ডান্ নামে (লক্ষ্য করবে ওটা ডান্) এক কবি ছিল বটে। কিন্তু ইংরেজি ভার্সে লিখিত হলেই কবিতা হয় এমন নয়। মিলটনেব পরে তো বার্নস, ব্লেক, মধ্যে আব কবি কে? লন্ডনের পাবলিশার্স ও স্টেশনার্সদের ঠিকানা পাঠালাম। ১৮৫৮ ও ১৮৫৯ প্রকাশিত দশখানি বই তোমার টাইমসের সাপ্লায়ার রোজাব গুনের কাছে আছে।

চিঠিটা যত্ন করে খামে পুবল সে আবার। একটা প্রশান্ত তৃপ্তি যেন অনুভব করল হবদয়াল। তাই বলে সে তো ডাকঘরে খোঁজ নিতে যেতে পারে না। বইয়ের প্যাকেট পৌঁছনোর একঘণ্টাব মধ্যেই তার হাতে নিশ্চয় আসবে। বাঁ হাতটা উঁচু কবে তার উপবে গাল রেখে সানন্দ দৃষ্টিতে বইয়ের শেল্ফগুলোর দিকে চাইল সে।

কিন্তু আজ সকালেও চিঠি লেখা হয়নি। অর্ধসমাপ্ত চিঠিটাকে সরিয়ে রাখতে হয়েছিল, কারণ বাগচী নিজে এসেছিল স্কুলের বিষয়ে আলাপ করতে। একটা সমস্যাই যেন। তাও এক চিঠি নিয়ে। চিঠিটা পেয়ে বাগচী বাব দুয়েক পড়েছে, যাকে বলে তার উপবে ঘুমিয়েছে। কিন্তু এখনও কর্তব্যটাকে সে স্পষ্ট দেখতে পায়নি। এদিককার বিদ্যালয়-পরিদর্শক এতদিনে যেন এই বিদ্যালয়ের সংবাদ পেয়েছেন। এবং তিনি বিদ্যালয়টিকে পরিদর্শন করতে বাসনা করেছেন। এটা তাঁর সরকারি কর্তব্যও বটে। তিনি বস্তুত লিখেছেন : ইহা আমার কর্তব্য বলিয়া বোধ করি যে যত শীঘ্র সম্ভব আপনার বিদ্যালয় পরিদর্শন করা হয়।

বাগচী বলেছিল—উনি এসে পড়তে পারেন, তার আগেই জবাব যাওয়া দরকার। নতুবা লাঞ্চের পরে আসতাম।

হরদয়াল চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—বাগচীর মত কী? এতে কি স্কুলের লাভক্ষতি কিছু আছে?

বাগচী বলেছিল—কারো-কারো মতে যেমন নিয়োগীমশায়, এ-সুযোগ ছাড়া উচিত হবে না। স্কুল সরকারের নজরে পড়লে তার মর্যাদা বাড়ে।

—তা কি শিক্ষক অথবা পাঠক্রম নির্বাচন, অথবা সরকারি গেজেটে আসা এবং আর্থিক আনুকূল্য?

—নিয়োগী বলেন সবই হতে পারে। সব স্কুলই তাই চায়।

—এখনই শেষ কথা বলা কঠিন। যে সুবিধা দেয় তার পক্ষে নিজের মত চাপাতে চাওয়াও অসম্ভব নয়।

—নিয়োগী বলেন, শিক্ষার ব্যাপারে যাঁরা কর্ণধার শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের মতামতের নিশ্চয়ই মূল্য আছে। এবং এই শিক্ষাধারাই ইংরেজ জাতকে মহৎ করেছে, আমাদের দেশের কুসংস্কার দূর হচ্ছে।

—ঠিক তাই। হেসে বলেছিল হরদয়াল—এর একটাও আপনার নিজের মত নয়। আপনি হয়তো বৃহত্তর মঙ্গল চিন্তা করে নিজেব মতকে কুণ্ঠিত করে রাখছেন। কিন্তু আমি জানি, ঠিক এখন আপনি যা ভাবছেন তা ভাষাশিক্ষাকে অন্তত তার ব্যাকরণ ও বানানকে কম মূল্য দিতে, যা কলকাতায় গ্রাহ্য হবে না। নিষেধ করে দিন।

বাগচী চলে গেলেও চিঠিটায় আর হাত দেওয়া হয়নি। এখন আবার সন্ধ্যা পার হচ্ছে। ছুতোর মিস্ত্রি চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই সে লাইব্রেরির এই আরামকেদারায় এসে বসেছে। এখন কি সে ডায়েরি লিখবে? দু-তিন দিন তা হয় না। কিংবা বন্ধুর চিঠি দুটির উত্তর?

হরদয়াল উঠে পাশের ঘরে গেল। প্রভিশনের আলমারি খুলে মদের বোতল এবং গ্লাস নিয়ে লাইব্রেরিতে ফিরল। গ্লাসটা লম্বা, সরু, গায়ে কাচের মধ্যে সাদা রঙে একটা লতার মটিফ। হরদয়াল নিজের অজ্ঞাতেই যেন হাসল ডেস্কের উপরে বোতল আর গ্লাস পাশাপাশি রেখে।

ডায়েরির মরোক্কো বাঁধাই মলাটের উপরে লিখবার প্যাড। প্যাড আর ডায়েরির মাঝখানে সেই অর্ধসমাপ্ত চিঠিটাকে পাওয়া গেল যা সে বন্ধুকে লিখতে শুরু করেছিল কাল।

হরদয়াল বোতল থেকে তার লম্বা গ্লাসটাকে ভরে নিল। এবার বন্ধুর আগের চিঠিটাকেও বার করল। হ্যাঁ, সেই চিঠিতেই বন্ধু জানিয়েছিল সে গত একমাস মদ্য স্পর্শ করেনি। আশা প্রকাশ করেছিল হরদয়ালও ইচ্ছামাত্র সে-রকম পারবে। একেবারে নতুন নয় সংবাদ। হরদয়াল তার কলকাতার অভিজ্ঞতা থেকে জানে সেখানে মদ্যপান নিবারণ নিয়ে কথা উঠেছে বটে।

হবদয়াল চিঠিটা হাতে ধরেই গ্লাসটাকে ঠোঁটে তুলল। দ্যাখো কাণ্ড, এই বলবে যেন সে, ইচ্ছামাত্রই কি সব কাজ হয? কিন্তু বন্ধুর চিঠির এটা জবাব নয়, বরং ডায়েরিতে লিখবার মতো কিছু।

ডায়েরি কেন লেখা হয়? এর সহজ উত্তর আছে। ডায়েরিতে দিনে কতবার মিথ্যাভাষণ হল, কতবাব লোভ থেকে ত্রাণ পাওয়া গেল, কতবার-বা ঈশ্ববের গুণগান করা হয়েছে তা লেখা থাকে। হয়তো-বা একসময়ে চারিত্রিক উন্মেষের সহায়ক হিসাবেই হরদয়াল ডায়েরি রাখতে শুরু করে থাকবে। এখন? ইচ্ছামাত্রই মদ ছাড়বে এমন চারিত্রিক দৃঢ়তা কি তার আছে আর? তেমন ইচ্ছাই কি হবে?

একসময়ে কলকাতার সত্যনির্ভর ইংরেজিনবিশ ছাত্রদের মতো সে হয়তো সব অবস্থাতেই সত্য বলত। সেই যে গল্প আছে যে তেমন একজন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : তুমি মদ খাও, 'সে বলেছিল খাই', জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : অসৎ স্ত্রীলোকের বাড়িতে যাওয়া-আসা করো, 'সে বলেছিল, করি'।

রানীমার জন্মতিথির উৎসবটাই ধরো। হঠাৎ একটা চালু হয়েছিল কিছু-একটাকে ঢাকতে। এখন সময়ের হিসাবে দূরে এসে স্পষ্ট করেই বলা যায় সত্যকে গোপন রাখতে। বিপদ্‌মুক্তির জন্য রানী কালীপূজা করবেন। বাৎসরিক কালীপূজার কয়েকদিন পরেই কালীপূজা। সেটা অনভিপ্রেতভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তাই বলা হল রানীমার জন্মতিথি। কেউ কি জানে সেটা সত্যিই কারো জন্মতিথি কিনা? সে কি বলতে পারে এটা তা নয়? এ-বছরের উৎসবটা এসে পড়েছে। আমলারা সেই সুযোগে নাটক করতে চাইছে।

অন্যমনস্কের মতো গ্লাসটাকে নামিয়ে সে বন্ধুর আগের চিঠিটাকে চোখের সামনে ধরল। আলোটাকে একটু উসকে দিল সে।

বন্ধু আগের চিঠিতে তাকে বলেছিল কলকাতায় যেতে। জানতে চেয়েছিল হরদয়ালের স্কুল কেমন চলছে। নবনিযুক্ত নিয়োগী মাস্টারমশাই যে লোহার মতো খাঁটি মানুষ এ-বিষয়ে আবার আশ্বাস দিয়ে জানতে চেয়েছিল কেমন সে পড়াচ্ছে। সংবাদ দিয়েছিল প্রায় দু'মাস হয় সে মেট্রোপলিটনে অধ্যাপকের পদপ্রাপ্ত হয়েছে। ঘোষণা করেছিল সে গত একমাস মদ্য স্পর্শ করেনি এবং আশা প্রকাশ করেছিল হরদয়াল ইচ্ছামাত্র সে-রকম পারবে। চিঠির পরের অনুচ্ছেদে সে বলেছে গ্রামের রাজসরকারের চাকরি যতই ভালো হোক হরদয়ালের মতো মানুষের পক্ষে কলকাতার বাইরে থাকা আর উচিত হয় না। কেননা

দ্রুতউন্নতিশীল জীবনের পরাকাষ্ঠা রাজধানীতে, তাই রাজধানীর বাইরে জীবন কি অপচয়মাত্র নয়? বর্তমানে হাইকোর্টের বিষয়ে যেরূপ শোনা যায় তাতে ব্যবহারজীবীদের আশাতিরিক্ত উন্নতির সুযোগ আসছে। হরদয়াল কলকাতায় গেলে সে যে অনায়াসে দু'চার হাজার তঙ্কা উপার্জন করবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মনে হয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত, রাজা রামমোহনের পুত্র রমাপ্রসাদ এবং আরো অনেকে কোনো-না-কোনোভাবে হাইকোর্ট স্থাপিত হওয়ামাত্র তাতে যুক্ত হবেন। নতুন জীবনে রওনা হওয়ার মতো সঞ্চয় কি এখনও হরদয়ালের হয় নাই?

হরদয়াল নিজের অর্ধসমাপ্ত চিঠিটাকেও উপরে তুলল আবার। মেট্রোপলিটানে অধ্যাপকের পদপ্রাপ্তির জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিল সে বন্ধুকে। স্কুল ভালো চলেছে। নিয়োগী কিছু পাগলাটে বটে, বোধহয় কার্পণ্য দোষ আছে যার জন্য তিনি গর্ববোধ করেন, কিন্তু পড়ান ভালোই। নিয়োগের পরে আর আলাপ হয়নি। সে জানতে চেয়েছিল এই চার বছরে নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় জনসমাজে কী কী পরিবর্তন সূচনা করেছে।

নিজের কথা সে কিছু লেখেনি। কেন সে গ্রামে থাকে অর্থাৎ দ্রুত ধাবমান কলকাতা শহরের আধুনিক সমাজের বাইরে, কী তাকে গ্রামে আকৃষ্ট করে—এসব কিছু জানায়নি সে। সে কি লিখবে গ্রামের সৌন্দর্য অথবা শান্তির কথা?

বন্ধুর চিঠিটা সযত্নে রেখে দিল হরদয়াল। চিঠি লেখা এখন অন্তত হবে না।

কয়েকটি সত্যভাষণ হল, কযটি মিথ্যাভাষণ হল, ডায়েরি তার হিসাব না-হয়েও অন্য রকমের কিছু হতে পারে। হরদযাল চিন্তা করল আমরা কি নিজের স্বরূপ নিজের কাছে প্রকাশ করি ডায়েরিতে? আত্মজীবনী হতে পারে? যাতে কোনো পোজ থাকে না। হরদয়াল ভাবল পোজ শব্দটার বাংলা কী হবে?

দেয়ালঘড়িতে মৃদু গম্ভীর শব্দ হল। রাত হয়েছে তাহলে। আত্মজীবনীতে নিশ্চয়ই পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধেও সংবাদ থাকে। কারণ মন তো নিরালম্ব নয়।

হরদয়াল উঠল। আবাব আলমারি থেকে নতুন একটা কাঁচের গ্লাস নিয়ে এল। একবার ব্যবহার কবা গ্লাসে আবার মদ নিলে কি স্বাদে তারতম্য হয়?

ডায়েরিতে অন্যের সম্বন্ধেও মন্তব্য থাকে। আত্মজীবনীতেও অন্যের জীবনী এসে পড়ে। এই গ্রামে যদি কারো জীবনের কথা লেখা যায় তিনি নিশ্চয়ই রানী? তাই নয়? অন্যদিকে বন্ধু ভাবছে এখনও সে দেওয়ান। না, সে আর দেওয়ান নয় এ-কথাও বন্ধুকে জানায়নি কেন? এত বড় একটা সংবাদ সে দিতে পারল না কেন? এটা কি একটা পোজ নয়? এই পোজ থেকে মুক্তি ডায়েরি লেখার যুক্তি হতে পারে?

হরদয়ালের চোখের কাছে কি বেদনার চিহ্নের মতো কিছু দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে গেল। হ্যাঁ, সে আব দেওয়ান নয়। আজই কি তা আবার প্রমাণ হল না? তার একসময়ের অধস্তন নায়েবমশায় এখন অনায়াসে সে কী কাজ করবে তাব নির্দেশ দিতে পারেন। এটা কি নিদারুণ লজ্জাব বিষয় বলেই ডায়েবিতে স্থান পায়নি?

ঘটনার কথা মনে আছে তার। সেদিন তখন অনেক রাত হয়েছে। হরদয়াল তার নিজের শয্যায় একখানা বই পড়ছিল। পদশব্দে এবং বোধ করি সুগন্ধেও সে বই থেকে চোখ সরিয়েছিল। রানী স্বয়ং, একা! রাজকুমারের বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে কলকাতার এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। তিনি ফিরে যাওয়ার পরে রানীর নিজের আত্মীয়স্থানীয়া এক মহিলা কিছু লিখেছিল চিঠিতে যাতে রানী অপমানিতা বোধ করেছিলেন। হয়তো কেটের মতো বিদেশিনী সুন্দরীর সাহচর্যে রাজকুমার ভ্রষ্টচরিত্র এরকম ইঙ্গিত ছিল। কারণ রানী বাগচীমাস্টার এবং তার স্ত্রী কেটের গ্রামে থাকা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। হরদয়াল বলেছিল তারা নিরপরাধ। সে বলেছিল এর জন্য রাজকুমারের বিবাহ বন্ধ হতে পারে না। সে এই পাত্রীর সঙ্গেই বিবাহ ঘটিয়ে দেবে। রানী তাকে সেই রাতেই বরখাস্ত করেছিলেন। হরদয়াল শুধু বলতে পেরেছিল আমার স্কুল? রানী তাকে সাধারণ প্রজাদের একজন হয়ে সে-বিষয়ে আবেদন করতে বলেছিলেন। অথচ

সে গ্রাম ছেড়ে যায়নি।

ডায়েরিতে (তা যদি আত্মজীবনীও হয়) অন্যের চরিত্রও ফুটে ওঠে। হরদয়ালের মনশ্চক্ষে রানী যেন ফুটে উঠলেন। কেন এই পদচ্যুতি তা কি সে বুঝতে পেরেছে? রানীকে শেষ যেদিন দেখেছে সে তখন যেমন তাঁকে দেখিয়েছিল তেমনটাই যেন হরদয়াল দেখতে পেল। রানীর মতো এমন চরিত্রই-বা কার এই গ্রামে?

হরদয়ালের মনের কি এটা পলায়ন-প্রবৃত্তি? পদচ্যুতির মতো কঠিন শাস্তি, যা অপমানজনকও বটে তা থেকে সরে আসার চেষ্টা? কিংবা এটা কি এমন যে, যে-রানী সেই শাস্তির উৎস হরদয়ালের মন তার সম্মুখে গিয়ে এখনও বিষয়টাকে বুঝতে চেষ্টা করছে?

বাগচীমাস্টার এ-গ্রামে থাকায় রানীর আপত্তি শুধু সেটুকুই ছিল নিশ্চয় যেটুকুমাত্র তাদের জীবনযাত্রার প্রভাব রাজবাড়িতে প্রবেশ করে। নতুবা তাঁর প্রজারা কে কী ধর্ম আচরণ করে তার জন্য তাঁর চিন্তার কিছু নেই। অর্থাৎ রাজকুমারের উপরে কেটের প্রভাব পড়ছে। কেট বিদেশিনী এবং সুন্দরী। হ্যাঁ, তরুণ মনে প্রভাব রাখতে পারে এমন সৌন্দর্যই বটে তার। রাজকুমারের তরুণ মনকে রূপসীর প্রভাব মুক্ত রাখাই কি রানীর চেষ্টা? রাজকুমার কেটকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল এই জেনেই কি রানীর ক্রোধ? যার ফলে সে আর দেওয়ান নয়?

এদিকে দ্যাখো, কাল রাতে আবার অন্য ভাবনাও উপস্থিত ছিল। দু'বার অন্তত, যদিও হয়তো তা দুই রকমের সুরে, তিনি বলেছিলেন নয়নতারা রাজকুমারের সঙ্গে থাকাতেই ভাবনা। অথচ রানীর প্রশ্রয় ছাড়াই কি নয়নতারা রাজকুমারের সঙ্গী হতে পারত?

রানীর মুখ কী রকম দেখিয়েছিল সেই প্রতীক্ষার সময়ে যখন দু'বার বলেছিলেন নয়নকে নিয়ে তাঁর ভাবনার কথা? সেই আয়ত চোখ দুটির কোলে কি হাসি ছিল? অথবা কি রানীর গালে কিছু টোল খেয়েছিল? একটা আলোর মতোই রানীর মুখটা যেন স্মৃতিতে ধরা দিচ্ছে।

কেন এই প্রশ্রয় নয়নতারাকে তা ভাবতে গেলে কোনো হেতু কি খুঁজে পাওয়া যায়? রানী যা-কিছু করেন তার অনেকটা রাজনৈতিক কৌশল, এ রকম একটা প্রত্যয় আছে। কেটের চাইতেও নয়নতারা কি বেশি সুন্দরী নয়? হয়তো রূপ দুটি দু'রকম, কিন্তু তুমি বলতে পারো না নয়নতারার চাইতে বেশি আকর্ষণীয়া কেউ হতে পারে।

তাহলে এটা কি বুদ্ধিমতী রানীর বিষের ওষুধ হিসাবে বিষ প্রয়োগ করা? এক সুন্দরীর প্রভাব কাটাতে অন্য-এক রূপসীকে পাশে এনে দেয়া। বিষস্য বিষমৌষধম্?

হরদয়ালের মুখে একটা হাসি যেন দেখা দিল। যেন সে ডায়েরিতে মন্তব্য করবে—কিন্তু রানী, খুব হুঁশিয়ার হয়েই এই বিষ প্রয়োগ করা উচিত হবে।

এসবে তার পদচ্যুতির কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বিদেশি প্রভাবেই কি রানীর আপত্তি? বিদেশি প্রভাব কি আলোর ডোমগুলিতে, পর্দাগুলিতে, আসবাবপত্রের অজুহাতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে না রাজবাড়িতে?

রানীর চরিত্রই যেন হরদয়ালের সম্মুখে। আজ সেটাই সবচাইতে মূল্যবান এমন অনুভব করল সে হাসি-হাসি মুখে, যেন সে একজন লেখক যে নিজেই একটা চরিত্র সৃষ্টি করে। তখন তো লেখক অন্য সবকিছু ভুলেও যায়, নিজের জীবনে ক্ষতি কিছু থাকে তাও।

অন্যদিকে ওটাও কি বিদেশি প্রভাব দূরে রাখা? কাল রাতের সেই মুন্সেফি কোর্ট দূরে রাখার অসহায় ইচ্ছাটা ভাবো। কলকাতায় হাইকোর্ট বসবে। এবং দেশের সব আদালত তার অধীনস্থ হবে। হয়তো শেষ পর্যন্ত কোম্পানির আদালতগুলি উঠে যাবে। ছোট-ছোট আদালত স্থাপিত হবে হাইকোর্টের এক্তিয়ারে। রানী চান না তেমন কোনো আদালত গ্রামে স্থাপিত হয়।

মুন্সেফি কোর্ট আসাটা হরদয়াল নিজেও সমর্থন করে। সে এ-ধরনের শাসনবিস্তারে শুভ দেখতে

পায় বইকি।

কিন্তু রানী কী চাইছেন? তিনি কি কল্পনাতেও নিজের আদালত স্থাপনের কথা চিন্তা করেন? করদ রাজ্য বেহার-রাজ্যের আদালতের কথা বলছিলেন না? অন্য কেউ বললে এ-সম্বন্ধে দ্বিতীয়বার চিন্তা করত না হরদয়াল। কিন্তু রানীর লাবণ্য যত কোমল মস্তিষ্ক তেমনই তীক্ষ্ণধার নয় কি? কিন্তু তুমি চিঠি লেখো আর না-ই লেখো, ডায়েরিতে চিন্তাগুলোকে বসাও কিংবা না-ই বসাও রাত হয়ে যায়।

রাত হল বইকি। ইতিমধ্যে ভৃত্য একবার পর্দার ওপারে এসেছিল। দশটা বাজে ঘড়িতে। লাইব্রেরির এটা একটা কৌতুক যে রাতের বয়স কত হল তা এখানে বোঝা যায় না যেন।

বন্ধু তাকে বলেছে কলকাতায় গিয়ে নতুন জীবন শুরু করতে। কলকাতায় কী হয় জানি না, এখানে আমাদের কিন্তু অনেকের বয়স হয়েছে। বয়স হলে তার অতীত থাকে না? অতীতকে কি বিসর্জন দেওয়া যায় সবসময়ে, কিংবা সবটুকু অতীতকে?

ভৃত্য এসে এবার বলল টেবল পাতা হয়েছে।

হরদয়াল উঠল।

লাইব্রেরি থেকে খাবার ঘরে যেতে একটা সরু প্যাসেজ পার হতে হয়। তার একটা জানলা রাজবাড়ির দিকে। চলতে-চলতে কানে এল, মনে হবে যেন জানলার ওপারেই বাজছে। তা সম্ভব নয়। কারণ এটা পিয়ানো এবং রাজকুমার বাজাচ্ছেন। তাহলে বরং এটাই প্রমাণ হয় রাজকুমারের ঘর—যেখানে তিনি পিয়ানো বাজান, তা দেওয়ানকুঠির এই দিকেই।

একটু দাঁড়াল হরদয়াল। ইতিপূর্বেও দু-একবার বাজনা কানে এসেছে তার। বাজকুমার যে বাজান তা সে ভালোভাবেই জানে। প্রতিবাবেই কলকাতায় তাকে স্বরলিপি খোঁজ করতে হয়। বাঃ, ভারি সুন্দর তো! বাজনাটার বৈশিষ্ট্যই যেন জানলার কাছে নিয়ে গেল তাকে। গম্ভীর মধুর কিছু, যেন কিছু বিষণ্ণ। যেন মানুষ যখন চাঞ্চল্যের বাইরে যায় সেই বয়সের সুর। কিন্তু তা হয় নাকি? হরদয়ালের মনে পড়ল এই গ্রামে যারা চল্লিশ হচ্ছে তাদের কথা , সে নিজে, বাগচী, রানীমা। কিন্তু এই গম্ভীর-মধুর ক্লান্ত-সুব কি প্রাণ থেকেই উঠে আসে না? পছন্দ-অপছন্দে মানুষের স্বরূপ ধবা পড়ে। এই সুর অন্তরে অনুভব করার মতো গভীর হয়েছে নাকি রাজকুমার ইতিমধ্যে?

প ঞ্চ ম প বি চ্ছে দ

ঘটনা কী সে-সম্বন্ধে ভিন্ন মত আছে। উপরন্তু যদি কেউ সে-সময়ের দলিল-দস্তাবেজ উল্টে-পাল্টে দ্যাখে তবে তার হঠাৎ অনুমান হতে পারে তখনই তো এক নতুন জাতের সব ঘটনার সূচনা হচ্ছিল গ্রামে। একটা উদাহরণ নাও। কাছারিতে তখন রানীমার জন্মোৎসবের কথাই প্রাধান্য পাচ্ছিল—তা ঠিকই, কিন্তু সেই একরকমের যুদ্ধ, যার অন্য নাম আধুনিকতাও বলা যায়, তার কথাও এসে পড়ছিল।

মূলে সেই রাস্তা কাটার ব্যাপারটাই। সোজা সে-কথা? নাক কেটে দেওয়ার চাইতে কম কিছু? তাও কার? ডানকানের? হতে পারে সে স্কচ, একেবারে ষোলআনা ইংরেজ নয়, তাহলেও সে কি রাজার দেশের লোক নয়? জ্ঞাতি-কুটুম্বদের মধ্যে পড়ে না? অথচ মাথা ফাটল না দু-পাঁচজনের, দু-চারজনের বুকে বল্লম বিঁধল না, এক কথায় রক্তে মাটি ভিজল না। এদিকে নায়েবমশায়ও যেন ব্যাপারটাকে নিজের মনের মধ্যে চেপে রেখেছেন। রাগ (নাকি ক্রোধই বলবে) ছাড়া কী? দারুণ ক্রোধ। নতুবা আলাপ-আলোচনা নেই, কথাবার্তা নেই, শাসানো নেই। লাঞ্চো খেলে তো একইসঙ্গে বসে (না-হয় নায়েব নিজে

খাননি) আর সেই লাঞ্চো থেকে উঠে এঁটোমুখেই হুকুম গেল সড়ক কাটার। এদিকে সব শুনশান। যেন কিছুই নয়। কিছু না-ঘটাই তো একটা ঘটনা।

কারো-কারো মতে এটাই ঘটনা যে ১৮৫৭ শেষবারের মতো ঘটেছে আর ঘটবে না, ঘটনা এটাই যে এখন থেকে নতুনভাবে ঘটবে। এসব লক্ষ্য করেই তারা বলতে পারে : হতে পারে তখনও স্যার বার্নেশ পীকক কলকাতার হাইকোর্টে জমকালো হয়ে বসেনি। কিন্তু এখানে যেন পরে যা-হবে তার সূচনা সেবারই দেখা দিয়েছিল। একটা বড় রকমের পরিবর্তনের সূচনা। তুমি তোমার ধর্মমত, আর্থিক সঙ্গতি এমনকী চামড়ার রং-নিরপেক্ষ অন্য সকলের সমান। এ কি আগে কখনও ছিল? তুমি বিধর্মী হলেই কোণঠাসা, তোমার চামড়ার রং কালো বলেই তোমার কথা মিথ্যা এই-না-এতদিন, পাঁচশো বছর ধরে, হয়ে এসেছে। এখন দ্যাখো সমান হচ্ছে। ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা হবে। এই সমান কথাটা নিয়ে রসিকতা আছে। ফুটপাথে শুয়ে থাকা ধনী-নির্ধনের পক্ষে সমান অপরাধ। সত্যমিথ্যা নিয়েও কম গোলযোগ নেই। প্রকৃতপক্ষে সত্য কি তাই নয় যা প্রমাণিত হল! আর প্রমাণ মানেই হলফ করে বলা কথা।

কথাটা ন্যায়নীতি নিয়ে। ন্যায়নীতির কথায় অবশ্যই কিছু কিন্তু আছে। এ-বিষয়ে নায়েবমশাই ও হরদয়ালের আলাপই উদাহরণ হতে পারে। হরদয়াল বলেছিল—দেখছি জমিটা মূলে ফরাসডাঙার, দখলদার কৃষক শামসুদ্দিন। নায়েব বলেছিল—তাহলেও প্রমাণ হয় না জমিটাতে মনোহরের স্বত্ব অর্শাচ্ছে। হরদয়াল বলেছিল—জমিটা হয়তো মনোহরের কাছে দায়বদ্ধ। নায়েব বলেছিল—জমি দায়বদ্ধ হতে পারে, তাতে কিন্তু তার উপরে স্থায়ী রাস্তা করার অধিকার মনোহরের জন্মায় না। হরদয়াল হেসে বলেছিল—তা বটে, কিন্তু আমরাই-বা কোন পক্ষ? জমিটা ফরাসডাঙাব যে বলবে তা কি প্রমাণসাপেক্ষ নয়? যদি অন্যরকম প্রমাণ হয় তা কি সত্য হয় না? সত্য কী? যা এভিডেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী তোমাব বক্তব্যকে প্রমাণ করে। এটা কি হরদয়াল আর নায়েবমশায়ের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য? হবদয়ালের মন কি এখনও রাজনীতিতে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে? শেষ পর্যন্ত রাজনীতির দাবি তাকেও মানতে হয়, কিন্তু কিছুটা তা কি নিজের মনের সঙ্গে বিবাদ করে? অন্যদিকে নায়েবমশায় যেন ন্যায-অন্যায় বিচারের অসারত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।

নায়েবমশায়ের এই মনোভাবকে অথবা মাঝপথে মনোভাব বদলানো তাদের একটা বিশেষ আধুনিকতা বলেই মনে হয়েছিল। মানুষ এখন থেকে ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষা থেকে সবে যাওয়ার এক নতুন পথ পাবে। এতদিন তো হাতাহাতি, দাঁতের বদলে দাঁত, নাকের বদলে নাক নেওয়া ছিল। এখন যেন সেসব থেকে দূবে থাকা হবে কৌশল। যে মামলায় জিতল সে তো শান্ত হলই, যে হারল সে-ও ভাবল, কী আর করা যাবে বলো, এবার থামো। যদি বলা হয় এ-ধরনের শান্তিতে প্রকৃত কিছু লাভ নেই, তাহলে অপরপক্ষ বলবে যা নিয়ে বিবাদ তারই-বা প্রকৃত মূল্য কী? কিছুদিন পরে বিবাদের উভযপক্ষই বুঝতে পারে যা নিয়ে এত উত্তেজনা, কলহ তা সবই নিতান্ত মূল্যহীন। এ যেন এক খেলার আইন মেনে চলা। জুয়ার খেলাতেও আইন আছে, যদিও সে আইনে টেবলের মালিকের লাভ হয় শেষ পর্যন্ত।

যাকে অন্যায় বলে মনে হয় তার প্রতিকারের জন্য মানুষের যুদ্ধ করার দিকে ঝোঁক আছে। এবং এই আধুনিক প্রথায় সে-ঝোঁকটারও তৃপ্তি হয়ে থাকে। সূচনায় চিনতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে বটে। দলিল দস্তাবেজ, কমিশন আর মিশন, গাউন-পরা শিক্ষিত উকিল-ব্যারিস্টারের ছুটোছুটি আদালতে, গাউন ছাড়াই তাঁদের ছুটোছুটি সেনেটে আর মাঠে—পরবর্তী একশো বছরের সেসব বাক্‌যুদ্ধের সূচনা পাবে এতেই। আর এ-ও যে একরকমের যুদ্ধ তা নাকি রানীমাই উল্লেখ করেছিলেন। অন্তত তাঁর কথাতেই যুদ্ধ শব্দটার উল্লেখ ছিল।

২

অন্যান্য দিনের মতো কাছারিতে কাজ হচ্ছে। নিঃশব্দেই বলা যায়। অর্থাৎ নায়েবমশায়ের খাসকামরার দিকে যত এগোবে ততই নিঃশব্দ। নতুবা এ-ঘরে ও-ঘরে চাপা গলার আলাপ, এমনকী তামাক টানার মৃদু শব্দ নিশ্চয় আছে।

কিছুক্ষণ আগে জমা-নবিশ মহেন্দ্র বেরিয়েছে নায়েবের কামরা থেকে, এখন আবার সুমার-নবিশ সুরেন্দ্রর ডাক পড়ল। জমা-নবিশকে চিন্তাকুল মুখে বেরোতে দেখা গিয়েছে।

তাকে সে-অবস্থায় যে দেখেছে সে সদর-আমিন সোনাউল্লা। সোনাউল্লা চট করে সামনে যে-দরজাটা পেল তা দিয়েই ঢুকে পড়ল। সে-ঘরটা ল-মোহরার গৌরীর।

সোনাউল্লা বলল, 'গতিক ভালো দেখি না'।

'শুনছি তাই'। বলল গৌরী। 'আসলটা জানেন কিছু'?

'আরে আমি ভাই লেঠেলদের সদ্দার। কাগজপত্রের খোঁজ কী রাখি'?

যেখানেই জমি নিয়ে বিবাদ সেখানেই আমিনের ডাক পড়ে। জমি মাপজোখের জন্য সঙ্গে লোকলস্কর থাকে এবং যেহেতু বিবাদ সঙ্গে দু'চারজন পাইকবরকন্দাজও। এ-থেকেই সোনাউল্লা কাজি, যে প্রায় মুনসেফ-ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ করে, নিজেই লেঠেলদের সদ্দার—কথাটা নিজের সম্বন্ধে তৈরি করেছে।

সে হেসে বলল, 'আমিও ভাবছি আলি বলে বেরিয়ে পড়ি। বিলমহলের মাপজোঁখ শেষ করে ফেলি। ওদিকে এ ওর জমিতে কামড় দিচ্ছে'।

'আপনার কি মনে হয় গতিকটা মন্দ কাজ ফেলে রাখার জন্যই'?

'শুনছি গত বছরের তুলনায় এই আট মাসের গড় আদায় বেশকিছু কম। পরগনায় পরগনায় নায়েব-আহিলকারদের কাছে কড়া চিঠি যাচ্ছে নাকি'।

'আপনার ভদ্রপুরের ঝামেলাটা মিটল'? গৌরী জিজ্ঞাসা করল।

'ওটা আর আমার ঝামেলা নয়। বাঙালি নীলকরের নাম শুনেছ? দত্তবাবুরা নীলকর হতে চাইছে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুররা যেমন হয়েছিল'।

'লাভ'?

সাতপুরুষে ব্যবসাদার ওরা। তেজারতি বন্ধকি তো ছিলই, এখন দাদনি ব্যবসা। শুনছি আগে তাঁতিদের মহাজন ছিল। এখন তাঁতি কই? নীলছাড়া আর ব্যবসা কোথায়? একটা তুলোর ক্ষেত দ্যাখো?

'কারখানাও করবে'?

'আপাতত মরেলগঞ্জের সঙ্গে বন্দোবস্ত। কিন্তু তোমার ঘরে মুসলমানি হুঁকো যদি না- রাখো, আমার আসাই বন্ধ করতে হবে'।

'রাখব'। গৌরী বলল, 'শামসুদ্দিনের দরুন সেই রাস্তা-কাটার জমিটা আপনি মেপেছিলেন নাকি'?

'কবে! না এবার উঠি। চক ইসমাইলের দিকে যাব। ভদ্রপুরের কানুনগোকেও চিঠি দিতে হবে। আরে গৌরী, এবার রানীমার জন্মোৎসবের খাওয়াদাওয়ার ইনচার্জো কে? গতবার মুসলমান জোতদাররা কলাপাতায় খেতে বিরক্ত হয়েছিল'।

'উঠেছিল বটে কথাটা। দেখতে সুন্দর হয়নি। মনে হয় সুরেনবাবুই ভার নেবেন। টেবল-চেয়ার-কাচের বাসন হলেই হয়'।

নায়েবের খাসকামরায় সুমার-নবিশ সুরেন্দ্র দেখল নায়েব তখনও জমার বই দেখছেন।পাশে গত সনের জমার চুম্বক-নথি, নাকি রেভেনিউ অ্যাবস্ট্রাক্ট বলে। আঙুলের ডগায়-ডগায় হিসাব হচ্ছে।

নায়েব বলল, বোসো, সুরেন্দ্র'।

দু'পাঁচ মিনিট আরো হিসাব চলল। চুম্বক-নথিতে লাল পেনসিলের দাগ পড়ল। খাসবরদারকে ডেকে নায়েব বলল, 'রানীমার সঙ্গে দেখা করব। হুকুম আনো'। আর্জি নিয়ে খাসবরদার চলে গেল, জমা-বই ঠেলে দিয়ে নায়েব মুখ তুলল।

সাহসী সুরেন্দ্রও চমকে উঠল।

নায়েব বলল, 'দ্যাখো, সুরেন্দ্র, দেওয়ান উৎসবটা শুরু করেছিলেন, তখন নিশ্চয় হেতু ছিল। এখন কিন্তু ওটা আমাদেরই ব্যাপার। আমরাই উৎসাহ নিয়ে এগোব। যাঁর জন্মতিথি তিনি কি আর বলেন? ছেলেরা নাটক করার কথা বলছে, কিন্তু তোমার দফাওয়ারি আগাম হিসাব, নাকি তাকে বড়্জেট বলে'?

'এবার তিথিটাই আজ্ঞে এগিয়ে এসেছে। আমি দু-এক দিনেই পেশ করব বড়্জেট'।

'হলেই-বা। সেদিন সুমার দেখতে দেখতে হঠাৎ নজরে না-পড়লে আরো কয়েকদিন পিছিয়ে যেত যোগাড়যন্তর'।

'তা কি আর হতে দিতাম, হুজুর। রেলের শেয়ারের দরুন অ্যাটর্নির খত দেওয়ানজির মন্তব্যসমেত এসেছে। আড়াই লাখ মতো'।

'হুঁ। বড়্জেটে ধরো'।

সুমার-নবিশের উৎকণ্ঠাটা গেল।

সে বলল, 'সব পরগনার সব জোতদারদের কি বলা হবে'?

'গতবারও বলেছিল বটে। কিন্তু একজায়গায় তো থামবে। বার্ষিক দাখিল পাঁচ হাজার পর্যন্ত পত্র দাও। জমা-নবিশের সেরেস্তায় লিস্টি করতে বলো'।

সুমার-নবিশ উঠল। কিন্তু যেন দাঁড়িয়ে পা ঘষে, যেন কিছু বলবে।

নায়েব তা লক্ষ্য করল।

'নাচগান আর আতসবাজির কথা নাকি'?

সুমার-নবিশ খুশি গোপন করে বলল, 'আচ্ছা, হুজুর, তা পরে বলব'।

সকালের কাছারি ভাঙে দুপুরের আগে। এগারোটা বাজে আজকাল তখন। সময়টা সেদিকে চলেছে। নায়েবের খাসবরদার আর্জি পৌঁছে দিয়ে ফিরে গড়গড়ার জল বদলে ছিলিম দিল। নায়েব দু'এক টান দিলেন। হাঁ, ঠাণ্ডা বটে এ-তামাকটা। যে বয়সের যা এই রকম একটা চিন্তা নায়েবের মনে একপাক ঘুরে গেল। রাজবাড়ি থেকে রূপচাঁদ এল। নায়েব তখনও তামাক টানছেন। কাছারি ভাঙলে যেতে বলেছেন রানীমা।

তামাক শেষ করে নায়েব উঠল। ধীর পায়ে কাছারির বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। কখনও কখনও কোনো সেরেস্তায় ঢুকে পড়ে নায়েব আমলাদের খাতাপত্তর পরীক্ষা করে থাকে। কাজেই যতটুকু দেখা যায় দরজা-জানলার ফাঁকে নায়েবকে তেমন দেখে নিয়ে আমলারা কাগজে চোখ নামিয়ে নিল।

নায়েব এই সময়ে লক্ষ্য করল সদর-দরজা দিয়ে হরদয়াল এগিয়ে আসছে।

দেওয়ানকুঠি থেকে কোথাও যেতে খানিকটা কাছারির দিকেই আসতে হয়।

হরদয়াল কাছে এলে নায়েব বলল, 'নমস্কার—কাছারিতে নাকি'?

হরদয়াল বলল, 'রানী ডেকেছেন'।

নায়েব বলল, 'আমিও তো যাচ্ছি, তাহলে...

হরদয়াল একটু ভেবে, হেসে বলল, 'দুজনকেই দরকার হয়তো একত্রে'।

রাজবাড়ির দরজাতে রূপচাঁদ জানাল, রানীমা দরবার-ঘরে। দেউড়ির ঘড়িতে তখন সশব্দে এগারোটা বাজল। দরবার-ঘরের নিচু কৌচে রানী বসেছিলেন। কাছারির প্রধানতম দুজন দরবারে। রূপচাঁদ সুতরাং যথোপযুক্ত আসনের ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

রানী বললেন, 'বোসো হরদয়াল, বসুন নায়েবমশাই'।

নায়েব দরবার চেয়েছিল, সুতরাং সে-ই আগে বলবে। জানাল জন্মোৎসব সম্বন্ধে বলতে চায়।

৩

বানী শুনে বললেন, 'তুমি যখন সে-বিষয়ে এখনও আলাপ করার কথা ভাবছ, সব পাকা হয়নি। ওটাকে কি চালিয়েই যেতে হবে? না-হলেই কি নয়'?

'আজ্ঞে, এটা এক বিশেষ উৎসব যা আমাদের অঞ্চলেই হয়। দশজনের আনন্দ, গ্রামের সুখ্যাত'।

'বলো'।

'গতবার জোতদারদের মধ্যে বড়দের, সদরের হাকিমদেব, মরেলগঞ্জের ওদের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। এবার...

'মরেলগঞ্জে দিতে চাচ্ছ না? ইংবেজদের সঙ্গে ফৌজদারি-ফরিয়াদিতে কিন্তু লাভ হয় না'। একটু দেরি হল নায়েবের উত্তর দিতে। বলল, 'এখনও সবটা ভেবে উঠতে পারিনি'।

কৌতুক বোধ করে রানীমা ভাবলেন : এ কি কখনও সম্ভব নায়েবের, মরেলগঞ্জেই দু-একজন লোক নেই যে ডানকান কী কববে তা ধরতে পারছে না? বললেন, 'মামলা চলুক, নিমন্ত্রণ পাঠাও। তাছাড়া লীজের হলেও মরেলগঞ্জও তোমাদেব একরকম পত্তনিদার। দেওয়ানি স্বত্বের মামলা ভালো। নাকি বিলেত পর্যন্ত নেওয়া যাবে। বেনে নীলকবেরা ততদূর যেতে চাইবে না বোধ হয়'।

কিন্তু তখনই স্নিগ্ধ ডাগর চোখদুটো যেন চঞ্চল হল, গালে কোথাও একটু যেন রং লাগল। বললেন বানী, 'তুমি কি শুনেছ? তোমাদেব পেত্রো নাকি ইংরেজদের একটা কথাই ইংরেজিতে বলতেন : দেয়ার্স নাথিং আনফেয়ার ইন লভ অর ওঅর'।

দরবার শেষ হল, নাযেব উঠল। কিন্তু ডানকান আর তাব মামলা সম্বন্ধে নির্দেশ নিয়ে দরবার ভাঙা যায় কি? বরং দরকাবি কথাব মাঝে এসে পড়েছিল এমন ভাবটা থাকা উচিত।

বিচক্ষণ নাযেব সেজন্যই যেন বলল, 'ঘরবাড়ি সংস্কার ইত্যাদির কাজে খরচটা বৃদ্ধির দিকে। রানী কথা না-বলে নায়েবকে বলতে দিলেন'।

নায়েব বলল হাসিমুখে, 'নরেশ, সুরেন, এবা যত কাজ করছে, তত যেন কাজ বাড়ছে। ওদের একটা আলাহিদা দপ্তর করলে হয় না? পৃথক হিসাবনিকাশ, তদারকি। দেওয়ানজিকে অনুরোধ করেছি ভার নিতে'।

ভাবতে যেন মুহূর্তই যথেষ্ট। বানী বললেন, 'ভালো করেছ। নিয়োগপত্রের দরকার হবে? আচ্ছা, আমি বলি, হরদয়াল, নরেশদের কাজ দেখে দিলে তোমার উপরে খুব চাপ পড়বে'?

কোনো-কোনো বিষয় খুব দ্রুত অগ্রসব হয় দেখা যাচ্ছে। নতুন এই পূর্তবিভাগটি পৃথক করে খোলার ব্যাপারে তা দেখা গেল।

নায়েব চলে গেলে হরদযাল বলল, 'আমাকে ডেকেছেন'?

'হ্যাঁ, হরদয়াল, বোসো'। বানী বললেন, 'ভালোই হল তোমার হাতে কাজের ভারটা এসে। একটা শহর গড়ে তোলার মধ্যেও পৌরুষ থাকে, নয়'? রানী হাসলেন। 'পরে অন্য পুরুষ এসে তাকে অন্য রকমে গড়তে চাইবে, তাহলেও কিছু একটা করেছি এরকম অনুভব থেকে যায় না? তুমি ভেবে দেখো আমাদের এই বাড়িতে গাড়িবারান্ডা জুড়লে কেমন হবে, তার জন্য নাকি আলগা কয়েকটা মিনারও বসাতে হবে মাথায়। কিন্তু তার চাইতেও বেশি ভাবা দরকার ছ-আনির কায়েতবাড়ি পর্যন্ত রাজবাড়ির সদর থেকে বর্ষায় বেচাল হয় না এমন পাকা সুরকি-রাস্তা কী করে হয়'।

'কায়েতবাড়ি'? হরদয়াল বিস্মিত হল 'কোথা দিয়ে যাবে? মরেলগঞ্জের আড়াআড়ি'?

রানী যেন কৌতুকে হাসলেন। বললেন, 'না-না। ফরাসডাঙা দিয়ে'।

'সে তো তিন-চার ক্রোশ হয়ে যাবে, অনেক...

রানী বললেন, 'অনেক টাকা বলেই তো নায়েবমশাই তোমাকে ভার নিতে বলছেন'।

দরবার কি দীর্ঘস্থায়ী হবে? কৌচের উপরে কুশন ছিল। হেলে বসলেন রানী। মোটা বাঁশগিরে রুলিতে আলো চিকমিক করল যেন। বললেন, 'চীনে নানকিং কী? টাইপিং কী বিষয়'?

হরদয়াল লক্ষ্য করছিল, ভঙ্গিটা পরামর্শের বটে। সে অতি দ্রুত চিন্তা করল, চিন্তায় থই পেয়ে বরং বিস্মিত হল। টাইমস কাগজে সোরগোল। টাইপিং বিদ্রোহে ইংরাজ অন্য পক্ষ, সুবিধা করতে পারছে না। এমনকী সেনাপতি বদলের কথা হচ্ছে। কিন্তু রানী জানলেন কী করে? চীনাদের এক অংশ স্বজাতির স্বার্থে, ইংরেজ তাদের অবাধ বাণিজ্যের নামে মুখোমুখি।

রানী হালকা কথার সুরে বললেন, 'কায়েতবাড়ির ছেলে ইংরেজ পক্ষে সাবলটার্ন না কী হয়ে যেতে চায় সেখানে'।

'আমরা'? হরদয়াল বলল, অনেকদিন পরে আবার সে রাজবাড়ির পক্ষকে আমরা বলল, 'আমাদের কিছু ভাবতে হবে? সাবলটার্ন বলছেন'?

রানী ভাবলেন, বললেন অবশেষে, 'ছেলেরা যদি মত চায়, তার অবশ্য একুশ পার হয়েছে। মত না-চাইলেও কী হতো'? একটু থেমে বললেন আবার, 'কেউ-কেউ বাপের মতো হবেই। সবদিক ভেবে দেখে বলো'।

রানী উঠলেন।

৪

নায়েব রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে খাসকামরায় বসতেই খাসবরদার একটু দ্বিধা করল, কিন্তু বসছেন যখন এই ভেবে ছিলিম পাল্টে আলবোলার নলটা হাতে ধরিয়ে দিযে বলল, 'এবার রানীমার জন্মদিনে তসরের গড়া চাই, হুজুর'।

'সে কী? ও আচ্ছা। তা তো বটেই। গৌরীকে ডেকে দাও একবাব'।

ল-মোহরার গৌরী এলে নায়েব চেপে-চেপে হাসল। বলল, 'কীবল ছোকরা কি ব্যারিস্টার? দ্যাখো তো মনোহরকে সে-ই পরামর্শ দিচ্ছে কিনা'।

অবাক গৌরী বলল, 'আচ্ছা-আচ্ছা, খোঁজ রাখতে হচ্ছে, হুজুর'।

কিন্তু গৌরী একা নয়। সুমার-নবিশকে সামনে রেখে বেশ কয়েকজন ভিড় করে এল। নায়েব চোখ তুলল। তার কি বুঝতে আর বাকি? বলল, 'ঢের হয়েছে, হাতের কাছে রামযাত্রা আছে কিনা দ্যাখো'।

সুমার-নবিশ 'আজ্ঞে' বলে ইতি করতে চাইল, কিন্তু তার পিছনে অন্যেরা এমন দরজা জুড়ে যে পিছানোর উপায় নেই।

দরজার পাশ থেকে একজন জানাল, 'আজ্ঞে, নাটক, কলকাতায় যা হয়, ঠিয়াটার। আমাদের ব্রজকান্ত দেওয়ানজির সঙ্গে গিয়ে দেখেছে। দেওয়ানজিকে বলেছিল ব্রজ। তিনি বলেছেন, দ্যাখো না চেষ্টা করে। আপনি বললে রিহারস্যাল শুরু করি'।

'এই মরেছে! এখন যাও, এখন যাও। ঠিয়াটারে রক্ষে নেই রিস্যাল দোসর। সেরেছ তোমরা। এখন বোঝোগে, সে কিন্তু রানীমার চোখে পড়তে পারে'।

আমলারা খুশি মুখে চলে যেতেই নায়েব জমাবন্দির খাতাটা খুলছিল, কিন্তু খাসবরদার নিবেদন করল এগারোটা বেজে এ বেলার কাছারি ভাঙলে তবেই তিনি রাজবাড়ি গিয়েছিলেন। তিনি না-উঠলে আমলারা কেউ যেতে পারছে না।

কাছারি বারান্দায় নায়েবের পালকি। হঠাৎ একদিন যেমন সে শুনতে পেয়েছিল সেদিন সকাল থেকেই সে নায়েব আর নয়, নায়েব-ই-রিয়াসৎ, তেমনি হঠাৎ একদিন কাছারির গোড়ায় ছ' বেহারার পালকিটাকে দেখতে পেয়েছিল।

—কে এল রে? আজ্ঞে, কেউ নয়। আপনার বাসায় যেতে।

পালকিটা চলেছে মাঝারিগতিতে। একহাত নিচে পথটা সরে-সরে যাচ্ছে। রানীমার ছোট আট বেহারার পালকিটাও মাটি থেকে কোমরসমান উঁচুতে থাকে। তাকিয়ায় কনুই রেখে আধশোয়া অবস্থায় নায়েব। এখন সে কিছু ভাবতে চায় না। এখন স্নানাহার বিশ্রামের সময় নয়? কিন্তু, তার মনের মধ্যে কেউ ফাঁকিটা ধরে হাসল—হুঃ। তাহলে তো উল্টোদিকে যোগই হল।

হুঁই-হাই করে চলছে পালকি। হ্যাঁ, নিচুই তো। কাহারদের সে বেঁটে দেখে দেখে বাছাই করেছে। পালকির ছাদের দিকে চাইল নায়েব। বেশ উঁচু। ও, হ্যাঁ, কোনো কোনো ঘোড়ার পিঠ ওরকম উঁচু হয় বটে। তা ছিল। আর লাফিয়ে উঠত তার পিঠে। কায়েতের ছেলে, কিন্তু লাফিয়ে উঠত বুজরুকের মতোই।

কাহাররা গুমগুম গুনগুন করে উঠল। নায়েব বলল, 'আস্তে চলো, বাপারা, এ কি রাজবাড়ির পাকা হাতা'?

নায়েব ভাবল পাকা রাস্তাই তো কথায় উঠেছিল। তা ভালো, সদরে গেলে বোঝা যায় সুবিধা কোথায়, ফীটন বলো, ল্যান্ডো বলো, সকলেরই সুবিধা।...আর বাজবাড়ির দেউড়ির কাছে যখন পাকা রাস্তায় উঠেছে বুজরুকের ঘোড়া, লাল আগুনের শিখার মতো ধুলো উড়ত, নাকি বালামচি?

কিন্তু, কিন্তু তুমি বাপু কায়েতের ছেলে গোবরা, তোমার কেন তেমন ঘোড়া? কী লাভ?

কী লাভ?

নায়েব নিজেকে জানাল : আসলে গৌবী বেজোদের দেখে মনে পড়েছে তোমার। তাদেরই সমবয়সী ছিল তো। থাকলে ওদের ঠিয়াটাবে জমত।

সে স্থির করল গিন্নিকে আজ বুঝিয়ে দেবে, (প্রথম) যে গিয়েছে সে শত কান্নাতেও ফেরে না, (দ্বিতীয়) পেটের ছেলেব শোকও মানুয ভোলে, ভাগনা বলে শোক বেশি হয় না, (তৃতীয়) আমি তো আর-এক ভাগনাকে এনে দিয়েছিলাম, ভবল তোমার বুক?

কাহাববা কাঁধ বদলাল, তাই একটা মৃদু ঝাঁকি লাগল। নায়েব দু হাত একত্র করে বুকে রাখল।

না, আনন্দ হয় এমন কোনো বিষয়ে আজ আলাপ করতে হবে। তেমন বিষয়ের খোঁজেই যেন তার মনে পড়ল রানীমার কথা। সেই স্নিগ্ধ ডাগর চোখ দুটির চঞ্চল হয়ে ওঠা, ঠোঁটের কোণের সলজ্জতা আর হাসির মধ্যে সেই ইংরেজি কথা। রানীমা ইংরেজি বলেছেন শুনে তুমি কাঠ হবে, গোবরার মামি। তা এক বিদ্যুতের ঝিলিক।

হঠাৎ যেন কাহারদের হুঁই-হাঁই বেড়ে উঠল। সে বাড়ির গিন্নিকে খুশি করতে। তো, রাজবাড়ির তনখা। গিন্নি কাপড়চোপড় দেন, এ-সুযোগে সে-সুযোগে মাহিনায় দশদিন খাওয়ান।

মর্যাদার প্রশ্ন এসব।

রানীমা অবশ্য যুদ্ধের কথা বলেছিলেন। কিন্তু সড়ক কাটা কি যুদ্ধ? যুদ্ধ? আঃ, অন্ধকারে অদৃশ্য ঘোড়ার কাজলকালো পেশির মতো কিছু কী তার মনের মধ্যে টগবগিয়ে উঠছে। নাকি এক হিংস্র দাঁতের সারি। আর, জানো বাপু, বুড়ো-বয়সে রাশ টেনে রাখতে পিঠ ভেঙে আসে, দম ফেটে যায় ; হাত...

বাড়ি পৌঁছে ধীরে-সুস্থে স্নানাহার করে নায়েব গিন্নিকে ডেকে বলল, 'গোবরার মামি, শোনো। একটু শোও দেখি, বাছা, আমার পাশে। এখনই সলতে পাকাতে হবে কেন? সলতে, সলতে...প্রদীপে ঘর সাজিয়ে লাভ'?

তিরস্কারের মতো সুর শুনে নায়েবগিন্নি বিছানায় এল।

নায়েবের চোখ দুটি দুপুরের ঘুমে জড়িয়ে আসছে, সেই কত দিনের অভ্যাস তো। হঠাৎ যেন উৎকর্ণ

হল সে। যেন কিছু শুনছে? পাখি? ক্রোক-ক্রোক করে ডাকছে। খুব নিস্তব্ধ দুপুরে, কিংবা পোড়োবাড়ির কাছে শোনা যায়। কাঠঠোকরাই। কিন্তু এ কী? আমার বাড়ির কাছে? নায়েব ধড়মড় করে উঠে বসল।

প্রাণের লোক উঠে পড়লে শুয়ে থাকা যায় না। নায়েবগিন্নিও উঠে বসল।

'খাস সিন্ধুকের চাবির গোছাটাই বোধ হয় ভুলে এসেছি। সেরেছে'!

'আদৌ না, এসেই আমার হাতে দিয়েছ'।

'এই মরেছে'! ধরা পড়েছে তা গোপন করতে নায়েব হাসল। তা, উঠেই যখন পড়লাম, চাকরকে বলো তামাকু দিতে।

গিন্নি শয্যা থেকে নামতে গেল। নায়েব বলল, 'আহা, এখনি নেবে যাচ্ছ কেন'?

গিন্নি হেসে বলল, 'চাকর তোমার শোবার ঘরে কবে ঢুকল যে তোমার শোবার ঘরের তামাকে হাত দেবে'?

নায়েবগিন্নি নিজেই তামাক সেজে ডাবাসমেত নিয়ে এল।

নায়েব বলল, 'চলো, এবার তোমাকে কলকেতা দেখিয়ে আনি। ওদিকে কালীঘাট দক্ষিণেশ্বর দেখা হয়ে যাবে, এদিকে কলকেতা শহর, এস্তেক নবদ্বীপ। যেখানে যাও, প্রাণ ভরে টিপটিপ'।

গিন্নি বলল, 'সে শহরে নাকি গাছপালা অনেক কম, সব বাড়ি নাকি পাকা, রাস্তাঘাট সব সুরকির? রাস্তার মোড়ে-মোড়ে নাকি আলো? আর...

'কী আর? কলকেতা বলছ'?

'পথে-পথে নাকি ইংরেজ-ঠাসা? এখেনে এক ডাংকাং-এ রক্ষে নেই ..

'শহরটাই তো ইংরেজেব। ওরাই পত্তন করেছে। সেখানে সবই ইংরেজি। ছোট ছোট বাঙালি ছেলে ফুটফুট করে ইংরেজি বলে। বড়দের তো কথাই নেই। স্বপ্নও নাকি ইংরেজিতে দ্যাখে। সেখানে টেবল ইংরেজি, চেয়ার ইংরেজি, মদ ইংরেজি। শিবঠাকুরও নাকি রবিবারে ইংরেজি মতে পুজো নেন'।

'রবিবার নিষ্ফলা না'?

'দ্যাখো কাণ্ড। সে কি ধূপধুনোর পুজো? আর্গিন বাজিয়ে গান। সবাই নাকি চোখ মুদে বসে থাকে আর-একজন খুব বক্তৃতা দেয়? হু-হু করে চোখের জল পড়ে'।

'ছেলেছোকরারা যায়'?

'যায় না আবার। পেশকার বেজো বলে, আমি শুনি। মাগীরাও। হাতঢাকা জামা কামিজ, পায়ে জুতোমুজো'।

নায়েবগিন্নির গালটা লাল হল। বলল, 'দ্যাখো, আমি শুনেছি, যেসব ইংরেজ এখেনে আসে তাদের নাকি বাপ নেই। মানে মা আছে কিন্তু, বুঝলে তো? কলকেতারও কি তাই'?

'ছি-ছি! কী যে বলো? আজকাল ছেলেছোকরারা কি বাপ-মার কথা শোনে? কোনোদিনই কি শোনে? আমাদের গোবরাই ভাবল আমাদের কথা'?

'দ্যাখো, তুমি আমার গোবরাকে, তুমি ওসব ছেলের সঙ্গে তুলনা দিও না'। ঝটকায় উঠে দাঁড়াল নায়েবগিন্নি।

'পরের ছেলেরা ভুল করছে, আর তোমরা ছেলে বুঝি ঠিক করেছিল'? ডাবা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'সেও ভুল করেছে, ভুলই। কলকেতার সব ভদ্রলোক সব শিক্ষিত লোক যার নিন্দে করছে, এস্তেক আমাদের দেওয়ানজি, তাই কিনা করতে গেল তোমার ছেলে! দ্যাখো দেখি কত তফাত, যখন যে-বছর লখনউ, কানপুর, ঝাঁসিতে মারপিট, ঠিক সে-সময়ে সে-বছর বিশ্ববিদ্যালয় বসল কলকেতায়। কেন? ইংরেজি শিখতে নয়'?

'ভারি ঢংয়ের কথা বোলো না গোবরার মামা? আমার ছেলে ভুল করে না। তুমি কী জানো? তুমি কী শুনেছ? খবরদার কাউকে বোলো না যেন ; কিন্তু জানো আর-একজনও ছিল সেই দলে, বলব?

রাজকুমার'।

শেষ কথাটায় গলার স্বরটা অনেক নামিয়ে আনল নায়েবগিন্নি। আঁচল তুলে চোখের কোণটা মুছল।

'আহা-হা'! বলল নায়েব। 'কী লাভ? এসব খোঁজ নেওয়াই-বা কেন আর এখন? ওরে তামুক দে, গেল কোথা সব, হারামজাদাদের বাড় বেড়েছে দেখছি'।

'রাগ কোরো না। শোবার ঘরে ওরা ঢোকে না। তামুক তো হাতেই'।

নায়েব ভাবল, সড়ক কাটার ব্যাপারটার সঙ্গে কী করে যেন গোবরা জড়িয়ে যায়। কিন্তু কথায় বলে নায়েব। হঠাৎ যেন খোলামেলা দেখতে পেল। বলবে ভুল ক'রে, কিংবা পেত্রোর পাল্লায় পড়ে, যে ক'রে হোক, ইংরেজ গোবরার শত্রু। তা থেকেই সেদিন ইংরেজদের উপরে রাগ হয়েছিল। তা থেকে সড়ক কাটা। আশ্চর্য কথা দেখছি। কিন্তু এ কি উচিত তোমার রাগে মনিবকে মামলা-হামলায় জড়ানো?

গিন্নি বলল, 'তামুক খেয়ে কি এখনই কাছারিতে যাবে? তাহলে জলপান...

'আমি বলি কী ...এখন কিছুদিন দইয়ের শরবৎ দিও'।

'এই শীতে দইপানা'?

'পিত্তটা বিশেষ কুপিত মনে হচ্ছে না? খামোকো রাগ হয়ে যায়'।

'তাহলে ওষুধ করতে হয়। বলো কী'!

'কী লাভ বলো'? নায়েব হেসে উঠল। তামাকের ধোঁয়াটাও গলায় লাগল। হাসি ও কাশির মধ্যে বলল, 'তো, একবেলায় খোঁয়াড়সমেত সায়েবটাকে ছাই করা যায়। সব কটাকে, বন্দুকে ঠেকে না, গ্রামসমেতই যদি বলো। তাতে কিন্তু পিত্তই কুপিত হয়। রাস্তা কেটে কী-বা হয়—বুড়োবয়সে পিত্ত কুপিত হওয়া ছাড়া'?

কাছারিতে ফিরে নায়েব ল-মোহরারকে ডাকল। সে এলে বলল, 'একটা কথা ঠিক রেখো। মামলায় লম্বা-লম্বা তারিখ নেবে। ঢিলে দিতে থাকো, উকিলকে টাকা ঢেলে দিক ডানকান। এদিকে শামসুদ্দিনকে ফিরিয়ে আনো, জমিতে চাষ দিক। না-আসে, অন্য কাউকে বসাবে জমিতে। গ্রামে কি শামসুদ্দিনের অভাব পড়েছে? তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখো, খেলে খেলে এগোও। জেবন কেটে যাক ওই সড়কে। স্বত্বটা দেখে নিক'।

গৌরী গেলে নায়েব হেসে তামাকেই মন দিল আবার। তার নায়েবি মাথায় তখন খেয়াল—স্বত্বের কিন্তু দুই পক্ষ, এক স্বামীত্ব করে, অন্যে বলে তারই হক। ফিরিঙ্গি পেত্রোর ফরাসডাঙায় স্বামীত্বই-বা কে করে?...ওদিকে দ্যাখো, গিন্নি যেমন বলল—রাজকুমার নাকি, কী কাণ্ড! নায়েব তার ফরাস আর দেয়াল বরাবর সাজানো কুর্সির মাঝখানে ধোঁয়ায় ভরা ফাঁকটাকে দেখছিল। ধোঁয়া, খালি পাক খাওয়া ধোঁয়া। আরে কাণ্ড! সে একেবারে স্তম্ভিত! ঢোলডগর, লোকলস্কর, খানাপিনায় চেপে গিয়েছে ব্যাপারটা। দখল বলে দখল? শোবার ঘরে বাঁশগাড়ি। হাওয়াঘরে শিব-গাড়া! রানীর বিচক্ষণতায় সে দিশেহারা হয়ে গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রানীমার জন্মোৎসব নিশ্চয়ই বড় ঘটনা। তখন সেই রঙিন মেঘে সকলের আকাশই ঢাকা। কিন্তু উল্লেখযোগ্য আর-কিছুই কি নেই? সেটাও তো রানীমারই উৎসব—শিবমন্দিরের বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়নি, সেটা হবে তো। জন্মোৎসবের দিনবিশেক আগে রানীমা নয়নতারাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। নয়নতারা রাজবাড়ি আসতে গিয়ে নতুন যোগাড়-করা একখানা পুঁথি এনেছিল।

এটা কৌতূহলের ব্যাপার। নয়নতারার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে রানীমার কি এত বই পড়ায় ঝোঁক ছিল? অথবা নয়নতারাই কি মহাভারত ও অন্যান্য পুঁথিতে এত মনোনিবেশ করতে অভ্যস্ত ছিল? পাঠকের মনে পড়বে, রানী যখন নয়নতারাকে রাজবাড়িতে ডেকেছিলেন, তখন অন্য উদ্দেশ্য ছিল। এখন সে রাজবাড়িতে এলে বারানসী অক্ষরে লেখা মহাভারতের কোনো-না-কোনো পর্ব তার হাতে থাকে। ব্যাকরণ ভাষ্য টীকা সহকারে তা পাঠ হয়। এ থেকে কি কোনো সাধারণ সূত্রে পৌঁছনো যায়? মানুষ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে যে-কাজ আরম্ভ করে, একসময়ে উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে সেই কাজটাই নতুন উদ্দেশ্য সৃষ্টি করতে পারে।

নয়নতারা আসতেই রানীমা বলেছিলেন, তোমাকে একদিন শিবমন্দিরটা দেখতে যেতে হয়। শিবচতুর্দশীর আগে শেষ হওয়া দরকার। তাছাড়া সেই রাতে মেয়েরা কোথায় থাকবে, কোথায় স্নান করবে? পড়ো দেখি কী এনেছ আজ।

কিন্তু পড়া শুরু করাব আগেই রানী হাসলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, নয়ন, সেদিন বেনেরা ইচ্ছা তৈরি করে বলে খুব ঠকালে। কিন্তু আর-এক রকম ইচ্ছাও কি নেই? এমন কী হতে পারে যাকে আমরা বুদ্ধির সাহায্যে ক্ষুধা নাম দিয়েছি, সেটাও আসলে একটা প্রবল ইচ্ছা? সেটা আছে বলেই বুদ্ধি তার নাম দিয়েছে'।

'আপনি কি বলবেন তা বুদ্ধির চাইতে পুরনো'?

'বাহ্, যে-শিশুর কথা ফোটেনি তারও ক্ষুধা আছে, যে-প্রাণীর চেতনা নেই বলি, তারও ক্ষুধা আছে। দ্যাখো, ক্ষুধা নামে ওই ইচ্ছাগুলো আমাদের চালাতে থাকে, বুদ্ধি না-না করলেও থামা নেই'।

'এ তো বড় ভয়ঙ্কর কথা যে আমরা বুদ্ধিতে চলি না'! নযনতারা হাসল।

রানী বললেন, 'সেদিন হৈমী বাইবেলের গল্প করছিল। ওদের ভগবান নিষেধ করেছিল তা সত্ত্বেও আদম না কে-একজন ফল খেলোই। বুদ্ধি চালালে ভগবানের অত কাছের মানুষ কি বোকার মতো সেই ফল খায়, হলই-বা মেয়েমানুষের পরামর্শ? চৌদ্দপুরুষ ধরে অভিশপ্ত হয়'?

রানী হাসলেন। নয়নতারা জিজ্ঞাসা করল, 'হৈমী বাইবেল পড়ে নাকি'?

রানী নয়নতারাকে ভালো করে দেখলেন, ভাবলেন, হয়তো পরে একদিন জানবেনই ; তাহলেও এখনই কেন? যেন হালকা কিছু এমনভাবে হেসে বললেন, কিন্তু কপালের প্রান্তে যেন বিষণ্ণতাও। বললেন, 'তো, তোমার এই ইচ্ছা যার নাম ক্ষুধা সে কি বেনেদের চাইতে পুরনো নয়? অন্যদিকে গাছেরও আত্মপুষ্টির ফুল ফুটানোর ক্ষুধা থাকে। সে কি জানে ফলে তার কী লাভ'?

আলাপটা এগোতে পারল না। নায়েব উৎসবের ব্যাপারে দেখা করতে চাইছে জেনে রানী উঠে গেলেন। নায়েব নিবেদন করল, 'শিশাওয়াল ফেলিসিটার কাল বিকেলের দিকে এসে পৌঁছবে আশা করা যাচ্ছে। আজ চিঠি পেলাম'। নায়েব হাসল। বলল আবার, 'লিখেছে আলো দিয়ে সম্পূর্ণ রাজবাড়ি সাজানোর ভার এবার সে নিতে চায়। সেই ব্যবস্থা করে আসছে। আমরা কি অপেক্ষা করব'?

রানীমা বয়স্ক কর্মচারীর এই কমবয়সী আনন্দ দেখে হাসলেন, বললেন, 'বেশ তো, তোমরা যা ভালো বোঝো'। নায়েব উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ফেলিসিটার লিখেছে তার নৌকোয় কায়েতবাড়ির কুমার

আসছেন'। রানী একটু ভাবলেন। বললেন এক মুহূর্তেই, 'তাহলে দুপুরের পর থেকেই হাওদা রাখতে হয় বোধ হয় কুতঘাটে'।

নায়েব চলে গেলে রানী নিজের ঘরের দিকে ফিরতে-ফিরতে ভাবলেন। তাঁর কল্পনায় বিশেষ আলোকোজ্জ্বল রাজবাড়িটা ধরা দিল। অন্যান্যবার কিছু কম আলো থাকে না, এবার তা বিশেষ হবে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলার নিজের ঘরের দিকে চলতে-চলতে চিন্তা করলেন : এসবই কেমনভাবে ঘটতে থাকে, না? ডানকানই আর তার সেই তশিলদারের কথা ভাবে? চন্দ্রকান্ত বোধ হয় নাম ছিল। কিন্তু রোহিণী নামে সেই স্ত্রীলোকটি? রাজকুমার হয়তো বয়সের ধর্মে ভুলে যেতে পারে। তাঁর মনে হল : আচ্ছা, রাজুকে কি উদাস দেখায়? নাকি ছেলেরা বড় হলে তেমন মনে হয়?

অলিন্দ দিয়ে চলতে চলতে সেই দুপুরের বসার ঘরের দরজার মুখোমুখি অলিন্দ যেখানে ঝুলবারান্দায় বেড়েছে তার কাছে দাঁড়ালেন। নয়নতারা তখনও বইয়ের সামনে দরজার পাশেই। মুখটা নিচু কিন্তু তার কোণে যেন কৌতুক।

পায়ের শব্দে নয়নতারা মুখ তুললে রানী বললেন, 'কী করছ নয়ন? বইটা কি ভালো নয়, নাকি টীকায় সন্দেহ আছে'?

নয়নতারা বলল, 'কত বড় পণ্ডিতেব লেখা ; সন্দেহ কোথায়'?

'মুখের চেহারায়'। রানী হাসলেন।

নয়নতারা অবাক হল। অসময়েব এই কালীপূজা যা রানীমার জন্মোৎসবের অঙ্গ সে-বিষয়ে তার তো কিছু সন্দেহ আছেই। তাই কি ধরা পড়েছে তার মুখে? সে হেসে বলল, 'আমার ভ্রূর গঠনে কিছু দোষ আছে, রানীমা'।

'হুঁ। তুমি তো কম নও'।

নয়নতারার মুখটা একটু বিবর্ণ হল। কথাটা সুপ্রয়োগ হয়নি।

কিন্তু রানী হাসতে হাসতে বললেন, 'এবার কিন্তু তুমি দুষ্টু হয়ে ফিরেছ। বানীকে তেমন মানছ না। কিন্তু যেন চেঞ্জো থেকে ফিরে আরো ভালো দেখায় তোমাকে'।

কথার আড়ালে সরে রানীমা ভাবলেন . ছেলেরা বড় হলে...কিন্তু কালীপূজার ব্যাপারটাকে নানাভাবেই প্রশ্ন করা যায়। রাজবাড়ির জন্মদিনের উৎসবগুলোতে সাধারণত গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দর পূজা হয়। ছেলেরা বড় হলে তাদের মনের এক শরিক হতে পারে যে সে মা নয়। হঠাৎ একটা ধাক্কা লাগল মনে। নয়নতারা কি জানে? রাজু কি তাকে বলেছে? এসব কত দিনে তামাদি হয়?

রানীর অন্তর চঞ্চল হল। একটু যেন ঝুঁকে নিচের উঠানটাকে দেখলেন। একটু যেন আবার শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন। ভাবছিলেন তো। ঘরের দিকে ফিরে বললেন, 'দ্যাখো নয়ন, ভুলে গিয়েছি। তুমি কাউকে দিয়ে এখনই একবার হরদয়ালকে আসতে বলে দাও'।

রানীর স্বরটা দ্রুত। নয়নতারা তাড়াতাড়ি উঠে ভৃত্যদের খোঁজে গেল।

রানী চারিদিকে চাইলেন, কিন্তু সেখানেই-বা বিষণ্ণতা কোথায়? দিনশেষের বেলা তো নয়, দুপুরের দিকে চলেছে দিন যার উজ্জ্বলতা চকমিলানো দেয়ালগুলোর মধ্যে রোদে কবোষ্ণ জলাশয়ের মতো অগাধ স্থির। তখন কিছু কি উদাস? রানী মনে করতে পারলেন না রাজুর চোখ দুটিকে শেষ কবে ভালো করে দেখেছেন। বরং অনেক পিছিয়ে মনে হল রাজুর ধাই-দাসী বলছে—এ মা, একেবারে হরিণচোখ, মেয়ে নাকি, রানীমা। এখন রাজু অনেক বেড়েছে। নায়েবমশাই, হরদয়াল দুজনেই দীঘল চেহারার মানুষ, রাজুকে তাদের চাইতে দীঘল দেখায়। হাসি-হাসি দেখাল রানীমার মুখ, কিন্তু সে হাসি দেখলে দৃঢ়তার কথাও মনে হতে পারে কারো। আসলে ছেলেরা বড় হলে পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হবে। পরিচয়ে সত্য থাকবে। পারো কি আড়াল করতে?

ইতিমধ্যে নয়নতারা ফিরেছিল। রানী বললেন, 'শিশুর চোখ দুটি মায়ের চোখের দিকে অপলক চেয়ে

থাকে ; তার বাইরে কিছু দেখতে চায় না। বড় হলে, তুমি দেখবে, তা স্বাভাবিক নয়। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী মায়ের মুখের চাইতে বিচিত্র, তাই নয় কি নয়ন'?

নয়নতারা প্রস্তুত ছিল না। সে কথাটা ভালো করে বুঝে উত্তর দেবার আগেই অলিন্দর শেষ প্রান্তে পায়ের শব্দ হল।

হরদয়ালই এসেছে। নয়নতারা অন্যত্র গেল।

কিন্তু তখন কি আলোচনার সময়? বরং স্নানাহারের উদ্যোগ করতে হয়। রানী কি নির্দেশ দেবেন যা জরুরি? তিনি অলিন্দেই দাঁড়িয়ে রইলেন, সুতরাং হরদয়ালকেও সেখানে দাঁড়াতে হল। রানী যেন গায়ে রোদ লাগাচ্ছেন, যেন-বা কথা বলার জন্যই কথা বলা, থেমে থেমে কথা বলছেন। রানী বললেন, 'হরদয়াল, কলকাতার বাড়ি সম্বন্ধে আর-কিছু ভেবেছ'?

'আহিরিটোলার বাড়িটা কেনা যায়, আর কালীঘাটের দক্ষিণে গিয়ে হেস্টিংয়ের বাড়ি ছাড়িয়ে সেই জমিটা দেখতে বলেন...

'উৎসবের পরেই তাহলে কলকাতায় যাও। এদিকে নরেশের তৈরি বাড়ির সামনে বসানোর গাড়িবারান্দার নকশা কি দেখলে? সব ইংরেজি বাড়িতেই নাকি তা থাকে। ভালো হবে? খ্রিস্টমাসে এবার রাজুর কলকাতায় যাওয়ার কথা কী ভাবলে'?

'নকশাটা আর-একটু দেখে আপনাকে জানাব। খ্রিস্টমাসের জন্য আপাতত আহিরিটোলার বাড়িটা ভাড়া নেওয়া যায়'।

রানী দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। হরদয়াল চিন্তা করল, এসব কথা কি এমন জরুরি? এ কি রানীর মনের কোনো চঞ্চলতাকে ঢাকার চেষ্টা? কিছু কী ঘটেছে? কথা শুনতে সে মুখ তুলেছিল, নিজে থেকেই মুখ নামাল।

রানী বললেন, 'আচ্ছা, হরদয়াল, তুমি কি ভেবেছ আমাদের নায়েবমশাই বুড়ো হয়েছেন, হয়তো চার-পাঁচ বছরে বিশ্রাম নিতে চাইবেন। তাঁর জায়গায় তখন কাজের মানুষই লাগবে। আমাদের ধরন বোঝে, তাকে ভালো লাগে এমন একজন দরকার হবে না? (রানী এই জায়গায় হাসলেন)। তাছাড়া এমন দু'একটা গোপন ব্যাপার থাকে যা গোপন রেখে চলতে হয়। আজকালকার ব্যাপার তো, নতুন লোককে ইংরেজিতে দক্ষ হতে হবে'।

'এখনই খোঁজ করা দরকার'?

'ভাবছিলাম এখন থেকেই রাজবাড়িতে অভ্যস্ত হোক, রাজুকে চিনুক, সম্ভবপক্ষে ভালোবাসতে শিখুক। আচ্ছা, আজকাল নাকি প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখা হয়। সব লাটেদের ছোট হোক, বড় হোক, থাকে একজন।

হরদয়াল হাসিমুখে বলল, 'সে-রকম লোক যদি পাওয়া যায় পরিকল্পনাটা বিশেষ ভালো'।

রানী ঈষৎ হেসে বললেন, 'জন্মোৎসবের পর নতুন কিছু করার রেওয়াজ হল দেখছি। ভেবেছি, আমলাদের বেতন বাড়ানোর সঙ্গে এই পদটার জন্যও বড়জেটে ধরা হোক। কলকাতা থেকে কাউকে আনিয়ে নেবে? আচ্ছা, তোমার বাগচীমাস্টার ভালো ইংরেজি জানেন শুনি, রাজুর সঙ্গে ভাবও। এবার রাজু ফিরবার পর থেকে প্রায় সন্ধ্যাতেই বোঠোকখানায় বসেন। দুজনে খুব কথা হয়। ইংরেজ রাজাদের গল্প। শিক্ষক তো, গল্প বলতে জানেন। ইতিমধ্যে হৈমীকে দিয়ে বিলেতি পিঠে, কেক না কী, তৈরি করিয়ে নিয়েছিল। আচ্ছা, পাঞ্চো কী? এল্ কী বিষয়'?

একটু ভেবে ইংরেজি শব্দ দুটোকে ধরল হরদয়াল, কিন্তু পাঞ্চো যে ইংরেজি পাঞ্চ, ব্রান্ডিতে লেবু-গরম জল-চিনি ইত্যাদির এক বিশেষ মিশ্রণ, একরকমের মদকে যে এল্ বলে, ইংরেজিতে কেকস্ অ্যান্ড এল্ বলে যে এক প্রবাদ চালু আছে—এসব কি রানীকে বলা যায়!

কিন্তু রানী হাসলেন। বললেন, 'আচ্ছা, এই সন্ধ্যাগুলোর জন্য বাগচীকে কি কিছু বেতন দেওয়া

উচিত'? হরদয়াল ভাবল, এতক্ষণে কথাটাকে সে ধরতে পেরেছে। বলল, 'আপনি কি মিস্টার বাগচীকে আপাতত প্রাইভেট সেক্রেটারি নিয়োগের কথা ভাবছেন'?

'ভেবে দ্যাখো, ওদিকে তোমার স্কুলও আছে'।

হরদয়াল রানীর মনের গতি বুঝতে তাঁর মুখের দিকে চোখ তুলল আবার, কিন্তু রানী ততক্ষণে আবার সুরেন-নরেশের বিষয়ে ফিরে গেলেন। বললেন, 'সিংদরজা থেকে পাকা পথটা আপাতত শিবমন্দির পর্যন্ত থাক। বসন্তে তো প্রাণপ্রতিষ্ঠা। তারপর সড়কটা ফরাসডাঙার আড়াআড়ি না-নিয়ে কায়েতবাড়ি থেকেও ওদিকে ফরাসডাঙার সীমা পর্যন্ত আনলে হয়। তুমি কি শুনেছ কায়েতবাড়ির ছেলেটি কালই আসছেন এখানে'?

হরদয়াল পথের কথায় বলল, 'আপনার হুকুম হলে তা হবে'।

কিন্তু কায়েতবাড়ির কারো আসা-যাওয়া সম্বন্ধে সে কী বলবে?

রানী ঝিকমিক করে হাসলেন, বললেন, 'ঝিলটায় এখন জল নেই বললেই চলে, ফরাসডাঙার সীমা পার হতে যা পেরোতে হবে। আগে হাঁস আসত। ওটাকে বুজিয়ো না। ওর ওপারেই ছিল ফরাসিদের ডিয়ার পার্ক। এখন একটা হরিণও বোধ হয় নেই। ওটা পিয়েত্রো এক তাসের বাজিতে তোমাদের রাজার কাছে জিতেছিল। তারও আগে অবশ্য আমার শ্বশুর পিয়েত্রোর বাবাকে বাধ্য করেছিলেন জমিটুকুকে তাঁর কাছে ইস্তফা দিতে'।

হরদয়াল কী বলবে খুঁজে পেল না। অনেকগুলো কথা হয়েছে, কোনোটাই অকার্যকরী নয়, কিন্তু কোনটা প্রধান? সবগুলো কাজ হলে ভিতরে-বাইরে এক পরিবর্তনের ছাপ পড়বে অবশ্যই।

রানী নিজেই বললেন, 'আচ্ছা, হরদযাল, তুমি সবদিকে চিন্তা করে জানিও'।

রানী নিজের ঘরে গেলেন। সেখানে নয়নতারা তখন অপেক্ষায়। রানী বসলেন। গায়ের চাদরটাকে বাখলেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বললেন, 'চলো নয়ন, স্নানে! তুমি কি বাড়ি যাবে ভাবছিলে? আজ দীঘিতে স্নান। ওদিকের ওই আলমাবিটা খোলো ; ওতেই বোধ হয় নতুন কাপড়। তোমার-আমার জন্য শাড়ি বেছে নাও'।

এগুলো প্রাত্যাহিক আলাপের মতোই। যদিও এ কি এক পরীক্ষা—এই শাড়ি বাছার ব্যাপার? সেখানে তো নানা রং নানা ঢং নানা জাতেব শাড়ি।

হরদয়াল সিঁড়ি দিয়ে নামল। এখন তারও কাজের চাপ নেই। রানী কেন ডেকেছিলেন? অন্তত আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে কথা বললেন। বাগচীমশায়কে নিয়োগের কথা বলতে? রানী যেমন চাইছেন বাগচী তেমন একজনই বটে।

ইংরেজি ভাষার দখলে যে-কোনো ইংরেজের সমকক্ষ। পরবর্তীকালে স্টেটের দেওয়ান, নায়েব ম্যানেজার যা হয় একটা হবেন। কিন্তু এখন কী কাজ হবে তাঁর? প্রাইভেট সেক্রেটারিদের কী কাজ থাকে? মনিবদের চিঠিপত্র আদানপ্রদান কিংবা দেখাসাক্ষাতের ব্যাপারে মনিব এবং বাইরের জগতের মাঝখানে বাফার? কিন্তু আসল কাজ কি মনিবের চিন্তার প্রতিফলক হওয়া? চিন্তার প্রতিফলক! বেশ কথাটা, আয়না যেমন ব্যক্তির—যেমন সে নিজেই বুঝি-বা রানীর চিন্তার প্রতিফলক হয়ে পড়ছে। হরদয়াল কিছুটা কৌতুক বোধ করল। কিন্তু এ তো বোঝাই যাচ্ছে, রানীর সবগুলো প্রস্তাবের মধ্যে যেন সবলতর হয়ে ওঠার ভাব ছিল। তাহলে কোনো কারণে কি দুর্বল বোধ করছিলেন?

নিজের কুঠির কাছাকাছি এসে কেকস্ অ্যান্ড এল্ এই বাক্যাংশ যেন আবার শুনতে পেল। ও দুটোর সমন্বয় তার কাছে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হচ্ছে। কিন্তু কে আনল কেক রাজবাড়িতে?

কোন ময়রা মিষ্টান্ন পাঠায়, অন্দরে কোথায় কী মিষ্টান্ন তৈরি তা কাছারিতে জানার কথা নয়। সেজন্য রাজবাড়ির গোমস্তা-সরকার আছে। কিন্তু বিজাতীয় এই কেক যা বাগচী-বাড়িরও নয়? কে হৈমী যে বিজাতীয় কেক তৈরি করতে পারে রাজবাড়ির ভিতরে? কে কোন পালকিতে ঢুকে রাজবাড়ির অন্দরে থেকে গিয়েছে তা-ও তোমার জানার কথা নয়, তাহলেও এটা বিস্ময়ের যে তেমন একজন কী করে কোথা থেকে এই গ্রামেই-বা এসেছে? ওটাও দ্যাখো বিস্ময়ের যে, বাগচীমশায় ইদানীং অনেক সন্ধ্যায় রাজকুমারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। বলবে, বাগচী স্কুলের শিক্ষক, তাকে তুমিই এই গ্রামে এনেছ? হরদয়াল হাসল। অবশ্য বাগচী তার এমন অধীন থাকতে পাবে না যে তিন বছর বাদেও গ্রামের অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সে নিজের সম্বন্ধ স্থাপন করবে না। তাহলেও আশ্চর্য লাগে যে সে এ-বিষয়েও জানত না!

আসল কথা, হরদয়াল ভাবল, তাহলে কি এই যে জীবনের স্রোত তাকে পাশ কাটিয়ে তার লাইব্রেরি-ঘরের বাইরে দিয়ে বয়ে চলে গেল? সে ভাবল, দেওয়ানকুঠি রাজবাড়ির এত কাছে যে রাজকুমারের পিয়ানো ঘরে বসে শুনতে পারো, তাই বলে রাজবাড়ির অন্দরে কী ঘটছে তা কি জানতে পারো যদি বানী না-জানান? এটাই বোধ হয় সেই ব্যাপার যে রানী এবং তাঁর সংসার এবং যাবা সেই সংসারের হিসাব রেখে চলে তার মধ্যে একটা অদৃশ্য পর্দা আছে বলে অনুভূত হয়। সেজন্য ওপারের সবই বিস্ময়েব আর কৌতূহলের। কী বলবে? রানীর মতোই? নাকি একটা হীরার মতো? আলো দেখে মনে হয় ভিতরটা ছুঁতে পারা যায়, কিন্তু কে কবে হীরার ভিতরে ঢুকেছে?

প্রমাণ তো আছেই। মনে হয় বাজবাড়ির সঙ্গে বাইরের যে যোগাযোগ তা কাছারির মধ্যে দিয়ে চলে। কিন্তু ইদানীং রানীর মুখে মরেলগঞ্জের সংবাদ শুনে মনে হয় না যে তাঁর নিজের লোক আছে সেসব খবর রাখতে? ইদানীং-বা কেন? দেওয়ান হিসাবে তুমি জানতে সাহবাদ পরগনায় ছ-আনি তরফ আছে যাকে কায়েতবাড়ি বলে ; জানতে, সেখানে এক কুমার আছে; জানতে, নামে তা ছ-আনি তরফ হলেও বাজার সম্পত্তি ভাগ হয়নি ; জানতে, এক ট্রাস্ট-ডিডের বলে রানীই সব সম্পত্তির ট্রাস্টি। জানতে, বছরের শেষে সম্পত্তির লাভ থেকে যে কোম্পানির কাগজ নিয়মিত কেনা হয় তা যেমন রাজকুমারের নামে তেমন সেই কায়েতবাড়ির ছেলেটির নামেও। জানতে, চার-পাঁচ বছর আগে থেকে সেই কুমার কলকাতায়। কিন্তু জানানো সেই কায়েতবাড়ির সঙ্গে এই রাজবাড়ির ঠিক সম্পর্কটা কী। রানী বলেননি। কর্মচারীরা, গ্রামের লোকেরা কি জানে, আন্দাজ করে? কিন্তু দেওয়ান না-জানতে চাইলে কে নিজে তা বলতে চাইবে? সেই ট্রাস্ট-ডিড সে কখনও দেখেনি। এটা এখানকার নিয়ম রানী কাকে কী করতে বলেছেন তা নিয়ে আলোচনা হবে না।

তাহলেও, হরদয়ালের অনুভব হল, আগে হলে বাগচীর এইসব আসরের কথা সে জানত। এই ঘটনাটা সেই কথাই মনে করিয়ে দেয় সে দেওয়ান নয় আর, আব রাজকুমারের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই।

আসল কৌতুকটা অন্যত্র। রানী কী চাইছেন? সেক্রেটারি না টিউটর? নাকি বয়স্য চাইছেন যে বাগচীর মতো স্থিতধী এবং সৎচরিত্র, মদ খায় কিন্তু মদ্যপ নয়। সে নিজে এসেছিল রাজকুমারের সেই পাঁচ বছর বয়সে টিউটর হয়ে। টিউটর এবং রাজকুমারের দিনমানের সঙ্গী। তারপর ক্রমশ বদলে গেল। রাজকুমার তখন তেরো-চোদ্দো হবে। ক্রমশ পিয়েত্রো বুজরুক তার দিনের বেশিরভাগ নিতে লাগল। সে নিজে অবশ্য তখন কাছারিতে বহাল। বুজরুক মাঝে মাঝেই আসত বাজকুমারকে নিয়ে যেতে। সেসব কি রানীর ইচ্ছাতে? এখন পিয়েত্রো, বুজরুক নেই। সেজন্যই কি নতুনতর সঙ্গী হিসাবে বাগচী? তাহলে কিন্তু অবাক হতে হয়। ভাবল হরদয়াল, সবটার পিছনেই কি পরিকল্পনা ছিল রানীর? কলকাতার শিক্ষা দিতে তাকে নিযুক্ত করে পরে পিয়েত্রো, বুজরুককে উপযুক্ততর মনে হয়েছিল? আর এখন পিয়েত্রো, বুজরুকের কাল চলে গিয়েছে বলে বাগচী?

হরদয়াল নিজের উত্তেজনায় হাসল। নিজের উপমাকে মনে ফিরিয়ে আনল। মনে-মনে বলল : নিজেই বলছ, হীরার ভিতরে ঢোকা যায় না। কিন্তু রানীমাতা, এটা আপনার হাতড়ে-হাতড়ে চলা হতে পারে, যেমন আমরা চলি। নতুবা বলতে হয় পুরুষদের মধ্যে দয়াল, পিয়েত্রো, বাগচী যেমন ক্রমে-ক্রমে, স্ত্রীদের মধ্যে তেমন নয়নতারা, কেট, বর্তমানে হৈমী।

৩

স্নানে চলেছেন রানী, সঙ্গে নয়ন। পিছনে কিছু দাসী কাপড় ইত্যাদি নিয়ে।

অন্দরমহলের চতুষ্কোণ পার হয়ে প্রাচীরের মধ্যেই এই আর-এক মহল। মন্দির, নাটমন্দির, তাদের পিছনে শালবন, শালবনের পাশে দীঘি। বন অর্থে ঝোপঝাড় নয়, আগাছাও নয়। বরং গাছগুলোর তলা যেন নিকানো এমন পরিষ্কার। গাছের ফাঁকে-ফাঁকে পথ। সেই বনের সামনে সোনালি গম্বুজওয়ালা লাল নাটমন্দিরসমেত সাদা মন্দির।

এখানে কারো কৌতূহল জাগতে পারে মন্দিরটা ঠিক এখানে এমনভাবে কেন?

মন্দিরের চেহারা নাটমন্দিরের চেহারা দেখে মনে হয় যথেষ্ট যত্ন আছে। কিন্তু এই রাজবাড়িরই যেখানে জাঁকজমকে রানীর জন্মতিথির কালীপূজা হয়, সে তো কাছারির দিকে—সদরে, প্রাসাদের এক অংশে। এই মন্দিরটিকে যেন কেমন লুকানো মনে হয়। শালবনের জন্য এই ধারণাটায় জোর পড়ে। আলো যখন ম্লান তখন হঠাৎ কারো মনে হতে পারে এই মন্দির পরিত্যক্ত।

বিষয়টি আসলে কিন্তু পার্থক্য। কাছারির কাছে সদরের আচার-আয়োজনের সঙ্গে এই মন্দিরের সেগুলির কিছু প্রভেদ দেখা যায়। সেখানে উৎসবের অঙ্গ হিসাবে দশটা ঢাকে কাঠি পড়ে, তেড়ে-তেড়ে কাড়া-নাকাড়া বাজে, বিদ্যাসুন্দরের পালাগান হয়, এবার তো শোনা যাচ্ছে নাকি ঠিয়াটারই হবে। এখানেও বাজনা বাজে, তা কিন্তু মৃদু বাঁশি আর ঢোল, কদাচিৎ জগঝম্পর একটানা ঝমর-ঝমর। এখানে নাটমন্দিরে কখনও কীর্তন হয়, মুষ্টিমেয় শ্রোতার সামনে কীর্তনীয়া পদাবলীর সঙ্গে আখর যোগায়, ক্বচিৎ কখনও কথকতা।

এই পার্থক্যগুলির কারণ সম্বন্ধে নানা গল্প আছে। এক গল্প বলে : এই বংশের বৃন্দাবনী গুরু, গুরু-পরম্পরায় যিনি নাকি শ্রীজীবের বংশধর, তিনি এখানে প্রায় পাঁচ বছর ছিলেন। এবং সাধনা করতেন। এবং তাঁর প্রত্যাদেশেই এই রাধামাধব বিগ্রহ। এই শালগাছগুলি তখনকার। যদি দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে মেহগ্নিও আছে তবে বুঝতে হবে সেগুলিই পরে লাগানো। সাধনার জন্য নিভৃত স্থানই প্রশস্ত। এখন (সাধনাটা বোধ হয় নেই) কিন্তু নিভৃতিটা আছে। পূর্ণিমা কিংবা তার আগের কয়েকটি রাত্রিতে শালবনে যখন জালিকাটা আলো তখন এই মন্দিরের কাছে, কারো তেমন চেষ্টা থাকলে, সে নিভৃতিকে খুঁজে পেতে পারে।

অন্য গল্প এই যে, কাছারিতে নানা ধর্মমতের লোক আসে। আরো আগে তো ভিন্ন ধর্মমতের এমন কেউ-কেউ আসত যাদের মুখ থেকে কথা খসলে দু-চারটে মন্দির চূর্ণ হয়ে প্রমাণ করতে পারত প্রকৃতপক্ষে সেসব মন্দিরের বিগ্রহরা সবই ঠুঁটো জগন্নাথ, ভক্তকে রক্ষা করা দূরে থাক আত্মরক্ষাও করতে পারে না। অথচ তখন এমন অবস্থা যে রাজবাড়ির কর্তাব্যক্তিদের ওঠা-বসা কাজকর্ম সবই সেই ক্ষমতাবান ভিন্ন ধর্মমতের মানুষের সঙ্গে। তাঁরা এলে, কাছারিতে, এমনকী প্রাসাদের কোনো-কোনো ঘরেই, ওঠাবসা এমনকী আহার না-হোক একত্রে মদ্যপান তো চলতই। কর্তাব্যক্তিরা তখন শিলোয়ারচুস্ত, চোগা চাপকান পরতেন। সে-পোশাক নিয়ে কি রাধামাধবের সামনে দাঁড়ানোও যায়!

গল্প যাই হোক, এই নিভৃতির অর্থ পরিত্যক্ততা নয় তা এখনই বোঝা যাচ্ছে। দূর থেকেই মন্দিরের বারান্দায় কাজের লোকদের দেখা গেল। শীতের ছোট দিন। হয়তো অন্নভোগের আয়োজন শেষ করে

দিয়ে এখনই শীতলের আয়োজন করছে।

শিরোমণি একবার যেমন বলেছিল, রজোগুণটার প্রকাশ তবু চোখে দেখা যায়। সত্ত্ব যেন ফুলের গন্ধের চাইতেও হালকা আর অদৃশ্য, যেন লুকিয়ে থাকে। বলা হয়ে থাকে, রাধামাধব বলো, মদনমোহন বলো সত্ত্বগুণের উপাসনা। এ নিয়েও এক গল্প আছে। একজন মদনকে পুড়িয়ে ছাই করেছিলেন। অন্যজন মদনকে মোহিত করেছিলেন। মদন পায়ের কাছে লুটিয়ে স্বীকার করেছিল হার। না-রূপে না-গভীরতায় সেই একজনের প্রেমের কাছে প্রেমের রাজা মদন কিছু নয় তা স্বীকার করেছিল। তারপরে মদন কী করেছিল? সে-সম্বন্ধে এখন কবিতা লেখা হয়নি।

কিন্তু মানুষ কি পারে—কামের চাইতেও মনোমোহন কোনো অন্তহীন অতল ভালোবাসায় পৌঁছতে, তেমন কোনো রসকে আস্বাদন করতে, আহা, যা পরকীয়া প্রেমের চাইতেও মধুর? চরম সাত্ত্বিকতার সেই চরম মাধুর্য কৌপীনবন্ত কারো ভাগ্যে জুটেছে কিনা জানি না, কিন্তু মানুষের পক্ষে? বিনা দহনে আলোয় ঝলমল করা!

আর তার প্রমাণও আছে। রানী নিজেই জানেন। (তাঁর মুখে হাসির মতো কিছু! তাঁর কি এই কথাগুলোই মনে আসছে)?

কাদম্বিনী খুবই ভালো গাইতে পারত। বৃন্দাবনের সেই মন্দির ছাপিয়ে, শুধু বৃন্দাবনের পথেই নয়, তার যশ তখনকার খাস দিল্লির দিকে চলেছিল। পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার দিল্লি। দিল্লিতে তখন বাদশা। সুতরাং আমির উজির মনসবদার। উপরন্তু কাদম্বিনী তার শ্যামবর্ণ সত্ত্বেও টিকলো নাকে, টানা চোখে, শরীরের গঠনে, সুন্দরী ছিল অসামান্যই, তার সেই পঁচিশ বছর বয়সে। ফলে কাদম্বিনী বৃন্দাবন থেকে কাশী এসেছিল, বাঈজী না-হয়ে মাথা কামিয়ে গৈরিক পরে সেই কায়স্থের বিধবা নিজের চারিদিকে এক কঠিন ছদ্মবেশ তৈরি করেছিল। কিন্তু একসময়ে সে রানীর সহচরী হয়েছিল। এবং ক্রমশ সেই ছদ্মবেশ থেকে বেরিয়ে এসেছিল এক নতুন সৌন্দর্যের স্তিমিত পূর্ণতা নিয়ে। তখন অবশ্য রানী রানী হননি, কাদম্বিনীর পঁচিশ, রানীর বারো হবে। পরে কাদম্বিনী এই রাজবাড়িতেও এসেছিল, রানীর সহচরীরূপেই। দাসী বা পরিচারিকা নিশ্চয়ই নয়, বরং সঙ্গিনী, যেন-বা নতুন পরিস্থিতিতে মন্ত্রিণী। আর তার প্রমাণ তার বেশভূষাতেও ধরা পড়ত। সে আপত্তি করলেও রানী সোনার-কাজ করা বেনারসী পরলে তাকে রুপোর কাজ করা বেনারসী পরতে হতো, নিদেন ঢাকাই জামদানি।

সেই কাদম্বিনী এখানে গান করত। সেই বৃন্দাবনের গানই। বৈষ্ণব মহাজনদের পদাবলী। রানীর ধারণা তা প্রাণহীন ছিল না। কারণ কাদম্বিনী বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের জ্ঞানে যে-কোনো পণ্ডিতের সমকক্ষ ছিল। এই গান এবং এই জ্ঞানই রাজাকে আকর্ষণ করেছিল। নতুবা এটা বলার বিষয়ই হয় না। রানীরা ছাড়াও অন্তঃপুরে সবসময়েই সুন্দরী স্ত্রীলোক থাকে। তাদের কেউ-কেউ রাজশয্যায় কখন স্থান পেলে দর্পিতাই হয় ; ধর্ম গেল এবং ভক্ষিতও হলাম এরকম মনে করে না।

কাদম্বিনী একদিন চোখের জলে ডুবে রানীকে বলেছিল—আমি এখন কী করি বলো? সব শুনে রানী বলেছিলেন—তুমি আমার চাইতে বয়সে বড়, ধর্ম-অধর্ম বেশি বোঝা। তুমি যা হতে চলেছ সে সম্বন্ধেও আমি-বা কী জানি?

রানী ভাবলেন। একটা কৌতুকবোধ সেই ভাবনার খুব কাছে থাকায় তার ঠোঁটদুটিতে হাসি জড়ানো। আসলে সূর্যও কি পারে বিনা দহনে শুধু আলো দিতে! আর আমরা মানুষেরা তো সূর্যেরই সৃষ্টি।

কাদম্বিনী বলেছিল—আমি কায়স্থ, আমি বিধবা, আমি রাজার বিবাহিতা স্ত্রী নই। সেদিন রানীর মুখ লজ্জায়, ব্যথায় লাল হয়ে উঠেছিল হয়তো। (এখন তা রানীর মনে পড়ে না। সেই তো প্রথম জানা গেল নিঃসন্তান রাজার সন্তান হতে চলেছে। সপ্তদশী রানী তখন নিজের শরীরের অবস্থাকে কিছু সন্দেহ করছে মাত্র, আর এদিকে কাদম্বিনী নিজের অভ্যন্তরে সত্তাটাকেই উপলব্ধি করছে)। রানী বলেছিলেন—এ নিয়ে তুমি খুব লজ্জিত বা অপমানিত বোধ করছ এরকম অন্তত রাজার কানে ওঠা ভালো হবে না। বিবাহিত

না-হলেও রাজবাড়িতে থাকাই তোমার পক্ষে ভালো হবে। সামান্য কিছু মাসোহারা নিয়ে অন্য কোথাও থাকলে কোথায় নেমে যাও তা বুঝে দ্যাখো। গান্ধর্ব মতটাকে যখন মেনেছ তার উপরে বিশ্বাস রাখো।

এখন কাদম্বিনী তার টিকলো নাকে তেমন সরু করে তিলক কাটে। কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করে। কায়েতবাড়িতেও তার মহলটাই আলাদা। আসল ব্যাপারটা এই যে মানুষের পক্ষে সেই প্রেমোত্তর প্রেমের সাধনা খুবই কঠিন। কিন্তু তাহলেও প্রত্যয়টাও মিথ্যা নয়। সুগন্ধির ঝাঁপি যদি ঠাসা ভরতি না-হয় তবে সুগন্ধি বস্তুগুলোর উপরে যে-অন্তরীক্ষ, সেই ঝাঁপিতে তা অদৃশ্য সুগন্ধে ম-ম করে। যেমন রাজবাড়ির পিছনে এই শালবাগান। হয়তো বাদশাহি ফরমানের যে-রাজা পাটনা অযোধ্যা হয়ে দিল্লি তক্ যাতায়াত করত তার মনে মধ্যেও কোথাও এমন একটা অসাধারণের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ছিল যা সার্থক হলে রূপ-সনাতনের বৈরাগ্য হয়।

রানীর মুখ অন্তর্লীন হাসিতে উজ্জ্বল দেখাল। পায়ের তলায় শুকনো শালপাতা বিছানো পথ।

নয়নতারা বলল, 'বনমর্মর বলে নাকি একে'?

নয়নতারার দুষ্টুমিতে আবার হাসলেন রানী।

এটাও কিন্তু কম কৌতুকের নয় যে রানী আজ খিড়কির দীঘিতে স্নানে চলেছেন। স্নানের জন্যই তো দীঘি এবং সেখানকার বাঁধানো ঘাট এমনকী পুরনারীদের জন্য স্নানের ঘর আছে, জলের উপরে— তা সত্ত্বেও। এবং এখানে চলতে গিয়ে এ পুরনো কথাগুলো যেন তাঁর মন ছুঁয়ে যাচ্ছে। ঠিক ভাবছেন এমন নয়, যেন মনে ঢুকতে দিচ্ছেন। কৌতুকটা এই যে এভাবে এ-পথে স্নানে এসেই কি এমন হল, অথবা মনে আসছিল বলেই তিনি এ-পথে এসেছেন আজ?

রানী সংবাদ পেয়েছেন কাদম্বিনীপুত্র, অন্য কথায় কায়েতবাড়ির ছেলে, রাজবাড়িতে আসছে। রাজুর জন্মের পর এই প্রথম। রাজুর মনে কি ধাক্কা লাগবে? যখন তাদের সাক্ষাৎ হবে?

পরে না-হয় ভবিষ্যতের কথা ভাববেন, কিন্তু অতীত? অতীত আর ভবিষ্যতে এই তফাত যে অতীত নিজের মনেরই এক অংশ যেন।

'কাদম্বিনীকে এরপরে অন্যত্র থাকতে হয়'। গম্ভীর খাদের গলা ছিল রাজার।

'তা তো বটেই। (কী-বা বুদ্ধি তখন সেই সপ্তদশী রানীর!)—আপনি কি বাগানবাড়ির মতো কিছু ভাবছেন'?

'সে-রকম কিছু। যদি বলো কলকেতার দিকে যেমন হচ্ছে তেমন একটা দূরে শাহাবাদ পরগনায়'।

'তাই হোক। কিন্তু তা রাজবাড়িই হোক। নতুবা কাদম্বিনী ছোট হয়ে যায় না? আর সে ছোট হলে আমারও সম্মান থাকে না'।

তাই হয়েছিল। শা'বাদ পরগনার আয়েও একটা রাজবাড়ি চলে বইকি। আর সেখানে কায়েতের মেয়ে কাদম্বিনী একা নয়, যেন এটা নীচ কিছু নয় এরকম বোঝাতে, এ-বাড়ির অনেক আশ্রিত সে-বাড়ির আশ্রয়ে গিয়েছিল, অথবা তাদের তেমন রাখা হয়েছিল। আর আশ্রিত মানুষরা যদিও তারা রাজার আত্মীয় এবং কায়েতও নয়, কাদম্বিনীর সম্বন্ধে উন্নাসিক হবে এমন হয় না।

শা'বাদ পরগনার কাছারি অবশ্য অন্যান্য পরগনার কাছারির মতোই নায়েব-ই-রিয়াসতের অধীন। আর আয়ব্যয়ের শেষ হিসাব সুমার-নবিশ দেখে থাকে।

রাণী বললেন, 'আচ্ছা, নয়নতারা, তুমি কি কখনও কায়েতবাড়ি গ্রামে গিয়েছ? নাম শুনছ নিশ্চয়'?

'হ্যাঁ, সদরে যেতে পড়ে। সেখানে এক জমিদারবাড়ি আছে, যারা নাকি কায়স্থ'।

'সেখানে একজন কুমার আছে যার বয়স রাজুর কাছাকাছি, জানো'?

'শুনিনি তো'।

'সে আমাদের রাজবাড়িতে আসবে লিখেছে'।

'আমাদের রাজকুমারের সঙ্গে পরিচয় বুঝি'?

'না। রাজু কবে কায়েতবাড়ি গেল? তাছাড়া সেই কায়েত কুমার তো পাঁচ-ছ বছর বয়স থেকেই বেশিরভাগ কলকাতায়'।

রানী আলাপটাকে অন্য দিকে নিলেন। বললেন, 'তোমার সঙ্গে হৈমীর আলাপ হল, নয়ন? মেয়েটি ভালো নয়। বেশ সুন্দরী, কি বলো'?

নয়নতারা বললে, 'বেশ কম বলা হয়'।

রানী হাসলেন। বললেন, 'ভাগ্যে মেমসাহেব বলোনি। রাজুর একরকম মামাতো বোন, ওদের শাখাটার রং ওরকমই'। কিন্তু দুঃখের ছায়া পড়ল রানীর মুখে। বললেন, 'তুমি ওর কথা জিজ্ঞাসা করছিলে না? কিন্তু কী কপাল! তোমাদের বয়স হবে, এর মধ্যে দু'বার কপাল পুড়িয়েছে। জানো, ওর বাবা পাটনায় কমিসেরিয়টে ছিলেন। বালবিধবা মেয়েকে সব আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করেছিলেন। পাটনার কুঠিব পার্টিতে যেত। সেখানে শেষ পর্যন্ত এক ইংরেজ না কী আইরিশ ক্যাপটেনের সঙ্গে প্রণয় পরিণয় হয়। কিন্তু দু'মাস পরেই দানাপুরেব কাছে কানোয়ার সিংকে রুখতে গিযে আর ফিরল না'।

নয়নতারা কী বলবে খুঁজে পেল না। অবশেষে এই সাদা প্রশ্নটা করল, উনি কি খ্রিস্টান'?

রানী বললেন, 'বিবাহটা চার্চে হয়ে থাকবে। কিন্তু তাই বলে কি ধর্ম বদলেছে? মনে হয় না। জিজ্ঞাসা করিনি। ওর বাবা অনেক সাহস করেছিল, কিন্তু এখন ফিরিয়ে নিতে সাহস পাচ্ছে না। দোষ দেওয়া যায় না, তার ছোট বাড়িতে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায়'।

দূর থেকে যাদের দেখা গিয়েছিল মন্দিরের বারান্দায় এখন তারা স্পষ্ট। তারা সকলেই ব্যস্ত। তারা কেউ ক্ষীরছানায় মিষ্টি গড়ছে, কেউ লুচির ময়দা নিয়ে ব্যস্ত। তারাও রানীকে দেখেছে। আজ কেউ কাজে ফাঁকি দিচ্ছে না, সুতরাং কর্মরত অবস্থায় রানীর দৃষ্টিতে পড়তে পেরে তারা ববং খুশি হল।

রানী ওদের থেকে কিছু দূরে বাবান্দায় বসলেন। রানীর পা নিচের সিঁড়িতে। রানী জুতো পরেন না, পায়ে আলতাও দেন না। তিনি তেমন কবে সিঁডিতে পা রেখে বসেছেন বলে জানা গেল, পায়ে গুল্‌ফের নিচে সরু পাটিহারেব মতো পায়জোর। ঘুণ্টি নেই, তাই নিঃশব্দ; অযত্নে রুপোটা কি কিছু ম্লান?

এখন কি রানী এখানে গল্প কববেন? যেহেতু প্রাচীনাগণ পরিচাবিকা শ্রেণীর নয়, বরং দূবের হলেও আত্মীয়াই, এখানে গল্প চলতে পারে।

আজ ভোগের আয়োজন কী হযেছে, শীতলের আয়োজন কী-কী হবে এসবই আলাপে এল কারণ এসবই তো সেই একজনের যিনি রাজার রাজা। আজ শীতল-প্রসাদ কার বাড়িতে যাবে তা আলোচনার পর যখন জানা গেল, আজ তা লিস্টি অনুযায়ী শিরোমণিমশায়ের বাড়িতে যাচ্ছে, তখন সেই সূত্রে যেন আলাপটা ফেঁপে উঠতে পারল। এটা একটা প্রথা, শীতলের প্রসাদ গ্রামের ভদ্র গৃহস্থদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। একশো জনের নাম আছে তালিকায়, ঘুরে-ঘুরে সেই তালিকা অনুযায়ী বাড়িতে যায় প্রসাদ। গ্রামের একশত ভদ্র পরিবার—বলা বাহুল্য তারা কিছু পরিমাণে অর্থবান, এবং এমন যে অনাহূত ভাবে রাজবাড়ির মন্দিরে প্রসাদ পেতে আসবে না।

শিরোমণির নামের সূত্রেই একজন বলল, 'অনেকদিন কথকতা হয় না। সামনে পূর্ণিমা। বললে হয় শিরোমণিকে'।

রানী বললেন, 'কেউ-কেউ বলে শিরোমণির কথকতা কাঠ-কাঠ'।

'সংস্কৃত বেশি থাকে। কিন্তু অমন ব্যাখ্যাও সহজে কেউ দিতে পারে না। গতবারে মানভঞ্জনের ব্যাখ্যা যা করেছিলেন তা এখনও যেন কানে লেগে আছে। আমরা কি জানতাম যিনি তাঁর হ্লাদিনী শক্তি, যিনি প্রায় অভেদ তাঁর থেকে, তাঁরও এমন অভিমান উচিত নয় যে তিনিই ঈশ্বরকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসেন, ঈশ্বর তাঁরই একমাত্র। ঈশ্বর চন্দ্রাকেও কৃপা করবেন। সেজন্য মান করা শোভা পায় না। আমি সবচেয়ে বড় ঈশ্বরভক্ত এটাও তো সাধনার বিঘ্ন'।

হেসে রানী বললেন, 'তোমার ব্যাখ্যাও কম যায় না, সুরধুনি। বেশ তো, শিরোমণির বাড়িতে যে

যাবে শীতল নিয়ে তাকেই বলে দিও শিরোমণিকে কথকতার নিমন্ত্রণ দিতে'।

আমার তো মনে হয় বিরুদ্ধপক্ষীয় নেতা হওয়া মানুষের স্বভাবেই থাকে। সেই আসরেও একজন ছিল। ক্ষণকালের আসর, রানী এখনই উঠবেন স্নানে, কিন্তু মনের মধ্যে বিরোধপ্রবণতা নিজেকে নিয়েই একশো।

তেমন একজন বললে, 'নয়ন নাকি এবার ফিরেই শিরোমণিদের ব্রাহ্মণভোজনের নিমন্ত্রণ দিয়েছিলে'?

'শিরোমণিদের নয়, শুধু তাঁকেই'। নয়নতারার মুখটা যেন একটু লাল হল।

'তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন, আর তারপর বলতে পারোনি কাউকে আর'?

যেন নয়নতারাকে প্রত্যাখ্যান করায় শিরোমণির রাজবাড়িতেও অনাদৃত হওয়া উচিত।

আর-একজন বলল, 'আমাদের রাজবাড়িতে তো ব্রাহ্মণ কর্মচারীর অভাব নেই'।

অপরা বলল, 'তারা অন্তত বাধ্য হয়েই আসত'।

নয়নতারা মুখ নামিয়ে নিজের পায়ের দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু রটাল কে এই প্রত্যাখ্যান? এই শেষ প্রশ্নটাই-বা কে করল? তা কি রানীর দৃষ্টি?

রানী যখন কথা বললেন, তাঁর গলাটা গম্ভীর শোনাল। তাঁকেও কথা বলতে সময় নিতে হয়েছে। বললেন তিনি, 'তোমার কি ব্রাহ্মণভোজনের দিন পার হয়ে গিয়েছে? ওরা যেমন বলছিল তাও করতে পারো, নয়ন'।

নয়নতারা রানীর দিকে চাইল। তার চোখের পাতা দুটো কি কাঁপল? সে ধীরে-ধীরে বলল, 'তাতে কি শিরোমণিকে অপমান করা হবে না'?

রানী হাসলেন। এ হাসির নানা অর্থ করা যায়। একটা অর্থ এই হতে পারে, তোমার বুদ্ধিকে বিশেষ পছন্দ করলাম। কিন্তু যে শুরু করেছিল আলাপটা তার মুখ ততক্ষণে কালো হয়ে গিয়েছে। বিশ্রী এই শব্দটাই যেন অন্যান্যদের মুখ থেকে বেরুবে। শিরোমণির প্রত্যাখ্যানটা যে রাজু এবং নয়নতারার সম্বন্ধ নিয়ে নানা কল্পনা থেকে ঘটছে তাতে সন্দেহ নেই। রানীর মনে, আলোচনাটা কুৎসিত—এই কথাটাই এল। যেন কেউ ক্রুদ্ধও করে তুলেছে তাঁকে। কে সেই ক্রোধের পাত্র? যারা শিরোমণির কথা তুলেছিল? তারা তো বিবর্ণমুখ, যন্ত্রের মতো হাত চলছে শুধু। অথবা ক্রোধের পাত্র কি শিরোমণি? কিংবা নয়নতারা? ক্রোধের পাত্র খুঁজে না-পেয়ে কি তিনি নিদারুণ রকমে হেরে যাবেন? তাঁর একবার মনে হল এ রকম আকস্মিকভাবে কথাটা উঠে পড়ল কেন? সেজন্যই বিষয়টাকে আয়ত্তে রাখতে পারছেন না! অথবা প্রকাশ আকস্মিক হলেও একদিন এ তো আলোচনার বিষয় হতোই। অতীতের সেইসব তো ছেলেমানুষি মোহ ছিল রাজুর। এখন?

হঠাৎ যেন তাঁর মনে কাদম্বিনী ফিরে এল। কাদম্বিনী আর নয়নতারার পার্থক্য কি সেকাল আর আধুনিকতায়? কিংবা কাদম্বিনী নিজেকে রাজবাড়ির বাইরের সমাজে কখনও নিয়ে যায়নি যেমন নয়নতারা শিরোমণিকে আহ্বান করতে গিয়ে করেছে? কিংবা কথাটা আধুনিকতাই হয়তো। বাদশাহি ফরমানে যে রাজা তাকে যা মানায় রাজুকে তা মানায় না!

কিন্তু রানী গলা তুলে বললেন, 'এই দ্যাখো, মনে পড়ে গেল, নয়ন, তুমি আর রাজু যে সেদিন অত গভীর রাত করে ফিরলে শিকার থেকে সে গল্পই আমার শোনা হয়নি। স্নান করতে-করতে শুনব'।

নয়নতারা বলল, 'তাহলে চলুন, রানীমা, বেলা হচ্ছে'।

রানী চলতে শুরু করলেন। তাঁর মুখে ক্লান্তির পাশে স্নিগ্ধতা ফুটবে এবার মনে হল। কিন্তু তাও কি সহজে! পাশে এখন নয়নতারা রয়েছে তো! তিনি যেন নিজেকে তিরস্কার করবেন এরকম এক মনোভঙ্গির কাছে গেলেন একবার। যেন-বা নিজেকে বলবেন এমন করে সমস্যাটা থেকে দূরে থেকেছ বলেই এমন বিস্ফোরণ হল তোমার নিজেরই অন্দরমহলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি নিজের ব্যক্তিত্বকে, যেমন অন্য সকলে, শ্রদ্ধা করেন। তাকে হীন করলে কি তিনি কিছু করতে পারবেন আর? নয়নতারা

এবং রাজুর ব্যাপারটা ওদেরই নিজস্ব। সেটা কি আদৌ কিছু ব্যাপার? নয়নতারাকে হীন করলে ব্যাপারটা মলিন হয়ে যায়।

তিনি বললেন, 'নয়ন, তোমার সঙ্গে বিদ্যেসাগরের মত মিলছে না মহাভারতে, শিরোমণির সঙ্গে মিলছে না ব্রাহ্মণভোজনে। আমার মনে পড়ছে আগে এ রকম কথা ছিল গ্রামে তোমার দাদা ন্যায়রত্নের মত মেলে না কারো সঙ্গেই'।

নয়নতারা বলল, 'ন্যায়রত্ন বলতেন মহাভারত বৃক্ষ'।

'সেই যার মূল ধৃতরাষ্ট্র মহারাজা? সে তো সাধারণ মতই'।

'ঠিক তা নয়। বলতেন বৃক্ষ জমি অনুসারে বৃদ্ধি পায়। মন অনুসারে মহাভারতের বৃদ্ধি'।

'কথাটা ভেবে দেখার মতো'।

রানী স্থির করলেন তাঁকে এবার থেকে ভাবতে হবে। কিন্তু এখন নয়, অন্তত নয়নতারার পাশে থেকে নয়, যেমন নয় বিবর্ণমুখ তাঁর সেই বর্ষীয়সী আত্মীয়াদের কাছে বসে। বিষয়টাকে নিজের আয়ত্তে এনে চিন্তা করতে হবে।

রানী বললেন, 'আ, নয়ন, ফরাসডাঙার ব্যাপারটা ভাবতে হয়। ওরা কী করছে? এবার শিবচতুর্দশীতেই কি সেখানে পুজো হবে? কেউ সেদিকটাকে দেখছে না যেন। ওদিকটার ভার নেবে? প্রকৃতপক্ষে রাজবাড়ির পুজোটুজোর ব্যাপারে বিশেষভাবে যাকে দায়িত্ব দেওয়া যায় এমন একজন কেউ নেই। নেবে সে ভার'?

'আপনার প্রয়োজন হলে তা করব'।

একবার রানী ভাবলেন নয়নতারার পাশে কি সত্যি তিনি ক্ষুদ্রকায়া ও মলিন হয়ে গেলেন? তা অবশ্যই নয়। নয়নতারা এখন প্রাপ্তবয়স্ক রাজুকেও প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে এটা ভাবতে গিয়ে তেমন বোকামির কথা মনে এসে থাকবে? আসলে তিনি যা অনুভব করছেন তাকে কথায় আনলে এরকম হয়? আর দ্যাখো এই গরবিনীর রূপ, এই রূপসীর তেজ। চোখ দুটোকে দেখেছ'?

স্নানের ঘাটে বসলেন রানী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সুতরাং একদিন পরেই নয়নতারা রাজবাড়ির পালকিতে ফরাসডাঙা চলেছিল। তখন শীতের আরামদায়ক উষ্ণতার মধ্যাহ্ন। যোগাযোগের ফলে নয়নতারার পালকিতে হেডমাস্টারের স্ত্রী ক্যাথরিন, কেট। পালকির পাশে, কখনও কিছু আগে, রাজকুমার রাজচন্দ্র তার খয়েরি কালো প্রকাণ্ড ঘোটকীতে। পালকির কিছু আগে হাওদাদার হাতি, পায়ে-পায়ে কয়েকজন বরকন্দাজ, পালকির পিছনে আর কয়েকজন বরকন্দাজের আগে-আগে রূপচাঁদ। একটা চোখ ধাঁধানো শোভাযাত্রা।

যোগাযোগটা এই রকম। নয়নতারা আহারদি শেষে বন্দোবস্ত মতো নিজের বাড়ি থেকে রাজবাড়ির পালকিতে রওনা হয়েছিল, পালকির সঙ্গে একজন বরকন্দাজ থাকেই। রাজুর তা জানার কথা নয়। আহারাদি শেষে দুপুরের রোদ ঝুল-বারান্দায় যেখানে আরামদায়ক সেখানে দাঁড়িয়ে সে অন্যমনস্ক হয়ে নিচে কাছারি চত্বরে হাওদাদার হাতি, রূপচাঁদ, বরকন্দাজ প্রভৃতি দেখছিল। কে যেন বলল, এরা কুতঘাটে যাবে। কুতঘাট বর্তমানে ফরাসডাঙা ঘেঁষে পড়েছে। তাতে রাজুর মনে হল সে-ও ফরাসডাঙা যাওয়ার কথা ভাবছে। এই দুপুরটা তো যাওয়ার মতোই। সুতরাং সে আস্তাবল থেকে নতুন ঘোটকটাকে আনিয়ে রওনা হয়েছিল।

রাজচন্দ্রর ঘোড়া যখন হেডমাস্টারের বাড়ির কাছে, সে দেখতে পেয়েছিল গেটের বাইরে টপ্‌হ্যাট মাথায় ছাতা হাতে বাগচী, গেটের ভিতরে কিন্তু গেটের উপরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে কেট। সে সুতরাং লাগাম টেনে সেখানকার রোদে দাঁড়িয়ে গল্পে জমেছিল।

রূপচাঁদ গঞ্জের পথে উঠেই রাজবাড়ির সেই ঝালরদার আট বেহারার পালকি দেখে মাহুতকে হাতি ধীরে নিতে বলে পালকির দিকে নিজে এগিয়েছিল। পালকির কাছে যেইমাত্র বুঝেছে পালকিতে নয়নতারা, তখনই অদূরে হেডমাস্টারের গেটের সামনের দৃশ্যটাও দেখতে পেল। বলল, 'রাজকুমারকে দেখছি'।

রূপচাঁদের কথায় পালকির দরজা আর-একটু মেলে নয়নতাবাও রাজকুমারকে দেখতে পেয়ে পালকি থামিয়েছিল।

নিজেদের অজ্ঞাতসারে পালকি, হাতি, রূপচাঁদ এবং বরকন্দাজেরা যে শোভাযাত্রা তৈরি করেছিল তা নিঃশব্দও নয়। বেহারাদের হুমহাম, হাতির গলাব ঘণ্টা তো ছিলই। পালকির ঝালরে, হাতির জামায়, বরকন্দাজদের পাগড়িতে তা রংদারও বটে।

নয়নতারা স্পষ্ট কিন্তু নিচু গলায় বলল, 'বেশ একটা ছবিই যেন। তার বক্তব্য ছিল কেট, বাগচী ও রাজকুমারের সংযোগকে উদ্দিষ্ট করে।

বাজচন্দ্র মুখ ফিরিয়ে নয়নতারাকে দেখে হেসে বলল, 'কোথায চলেছ? দ্যাখো-দ্যাখো কেট, কবরেজমশায়ের রোগী দেখতে যাওয়া কাকে বলে'।

নয়নতারা বলল, 'প্রজাদের নানা উপজীবিকা থাকাই স্বাভাবিক'। কিন্তু সামনে-পিছনে চেয়ে সেই জৌলুস চোখে পড়ায় সেও বিস্মিত এবং লজ্জিত হল। উপরন্তু বাগচীও তাকে বিস্মিত হয়ে দেখছে, আর বাগচীর সঙ্গে ছদ্ম-ব্যবহারও চলে না। নয়নতাবা একেবারে সহজ হয়ে বলল, 'ক্যাথরিন, ফরাসডাঙার মন্দির দেখতে যাচ্ছি। তুমিও এসো না। এতক্ষণে তোমাদের লাঞ্চো নিশ্চয় শেষ হয়েছে'।

কেট না-যাওয়ার অজুহাত হিসাবে বলল হাসিমুখে, 'জৌলুস থামিয়ে তো পোশাক করা যায় না, আর পোশাক না-কবে জৌলুসেও যাওয়া যায় না'।

নয়নতারা সুবিধা পেয়ে বলল, 'যে পোশাকে বাজকুমারের সঙ্গে দেখা করা চলে সে পোশাকে তার বাজ্যে সর্বত্রই মুখ উঁচু করে চলা যায়। এসো এসো'।

বাগচী হেসে বলল, 'যুক্তিতে হারলে কেট। অন্য কহ আর। কিংবা যাও না বোদটা গায়ে লাগাতে'!

রাজকুমাব বলল, 'গেট ইন, গেট ইন'।

নয়নতারা বলল, 'ওমা, ইংরেজি বলছেন যে। শিগগির পালিয়ে এসো'।

বাকিটা অবশ্যই তরুণী মনের রঙ্গমুখিনতা।

পালকির কাছাকাছি দলপতি রূপচাঁদ থেমে দাঁড়ানোর ফলে মাহুত তার হাতিকে খানিকটা এগিয়ে পথের ধারে দাঁড় করিয়েছিল, রূপচাঁদের সঙ্গের বরকন্দাজেরা পালকির কিছু পিছনে। তাদের গন্তব্য যাই হোক রাজকুমারকে ডিঙিয়ে চলে যেতে কোনোরকমের একটা ইশারা চাই।

কেট পালকিতে উঠলে, পালকি কাহারদের কাঁধে উঠলে, নয়নতারা মুখ বাড়িয়ে বলল, 'আগে-আগে চলুন বাজকুমার'। রাজচন্দ্র বরং দ্বিধা করল। ফরাসডাঙায় সে যেজন্য যাচ্ছে তা কি নয়নতারাদের সঙ্গে গেলে সার্থক হয়? তখন নয়নতারা হেসে কেট আব রাজচন্দ্র যাতে শোনে শুধু এমন গলায় বলল, 'দ্যাখো কেট, তোমাকে বলেছিলাম, হিন্দুদের অমন যে সদাশিব তারও বর দিতে কত বায়নাক্কা'। কেট সম্ভবত নয়নতারা কবে এরকম বলেছিল কী অর্থে তা ভেবে দেখতে গেল, ফলে সে নয়নতারার ভ্রূর জ্যামুক্ত তিরটাকে দেখতে পেল না।

সুতরাং তাদের গন্তব্য যাই হোক, হাতি, হাতির পরে তার খয়েরি-কালো ঘোটকীতে রাজকুমার, পরে সেই জরির ঝালরদার পালকি, তারপর ছুটন্ত বরকন্দাজদের নিয়ে রূপচাঁদ, এইভাবে সেই জৌলুসটাকে এগিয়ে যেতে দেখল বাগচী। সে ভাবল : কী এমন ব্যাপার আবার রাণিমার শিবমন্দিরে যে আজ এমন

উজ্জ্বল শোভাযাত্রা!

কিন্তু কেট এভাবে চলে যাওয়ায় তার কর্তব্য দেখা দিল। কেট কখন ফিরবে কে জানে, সে-ও সন্ধ্যার আগে ফিরবে না। তার কুঠিতে ঝি-চাকর বলতে সবেধন এক সহিস। সুতরাং তাকে ডেকে ফাঁকা বাসার দিকে চোখ রাখতে এবং মেমসাহেবের ফিরতে দেরি হলে সন্ধ্যার আগে আগে সহিস যেন কয়েকটা বাতি জ্বালায় এমন নির্দেশ দিল সে। এইসময়ে তার মনে হল তাদের কুঠিতে ঝি, চাকর, আয়া, খিদমদগার বলতে কেউ নেই।

এখন আর দ্বিধা হয় না। কিন্তু কেট তার স্ত্রী হওয়ার পরে মনে হতো বইকি বাগচীর, কেটের মতো ইওরোপীয় কোনো মহিলার কুঠিতে এদেশে অন্তত, কাজ থাক আর না-থাক, সহিস ছাড়াও একজন ফুটম্যান, একজন বাবুর্চি, অন্তত চার-পাঁচজন ঝি-চাকর থাকে। কেটের বাবা ফাদার অ্যানড্রুজের সেন্ট্রাল প্রভিন্সের মিশন-বাংলোতেও তা থাকত। প্রথম যখন এখানে তারা এসেছিল দেওয়ানজি নিজে থেকেই ঝি-চাকর ঠিক করে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। বাগচীর মনে আছে, সে নিজে বলেছিল দুজনের ছোট্ট একটা সংসার, সেল্ফ-হেল্পই ভালো হবে। কেট হেসে বলেছিল, আমাদের দেশে মধ্যবিত্তদের পরিবারে ঝি-চাকর তেমন থাকে না। এদেশে থেকে যারা টাকাপয়সা করে তাদের কথা আলাদা। পরে কেট তাকে বলেছিল, এদেশে সমাজ কোথায় যে মান রাখতে ঝি-চাকর রাখতে হবে?

এটা কিন্তু বাগচী হালকা মনে তার স্কুলের দিকে যেতে-যেতে ভাবল, সেল্ফ-হেল্প ভালো, আর সমাজে মান রাখার প্রয়োজনের অভাব কি দু-রকম কথা নয়? এইসময়ে বাগচী তার চোখের উপরেই যেন কেট ও নয়নতারার সেই উজ্জ্বল শোভাযাত্রাটাকে দেখতে পেল। কী যেন? নিজের মনে এই প্রশ্ন করল বাগচী হাসি-হাসি মুখে। মনে পড়ায় সে হাসল। এখানে আসার পরে মনে-মনে সে বলল, তোমার মনে পড়বে কেট, পালকি চড়া নিয়ে সে বেশ একটা ব্যাপার হয়েছিল। দেওয়ানজি কুতঘাটে পালকি রেখেছিল। এখানে সমাজের উচ্চতর অংশের তাই তো স্বাভাবিক যানবাহন। সেদিন কিন্তু সে কিংবা কেট প্রথম দিনেই পালকিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এমনকী সে নিজে মানুষের ঘাড়ে চেপে স্বর্গে যাওয়ার চেষ্টা করে নহুষের দুর্গতির গল্পটা বলেছিল। এসব ব্যাপারে কি মন আগে থেকেই তৈরি হতে থাকে? কেটের পৈত্রিক মিশন হাউস, যা অবশ্য তারও একমাত্র আশ্রয় ছিল আবাল্য, তা ত্যাগ করার সঙ্গে-সঙ্গে আরো অনাড়ম্বর জীবনের দিকে ঝোঁক দেখা দিয়েছিল তাদের? তা অবশ্য বাস্তবিক, কারণ তখন তো স্কুলমাস্টারের বেতনই তাদের উপজীবিকা।

বাগচী লঘু মনে হাসল।

বাস্তব পরিস্থিতি আর নীতিতে বেশ মিল তো! কিন্তু না, এটা নিয়ে হাসাহাসি নয়। আজ লাঞ্চে হাসাহাসিটা হয়েছিল অন্য ব্যাপারে। —রোসো, কেটের পালকি চড়া নিয়ে আজ সন্ধ্যায় ক্ষেপিয়ে তোলা যাবে। কী গো, এ কি ডু অ্যাজ দ্য রোম্যান ডাজ! বেশ তো পালকিতে চড়লে!

কয়েক পা গিয়ে তার মনে হল এটা ঠিক তার হাসির ব্যাপার নয়। আজ লাঞ্চে বসে বেশ হাসাহাসিই হয়েছিল, এমনকী রাজকুমার এসে পড়ার আগেও সে-ব্যাপারটা নিয়ে তারা রঙ্গ করছিল। বলতে পারো অন্যত্র যাই হোক একজন পাদরির বাড়িতে তা বেশ গম্ভীর বিষয় হওয়া উচিত। কথাটা বোধ হয় স্কুলে বিজ্ঞানের দিকে ঝোঁক দেওয়ার কথা থেকে কেট তুলেছিল। আত্মা আর মন নিয়ে কথা উঠেছিল। একসময়ে হাসতে-হাসতে কেট বলেছিল—মনের চোখ, কান, নাক এসব, বুদ্ধি, চেতনা এসব আছে, বেচারা আত্মার? নাকি সে দশশালার জমিদার যে মনের উপরে ম্যানেজারি ছেড়ে দিয়ে নিজে মজা নিয়ে আছে। বাগচী বলেছিল—তাহলে কান্টকে আনতে হয়। কেট কপট আশঙ্কায় বলেছিল—না-না, এখন লাঞ্চ। কিন্তু কম দুষ্টু ভেবেছ—ভাবল বাগচী, কিছুক্ষণ পরেই আবার বলেছিল—আচ্ছা, চেহারা, স্বভাব, গলার স্বর, পশুপাখি থেকে মানুষ, সকলেই অনেক পরিমাণে পিতামাতার কাছে পায়, কিন্তু আত্মা? তা কি দুই আত্মার থেকে কিছু কিছু নিয়ে তৃতীয় একটি? বাগচী মনে-মনে হাসল। তো, সেও বেশ একটা লাগসই কথা

বলেছিল—হিন্দুদের বেশ একটা ধারণা আছে, আত্মার জাতি নেই, পুরুষ আত্মা, স্ত্রী আত্মা, ইহুদি আত্মা, মুসলমান আত্মা এ রকম নাকি হয় না। তা যদি থাকে তাহলে তার সমাজই-বা কী? ভালোমন্দর বিচারও বারো আনা চলে যায়।

এখন বাগচী ভাবল, একটা কথা কিন্তু ভাববার মতো। আত্মার চোখ কান না-থাক তার একটা প্রজ্ঞা আছে যাকে স্বজ্ঞাও বলা যায়। মনই বরং অনেক বুদ্ধি বিবেচনা করে চলে। কিন্তু তাতে চালাকিও থাকে নাকি? যেমন মন ভদ্রতার খাতিরে সমাজের সঙ্গে মানিয়ে চলতে যা সে চাইছে না তা করে, বলে। ফাঁক থেকে যায় না?

কিন্তু এটা তার চিন্তার বিষয় নয়। তার মনে তলায়-তলায় যে চিন্তা চলেছিল তা প্রকাশ পেতেই সে অবাক হল। এই গ্রামের সমাজ, কী আশ্চর্য, আজকার এই শোভাযাত্রা, যেমন জোনাথন গাইল্‌স বলত, দশশালা বন্দোবস্তের ফল? অর্থাৎ নিজেদের ধন উৎপাদনের শ্রম করতে হয় না এমন এক শ্রেণীর ব্যসন? কিন্তু ওদিকে আবার গাইল্‌স, যে নাকি মতবাদে মিলকে অনুসরণ করে, নিজেকে প্রকাশ্যে ইউটিলিটেরিয়ান বলে, বলে ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ভারতকে উন্নত করার জন্যই, সে নিজেই স্বীকার করেছিল কর্নওয়ালিশ কতগুলো দালাল সৃষ্টি করেনি, ইংল্যান্ডের ভূমি-আভিজাত্যই অনেকটা এখানে প্রবর্তন করতে এসেছিল। স্বীকার করেছিল ইংল্যান্ডের তারাও শ্রম করে খায় না এবং ব্যসনও যথেষ্ট। দশশালার আগেকার জায়গিরদার প্রথাতে রায়তের অবস্থা ভালো না-হয়ে বরং আরো খারাপ ছিল নাকি।

গাইল্‌স এখন, ভাবল বাগচী, চাকরিটা ভালো পেয়েছে। সেন্ট্রাল স্টেটস এজেন্সির অধ্যক্ষ। এজেন্সিটা কি আগেই ছিল, নাকি সিপাহি বিদ্রোহের পরে হয়েছে? তখন, তারা যখন মধ্যপ্রদেশে, সে নাগপুরে রেসিডেন্ট ছিল বটে।

ভাবল বাগচী, লাঞ্চে আজ আলাপের প্রথম বিষয় ছিল ডাকে আসা গাইল্‌সের চিঠিটাকে নিয়ে। প্রথমে অবাক লেগেছিল, গাইল্‌স তাদের ঠিকানা পেল কী করে! কেট বলেছিল—গত ক্রিস্টমাসে তাদের সেই অরফ্যানেজে একসময়ে মানুষ হয়েছিল এমন কয়েকজনকে কার্ড পাঠিয়েছিল তাতে এখানকার ঠিকানা ছিল।

এবার বাগচী চলতে-চলতে গাইল্‌সের চিঠিটার কথা ভাবতে লাগল। আকস্মিক ব্যাপারই বটে। ভাবা যায়নি গাইল্‌স চিঠি লিখে বসবে। ও, গাইল্‌স তার চিঠিতে তাদের ছেড়ে আসা মধ্যপ্রদেশের সেই মিশন হাউস সম্বন্ধে লিখেছে। আঃ কতদূর! নস্ট্যালজিয়া আছে বইকি! জীবনের ত্রিশ বছর কেটেছিল যেখানে। কিন্তু শোক করেও লাভ নেই। সে জানতই বস্তারি আদিবাসীদের গ্রামের সেই ছোট সুন্দর মিশন হাউস, তার সংলগ্ন অরফ্যানেজ সবই তার শ্বশুরের টাকায় তৈরি, কিন্তু নীতির প্রশ্ন উঠলে জবাব দেওয়া কঠিন।

লন্ডন মিশনের সেই পাদরিকেই যেন সে দেখতে পেল আবার। গাইল্‌সকে সঙ্গে করেই সে এসেছিল। গাইল্‌স নাকি মধ্যস্থতা করবে। তো, সেবারই ইউটিলিটেরিয়ান কথাবার্তা বলেছিল গাইল্‌স। তখন কিন্তু গাইল্‌স তাদের সমর্থন করে একটা কথাও বলেনি, যদিও এ-চিঠিটার সুর অন্য রকম। এ চিঠিটা একটা বড় ঘটনা বইকি? সেটাও বেশ বড় ঘটনা ছিল। লন্ডন মিশনের সেই পাদরি যুক্তি দিয়েছিল কেটের পিতা ফাদার অ্যান্ড্রুজ যে টাকাই জমিয়ে থাকুন তা তো লন্ডন মিশন তাকে যে স্টাইপেন্ড দিত তা থেকেই, অন্য কোনো উপার্জনই ছিল না। তিনি যখন অ্যাংলিকান ধর্ম ছেড়ে দিয়েছিলেন তখন নীতিগতভাবে সেই স্টাইপেন্ডের কোনো অংশেই, তা তিনি যত কষ্ট করেই জমিয়ে থাকুন, তার উপরে তাঁর অধিকার জন্মায় কি? সেই পাদরির আসল উদ্দেশ্য ছিল মিশন হাউসটা যত কমে সম্ভব কেটের কাছ থেকে কিনে নিয়ে ফাদার অ্যান্ড্রুজ, ইউনিটেরিয়ান মত প্রচার করে যে-ক্ষতি করেছিলেন তা শোধরাতে। ক্ষতিটা খ্রিস্টধর্মের। দুদিন ধরে এসব শোনার পরে কেট বিবর্ণ কিন্তু কঠিন মুখে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কাছে এসে হাত চেপে ধরে বলেছিল—ফাদার বাগচী, তুমি একটা সংসার চালাতে পারো? পারো? তবে নিজেদের পোশাক ছাড়া আর-কিছু নয়। তারা পরেরদিনই প্রায় সে-রকমই চিরদিনের জন্য মিশন হাউস ত্যাগ করেছিল। মৃত

পিতার পক্ষ হয়ে তার ধর্মমত ভারতে কিংবা ইংল্যান্ডে মামলা চালানোর ইচ্ছা ছিল না কেটের। এখন বোঝা যায়, গাইল্‌স তখনই ইউনিটেরিয়ান মত ছেড়ে দিয়েছিল।

গাইল্‌স একরকম মামলার কথাই যেন কিছু লিখেছে চিঠিতে। সে অবশ্য বিরক্ত হয়ে চিঠির সেই লম্বা প্যারাগ্রাফটাকে বাদ দিয়েছিল। বটে? এই বলে বাগচী অন্য দিকে ভাবল। আত্মা সম্বন্ধে সেই আলাপগুলো করতে গিয়ে আত্মাকে দশশালার জমিদার বলার কারণ কী গাইল্‌সের সেই বিতর্ক মনে হওয়া কেটের, কিংবা সে যে আত্মার জাতি না-থাকার কথা তুলেছিল তার কারণও কি গাইল্‌সের চিঠির কোনো কথা? তার মন আবার কৌতুকের দিকে ফিরল।

অনেকসময়ে যেমন হয়, বিরক্তিতে যা দেখিনি বা শুনিনি মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তা এমন যে ভাবতে গেলে দেখা যায়, তার অনেকটাই মনে ঢুকে গিয়েছে; গাইলসের চিঠির সেই লম্বা প্যাবাগ্রাফটার অনেক কথাই বাগচীর মনে আসতে লাগল। গাইলস লিখেছে : অরফ্যানেজে যারা মানুষ হয়েছিল তারা তো বটেই, মধ্যপ্রদেশে এখানে-ওখানে যারাই কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে ইংরেজ-রক্তে সংশ্লিষ্ট তাদের এখন ভাবার সময় এসেছে। পিতা ইংরেজ, আইরিশ কিংবা স্কচ, মাতা মুসলমানি গোয়ানিজ, অথবা ভারতীয় আদিবাসী খ্রিস্টান হোক, পিতার ধর্ম প্রটেস্ট্যান্ট, ক্যাথলিক, প্রেসবাইটেরিয়ান যাই হোক, তাদের এখন এক হতে হবে। বোঝাই যাচ্ছে, কি ভারতের সরকার, কি ইংল্যান্ডের সরকার কেউই তাদের ইংরেজ বলে স্বীকৃতি দিতে চায় না আর। এককথায়, ভারতীয় ও ইউরোপীয় মিশ্র রক্তের লোকদের কোনো ভবিষ্যৎই দেখা যাচ্ছে না—না এদেশে, না ইংল্যান্ডে। কিছুদিন হয় এরকম দশ হাজার অফিসার ও আদার র‍্যাংকস আর্মি থেকে ছাঁটাই হতে চলেছিল। সিপাহি যুদ্ধে তাদেব শৌর্য, ত্যাগ ইত্যাদি মনে রাখা হয়নি। তাদের অপরাধ তারা ইংল্যান্ড থেকে আগত অফিসার ও আদার র‍্যাঙ্কসের সমান সুযোগ সুবিধা চেয়েছিল। এমনকী তিন পুরুষ বৃটিশ-রক্তের যোগও হয়েছে যাদের তাদেরও সমস্যার মুখেই পড়তে হবে। এদেশের প্রবাদ অনুসারে, না ঘরকা, না ঘাটকা। তোমাদেরও সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবতে হয়। এদেশের সমাজ যা থেকে আমরা শিক্ষা, দীক্ষা. রুচি, নীতি, কালচার, ধর্মে এত পৃথক সেখানে আমরা মিশতে পারি না, অন্যদিকে ইংল্যান্ডই আমাদের দেশ তাই-বা বলার সুযোগ কোথায়?

বাগচীর ভ্রূ কুঁচকে গেল। একবার সে ভাবল, চিঠিটা কেটকে লেখা, সে-ই বুঝবে তা নিয়ে কী করা উচিত। যদি বলো, আমি নিজেকে ইংরেজ বলতে গেলাম কেন? তাতে কিন্তু সমস্যাটা যায় না। জাতিতে ভারতীয় কিন্তু ধর্মে ক্রিশ্চিয়ান বললেও কিন্তু কোণঠাসা হয়ে পড়তে হয়, যদি ইংরেজ বিশেষ স্বীকৃতি তুলে নেয়।

বাগচী নিজেকে বলল—এসব ভাবতে চাই না। মধ্যপ্রদেশে যেমন সমাজ এখানে গ্রামে তেমন একটা সমাজ আছে। এ-সমাজ অবশ্যই আমাদের অন্তরঙ্গ করে নেয়নি। নিতে কে পারে? কিন্তু একেবারে কি দূরে রেখেছে? তাছাড়া আমাদের সন্তান কোথায়? বাগচী যে আত্মায় বিশ্বাস করত তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু মনকে অবিশ্বাস করত তাও বলা যায় না। মন তো বুদ্ধিরই দুর্গ। সে ভাবল, কেট বেশ বুদ্ধিমতী। সে অনায়াসে চিঠিটাকে পুড়িয়ে দিতে পারবে। সে অবশ্য খুব জেদিমানুষ। দ্যাখো, কিছু নেব না, বলতে সে মিশন হাউস থেকে তার সখের জিনিসগুলোও আনেনি। আসবাবপত্র এমনকী নিত্য সন্ধ্যার সঙ্গী অর্গানটার দিকেও ফিরে চায়নি।

২

কাহাররা আস্তে চলতে জানে না। যেন যত তাড়াতাড়ি পারে গন্তব্যে পৌঁছে বোঝাটাকে নামানো চাই। চাপা হুঁ-হুঁ করে আটজন ছুটছে। এক হাত পালকির দাঁড়ায়, অন্য হাত ভাঁজ করে বুকের কাছে নেওয়া, সেটা সে-অবস্থায় হুঁ-কারের তাল রাখছে। পিছনে, কখনও সামনে, সরু-সরু লম্বা পায়ের সেই কালো ঘোটকী, যার নিতম্ব ছাড়া সর্বত্র হালকা হরিণের ভাব, সামনের দু'পায়ে দু'থোপা সাদা চুল থাকায় রূপার মল পরেছে বলে ভুল হতে পারে, মাথা উঁচু করে ঘাড় বাড়িয়ে চলেছে,যাকে অ্যাস্‌লিং বলে। রূপচাঁদ আর বরকন্দাজের দল হাসি-হাসি মুখে ছুটতে-ছুটতে পিছিয়ে পড়ছে।

পথে একবার পালকি আর ঘোড়ায় ছাড়াছাড়ি হল। ঘোটকী ক্যান্টারে নাচতে-নাচতে এগিয়ে গেল। আর সেই সময়ে এই অধ্যায়ে যা প্রক্ষিপ্ত এমন একটা ব্যাপার ঘটল। পথের পাশে সংকুচিত হয়ে দাঁড়িয়ে একজন গ্রামবাসী আনত হয়ে রাজকুমারকে নমস্কার করল। তার ভঙ্গিটা এমন যেন সে কিছু বলতে চায়। রায়ত হলেও বিশিষ্ট হবে, গায়ে মেরজাই, পাকানো চাদর, পায়ে চীনা জুতা। রাজচন্দ্রর অনুমান হল মানুষটিকে সে কোথাও দেখেছে। বাজচন্দ্র লাগাম টানল, পালকি এসে পার হয়ে গেল। হাতিটাও ঘণ্টা বাজাতে-বাজাতে কাছে এসে পড়ল। লোকটি তাড়াতাড়ি পথের ধারে একটা পাতা-ঝরা ন্যাড়া জিওল গাছের নিচে সরে দাঁড়াল। সেই গাছ আর সে যেন সমান বিষণ্ণ।

রাজু বলল, 'কিছু বলবে'?

'আজ্ঞে'? লোকটি যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল, যেন রাজকুমারকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে বুঝতে চেষ্টা করল। তা কি এই যে রাজকুমার নিজের বুদ্ধিতে চলার মতো বড় হয়েছেন কিনা?

রাজু জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাম কী'?

'আমি চরণদাস। গ্রামের পোস্টমাস্টার। আমি—আমরা খুব বিপন্ন'।

'বিপন্ন? কেন? তুমি কি এ বিষয়ে নায়েবমশায়কে বলেছ'?

'তিনি জানেন, নতুন করে তাঁকে বলা হয়নি'।

চরণদাস দ্বিধা করতে লাগল। ভাবল, কেনই-বা হঠাৎ শুরু করল এই আলাপ? ডানকানের ব্যাপারে কী-বা করবেন রাজকুমার? ডানকান অঘ্রাণের ধান কাটার আগে যে ঢিলে মরসুম সেই সুযোগে টাকা বিলোচ্ছে মরেলগঞ্জের বাইরে এসে, তাতে রাজকুমারের কী করার থাকবে?

রাজচন্দ্রর মনে হল এমন হতে পারে খাজনার গোলমাল করে লোকটি বিপন্ন। সে বলতে গেল, তুমি তোমার অসুবিধা জানিয়ে রানীমার কাছেও দরখাস্ত করতে পারো।

চরণদাস ভাবল, কাজটা ভুলই হয়েছে। সেদিনের লাঞ্চে রাজকুমার ছিলেন না, আর সেদিন রাজবাড়ি থেকে ডানকানের সড়ক কেটে দেওয়া হয়েছে মনে-মনে এ-দুটোকে যোগ করে রাজকুমারকে কিছু বলতে যাওয়ার কোনো যুক্তি নেই। সে তো জানেই রাজবাড়ির খাজনা দেওয়ার জন্যও কেউ টাকা ধার করে, আর মনোহর সিং সেই সুযোগও নিয়ে থাকে দাদন দিতে।

রাজকুমার লাগাম ঢিল দিয়ে ঘোড়ার পিঠে তা দিয়ে মৃদু আঘাত করল। ঘোড়াটা চলতে শুরু করল। কিন্তু দু'পা যেতে-না-যেতে সে লাগাম টানল, জিনের উপরেই ফিরে পিছনে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'রোসো, তুমি সেই চরণ নয় যে পোস্টমাস্টার গোবরা অর্থাৎ গোবর্ধনের বন্ধু ছিলে'?

চরণ এক পা এগিয়ে সমর্থন করল।

রাজচন্দ্রর মুখটা গম্ভীর হল, বলল, 'আচ্ছা চরণ, জন্মোৎসবের পরপরই তুমি রাজবাড়িতে যেয়ো। যে-কোনো সন্ধ্যাতেই আমাকে সেখানে পাবে'।

জুলুসটা থাকার কথা নয়, ফরাসডাঙায় ঢুকবার মুখেই কুতঘাটের পথ, তা পেতেই রূপচাঁদ তার হাতি ও বরকন্দাজদের নিয়ে চলে গেল। পিয়েত্রোর হাওয়াঘরের ভিতেই তো মন্দির, তা তখন এক রশি।

নয়নতারা পালকি থামিয়ে নামল, রাজচন্দ্রকে বলল, 'রাজকুমার, ঘোড়াটাকে বরকন্দাজকে ধরতে দিলে হয় না'? রাজচন্দ্র জিজ্ঞাসা করল, 'নয়নতারা এত দূরে নামলে কেন'? নয়নতারা বলল, 'প্রাণ আছে না? তার কথাও আছে'?

কাহার বরকন্দাজদের কবল থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে হাসতে-হাসতে মন্দিরের কাছে পৌঁছল তারা। এ কখনও ঠিক নয়, রাজকুমার তেমন সন্দেহ প্রকাশ করলেও, যে নয়নতারা তত্ত্বাবধানে আসেনি বলে মিস্ত্রিরা কাজে ঢিল দিয়েছে। মন্দিরটা শেষ হয়নি, ইতিমধ্যে তার মাথা যেন মেঘে। যাকে মন্দিরের শিখর বলা হবে, নিচ থেকে আন্দাজ হয়, তার কাছে কাজ হচ্ছে। চত্বরের নিচে অর্থাৎ পিয়েত্রোর সেই হাওয়াঘরের ভিতের গোড়া থেকে মিস্ত্রিদের পুতুলের মতো ছোট দেখাচ্ছে। তাদের ডান দিকে নদী, পাড়টা বাঁধানো, মনে হচ্ছে আকাশটা বাঁধের ওদিকটায় নেমে পড়েছে।

কেট এই বিরাটত্বের বিস্ময়টা প্রকাশ করে ফেলল।

উজ্জ্বল মুখে নয়নতারা বলল, 'এসো-এসো, আজ আমরা মন্দিরটাকে ভালো করো দেখব চলো'।

কেট বলল, 'আমিও আসব'?

চত্বরের সিঁড়ির দু'এক ধাপ ইতিমধ্যে উঠেছে নয়নতারা। বলল, 'ডানকানরা উঠেছিল ভেবে দেখো। উঠে পড়ো। তাছাড়া তোমাকেই বরং সাবধানে চলতে হয়। তোমার চাঁপার কলি আঙুলগুলো দেখে না ফেলেন। চার-চারটি থাকতেও উনি এমনকী কুচনি পেলে ছাড়েন না'।

ক্যাথরিন কিছু সংকুচিত হল। এইসব মিথোলজি! মনে-মনে এই বলে সময়ের উপযুক্ত কথা খুঁজে বলল, 'উনি কি তা হলে কুলীন হলেন'?

নয়নতারা বলল, 'কাপও হতে পারেন। একজন মাথায় চড়ে, বকবকানিতে কান ঝালাপালা, একজন বুকে গলায় জড়িয়ে থেকেও ফোঁসফোঁস করছে, কাউকে ঠাণ্ডা রাখতে তার পায়ে লুটোচ্ছেন, একজন তো শরীরের আধখানাই জুড়ে আছেন। এসো-এসো, স্ত্রীলোক হলেই হল, ওঁর আবাব জাতি কী'!

দ্রষ্টব্য বিষয় যদি আকা'শ-প্রকারে বিপুল হয়, তবে তার পাশে একা দাঁড়ানো আর অনেক মানুষের ভিড়ে দাঁড়ানো এক নয়। মন্দিরের কাঁধে উঠে শিখরের গোড়ায় ইট গাঁথা চলেছে এখন, নিচেও, বলা যায় মন্দিরের কোমরের কাছে হচ্ছে আস্তরের। ইট গাঁথবার সময় খাঁজ রেখে গিয়েছে, এখন মশলার সাহায্যে টালি বসানো হচ্ছে। নিচে তো সেজন্য একটা টালির কারখানা বসেছে। কাঁচামাটির তাল কাঠের ছাঁচে চেপে টালি করে তা রোদে শুকোচ্ছে। ওদিকে পোয়ান ধোঁয়াচ্ছে। সেখানে টালিগুলো পুড়ে লাল হয়। টালিগুলো এক মাপের নয়। বড়-বড় গুলোতে একটা-একটা পুরো দৃশ্য, 'বেলতলায় তপস্বী, অন্নপাত্র হাতে সীমন্তিনী, পাশাপাশি বসালে এক পৌরাণিক গল্প হবে। ছোটগুলোর কোনোটিতে একটি হাতি আর মাহুত, কোথাও একটা ধুমসো-ককুদ ষাঁড়। সে-রকম একসারি টালি চার দেয়াল ঘুরে বসানো শেষ হওয়ায় মনে হচ্ছে তা এক শোভাযাত্রার দৃশ্য। হাতি ঘোড়া মানুষ, শিঙের কারুকার্য ষাঁড়, রামশিঙা নিয়ে পাগড়িবাঁধা মানুষ, ঢোল নিয়ে তেমন মানুষ।

কেট বলল, 'এদের আকৃতিতে কিন্তু নতুনত্ব আছে'।

নয়নতারা মুগ্ধ হয়ে দেখছিল, বলল, 'যেমন চোখে দেখি তেমন নয়, তাই বলছ না'?

কেট বলল, 'মনে হচ্ছে না যে হাতিটা যেমন অসাধারণ ঘোড়াটাও ঠিক তাই? বেশিও নয়, কমও নয়'।

রাজচন্দ্র বলল, 'অর্থাৎ সবই সমান অবস্তু'।

নয়নতারা, 'কিন্তু ওদের রাজ্যের হিসাব মানি যদি, সকলেই মানানসই। রামশিঙাটা মানুষের সমান কারণ তা বাজছে; ঘোড়াটা খুব কায়দা করে গলা বেঁকিয়েছে, সেজন্যই গলায় অত অলংকার; হাতিটা পিঠের সওয়ারের জন্য খুব দাম্ভিক, সেজন্য চোখ অত বড় আর কানের দু'পাশে বাঁধা ঝুমকি ঝুলে মাটি ছুঁয়েছে। এমন সুন্দর হয় না'।

হঠাৎ কেট হেসে বলল, 'এদিকে দেখুন তবে'।

'আ রে, এ-যে দেখছি আমাদের বন্ধু, একেবারে টুপিসমেত'। খিলখিল করে হাসল নয়নতারা।

রাজু বলল, 'তা আমার একটা তুলনা মনে আসছে। এসবই যেন আমাদের কেটের মুখের বাংলা। ঠিক স্পষ্ট নয় উচ্চারণ, ঠিক আমাদের মতো ব্যাকরণ নয়, কিন্তু মিষ্টি শব্দ শুনে তার উৎস লাল ঠোঁটদুটিকে দেখতে হয়, যেন তা লোভনীয় ফুলের মতো ফুটে-ফুটে উঠছে'।

কেটের মুখ লাল হয়ে উঠল, নয়নতারা ঝিকিমিকি হেসে বলল, 'ধন্যবাদ। এজন্যই তো রাজকুমার'।

টালির গায়ে হাতির পিঠে শিকারির ছবি, হাওদায় ঝুঁকে দাঁড়িয়ে সে বাঘ শিকাব করছে। বাঘটি চেহারায় দুর্গার সিংহ, আকারে হাতির অর্ধেক অন্তত। রাজু নিজের সেই সম্ভাব্য ব্যঞ্জনায় হা-হা করে হেসে উঠল। কিন্তু পরে বলল, 'ছবি হিসাবে বেমানান হল, ওই রামশিঙা আর ককুদ্বান বৃষের পাশে বন্দুক-টুপিধারী শিকার মানায় না'।

'কেন'? বলল নয়নতারা। এই বলে সে একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আকবর বাদশার সময়ে কি রামশিঙা বাজত না? কিংবা তখন কি বলদের শিঙে সোনারূপার গহনা দেওয়া হতো না, অথবা ঘোড়ার পিঠে সোনারূপার কাজ করা মাটি ছোঁয়া কিংখাবের জামা'?

'হয়তো, হয়তো'।

'আকবর বাদশার সময়ে, শুনেছি কিংবা রানীমার ঘরে তসবিরে দেখে থাকব, বন্দুকে গাধা কিংবা সিংহ শিকারের ব্যবস্থা ছিল। এখানেও বন্দুকের গায়ে কত কারুকাজ। তেমন বন্দুকই'।

'তাহলে', কেট বলল, 'বন্দুক সত্ত্বেও এই শোভাযাত্রা দু-তিনশো বছরের পুরনো'?

'অর্থাৎ আমাকে', রাজু বলল, 'তুমি আকবর বাদশাহের সময় থেকে উঠে আসা একজন মনে করো? হা ঈশ্বর'!

নয়নতারা বলল, 'হলই-বা, কী লোকসান তাতে? কিন্তু দেখুন এদিকে, টালিগুলোর উপর-পাড় বরাবর নকশাটা যেন আধখানা বাঁশের। আস্ত বাঁশকে লম্বায় চিরলে যেমন হয়। রোসো হয়েছে। তাহলে উপরের টালিব থাকের নিচ-পাড়ে বাঁশের বাকি আধখানা পাওয়া যাবে'।

রাজচন্দ্র হেসে বলল, 'তাতে কী হবে? বাঁশ কি এমন দুষ্প্রাপ্য বিষয়'?

'তখন, আমার মনে হচ্ছে', নয়নতারা ভাবতে-ভাবতে বলল, 'এই শোভাযাত্রার দৃশ্যগুলোর উপর দিয়ে গোটা মন্দিরটা ঘিরে একটা বাঁশগিরে রুলির নকশা ফুটবে'।

না কেট, না রাজু—বাঙালিনীর অতি প্রিয় এই রুলি-অলংকার সম্বন্ধে কল্পনা উদ্দীপ্ত হওয়ার কিছু পেল না। কিন্তু নয়নতারার সুন্দরের দৃষ্টিতে যেন স্বপ্নের ঘোর লাগল। ভাবল সে : কোনো এক রমণীর বলয়ের ঘেরের মধ্যে মন্দির? নিজের দুখানা বাহুতে ঘেরা কিংবা হৃদয় দিয়ে ঢাকা, ছবিতে এমন ফুটানো যায় না বলেই যেন নিজের বলয় দিয়ে ঘেরা। কিন্তু কার বলয়?

ততক্ষণে কেট ও রাজকুমার এগিয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি চলে তাদের পাশে গিয়ে নয়নতারা বলল, 'রাজকুমার কি এখন আকবর বাদশার যুগের কথা ভাবছেন'?

'কই না'।

কথাটা বোধ হয় নয়নতারার নিজের চিন্তাকে টাঙিয়ে দেবার খিল। সে হেসে বলল, 'অন্যভাবেও এটাকে দেখা যায়, রাজকুমার। মন্দিরটা মহাকালের তো। তাঁর চোখে শিঙে সোনার-টোপর-পরা বলদ, কিংখাবের জামা-পরা ঘোড়ার সেকাল আর কারো বন্দুক দাগা সোলার টুপি-পরা আধুনিকতায় সময়ের এমন তফাত নেই যে এক শোভাযাত্রায় মানায় না'।

'অর্থাৎ এইসব আধুনিকতা প্রাচীন থেকে এমন কিছু পৃথক নয়? এ তো দারুণ কথা'!

রাজু এক সমস্যার অভিনয় করল।

নয়নতারা গলা নিচু করে বলল, 'লোকগুলি কাছে থেকে আমাদের আলাপ শুনতে চাইছে, ভয়ে

দূরেও সরে-সরে যাচ্ছে। কাঁহাতক আর কষ্ট দেবেন? ডেকে কথা বলুন। দরকারের কথাও আছে'।

রাজু 'শোনো মিস্ত্রি' বলে ডাকতেই যে এগিয়ে এল সে প্রবীণ, বোধ হয় নিজের হাতে এখন কাজ করে না আর। নয়নতারার ইঙ্গিতে রাজু তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের সব কাজ শেষ হতে আর কতদিন লাগতে পারে'?

সে-ই প্রধান মিস্ত্রি, বলল, 'এখন তো কাজ ভালোই চলেছে, 'হুজুর, শীতের বাদলে যদি থকে না যাই, বর্ষার মুখে কাজ শেষ করে, বড়পূজার আগে রঙের কাজ ধরব। ততদিনে নাটমন্দিরে খিলান গাঁথা শেষ হবে'।

রাজচন্দ্র হেসে বলল, 'আরো ন-দশ মাস তো বটেই। বর্ষায় কাজ অনেকদিন বন্ধ থাকলে এক বছরও হতে পারে। দ্যাখো, মুশকিল'!

শেষ কথাটা লঘু স্বরে নয়নতারাকে বলা।

নয়নতারা বলল, 'তাহলে এবার শিবচতুর্দশীতে কি পূজা হবে না'?

'হুজুরাইন, চেষ্টাই হচ্ছে যাতে হয়। সেজন্য উপরের ছাতিতে দেখুন, সব লোক লেগেছে। এখন একমাস ওই কাজ। পদ্মটা বসিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্দি, তখন ভিতরে পূজা, বাইবে কাঁধতক টালি বসানো চলবে। শিবের মাথায় দাঁড়াতে সাহস নেই যে আজ্ঞা'।

নযনতারা উপরে চাইল। দড়ির জালে আটকানো অনেকগুলো শাখামৃগ যেন। প্রকৃতপক্ষে বাঁশের ভারা বেঁধে মিস্ত্রিরা কাজ করছে।

এই কথাই বলে মিস্ত্রিকে বিদায় দিল নযনতারা। তারা তারপর সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। কিছুদূরে যেখানে কুমোরেরা টালি গড়ছে সেখানে যেতে চাইল কেট।

হো-হো করে রাজু হাসল, 'দেখলে, হুজুরাইনকে ঠিক চিনেছে'।

ঠিক এ-রকম সময়ে মনে হল নয়নতারাব, রানীমা জানতে চেয়েছিলেন মন্দিরটা কেমন দেখায় তার চোখে। এখন তো আকারটা স্পষ্টই হয়ে উঠছে। বাইরের দেয়ালটা যতদূর মানায় টালির কারুকার্যে অপূর্ব রকমে সুন্দর দেখাবে ; চত্বরসমেত রথটার বিরাট আকারও দ্যাখো ; যেন সৌন্দর্যে গাম্ভীর্যে সংযুক্ত। নয়নতারার মনে হল : রানীমার এ-রকম নির্দেশের অর্থ কি এই হতে পারে যে তিনি নিতান্ত উৎসুক মন্দির সম্বন্ধে? আর তা স্বাভাবিকও। সেই রক্তচন্দনের পাত্রে যা ছিল তা বুকের রক্ত, বুকটা অনেকখানি চিরে না-দিলে ফোঁটায়-ফোঁটায় অতটা রক্ত জমে না! 'অন্যদিকে চলো দেখে আসি', বলে সে ভাবল, তবে কি মন্দির শেষ হওয়ার আগে দেখতে আসাটা লঘুতা হবে বোধ করছেন? কৌতুকের এই দোটানা? একটুপরেই নয়নতারা অনুভব করল, এমনটাই রানীদের মানায়।

টালি-কারখানার কৌতূহল মিটলে তারা চকচকে মুখে ঘুরে দাঁড়াল আর তখন আবার তারা অন্যকিছুতে আকৃষ্ট হল। বাঁধের নিচে নদীর খাত। আকাশরেখা বাঁধের কাঁধে। সেই আকাশে ইতিমধ্যে রং জমতে শুরু করেছে। যথেষ্ট আলো, কিন্তু তা যেন রঙিন। তারা পায়ে-পায়ে বাঁধের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু ততদূরে যাওয়ার আগে চত্বরে উঠবার সিঁড়ির একটা অংশ কমলা-আলোয় রঙানো মনে হল।

'আমবা কি এখানে বসব'?—এই বলে রাজচন্দ্র সেই সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। নিজেই বসল। বলল, 'তোমরা? কিংবা সে আমার ভাবনা নয়। অনুমতি করো, পাইপ ধরাই'।

কেট বলল, 'ধুলো নয়'?

রাজু বলল, 'যথেষ্ট, এবং শুকনো পাতাও কয়েকটি। সে নিচের সিঁড়িতে বসে উপরেরটিতে, যেন আরামকেদারায়, হেলান দিয়ে বসে, পাউচ পাইপ বার করল'।

নয়নতারা সামনে দাঁড়িয়ে রাজুকে দেখছিল। বলল, 'ভারি সুন্দর, না কেট? আমাদের একালও'?

রাজু, 'আবার কী দৃশ্য পেলে'?

কেট, 'বলতে গিয়ে কম বললেন'।

রাজু, 'কী'? সে প্রথমে একটু অবাক, পরক্ষণেই সে নিজেই তাদের আলোচনার বিষয় বুঝে হো-হো করে হেসে উঠল। 'কী যেন কেট, বাগচী তোমার কথায় হেসে বলেছিল? কাপিটাল! কিংবা, রোসো, আলো থেকে সরে বসি, রোদটা লাগছে বটে'।

কিন্তু নয়নতারাই নিজের কথায় লজ্জা পেয়ে সরে গেল, বলল, 'রাজকুমার, এখন রাজকার্য বাকি। শিবপূজায় যথেষ্ট জল লাগে। তার তো ব্যবস্থা দেখছি না'।

'নদীর ধারেই আকণ্ঠ তৃষ্ণা! বোসো, উজিরাইন, খোঁজখবর নিই'।

রাজু পাইপে তামাক ভরে উঠে দাঁড়াল। দূরে দাঁড়ানো বেহারাদের দিকে হাত তুলে ইশারা করল। বরকন্দাজ দৌড়ে এলে, সে তাকে পুরোহিত-ঠাকুরকে ডেকে দিতে বলল।

লোকটি চলে যেতেই নয়নতারার দিকে ফিরে বলল, 'কেমন ব্যবস্থা হল, উজিরাইন! তুমি অন্তত, কেট, পাশে বসে রাজকুমারের বুদ্ধির মূল্য দাও'।

হেসে নয়নতারা রাজচন্দ্রের পাশে বসল, কেটকে বসালো মাঝখানে। সিঁড়িটা যথেষ্ট চওড়া, ঘেঁষাঘেঁষি হল না।

নদীর এত কাছে কিছুক্ষণ পরেই আকাশে যে রং বদলের খেলা শুরু হবে এখন যেন তার মহড়া হচ্ছে। আলো কমছে, বাড়ছে। এখানে সব শান্ত নয়, নতুবা সিঁড়িতে এত শুকনো পাতা কী করে আসবে? তেমন একটা হাওয়া হালকা-ধুলোর ঝাপটা দিয়ে গেল। রাজচন্দ্র হেসে, মুখের পাইপ সরিয়ে, রুমালে নাক-মুখ মুছল।

নয়নতারা হাসল ধুলোর দুষ্টুমিতে। কিন্তু ভাবল, এই পাইপে তামাকটা নতুন, যেমন নতুন এই দাড়ি। এটা ভারি মজার যেন যে রাজু পাইপ টানছে! কী আছে ওতে? অর্থাৎ রাজকুমার এখন পুরুষ। তার যেন এক বিস্ময় লাগল, পাইপ-পাউচ আর তার পাশে রাখা বিলেতি দেশলাই-পাতা দেখে।

একটা সুন্দর কবোষ্ণ অনুভূতির অবসর। নয়নতারার কর্তব্য, অন্তত যা তাকে এনেছে, সে তো প্রায় সমাধাই হয়েছে। ঝরঝরে আলোর দিন। আর রঙিন আলোটা তো থেকে-থেকে এখন তিনজনের গায়েই যেন পড়ছে। নয়নতারা কেটের ডান হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে অন্যমনস্কের মতো তার আঙুল নিয়ে খেলতে-খেলতে সামনের দিকে চেয়ে ছিল। সামনে তো কয়েকটা ছোট ঝোপ ছাড়া অবারিত ঘাসে ঢাকা একটা মাঠই, যার প্রান্তে একটামাত্র গাছ। গাছটা বিলিতি।

ফুট তিনেক উপর থেকে কাণ্ডটা যেন দুভাগে দুটো গাছ হয়ে আবার কয়েক ফুট উপরে এক হওয়ার চেষ্টা করছে। সেদিকে চেয়ে থাকতে-থাকতেই নয়নতারা দেখল, একটা ছোট্ট ঘূর্ণি বাতাস একটা খরগোস বা কোনো বড় পাখির মতো মাটির উপরে ছুটোছুটি করছে। সেটা একবার পাতাটাতা ঘুরিয়ে পাঁচ-ছ আঙুল ব্যাসের শুঁড়ের চেহারা নিয়ে উপরে উঠল তাদের দিকে এগিয়ে আসতে মুখ থুবড়ে পড়ল।

আর তখন মনে হল নয়নতারার, আশ্চর্য, এটাই কি সেই গাছ যাতে পিয়েত্রোর ছোট হাতিটা বাঁধা ছিল। হাতিটাও কেন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তাই বলে এটা কখনও কি সত্য হতে পারে, সেই মূক প্রাণী বুঝেছিল সেই বাদলের সন্ধ্যায় পিয়েত্রোর মরদেহ ঘিরে তখন তার চাকর বাবুর্চিরা হাহাকার করছে! সে নিজে বাংলোর বাবান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ছিল রাজুর অপেক্ষায়। রানীমা আগেই নিঃশব্দে চলে গিয়েছিলেন।

ঘূর্ণিটা এবার যেন ফণা তুলে নাচতে-নাচতে এগিয়ে এসে তাদের পায়ের কাছাকাছি ভাঙল। কয়েকটা পাতা সরসর শব্দ করল। নয়নতারা মাঠটার দিকে চেয়ে-চেয়ে হাসিমুখে বলল, 'আচ্ছা, কেট, তুমি কখনও দাবা খেলেছ, ঘোড়ায় চড়েছ'?

রাজচন্দ্র বলল, 'কেন, কেট, দাবা তো তোমাদের দেশেও আছে। বাগচী তার প্রমাণ। আমাকে মাঝে মাঝে মাৎ করেন'।

কেট হেসে বলল, 'কিন্তু আমি তো পাদরির মেয়ে, পাদরির স্ত্রী'।

রাজচন্দ্র বলল, 'আর আমি তোমার কাছে শুনেছি তোমার ঘোড়া ছিল। এমনকী তোমাদের সেই সেন্ট্রাল প্রভিন্সের মিশন হাউসে সহিসের ছেলেই তোমার বাল্যপ্রেমিক ছিল'।

কিন্তু নয়নতারার মনে যে-গল্পটা আসছিল তা যতই ঝকঝকে, রঙিন, আলোকোজ্জ্বল হোক, তা কাছে এলেই শঙ্কার চেহারা নিল। তার অনুমান হচ্ছিল, এই মাঠেই হয়তো বরকন্দাজদের নিয়ে রাজকুমার আর বুজরুক শতরঞ্জ খেলেছিল, সে-শতরঞ্জের চাল দিতে নাকি মাঠের চারদিকে ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে হয়েছিল তাদেব। আর, রাজবাড়ির আর পিয়েত্রোর বরকন্দাজেরা ছিল ঘুঁটি। কারণ সে-খেলা তো ছিল প্রকৃতপক্ষে তরোয়াল নিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করা ও আত্মরক্ষার কৌশল অভ্যাস করা। সেই গল্প বলেছিল রাজু নয়নকে, আর তা শুনে নয়নতারা তারও ঘোড়া চড়া দরকার হতে পাবে এরকম বলে হাসাহাসি করেছিল। কিন্তু শঙ্কারই তো বিষয়। সেই বরকন্দাজরা বুজরুকের সঙ্গে সিপাহি বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল, খুব কমই ফিরেছে। এই গল্প উঠলে রাজু যদি এখন সেসব কথা কেটের সামনে বলে? নয়নতারার মুখ আশঙ্কায় বিবর্ণ হল। কী কবে গল্পটা ঢেকে অন্যদিকে আলাপ নেয় এখন?

কেট রাজুর কথার উত্তর না-দেওয়ায় নয়নতারার ঘোড়া আর দাবার গল্প থিতিয়ে গেল।

রাজচন্দ্র ভাবল, সময় নিয়েই কিন্তু আজ অনেকবার কথা হয়েছে। সেই আকবর বাদশাহের যুগেব কথা। খুব বলেছে কথাটা নয়নতারা, ওখানে ওই মন্দিরে একাল থেকে ওকালের তফাত এক আঙুলও নয়। কিন্তু, সে মনে মনে হাসল, এখানে এই চত্বরের সিঁড়িতে? যেন সে বর্তমানে ফিরতে যত্ন নিল। হেসে বলল, 'বা-বা, কী সুন্দর! তোমাদের দুজনের এমন করে বসা'!

দুজনেই একসঙ্গে চোখ তুলেছিল। এরকম প্রশংসা শুনে একসঙ্গেই চোখ নামাল তারা।

রাজচন্দ্র জিজ্ঞাসা কবল, 'হ্যাঁ, কেট, তোমাদের দেশে কালো চুল, কালো চোখ কি হতে নেই? তাতে কি তোমাদের পুরুষরা বশ থাকে না? তাবা কি শুধু মণিমাণিক আর সোনাই খোঁজে? যেজন্য তোমার চোখ দুটিকে গোমেদ আর চুলকে সোনা করতে হয়েছে'?

প্রশংসা-বিরত কেট কিছু বলার আগেই বরকন্দাজ ফিরে এল। জানাল, 'পুরোহিত নদীতে স্নান করতে গিয়েছে'।

'আচ্ছা যাও', বলে তাকে বিদায় দিয়ে রাজচন্দ্র বলল, 'এখন তাহলে অপেক্ষা করতে হবে'?

নয়নতারা বলল, 'তা কেন? পূজার্থিনীরাও যদি নদীতেই স্নান করতে চায়? চলুন আমরা নদীটাকেও দেখে আসি। বাঁধ থেকে কী করে নদীতে নামা যায় বুঝতে হবে না'?

কিন্তু, সে ভাবল : এখন তোমার কেট আর হৈমীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে। তাই বলে তাদের কাছে পিয়েত্রো, বুজরুকের সঙ্গে কাটানো সময়ের কথা বলা ভালো হয় না। কথাগুলো ছড়ালে অনেকেই বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে।

তার সিঁথির নিচে কপালটাকে ম্লান দেখাল।

তারা একেবারে বাঁধের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল। এই বাঁধ ফরাসিরা করে থাকবে। নদীর খাত থেকে দশ-পনেরো হাত ইট দিয়ে গেঁথে তোলা। নদীর খাতে দাঁড়ালে মনে হবে কেল্লার প্রাচীর। কোনো-কোনো জায়গায় এমন খাড়া, উপর থেকে দেখতে গেলে গা শিরশির করে। কিন্তু নদী?

নয়নতারা ভাবল . তখন কিন্তু নদী বাঁধ বরাবব চলত। নয়তো হাওয়াঘরে দাঁড়িয়ে সুলুপের পালে রাজকুমার বন্দুকের নিশানা কবতে পারত না। এখন বাঁধের নিচে বালুচর। আর বালুচর কেমন যেন দুঃখের মতো ব্যাপার। বালিই কিংবা পলি গুঁড়ো হলে যেমন হয় সাদা মিহি-মাটি। জলে ভেসে আসা বালিতে অর্ধেক পোঁতা একটা গাছের কঙ্কাল।

সে নিজের মন থেকে সরতে গেলে তার চোখ দুটি চঞ্চল হল। সে বলল, 'রাজকুমার, আপনাদের দেশের পুরুষরা বুঝি শুধু অসীমকে খোঁজে, তাই কালো চোখের মণি, কালো চুল'।

রাজচন্দ্র বলল, 'ও, সেই কথা। এ বিষয়ে আমি একটা গল্প বলতে পারি। কেটের দেশেও কালো চুলের কালো মণির মানুষ আছে। প্রমাণ বাগচীমশাই। তবে এ-রকম কুসংস্কারও আছে, আবার বাগচীই প্রমাণ, পুরুষরা তাদের সংস্পর্শে এলে ফল ভালো হয় না। আর সভ্য দেশে থেকেও তারা নাকি অসভ্য। চাকা লাগানো বাড়িতে কিংবা ছোট-ছোট গাড়িকে বাড়ি করে বাস করে। তাতে ঘোড়া লাগিয়েই এক জায়গা থেকে অন্যত্র চলে যায়। কী যেন নাম কেট'?

কেট জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি জিপসি মেয়েদের কথা মনে করছেন? ভালো নয় কিন্তু'।

'খুব গরম বুঝি'? রাজু হাসল। বলল, 'কিন্তু জাতিটার কথাই মনে করো'। বলল সে, 'জানো নয়ন, তাদের নিজস্ব নানা বিদ্যা আছে নাকি, পূর্বপুরুষ থেকে মুখে-মুখে শোনা অলিখিত নীতিগুচ্ছ আছে। সারা ইউরোপে তারা হাজার বছর থেকে বাস করছে, কিন্তু কিছুতেই ইউরোপীয়দের সঙ্গে মিশে যায়নি। এমনকী ভাষা, যে ভাষায় তারা নিজেদের মধ্যে কথা বলে, তা না ইংরেজি, না ফরাসি, ইউরোপীয়ই নাকি নয়'।

নয়নতারা বলল, 'তারা কি আমাদের দেশের বেদের মতো'?

রাজু বলল, 'কিন্তু তাদের সম্বন্ধে এই এক গল্প আছে, হাজার বছর ধরে তারা পথ হাঁটছে। তাদের ভাষাই প্রমাণ তারা একসময়ে ভারতবর্ষে ছিল। কিন্তু হাজার বছব হেঁটেও ভারতবর্ষে ফিরতে পারছে না আর। বরং আরো দূরেই চলে যাচ্ছে। বোধ হয় ফেবার সময়টাকে হারিয়ে ফেলে আর তা খুঁজে পাচ্ছে না'।

নয়নতারা গোপনে রাজুর মুখের দিকে তাকাল। যে কথা বলছে তার স্বর কোনো-কোনো সময়ে যা সে বলছে তার থেকে পৃথক কিছু বলতে থাকে।

৩

কিন্তু নয়নতারা বলল, 'কতদূরে সরে গিয়েছে নদী! কোথায়-বা নৌকা ভিড়বে, কী করেই-বা স্নানে যাবে মানুষ, পুরোহিতই-বা কোথায় গেল? এই খাড়া বাঁধ, ফরাসিরাই-বা জলের কী করত'?

রাজচন্দ্র বলল, 'এখন কুতঘাট অনেকটা উজানে। সেখানে নদীর পাড় চালু হয়ে নিশ্চয় জল ছোঁয়। গোরুর গাড়িগুলোকে যেতে হয় জলের ধারে। কিন্তু তাই-বা কেন? ফরাসডাঙারই ঘাট আছে, যে-পথে তোমার পুরোহিত স্নানে গিয়েছে নিশ্চয়'।

ডানদিকে খানিকটা চলে তারা বাঁধের গায়ে গড়ে-তোলা ঘাট পেল। এত চওড়া এত সিঁড়িব সেই ঘাট অনেক খরচে তৈরি হয়ে থাকবে। এখন তো ভাঙাই, মাঝে দু-এক ধাপ সিঁড়িও উধাও। ফাটলে ঘাস জন্মেছে।

'তোমরা নামবে কি? কী করে তা পারবে? রোসো, হাত ধরো। শুধু রোদ আর আলো নয় ধুলোও কিন্তু'। প্রথম কেটকে, পরে নয়নতারাকে হাত ধরে নামতে সাহায্য করল রাজচন্দ্র। সে বলল, 'আমরা কি নদীর জল পর্যন্তই যাব? তাহলে কিন্তু চরের সীমা বলে যা মনে হচ্ছে ওই ঘাসবন পর্যন্ত যেতে হবে। অনেকটা দূরই'। নয়নতারা বলল, 'আধঘণ্টায় ফেবা যাবে না? তাহলে চলুন, ভালো লাগছে না কেট'?

কেট বলল, 'এখন আর অসুবিধা কী? বালিটা সমতলই তো'।

খানিকটা দূরে গিয়ে সম্ভবত বাঁধটাকে দেখতে ইচ্ছা হল, নয়নতারা ফিরে দাঁড়াল। প্রকাণ্ড নিরেট ইটগাঁথা বাঁধ। নয়নতারা বলল, 'দেখুন, রাজকুমার, দেখুন। ওদিকে কেমন ফাটল লেগেছে বাঁধে'!

তা বটে। শুধু ফাটলই নয়, সেখানে বাঁধটার গোড়ায় একটা সুড়ঙ্গ, যেন কোনো বন্যজন্তু গুহা তৈরি করেছে।

রাজচন্দ্র বলল, 'তুমি কি বলবে শেয়াল গর্ত করেছে? নাও হতে পারে'।

যেখানে তারা দাঁড়িয়েছিল তার বাঁদিকে খানিকটা দূর পর্যন্ত চরটা বালিয়াড়ির মতো উঁচু হয়ে উঠেছে। তার ওদিকের ঢালুটার গায়ে যেন সবুজের ভাব। বালিয়াড়ির গায়েও এখানে চর-ঝাউ। সবুজের ভাবটা প্রমাণ করে, জল কাছেই হবে সেদিকে। অন্যদিকে তাদের পিছনেই বাঁধানো পাড়ের বড় ফাটলটা যেন তখন দূর থেকে গুহার মতো দেখাচ্ছে।

কিন্তু পতপত করে শব্দ হল। বালিআড়ির ওপাশ থেকেই যেন আকাশে উঠে পড়েছে শব্দটা। কেট উত্তেজিত হয়ে বলল, 'হাঁস, হাঁস'।

হাঁস হলে তা বেশ বড় আর রঙিন। দুটো ডানাই চঞ্চল, কিন্তু ঠোঁট গলা যেন তখন মাটির দিকে ঝুঁকে।

'বুনোহাঁস'? নয়নতারাও জিজ্ঞাসা করল।

রাজচন্দ্র হেসে বলল, 'কী বলো তো, সার্বভৌমপাড়ার মেয়ে? এই কিন্তু সেই চক্রবাক্ বধূ আমন্ত্রয়স্ব ইত্যাদি। কেট, ফর ইনফরমেশন, একে চকা বলে। দ্যাখো, ঠিক একজোড়া'।

কিন্তু তাদের বালিয়াড়ির সবটা উঠতে হল না। তারা ওপার থেকে একজন মানুষকে আসতে দেখল। খালি গায়ে, কাঁধে ভিজেকাপড়, হাতে ঘড়ার মতো বড় পিতলের কমণ্ডলু। পূজারী ছাড়া এখানে আর তেমন কে হবে?

নয়নতারা বলল, 'রাজকুমার, এ যদি পূজারী হয় তবে পূজার খবর, স্নানের খবর এর চাইতে আর কে ভালো বলবে? আমাদের আর এগিয়ে কী হবে? কী বলো, কেট'?

পূজারীই লম্বা-লম্বা পায়ে তাদের কাছে এসে পড়ল। নয়নতারা তাকে জানাল, রাজবাড়ি থেকে তারা শিবমন্দিরের খোঁজ খবর নিতে এসেছিল। পূজারী বোধ হয় স্বল্পভাষী এবং নমস্কার করে না। একবারমাত্র তিনজনকে দেখে নিয়ে মৃদু হেসে পথ চলতে লাগল। রাজু বলল, 'চলো, আমরাও ফিরি। বাঁধের সেই ফাটলটা কিন্তু আমাদের পথের দিশারী। নাকি পূজারীর পিছন-পিছন চলবে। অন্তত কোথায় স্নান হবে তা তোমার জানা হয়েছে'।

তারা ফিরতে শুরু করল।

কেট বলল চলতে-চলতে, 'আচ্ছা, রাজকুমার, সেই গর্তটা কি কাঁকড়ার হতে পারে? হাসছেন যে'?

'হাসছি'? রাজচন্দ্র হাসিমুখেই বলল, 'এ কি হাসির কথা? দ্যাখো মন্দিরের অনেকটা দেখা যাচ্ছে আকাশ ফুঁড়ে যেন, আর এদিকে বাঁধে এত বড় ফাটল'।

সামনে থেকে পূজারী বলল, 'অউর ভি হৈ'।

পূজারীর এই অনুপ্রবেশ সামলে নিয়ে নয়নতারা নিচু গলায় বলল, 'শুনলেন'?

'আপনি কি বলছেন রাজকুমার, মন্দিরের বিপদ হতে পারে'?

রাজচন্দ্র বলল, 'নদীর যদি ফেরার মতি হয়। এ বিষয়ে আপনার কী মত, ঠাকুরমশাই'?

নয়নতারা চাপা গলায় 'আ' বলে রাজচন্দ্রকে নিরস্ত করতে গেল। কিন্তু তার আগেই পুরোহিত ভাঙা বাংলায় বলল, 'নাম যাই হোক, আসলে গঙ্গামাঈ। তো লোটাসে গঙ্গা চড়াই বুঢ়াকে। কখুন মাঈ-এর সওখ হোবে বুঢ়াকে আপন কোরে নিতে'।

রাজচন্দ্রর মুখে চাপা হাসি, নয়নতারার গালে রক্তাভা।

কিন্তু বালিয়াড়ির আলগা ঢালুটায় বোধ হয় পূজারী সতর্ক ছিল নিজের ভারী শরীরের জন্য। বালিয়াড়ির থেকে নামতে পেরে লম্বা-লম্বা পায়ে পূজারী অনেকটা এগিয়ে গেল।

রাজচন্দ্র বলল, 'নয়ন, লোকটি পূজারী বটে তো? গোঁফটা দেখেছ? কমণ্ডলুটা খালি থাকলেও তুমি তুলতে পারবে কি'?

কেট বলল, 'লোকটি, আমি বাজি রাখতে পারি, পাহাড়ি, অন্তত পাহাড়ে ঘোরা অভ্যাস আছে'।

তারা সেই ঘাটের কাছে এসেছিল। পূজারী কয়েকটা লম্বা পা ফেলে উঠে গেল। রাজচন্দ্র বলল, 'এবার'?

নামার চাইতে ওঠাই আরো কঠিন। শুধু হাত ধরাতেই হল না।

পারে উঠে রাজচন্দ্র বলল, 'এখন কিন্তু বেলা আর বেশি নেই। দ্যাখো, নদীর উপরে আকাশের ওদিকটা সোনালি রাংতার মতো'।

নয়নতারা নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। যে-চাদরটা সারাক্ষণই ছিল এখন আবার তা অবগুণ্ঠন হয়ে মুখের দু'পাশকেই খানিকটা করে ঢেকে ফেলেছে।

রাজচন্দ্র হাসি-হাসি মুখে বলল, 'তোমার পুরোহিত হয়তো আবাল্য সন্ন্যাসী, কিন্তু প্রেমের কথা বোঝে দ্যাখো! কিংবা রানীমার উজিরাইন কি এখন বাঁধের ফাটল নিয়েই দুশ্চিন্তায়'?

নয়নতারা বলল, 'নদীর গতি তো বদলায়ই। কুতঘাট সরে গিয়েছে সেটাও একটা প্রমাণ'।

রাজচন্দ্র জোরে-জোরে হাসল। বলল, তাতেই-বা তোমার ভাবনার কী? ফরাসিরা শক্ত করে বাঁধ দিয়েছিল। রানীমা কি প্রয়োজনে আরো শক্ত করে বাঁধ দেবেন না'?

৪

তারা মন্দিরের কাছে যেতে রাজুর ইশারায় পালকি এগিয়ে এল। তখন অন্ধকার হয়নি, কিন্তু আলো বাদামি হয়েছে। কেট ও নয়নতারা পালকিতে উঠল, রাজচন্দ্র তার ঘোড়ায়। ততক্ষণে বরকন্দাজ মশাল জ্বালিয়ে নিয়েছে। বেহারারা পালকি নিয়ে চলেছে, কিন্তু ঘোড়ার শব্দ কানে না-আসায় পালকির দরজায় মুখ বার করল নয়নতারা। সে অবাক হল। দেখল, যেখানে তারা পালকিতে উঠেছিল সেখানে বাদামি আলোতে কালো স্তব্ধ এক ঘোড়সওয়ার হয়ে রাজচন্দ্র—নড়ছে না। কিছু ভাবছে?

পালকি ততক্ষণে ছুটতে শুরু করেছে। ছাদের কাছে ছোট গোল কাঁচের জানলা দিয়ে বাইরের মশালের আলো লাল ছোট বৃত্তের মতো পড়ছে, লাফাচ্ছে। কখনও তা নয়নতারার সিঁথির উপর দিয়ে, কখনও কেটের মুখে, কখনও কোলের উপরে জড়ো করে রাখা তাদের হাতে। এরকম ক্ষেত্রে মনও দুলে-দুলে ওঠে, সরে-সরে যায়। চিন্তার উৎস অনির্দেশ্য হয়ে পড়ে। কেট বলল, 'শীত এসে গেল, এখন কিন্তু সোয়েটারকে বুনে তুলতে হয়'। সে কি কল্পনায় সুন্দর সুঠাম এক পুরুষকে তার বৈঠকখানার দেখল! অথবা সেলাই বৈঠকখানার আলাপের অভ্যাস! নয়নতারা যেন শুনতে পায়নি এমনভাবে চাইল। শুনতে সে অবশ্যই পেয়েছিল, মন সজাগ হতে একটু দেরি হল। কেটকে দেখেই তার পরামর্শে গত শীতের গোড়ায় রাজকুমারের জন্য একটা সোয়েটার বুনতে শুরু করেছিল। সেই বিলেতি উলের রং রাজকুমারকে নিশ্চয়ই মানাতো। তাছাড়া কি বিলেতি উল, কি উলবোনা তখন কলকাতাতেও চূড়ান্ত আধুনিকতা। একবছর থেকে তা আরম্ভ হয়েই পড়ে আছে।

নয়নতারা কল্পনায় কি এক খয়েরি অন্ধকারে গাঢ় খয়েরি এক ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল? কী চায়? কী খোঁজে? এখন কি আর মানায়? নয়নতারা বলল, বলতে গিয়ে যেন বিব্রত হয়ে হাসল, 'দ্যাখো কাণ্ড! একেবারে মনে ছিল না। তুমি কি বুনে দিতে পারো না, কেট'?

পালকিটা হুমহাম করে চলতে লাগল। নয়নতারা কেটের হাতে-মুখে যেন সেই আলোর বৃত্তগুলোর নাচন দেখছে। তখন অনুভব করল, পার্থক্যটাই অভিপ্রেত। তাই নয় কি? কষ্ট বটে।

উলের কথায় নীরবতা কাটল না দেখে অন্য গল্প ভেবে নিয়ে কেট বলল, 'পুরোহিত যে গঙ্গার ফিরে আসার কথা বলছিলেন, তা কি কোনো উপাখ্যান'?

নয়নতারা হাসিমুখে বলল, 'ধারণাটা আছে, গল্প বানালেই হল'। এই বলে গঙ্গাকে শিবের স্ত্রীরূপে

কল্পনা করা হয়, শিবের জটায় গঙ্গা নেমেছিল, সেখানে ফাঁদে পড়েছিল কিংবা প্রেমে—এমনসব গল্প করল।

কেট বলল, 'এটা কি কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার বিন্যাস? তাহলে শিক্ষিত মানুষেরা কেন পূজা করবে'?

নয়নতারা হেসে বলল, 'এই দ্যাখো আমি নাকি শিরোমণিঠাকুর! আমরা বড়জোর অনুভব করতে পারি। গঙ্গা চঞ্চলা, স্নিগ্ধা, প্রমত্তা, কী যেন এক অদ্ভুত প্রবাহ! প্রাণের বলবে? কিংবা প্রবহমান কালের ছায়া? অন্যদিকে জানো কেট, শিবের নাম মহাকাল—যার শেষ নেই, প্রথম নেই, খণ্ড হয় না। এ-রকম ব্যক্তিত্বে স্নেহ থাকতে পারে? কিন্তু মনে হয় না যে সে গঙ্গাকে যদি-বা ভালোবাসে যেন কোনো-এক বিষে তার মন জর্জর, যেন উদাসীন, যেন কীসের সাধনা করে, যেন বুঝতে পারে না কী চায়'?

নয়নতারার গলাটা ধরে এল।

বাগচীর কুঠির সামনে পালকি থামলে কেট দরজা খুলে নামতে গিয়ে দেখল, ইতিমধ্যে ঘরে-ঘরে আলো জ্বলছে। বাগচী তো ফিরেছেই, রাজকুমারও অন্যপথে তাদের একটু আগেই এসেছে। সে তখন ঘোড়ার পিঠে, ঘোড়াটা স্থির, কিন্তু বালামচি দোলাচ্ছে।

রাজচন্দ্র বলল, 'আমরা আর দাঁড়াব না। দ্যাখো, আলো তোমাকে অভ্যর্থনা করতে পথে এসে পড়েছে'।

কেট কিছু বলতে দাঁড়িয়েছিল। পথের ধারের একটা গাছের ডালপালায় আটকানো একখণ্ড চাঁদ তার চোখে পড়ল যা এই সন্ধ্যাকে কখনও ঘন কালো হতে দেয়নি। তাব আলো যেন নয়নতারার মুখেও। কেট বলল, 'আমি আর মাঝখানে থাকতে চাইছি না। গুড নাইট ডিয়ার্স'।

এক ভারি কৌতুকের প্রশ্ন : আমাদের চিন্তা কি সিঁড়ি বেয়ে চলে? অথবা কি নিত্য প্রবহমান?

কেট দেখল রাজকুমার ঘোড়া থেকে নেমে খানিকটা হেঁটে গেল। নয়নতারা তো পালকি থেকে নেমেছিলই। সে-ও কয়েক পা হেঁটে রাজকুমারের কাছাকাছি গেল, দাঁড়াল। কেট অনুভব করল, এই সুন্দর যুবক ... ও সেই সিড অব ডেথ ... আশ্চর্য! কিন্তু যদি তা হয়, এমন স্বাস্থ্য, এত রূপ! মৃত্যুবীজ থেকে কেউ কি বাঁচাতে পারে না? কেন পারছে না তবে?

রাজচন্দ্র বলল, 'তোমাকে কি তোমার বাড়িতে পৌঁছে দেব'।

নয়নতারা বলতে গেল, কী সুন্দর চাঁদ, রাজু। রাজকুমারের লাগাম-ধরা হাতটার দিকে বাড়ানো আঙুলগুলোকে মুঠি করে গুটিয়ে আনল। বলল, 'রাজবাড়িতে যেতে হবে না? রানীমাকে খবর দিতে হবে'। একটু হাসল সে। বলল আবার, 'যাই রাজকুমার, আমি কিন্তু গুড নাইট বলতে জানি না'।

নয়নতারা উঠলে পালকিটা ছুটে চলতে শুরু করল। এখানে রাস্তা বিশেষ ভালো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সে-রাতের রাজবাড়ি অন্যান্য রাতের চাইতে কিছু পৃথক হয়ে উঠল। অনেকবেশি আলো এবং লোক-চলাচল। পালকি যখন সদর-দরজায়, তখনই আলোগুলো চোখে পড়েছিল নয়নতারার। কাছারির বড় চত্বরটা পার হয়ে যেতে-যেতেই নয়নতারা দেখল, প্রাসাদের কাছাকাছি হাতিটা বসেছে। তার চোখে পড়ল হাতিটাকে কিছু দূরে রেখে রাজকুমার তার ঘোড়ায় আর-একটা দরজার দিকে গেল। হাতির হাওদা থেকে সিঁড়ি বেয়ে বিলেতি পোশাকের একজন নামছে। তাকে সাহায্য করতে, এগিয়ে নিতে বরকন্দাজ ও পরিচারকেরা এগিয়েছে। কিন্তু রূপচাঁদই 'এদিকে-এদিকে' বলে তার পালকির আগে-আগে ছুটে পালকিটাকে খিলানের তলা দিয়ে অন্দরে নিয়ে গেল।

নয়নতারা ভাবল : সত্যি কি তাই হয়, সময় কি নদীর স্রোতের মতো সরে যায়? তা কি তড়াগের

মতো কোনো ব্যক্তিত্বের আধারে স্থির থাকে না?

আমাদের চিন্তার প্রবাহ অবিরত অখণ্ড কিনা তা নিয়ে তর্ক আছে, কিন্তু আলাপ যে তার খানিকটাকে কিছু সময়ের জন্য আয়ত্তে আনতে পারে সন্দেহ নেই।

রানীমাকে তাঁর দোতলার বসবার ঘরেই পাওয়া গেল। নয়নতারাকে বাড়ি যাওয়ার আগে তো দিনের খবরগুলো দিয়ে যেতে হবে। রানীকে মন্দির সম্বন্ধে বলা শেষ হলে নয়নতারা নদীর বাঁধানো পাড়ে ফাটলের কথাও বলল। রানী বললেন, 'তাই? অবশ্য বাঁধানো পাড় ধীরে-ধীরে ঢালু স্বাভাবিক পাড় হয়ে গেলেই-বা ক্ষতি কি'? পুরোহিতের রসিকতাটা নয়নতারার মনে এল। তা কিন্তু রানীর সামনে বলা যায় না। রানী নিজেই বললেন, নদী ফিরলে ভয়ের কথা। কিন্তু তা ফিরবেই তা বলা যায় না। তখন আবার বাঁধ দেওয়া শক্ত কি'? হাসলেন রানী, বললেন আবার, 'ওদিকে কিন্তু সময়ের বন্যা আছে'।

রানী সেই রাতে নতুন কিছু করলেন, অভাবিতভাবে, যেমন শুধু রাজকুমারের বেলাতে তার আবদারেই হয়ে থাকে, নয়নতারাকে পাশে নিয়ে রাত্রির আহার করলেন। ব্যাপারটা কাল সকাল থেকেই গল্প হয়ে ছড়াবে। আর তাই যেন রানী, যাঁর এসব ব্যাপারের কড়াকড়ি সার্বভৌমপাড়াকে হার মানায়, তিনিই চাইলেন।

সে কিন্তু কিছুটা রাত হলে। তার আগে, রানী তখন বসবার ঘরেই, নয়নতারা তো ছিলই, হৈমীকে ডাকিয়ে আনলেন। বললেন, 'বোসো হৈমী, সারাদিনে তা করোনি'। হেসে বললেন, 'এ দিকের ঘরগুলোকে দেখেছ, নয়ন? চিনতে পারবে না। ইস্‌কিরিন, শোপা, টেবিল, গাল্‌চেতে ছয়লাপ। হৈমী এসব বোঝে ভালো'।

সেখানেই রূপচাঁদ 'এদিকে-এদিকে' বলে ছ-আনির কুমারকে নিয়ে এল।

রানী বললেন, 'বোসো। জলযোগ হয়েছে তো? পথে নিশ্চয় খুব ক্লান্ত হয়েছ। তোমার থাকবার জায়গা পছন্দ হল তো? এঁর নাম হৈমী। ইনি তোমার দেখাশুনা করবেন। কাল তোমার চীনের গল্প শুনব। কালই হরদয়াল আর নায়েবমশায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। রাজুর সঙ্গেও তখন আলাপ হতে পারবে'।

ছ-আনিব কুমার প্রণাম কবে বসেছিল, প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল। তখন রানী হৈমীকে বললেন, 'ইনি মুকুন্দকুমার। কাছে-কাছে থেকে ওঁর যত্ন কোরো'।

নয়নতারার একটু অবাক লাগল। প্রথম, অবশ্য, কৌতূহলের নিবৃত্তি। এই তাহলে কায়েতবাড়ির কুমার। এসবক্ষেত্রে অবগুণ্ঠন থাকে, নয়নতারা ও হৈমীর তা ছিল। কিন্তু সে-অবগুণ্ঠন রেশমের, যা স্বচ্ছ। আলাপে না-আনলেও বোঝা যায় তা রানীর অভিপ্রেত ছিল, নতুবা সঙ্গে নিয়ে বসতেন না। কিংবা নাকি মনের চঞ্চলতাকে আড়ালে রাখতে পার্ষদ নিয়ে বসা। নয়নতাবা অনুভব করল কায়েতবাড়ির কুমার সম্বন্ধে রানী কি কিছু বলতে চাইছেন? যেন, যা একদিন গোপন ছিল এখন প্রকাশ হতে চলেছে, কিন্তু প্রকাশটাকে আয়ত্তে রাখতে হবে।

কথা বলার আগে রানী উঠলেন। নয়নতারাকে নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরলেন। তাঁর নিজের শোবার ঘরের পাশের ঘরটিতে এসে বললেন, 'দ্যাখো। এ-ঘরে ঘুমোতে কি অসুবিধা হবে তোমার? রাত করে আর বাড়িতে ফিরো না'।

বসবার ঘরে ফিরে কথা বলার আগে কী এক আমোদ পেয়ে হাসলেন নিঃশব্দে, বলতে-বলতে একটু জোরে হেসে উঠলেন, 'শুনেছ নাকি? পিয়েত্রোর এক বাবুর্চি নাকি তার বাংলোতেই থেকে গিয়েছিল। বন্দা না কী নাম। রাজু তাকে পিলখানায় রেখেছে কিছুদিন হয়। নাকি ভালো রসুই। তো পিয়েত্রো তো ফরাসি। বড়-বড় সোনা ব্যাঙ দেখেছ'?

'ম্যাগো! সেসব রাঁধত কিনা বন্দা কে জানে'! রূপচাঁদ বলতেই হৈমী বলল, 'সে থাকলে সুবিধা হয়। বন্দা ব্যাঙ না-রাঁধুক শোর যে রাঁধত সন্দেহ কি? শোর মেরে-মেরে একটাও কি আর রেখেছিল এ

তল্লাটে'।

নয়নতারা বলল, 'বুনো শোর বিপজ্জনক হয়ে থাকে। কমিয়ে দেওয়াই ভালো হয়েছে'।

'ও হরি, তাই, পরোপকার ভেবেছ? প্রতি রবিবারে ঘোড়ায় চড়ে বল্লমে বিঁধে মারা! কী হৈ রৈ! এখানকার রাজাও সঙ্গী। খেতে অমর্ত। ঘেন্নায় মরি। তা বন্দার এখানে এই প্রথম রাঁধা। রাজু আবার একদিন তার হাতে ভগবতী খেতে চাইবে কিনা কে জানে! একবার ... হরদয়াল বলেছিল, কলকাতার ভদ্রলোকের ছেলেরা নাকি আজকাল...

একটু থেমে রানী বললেন আবার, 'রাজু অবশ্য ... আজকাল সে রোজ পিলখানায় যায় হাতির তদবির করতে। ওখানে নাকি বন্দার সঙ্গে তরোয়াল খেলে। রূপচাঁদের কথা, বলে বিপজ্জনক। রাজু অবশ্য হাসে। ওতে নাকি বুক-কাঁধ চওড়া হয়, হাতের গুল-কবজি ফোলে, চোখের ধার বাড়ে'।

রানী একটু ভাবলেন, 'বললেন, যাক গে, একটা গল্প বলো শুনি'।

নয়নতারা বলল, 'যদি আপনি বলেন দয়া করে ...

রানী একটু ভেবে নিয়ে বললেন, 'তোমরা ফার্সি পড়বে না, আরব্য উপন্যাসের গল্পও জানলে না। তুমি কি সিন্ধুবাদের গল্প শুনেছ'?

নয়নতারা বলল, 'সেই সিন্ধুবাদ নাকি, যার কথা সেদিন মানদাদিদি বলতে শুরু করেছিল'?

'হ্যাঁ, সেই বটে। মস্ত বণিক, দুধর্ষ সাহস। ধনরত্নের জন্য প্রাণকে পণ রাখতে আপত্তি নেই। জাহাজ ডুবছে, শেষ রক্ পাখির পায়ে নিজেকে বেঁধে পাহাড়ের উপরে সাপের রাজ্য, নাকি আগ্নেয়-গিরির গর্তে হীরার জন্য। হীরা যে প্রাণের চাইতে বড়। কিন্তু সেই হীরা পেয়েও কি ঘরে থাকতে পারছে'?

নয়নতারা বলল, 'আপনি কি বলবেন এ সেই ন জাতু কামঃ'।

রানী বললেন, 'কী শক্তি দ্যাখো সেই কামের, যে বুদ্ধিমান সিন্ধুবাদকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। যেন তাতেই ভালো হবে। সেই সিন্ধুবাদ একদিন দ্বীপের বুড়োর খপ্পরে পড়েছিল। বুড়ো তাব কাঁধে বসে দুই হাঁটুতে এমন গলা চেপে ধরেছিল যে প্রাণ যায়। বুড়ো ধূর্ত বটে, কিন্তু খোঁড়া'।

নয়নতারা বললে, 'আপনি জ্ঞান বুদ্ধি এসবকে খোঁড়া বলছেন'?

রানী হেসে বললেন, 'তুমি তো আবার ন্যায়রত্নের বোন ; নব্যন্যায়ের ঘর'। একটু হাসলেন তিনি।

তাঁর দৃষ্টি কোমল হল। বললেন, 'তা হয় না, না? একটা জিনিস লক্ষ্য করো। সেই মহাভারতের সময়ে লোভ, হিংসা, ক্রোধ ছিল, এখন তারা সব তেমনি আছে, তখন বুদ্ধি করে-করে যেসব নীতি করা হয়েছিল এখন সেগুলোকে বোকামি বলা হয়। ভাবো দ্রৌপদীর সংসার, কিংবা অর্জুনের পত্নীমালা। মনে হয় নাকি যে বুদ্ধিটার এক যুগ পার হয়ে অন্য যুগে যাওয়ার ক্ষমতা নেই'?

নয়নতারা হেসে বলল, 'সমাজের নীতি টিতি মানুষ বুদ্ধি দিয়ে করে বটে'।

কিন্তু রানীকে উঠতে হল। হৈমী কায়েতকুমার মুকুন্দর ব্যবস্থা ভালোভাবেই করবে সন্দেহ নেই, রাজুর খোঁজও নেওয়া দরকার।

তখন রাতের আহারপর্ব মিটেছে। হৈমী নিজেই এল। জানাল খাওয়া-শোয়ার ব্যবস্থা মুকুন্দকুমারের পছন্দ হয়েছে। বন্দাকে আশ্বাস দিলেন।

রানী বললেন, 'নিশ্চিন্ত করলে'।

এইসময়ে হৈমী বলল, 'উনি নাকি চীনে যাবেন। সেখানে নাকি ইংরেজ-চীনে যুদ্ধ, গর্ডন না কী গার্ডন নামে এক সেনাপতির জাহাজ কলকাতায় ভিড়েছে। অনেকে যাচ্ছে। কেউ-কেউ কমিসরিয়াটের কাজে। তবে উনি যেতে চাইছেন যুদ্ধ করতে। আপনি অনুমতি দিলে আর-কেউ আপত্তি করবে না'।

এ সম্বন্ধে রানী তাকে আগেই বলেছেন, ভাবল নয়নতারা। তাহলেও তার বিস্ময়বোধ হচ্ছে, কায়েতবাড়ির ছেলে এ-বাড়ির অনুমতি চাইছে! কিন্তু তার চাইতে বিস্ময়ের, মানুষ কি স্বভাবতই যুদ্ধ থেকে দূরে থাকে না? তা তো অন্যের যুদ্ধ, অন্য দেশে।

কথার কথা বলার মতো ভঙ্গিতে নয়নতারা বলল, 'এ রকম যেতে কি আপনি অনুমতি দেবেন'?

রানী বললেন, 'এবার ওর একুশ পার হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক হলে কিছু করতে চাইবে তো। এদিকে ইংরেজরা তো এদেশে আর-কাউকে মনসবদার করছে না'। রানী যেন আমোদ পেয়ে হাসলেন।

হৈমী বলল, 'নিজেরই কিন্তু ঘোড়া, বন্দুক, তরোয়াল এসব কিনে দিতে হবে'।

রানী বললেন, 'তোমার সঙ্গে অনেক কথা হয়েছে তো'!

নয়নতারা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল, সে ভাবল, নিজের চিন্তার ভুল ধরল যেন, সেজন্য অবাক লাগছে না। এটাও অবাক হওয়ার মতো। একই বয়সের। একজন চলেছে ইংরেজের পক্ষে অন্যদেশে যুদ্ধ করতে, আর অন্য একজন?

কিন্তু রানীর হাই উঠল।

রানীর পাশের ঘরেই তো নয়নতারার শোবার ব্যবস্থা। রানীমা শুয়ে পড়লে নয়নতারা নিজের জন্য নির্দিষ্ট শোবার ঘরে সামনে অলিন্দে দাঁড়াল। রাত্রির রাজবাড়ির অন্দরমহল তার চোখে পড়ল। এখন চতুষ্কোণ উঠোনটার চারিদিকের সবগুলো ঘরেই আলো। লোকজনের সাড়াও যেন। দোতলার অলিন্দের দেয়ালগিরিগুলো জ্বলছে, কিন্তু অনেক ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অলিন্দে বরং কোমল অন্ধকার এখানে-ওখানে। বাঁ দিকটায় বেশ কয়েকটা ঘরের পরে একটা ঘরেব পর্দার আলো আসছে অলিন্দে। এবার সেটা বন্ধ হল। ও-ঘরটা কি হৈমীর, অথবা ও-ঘরেই কি মুকুন্দকুমার? নয়নতারা এবার ডানদিকে চাইল। বড একটা থামের পাশ দিয়ে অলিন্দটা ঘুরে গিয়েছে কোণ তৈরি করে। থামটাই প্রমাণ যে ওখানেই দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। সেজন্যই ওখানে একটা ঝাড় যা থামের পাশ দিয়ে খানিকটা চোখে পড়ছে। সিঁড়ির থাকটাই বাজকুমারের মহলকে রানীর মহল থেকে পৃথক করে। রানী শুয়ে পড়েছেন, দোতলা নিঃশব্দ হয়ে আসছে। কার্নিশের নিচে বসানো ঝরোকায় আলো আসছে, আন্দাজ করা যায় ওটাই রাজকুমারের ঘর।

আশ্চর্য! নয়?—এই ভাবতে-ভাবতে নয়নতাবা তার শোবার জন্য নির্দিষ্ট রানীমার ঘরের পাশের ঘরে ফিরে এল। অসাধারণ শয্যা। রানীমার নির্দেশে যে-রকম হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কেন যে এমন করেন?

শয্যায় বসে সারাদিনের ক্লান্তি সত্ত্বেও নয়নতারার ঘুম আসতে দেরি হল। বরং রানীর কথাগুলো মনে এল তার। আলাপে-আলাপে বাঁধের ফাটলের সমস্যা, তার সমাধান, কায়েতবাড়ির মুকুন্দকুমার, চীনের যুদ্ধ, বান্দা-বাবুর্চির তরোয়াল খেলার কথা হয়েছিল। দ্যাখো কাণ্ড, বলে ভাবল নয়নতারা, জাঁ পিয়েত্রোর বাবুর্চির নাম বন্দা, যে নাকি তরোয়ালবাজ, যেমন বুজরুক ছিল তার মসলিন-রেশম কারবারের ম্যানেজার। এসব কি পিয়েত্রোর পরিকল্পনা, না খেয়াল? হয়তো খোঁজ করলে জানা যাবে, বন্দা ছিল প্রকৃতপক্ষে তাঁর অবিচল দেহরক্ষী।

তরোয়াল খেলার গল্পটা যেন হঠাৎ তার বুকের ভিতরে কিছুকে ধাক্কা দিল। বন্দুকও প্রাণঘাতী। কিন্তু তরোয়াল খেলা, তা কি নকল তরোয়াল দিয়ে হয়? সে মনে-মনে বলল : কী আশ্চর্য, এ তো আমাকে বলোনি! এ বিষয়ে আলাপ করা দরকার নয়? তরোয়ালকে. কৃপাণ, করবাল ইত্যাদিও তো বলে। পিয়েত্রোর সেই মখমলে ঢাকা কিন্তু অদ্ভুত ধারালো মস্ত তরোয়ালটা ব্যবহাব করে নাকি? লোহার জামা গায়ে দিয়ে নেয় তো? দেখা দরকার। না না, তা ভালো নয়। সে কাছে থাকলে যদি রাজকুমার অন্যমনস্ক হয়?

কিন্তু কী করে একা-একা অনুভব করে সমস্যার সমাধান হয়? কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারলে হতো। শিকল বুনে-বুনে জামা তৈরির কথা যদি বলো (নয়নতারার অজ্ঞাতে এটা কি ইস্পাতের জামার ছায়া?) সোয়েটারটা কিন্তু বোনা হয়নি। কী আগ্রহে উল আনাল কলকাতা থেকে, কী আগ্রহে বুনতে শেখা। কিন্তু আশ্চর্য, আগ্রহটা কেন নেই? কারো সঙ্গে আলাপ করা দরকার নয় কি?

রাজকুমারকে একবার নিজের হাতে সুতো কেটে ধুতি চাদর উপহার দিয়েছিল বটে। তেমন সেই

এক উৎসবের রাতে অনভ্যস্ত মদে বিহ্বল কিশোর রাজকুমার তার বাড়িতে গিয়ে তার বিছানায় ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আলাপের কথাতে মনে পড়ল নয়নতারার, এ-বিষয়ে একজনই মাত্র বেশ স্পষ্ট করে আলাপ করেছে। ঘটকী, সেই ব্রহ্মঠাকরুন। সেই যে অঙ্কের ধাঁধার মতো স্ত্রী-পুরুষের বয়সের পাশাপাশি হিসাব।

ছি-ছি! এসব কি আলাপে আনা যায়? রাজকুমারের এখন একুশ হবে। যেন উপরের পাতার চাপে জল এসে নয়নতারার নিচের পাতার পক্ষ্মগুলো জলবিন্দুতে ভারি হল। সে স্থির করল সে ঘুমোবে। দরজা বন্ধ করে টিপয়ায় বসানো বড় ডোমদার সেজটাকে নিবিয়ে বিছানায় এল সে। দেয়ালে লাল কাচকড়ার মৃদু দেওয়ালগিরিটা জেগে থাকবে। এখন সে গায়ের কাপড় আলগা করে দিচ্ছে।

শুয়ে নয়নতারা ভাবল, রানী কিন্তু বিচলিত নন। বাঁধটাকে নতুন করে শক্ত করে তুলবেন। ফাটলগুলো থাকবে না। পুরোহিত যেমন বলেছিল, গঙ্গার সেই বুড়াকে ... কিন্তু ক্ষতি কী যদি অগাধ শান্ত হয়ে নদীটা মন্দিরের কিছু দূরে প্রবাহিত হতে থাকে।

চোখে যখন ঘুম জড়িয়ে আসছে সার্বভৌমপাড়ার মেয়ের মনে হল : তোমার কাছে আকবর বাদশার কাল আর রাজুর কালে ব্যবধান নেই। রানীমার মন্দির কখন আকাশ স্পর্শ করে, কখন আবার মাটিতে মিশে যায়, দু-তিনশো বছরের সে-ব্যবধানও তোমার কাছে মূল্যহীন। কিন্তু তুমি তো মহাকাল, সৃষ্টির উৎস। স্নেহ নেই কেন? সময়ের ব্যবধানে আমাদের যা অতীত হয়ে যায় তা কি তুমি করুণায় পূর্ণ করো না?

এক দারুণ উৎকণ্ঠায় আর লজ্জায় ঘুম ভেঙে গেল নয়নতারার। বিছানায় উঠে বসল সে। কিন্তু বিছানা, ঘর, আলো যেন বিশ্বাসে আসছে না। স্বপ্নটা এরকম যেন : এক অগাধ জলরাশির পার বাঁধানো চলেছে কিংবা গতিশীল জলরাশিকে বাঁধে হ্রদে পরিণত কবা হচ্ছে। রানীমা, হরদযাল, নায়েবমশাই, লোকজন। কিন্তু যেন চিড় ধরল। মেঘেব মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে ফুলে-ফেঁপে সেই জল মন্দিরকে বিগ্রহকে গিলে ফেলছে। বিষণ্ণ উৎকণ্ঠায় যেন দম বন্ধ হবে। যেন হাহাকার করা হচ্ছে। কিন্তু যেন গোপনে নয়নতাবা সুখী হয়ে উঠল।

আশ্চর্য! সে বিছানার দিকে চেয়ে-চেয়ে ভাবল, এ কী অন্যায় যে রানীমার পবাজয়ে সে এত সুখী হয়েছিল! রানীমাকে সে কি বিদ্বেষ করে?

নয়নতারা উঠল। দাঁড়াতে গিয়ে পা দুটো একটু শিরশির করল। একটা জানলা খুলে দিল সে। তখন পেটাঘড়িতে একটা-একটা করে এগারোটা বাজল। রাত হয়েছে বটে, তবে তেমন বেশি নয়। জানলা ধরে দাঁড়াল সে। বাতাসটা বেশ ঠাণ্ডাই। সে কি একটা বাজনা শুনতে পেল? মৃদু, যেন ক্রমশ স্ফুরিত হচ্ছে। আগে কি ছিল? কিন্তু পিয়ানো বাজাতে বসার পক্ষে এখন কি বেশি রাত নয়?

নয়নতারা ভুল শোনেনি। বিছানা দেখে মনে হচ্ছে, সে এতক্ষণ বসেই ছিল। স্থির হয়ে বড় চেয়ারটায় চিবুকের নিচে ডান হাতে চেপে ধরার ভঙ্গিতে ছুঁয়ে বসে থাকাকে আর কিছু বলে না। এখন সে উঠে পিয়ানোর সামনে বসল। মিউজিক শীটটার গায়ে ইংরেজি অক্ষরে লেখা চপিন। শিশাওয়ালও তাই বলেছিল। কিন্তু এতক্ষণ ভেবে সে ঠিক করেছে ফরাসি হলে 'সিএইচ' 'শ' হয়ে যাবে, শেষের 'এন'টা চন্দ্রবিন্দু। এই উচ্চারণ বিভ্রাটই যেন তাকে ভাবাবে। সে স্কোর শীটটার উপরে চোখ বোলালো। অভ্যাসের ফলে টানা লাইনে নানাভাবে নিবদ্ধ স্বরগুলির শব্দ তার মনে-মনে ঝংকার তুলতে লাগল।

রাজচন্দ্র অবশ্যই এই চপিন-শপ্যাঁ সম্বন্ধে এই প্রথম জানছে। আজ সন্ধ্যাতেই পৌঁছানোর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শিশাওয়াল তার সঙ্গে দেখা করে মিউজিক শীটের রোলটা তাকে দিয়ে বলেছিল— এটা সার, আপনার জন্য এই অধমের আনা উপহার। জঙ্গিলাটের প্রাইভেট সেক্রেটারির স্ত্রীর কাছে সংবাদ

পেয়ে সেই রাতেই সংগ্রহ করি। তো স্পিংক সাহেব আমাকে বলল, এটা যখন রচনা হচ্ছে চপিন প্যারিসে, স্বদেশ পোল্যান্ড থেকে নির্বাসিত। যেন স্বদেশ স্বকাল থেকে বিচ্যুত। আর সেখানে খবর এসেছিল পোল্যান্ডকে চিরকালের আগ্রাসপন্থী রাশিয়া গ্রাস করে ফেলছে। সেই রাগে এটার রচনা। শুনে হাসি পাওয়া স্বাভাবিক। শিশাওয়াল ভালো সেলসম্যানের মতো অনর্গল কথা বলতে পারে, কেউ তার কথা বিশ্বাস করছে কিনা তা পরোয়া করে না। তার গল্পের কোন অংশটা মিথ্যা কে বলবে?

কিন্তু পিয়ানোই রাজুকে আকর্ষণ করল। নোটেশনগুলোতে চোখ পড়তে তার মনে হচ্ছে, বাজালে তা বুকের মধ্যে তরঙ্গ তুলবে। শীটের মাথায় ইংরেজ-প্রকাশক 'রিভলিউশনারি স্টাডি' কথাটা জুড়ে দিয়েছে। রাজু বাজাতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সুর এমন হল যে কিছু যেন ভেঙে পড়ছে, কোথাও বিদ্রোহ যেন, আক্রোশ আর বেদনা, হার না মানার প্রবল প্রতিজ্ঞা।

সে রাত্রিতে রাজু শপ্যাঁর সেই রিভলিউশনাবি স্টাডি বারবার বাজিয়ে যেন মুখস্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। যেন রিহার্সাল, কাল তাকে শ্রোতাদেব সামনে উপস্থিত হতে হবে। অস্বীকার করা যায় না যে কোনো বিচক্ষণ শ্রোতার কানে ধরা পড়ত বাজানোর ব্যাপারটা প্রতিবারে শপ্যাঁর নির্দেশ মতো হচ্ছে না। ইম্প্রোভাইজ করা হচ্ছে যেন, অন্তত তীব্র কঠোর ধ্বনিগুলি দীর্ঘায়ত আর উচ্চরব হচ্ছে। যেন বাঁধনছেঁড়া, বাঁধভাঙা, তাকে তীব্রভাবে অস্বীকার করা যা তোমাকে স্বাধীন হতে দেয় না, আর ব্যর্থতা যখন ভাগ্যের মতো তখন বিষণ্ণতার ঘাটগুলো বেজে উঠছে।

ন ব ম প বি চ্ছে দ

রানীর জন্মোৎসবেই সময়ের হিসাব। তখন অঘ্রানের প্রথম, নভেম্বরের মাঝামাঝি, জন্মোৎসব দু'সপ্তাহও দূরে নয় আর। শীত পড়েছে। হালকা রাগ্ নেমেছে শয্যায়।

সেদিন ববিবার। বাগচীর ঘুম ভেঙেছে যেন, কিন্তু এখনও সে শয্যায়। রবিবার বলে? ছুটির দিনেই কিন্তু অন্যদিনের আগে তার কাজের দিন শুরু হয়। সে কি অসুস্থ? উল্টো ববং, নরম ল্যাভেন্ডারগন্ধী রাগ্-এর নিচে তার শবীরটা সুস্থ, সানন্দ, বিশেষ রকমে হালকা। তার কি স্কুলের কথা মনে নেই? বরং এখনই সে ঘুমে জড়িয়ে ভাবছিল, গতবাবের চাইতে এবার তার স্কুলে ছুটি বেশি। রাসের ছুটি, জন্মোৎসবের ছুটি, বড়দিনের ছুটি। গতবাব রাসের ছুটি ছিল না।

অন্যান্য সকালে বাগচী উঠে যাওয়ার পরে কেট তার নিজের শয্যা ত্যাগ করে। নির্দিষ্ট অভ্যস্ত সময় পার হতে দেখে কেট উঠে, গোসলখানা ঘুরে হাত-মুখ মুছতে দুই খাটের মাঝখানে রাখা আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল। তখন রাত্রিবাস থেকে দিনের হাউসকোটে যাওয়ার সময়। কারো রাত্রিবাস ল্যাভেন্ডারগন্ধী মসলিনের হতে পারে। কেট ভেবেছিল বাগচী ঘুমিয়ে আছে, উপরন্তু শয্যার দিকে পিছন ফিরেই তো সে। কিন্তু প্রতিবিম্বর মুখ তো শয্যার দিকেই।

বিস্মিত বাগচী পাশ ফিরেছিল। সে ভাবল : ক্রিস্টমাসে কেটকে নিয়ে কলকাতা গেলে হয়। গতবার সে সময়ে রাজকুমারের কলকাতা যাওয়ার কথা ছিল, তাদের সঙ্গী হওযার আমন্ত্রণ ছিল। কিন্তু ব্যাপারটা তেমন ঘটেনি, রাজকুমার নৌকাবহরে পশ্চিমভ্রমণে গিয়েছিলেন।...এবার তাদের বিবাহের পঞ্চম বার্ষিকী এগিয়ে আসছে। সে-সময়ে অবশ্যই স্কুলের পরীক্ষা চলতে থাকবে। তা কেটের এতদিনে ত্রিশ হবে। পরীক্ষা নেওয়ারই পরীক্ষা, লেখার বদলে মুখে। নতুন পদ্ধতি বটে। তো শোবার ঘরের আয়না...। তাছাড়া, সলজ্জ বাগচী ভাবল : কাল বিকেলে চরণ দাস যে চিঠি দিয়েছে, বেশ বড় চিঠি। বানান দেখে

বলতে পারো না, কিন্তু উচ্চারণ রলে, রেভারেন্ড ফাদার সিবাস্টিয়ান রলে। দ্যাখো, কীবল কাল আবার এসেছিল বিকেলে। তখনই চরণ দাসও চিঠিটা এনেছিল। কেমন সব যোগাযোগ নিত্য ঘটছে। কীবল এসেছিল রলের কথা বলতেই। ফলে রলের চিঠিটা না-খুলেই জানা গিয়েছিল রলে এ-অঞ্চলে একটা মিশন হাউস করতে চায়। কীবল চলে গেলে চিঠি খুলে অবাক। রলের চিঠি। মিশন হাউস তো বটেই, সম্ভব হলে সে একটা স্কুল, একটা হাসপাতালও করতে চায়।...গাছটা বেশ বড়, রুক্ষ মোটা ত্বক ; হঠাৎ ফুল ফুটলে কেমন ছেলেমানুষ দেখায়। এরকম একটা অনুভূতির পাশ দিয়ে বাগচী স্থির করল, বেশ আরামই লাগছে, ব্রেকফাস্টের ডাক পেলে উঠলেই হবে।

কিন্তু কেট এল। কোমরের অ্যাপ্রনে বোঝা যায় ব্রেকফাস্ট তৈরিতে ব্যস্ত ছিল সে। বিছানার পাশে এসে বলল, 'অতিথি'।

বাগচী তো জেগেই ছিল। উঠে বসে বলল, 'কে, রলে নাকি'?

কেট বলল, 'ওই যে যার প্রার্থনা, 'ও গড, মেক মি এ সেন্ট বাট নট ইয়েট'।'

'আমারে করো সন্ত, কিন্তু এখনই নয়'! সে কি? বাগচী বিছানা থেকে নামল। আন্দাজ করতে পেরে হেসে উঠল, 'গুড, গ্রেশাস, ব্রেকফাস্টে বসতে বলেছ নিশ্চয়'।

'বললেন, তাঁর প্রাতরাশ শেষ হয়েছে। তাহলেও পাছে আমরা ভাবি পানাহাবে তাঁর ছোঁয়া যাওয়ার কুসংস্কার আছে, তাই টেবিলে বসতে রাজি হয়েছেন'।

বাগচী আর-একবার হেসে বলল, 'ঠিকই ধরেছি তবে। ভদ্রলোক কিন্তু সবসময়েই ভেবে কথা বলেন, ভেবে কাজ করেন'। তোয়ালে হাতে গোসলে যেতে-যেতে বাগচী দাঁড়াল ; কেটের চিবুকেব নিচে আঙুল রেখে বলল, 'মেক মি এ সেন্ট বাট নট ইয়েট প্রার্থনাটা প্রকৃতপক্ষে কার বলো তো'?

'কেন, সেন্ট টমাসের নয়'?

কেটের চিবুক ঈষৎ উঁচু করে বাগচী বলল, 'আমার, আমার, রেভাবেন্ড এন্ড্রুজ বাগচীর'।

বাগচীর বসবার ঘরে তখন যে অপেক্ষা করছিল সে সর্বরঞ্জন প্রসাদকুসুম নিয়োগী। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্কুলে যে-তিনজন শিক্ষক এসেছেন তাঁদের প্রধানতম, সহকারী প্রধানশিক্ষক বলা হয়। প্রায় এক বৎসর এই গ্রামে আছেন কিন্তু এখনও অনেক পরিস্থিতিতে তাকে নবাগত মনে হয়। ইতিপূর্বে একদিন কেট তাকে সেন্ট ফ্রান্সিস বলেছিল। চেহারা দেখেই মন্তব্য। সর্বরঞ্জন অবশ্যই বৃদ্ধ নয়। হয়তো পঁয়ত্রিশ হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে তার কথায় অর্ধেক থাকে ধর্ম সম্বন্ধে। তার দিকে চাইলেই যা দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা তার শ্মশ্রুজাল। প্রচুর আবক্ষ সেই দাড়ি সাধুসন্তের কথা মনে আনে, কিন্তু তা ঘনকৃষ্ণ হওয়ায় যেন বিপরীতমুখিনতাও। তার পরনে গলাবন্ধ কোট, ঢিলে সাদা ট্রাউজার্স। কলকাতার আধুনিকতা, কিন্তু সম্ভবত ক্ষারে কাচা এবং ইস্ত্রিও হয়নি। পোশাকটা ঘোষণা করছে সর্বরঞ্জন সাদাসিধে, মিতব্যয়ী, কিন্তু অন্যদিকে কতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ক্লেনলিনেস ইজ নেকস্ট টু গডলিনেস, সন্দেহ কী?

বসবার ঘরে ঢুকে নিয়োগীকে দেখে বাগচীর সন্ত টমাসের রসিকতাটা আবার মনে এল। সে প্রফুল্ল বোধ করল। স্কুল সম্বন্ধে কেটের রসিকতায় সস্নেহ ভাবটা স্পষ্ট থাকে।

সর্বরঞ্জন হেসে বলল (এখানে বলা দরকার তার এই থ্রি পিস নাম ইংরেজ ক্রিশ্চানদের অনুরূপ হলেও এখানে সুবিধার জন্য সংক্ষেপ করা হচ্ছে), 'আমি একটু ভুল করেছি সার, আমার ধারণা ছিল আপনি ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে থাকেন'।

'ব্রাহ্মমুহূর্তে ! বাগচী চশমার কাচ দুটোকে রুমালে মুছে নিল।

'উপাসনার সেটাই প্রকৃষ্ট সময় নহে কি? এবং যেহেতু আপনি ধার্মিক, সুতরাং অবশ্যই উপাসনা করে থাকেন, এবং সুতরাং ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করতে অভ্যস্ত ধরে নেওয়া যায়'। নিয়োগী হাসল। বিহ্বল বাগচী বলল, 'আপনি অবশ্যই ব্রাহ্মমুহূর্তে উপাসনা সমাধা করেছেন'?

সর্বরঞ্জন মাথাটাকে একবার ডান কাঁধে আর একবার বাঁ কাঁধের উপরে ছোঁয়ালো। তার মুখে একটা

শুভ্র উজ্জ্বল হাসি দেখা দিল, (সেই প্রচুর কালো দাড়িকে ছাপিয়ে হাসির পক্ষে যতটুকু তা সম্ভব) সে বলল, 'ওটাই কি ডায়েরির দৈনিক হিসাবে জমার দিকে প্রথম অঙ্কপাত হয় না'?

ব্রেকফাস্টের আগে কেউ যদি বাড়ি বয়ে এসে প্রার্থনার কথা আলোচনায় আনে তবে তাতে একটা কৌতুকের দিক থাকে। কিন্তু ব্যাপারটা বাগচীকে চিন্তার বিষয়ও এনে দিল। সে অপ্রতিভভাবে হেসে বলল, 'ওটা নিশ্চয়ই সবসময়েই জমার দিকে পড়ে, কিন্তু স্বীকার করছি, আমার জমা অনেক কম'।

সর্বরঞ্জন দাড়িঢাকা চিবুক উঁচুনিচু করল। সে কি বিব্রত অথবা আনন্দিত? কিন্তু সুশিক্ষা এমন উল্লাসকে মনে গোপন রাখতেই বলে। সুতরাং তা গোপন করতে সে যথেষ্ট বিব্রত হয়ে পড়ল।

বাগচী বলল, 'মিস্টার নিয়োগী, আপনার নিশ্চয় গুরুতর কিছু প্রয়োজন আছে, কেউ কি অসুস্থ? কিংবা আপনি কি স্কুল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবেন? কিংবা ব্যক্তিগত কিছু'?

সর্বরঞ্জন বলল, 'আমি আপনাকে অন্য বিষয়ে কিছু বলতে এসেছিলাম। কিন্তু স্কুলের কথাটা যখন উঠে পড়ল তখন বলি। আজই তো স্কুলে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য পরীক্ষক নির্বাচন করা হবে, এই সুযোগে মৌখিক পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাবটা আর-একবার ভেবে দেখলে হয় না? এমনকী শিরোমণিমশায়ও বলছিলেন ব্যাকরণজ্ঞান না-হলে, শুদ্ধ বানান লিখতে না-জানলে বিদ্যাশিক্ষাই হয় না। মৌখিক পরীক্ষায় ছাত্ররা ব্যাকরণ বানান ইত্যাদিকে ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পাবে না কি'?

শিরোমণি? বাগচীর মনে পড়ল কিছুদিন আগে শিরোমণিকে উঁচু ক্লাসে সংস্কৃত ও বাংলা পড়ানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। স্কুল সম্বন্ধে তার চিন্তায় যে-কয়েকটি মানুষের কথা মনে আসে শিরোমণি এখনও তাদের মধ্যে একজন নয়। সে বলল, 'এটা তো পরীক্ষা নেওয়ার পরীক্ষামাত্র। যদি দেখা যায় ব্যর্থ হচ্ছে, আগামী বছরে পুরনো বিধিতে ফেরা যাবে। আগেও বলেছি হিমালয়কে ঈকার দিয়ে লিখলে বা ভাবলে তার উচ্চতা কমে না, তুষারও হ্রাস পায় না'।

'কিন্তু এর একটা অন্য দিক আছে, সার। কিছুদিন পরে পুস্তকগুলি ভাষার ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে না'?

'সে যখন আমাদের এই ছাত্ররা বই লিখবে'। বাগচী হাসল, 'তাছাড়া আপনি অবশ্যই জানেন, বানান কোনো ভাষাতে স্থির নয়, ব্যাকরণ ইতিমধ্যে বদলাচ্ছে; আমরা ইতিমধ্যে 'করিবেক' 'আমাদিগের' ইত্যাদি পদ এমনকী স্কুলেও ব্যবহার করছি না'।

'তাও যদি মেনে নেওয়া হয় বিদ্যালয়-পরিদর্শকের মতকে অবহেলা করে কলকাতার পদ্ধতিকে গ্রাহ্য না-করে, এই এক নতুন পথে চললে আমরা কি দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব না'?

বাগচী হেসে উঠল, কিন্তু তখনই সম্বৃত হল, বলল, 'কলকাতার লোকসংখ্যা কি সারা দেশের লোকসংখ্যার চাইতে বেশি? তাদের সংস্কৃতিকে কি সারা দেশের সংস্কৃতি করতে হবে? সেখানে কি ইংরেজির কয়েকটা শব্দ জানাকে সংস্কৃতির লক্ষণ মনে করা হচ্ছে না'?

নিয়োগী বলল, 'সার, আপনার প্রশ্রয় আমাকে তর্ক করতে সাহসী করছে। কলকাতার ইংরেজি শিক্ষার উপরে জোর দেওয়া হয়। কিন্তু তা কি অন্যায়? সেকালের রাজা রামমোহন, একালের বিদ্যাসাগর কি ইংরেজি শিক্ষার গুণগ্রাহী নয়'?

বাগচী বলল, 'উভয়েই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, কিন্তু তাঁরা কি ইংরেজি পড়ে পণ্ডিত? কিন্তু আসল কথাটা তা নয়। আপনি কি এ দেশের চাষীদের সঙ্গে, স্ত্রীলোকদের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে, রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ইত্যাদি নিয়ে, পাপ পুণ্য সমাজ নীতি ইত্যাদি নিয়ে আলাপ করেছেন? তাদের অক্ষরজ্ঞান নেই, কিন্তু...

'সেটা হয়তো কথকতা ইত্যাদির ফলে। কিন্তু তাদের সেই জ্ঞানই তো কুসংস্কারের উৎস'।

'কুসংস্কার? হয়তো, হয়তো। আমি চাইছি আমাদের ছাত্ররা আপাতত ইতিহাস ভূগোল বিজ্ঞান চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক কিছু, আর তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানুক। সময়ের ব্যবধান কমাতে চাইছি। শুধু ইংরেজি ভাষার উপরে জোর দিলে একটা ইংরেজিনবিশ সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণী তৈরি হবে যারা আর

সকলকে মূর্খ আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনে করবে'।

এই বলে বাগচী হেসে উঠলে। কিন্তু আলোচনাটাকে গুটিয়ে নিতে সাহায্য করল কেট। সে ঘোষণা করল ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়েছে। বাগচী দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'আসুন, আসুন টেবলে যাওয়া যাক'।

আলাপটা এখানে মুলতবি হতো। কিন্তু নিয়োগীর ব্রেকফাস্টে না-বসেও টেবলে বসার বিষয়টা তো আগেই স্থির করা হয়েছে। সে তো ক্রিশ্চানদের সঙ্গে এক খাওয়ার টেবলে বসতে না-পারার মতো কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিতে পারে না, সুতরাং সে সেই ব্রেকফাস্ট টেবলের পাশেই বসল।

বাগচীর এইসময়ে একবার রলের চিঠির কথা মনে হল, একবার চরণ দাসের ডিসপেনসারির কথা মনে হল, কিন্তু সেসব দিকে মন দিলে নিয়োগীর দিকে অনাদর দেখানো হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কায় সে তার দিকে ফিরে বলল, 'বলুন মিস্টার নিয়োগী, আমি কোন বিষয়ে আপনার কাজে লাগতে পারি? আপনার দরকারি কথা না-বলে এতক্ষণ আমি অন্য কথা বলেছি ; দুঃখিত'।

সর্বরঞ্জন প্রসাদ বলল, 'সমস্যা দু'রকমের সার। আমি গতকাল স্কুল থেকে বাড়ি যাওয়ার সময়ে এ বছরের ছুটির তালিকা এবং আগামী বছরের তালিকার খসড়াটাকে দেখছিলাম। দেখলাম, রানীমার জন্মতিথির উৎসবের কাছেই লাল কালিতে নতুন একটা ছুটি বসানো হয়েছে রাস উপলক্ষে। আগামী বছরের খসড়ায় দেখলাম কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাদি তো বটেই শিবচতুর্দশী উপলক্ষেও ছুটি হবে'।

বাগচী বলল, 'এ বছরের রাসপূজার কথা আমার জানা ছিল না। শিরোমণিমশায় কয়েকদিন আগে এ ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন। আগামী বছরের শিবচতুর্দশীর ছুটির কাবণ রানীমা ফরাসডাঙায় যে শিব স্থাপন করেছেন, শুনতে পাচ্ছি সে-সময়ে সে-উপলক্ষে ভারি বড় মেলা হবে। কাছারিও বন্ধ থাকবে হয়তো'।

'এ ব্যাপারে, সার, দেওয়ানজিরও কি এই মত'?

'তিনি স্কুলের এসব ব্যাপারে আমাকেই মত স্থির করতে বলেন'।

'তাহলেই দেখুন, সার, এসব অন্যায়ের সব দায়দায়িত্ব আমাদেরই থেকে যাচ্ছে'। এই বলে সর্বরঞ্জন প্রসাদ বেশ খানিকটা মাথা ঝাঁকালো। বলল, 'আপনি আমার উপরওয়ালা। ডিসিপ্লিনের জন্য আপনার কথা আমাকে মানতেই হবে। কিন্তু এও আমি বলে দিচ্ছি, এতে আমাব অন্তরলোকের সায় নেই। প্রত্যেকের একটা মিশন আছে। আমাদের ছাত্ররা যদি তাদের পিতামাতার অন্ধকাবাচ্ছন্ন পুতুলপূজার মানসিকতায় ফিরে যায় তবে বৃথাই আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, বৃথাই শিক্ষকতা কবা'।

বাগচী হাসিমুখেই বলল, 'ছাত্রদের পিতামাতারও নিজস্ব মত থাকতে পারে'।

'অন্যায় মতও মানতে হবে'?

'অন্যায় বলছেন'?

'অন্যায় নয়? রাসের কথাই ধরুন। ওটার মতো কুৎসিত জঘন্য নীতিহীন কিছু হতে পারে? লাম্পট্যের জঘন্য প্রকাশ ছাড়া কিছু বলবেন'?

'ওটা তো ধর্মের ব্যাপার। শিরোমণি বলছিলেন। আমি ঠিক জানি না'।

সর্বরঞ্জনের মুখ গম্ভীর হল, জমকালো দেখাল তাকে। ধর্ম এবং নীতিহীনতা, এটাই তো সে বলতে চাইছিল। বিষয়টার নীতিহীনতাকে আক্রমণ করতে পারলে পুতুলপূজাটাকে সার্থক আক্রমণ করা যায়। এটাই তো প্রমাণ পুতুলপূজা কত আবিলতা সংগ্রহ করতে পারে। সে বলল, 'তাহলেই দেখুন, ওটা কি ধর্ম! মহিলা উপস্থিত না-থাকলে বলতে পারতুম ধারণাটাই কী জঘন্যভাবে কুৎসিত'।

এমনকী সর্বরঞ্জনের মুখে দাড়িহীন অংশটুকু যেন লজ্জায় লাল হয়ে উঠল। নিয়োগীর কথা বলার ভঙ্গি, মুখচোখের চেহারা দেখে রাস উৎসব সম্বন্ধে বাগচী প্রকৃতই ভীত হল। তাকে দুশ্চিন্তা করতে দেখা গেল। সে বলল, 'আপনি শিরোমণির সঙ্গেও আলাপ করুন। আপনার মত তাকে জানান। স্কুলে নীতিহীন ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া যায় না'।

কেট বাংলা বোঝে, বলে। সুতরাং ইতিমধ্যে সে-ও কুণ্ঠিত হয়ে উঠেছিল। সেদিকে লক্ষ্য রেখে বাগচী তাড়াতাড়ি আলাপটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনার বাড়ির খবর বলুন, ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ভালো থাকছে তো? এই সমাজে আপনার স্ত্রীর অসুবিধা হচ্ছে না তো? আপনার বাসগৃহ সম্বন্ধে কিছু করা দরকার আছে কি? আপনার বেতন জানুয়ারি থেকে পুরো একশো করা যায় কিনা এ সম্বন্ধে দেওয়ানজি ভেবে দেখবেন বলেছেন'।

আলোচনাটা এদিকে ফিরলে কেট বিস্কুট ও কফি এগিয়ে দিল। সর্বরঞ্জন তা গ্রহণ করে উৎফুল্ল হল। সুনীতির সার্থক সুপ্রয়োগে কার না সুখ হয়?

বলা বাহুল্য, বাগচীদের প্রাতরাশ সেদিন অন্য দিনের মতো হল না। বাগচী আলোচনাটাকে গ্রাম সম্বন্ধে, গ্রামজীবনের সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে, নিয়োগীর সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে ধবে রাখল। অন্যান্য দিনের মতো তাদের পরস্পরের অন্তরঙ্গ বিষয় নিয়ে আলাপ হল না। কেট নিয়োগীকে একবার আরো কিছু খেতে অনুরোধ করে ভাবল : এসব হয়তো আমার ভাবা উচিত নয়, কিন্তু ভদ্রলোকের দাড়িটাকে অন্যের বলে মনে হয় যেন। আর এই মাথা নেড়ে কথা বলার ভঙ্গি? বাগচী একবার ভাবল . ভদ্রলোক ছুটির ব্যাপারটাকে কত কঠিনভাবে নিয়েছেন দ্যাখো! ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে চলে এসেছেন, কারো গৃহস্থালিতে ব্যাঘাত হয় কিনা তা ভাবার অবকাশ পাননি।

প্রাতরাশ শেষ হতেই বাগচী পাইপ হাতে টপ হ্যাট মাথায় বাইরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। অন্যান্য দিনের মতো পাইপ মুখে কেটের সঙ্গে আধঘণ্টা নিছক গল্পগাছা করার সুযোগও আজ ছিল না।

তা দেখে বাগচীর সহিসও তার টাট্টু নিয়ে এল।

বাড়ির বাইরে পথে এখন সকালের রোদ। উজ্জ্বলতায় ও কবোষ্ণতায় তা তৃপ্তিদায়ক। রবিবারের অভ্যাসমতো বাগচী চরণের ডিসপেনসারির কথা ভাবল। ইতিমধ্যে সে বোধ হয় দেরি করে ফেলেছে।

সর্বরঞ্জন বলল, 'আপনি কি এখনই বেরোচ্ছেন, সার? আমার আলাপের দ্বিতীয় বিষয়টার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিলাম'।

'ও, হ্যাঁ, বলুন-বলুন। চলুন তাহলে আমরা হাঁটতে-হাঁটতে কথা বলি'।

তারা হাঁটতে শুরু করল। সহিস অগত্যা টাট্টু নিয়ে পিছনে হেঁটে চলল।

সর্বরঞ্জন বলল, 'এবার এ গ্রামে নাটকও হচ্ছে'।

'নাটক? মানে থিযেটার? কলকাতায় হুজুগ উঠেছে বটে। হঠাৎ হচ্ছে যে'?

'রানীমার জন্মোৎসবে'।

'বাহ্! অন্যান্যবার শুনেছি যাত্রা হয়। তো আপনি এবং আমাদের সব শিক্ষকই অবশ্যই আমন্ত্রিত হবেন। শুনেছি খুব আনন্দ হয়'।

'তা হয়তো হবে। কিন্তু থিয়েটার বলে কথা? বেশি বাস্তব নয়'?

'যাত্রার চাইতে সাসপেনসন অব ডিসবিলিফ বেশি হয় বলছেন'?

'আমাদের ছাত্ররাও তো তা দেখবে'।

'খুব সম্ভব। শুনেছি রাজবাড়ির দরজা সে রাতে বন্ধই হয় না'।

'তাহলেই দেখুন, সার! উপরন্তু যদি তারা দেখে তাদের একজন শিক্ষকই সেই অভিনয়ে অংশ নিচ্ছে...

'সে কী? কে'? বাগচী অবাক হল।

'আমাদের চরণ দাস'।

বাগচী হো-হো করে হেসে উঠল চরণ দাসকে অভিনয় করতে দেখার কল্পনায়। পথের ধাবে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাসি থামলে বলল. 'বলেন কী, আমাদের চরণ দাস'? তার চোখের সামনে ধুতি, বেনিয়ান, দড়ির মতো পাকানো চাদর গলায় গম্ভীরমুখ এক যুবক ভেসে উঠল যে কাজের ব্যস্ততায় প্রায়ই দাড়ি

কামায় না।

গম্ভীর স্বরে সর্বরঞ্জন প্রসাদ বলল, 'নাটকমাত্রেই নারীচরিত্র থাকে নাকি? সেই নারীচরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কোনো পুরুষচরিত্রে অভিনয় করা কি ভালো'?

বাগচীর গায়ে সকালের রোদ পড়ছে। আবার গাছপালা থাকায় কুয়াশাও আছে। পথের ধারের গাছের ডালপালার ছায়া যেমন পথে তেমনি তার গায়ে জালি কাটছে। সে হেসে বলল, 'এই এক মহা অনিষ্ট, আজন্ম আমরা নারীচরিত্রের সঙ্গে জড়িত। ওতপ্রোতভাবেই। এমনকী আমরা শুরু হচ্ছি নারীর উদর থেকে'।

এ কী অদ্ভুত কথা! একটা কঠিন আঘাত পেল সর্বরঞ্জন। এ কী সাংঘাতিক কথা বলছেন এত হালকা সুরে হেডমাস্টারমশাই! হায়, সুনীতি বলে কিছু আর রইল কি? কিন্তু সে-ও অনেক যুদ্ধের পোড় খাওয়া সৈনিক ; হয়তো হেরেছে বেশি, কিন্তু জয়লাভও করেছে। সে তার বক্তব্য বাছাই করে নিল। তার দাড়িটা কেঁপে উঠল একবার। সে বলল, 'না-না, না, একে আমরা বোধ হয় এত সহজে চিন্তা থেকে সরিয়ে দিতে পারি না। তাদের এই নাটকে পরনারী ধর্ষণের কথা আছে, আয়োজন আছে। জগদীশ্বর আমাদের পাপকথন ক্ষমা করুন। নিয়োগী দু'হাত তুলে দুটি তর্জনী অনেকটা করে নিজের দু কানে ঢুকিয়ে দিল যাতে তার নিজের কথাটাও সবটুকু কানে না-যায়।

কারো-কারো কৌতুকবোধ বেয়াড়া রকমের থাকে। মনে হল, বাগচী আবার হেসে উঠবে। কিন্তু সে বরং থমকে গিয়ে চিন্তা করল। নিয়োগীর প্রকাশটা কৌতুকের হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে চিন্তার বিষয় থেকে যাচ্ছে। নারীধর্ষণ অসম্ভব ঘটনা নয়, কোনো নাটকে তার চিত্রণও থাকতে পারে, কিন্তু তার সঙ্গে একজন শিক্ষকের অভিনয়ে সংযোগ থাকা উচিত হয় কি? বাগচীর হাতের ছাতাটা একবার দুলল, সে বলল, আচ্ছা, এ বিষয়ে আমি চিন্তা করব, চরণের সঙ্গে কথা বলে নিই'।

প্রকৃতির স্নিগ্ধ কবোষ্ণতা এই ছুটির দিনে বাগচীর আরামদায়ক বোধ হচ্ছিল। এমনও হতে পারে, ব্রেকফাস্ট অন্যান্য দিনের মতো স্বচ্ছন্দ হয়নি, এখন কিন্তু জীর্ণ হতে-হতে স্নিগ্ধ পুষ্টিতে তার কোষগুলিকে হৃষ্ট করছে। বাগচী বলল, 'আচ্ছা নিয়োগীমশায়, আপনার কি মনে হয়, এ গ্রামটার কিছু-কিছু বিশেষত্ব আছে? কথাটা বোধ হয় এই, আনন্দদায়ক শান্তি এখানে খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে'।

'ঈশ্বরের কৃপায় তা হতে পারে, সার'।

'নিশ্চয়-নিশ্চয়। তিনি কৃপা না-করলে কৃপা চাইবার বুদ্ধিও হয় না, এরকম শুনেছি। আপনাকে একটা ভালো সংবাদ দিতে পারি, আপনার মতও জেনে নিতে পারি। এ অঞ্চলে রেভারেন্ড রলে নামে একজন ক্যাথলিক মিশনারি একটি মিশন হাউস করতে চাইছেন। ইংল্যান্ডের নতুন ক্যাথলিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত এঁরা'।

'এ তো আশ্চর্যের কথা, সার, ভারি আশ্চর্যের কথা'!

'হয়তো পরে একটা স্কুল কিংবা চিকিৎসালয়ও হবে সেই মিশনে'।

নিয়োগী বলল, 'না, না সার, এর চাইতে পরমাশ্চর্যের বিষয় আর-কিছু হতে পারে না'।

তারা পাশাপাশি হেঁটে চলল। বাগচীর একবার মনে হল তার পক্ষে এখনই কি ঘোড়ায় ওঠা ভালো হবে? তার আর মিস্টার নিয়োগীর উদ্দেশ্যে এখন কিছু পার্থক্য আছে বটে। কিন্তু একজন ভদ্রলোক তার বাড়িতে এসেছিলেন, তাঁকে কী করে বিদায় নিতে বলা যায়? আলাপ চালিয়ে নিয়ে সে বলল, ক্যাথলিকরা কিন্তু এ রকম সাকার পূজাই করে থাকে। পুতুল না হোক, মূর্তি থাকে'।

নিয়োগী বলল, 'অবশ্যই সার, তা কিন্তু পবিত্র ক্রিশ্চান ধর্ম'।

কিন্তু সে অন্যদিকে ভাবছিল, অন্তত তাঁর ঠোঁট এবং চোয়াল কিছু চিবানোর ভঙ্গিতে নড়ছিল। সে বলল, 'সার, আমাদের চরণ দাসের পদস্খলনের ব্যাপারটা। না, না সার, এ কথা আমাকে বলতেই হবে, ওটা তুচ্ছ ব্যাপার নয়। যদিও হয়তো স্ত্রীলোক অভিনয় করবে না, কিন্তু কী মারাত্মক, বিশেষ এই গ্রামে,

রুগ্নদেহে কুপথ্য সম্বন্ধে যেমন, এ বিষয়ে সতর্ক থাকতেই হবে'।

বাগচী ভাবছিল, তার নিজের ধর্ম—যা ক্যাথলিক বা প্রোটেস্ট্যান্ট কিছু নয়—তাতে ঈশ্বরের কোনো আকার করার কথা ওঠে না, ওদিকে কিন্তু ভাবতে গেলেই আকার একটা আসে। ফলে অন্যমনস্ক থাকায় সে নিয়োগীর কথা সবটুকু শুনতে পায়নি। রোগের কথায় উৎকর্ণ হয়ে বলল, 'কী বলছিলেন? এই গ্রামে কী বিশেষ রোগের কথা বলছিলেন? বিশেষ কোনো প্রাদুর্ভাব নাকি? শুনিনি তো'!

নিয়োগী বলল, 'সত্যভাষণের সুযোগ সত্যই কম। সুযোগ হলে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত। আপনি যখন এই গ্রামে ক্যাথলিক রলের মিশন হাউস কল্পনা করে প্রফুল্ল, তখনই দেখুন, কত না জাঁকজমক সহকারে শিবমন্দির হচ্ছে এই গ্রামে'!

'রানীর মন্দিরের কথা বলছিলেন কি? ওঁরা ধনবান, জাঁক হবেই। গ্রামটাও ওঁদের'।

কিন্তু, নিয়োগীর মুখ আরো গম্ভীর হল, সে বলল, 'এও কি ভালো সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় রক্তচন্দন ব্যবহৃত হবে'? বাগচী হো-হো করে হেসে উঠল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বলল, 'আমার লঘুভাব ক্ষমা করবেন, বিশ্বাস করুন শিবপ্রতিষ্ঠায় রক্তচন্দন প্রয়োজনের কিংবা অধর্ম তা আমার জানা নেই। আপনার কি মনে হয় শ্বেতচন্দনই প্রশস্ত'?

নিয়োগী বলল, 'না-না, এসব ব্যাপার লঘুভাবে দেখা উচিত হয় না। রক্তচন্দন কি রক্তের প্রতীক নয়? তাতে কি লিঙ্গ উপাসনা আরো বাস্তব হয় না? তিনি আমাদের অন্নদাত্রী, কিন্তু একবারও না-বললে সত্য কুণ্ঠিত হয়। যে প্রকার শুনি তা হয়তো চন্দন নয়, রানীমার রক্তই'।

নিয়োগী দুই কানে আবার তো আঙুল ঢোকাল বটেই, শিউরে উঠে চোখ দুটিও বন্ধ করে ফেলল। বাগচীর মুখ নিরতিশয় গম্ভীর। সে বলল, 'নমস্কার মশাই, আপনার বাসা অদূরে। তাছাড়া ডিসপেনসরিতে রোগী আসার সময় হয়ে যাচ্ছে'।

বাগচী পিছনে তাকিয়ে তার সহিসকে দেখতে পেল। সে টাট্টু নিয়ে এতক্ষণ নিঃশব্দে অনুসরণ করেছে। টাট্টুটা নিচু, চড়তে সহজ। বাগচী লাগাম হাতে নিয়ে টাট্টুতে বসল।

যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার সুযোগ চলে গিয়েছে ; নবকৃষ্ণ, মতি শীল, এমনকী দ্বারকানাথ হওয়ারও সুযোগ কম। তখনকার কলকাতায় নিম্নমধ্যবিত্তদের একরকম প্রাবল্য চোখে পড়ে। কেরানি, মুৎসুদ্দি, দালালের দালাল, শিক্ষক, কিছু উকিল, কিছু ডাক্তার, বড় জোর ডেপুটি, এবং দোকানদার, অর্ধ বেকার, বেকার। এদের এক অংশ খুব লিখত, বক্তৃতা দিত, পত্রিকা ছাপাত। গবেষণা করতে হলে এইসব কাগজপত্রই হাতের কাছে। ফলে এ-রকম ধারণা হয়, কলকাতায় তখন সমাজ ও ধর্মের সংস্কার ও সংস্কৃতি বিষয়ের আলোচনা ছাড়া কিছু নেই, সেই যুগটাই ছিল সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের। তা অবশ্যই হয় না। তখনও যুগটা খাওয়া-পরার দরুন অর্থ সংগ্রহের যুদ্ধে ব্যস্ত ছিল।

এখনও যেমন তখনও তেমন কলকাতার হালফিলের চালচলনকে সংস্কৃতি মনে করা হতো, যদিও হয়তো সংস্কৃতি কথাটা তখনও জন্ম নেয়নি। তখনকার দিনে মধ্য, নিম্নমধ্যবিত্ত স্কুলে-কলেজে পড়া মানুষদের মধ্যে ধর্মমত, সুনীতি, দুর্নীতি নিয়ে, স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও নানা রকমের সমাজ-সংস্কার নিয়ে আলাপ আলোচনা যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছিল। গো-মাংস খেয়ে, মদ্যপান করে সমাজ-সংস্কার করার চাইতে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ রোধ, স্ত্রীলোকের শিক্ষা ও তাদের পর্দার বাইরে আনা এগুলোই সমাজ-সংস্কারের উপাদান হিসাবে মূল্য পাচ্ছে ক্রমশ, যদিও কি উকিল, কি ডাক্তার, কি ইংরেজ ব্যবসায়ীর মুৎসুদ্দি, কিছু সঙ্গতি হলেই উপপত্নী বা রক্ষিতা রাখাকে জীবনের সাফল্যের নিদর্শন মনে করছে। তখন মিশনারিরা ১৮৫৭র আশঙ্কাকে কাটিয়ে উঠতে না-পেরে ক্রাইস্টের মত প্রচারের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতীয় ধর্মের কুৎসা প্রচারের ব্যাপারটায় ঢিলে দিয়েছে। ভারতীয়রা বুঝতে পারছে, নামে মাইকেল, এমনকী রেভারেন্ড যুক্ত হলেও জীবনের প্রেয় সহজলভ্য হয় না। কিন্তু পৌত্তলিকতা যে মন্দ তা নিয়ে তর্কের অবকাশই ছিল না। শিক্ষিত হলে কথা নেই, এমনকী স্কুলের ছাত্র কী-এক গ্লানিতে

উপনিষদে মুখ লুকাবে যেন। ইংরেজ রাজা হওয়ায় এই এক সুবিধাও ছিল, পথেঘাটে প্রকাশ্যে ধর্ম নিয়ে কথা বললে কাজির লোকেরা ধরতে আসে না। তখন তো নতুন যে ব্রাহ্মধর্ম তাতেও কোন শাখা আভাঁগার্দ এমন তর্ক যেন দেখা দেবে। বেদ অপৌরুষেয় কিনা, উপাসনা-বেদিতে অব্রাহ্মণ বসবে কিনা এসব সমস্যা পার হয়ে তখন উপবীত ত্যাগের আন্দোলন হচ্ছে। আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে নববিধান বিচ্ছিন্ন হয়নি বটে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ক্রাইস্ট সম্বন্ধে কোনো-কোনো মন্তব্যের ফলে কোনো-কোনো ব্রাহ্ম পত্রিকার গ্রাহক থাকতে অনিচ্ছুক হচ্ছেন। তখনও কেশবচন্দ্র রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে ব্রহ্মকে মা বলে ডাকতে শুরু করেননি, বিজয়কৃষ্ণ নিরাকার ত্যাগ করে সাকারে ঝোঁকেননি। তাহলেও ধর্ম তখন এক নিরতিশয় উত্তেজক বিষয়। অন্যদিকে তখন এদেশের ভাষায় নাটক লেখা হচ্ছে। এটা কৌতুকের যে নাটকের পৃষ্ঠপোষকেরা ব্যক্তিগত জীবনে মদ ও ভ্রষ্টাদের সঙ্গে যেভাবেই সংশ্লিষ্ট হোক, নাটকে সেসবের সমালোচনা দেখা দিচ্ছে, রায়তদের কষ্টের ইঙ্গিত থাকছে। কিন্তু সেইসব প্রাগ্রসর মানুষের প্রাগ্রসর অংশে নাটক সম্বন্ধেই বিরূপতা দেখা দিচ্ছে, কারণ নাটক অলীক, নারী-সংযুক্ত বিষয়। তখন এক দল মদ খেতে না-শেখায় পুত্রস্থানীয়দের কী করে ভদ্রসমাজে পরিচিত করবেন ভেবে চিন্তিত, অন্য এক অংশে তখন মদ্যপান নিবারণ সম্বন্ধে ভাবা হচ্ছে।

ঠিক এইসময়েই সর্বরঞ্জন কুসুমপ্রসাদ, 'রাজনগরের জ্ঞানদা বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক, শুনতে পেল, মানুষের গলায় কেউ তাকে কিছু বলছে। তার সামনে, পিছনে, পায়েব নিচে কয়েক গজ রৌদ্রে উজ্জ্বল পথ, তার বাইরে কিন্তু বৃত্তাকারে কুয়াশা। সে শুনল : করুণাময় আর বিধানচন্দ্র দুজন আলাদা বাবু, হুজুর কাকে খবর দিতে বলেছেন?

নিয়োগী পিছন ফিরে দেখল বাগচীর সহিস কয়েক হাত দূরে করজোড়ে দাঁড়িয়ে। দ্যাখে, তার মুখে কিনা এই সকালেই একটা ঘাসের ডাঁট। নিয়োগী একবারমাত্র তাকে দেখে নিয়ে দম-দম করে হাঁটতে শুরু করল। সে অবশ্যই অন্য অনেক আদর্শবান ব্যক্তির মতো নিরর্থক, অসত্য অকিঞ্চিৎকরকে পিছনে ফেলে চলতে শিখেছিল।

২

টাট্টুর উপরেই ট্যাকঘড়ি বার করে বাগচী দেখল, নটা বাজতে চলেছে। চরণ দাসের বাড়ি কম করেও এক ক্রোশ। টাট্টুটাকে দ্রুততর করতে তার পশমদার ঘাড়ে চাপড় দিয়ে 'যা-যা' বলতে সেটা গলা লম্বা করে তা দুলিয়ে ঝাঁকিয়ে গতির পরাকাষ্ঠা অভিনয় করল। বাগচী তাকে আরো গতিশীল করতে পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে তার নিতম্বদেশে 'যুঃ-যুঃ' বলে চাপড় দিলে টাট্টু একেবাবে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল। বাগচী অবাক। টাট্টুর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে গোড়ালি দিয়ে তার পেটে আঘাত করে 'হেট্-হেট্' বলাতে টাট্টু আবার তার নিজের চালে চলতে আরম্ভ করল।

বাগচী চশমা খুলল, রুমালে মুছল, হাসল। ব্যাপারটা ধরতে পেরে মনে-মনে বলল, তাহলে এই গাধাটা চু-চু আর যুঃ-যুঃ-র তফাত বোঝে না।

তখন তার চারিদিকে ঈষৎ রঙিন কুয়াশার মধ্যে আরামদায়ক টাটকা রোদ, ভিতরেও জীর্ণমান ব্রেকফাস্টের কবোষ্ণতা। সে এক চম্পক করাঙ্গুল দেখতে পেয়ে মনে-মনে হাসল, তৃপ্তি বোধ করল, স্থির করল কেটকে বলতে হবে, অতটা করে চিনি যেন টাট্টুকে আর না-খাওয়ায়। কিন্তু আগে যে-চিন্তাটা মনে ছিল সেটাকে খুঁজে পেল না। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ল, বিষয়টা বোধ হয় আত্মা আর মন। আত্মাও কাজ করে, মনও করে। যত বুদ্ধিসুদ্ধি তা তো মনেরই, তাহলে আত্মা কীভাবে কাজ করে? মনের কাজগুলোকে কি এ-রকম বলবে যে তার সঙ্গে খানিকটা বুদ্ধি করে চলার, লাভক্ষতির, মানিয়ে নেওয়ার চিন্তা থাকে, যতই আন্তরিকতা থাকুক?

এখন ভাবার সময় নয় এই ভাবতে গিয়ে সে ভাবল কাল সন্ধ্যার কফির সময়ে, রাতের ডিনারের সময়ে কেটকে বিশেষ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। বিশেষ তার গাল লাল হয়ে উঠেছিল, চোখ উজ্জ্বল হচ্ছিল। গাইল্সের চিঠির কথা উঠেছিল আবার।

এটাও তার ভাববার বিষয় কিনা সন্দেহ। সকালে আয়নার সামনে তখন কেট কিন্তু ভেবেছিল সে ঘুমিয়ে আছে। আজ দেরিই হয়ে গেল ডিসপেনসারিতে যেতে। তা, কেট অবশ্যই সুন্দরী, গড়নটাও, তাতে প্রাচুর্যও আছে। এবার তার ত্রিশ হবে। আর তাদের বিবাহের তো এবার পঞ্চবার্ষিকী।

সে এদিক-ওদিক চাইল। সবচাইতে কাছের মানুষ একটা খেজুর গাছের মাথায় রস সংগ্রহ করছে। অবশ্যই বলতে পারো তার মতো চল্লিশের এক রেভরেন্ড পাদরির এসব ব্যাপারে বাক্যব্যয় করা উচিত হচ্ছে না। কেট নিশ্চয়ই বুদ্ধিমতী, সংসারের ব্যাপারে পদক্ষেপগুলো হিসাব করা। আর তুমি কি কল্পনাও করতে পেরেছিলে, কত সহজে পরিবর্তন আনা যায়, কথাটা বলা যায়—কাল রাতে কেট যা বলল! 'আমাদের সংসার এবার পূর্ণ হোক'। অবশ্য এখন বলতে পারো, কালকের রাতের পোশাকে আর চুলের খোঁপায় কিছু বিশেষ ছিল। খুব সোজা কথা, একটু মুখ লাল করে বলা, সংসার পূর্ণ হোক।

এ রকমও সে শুনেছে যে কোনো এক বসন্তের প্রভাবে উভয়ে যখন কী-এক লাবণ্যে পূর্ণপ্রাণ...কেট খুব বুদ্ধিমতী, হিসাব করে চলে। তা বুদ্ধির তো সেটাই ধর্ম। কিন্তু তুমি কি বলবে সন্ধ্যার সেই উত্তেজনা গাইল্সের চিঠি নয়? একটা পরিবর্তন কিন্তু।

বাগচী ভাবল, ও সেই নারীসংযোগের কথা। আচ্ছা-আচ্ছা, নিয়োগীমশায়কে ওভাবে পথের উপরে ত্যাগ করা ভালো হয়নি। দেখা হলে ক্ষমা চেয়ে নিলে হবে। সে মনে-মনে হাসল, কিন্তু লক্ষ্য কবো কি ক্যাথলিক বলে, কি বৌদ্ধ শ্রমণ, কি হিন্দু সন্ন্যাসী পরিহার করতে বলে। তাকে কিছু লজ্জিত দেখাল। না, নিয়োগীকে দোষ দেওয়া যায় না।

বাগচী কিছু অন্যমনস্ক থাকায় চরণের সেই ডিসপেনসারির বারান্দার ভিড়টাকে লক্ষ্য করেনি। ফলে সে কাছাকাছি যাওয়ামাত্র চারিদিকে একদল ছাত্রকে দেখতে পেল। তাদের মধ্যে দু'এক পা এগিয়ে তার মনে হল, এ সময়ে এখানে তাদের থাকার কথা নয়। সে বলল, 'তোমরা এখানে'? কয়েকজন একসঙ্গে বলল, 'আমাদের ইসমাইলের চোখটা তো সারবে সার'? বাগচী নিজেই তাদের সমস্যা ও উত্তেজনার কারণটাকে দেখতে পেল। বারান্দায় বেঞ্চিতে বসা এক বালকের চোখ কপাল জড়িয়ে ব্যান্ডেজ-বাঁধা। বাগচীর এক হাতে লাগাম, অন্য হাতে ছাতা, সে দুটিকে দুজনের হাতে দিয়ে বারান্দায় উঠে কোটটাকে তৃতীয় জনকে ধরতে বলে ব্যান্ডেজ খুলতে শুরু কবল। অসুখটা কঠিন। চোখটা বিশ্রীরকমে ফুলে বন্ধ হয়ে আছে। যে তুলো দেওয়া হয়েছে তাতে রক্তের চিহ্ন। অন্যটিও আক্রান্ত, কিছু কম। বাগচী সস্নেহে ব্যান্ডেজটা আবার বেঁধে দিল।

একজন ছাত্র বলল, 'ওকে ওষুধ দেন সার'।

স্বভাবত ধীরভাষী চরণ ধমকে উঠল, 'ওষুধ দেওয়া হয়েছে। যাও এখন, বিরক্ত কোরো না'।

ছাত্ররা হকচকিয়ে বারান্দা থেকে নেমে গেল।

বাগচী বলল, 'তোমাদের ইসমাইল আমাদের বুঝি কেউ নয়? তুমি কিন্তু টক খেও না ইসমাইল। ভয় পেয়ো না, চরণবাবু তো ওষুধ দিয়েছেনই। ইসমাইল কি ওষুধ নিতে আবার বিকেলে আসবে, চরণ'?

চরণ অন্যদিনের চাইতে অনেক গম্ভীর। সে বলল, 'আমি ওকে সে-রকমই বলেছি সার'।

ছাত্ররা চলে গেলে চরণের বারান্দা ফাঁকা হয়ে গেল। বাগচী রসিকতা করে বলল, 'দ্যাখো তোমার ওষুধের গুণ, ডিসপেনসারিতে একজন রোগী নেই'।

চরণ বলল, 'এখন মসুর-কলাইয়ের ক্ষেত্ করার সময়, যার যেটুকু অঘ্রাণের ধান আছে কাটার সময়। দু'একজন এসেছিল, ওষুধ নিয়ে গিয়েছে'।

আলাপটা এগোল না। ব্যাগ কাঁধে ডাকহরকরা দেখা দিল। সেখানে বসেই ডাকের ব্যাগ নিল চরণ,

তেমন একটা মুখ বন্ধ ব্যাগ এনে দিল ডাকহরকরাকে। চরণ যখন ডাকের এই কাজ করছে, বাগচী ভাবল কী অদ্ভুত কাজ করে এই লোকটি। সকালে ডাকের কাজ করে, সেখান থেকে স্কুলে, আবার কিছু ডাকের কাজ, বিকেলে এই ডিসপেনসারিতে ওষুধ বিলোয়, নিজের ক্ষেতখামারের কাজ তো আছেই। নিয়োগী আসার পর থেকে সন্ধ্যায় ইংরেজি শিখছে। রবিবারেও এই ডাক এল।

হরকরা চলে গেলে বাগচী বলল, 'রোগী আসে আমি দেখব, তুমি ডাকের কাজ করতে পারো'। চরণ ডাকের কাজ করতে শুরু করল। বাগচী বসে রইল খানিকটা সময়। এক-এক করে দু-তিনজন রোগী এল। তাদের বিদায় করে পাইপ ধরাল বাগচী। সে অনুভব করল তামাকটা বেশ ভালো, আর এখনকার আবহাওয়াটাও। তাছাড়া কেট দেখা যাচ্ছে চিরদিনই বেশ সাহসী। ভাবো, সেবার রাজকুমারের সঙ্গে গড়ের জঙ্গলে চলে যাওয়া। অবশেষে ঘড়ি দেখে বলল, 'আর মিনিট দশেক। তোমার কাজ হল? আজ দিনটা বেশ ভালো। ভাবছি তোমাকে সঙ্গে করে কিছুটা ঘুরি। আমার কিছু সিল্ক কেনার ইচ্ছা হচ্ছে যদি পাই। দেখা যাক না, কী বল?

চরণ বলল, 'দু-তিন দিন আগে সেই আর্মেনি শিশাওয়ালকে দেখেছিলাম। তার কাছে সিল্ক নেই'?

শিশাওয়াল কলকাতা থেকে নৌকা সাজিয়ে অন্যান্য বছরের মতো এবারও এসেছে। তার ব্যবসাই এটা। পণ্যের দিক দিয়ে সে একচেটিয়া। এসব অঞ্চলের ধনীদের, মধ্যবিত্তদের, এমনকী নিম্নমধ্যবিত্তদের উপযুক্ত পণ্য থাকে তার। মুখ্যত অবশ্য মরেলগঞ্জের কুঠিয়ালদের এবং রাজবাড়ির অর্ডার-সাপ্লায়ার। শিশাওয়াল নামও পণ্য থেকেই। কাচের শীট, গ্লাস টাম্বলার, চিমনি, ডোম, ঝাড় এসব তো বটেই, নানা আকারের মদের বোতলও অবশ্যই থাকে। কলকাতার আধুনিকতার কথা মনে রেখেই কুঠি ও রাজবাড়ি থেকে অর্ডার দেওয়া হয়। কিন্তু আধুনিকতার সৃষ্টি তো মুখ্যত বণিকের পণ্যে, সুতরাং আমদানি অর্ডারকে ছাপিয়েই যায়। অবশ্যই তার সেলসম্যানশিপও যথেষ্ট। সে ধনীদের শাল, দোশালা, বনাত আনে। নানা দামের রাগ্-কম্বল আনে, সূতার বস্ত্র ইত্যাদিও আনছে নিম্নমধ্যবিত্তদের জন্য।

সম্ভাব্য রোগীদের জন্য অপেক্ষা করতে-করতে বাগচী শিশাওয়াল থেকে রানীমার জন্মোৎসব, তা থেকে নাটকের চিন্তায় পৌঁছে মনে-মনে হাসল। জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, চরণ, খবরটা আজই শুনলাম, তোমরা নাকি এবার থিয়েটার করছ রাজবাড়িতে'?

চরণ লজ্জায় মুখ নামাল।

বাগচী বলল, 'কী নাটক? সে কি আমি পড়েছি'?

চরণ বলল, 'প্রথমে ঠিক হয়েছিল নীলদর্পণ'।

বাগচী মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'কিসের দর্পণ? রোসো-রোসো, মনে পড়ছে। গত মাসে দেওয়ানজি যে কয়েকখানা বই স্কুলে দিয়েছেন তার মধ্যে এটা ছিল। কিন্তু ভাষা সহজ হলেও তা কিন্তু ছাত্রদের পড়ানো যায় না। ভাষা সহজ ভালো, কিন্তু অত গেঁয়ো ভালো নয়। বলবে ঘরের চারপাশের ভাষা। কিন্তু ঘরের চারপাশে তো জঞ্জালও থাকে। কিছু উপরে উঠতেই না স্কুল'।

চরণ বলল, 'দেওয়ানজির সেরেস্তদার বেজো কলকাতা থেকে বইটা এনেছে। তা কিন্তু আমরা করছি না। গৌরীরা 'বুড়ো শালিখ' পছন্দ করেছে, আর 'একেই কি বলে...

'এসবও কি বেজোবাবু এনেছে? কার লেখা, কী বৃত্তান্ত সেসব নাটকের'? চরণ বলল, 'হ্যাঁ সার, বেজোই এনেছে। মাইকেলসাহেবের লেখা'।

কিন্তু বাগচী তখন নীলদর্পণের কথাই ভাবছিল। সেই নীলকরদের অত্যাচারের কথা যা সেই নাটকে দগদগে করে আঁকা। সেই দাদন আর দাদনের নীল আদায়ের জন্য 'গাদন'। সে বলল, 'আচ্ছা, চরণ, তোমার সেই ডানকানার খৃস্টানি আত্মার কাগজপত্তর জাল করার, লাখ বছর ঘুমিয়ে থাকার গল্প মনে আছে'?

'ওটা, সার, গ্রাম্যরসিকতা হয়েছিল। চরণ অপ্রতিভ হল'।

'না চরণ, না। তোমাদের সেই রসিকতা বেশ তীক্ষ্ণ ছিল। বলতে কি তোমাদের সেই আলাপ নীলদর্পণে ঢুকিয়ে দিলে মানাত। সে তুলনায় নীলদর্পণের রসিকতাই মোটা'।

চরণ অবাক হয়ে বাগচীর মুখটাকে দেখে নিল। সে জানে হেডমাস্টারমশাই-এর চিন্তার খেই ধরা তার পক্ষে সম্ভব নয়। দেওয়ানজির বন্ধু, আচারে ব্যবহারে সংস্কৃতিতে যিনি পুরোপুরি ইংরেজ, তিনি এ বিষয়ে কী ভাবছেন কে জানে। নীলদর্পণই এখনও মনে রেখেছেন, হয়তো শোনেননি যে তারা নীলদর্পণ নাটক করছে না। মুখটা যেন থমথম করছে।

বাগচী বলল, 'দ্যাখো চরণ, লোকে বলে আত্মা কৃতকর্মের বিচারের জন্য অপেক্ষা করে থাকে, কেউ বলে পাপের শাস্তি সঙ্গে-সঙ্গে হয়, এ-রকম মতও আছে—পাপপুণ্য, তার শাস্তি পুরস্কার সমাজ শাসনে রাখার জন্য তৈরি গল্প। কিন্তু, চরণ, অন্যকে পীড়ন করা যে পাপ এ কিন্তু খ্রিস্টানরাও স্বীকার করে'।

চরণকে আজ অন্যরকমই দেখাচ্ছে। সে যেন কোথা থেকে মনকে ফিরিয়ে আনল, বলল, 'কিছু বললেন, সার'? বাগচী প্রশ্নটায় অবাক হল। বলল, 'তুমি কিছু ভাবছিলে, চরণ, আমার বক্তৃতাটা মাঠে মার খেলো। কোন রোগীর কথা ভাবছ? আচ্ছা, চরণ, তুমি কি মিশন হাউস দেখেছ? মনে করো, এই অঞ্চলে একটা মিশন হাউস হচ্ছে। সেখানে ইংল্যান্ডের মিশনারিরা থাকবেন'।

চরণ বলল, 'মরেলগঞ্জের কুঠিতে একাধিক ইংরেজ সপরিবার আছেন'।

চরণের তুলনাটা তার কাছে এত ভ্রমাত্মক যে বাগচী হেসে বলল, 'মনে হচ্ছে তুমি মিশনারিদের দ্যাখোনি। আমি তোমাকে তাঁদের ধর্মমত মানতে বলছি না। আমিও সব মানি না। মিশন হাউসের সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষা, বদান্যতা, পরোপকার, আধুনিকতা অনেক-কিছু জড়িত থাকে। মরেলগঞ্জের কুঠিয়ালদেরই কেউ-কেউ এ-ব্যাপারে উৎসাহী। তুমি তো কীবল সাহেবকে নিজেই দেখেছ আমার কুঠিতে'।

'তবেই তো, সার। দ্য ডেভিল ওয়জ সিক দ্য ডেভিল এ সেন্ট উড বি'।

'কী বললে? ডেভিল'?

চরণ তাড়াতাড়ি বলল, 'হয়তো আমারই ভুল, সার'।

'না, চরণ, তোমার ইংরেজি উচ্চারণটা ভালোই। আমি মনে করতে পারছি না ছড়াটা কোথায় শুনেছি। কিন্তু দ্যাখো, এ অঞ্চলে মিশন হাউস হলে আমাদের গ্রামেরও পরিবর্তন হবে। তাছাড়া নতুন আদর্শ চোখের সামনে থাকা ভালো। আমাদের পুরনো আদর্শ প্রয়োজনমতো বদ্‌লে নিতে পারি। তাতে ভালো হয়'।

'ভালো হয়'?

তর্কে অভ্যস্ত পাদরির সতীদাহ নিবারণ ও বিধবাবিবাহ আইনের কথা মনে এল। যুক্তি হিসাবে এটাকেই সে খুব জোরালো মনে করল, কারণ চরণ নিজেই বিধবাবিবাহ করেছে। সে বলতে গেল এদেশে কিছুদিন আগেও বিধবাদের পুড়িয়ে মারা হতো, এখন প্রয়োজনে তাঁরা বিবাহিত হচ্ছেন। কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত এই যুক্তি থেকে সে নিজেকে সামলে নিল।

পাইপটা ঝেড়ে পকেটে রেখে সে ঘড়ি দেখে হেসে বলল, 'দশটা বাজল চরণ। আমি তোমাকে মিশনারিদের সম্বন্ধে অনেক বলতে পারতাম। কিন্তু এখন চলো, একটু ঘুরি। সিল্ক খুঁজতে হলে তুমি তাঁতিদের কাছেই যাও, তাই নয়'?

চরণ বলল, 'চলুন সার, আমি দুমিনিটে তৈরি হয়ে আসছি'।

চরণ দাস অন্দরে গেলে বাগচী ভাবল : এটাও ভেবে দেখার মতো বইকি যে মিশনারিদের প্রধান উদ্দেশ্য ধর্মান্তরকরণ। কিছু মানুষকে তা ক্রিশ্চান করতে চেষ্টা করবেই। চরণ কি এই ভেবেই বিরক্ত? এটা কি চিন্তায় উঠে আসেনি, কিন্তু মনের তলায় আছে এমন স্বজাতিক্ষয়ের আশঙ্কা?

চরণ প্রস্তুত হয়ে এলে তারা বেরিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ তারা পাশাপাশি নিঃশব্দে হেঁটে চলল। পরে বাগচী বলল, 'সব যদি ছেড়েও দাও চরণ, মিশনারিরা ইংরেজ শাসনকে তাড়াতাড়ি টেনে আনতে পারে।

পথঘাট হবে, হয়তো রেল এসে যাবে, হয়তো তারে খবর পাঠানোর বন্দোবস্ত হবে'।

এটা একটা কৌতুকের ব্যাপারই হল। বাগচী টের পেল না এই পথঘাটের কথাটা এইমাত্র বাইরে থেকে তার মনে ঢুকল। তারা ফরাসডাঙার দিকে চলেছে তখন। তারা তখন যেখানে তার কিছু দূরে পথের উপরে বেশ কয়েকজন মানুষ কিছু মাপজোখ করছে। ওভারসিয়ার সুরেন তাদের নেতা। বাগচী যেন তাদের লক্ষ্যে আনল না, কিন্তু যেন আগের তর্কের টানে বলল, 'রানীমার শিবমন্দির হচ্ছে, তাতে কত লোক একবছর থেকে কাজ পাচ্ছে, দেখেছ? মিশন হাউসও খুব ছোট হয় না। তাদের বাড়িঘর পথঘাট তৈরিতেও কত লোক কাজ পাবে দেখ'।

আলাপটা ক্রিশ্চান মিশন হাউসের অনেক বড়-বড় সম্ভাব্য উপকরণ থেকে অকস্মাৎ কিছু লোকের কিছুদিন ধরে মজুরি পাওয়ার সম্ভাবনায় নামলে চরণ হেসে ফেলল। আশ্চর্য রকমে অন্যমনস্ক না-হলে এমন হওয়ার নয়। হেডমাস্টারমশায়ের কথা। কিন্তু তার কথাও অনেকক্ষণ থেকে কি একগুঁয়ের মতো শোনাচ্ছে না? সে যেন একমত হওয়ার সুযোগে স্বস্তি পেয়ে বলল, 'তা ঠিকই, সার। শিবমন্দির শুধু নয়। ডাকঘরের পর থেকেই এবার পাকা সড়কের কাজ শুরু হয়েছে। শুনছি নাকি রাজবাড়ির সদর থেকে শিবমন্দির তক একই পাকা রাস্তা হবে, আমাদের স্কুলের পাশ ছুঁয়ে, পুরনো ঝিলের উপরে অ্যাকোয়াডাক্ট তৈরি করে। চাষা-আবাদ নেই, কাজকর্ম নেই এমন লোকজনের উপকার হচ্ছেই তো বটে'।

'বলো কী? এসব বলোনি তো আগে'? বাগচী হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, 'তুমি তো আচ্ছা অন্যমনস্ক লোক হে! সামনে কত লোক সড়কের কাজ করছে দ্যাখোনি? ওখানে সুরেনবাবুদের দেখছি'। মুখ ঘুরিয়ে চলো। বন্ধুদের দলে জুটে থিয়েটারে মাতো যদি আমার রেশম খোঁজাই হবে না'।

খানিকটা দূরে গিয়ে বাগচী বলল, 'এত সব সড়ক কি শুধু শিবমন্দিরে যেতেই মনে করো'?

চরণ বলল, 'শুনছি সেখানে পেত্রোর বাংলোও নতুন করে করা হচ্ছে। একটা নতুন বাড়িও নাকি উঠবে কলকেতার সাহেববাড়ির কায়দায়'।

'তাহলেই দ্যাখো। আচ্ছা, সেখানে সে-বাড়িটা কেন হবে আন্দাজ করছ'?

চরণ বলল, 'ওটা তেমন-তেমন সাহেবসুবোদের জন্য গেস্ট হাউস হতে পারে। হতে পারে রাজবাড়ির কেউ থাকবেন, রানীমাও হতে পারেন'।

বাগচী ভাবল : রানীমা? রানীমা কেন? তা, শুনেছি রাজাদের বিবাহ হলে তেমন ব্যবস্থা হয়। চরণ চিন্তা করল, তার কথাটা কি শ্লেষের মতো শুনিয়েছে? এ-বিষয়ে সে হেডমাস্টারমশায়েব সঙ্গে একমত যে রাজবাড়ির মন্দির, সড়ক ইত্যাদির ব্যাপারে মানুষ কাজ পাচ্ছে। তা দরকারও ছিল। কুমোর, কামার, তাঁতি, চাষিদের কাজের বয়স হলেই বর্ণগত জীবিকা ধরবে সে সুযোগ আর কোথায়? তাদের কেউ-কেউ জীবিকা পাচ্ছে। কিন্তু আর-সব জমিদারের মতো রানীমা যদি কলকাতা-ঘেঁষা হতেন? সে মনে মনে হাসল : আসলে বিধবা রানীমা খ্রিস্টান ব্রাহ্মদের ব্যাপারগুলোকে ম্লেচ্ছকাণ্ড ভেবে কলকেতার দিকে যেতে চান না। তাই উপকার।

৩

তখন তারা ফরাসডাঙা দিয়ে চলেছে। বাগচীর মন ততক্ষণে পথঘাট থেকে রেশমের দিকে সরে গিয়েছে। সে বলল, 'এবার তাহলে আমাদের এই গ্রাম ক্রমশ হুগলি চুঁচুড়া শ্রীরামপুরের মতোই একটা শহর হয়ে উঠবে দেখো'। কিন্তু পরক্ষণেই বলল, 'এদিকেই কোথায় ধনঞ্জয় বসাকের বাড়ি, সেদিকেই চলো'।

সেকালটা, অবশ্যই, রাজনগরে আর এমন ছিল না যে বাগচী যে-কোনো সকালে বেরিয়ে তার আশামতো ব্রোকেড-সিল্ক দূরের কথা গরদ-মটকাই পেয়ে যাবে। সে প্রথমে বসাকপাড়ার ধনঞ্জয় পরে

মালিকপাড়ার মেহেরালির দেখা পেল। চিকিৎসার সূত্রে তারা পূর্ব-পরিচিত বটে। তাঁতিদের মধ্যে দবীর বক্সের সাগরেদ আল্লারাখা বসাকের কথা বাদ দিলে তারাই এ অঞ্চলে প্রধান।

ধনঞ্জয়ের লম্বা তাঁতঘরে তখন তাঁত চলছিল। অন্তত চারখানায় কাজ হচ্ছিল, তারই একখানায় সে নিজে। সে জানাল রাজবাড়ির উৎসবের দরুণ সে কিছু তসরের গড়ার বরাত পেয়েছে। শীতে ওম দেবে, কিন্তু খসখসে আর মোটা। হুজুরের হুকুম পেলে সে পরে এক থান তসর বুনে দিতে পারে। গরদ চাইছেন, সে সুতো নেই। বামুনমশায়রা মাঝে মাঝে তসর-কেঠো নেন, গরদ কে নিচ্ছে আর? শুনেছি মালিকবাড়ির ওরা রাজবাড়ির দরুন গরদের শাড়ির বরাত পেয়েছে। দেখুন ওখানে, তাছাড়াও গরদ বুনছে কিনা। সুতো নাকি রাজবাড়ির সরকারই এনে দিয়েছে।

বাগচী জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে বুঝি গরদের সুতো হয় না'?

'হতো তো। সে কিন্তু পেত্রোসাহেবের আমলে। ফরাসডাঙার আধখানায় তুঁতচাষ ছিল, আজ্ঞা।

'এখন বুঝি তসরের সুতো হয়। বামুনদের লাগে বলছিলে'।

'আজ্ঞে না। সেও তো আনাতেই হয়। দামে কম, ঝুঁকি কম। বামুনে-তসর বছরে দশখানা বিকোয়, দাম পেতে আজ্ঞে একবছর। কিনছে কে যে কাটুনি সুতো কাটে, তাঁতি তাঁত বয়? জোলাপাড়ায় দেখুন গামছা আর মোটা সুতোর মাঠা। আট আনায় যে মিলেন শাড়ি, তাঁতি দিনরাত খেটে ডেড় টাকায় দিতে পারবেনি। আর বামুনমশায়রা যে কিনবে আমরা আগে তো দেব-থোবো। আমরা গিইচি তো তেনারা রইলেন? শাপমুন্যিরও আর আগুন নেই'।

বাগচী হেসে ফেলল, কিন্তু বলল, 'না-না, বোধ হয় ঠিক বলছ না। পিয়েত্রো গত বলে খরিদদাররাও গত হবে কেন'?

ধনঞ্জয় বলল, 'এখন বুঝি, আগেই টান ধরেছিল। এখন ভাবলে বুঝি, ত্রিশ বছর থেকে তাঁতের বৃদ্ধি বন্ধ ছিল। সাহেব থাকা তক বাজারের কথা ভাবতাম না। বোনা মাল গুদামে পৌঁছে দিলে হল, সুতো চাই, আনো গুদাম থেকে। দেখতে হতো মালটা কী হচ্ছে, তাঁতে হাঁকফাক না-পড়ে'।

'তাহলে বলছ, পিয়েত্রোর মতো মহাজন আর-একজন না-আসা পর্যন্ত তসর গরদ আর উঠতি হচ্ছে না'।

'আজ্ঞে না। নামার দিকে। বরাত ছাড়া, আগাম দাদন ছাড়া কে বুনবে? কী এক মিলেন কাপড় হয়েছে, তাই নাকি বাবুভায়াদের ফ্যাশোয়ান। সাপানে কাচো, গরমে ইস্তিরি চালাও। কে-আর তিনগুণ দিয়ে রেশম কিনছে'?

বাগচী বলল, 'হ্যাঁ, ধনঞ্জয়, কী হবে তাহলে এখন'?

ধনঞ্জয় বলল, 'জন্ম থেকেই শুনছি, কী হবে? বোকার জাত, সার, ধানপানের কাজ জানি না, রোদজল সয় না, কাদাপাঁকে গা ঘিনঘিন। কী হবে দেখেন গে ওস্তাগরপাড়ায়। দরজায়-দরজায় রঙের ভ্যাট, ধুমসো চাড়ি-গামলা, কাঠের ছাপা, ইস্তিরির কুঁদো। সাদামাটা রেশম চলে না, কে-আর কিনছে? রঙিন আর ফুলদার...

বাগচী অপ্রতিভের মতো হেসে বলল, 'তাহলে ব্রোকেড দূরের কথা'?

ধনঞ্জয় বলল, 'চরণভায়া, মাস্টারসাহেবকে নিয়ে মালিকবাড়ি যাও। মেহেরচাচার পাগলামি আছে। বোরকেট্ করলেও করে দিতে পারে'।

মেহের মালিকের বয়স অনেক হবে। মুখে সাদা কিন্তু সৌখিন ফরাসি কায়দার দাড়ি। কথা বলার আগে ঠোঁটে হাসি জড়ায়।

বাগচী তার কাছে মেমসাহেবের গাউনের উপযুক্ত সিল্কের কথা বলতেই সে বলল, 'সে আর হয় না'।

'ব্রোকেড চেনো, মালিক'?

মেহের আলির আত্মসম্মানে আঘাত লাগল। কী একটা বলতেও যাচ্ছিল, কিন্তু কথাটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'পেত্রো বুজরুকের বাপেরা আমার আব্বাজান আর চাচাজিকে চুরি করে এনেছিল মুকসুদাবাদ থেকে। ভরার খুবসুরৎ হিঁদু মেয়ে দেখে নিকাহ দিয়েছিল'।

'বলো কী'? বাগচী হেসে ফেলল।

'জি, চাবুক খাও, নয় বোরকেড্‌। রেশমে ফুল ফোটাও, ঠাসো যেন জল না-গলে। বোনো জমিজিরৎ মৌরসিতে। লেকিন বিশ থান বোরকেড্‌'।

'এসব গল্প'।

'কারিগরে আর ফকিরে ওই এক মিল, হুজুর। কারিগরের বিশ থান হয়ে ওঠে না, ফকিরও খোদাকে পায় না। কিস্তক এই জমিজিরত পেত্রোদের দেওয়া। তো, ওদিকে দবীর বক্সের দবীরখানি মসলিন, ইদিকে আব্বাজানের মালকানি বোরকেডের নাম ছিল, হুজুর। লোকে বলত, আঙুলে হয় না শুধু, তুকতাক আছে'।

বাগচী বলল, 'ব্রোকেড হয় না, ঠাসা জমির গরদও কি হয় না'?

তখন মেহের তার তাঁতঘরে ঢুকল। লম্বা উঁচু আটচালাটায় তখনও আট-দশখানা তাঁত। তিন-চারটিতে কাপড়, একজন একটিতে কাজ করছে। মেহের জানাল সে তার ছোট ছেলে। মেহের নিজেই তাঁতের উপরে ঝুঁকে বলল, 'এসব কাপড়ে কি আপনার হয়'? কিন্তু কাপড় দেখে বলল, 'না, হুজুর, এ আপনাকে দেওয়া যায় না'। ছেলেকে হেঁকে বলল, 'এ-রকম কেন রে'?

ছেলে বলল, 'ওখানা রাজবাড়ির নয়। হীরু মহাজনেব দরুন। সে বলেছে, মুখপাত ঠেসে দিও, সব ঠাসলে দামে পোষায় না'।

মেহের আলি বলল, 'না হুজুর, এদিকে ঘুরে লাভ নেই। আপনি বরং আল্লারাখার খোঁজ নেন। সে এখনও রাজবাড়ির দরুন গরদ বোনে'।

বাগচী বলল, 'কাপড় নাই পেলাম। এই আলাপও ভালো লাগছে। কিন্তু, ওস্তাদ, এ-রকম হল কেন'?

মেহের বলল, 'হয়েছে কি আজ? তিন কুড়ির উপরে দশ হল, তিন কুড়ির খবর রাখি। পেত্রোদের স্থায়ী গুদাম হওয়ার আগে পূজা ঈদের ছ'মাস আগে দাদন বরাত নিয়ে সাধাসাধি, এক-দেড় মাস আগে কুতঘাটে নৌকার ভিড় লাগত মহাজনের। রেশম তো বটে, সুতোর শাড়ি নিয়ে কাড়াকাড়ি। সেসব নৌকা বন্ধ হল ; এক কুড়ি বছর আগে পেত্রোদের জাহাজ চলাও বন্ধ হল'।

মেহের থামল একটু, পরে হেসে বলল, 'তো পেত্রো বলতেন, মেহের, হাজার বছর ধরে কাপড় দিয়ে সোনা লুঠেছ ওদের, এবাব ওরা আইন করে কাপড় দিয়ে সোনা লুঠবে। শুধু কি কাপড়? ইস্তক খোন্তা, কুড়ুল, দা, হেঁসো সেই জাহাজে আসছে'। বাগচী বলল, 'মেহেরমিঞা, তোমার বোবকেড জাহাজে নাই উঠল, এদেশেও তো বহু লোক...

'হুজুর ফেশোয়ান বদলায়। পাঁচ সাল আগেও বুজরুক খাঁর কিস্তি যেত লখনউ। এখন, হুজুর, সেখানে সে ফেশোয়ান নেই। কে আছে কলকেতায় মুকসুদাবাদে দবীরখানি মসলিনের শাড়ি পিন্ধে, কামিজ বানায়, দো পাট্টা পিন্ধে? কে আছে হুজুর, মালকানি বোরকেটের শেরোয়ানি, আচকান, চোগা পিন্ধে'?

বাগচী তা সত্ত্বেও বলল, 'শুনে মনে হয় ববাত ছাড়া, আগাম টাকার দাদন ছাড়া তাঁতে বসতে চাও না'।

মেহের আলি একটু ভেবে বলল, 'হুজুর, সুতোর টাকা বরবাদ, একমাসের পরিশ্রম বরবাদ যদি এক থান বুনে এক বছর বসতে হয় তা বেচতে। আসলে, হুজুর, রোগটা অনেকদিনের। সেই ছিয়াত্তরের রক্তবমি। রাজবাড়ি আর পেত্রোর চেষ্টায় ওস্তাদেরা বেঁচেছিল, কিন্তু পাঁচআনি লোক, কাটুনি জোলা, রজক ওস্তাগর, কামার কুমোর, গুড়ে, চাষী শেষ হয়েছিল। পেত্রো বলতেন, তারপরে শরীর সারেনি, জাতটাই আধহাত কমে গিয়েছে'।

বাগচীর কৌতূহল বাড়ছিল। রাজনগর-ফরাসডাঙার এ অঞ্চলের খ্যাতিটা তাহলে ছিল তাঁতের।

সেজন্যই বর্ধিষ্ণু। নতুবা শুধু ধানে, তিলে আর গুড়ে বোধ হয় অত বড় রাজবাড়ি এতদিন ধরে গড়ে ওঠে না। সে বলল, 'আসলে তোমাদের বাজার চাই, বাজারে নিয়ে যাবে দাদনদার বরাতদার মহাজন চাই'।

মেহের আলি বলল, 'আমার ছোট দামাদের ভাই মহাজন হতেছিল, 'এ গের্দের মাল নিয়ে দু'সাল কলকেতায় গেল'।

'তারপর'?

'মিয়াদ খাটছে'।

'সে কী'?

মেহের বলল, 'দাদনদার হতে রাজার জাত হতে হয়। দাদনের কাজ আদায় হয় না সহজে, আগাম টাকা গরিবের পেটে ঢুকে যায়। আদায় করতে, তো ইংরেজ তা করে বাঁচে, অন্যের মিয়াদ হয়'।

৪

মাসদেড়েক পরে এইসব কথা বিচিত্রভাবে বাগচীর মনে ফিরেছিল চরণের বাড়িতে বসেই। সে তো পিয়েত্রোর কাছেই শুনেছিল সেই পাঠান-মুঘল আমলে, ইউরোপেও যেমন, ধর্ম নিয়ে বর্বরতা ছিল, কিন্তু প্রতিবাদও ছিল . ক্ষুধা ছিল, সোনা-জহরৎ ছিল, নবাব-রাজা-ওমরাদের বিলাস ছিল, সোনাও ফিরত কাবিগবদের হাতে। এখন প্রতিবাদ নেই, সোনাজহরৎ নেই, কারিগর নিশ্চিহ্ন। সে চিকিৎসক এবং সেটা তো ডিসপেনসারি। হঠাৎ এ-রকম ঘোব লেগেছিল তার মনে! তার স্কুল, ছাত্র, হাটবাজার, লোকজনেব চলাফেরা এসব কি সেই ছিয়াত্তরের উচ্ছিষ্ট।

কিন্তু সেদিন তখন বেলা হয়েছে। প্রথম শীতের হলেও, বেলা বারোটায় প্রকৃতি তপ্ত, প্রখর। তারা চরণের বাড়ির দিকে ফিরছিল। বাগচী লক্ষ্য করল, চরণ এতক্ষণ সঙ্গে থেকেও একটা কথাও বলেনি। সে হেডমাস্টারের এই রেশম খোঁজায় কৌতুক বোধ করছে না তো? তার এই রেশম খোঁজা কি অস্বাভাবিক ব্যাপার হল? সে বলল, 'হ্যাঁ চরণ, তুমি কি সেই অসুস্থ ডেভিলের কথা ভাবছ এখনও'?

চরণ বলল, 'ওবা দাদন-বরাতের কথা বলল'।

বাগচী বলল, 'তাই, তাই। সিল্ক নেই বলে এমন করে নেই তা কি তুমি জানতে'?

চরণেব বাড়ির কাছাকাছি এসে বাগচী বলল, 'তোমাদের সেই নাটকের কথা যা বলছিলাম'।

'নাটক হবে। তবে আমি ঠিক ওতে নেই'।

বাগচী ভাবল : দ্যাখো, কেমন সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

চরণের বাড়িতে টাট্টুর লাগাম হাতে নিয়ে সে বলল, 'ও হ্যাঁ, ইসমাইলের চোখটা! মার্ক সল দিয়েছ তো? তাই দিও আবার'।

টাট্টুরও ক্ষুধার সময়। সেটা একটু তাড়াতাড়ি চলছে চেষ্টা করে, এমনকী তার ক্ষুরে ঘোড়ার মতো না-হোক পটপট করে একটা শব্দ হচ্ছে। বাগচী তখন ভাবল, কী লজ্জা থেকেই বাঁচা গেল! ভাগ্যে সিল্ক পাওয়া যায়নি। তার চল্লিশ হয়েছে। কেটের ত্রিশ হবে। আজ সন্ধ্যায় পিয়ানো বাজাতে বলা যায়। আমি চরিতার্থ, হে ঈশ্বর! কিন্তু সিল্ক কিনে দিলেই তা বেমানান হতো। এই সিল্ক খোঁজার গল্পও কি বলা যাবে? কেটের তো এমন মনে হতে পারে, সে কাল রাত্রিতে যে-সিদ্ধান্ত নিয়েছে এসব তারই পুরস্কার দেওয়ার ইচ্ছা। না, না। এ রকম ধারণা অন্যায় হবে যে একজন শুধু কেটকে নিয়েই সন্তুষ্ট ছিল না।

সে যখন সার্বভৌমপাড়ার পাশ কাটিয়ে গঞ্জের রাস্তা ধরছে, ভাবল, তাহলে এতদিন এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্তে নেওয়ার ভার আলোচনা না-করেও কেটের উপরেই রাখা ছিল? কেটই দেখতে গেলে তাদের সংসারে ভিন্নজাতীয়া হিসাবে অতিথি। ব্যাপারটা কি এই ভিন্নজাতীয়তার দরুন সমস্যা হয়ে ছিল? স্বীকার

করতেই হবে, কেট যেমন বুদ্ধিমতী, তেমন জেদী। এ দুটোর প্রকাশের সময়েই তাকে কিন্তু ভালো দেখায়।

বাগচী তখন স্কুলডাঙার দিকে যাওয়ার প্রধান পথগুলোর একটির কাছে। সেটার ধার দিয়ে একসারি গাছ থাকায় তার সবটুকু চোখে পড়ছে না। সে ভাবল : যা স্বাভাবিক তা নিয়ে সে ভাবছেই-বা কেন?...সকলেই ভাবে? তাও কিন্তু তার এই চল্লিশে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারে না। কেটকে জিজ্ঞাসা করা যায় না। না-না। এটা তার নিজস্ব সিক্রেট থাক।

রবিবার থাকায় যোগাযোগ হল একটা। একটা হাঁক শুনে সে চমকে উঠল। সে দেখতে পেল, যেখানে সে প্রধান পথটায় উঠবে সেই মোড় দিয়ে একজন যাচ্ছে বটে। তার পরনে ট্রাউজার্স, কিছুটা বিবর্ণ চেক্ ফ্ল্যানেলের শার্ট, মাথার চুল বেশ লালচে, মুখের রং গাজর জাতীয়। হলুদ হলে, মাথার চুল কালো হলে চীনা বলা যেত। অন্তত তাব পিঠে কলকাতার চীনা ফিরিওয়ালাদের মতো কাপড়ের গাঁটরি। দৃশ্যটা বাগচী মনের মধ্যে নিতে-না-নিতে আবার হাঁকটা শুনতে পেল, 'বনাত, বনা-ত, ব-না-ত।

সেদিকে চোখ থাকায় বাগচীকে আবার মৃদুভাবে চমকাতে হল, তার টাট্টু এখন যেভাবে চলেছে তাতে যে-কোনো লম্বা লোক অনায়াসে তার পাশে-পাশে চলতে পারে, লম্বা পায়ে চললে তাকে ছাড়িয়েও যেতে পারে। বাগচী শুনতে পেল তার কনুইয়ের কাছে কে বলল, 'গুড মর্নিং, সার। যদি অনুমতি করেন, আপনার কুঠিতে যেতে চাই। আজ রবিবার বলেই এই পথে এসেছি। কয়েক পিস্ ভালো শাল আছে, সার। গত রবিবারে আপনাকে পাইনি'।

বাগচী হাসিমুখে ওসবে আমার দরকার নেই বলে নিরস্ত কবতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই শিসাওয়াল উঁচু গলায় গজ দশেক আগে চলা সেই ফিরিওয়ালাকে ডাকল। বাগচী লাগাম টেনেছিল। সেই ফিরিওয়ালাও পিছিয়ে এল। সে কাছে এলে শিশাওয়াল বলল, ' আলফ্রেড মিনহাজ ডিসিলভা আমাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, রেভরেন্ড ফাদার বাগচী, হেডমাস্টার'।

ভদ্র বাগচী বলল, 'হাউ ডু ইউ ডু মিস্টার ডিসিলভা'।

মিনহাজ তার হলুদ দাঁতে হেসে ইংবেজিতে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার। কিন্তু আমার প্রিন্সিপ্যাল আমার নামটা প্রায়ই গুলিয়ে ফেলেন, আমি ডিসিলভা নই, রিয়ালি আই'ম ওসুলিভান'।

তখন সেখানে আলাপ করার সময় নয়। বাগচী কিছু বলার আগেই শিশাওয়াল, যার প্রকৃত নাম য্যাকব ফেলিসিটার, বলল, 'ডিসুলিভান, তুমি ছোট গাঁটরি আর পিতলের গজকাঠিটা আমাকে দাও। আর বিকেলের আগে পুবদিকটা শেষ করে এসো'।

ওসুলিভান তার বড় গাঁটরির নিচে থেকে একটা ছোট গাঁটরি বার করে দিল। তার হাতে এতক্ষণ বোঝা যায়নি, দুটো গজকাঠি ছিল। তার একটা ফেলিসিটারকে দিয়ে আবেগহীন মুখে হাঁটতে শুরু করেই হাঁক দিল, 'বনাত'। য্যাকব বলল, 'শুধু বনাত কেন? চাদর. চেকচাদর বলো, সুতি দোরুখী আলোয়ান বলেও হাঁক দাও। দিনে খানদশেক চাদর কাটা চাই'।

ওসুলিভান জোরে 'চাদ্দর' বলে হাঁক দিল'।

বাগচী জিজ্ঞাসা করল, 'চেকচাদর কী'?

'এবারের ফ্যাশান, সার। উল আর সুতোয় মিশানো, নানা রঙের চেক। অল-উল বলে চলে যাচ্ছে। তিন থেকে চারে দিচ্ছি রং অনুসারে। তাঁতের একটা মোটা সুতোর চাদর যেখানে দু টাকা, রঙিন সুতোর চাদর বারো আনা থেকে দেড় টাকায় দিচ্ছি। দোরুখীগুলো দু টাকায়। চলুন, সার'।

বাগচীর টাট্টু চলতে শুরু করল, শিশাওয়াল তার পাশে হেঁটে চলল।

বাগচী বলল, 'তুমি আমার কুঠিতে যেতে চাইছ বটে, আমি কিন্তু শাল কিনবার কথা দিচ্ছি না'।

য্যাকব বলল, 'না সার, মাল না-দেখে কেন তা বলবেন'?

বাগচী মনে-মনে হেসে ফেলল, গতবারও এ-রকম ধরনের কথা হয়েছিল বোধ হয়। ফেলিসিটার

একখানা এমারেল্ড রঙের শাল না-গছিয়ে ছাড়েনি, যা থেকে কেট একটা সুন্দর গাউন করেছিল।

তার কুঠি তখনও খানিকটা দূরে। বাগচীর মন কেনাকাটা থেকে খানিকটা অন্যদিকে সরল। সামনে খানিকটা দূরে ওসুলিভানকে দেখা গেল। বাগচী ভাবল, সুন্দর অসুন্দরের প্রশ্ন নয়, শুধু চুলের রঙও নয়, আলফ্রেড মিনহাজ, তা সে ডিসিলভা বা ওসুলিভান যা হোক, তাকে দেখামাত্র ইউরোপীয়দের কথা মনে আসে। কিন্তু এটাও ঠিক, ভালো করে দেখতে গেলে, ড্রেগ আর স্কাম শব্দ দুটোও মনে আসে। বয়স কিছুতেই পঁচিশের বেশি নয়, কিন্তু ইতিমধ্যে অনেক গুটিযুক্ত মুখের নাকটির অগ্রভাগ লাল, অনাবৃত বাহুর উপরে অনেক ছিট, ক্ষয়গ্রস্ত হলুদ দাঁত। ইউরোপীয় নয়, এদেশে এখনও এমন কোনো ইউরোপীয়ান আসে না যাকে অন্য ইউরোপীয়ানরা ফেলিসিটারের ভারবাহী হতে দেবে। স্বজাতির মানরক্ষায় হয়তো তাকে চাকরি দিত। বাগচীর মন আবিল করে এই চিন্তা দেখা দিল : হয়তো টাকায় বশীভূত কোনো ন্যানীর প্রতি কোনো ওসুলিভানের লালসার ফল।

কিন্তু তখন ফেলিসিটার বলছে, 'সার, ম্যাডাম অনুমতি করলে তাঁকে তো শাল দেখাবই, আপনাকে এখন একটা প্রস্তাব দিতে চাই। দয়া করে ভেবে দেখুন। এখন তো এটা শহর হয়ে উঠছে ক্রমশ। বেশ কয়েকটি সুরকির পথ হচ্ছে, আপনাকে একটা ফেটনের বিষয়ে চিন্তা করতে বলব কি? মেহগ্নি কাঠ, নিকেলের কাজ, ক্যানভাসের হুড। মরেলগঞ্জের ক্রিস্টমাসের আগেই একটা দিচ্ছি'।

বাগচী হেসে বলল, 'না-না, আমি একজন স্কুল-টিচার মাত্র'।

শিশাওয়াল হেসে বলল, 'এটা কি সমস্যা? মিদনাপুরের হেডমাস্টারসাহেবকে গত মাসে একটা ফেটন এবং একটা খাঁটি ওয়েলার দিয়েছি। এই গ্রামে প্রকৃতপক্ষে এখন মিদনাপুরের চাইতে ভালো পথ তৈরি হচ্ছে। এমনকী সার, একটা ফ্লাই আপাতত নিন। আপনার টাট্টুর মাপে, খুব হালকা, সিমলার রিকশার মতো, দুজনে বসা যায়, দু চাকার, হালকা সেগুন আর নিকেলের একটা ফ্লাই...

বাগচী ফেলিসিটারের কথা সবটুকু শুনতে পায়নি। সে ভাবল, কিংবা সত্য পরিচয় খুঁজে না-পাওয়াতেই ডিসিলভা হবে কিংবা ওসুলিভান—এই সমস্যা। এটা তাহলে বড় বড় শহরের উপান্তে যে মিশ্রজাতের মানুষগুলো কখন নিজেদের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, কখন ইউরেশিয়ান বলে পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করছে, যারা ইংল্যান্ডেরও নয়, ভারতেরও নয়, তাদের শিকড় খুঁজে বেড়ানোর সমস্যা। ও হো, এ তো গাইল্সের চিঠি থেকে নামল যেন। সে বলল, 'তোমার এই ওসুলিভান লোকটি...

শিশাওয়াল হেসে বলল, 'সে গল্প সার। প্রথমে কলকাতার স্কুলে শিক্ষক ছিল, শেষ চাকরি ছিল রেলে। আমার এই চাকরি দিয়ে ভালো করিনি? খেতে পরতে পাচ্ছে, সন্ধ্যায় রম্ টানছে'।

'শিক্ষক ছিল? লেখাপড়া জানে বলো'?

'বিলক্ষণ! ইংরেজি বলে, লেখে। আমার কাছে চাকরি চাইতে এসে কলকাতার কয়েকখানা পত্রিকা দেখিয়েছিল, যাতে ওর লেখা কবিতা ছাপা হয়েছে'।

'তাহলে স্কুলে চাকরি যাওয়ার হেতু'? বাগচী বেশ বিস্মিত হল। 'ক্রিশ্চান ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করত? ছাত্রদের হিন্দু অভিভাবকেরা আপত্তি করেছিল'?

'না সার। হিন্দুদের কুসংস্কারের কথা বললে তত গোল হতো না, মদ আর গোরু না-খেলে মানুষ সভ্য হয় না এ বললেও ক্ষতি ছিল না। রটেছিল যে, ও নাকি বলত ভাইবোনের বিবাহে দোষ নেই। আসলে যিশুকে মানে মাতা মেরীর কুমারীত্বেই সন্দেহ। স্কুল কমিটির হিন্দু ক্রিশ্চান সব সভ্যই ওর বিরুদ্ধে চলে গেছল'।

তারা হেডমাস্টার-কুঠির কাছে এসে পড়েছিল। বাগচী ভাবল, তারাও তো ক্রাইস্টকে ঈশ্বরপুত্র মনে করে না। ন্যায় অনুসারে মেরীর কুমারীত্ব মানে না। এই বেদনার চিন্তা থেকে মুখ তুলে সে কুঠির বাইরের দিকের বারান্দায় দূর প্রান্তে যেখানে ছাদ থেকে অর্কিডগুলো ঝুলছে সেখানে কেটকে দেখতে পেল। ফুলের পরিচর্যায় নাকি অন্যমনস্ক।

ফেলিসিটার বলল, 'সার, আমি গেটের বাইরে দাঁড়াই, ম্যাডাম অনুমতি করলে আমি ভিতরে যেতে পারি'।

গেট পার হয়ে কুঠির বারান্দায় উঠে বাগচী বলল, 'হ্যালো ডারলিং, আমরা এসেছি। ওখানে কী'?

কেট ফিরে দাঁড়াল। তাঁর মুখটা কি বিবর্ণ? মুহূর্তে রক্ত ফেরার চাপেই যেন স্বাভাবিকের চাইতে বেশি লাল হল। সে হেসে বলল, 'একমিনিট আগে বনাতওয়ালা গেল একজন'।

বাগচীও ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'বনাত কিনবে নাকি? সহিসের জন্যে? এদিকে গেটের কাছে দ্যাখো শালওয়ালা'।

কেট বলল, 'নাঃ, কেন কিনব? ভাবছিলাম, রাজা রামমোহন পার্লামেন্টের কাছে সেই যে দরখাস্ত করেছিলেন যাতে ইংল্যান্ডের লোকেরা বেশি সংখ্যায় এদেশে এসে বসবাস করে'।

বাগচী বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু সে-কথা কেন? বনাতওয়ালাকে এড়াতে পারো, শালওয়ালাকে পারবে না। গেট দিয়ে ঢুকছে দ্যাখো'।

সেদিন রবিবারের লাঞ্চের তখন ঘণ্টাদুয়েক দেরি। ফেলিসিটারও ভালো সেলসম্যান। প্রয়োজনের অতিরিক্ত, গ্রামের পক্ষে তো বটেই কলকাতাতেও তেমন সুলভ নয়, এমন পণ্য বিক্রি করতে যে মসৃণ প্রগলভতা দরকার তা ছিলই তার। সে, উপরন্তু, হাসতে জানত, ঠাট্টায় চটত না, ধারে পণ্য দিতে কুণ্ঠিত ছিল না, এবং তখনও—সে অনুগৃহীত এমন ভঙ্গি তার অভ্যস্ত ছিল। সন্দেহ হয়, ব্যবসায় লাভের অতিরিক্ত কিছু সে পেত, হয়তো ভালো লাগার ব্যাপার। কতকটা যেন সমাজ-সংস্কাব, সমাজকে আধুনিক করাই-বা, যেন ওপারের সংস্কৃতিকে এদেশে বহন করে আনা। এখনকার মতো তখনও আধুনিক হতে, সংস্কৃতিবান হতে মানুষের একটা সহজ আগ্রহ তার কারণ হতে পারে।

বসতে-বসতে সে ঘোষণা কবল, সে কয়েক পিস্ কাশ্মীরি শাল দেখাতে এসেছে। তারপর প্রায় একঘণ্টা তার সেলসম্যানশিপে বাগচীর পার্লার সরগরম করে রাখল। একের পর এক শাল বার করে একবার তা বাগচীর হাতে, একবার কেটেব হাতে দিয়ে, তাদের গুণাগুণ, দাম, কীভাবে সেগুলোর কারুকার্য নষ্ট না-করেও ম্যাডামের গাউন করা যেতে পারে তার বর্ণনা দিয়ে, একশো থেকে হাজার টাকা দামের শাল দেখিয়ে, বাগচীকে কতটা কমিশন দেওয়া যায়, সে বাগচীর জন্য কতটা লাভ ছাড়তে রাজি, তা বুঝিয়েও যখন অকৃতকার্য হল, তখন সে রুমাল বার করে কপাল ঠোকার ভঙ্গিতে ঘাম মুছে, কিন্তু হাসিমুখে, বলল, 'এবার অনুমতি করুন কিছু সার্জ দেখাই। বিশেষ একটা লাল সার্জ'।

কেট বলল, 'সার্জ? না-না, দরকার নেই। তাছাড়া টমিদের রং আদৌ ভালো নয়'। বাগচী হেসে বলল, 'ডারলিং, আমাদের সাহেবকে একটু কফি খাওয়াতে পারো'?

কেট কফি করতে গেল। মিনিটদশেকে কফি নিয়ে ফিরে এল। এই সময়ে বাগচী আর-একবার ওসুলিভানের কথা ভাবল। নিজের ভারতীয় মায়ের উপরে ঘৃণা ও অবিশ্বাস থেকেই সে কি মাতা মেরীকে কলঙ্কযুক্তা মনে করে? কিংবা তা কি একরকম বাস্তববোধ? চিন্তাটা মনকে স্বস্তি দেয় না। কিন্তু ফেলিসিটার তাকে সাহায্য করল। পানীয়র কথা থেকেই যেন তার মনে পড়েছে এমনভাবে সে বলল, বাগচীকে সে কিছু পোর্ট ও শ্যাম্পেনও দিতে পারে। মরেলগঞ্জের জন্য ও দেওয়ানজির জন্য যা এনেছিল তার বাড়তি কিছু আছে। তাই-বা কেন? সে তো মাসখানেক বাদে ফিরে আসবেই, ক্রিস্টমাসের আগেই, তখন বাগচীর পছন্দমতো ওয়াইন এনে দিতে পারে।

বাগচী বলল, 'একমাস পরেই আবার? এত তাড়াতাড়ি'?

ফেলিসিটার এক জায়গার গল্প অন্য জায়গায় নেয়। সে বলল, 'মরেলগঞ্জের ওরা ক্রিস্টমাসের আগে আগে এক গ্রোস মদ চেয়েছে। অর্ধেকটাই হুইস্কি, বাকিটা ব্রান্ডি, শ্যাম্পেন আর পোর্ট'।

'ক্রিস্টমাসে? এক গ্রোস'? বাগচী হাসল।

ফেলিসিটার গলা নিচু করে এক চোখ বন্ধ করে বলল, 'ক্রিস্টমাসের উৎসবেই। ক্রিস্টমাসের গাছের

জন্য ছোট্ট-ছোট্ট রঙিন ডোমেরও অর্ডার পেয়েছি। অনেকে আসবেন। আসলে কিন্তু, যে রকম শুনি, এক কমিশন, নাকি ইন্ডিগোর'।

কিন্তু তখন কেট কফি নিয়ে আসায় ফেলিসিটার ধন্যবাদ দেবার তাগাদায় মরেলগঞ্জের সেই বিশেষ উৎসবের গল্প ভুলে গেল।

কফির পরে পাত্রগুলো সরানো হলে সার্জ বার করল ফেলিসিটার। মুখবন্ধে সে বলল, দুটোইমাত্র দেখাবে। বটল গ্রীন একটা আছে। থানের অনেকটা রাজকুমারের ওস্তাগর নিয়েছে রাজকুমারের আচকান করতে। বাকিটায় একটা ভালো জ্যাকেট অবশ্যই হতে পারে। কিন্তু যেটা সে মেমসাহেবের জন্য বিশেষ করে মনে আনছে তা লাল সার্জটা। কখনই টমি-ইউনিফর্মের লাল নয়। বলতে কী এ-থানটার আধখানা দিনদশেক আগে জঙ্গিলাটের সিস্টার-ইন-লকে বিক্রি করেছে। বলতে-বলতে সে সার্জটাকে বার করে হাতের খেলা দেখানোর কায়দায় ঝাঁকি দিয়ে কয়েক ভাঁজ খুলে মেলে ধরল।

যদিও প্রমাণ ছিল না, ফেলিসিটারের কথায় ছাড়া, যে কাপড়টার আধখানা জঙ্গিলাটের বাংলোয় বিক্রি করেছে, কিন্তু কেট ও বাগচী দুজনেই কাপড়টাকে হাতে নিয়ে দেখল। বুনোটটা মিহি, স্পর্শটা কোমল। রঙটা নিয়ে একটু কথা হল। টমিদের লাল থেকে কতটা পৃথক তা স্মৃতি থেকে ঠিক করা শক্ত হচ্ছিল কেটের পক্ষে। তখন ফেলিসিটার হেসে বলল, 'ম্যাডাম এই সার্জ টমিদের গায়ে দিতে হলে মহারানীর ভারতরাজ্য বিক্রি করতে হবে'।

কেট বলল তা সত্ত্বেও, 'এটা অত্যন্ত দামি কাপড়'।

দামের কথায় বাগচীর মুখের হাসিটা কমে গেল। তা দেখে কেট বলল, 'আমার তো ভালো গাউন রয়েছেও অনেক'।

তখন বাগচী বলল হেসে, 'ফেলিসিটারের পরিশ্রমটাও ভাবো ডারলিং, একঘণ্টা গল্প শুনিয়েছে'।

কেট রাজি হয়েছিল। কাপড়টা নিশ্চয়ই ভালো। তাছাড়া বাগচীর চোখে তার আগ্রহ প্রমাণ হচ্ছিল। সুতরাং ফেলিসিটার তার সেলসম্যানশিপ সার্থক করে বিদায় নিল'।

কেট বলল, 'খাবারগুলোকে বাষ্পে বসিয়ে এলাম। পনেরো মিনিটে সব গরম হবে'। তখনও ঘরটায় ফেলিসিটারের অদৃশ্য উপস্থিতি বিরাজ করছে। তা অনুভব করেই যেন বাগচী বলল, 'আ, ডারলিং, তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি, মিদনাপুরের হেডমাস্টার একটি ফিটন কিনেছেন'।

আচমকা সংবাদটা শুনে তার গুরুত্ব কোথায় তা খুঁজতে কেট কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। সংবাদটা এমনভাবে বলা যেন অন্ধকারে এই চাঁদ উঠল। কেট হেসে ফেলল। কিন্তু বলল, 'সেই হেডমাস্টারকে আমরা চিনি না, তবে কেন ঠাট্টা করছ'?

'ঠাট্টা! একে তাই বলে বুঝি? ফেলিসিটার অন্তত একটা ফ্লাই কিনতে বলেছে আমাদের, টাট্টুটাই টানতে পারবে, সিমলার রিকশার মতোই—হালকা, সুন্দর—সেও কি ঠাট্টা'?

কেট বলল, 'তাহলে আর কথা কী'!

'এবার তুমি ঠাট্টা করলে। দ্যাখো, রাজবাড়ির হাতা থেকে ফরাসডাঙা পর্যন্ত একটা মেটাল্ড রোড হচ্ছে। আর তাহলে তা থেকেও আরো ছোট-ছোট তেমন রাস্তা বার হবে'।

কেট হাসতে-হাসতে বলল, 'পথের জন্য ফিটন না-হয়ে ফিটনের জন্যই না-হয় পথ হবে, এবার বলো কোথায় যাবে। পিয়েত্রার কুঠিতে লাঞ্চ নাকি'?

বাগচী বলল, 'আরে তা কেন? ফাদার রলের মিশন হাউসটার কথা ভুলে গেলে? সেখানে যেতে তোমার নিদেন একটা ফ্লাই লাগবে না'?

কেটের মুখে হাসির পাশে ছায়া পড়ল যেন। সে বলল, 'কিন্তু তুমি সে-বিষয়ে কিছু ভেবেছ ফাদার বাগচী'?

বাগচী বলল, 'আমি কেন ভাবতে গেলাম? টাকাটা তো আমার নয়, মিশন হাউস বানানোর খরচ

দেবে তাদের লন্ডন সোসাইটি। মরেলগঞ্জের ওদেবও উৎসাহ আছে। কীবল চাইছে রাজবাড়ির আনুকূল্য থাকে তা যেন আমি দেখি'।

কেট উঠে দাঁড়াল। বলল, 'চলো দেখি, খাবার এতক্ষণে গরম হয়েছে। কিন্তু ফাদার রলে তো ক্যাথলিক'।

বাগচী কেটকে অনুসরণ করতে উঠল। বলল, 'ওহ্ তুমি তাই ভাবছ? সে তো প্রটেস্ট্যান্টরাও। তারাও আমাদের ক্রিশ্চান মনে করে না। ক্যাথলিকরাই-বা তা কেন করবে'?

বাগচী কেটের মুখ দেখতে পেল না, কিন্তু তার এই ভুল ধরিয়ে দিয়ে বেশ খানিকটা হেসে নিল।

লাঞ্চে একসময়ে কেট বলল, 'বারেবারে চাইছ, কেন, কিছু বলবে'?

'ভাবছিলাম'।

'কী? গাউনটার কথা বুঝি? সত্যি, কী হবে তেমন দামি পোশাকে?

বাগচী বলল, 'কেন? আমরা কি কলকাতা যেতে পারি না, সামনে ক্রিস্টমাস? এবার রাজকুমারের সঙ্গে সে সময়ে কলকাতা যাওয়ার প্রস্তাব আসতে পারে। আমরা যেতেও পারি'।

কেট বলল, 'কিন্তু সেখানকার উৎসবে...

'তুমি বলবে আমরা যিশাসকে ঈশ্বরপুত্র বলি না, মানবপুত্র বলি। কিন্তু তাঁকে সর্বোত্তম মানুষের একজন মনে করি, সেটাই আমাদের আনন্দের কারণ হতে পারে'।

কেট ভাবল : মানুষটি এই রকমই। কিছুতেই যেন বুঝবে না উৎসব একা হয় না। সমমতের দশজনকে লাগে। সেখানেও তো আমরা একাই। উৎসব বলতে যা, তা পাশ দিয়ে বয়ে যাবে। কিন্তু তার ইচ্ছা হল বাগচীর মন অন্যদিকে নিয়ে যায়। সে বলল, 'আচ্ছা ডারলিং, রাজকুমার কেন এ উৎসবে কলকাতা যাবেন'?

বাগচী একটু ভেবে হাসিমুখেই বলল, 'ধর্ম নয় বলছ? না, ধর্ম নয়। রাজনীতি বলবে? তা হতে পারে, দেওয়ানজি যখন উদ্যোগী'।

কেট বলল, 'একটু বুঝিয়ে বলো সেটা কী রকম রাজনীতি হতে পারে'?

লাঞ্চের গল্প খানিকটা হালকাভাবেই হয়। কিন্তু রাজকুমারের ব্যাপার বলেই যেন কিছু গম্ভীরও হতে হয়। বাগচী বলল, 'আমি ঠিক বুঝি না, কিন্তু দেওয়ানজির পদক্ষেপগুলোকে সাধারণ মনে হয় না। আচ্ছা, তোমার সেই নিয়মিত টাইমস পড়া আর সেই সুবাদে বলা দেওয়ানজির 'মোকাবিলা' কথাটা মনে আছে? তাছাড়া, কেট, ভেবে দ্যাখো, লন্ডনের ক্রিস্টমাসে গ্রামীণ লর্ডরাও এসে থাকেন'।

কেটও একটু ভেবে বলল, 'তারা কিন্তু লর্ড-সভার সদস্য, সে দেশের রাজ্যশাসনের সঙ্গে যুক্ত'।

বাগচী ভেবে-ভেবে বলল, 'অন্নদাতা সম্বন্ধে এ রকম আলোচনা করা উচিত হয় না। আমার কিন্তু মনে হয়, এসব ব্যাপারে রানীমার, রাজকুমারের এবং দেওয়ানজির ধারণা শেষ পর্যন্ত এক নয়। যেজন্য গতবার রাজকুমার কলকাতায় না-গিয়ে পশ্চিমে চলে গেলেন। দেওয়ানজি একাই ছিলেন কলকাতায়। ওদিকে বুজরুকের একটা ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত দেওয়ানজির মতই প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু তারপরই কোনো বিষয়ে রানীমা আর দেওয়ানজির মতের পার্থক্য এমন প্রবল যে, রানীমা দেওয়ানজির ক্ষমতা কিছু খর্ব করেছেন। অবশ্যই এসব আমরা দ্বিতীয়বার আলোচনা করব না। আপাতত রাজপুরুষদের সঙ্গে সখ্যস্থাপন, আর-একটু এগিয়ে, রাজকুমারের রাজোপাধি পাওয়াতে যাতে প্রতিবন্ধক না আসে—এ-রকম কোনো উদ্দেশ্য হতে পারে'।

কেট বলল, 'আচ্ছা, বাগচী, রাজকুমারের এখন বোধ হয় সাবালকত্ব হয়েছে। তাঁকে কখনও কখনও বিশেষ বিষণ্ণ দেখায়। এমন কি মনে হয় তোমার, তা রাজোপাধি পেতে দেরি হওয়ার জন্য হতে পারে'?

তখন তো লাঞ্চ। ভালো রান্না অনেকসময়েই মনকে সেদিকে নিয়ে যায়।

বাগচী তখন লাঞ্চের পরে বসবার ঘরে। পোশাক খোলা হয়নি, পায়ে জুতোর বদলে স্লিপার। হাতে

আরামদায়ক পাইপ। একবার যেন অসংলগ্নভাবে তার মনে ওসুলিভান দেখা দিল। তেমনি অসংলগ্নভাবে সে অনুভব করল, কেট কিন্তু খুবই সাহসী। কিন্তু রান্নাঘরের কাজ শেষ করে কেট এল। হেসে-হেসে বলল, 'পোশাক খুললে না, এখনই রোগী দেখতে যাচ্ছ নাকি'?

বাগচী বলল, 'কে বলেছে? আজ আমার ছুটি নয়'?

কেট গোপনে হেসে বলল, 'তাহলে কী ভাবছ এমন'?

'আমাদের গ্রামে শুধু রাস্তা তৈরি হচ্ছে না। রাজবাড়ির সদর-দরজাটা নতুন করে করা হয়েছে। রাজবাড়িতেও নতুন কিছু করা হবে মনে হয়। মাপজোখ হতে দেখেছি। ওদিকে ফরাসডাঙায় নাকি একটা আধুনিক প্রাসাদ হবে'।

কেট ভাবল, এটাই বৈশিষ্ট্য, পরের সুখে সুখী হয়ে ওঠা। তার বাবা এটাকেই বাগচীর সবচাইতে আকর্ষণীয় গুণ বলতেন। প্রশ্রয়ের সুরে সে বলল, 'ও মা! কেন'?

বাগচী বলল, 'সম্ভবত রানীমা থাকবেন'।

'কেন'?

'তোমার নিশ্চয়ই জানা আছে কেট, রাজরাজড়ার ঘরে নতুন রানী এলে পুরাতন রানী ভিন্ন প্রাসাদে চলে যান'।

'তার মানে'? কেট দু'এক মুহূর্ত সংবাদটা মনে-মনে ওজন করল। বলল, ও, আচ্ছা, তাহলে ঠিকই ধরেছি'।

'কী ধরেছ'? কেট বলল, 'ঠকে গেলাম। একটু বুদ্ধি করলে সংবাদটা তো আমিই দিতে পারতাম তোমাকে'।

এবার বাগচীই বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'রাজকুমারের বিবাহের কথা আগেই শুনেছ নাকি কেট'?

'শুনতে হবে কেন? চোখেই তো পড়ছে'।

'চোখে? সে কী! তাহলে বিবাহের অন্যপক্ষকে তুমি—ও আচ্ছা, আচ্ছা'। বাগচী আনন্দে হেসে উঠল'।

'কিন্তু... কেটের ভ্রূ একটু কুঞ্চিত হল, 'বয়স একটু বেশি হল না'?

'বয়স? তুমি কার কথা বলছ? নয়নঠাকরুন কি'?

'তাছাড়া আবার কে'? কেট উজ্জ্বল মুখে বলল, 'তা অবশ্যই পুরুষের চোখে ধরা পড়ে না। ববং সেই বাড়তিটা অনেকসময়ে বেশি টানে। পবে, দিন গেলে...

বাগচী বলল, 'দ্যাখো-দ্যাখো, এ ব্যাপারে আমার একটা কথা মনে হচ্ছে। বেশি তো একটু বয়েস? বলব? বলো তো আমাদের পরিচিত জানা-পুরুষদের মধ্যে ভালোবাসাকে সবচাইতে বেশি কে জেনেছে? পারলে না তো! বলব? শেক্‌সপীয়র। ঠিক বলিনি'?

'এখানে শেক্‌সপীয়র কে হচ্ছে'?

'দ্যাখো ডারলিং, শেক্‌সপীয়রের অ্যান্ কিন্তু তাঁর চাইতে বছরদশেকের বড় ছিলেন। জানতে না তো! দ্যাখো'।

আনন্দোজ্জ্বল কেট বলল, 'কী সুন্দর হবে! কী সুন্দর মানায়! আর দুজনেই যে অমৃতসরসীতে ডুবে আছেন'।

৫

কিন্তু আলোর কথা বলতে হলে বলতে হবে, সে তো শুধু লাল আর কমলা নয়। নীলাভ হয়, বিষণ্ণ বাদামি হয়।

সেদিন আবার শনিবার। প্রায় সপ্তাহ ফিরে এল। অকালে বাদল হয়েছে। স্কুল-ফেরত বাগচী ঘরে

বসেছে। বোঝা যাচ্ছে, আজ রাজবাড়িতে যাবে না। ইতিমধ্যে ঢিলে নাইট-গাউন পরে সে তার পড়বার ঘরে। আলো জ্বলছে সেজে। বিশেষ কোমল আলো। কফি নিয়ে কেট সেই ঘরেই বসেছিল। দুজনের সংসারে বারবার দেখা হয়, বারবার গল্পও হয়। টিপয়টার উপরে সেজ, তার উপরে কফির ছোট্ট ট্রে-টা রাখা। সেজের গোড়ায় বাগচীর পাইপ পাউচ। পাইপের খানিকটা অ্যাম্বার, পাউচটা বাদামি। পাশের বইটার মলাট লাল। তাতে রূপালি রঙও। রূপালি অক্ষরে লেখা 'ইন ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট'। কেট বইটাকে ভালোভাবেই চেনে। কেম্পিসের লেখা। বাগচী কতবার পড়েছে ঠিক নেই। সে নিজেও অন্তত বারদুয়েক। রঙের কথাই যদি, বাগচীর সেই ছোট স্টাডি নামক ঘরে তার মুখোমুখি দেয়ালে এদেশের হাতে তৈরি কাগজে এদেশের এক চিত্রকরের আঁকা, এদেশের গেকয়া মাটির রঙে আঁকা ছবিটার কথা বলতে হয়। কীবল দেখে বলেছিল—খুব সরল করে আঁকা, এদেশের নমাজের ছবি নাকি? কেট বলতে বাধ্য হয়েছিল—প্রার্থনারত ক্রাইস্ট। কীবল কিন্তু এসব ব্যাপারে কৌতূহলী। বলেছিল—তাঁকে কি প্রার্থনা করতে হতো? কিন্তু খুব লম্বা করে আঁকা নয়? কেট আবার বলতে বাধ্য হয়েছিল—এটায় না জেনেও চিত্রকর এল গ্রেকো নামে একজনেব স্টাইলে গেছেন।

তা, কফি খেতে খেতে বাগচী তার এবং কেটের মাঝের দু-হাত শূন্যটাকে বারবার দেখছিল। আর কফির সেই অবসরেই ডিসিলভা ওসুলিভান সম্বন্ধে বলেছিল। কেট একেবারেই অবাক হয়েছিল শুনে।

এখন কেট রাতের খাওয়া তৈরিতে ব্যস্ত। সংসাবের কাজে এ-ঘর ও-ঘরও যাওযা আসা কবছে। একটু প্রসাধনও করছে সে আজকাল। সে শোবার ঘবের আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। যেন প্রসাধন কী করবে খুঁজতে লালের ছোঁয়া লাগা নিজের চাঁপা রঙেব মুখটাকে, আব হাত ও বাহুকে দেখল। জ্যাকেটের হুক খুলে গলার নিচে ক্যামিসোলেব উপবে দুধসাদা 'ভি' টাকে দেখল। একটু সরে এসে দরজা দিয়ে যেমন সম্ভব শ্যামল বঙের বাগচীকে দেখল দু-একবাব।

একটু চঞ্চল হয়ে সে বাইরে এল, যেন বাগচীর রংটাকে ভালো কবে দেখতে। সে দেখল বাগচী পড়ছে, লাল রঙে প্রমাণ তা সেই ক্রাইস্টের অনুসরণ ; বসার ভঙ্গিটা নমাজের কিন্তু। দু হাঁটু একত্র, গোড়ালির উপরে বসা। আচ্ছা! ঘন কালো চুলগুলো তো বেশ বড হয়েছে। বাবরির মতো দুপাশে নেমেছে কান ঢেকে। না, পড়া নয় তো। মুখটা দ্যাখো ক্রাইস্টের ছবির দিকেই। একেবারে অবাক হয়ে গেল কেট ; বাগচীর দু-চোখের কোণ বেয়ে জল নেমেছে।

কিন্তু সেই শনিবারের সন্ধ্যার আগে তার দুপুব আর বিকেলেব কথা বলা চাই। আর তাতে একরকমের সুবিধাও আছে।

এখানে ইতিহাসের উপাদানগুলো অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। না-আছে রাজকাহিনী, না-আছে পাথরে বা তামাব পাতে লেখা সন-তারিখের সাক্ষ্য। অন্যদিকে নিয়োগীর মতো যারা, তারা যা-কিছু করে, ভাবে, বলে, লিখে রাখে, পত্রিকায় ছাপায় ; যেখানে তা সম্ভব নয় সেখানে তাদের ডায়েরিগুলো সরব। ফলে ইতিহাসের কথা বলামাত্র সেই সব বিবর্ণ পত্রপত্রিকাই সত্যেব সাক্ষী হয়। মনে হতে থাকে পত্রপত্রিকা অনুসারে গোটা দেশটা ওঠাবসা করত।

সে যাই হোক, সর্বরঞ্জনকুসুমপ্রসাদ একদিন নিজেকে মার্টাররূপে দেখতে পেল। সে অবশ্য তাব ডায়েরিতে এই বিদেশাগত শব্দটাকে উল্লেখ করেনি।

সে বুঝতে পেরেছে, সুরেন ও নরেশ কলকাতার মানুষ হওয়ায় নতুন ধর্মমত সম্বন্ধে আগ্রহী বটে, কিন্তু থিয়েটারেও আগ্রহী কম নয়। চরণ দাস জনান্তিকে বলেছে থিয়েটার শেষ হওয়ার পরে সে আবার নিয়মিত বাইবেল পড়বে, কিন্তু অভিনয় না-করলেও বন্ধুদের এই ব্যাপাবে প্রম্প্ট তাকে করতেই হবে। দ্বিতীয়ত, সে বুঝতে পেরেছে এখানকার যে-শিক্ষাব্যবস্থা হেডমাস্টারমশাই প্রবর্তন করছেন তা হবে

অনিবার্যভাবে কলকাতার থেকে পৃথক। এক সপ্তাহের মধ্যে মৌখিক পরীক্ষার আদর্শ প্রশ্নপত্র হেডমাস্টারমশায়ের হাতে পৌঁছে দিতে হবে।

তৃতীয়ত, রাজবাড়ির ব্যবস্থাপনায় শুধু যে ফরাসডাঙার শিবমন্দির ক্রমশ উলঙ্গ হয়ে আকাশকে স্পর্শ করতে চলেছে তাই নয়, রানীমার জন্মোৎসবও এসে গেল, যার কেন্দ্রে কালীপূজা, যার আয়োজন, আবহাওয়ার মতো নিজের গৃহকোণে বসেও অনুভব করো। এমনকী তার সাধ্বী স্ত্রী বলছিলেন, আমাদেরও তো নিমন্ত্রণ থাকে, ছেলেমেয়েরা তো এখন নাবালক, আলো বাজি এসব দেখলে অথবা মিষ্টান্ন খেলে দোষ কী? সে তো প্রসাদ নয় শুনেছি।

অন্যদিকে কাল বিকেলে তাকে অবাক করে সুদৃশ্য এক প্রস্থ আসবাব তার বাসায় পাঠানো হয়েছে। হেডমাস্টারমশায়ের সঙ্গে আলাপে আসবাবের কথা উঠেছিল বটে। একজন শিক্ষকের সুবিধার কথা মনে রাখা হয়েছে। চারিদিকের ঘোর কালোর মধ্যে এগুলি ঈশ্বরের কৃপালোক বলে অনুভূত হয়।

এরই ফলে সর্বরঞ্জনপ্রসাদের মনে একইকালে বেশ কিছু হতাশা এবং অল্প পরিমাণে উৎসাহ। সেই সকালেই সে অনুভব করল তার এই পঁয়ত্রিশ বেড়ে-বেড়ে পঁয়ষট্টিতে পৌঁছালেও তাকে হয়তো এই গ্রামে অল্প পরিমাণ উৎসাহ এবং সমধিক হতাশা নিয়ে চলতে হবে। না-না, এটা অনিবার্যই। কেননা যারা বি. এ. পাশ করেই হাকিম হতে পেরেছে তাদের মতো সৌভাগ্যবান সে নয়। ডেপুটি হওয়ার দিন গতপ্রায়। এমনকী বি.এ. পাশ করার পর সিম্পসন-স্যামসন অ্যাটর্নি কোম্পানিতে যে আর্টিকেল্ড্ ক্লার্ক হওয়ার কল্পনা ছিল তাও অবাস্তব। কেননা ততদিনে তার সংসার কে চালায়? এই অবস্থায় ভাদুড়ীমশায় যখন এই চাকরি করে দিলেন তখন এটাকেই ঈশ্বরনির্দিষ্ট বলে মানতে হবে এ-রকম সম্ভাবনার কথা হেডমাস্টারমশায় বলেছেন। যাত্রার সময়ে সমাজবৃদ্ধরা সকলেই উচ্চকণ্ঠে তাকে আশীর্বাদ করেছে। সকলেই একবাক্যে বলেছিল : ইহাকে ঈশ্বরপ্রেরিত জ্ঞান করবে। মনে করো তোমার বদলে যদি পৌত্তলিক কারো এই চাকরি হতো? সে কি দেশের ওই অংশকে আরো অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে সহায়তা করত না? এখন তোমার আলোকে কত ছাত্রই-না আলো জ্বালে!

কিন্তু প্রদীপের এই এক অনিবার্যতা—আলোর কেন্দ্রেই দাহ থাকে।

সুতরাং তার মনে দাহ ছিল। আপাতত তা সুরেন নরেশ প্রভৃতির নাটকপ্রিয়তা, যার অন্য নাম তার চিন্তার পরাজয়, তাকে অবলম্বন করে তীব্র। এই অবস্থায় শনিবার সকালে স্কুলের জন্য পথে বেরিয়ে তার যেন অসংলগ্নভাবে মনে হল, সেন্ট বার্থলোমিউ-এর ওরা জীবন্তে গায়ের চামড়া তুলে নিয়েছিল, সেন্ট ফ্রান্সিসকে ওরা পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল। হে প্রভু, সুতরাং আমাকে দগ্ধ করো, কে না জানে খাদ পাননা-পুড়লে সোনা উজ্জ্বল হয় না, না-পুড়লে আলো হয় না।

এসব চিন্তার ফলে তার মুখমণ্ডলে প্রশান্ত শান্তি, চোখে নিজের পরিবেশকে লক্ষ্য করার স্থির দৃষ্টি, কিন্তু অন্তরে আলোক বিকিরণ করার আগ্রহ, যাকে জ্বালার থেকে এককালে পৃথক করা যায় না। এইসময়ে পথের উপরে শ্বেতশুভ্র আলোর মতো কিছু-একটা সে দেখতে পেল। সে ভাবল : এই আলোক, আশ্চর্য এই আলোক! এমনকী সে যখন আরো এগিয়ে গিয়ে এই আলোকের কথা ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করার কথা ভাবছে সে দেখতে পেল সেটার উৎস একটা সাদা রঙের ছাতা। ছাতা যখন তার নিচে শিরোমণিমশায় অবশ্যই আছেন। রাজবাড়ি থেকে প্রতি বৎসরের শেষে জলপূর্ণ তাম্রকলস ও এই ছত্র পেয়ে থাকেন। সর্বরঞ্জন মুখ লুকিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল, তাড়াতাড়ি স্কুলের দিকে চলতে শুরু করল। এই শিরোমণি পদাধিকার-বলে তার অধস্তন, কিন্তু যেমন ঠিক তিনদিন আগে, ঠিক তিনদিন, বলেছিল—আলো জ্বালতে ব্রহ্মোর যে এত বেকুবি, কেবল পোড়াচ্ছে আর দাহ করছে আপনাদের। ঠিক জানেন তো, সে ব্রহ্ম কিংবা খ্রেস্ট? তখনই ঠিক করেছিল সর্বরঞ্জন, সম্ভবপক্ষে শিরোমণির সঙ্গে ধর্ম সম্বন্ধে কথা বলবে না আর, যদিও শিরোমণির উপস্থিতিই যেন অবিরত তাকে তর্কে আহ্বান করে।

কিন্তু সর্বরঞ্জনপ্রসাদকে পথের পাশে ঝটিতে সরে দাঁড়াতে হল। তিনটি ঘোড়া তীরের ফলার মতো

বেগে আসছে ; পুরোবর্তীটির একটু পিছনে রাস্তার দুপাশে দুটি। পুরোবর্তী সওয়ার নিতান্ত তরুণ, তার পোশাক ইউরোপীয়—রাইডিং কোট ও ব্রিচেস, মাথায় বারান্দা-টুপি, হাতে সুদৃশ্য ডাঁটযুক্ত চাবুক। রাজকুমার কি? শ্যামল দেখাল না অনেকটা? পিছনে সওয়ার দুটিকে চেনা মনে হল। লাটসাহেবের সওয়ারদের পোশাকই যেন, পাগড়ির রঙে তফাত। তাদের দুজনের হাতে রূপার বল্লম। পাগড়ি দ্যাখো, গাঢ় নীলে রূপালি জরি। এমন একটা ব্যাপার যা ধ্যান ভাঙিয়ে দেয়। এত তাড়াতাড়ি গেল, বোঝা গেল না রাজকুমার কিনা।

সে অবশ্যই মুকুন্দ যে রানীমার কাছে দরবার শেষ কবে কায়েতবাড়িতে তার মায়ের কাছে চলেছে। এই ছোট্ট রিশালাটা চলেছে অবশ্যই তার সম্মান রাখতে। রাজবাড়ির ছাদ আর ঝুল-বারান্দা থেকে সদরের গেট পর্যন্ত যারা সেটিকে যেতে দেখল তারা ভাবল এই কুমার অবশ্যই অসাধারণ সম্মানের পাত্র, যদিও সে কায়েত।

তার এইদিন পড়ানোর কাজের চাইতে অফিসের কাজ বেশি। প্রয়োজন হলে সে সুতরাং কাজকে খানিকটা পিছিয়ে রেখে চিন্তার অবসর করে নিতে পারে। সে কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে কাজ করল ; আর তা করতে-করতে একবার চরণ, আর-একবার শিরোমণিকে দেখতে পেল। এই সময়ে তার মন এ রকম বলল : ঈশ্বরের সৈনিক, অগ্রসর হও। সে অনুপ্রেরণার জন্য মনকে আঘাত করতে লাগল।

উৎসবই উৎসবের সমকক্ষ। না, না। সে স্থির করল তাকে একটা উৎসব করতেই হবে। যা হবে প্রকৃত উৎসব ; যেখানে বেদী থেকে পরম করুণাময় একমাত্র সেই নিরাকার ঈশ্বরের প্রার্থনা হবে। তার মনে পড়ে গেল তার শেষ সন্তানের নামকরণ-উৎসব হয়নি। আর-একটি শিশুকে সত্যধর্মে অভিষিক্ত করার চাইতে উৎসবের কী এমন ভালো সুযোগ হতে পারে? এবং এটাও দেখতে হবে যে সেই উৎসব শক্তির উৎসে যুক্ত হয়। ভাবো সেই রিশালার কথা! দেওয়ানজির সহায়তায় কি রাজকুমারও একদা সত্যধর্মে উৎসাহিত হন না?

সুতরাং সর্বরঞ্জন স্থির করল : আজই, এখনই, স্কুল থেকেই সে দেওয়ানজির সঙ্গে দেখা করতে যাবে। না-না, তাকে যেতেই হবে। প্রথমত আসবাবগুলির জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া যেতে পারে ; দ্বিতীয়ত, সে ভাদুড়ীমশায়ের চিঠি পেয়েছে গত সপ্তাহে তা জানানো যেতে পারে। ভাদুড়ীমশায় তার মুরুব্বি, তেমনি দেওয়ানজিরও বন্ধু ; তাছাড়া থিয়েটার বলো, রাজবাড়ির উৎসব বলো, তিনি তো সর্বেসর্বা। আর ধর্ম ছাড়া তার উপায়ই-বা কী? সে তো হাকিমও নয়, এমনকী আর্টিকেল্‌ড ক্লার্কও নয়।

দেওয়ান-কুঠিতে যখন সে পৌঁছাল, হরদয়াল তার লাইব্রেরিতে। নিয়োগীর বেশ একটু অস্বস্তি বোধ হল। একটি গৃহ যে এমন নিঃশব্দ হতে পারে তা তার অভিজ্ঞতায় ছিল না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কুঠির ভিতরের কোনো দেয়ালঘড়ির মৃদু টিকটিক সে শুনতে পেল। কী করে সে খবর দেবে যে সে দেখা করতে এসেছে। অবশেষে একজন ভৃত্য বেরিয়ে এসে তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে লাইব্রেরিতে বসাল। তার জুতোজোড়া যে একরকমের কিম্ভূত ফাঁপা, শব্দ করে শান্তির বিঘ্ন ঘটায় তা সে জানত না।

ভৃত্য তাকে যে চেয়ারটায় বসিয়েছিল সেখানে বসে লাইব্রেরি ঘরের এই ঠাসা সেল্‌ফগুলি, এখানে-ওখানে ছড়ানো গাঢ় কালো রঙের সুদৃশ্য চেয়ারগুলো, ঘরের প্রায় কেন্দ্রে সুদৃশ্যতর সোফাসেট প্রভৃতি লক্ষ্য করতে-করতে তার আর-একবার মনে হল, এভাবে আসা তার পক্ষে ভালো হয়নি। দু'এক মুহূর্তে আলোটা চোখে ঠিক হলে সে যেন একটা সেল্‌ফের আড়ালে হরদয়ালকে খানিকটা দেখতে পেল। আরো ভালো করে দেখতে গিয়ে সে লক্ষ্য করল, সোফার সামনে টিপয়ের উপরে একটা চাঁপা রঙের তরলপূর্ণ বোতল, তার পাশে বড় করবী ফুলের মতো কিন্তু লম্বা বৃন্তের উপরে একটা গ্লাস। সেই বোতল ও গ্লাসের পাশে একখানা বই যার ভিতরে একটা সুদৃশ্য রূপার পেজকাটার। সে একটা মৃদু গোলাপি গন্ধ পাচ্ছে। তা কি ধূপের, অথবা মদের?

দু'এক মুহূর্তে হরদয়াল সেল্‌ফের পাশ থেকে বেরিয়ে সোফার কাছে এগিয়ে বলল, 'এখানে আসুন'।

বসতে-বসতে হরদয়াল হাসল। আর সে-হাসি যেন কোনো রমণীর হতে পারে এমন নরম এবং কুণ্ঠিত। বলল সে, 'একার সংসার, বইগুলো সারা ঘরে ছড়ানো ছিল, তাই তুলছিলাম'।

সর্বরঞ্জন এক কঠিন সমস্যায় পড়ল। সোফায় বসতে-বসতে সে অনুভব করল, তার জিভটা শুকিয়ে উঠছে। এই তো মদ, যা ইতিপূর্বে ছবিতে মাত্র দেখেছে এবং যাকে সে দুশ্চরিত্রা রমণীর মতো কুহকী ও ঘৃণ্য মনে করে। সে কী করে এগুলোর উপর দিয়ে দেওয়ানজির মুখের দিকে চাইবে? সে মনে-মনে ভাবল : উনি হয়তো ক্রিশ্চান সন্তদের মতো, মদের পাশে বইটা অবশ্যই ধর্মগ্রন্থ হবে। সে আড়চোখে বইটার নামটা পড়ল, 'ওরিজিন অব স্পেসিস'। 'চার্লস ডারউইন' নামে একজন লেখক। প্রকাশস্থল লন্ডন, ১৮৫৯।

কিন্তু হরদয়াল বলল, 'আপনার সব কুশল তো? আপনার কথা আমি প্রায়ই ভাবি। সাহিত্যের লোক আপনি। এখানে ছাত্রদের প্রাইমার পড়াতে আপনার অবশ্যই অসুবিধা হচ্ছে'।

সর্বরঞ্জন নিয়োগী বলল, 'পরম করুণাময় ঈশ্বরের যদি তাঁর এই কর্মশালাতেই আমাকে আহ্বান করার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তবে সার, এখানে আনন্দিত হওয়াই আমার কর্তব্য'।

উত্তর দিতে হরদয়ালের একটু দেরি হল। সর্বরঞ্জনের সঙ্গে তার এটা দ্বিতীয়বার আলাপ হচ্ছে। প্রথমটা হয়েছিল এক বৎসর আগে চাকরিতে বহাল করার ইন্টারভিউ-এ। তখন নিয়োগীর ইংরেজিটা ক্রিস্পই বোধ হয়েছিল। সর্বরঞ্জনের এই বিশেষ ধরনের বাংলা তাকে পুরোপুরি স্তম্ভিত করতে পারল না, কেননা কলকাতায় তার বন্ধু ভাদুড়ীমশায়ের চারপাশে এরকম বাংলাই শোনা যায়। সে বলল, 'তবে তো কথাই নেই। আপনার পরিবারের সকলের স্বাস্থ্য ভালো থাকছে তো? যে কারণেই হোক এ অঞ্চলটায় ম্যালেরিয়ার উৎপাতটা কম'।

নিয়োগী আবার বলল, 'এ বিষয়েও তাঁরই মঙ্গলময় বিধান দেখতে পাই'। সে সুন্দর করে হাসল, অবশ্যই তার প্রচুর শ্মশ্রুজালের আবরণের বাইরে তা যতটা প্রকাশ হতে পারে।

হরদয়াল বলল, 'আগে করা যায়নি, এবার আপনাদের কোয়ার্টারগুলোকে বড় করে দেব'।

হরদয়াল তার মুখের দিকে চেয়ে কথা বলছে, কিন্তু তার দৃষ্টিটা বোতলের পাশে-রাখা বইটার উপরেও পড়ল, আর তা যেন সস্নেহ। মদ ঢালতে কখন এক ফোঁটা কী করে মলাটে পড়ে থাকবে। হরদয়াল তা হঠাৎ দেখতে পেয়ে কোঁচার খোঁট তুলে বিন্দুটাকে মুছে নিল।

কিন্তু আলাপটা গতি নিতে পারছে না। হরদয়াল তো শুনতেই প্রস্তুত কিন্তু নিয়োগী অনুভব করল এখানে বাগচীর সঙ্গে সে উপরওয়ালা হলেও, কলকাতার সমাজনেতাদের সঙ্গে, এমনকী সেখানকার ধনী মানুষদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলা যায় এই স্থির মানুষটির সঙ্গে তার এই নিঃশব্দ লাইব্রেরিতে বসে সেভাবে কথা বলা যায় না। তার একবার মনে হল সে শিক্ষক, বই সম্বন্ধে কথা বলতে পারলে সুবিধা হতো। কিন্তু এই যে একখানা বই যা ১৮৫৯ এ প্রকাশিত এবং ইতিমধ্যে এখানে, তার সম্বন্ধে কি কিছুমাত্র বলার সুবিধা হচ্ছে? 'ওরিজিন অব স্পেসিস' বাক্যাংশটার অর্থই-বা কী? লেখক এই চার্লস ডারউইন-বা কে? এ রকম কোনো কবির বা ঔপন্যাসিকের নাম সে কলকাতায় শোনেনি। অথচ এই নিস্তব্ধ লাইব্রেরিতে ঘড়ি টিকটিক শব্দে সময়টা দ্রুত চলে যাচ্ছে, অপব্যয়ই হচ্ছে, এবং সময়টা হরদয়ালের।

সুতরাং নিয়োগী তার মাথাটাকে কয়েকবার উঁচু-নিচু করল। অবশেষে বলল, 'সার, আজ যে আপনার মহামূল্যবান সময়ের খানিকটা এই যে অপব্যয় করতে উদ্যত হয়েছি, এই যে আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিয়ে চলেছি, এসবেরই একটা উদ্দেশ্য আছে'।

'বলুন'।

'এখানে একটি পরম করুণাময় সেই এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরের উপাসনা মন্দির হলে কি ভালো হয় না'?

হরদয়াল বলল, 'উপাসনার ব্যাপার মিস্টার বাগচী সব চাইতে ভালো বোঝেন'।

বাগচী বলল, 'আমি নবতর কোনো সংগঠনের কথা ভাবছিলাম, সার'।

'সেটা কী ব্যাপার হচ্ছে'?

সর্বরঞ্জন ক্রমশ তার চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নিল। বলল, 'বিষয়টা আনন্দজনক নয়, সার, তা আমাকে বলতেই হবে। না-না, তা না-বলে উপায় নেই। কিন্তু ঈশ্বর নিরানন্দের মধ্যেও নিজেকে প্রকাশ করেন, এই তার অভিরুচি। আর এ তো আত্মসমালোচনাও বটে। ব্রাহ্মদের অর্থাৎ যারা পরম ব্রহ্মের উপাসনা করি তাদের কাছে কি কে শুদ্র কে ব্রাহ্মণ এ-বিচার থাকা উচিত? অথচ আমাদের পুরোধা কারো-কারো প্রার্থনাবেদিতে ব্রাহ্মণেতর কাউকে বসতে দিতে আপত্তি, এখন কেউ-কেউ উপবীতকে আঁকড়ে ধরে আছেন। এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ...

খানিকটা বাধা দেয়ার মতো করে হরদয়াল বলল, 'দেবেন্দ্র ঠাকুর মশায় কলকাতার লোক, যদিও নানা অঞ্চলে তাঁদের জমিদারি আছে ; কিন্তু তাঁর বিষয়ে আমাদের এখানে করণীয় কিছু আছে কি? এ অঞ্চলটা তাঁর জমিদারিতে পড়ে না'।

আবেগের প্রাবল্যে নিয়োগীর মাথাটা দুলে উঠল। বলল সে, 'না-না, সার, এ আমাকে বলতেই হবে। এই গ্রামে গোড়া থেকেই সবদিকে বাঁধ দিয়ে অগ্রসর হওয়া কি ভালো নয়? এমন মন্দির হওয়া উচিত যার সংবিধান বলে আচার্য হিসাবে যে-কোনো সম্প্রদায়ের লোকই উপাসনায় নেতৃত্ব দেবে'।

হরদয়ালের মুখে সূক্ষ্ম একটা হাসি দেখা দিল। গতবার কলকাতায় এসব ব্যাপারে সে কিছু-কিছু শুনেছিল বটে। এমনকী তার বন্ধু ভাদুড়ীমশায়ের চারিদিকেও এ বিষয়ে উত্তেজনা ছিল। কৌতূহলের অভাবে তা সে ভুলে গিয়েছিল। এখন মনে পড়ল এই স্ববিরোধে কেশব সেন মশায়ের নামও শোনা যাচ্ছিল। হরদয়াল বলল, 'কিন্তু এখানে তো আপনি মাত্র একা। এখানে কে-আব আপনাব বিরুদ্ধতা করছে? আপনাদের শুনেছি উপনিষদ নিয়ে ব্যাপার। আপনার ব্যাখ্যার সঙ্গে এ অঞ্চলে বিরুদ্ধ মত মাত্র একজনেরই হতে পারে। তিনি শিরোমণি। তাঁকে ধর্তব্যের মধ্যে আনছি না, কারণ তিনি নিজে যেচে অনধিকারীকে উপনিষদ সম্বন্ধে কিছু বলেন না'।

'না। না, সার, একথা আমাকে আবার করে বলতে হবে, সার। মন্দির হওয়ার আগে থেকেই আমরা প্রার্থনাসভা করতে পারি, আর সে-প্রার্থনাসভায় আপনাকেই প্রধান ও পরম পূজনীয় আচার্যরূপে পেতে ইচ্ছা করি। আর একাই-বা কেন? আমার পরিবারে সাতজন তো রয়েছি'।

হরদয়ালের হাসি পেল। সর্বরঞ্জনের পরিবারের সাতজনে দু-তিন বছরের শিশু গুটিদুয়েক। কিন্তু বাড়িতে যে দেখা করতে এসেছে তাকে পরিহাস করা যায় না। সে বরং আবার শান্ত দৃষ্টিতে সর্বরঞ্জনের দিকে চাইল। এত বিস্তৃত সে-দৃষ্টি যে নিয়োগী লক্ষ্য করতে পারল সেই চোখের প্রান্তগুলি বেশ লাল।

হরদয়াল বলল, 'এটা এমন সময় যে কী দিয়ে আপনার পরিচর্যা হয় বুঝি না। তাছাড়া আমাব তো চাকর-বাবুর্চির সংসার। আপনাকে কি কিছু পানীয় অফার করতে পারি? কী পছন্দ করেন? এটা বার্গান্ডিই, যদিও রঙটা গাঢ়'।

এই বলে সে বোতলের দিকে হাত বাড়াল।

সর্বরঞ্জন জীবনে এমন বিপন্ন হয়েছে কিনা সন্দেহ। যা উপস্থাপিত হলে ডানকান সাগ্রহে অগ্রসর হয়, পিয়েত্রো যার অনুপস্থিতি অসম্মানজনক মনে করত, এমনকী বাগচী যার কথায় হয়তো হেসে বলত লুব্ধ হচ্ছি, সন্ধ্যায় আসব ; সর্বরঞ্জনকে তা একেবারে নির্বাক করে দিল। সে কি উঠে দাঁড়িয়ে স্থান ত্যাগ করতে পারে? সে কি মদ্য সম্বন্ধে তার ঘৃণা প্রকাশ করতে পারে এই মানুষটির সম্মুখে?

কিন্তু মুহূর্তটি নির্বিঘ্নে পার হল। এমন হয় যে কোনো বিষয় কোনো বিশেষ অঞ্চলের অনেক মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করে। হরদয়ালের চিন্তাকে আজ সকাল থেকেই গৌরীদের নাট্যাভিনয় ব্যস্ত রেখেছিল। সে বলল, 'মিস্টার নিয়োগী, বাগচীমশায় আপনার সাহিত্যজ্ঞানের বিশেষ প্রশংসা করে থাকেন। আপনি কিন্তু গ্রামের যুবকদের বিশেষ এক উপকার করতে পারেন'।

অন্য আলাপে যেতে পেরে যেন নিঃশ্বাস নিতে পারল নিয়োগী। সে সাগ্রহে বলল, 'কীভাবে, সার? সাধ্য হলে নিশ্চয়ই করব'।

হরদয়াল বলল, 'গ্রামের যুবকদের একাংশ হঠাৎ অভিনয় করতে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু ভালো নাটক কই? 'বুড়ো শালিখ' আর 'একেই কি বলে' এবার করতে চাইছে। আমার কাছে ভালো লাগেনি'।

সর্বরঞ্জন ক্রমশ অনুভব করল সে না-চাইতে সমস্যাটার কথা উঠে পড়ল। এটায় কি সে আশ্চর্য হবে? কিংবা দ্যাখো, সৎপ্রয়াস কীভাবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করে। দ্যাখো, এবার দেওয়ানজির মতের সঙ্গে তার মত মিলছে। সে ইতিমধ্যে চরণ দাসদের আড্ডায় একবার অন্তত রিহার্শালে গিয়ে পড়েছিল, ফলে নাটক যে কত কুৎসিত সে বিষয়ে তার সংশয় ছিল না। সুতরাং সে একটু সাহস করে বলল, 'ভালোলাগার কথাও নয়, সার। যদি অনুমতি দেন, বলব তা জঘন্য। আমার তো মনে হয় রাজবাড়ির কোথাও এরকম নাটকের অভিনয় হওয়া উচিত হয় না'।

হরদয়াল ভাবল সেটা খুব বড় সমস্যা নয়, রানীমা আদৌ নাটক দেখতে আসবেন না। রাজকুমার যদি আসেও নাটকে যেসব পুরুষের কথা বলা হয়েছে তারা এত নিম্নবিত্ত শ্রেণীর যে তাদের সস্তা দুশ্চরিত্রতাকে তার কাছে ভাঁড়ের ভাঁড়ামি মনে হবে। সে বলল, 'আপনি কি শেকস্‌পীয়রের দু-একটা কমেডি অনুবাদ করে দিতে পারেন? কী হবে বলছেন? মানুষ নাটক করতে চায়, কিন্তু ভালো নাটকই নেই'।

'হয়তো তা করা যায়, কিন্তু . . .

'আমি তাও ভেবেছি। সেকস্‌পীয়বের কাব্যগুণ অনুবাদে ধরা যায় না। আমার মনে হয় শেরিডান অথবা কংগ্রিবের নাটক অনুবাদ করা তার তুলনায় সহজ হবে'।

সর্বরঞ্জন এক সমস্যা থেকে উঠতে গিয়ে যেন অন্য সমস্যায় ডুবে যাচ্ছে এরকম বোধ করল। 'বুড়ো শালিক' কুৎসিত, দেওয়ানজির সঙ্গে এই পর্যন্ত তার মত মেলায় সে উৎসাহিত হয়েছিল, এখন সে তো এক চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছে। কংগ্রিব! সে তো ব্ল্যাগার্ডদের সম্বন্ধে ব্ল্যাগার্ডদের জন্য এক ব্ল্যাগার্ডের লেখা। সে কি চূড়ান্ত নির্লজ্জ আদিরসের কথা নয়?

সে কিছুই বলতে পারল না। সে অনুভব করল এই অবস্থায় এই ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেই মাত্র তাব মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। কলকাতার কারো বৈঠকখানা হলে তা সে অবশ্যই করত। কিন্তু এখানে দেওয়ানজি হরদয়ালের ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় না, কেননা প্রকৃতপক্ষে এই লাইব্রেরি ঘরের বাইরে যে রাজপথ, যে স্কুল, শিক্ষকদের আবাসিক বাড়ি, এবং তারও পরে গ্রামের পরে গ্রাম, কতদূর কে জানে, সবই দেওয়ানজির বৈঠকখানা।

সাক্ষাৎ শেষ হয়েছে অথচ বিদায় নেয়ার ঠিক কথাটা ভেবে ওঠা যাচ্ছে না বলে বসে আছে এমন অবস্থাই যেন তার। এই সময়ে ঘড়িতে কোন-এক আধঘণ্টা সূচনা করল। পর্দার কাছে হরদয়ালের ভৃত্যের সাড়া পাওয়া গেল। সে যেন গোসলখানায় জল দেয়া হয়েছে এ বকম বলল।

নিয়োগী বলল, 'আপনার স্নানাহার? আপনার স্নানাহারের সময় হল'?

হরদয়াল বলল, 'সে হবে। আপনি কংগ্রিব অথবা শেরিডান অনুবাদ করা ভেবে দেখুন'।

হরদয়াল উঠে দাঁড়াল। নিয়োগী যেন কিছু লজ্জিতভাবে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

ভৃত্য পর্দার এপারে এসে বলল, 'রান্না শেষ হল'।

তখন চিন্তার সময় নয়। তাহলেও 'চলো তবে' বলে ভৃত্যের পিছন-পিছন যেতে-যেতে হরদয়াল চিন্তা করল, আমাদের এই নতুন মাস্টারমশায়ের মনে ধর্মাভাব যত প্রবল সাহিত্যপ্রীতি কি ততটা প্রবল নয়? ধর্মের ভাব কিন্তু এখন প্রবল হচ্ছে কলকাতাতেও। একে কি ইংরেজি শিক্ষার ফল বলবে? তাহলে ও-জাতটাকেই ধার্মিক বলতে হয়।

পথে বেরিয়ে সর্বরঞ্জনও ভাবছিল : তাহলে এতদিন যা ভেবে এসেছে তা কি সবই ভুল? তাহলে

মেট্রোপলিটানের ভাদুড়ীমশাই তাঁর বন্ধুকে চেনেন কি? ভাবো দুপুরের স্নানাহারের আগে ওই মদ্যপান। না-না, এ কখনই গোপন করা যায় না তিনি মদ্যাসক্ত। এবং ঈশ্বরেও বিশ্বাস আছে কি? ভাবো, শিরোমণিকে, উপনিষদ-অভিজ্ঞ ভাবেন! অথচ ইংরেজিনবিশ সে-বিষয়ে সন্দেহ কী? গায়ের সেটা অবশ্যই ড্রেসিংগাউন, কত দাম কে বলবে? সে হঠাৎ আবিষ্কার করল। তাহলে দেওয়ানজি ডিরোজিও ধারার মানুষ, নিরীশ্বর, দুর্বিনীত, মদ্যপায়ী আধুনিকদের একজন যারা নষ্ট স্ত্রীলোক সংসর্গে সংকুচিত নয়? না-না, একথা আমাকে বলতেই হবে দেওয়ানজি সেই প্রজন্মের মানুষ একসময়ে ভয়ঙ্কর রকমে আধুনিক ছিল, কিন্তু এখন কলকাতার চোখে আর আধুনিক নয়। না, আধুনিক নয়।

হরদয়ালও ভাবছিল। সে ভাবল, এদিকে লক্ষ্য করো। এই চার্লস ডারউইনকে যদি বিশ্বাস করো তবে এই লাল কাপড়ের মলাটের বইটা এখন একখানা ইট যার আঘাতে অনেক গির্জার অনেক কাচ ঝনঝন করে ভেঙে পড়ে। যদি এঁকে বিশ্বাস করো ওটা আর বিশ্বাস করতে পারো না যে ঈশ্বর মানুষকে হাজার পাঁচেক বছর আগে নিজের আকারে সৃষ্টি কবেছিলেন। একটা চাপা হাসি হরদয়ালের চাপা ঠোঁটে জড়িয়ে গেল। অবশ্য ওদেব কথা, হয়তো প্রমাণ করবে ডারউইন ঠিকই বলেছেন তবে তা লাল আব কালো মানুষ সম্বন্ধে। ঈশ্বর বেশ ব্লোন্ড এবং নর্ডিক, আর সে-বকম মানুষ সৃষ্টির কথাই বাইবেলে আছে।

৬

স্কুলে পৌঁছে সর্ববঞ্জন নিজেব আবিষ্কার নিযে নিতান্ত গম্ভীর হযে বইল। সে কি আব কখনও দেওযানজিব কাছে সাহায্য আশা করতে পারে? স্কুল ভাঙাব আগে তাব দুটো ক্লাস ছিল, একটাতেও সে মন দিয়ে পড়াতে পারল না।

সে শিক্ষকদের বসবাব ঘরে গিয়ে একবার মনে করল পবীক্ষার যে-প্রশ্নপত্র আগামী সপ্তাহে দিতে হবে সেগুলোকে আর-একবাব দেখে দিলে হয়। কিন্তু উৎসাহটা তৈলহীন প্রদীপের মতো নিস্তেজ। সে তখন দেরাজ থেকে একখানা খেরো বাঁধানো খাতা বার করল। এটা তার একরকমের ডায়েবি। ক্লাসে কী পড়ানো হল কী পড়ানো উচিত এসব যেমন থাকে, তেমনি লেখা থাকে তার নানা সময়েব চিন্তা। এটা অবশ্যই তার সেই ডায়েরি নয় যা সে বাড়িতে প্রত্যহ সন্ধ্যার উপাসনার পবে লেখে। বরং এই দুই নম্বর ডায়েরিতে যা-সব থাকে তার কিছু-কিছু পরিমার্জিত হয়ে বাড়ির এক নম্বর ডায়েবিতে স্থান পায়।

দু'নম্বর ডাযেবি লিখতে সর্বরঞ্জন দেখল গোলটেবিলটার একপ্রান্তে শিবোমণি এসে বসল। কিছুপবে তার থেকে দু'একখানা চেয়ার বাদ দিয়ে চরণদাস বসল এসে। সে একটা বাঁধানো খাতায় লাল-কালো কালিতে রুল টানতে শুরু করল। নতুন বছরের অ্যাটেন্ড্যান্স রেজিস্টাব হবে।

চরণ দাসের পরনে বেঁটে আচকান জাতীয় পিরহান, পাকানো চাদর কোমর ঘিরে বুকে ক্রশ করে দুই কাঁধে। শিরোমণির গায়ে খাটো ঝুলের খাটো হাতার পাশে ডোবে বাঁধা মেরজাই, চাদরটা গলাব দুপাশ দিয়ে ঝুলছে। গলার কাছে মোটা পৈতের গোছা। কিন্তু সবচাইতে দর্শনীয় তার অর্ধেকের বেশি কামানো মাথায় সাদা ধবধবে টিকির গোছাটা।

হয়তো নিঃসঙ্গতাবোধ নিয়োগীকে এত পীড়িত করছিল যে নিজের অজ্ঞাতসারে তার মন তালাশেব সুযোগ খুঁজছিল। সে বলল, 'চরণদাসবাবু এখনই আগামী বছবের কাজ সেরে রাখছ? নাকি এটাও থিয়েটার সম্বন্ধে কিছু'।

চরণ দাস মুখ না-তুলে বলল, 'আগেকারটাই ঠিক'। সে হাসল। ইতিপূর্বেই থিয়েটার সম্বন্ধে নিয়োগীর সঙ্গে কিছু তর্ক হয়েছে।

সর্বরঞ্জন বলল, 'ভয় নেই তোমাদের। এখানে এই গ্রামে তোমাদের থিয়েটারকে কেউ নিন্দা করবে

না'। থিয়েটার নিয়ে আলোচনার ফলে দেখা যাচ্ছে শিরোমণিও শব্দটির সঙ্গে পরিচিত। সে বলল, 'তা কি বলা যায়? থিয়াটার বা অভিনয় যাই বলুন, ভালো না-হলে নিন্দা হবেই'।

চরণ বলল, 'উনি বোধ হয় অন্য অর্থে বলছেন'।

'কথাটা ঠিক ধরেছ'। বলল সর্বরঞ্জন। কিন্তু তারপরে সে নির্বাক হয়ে গেল। সে কি কখনও-ই প্রকাশ্যে বলতে পারে দেওয়ানজি হরদয়াল থিয়েটার নাটক সম্বন্ধে কী জাতীয় নিন্দনীয় মত পোষণ করেন? সে কি এইমাত্র ডায়েরিতে যা লিখেছিল সেই আশঙ্কার কথা বলবে? যে অতি শীঘ্রই এই নাটকের প্রশ্রয়ে ঢপওয়ালি, খেমটাওয়ালি, সাধারণভাবে নষ্টা স্ত্রীলোক অভিনয়ের সুযোগে কীভাবে প্রকাশ্যে বহুলোকের চোখের সামনে ক্রমশ আদরণীয় হয়তো দেবীরূপে কথিতা হবে।

সে মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'মুশকিল কী জানো, চরণদাসবাবু, মানুষকে দেখে-দেখে যে ধারণা করো আর তার প্রকৃত ব্যবহারে অনেক তফাত'। এবারেও নিয়োগীর মনে দ্বিধা দেখা দিল। সে কি বলতে পারে হরদয়ালের ব্যবহার তাকে আজ কী রকম আঘাত দিয়েছে। সে বলল, 'জানো খিদিরপুরে এক মিত্তিরজা আছেন যিনি নতুন সত্যধর্মকে আলিঙ্গন করেছেন। কিন্তু তা করার আগে নিজেদের গৃহবিগ্রহ গোপীনাথ প্রভৃতিকে এক মন্দিরে দিয়ে এসেছেন। যাতে সেই অবস্থাতেও পূজা হয় সেজন্য সে মন্দিরকে আট-দশ বিঘা জমিও কিনে দিয়েছেন'।

শিরোমণি বলল, 'কৌতুকের ব্যাপার তো। বিবেকের সঙ্গে রফা'?

'আমার কিন্তু মশায় তা নেই। মিথ্যা মিথ্যাই। আমাদের নারায়ণশিলা বিগ্রহ ছিল ...

চরণ বলল, 'তা বুঝি গঙ্গায় দিয়েছেন'?

'রোসো-রোসো, চরণদাস', শিরোমণি বলল, 'গঙ্গায় দেয়া তো হিঁদুআনিই হল'।

নিয়োগী বলল, 'আপনি যদি দয়া করে আমার বাসায় যান, দেখতে পাবেন সে শিলা আমার টেবিলে কাগজ চাপাব কাজ করছে। আমি চাই আমার পুত্রেরা তাকে নুড়ি বলে জানুক'। সে বলল আবার, 'না-না, আমাকে বলতেই হবে, আজ পর্যন্ত সেই পাথর থেকে নূপুরের শব্দও শুনিনি, বাঁশিও বাজে না'। এই বলে সে হাসল মৃদু-মৃদু।

শিরোমণি তাতে প্রচণ্ড শব্দে হা-হা করে হেসে উঠল, বলল, 'এখানেই চিন্তার ত্রুটি। যাকে নুড়ি জ্ঞান করলেন তার আবার নূপুর অথবা বাঁশি কী? এ যে পরম ব্রহ্মের দয়াময় হওয়ার মতোই'।

চরণদাস বলল, 'আপনি বলছেন নুড়ি ভাবলে তা নুড়ি হয়'?

'তাই তো হয়ে থাকে', শিরোমণি বলল, 'তোমার আমার কাছে যা রক্তে বসায় মাখানো আড়াকাঠ, কারো-কাবো কাছে তা আবার পূজনীয় অবতারের প্রতীক। হয়তো নিয়োগীমশায়ও এমন একখানা কাঠ দেখলে যুক্তকব অন্তত বুক পর্যন্ত ওঠান'।

সর্বরঞ্জনের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। তার মুখে যে শক্ত-শক্ত শব্দগুলো আসছে সেগুলো আয়ত্তে রাখা কঠিন হচ্ছে। সে বলল, 'সত্যি গোপন করা আমার অভ্যাস নয়। স্বীকার করি আপনি যাকে আড়াকাঠ বলছেন সেই ক্রুশ দেখলে যুক্তকরে শ্রদ্ধা জানালে লজ্জার কিছু দেখি না। আপনি ইংরেজি জানলে আপনাকে কেশব সেন মশায়ের বক্তৃতা পড়তে দিতাম। দেখতেন বড়-বড় ইংরেজরাও কেন তাকে প্রশংসা করছে। না-না, একথা আমাকে বলতেই হবে, আমাদের এই দেশে এমন প্রতীকও পূজা করা হয়, যা স্বীকার করতেই হবে, যে কোনো ভদ্রব্যক্তিকে লজ্জিত করে। তার তুলনায় ক্রুশ'?

চরণ জিজ্ঞাসা করল, 'নিয়োগীমশায় ওলাবিবি, শীতলা ঠাকুরানীর কথা বলছে কিনা'।

নিয়োগী বলল, 'আমি তোমাদের দেবতার দেবতা। মহাদেবের কথা বলছি'।

কোনো-কোনো কথা একটা আলগা-আলগা ধরনের আলাপকে যেন বিদ্যুতের আঘাতে সজীব করে তোলে। এই ক্লাসটা শেষ হলে শনিবারের ছুটির ঘণ্টা পড়বে। শিরোমণির তখন গৃহে ফেরার কথাই মনে হচ্ছে। টেবিলের উপরে তার হাতের কাছে স্কাইলাইট থেকে রোদ এসে পড়ছে। শিরাবহুল বৃদ্ধ

হাত দুটিরও যেন রোদ পোহানোব ভঙ্গি।

চরণ বলল, 'সে তো এক থাবা কাদা কিংবা একটুকরো পাথর। লজ্জার কী'?

'কিন্তু আকৃতি? বিশেষ করে এই গ্রামে . . . সর্বরঞ্জনপ্রসাদ জুগুপ্সিত বোধ করে থেমে গেল।

শিরোমণি বলল, 'অ। তা বিশেষ করে এই গ্রামে কেন'?

'নতুবা শিবলিঙ্গের গোড়ায় কারো বুকের রক্ত দেয়া হয়'?

'তাকেও যৌনতাগন্ধী বলছেন'? শিরোমণি হাসল যেন।

'আপনি ব্রাহ্মণ, স্বীকার করবেন শিবপূজায় রক্তচন্দন অবিধেয়। রানীমা সম্বন্ধে আপনি যে-কথা বললেন এই গ্রামে বসে আমি সে-কথা মুখে আনতে চাই না'।

'অর্থাৎ চিন্তা গোপন করছেন'? শিরোমণি হাসল আবার।

'তাহলে শুনতে চান? ওকে আমি পশুত্ব পূজা বলি'।

শিরোমণির কৃশ শরীরে অনেক শিবাই প্রকাশমান। কপালেব ঠিক মাঝখানে একটা শিরা যেন রক্তের চাপে দপদপ করছে। হঠাৎ সে ঠা-ঠা করে হেসে উঠল। সে বলল, 'খুব বলেছেন। আমি শুনেছি সাহেবদের শিশুরা রুমালে বাঁধা অবস্থায় সারস দ্বারা নীত হয়। আপনি বাঙালি, আপনাদেরও তা হয় কিনা জানি না। ভেবে দেখুন নিজের জন্ম, নিজের সন্তানের জন্ম পাপপঙ্কে পশুত্বের ফলে কিনা। আমরা স্বর্গদ্বার থেকে ভূমিষ্ঠ হই কিন্তু। যদি বলেন একবারই জন্মানোর সুযোগ পেয়েছি, এ জন্ম সার্থক, তবে সেই সার্থকতার উৎস, জীবনের সবটুকু আনন্দের উৎস, মাতৃযোনির মতো কি এমন পবিত্র, মশাই'?

'ছি-ছি-ছি, এসব আপনি কী বলছেন! নিয়োগী দু'হাতের তর্জনী দু'কানে খানিকটা করে ঢুকিয়ে দিল।

শিরোমণি বলল, 'মস্তিষ্কের সাহায্যে ব্যাপারটাকে বিবেচনা করুন। পবিত্রতার বোধ বদলাবে। রক্ত মাখানো কাঠ, যা মৃত্যু, বেদনা, প্রতিহিংসার কথা মনে আনতে পাবে, তা যদি আপনারা সামনে রাখতে পারেন, তাহলে আমরা যদি আনন্দ ও জন্মের প্রতীককে সামনে রাখি তাতেই কি দোষ'?

ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজল। ছুটির ঘণ্টা শুনে সেই হলের বাইরে ছেলের দল হৈ-হৈ কবে বেরচ্ছে। শিরোমণি উঠে দাঁড়াল। বলল, 'নমস্কার মশায়। বুড়োর কথায় দোষ নেবেন না। আজ আছি, কাল নেই'।

কিন্তু সেদিন ভবিতব্য অন্যপ্রকার ছিল। ভিতরের দিকের এই হলে বসে বাইরে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে তা বোঝা যায়নি। বাতাসও ছিল। শিরোমণি হলের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ভিজে বাতাসের ঝাপটা খেয়ে পিছিয়ে এল। টেবলের কাছে এসে বলল, 'খুব ধমক খেলাম হে চরণ, জল হচ্ছে'।

চরণ বলল, 'তাড়া কী? বসুন'।

নিয়োগীর বোধ হয় এমন স্পষ্ট, তার কাছে যা নির্লজ্জ, কথা শোনার অভ্যাস ছিল না। সে কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। শিরোমণিকে ফিরে চেয়ারে বসতে দেখে সে বেশ তিক্তস্বরে বলল, 'আপনার এই অনুভূতিগুলিকে আমি নিতান্ত নিম্নস্তরের মনে করি। এ কথাটা আপনাকে জানানো দরকার'।

শিরোমণি বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। এগুলো সেই স্তরের কথাই যখন মানুষ শিবলিঙ্গে জগৎ পিতরৌকে দেখতে পাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে না তাঁদের স্নেহ ঢলঢল মুখ। হ্যাঁ হে চরণ, তুমি বাইবেল পড়ো শুনি, কালিদাস পড়েছ'?

নিয়োগী বলল, 'আমি পড়েছি, আমাকে বলুন। কৈশোরে সে দুর্ভাগ্য হয়েছিল আমার। কালিদাস শৈব ছিলেন, এই বলবেন তো? তাতে কিছু প্রমাণ হয় না'।

শিরোমণি বলল, 'প্রমাণ নয়, তুলনা। আপনি হয়তো শকুন্তলমও পড়েছেন। প্রথমে শিবকে প্রণাম শেষে ভরতবাক্যেও তাই, মাঝখানে কামজ মিলন থেকে আর-এক কুমারসম্ভবের পবিত্রতায় পৌঁছানো। এই এক ব্যাখ্যা হয় যে মানুষ কামজ অস্তিত্ব থেকে শিবত্বে পৌঁছাতে পারে। আদিরসকে বাদ দিয়ে নয়, তাকে দেবত্বের সার্থকতায় চালিত করেই কাব্য হয়। যদিও আপনারা ভাবেন ভগবান আদিম মানুষকে কোন-এক উদ্যান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, এ পতন হয়নি, বরং পশুত্ব থেকে উর্ধ্বে চলেছে মানুষ।

কিছু উন্নতি হয়েছে'।

সর্বরঞ্জন বলল, 'থাক-থাক। এতেও আপনার শিশ্নপূজার সমর্থন হয় না'। সে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

শিরোমণি স্মিত হাস্যে বলল, 'হয়। যতক্ষণ না তাকে জগৎপিতা যোগীশ্বর বলে বোধ হয়, জন্ম জীবন মৃত্যুর হেতু বলে মনে হয়, ততক্ষণ না-হয় নিজের প্রাণশক্তির প্রতীকরূপে পূজা করুক'।

শিরোমণি অভ্যাসবশে শিখায় হাত রাখল, যেন সেটাকে বাঁধবে ফুল দিয়ে, কিন্তু আচমকা অন্যদিকে গেল ঘটনার গতি। কে যেন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি শৈব, শিরোমণিমশায়'?

শিরোমণি পিছন ফিরে দেখল, তার চেয়ারের পিছনেই বাগচী, এবং তার কাছাকাছি অন্যান্য শিক্ষকরাও। শিরোমণি বিশেষ বিব্রত বোধ করল, কিছুটা যেন ভীতও। সে জিভ কাটল। সে ইতস্তত করে বলল, 'না মশায়, বিষ্ণুকে পূজা করার চেষ্টা হয়'।

বাগচী বলল, 'ও আচ্ছা। কিন্তু আপনি যোগীশ্বর রূপের কথা কী বলছিলেন, জগৎপিতাও বলছেন। বৃষ্টি থামেনি, আপনি বলতে পারেন'।

শিরোমণি লজ্জায় অধোবদন হল। কিন্তু সে লক্ষ্য করল যে অন্য-অনেকেই তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। যেন সে ধিক্কৃত পরাজিত এক জনগোষ্ঠীর প্রতিভূ এ রকম একটা অনুভব হল তার।

সে বলল, 'তারপরও, কল্পনা করি, তার অনুভূতিতে যোগীশ্বর সেই রূপ ক্রমশ এক আনন্দময় জ্যোতিস্বান্ কালস্রোতে মিলিয়ে যায়। সে হয়তো অনুভব করে সেই মহাকালস্রোতে সূর্য-চন্দ্রাদি জন্মাচ্ছে, লোপ পাচ্ছে, সে নিজেকে সূর্য-চন্দ্রাদির মতো মহাকালপ্রসূত এবং তাতেই বিলীন মনে করে। সেই জগৎ-জনয়িতা মহাকালকে অনুভব করে তার জন্মের আনন্দ নেই, মৃত্যুর ভয় নেই, তার সুখ দুঃখ নেই, সে কাউকে ভয় করে না, বিদ্বেষ করে না। সে যদি কখনও বলে আমিই শিব তাহলে তা মিথ্যা হয় না'।

এই বলে সে থামল। তাকে বিশীর্ণতর দেখাল। সে মনে-মনে ভাবল : এই বিধর্মী মানুষটির কাছে কেমন-বা কটু বোধ হল তার কথা!

কিছুক্ষণ কেউই কিছু বলল না। কিন্তু কেউ-কেউ করিৎকর্মা থাকে। কৈলাসপণ্ডিত ইতিমধ্যে উঠে দরজা পর্যন্ত গিয়েছিল। সে বলল, 'ধরেছে সার। এবার যাওয়া যাবে'।

বাগচী হেসে বলল, 'পণ্ডিতমশায় দেখছি আলোচনাটা চালাতে চান না। চলুন তবে'।

পথে বেরিয়ে শিক্ষকেরা শীতের এই ক্ষণস্থায়ী বৃষ্টি শীত বাড়াবে কিনা, ফসলের পক্ষে ক্ষতিকর হবে কিনা, ধান-চালের দাম এবার গতবারের চাইতে বেশি কেন ইত্যাদি আলোচনায় ব্যস্ত হল।

শিরোমণি সকলের পিছনে হাঁটছিল। বাগচী শিক্ষকদের পরে স্কুল থেকে বেরিয়েছিল। কখন সে শিরোমণির কাছে এসে পড়েছে। সে বলল, 'এগুলো কি আপনার নিজেরই ব্যাখ্যা? কিংবা কোনো দর্শন থেকে বলছেন? হ্যাঁ, মশায়, ওই উদাসীন মহাকালের কথা? সবাই উদাস হলে কি চলবে'?

শিরোমণি নিজের মনের মধ্যে খোঁজ করল যেন, বলল, 'নিশ্চয়ই পূর্বসূরীদের কাছ থেকে পাওয়া। কিন্তু হঠাৎ বিশেষ কারো নাম মনে করতে পারছি না। কাল ছাড়া কি কুম্ভকারই একটা ঘট বানাতে পারে? কিন্তু উদাস না-হলেও চলে। যোগীশ্বর রূপে তাঁকে আদর্শ করে লোক সংগ্রহ করা যায়। তিনি অপরের জন্য বিষ পান করেন'। শিরোমণি নিতান্ত কুণ্ঠিত হয়ে হাসল।

বাগচী এই কথাগুলো ভাবতে-ভাবতে কিছুক্ষণ শিরোমণির পাশে চলল। সে বিস্ময় বোধ করল। জন্মান্তরবাদ নয়, কর্মফল নয়, সবই যেন এক উদাসীন মহাকালস্রোতে ভাসমান। কী সাংঘাতিক কথা, তাহলে ক্রাইস্ট দূরের কথা, ঈশ্বরই থাকেন কি?

শীতের এই এক পশলা বৃষ্টি ধুলোকে জব্দ করতে পারেনি। বরং বাতাস এনে ধুলোর উৎপাত বাড়িয়েছে। একবার তা উঠে শিরোমণিকে ব্যতিব্যস্ত করল। সে চাদরে নাক-মুখ ঢাকল বটে, তার পাকা চুলে, শীর্ণ দেহে ধুলোর স্তর পড়ল যেন। ধুলোয় ঢাকা ক্লান্ত শীর্ণ এক হতাশ মানুষ যেন সে।

নিজের বলা কথা চিন্তার সূচনা করতে পারে। শিরোমণি মনের তলায় চলে নিজের অজ্ঞাতে রামায়ণের ভাষায় চলে এল। কিছু বদল করে সে ভাবল : উনষোড়শ বর্ষ পৌত্র যে রাজীবলোচন আজ সন্ধ্যা থেকে তাকে 'মেঘদূত' পড়াতে হবে। বালবিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী গৃহে থাকায় টোলেও ভট্টি ছাড়া কাব্য পড়ানো হতো না। এখন তা যায়। বাড়ির কাছাকাছি এসে সে ভাবল : কিন্তু তা কি ভালো হচ্ছে? পৌত্র ও পুত্রতে কি বিবাদ দেখা দেবে? এ কি সত্য যা সে কখন আশঙ্কা করে? নিজের গৃহের পরিস্থিতি সে বিশ্লেষণ করল। এবার নিয়ে সাত বছর হল পুত্র বিজয়কুমার কলকাতায় অর্থোপার্জনের জন্য। মাঝে কী এক পরীক্ষা দিয়ে জজ-পণ্ডিত হওয়ার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু জজ-পণ্ডিত কি এখন হয়? তা কি গুজব নয়? এই সাত বছর বিজয় কালের সঙ্গে অনেক আপোস কবেছে। সে ধর্মান্তরিত হয়নি বটে, কিন্তু স্মৃতিতে বিশ্বাস অনেকটাই কমেছে। সে গতবার হাসতে-হাসতে তার মাকে বলেছিল, সময়ও মুনিদের কাছে বেদের মতো প্রমাণ। কিন্তু সে আজকের নিয়োগীর মতোই উত্তেজিত ছিল। সেদিন টোলের দু-তিনজন ছাত্র তার মায়ের পক্ষ নেওয়ায় কণ্ঠস্বরগুলো ক্রমশ উচ্চতর হচ্ছিল। তার সে মা আর নেই। কথাগুলো কি তাঁর সঙ্গে গিয়েছে? সে বলেছিল—দোষটা ভাগ্যের যে ব্রাহ্মণকুলে জন্মেছি, কুল ত্যাগ করতে পারছি না। কিন্তু শীল, সোনার বেনে, কৈবর্ত, কায়েতের মুখে বামুন-বামুন ঠাট্টাও শুনব আর তাদের দেওয়া নামমাত্র বৃত্তি ভোগ করব, তাই-বা কেন? আমরাই যদি নিজেদের স্বার্থে ধর্ম তৈরি কবে থাকি আমরাই তা চুরমার করে দিই না কেন? তুমি কি বলবে এই গ্রামের বাইরে শিরোমণি শব্দটাকে কেউ শ্রদ্ধা করে? তার চাইতে বামুন বিদ্যাসাগর ভালো। কলকেতায় বাস কবলে খানিকটা কলকেতার মতোই হবে, বিজয়েরও হয়েছে। কিন্তু পৌত্র বৈজয়ন্তেব উপবে বাডির প্রভাব বেশি। পৌত্রেব প্রতি স্নেহাবিষ্ট হযে, অথবা সপরিবারে পুত্রের কলকেতায থাকা অসুবিধাব হবে এই যুক্তিতে পৌত্রকে নিজের কাছে রাখা কি ভালো হচ্ছে?

কিন্তু কাব্য পাঠের কথা হচ্ছিল। সময হয়েছে বটে। কাব্যেব রস ও ব্যক্তির ইন্দ্রিয় কর্তৃক উপভোগ-জাত সুখ এক নয় তা বুঝতে হবে। কিন্তু বাজীবলোচন পৌত্রের বাহুও তো পরিঘসদৃশ হওয়া উচিত। কাব্যের রস সেই রকম ব্যূঢ়োরস্ক পুরুষের জন্যই কি? কাব্যেব স্মৃতি শিরোমণির কল্পনাকে উদ্দীপ্ত কবায় সে যেন তার সম্মুখে রসপিপাসু কয়েকটি যুবাকে দেখতে পেল।

কিন্তু কল্পনা অনেকসময়েই বাস্তবকে বৈপরীত্যের সাহায্যে স্পষ্ট কবে। এসব কাব্য যাদের, মহাকাল যাদের উপাস্য, তারা চারহাতে ধনুতে জ্যা রোপণ করতে পারত। যবনধ্বংসী সেই সেনা নিশ্চয় ক্ষুধাখিন্ন ছিল না।

তার চতুষ্পাঠীতে কি তেমন যুবক আছে? কিংবা গ্রামে? মাংসল স্কন্ধ, সুবলিত বাহু। আর ধনুর অনুকল্প তো বন্দুক।

বাড়িতে ঢুকতে-ঢুকতে নিজের চিন্তাগুলোকে লক্ষ্য করে সে লজ্জিত হল। এসব কেন ভাবছে? যখন এসব কাব্য লেখা হয়েছে তখন অপরাধগুলো সবই ছিল, অবশ্যই ক্ষুধা, তৈল, ইন্ধন, লবণ চিন্তা ছিল, কিন্তু একরকমের বলিষ্ঠতাও ছিল। এইসব যে সে ভাবছে কে জানবে? শালগ্রামশিলা? ক্ষুধার অভাব, দৃপ্ত যৌবন, ধীরোদাত্ত পুরুষ শত সহস্র কুটির থেকে ছুটে আসছে, যাদেব অপরাধকে ভুল বলে ক্ষমা করা যায়, তাদের জন্য কার কাছে প্রার্থনা করা যায়?

বাগচীও বাতাসের ঝাপটায় পড়েছিল। পথের ধারের গাছগুলোর ব্যস্তসমস্ততা দেখতে পেল। আকাশে যে হালকা মেঘ তাতে আর কি বৃষ্টি হবে? কী যেন ভাবছিল সে? শিরোমণির কথা? সে কি তবে নিজেই জানে না তার কথাগুলোর উৎস কোথায়? এ কি নতুন দার্শনিক চিন্তার দিকে চলেছে তার মন, অসীম অকম্পিত কালকে, সময়কে, সে যাকে হিন্দুরা ব্রহ্ম বলে তার প্রতিভাস মনে করছে? এ কি নতুন দার্শনিক চিন্তা যা এই গ্রামে বলা হচ্ছে? কী জানি! কিন্তু তা কি ভালো? তাহলে কি বিপন্ন হতে হয় না? ঈশ্বর থাকে না!

ঠিক এই সময়ে নিয়োগীও চিন্তা করছিল। সে মাথা নিচু করে হাঁটছিল, যেন সে পরাজিত। কিন্তু মনের জোরে সে এই অলীক কল্পনা থেকে মুক্ত করে নিল নিজেকে। বাগচীকে দেখেই সে ভদ্রতায় থেমে গিয়েছিল কেননা শিরোমণি তখন নিতান্ত অরুচিকর যৌন বিষয়ক কথা বলছিল। কী আশ্চর্য, দেওয়ানজি এঁকেই উপনিষদের ব্যাখ্যা করার উপযুক্ত বিবেচনা করেন! কালিদাস! শকুন্তলম্! ঈশ্বর আমাদিগকে পাপ শ্রবণ ও পাপ কথন থেকে রক্ষা করুন। একবার তার মনে হল সে নিজেকে এবং নিজের সন্তানদের পাপ থেকে উৎপন্ন মনে করে কিনা। পরমুহূর্তেই সে ভাবল এই যে তার ঈশ্বরচিন্তায় বারবার যৌনতা যুক্ত হয়েছে এর জন্য কি সে দায়ী? অথবা এই কি অঙ্গুলিনির্দেশ যে তাকে গ্রাম ত্যাগ করতে হবে?

আদর্শবাদীদের চিন্তা অনেকসময়ে বাধার সম্মুখে অনুপ্রেরিত হয়ে ওঠে। গ্রাম ত্যাগের কাল্পনিক শূন্যতার সামনে তার চিন্তা শক্ত হয়ে দাঁড়াল যেন। না-না, সত্যধর্মের পরাজয় হয় না। সে অতি দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। এই গ্রামে দেওয়ানজি নিশ্চয়ই প্রচণ্ড শক্তিশালী, না-না, তা আমাকে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু তাঁর শক্তির উৎস? তা কি আবো শক্তিশালী নয়? সে যেন পেয়েছি-পেয়েছি বলে উঠবে। সে ভাবল, আর দিদি ব্রহ্মবালার কথা সত্য হলে, অবশ্যই তা সত্য, রানীমা গুণাঢ্যমশায়ের কন্যা সম্বন্ধে ভাবতে রাজি হয়েছেন। আগ্রা, মথুরা, পাটনার এবং বর্তমানে কলকাতারও এই পরিবারের ন্যায় কাদের এমন সত্যধর্মে নিষ্ঠা? গুণাঢ্যমশায় কমিশরিয়াটের কনট্রাকটার রূপে ধনাঢ্যও বটেন। তাঁর কন্যা যদি রাজকুমারের স্ত্রীরূপে এদেশে আসেন? না-না, দিদিকে আজই পত্র দিতে হবে। এ-সম্বন্ধ ঘটাতেই হবে। রানী হতেই কি রোমসম্রাট ক্রিশ্চান হননি?

৭

বাড়ি যাওয়ার কথা সকলের আগে মনে হলেও কৈলাসপণ্ডিত সকলের পিছনে ছিল। সঙ্গে চরণদাস। চরণদাস তো দাঁড়িয়ে থেকে স্কুলের দরজা-জানালা বন্ধ করায়। কৈলাসপণ্ডিতের গন্তব্যই হারিয়ে গিয়েছে, কোথাও কোনোরকমে পৌঁছে গেলে সেখানেই নিজেকে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে। বয়স শিরোমণির চাইতে কম হবে, এমন জরাজীর্ণ যে কেউ প্রতিকারের কল্পনা করে না।

তার এই এক সুবিধা, সে দারিদ্র্যকে অনুভব করতে পারে না আর। দ্বিতীয় সুবিধা ইদানীং দেখা দিয়েছে, সে ক্রমশই অতীতকে ভুলে যাচ্ছে। তার মনে আছে বটে, এই স্কুলটা হওয়ার আগে বাংলা, অঙ্ক, ইংরেজির দু'এক কথা শিখতে তার পাঠশালাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান ছিল, আর দেওয়ানজির বদান্যতায় স্কুল হলেও তাকে সেখানে কাজ সুতরাং জীবিকার পথ দেওয়া হয়েছে। এখন কৈশোর-যৌবনের ঘটনাগুলোকে তার অলীক মনে হয়। সে যে কায়স্থ তা নিশ্চয় মনে আছে; পিতার নাম-গোত্র মনে আছে, কিন্তু তাঁর মুখখানা স্মৃতিতে আর আসে না। মায়ের? তা যেন ভাসে, দোলে, ডুবে যেতে চায়। কায়স্থের বিধবা। কিন্তু কী কঠোর বামনাই! সেই কঠোর একাগ্রতা ধরা পড়ত চরকা নিয়ে বসলে। তেমন সূক্ষ্ম রেশম মাকড়সাও পারে না। ফরাসডাঙার সাহেব কিনত। আর তাতেই মা-ছেলের ভাত। মা যখন সব-সেরা কাটুনি তখনই মাসে দুটো করে উপবাস, প্রতি রাত্রিতেই অরন্ধন, মায়ের প্রতি রাত্রিতেই অভক্ষণ। শুভঙ্করে দড় পণ্ডিত জানে এসবে ভাতের প্রয়োজন এক-তৃতীয়াংশ কমে আসে। কৈলাসের আর-এক সুবিধা হয়েছে এখন, বালকের মতো কথায়-কথায় চোখে জল আসে, চিন্তা ভেসে-ভেসে হারিয়ে যায়।

সে আজ ধর্মের কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছে। ধর্ম? ভাবতে গেলে মায়ের সেই শীর্ণ, ক্ষুধাখিন্ন মুখটাকে মনে আসে। এখন বাতাসা-টাতাসা মানত করার দায়িত্ব তার স্ত্রীর। তার মেয়ে চারু এখন বড় হয়েছে, সে বরং এ-ব্যাপারে মাকে সাহায্য করে। কিন্তু এই ধর্ম নিয়ে একটা বিপদ যেন ঘনিয়ে আসছে। আজ আবার নিয়োগীমশায় শিরোমণিকে চটিয়ে দিলেন।

মুশকিল! সে কিছুদিন থেকে নিয়োগীমশায়ের কাছে ঋণী বোধ করছে। অসময়ে বিনা সুদে দু'চার

টাকা ধার দেওয়া তো বটেই। আসল কথা তার মেয়ে চারু। বছর দুয়েক আগেও সে গ্রামের সবচাইতে গেছোমেয়ে ছিল। এখন বিষণ্ণ হয়েছে, ষোলো-সতেরো হল তার। তার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা নেই। বছর দুয়েক আগে শেষ চেষ্টা করেছিল সে। সে কুলীন নয় আর কুলের কথা ভাবে না। তা সত্ত্বেও তখনই পাত্রপক্ষ সোনায়-নগদে চারশো চেয়েছিল যা তার এক বছরের উপার্জন। চারুকে দরজা বন্ধ করে থাকতে হতো যদি না নিয়োগীমশায়ের স্ত্রী তাকে ডেকে নিতেন। দিনমানের দু-পাঁচ ঘণ্টা চারু তাঁর কাছে কাটায়, তাঁর ছোটছেলেটিকে বুকে করে রাখে, কুটনো কেটে দেয়, সব কাজেই সাহায্য করে। একটু রুগ্ণই তিনি, সন্তানও বেশ কয়েকটি। কিন্তু তিনিও চারুকে ভালো-মন্দ খেতে দেন, সেলাই শেখান, খাতা বেঁধে হাতের লেখা শেখান।

হাতের লেখা সে নিজেই পাঠশালায় শিখিয়েছিল। কিন্তু এটা তার চিন্তার বিষয় নয়। সে নিয়োগীমশায়ের দিকে ঝুঁকেছে, তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করছে। তিনি যেমন দয়াবান তেমন যদি নরম হতেন। কিন্তু তিনি দলাদলির দিকে চলেছেন। কৈলাসের আতঙ্ক হল—এ রকম চলতে থাকলে সে নিয়োগীমশায়ের দলে গ্রামের অন্য অনেকের বিরুদ্ধে গিয়ে পড়তে পারে। উদাসীন, নিস্পৃহ শিরোমণি, আর ক্রুদ্ধ অপমানিত শিরোমণি এক নয়। কী হবে তখন চারুর?

ভয়ে-ভয়ে কৈলাস বলল, 'চরণ, তুমি ধর্ম-টর্ম বোঝো'?

'তেমন বুঝি কোথায়'?

কথাটা এগোল না। কৈলাসের মনে তার মেয়ে চারুই ফিরে এল : দ্রুত চলেছে এমন চারু, দ্রুত কাজের হাত চলেছে এমন চারু, হাস্যময়ী এক চারু, যার হাসি দেখে তার দুঃখ বোঝা যায় না। কিন্তু সে আজ মনকে ভেসে যেতে দেবে না। গোপনে চরণকে পাওয়া গিয়েছে। চরণের একরকম বেপরোয়া সাহস আছে যা এ-গ্রামে দুর্লভ। ভাবো, নিজের বিধবা ভ্রাতৃবধূকে প্রকাশ্যে বিবাহ করা! কিন্তু কৈলাসের চোখ দুটি ছলছল করে উঠল।

তার অনুভূতিতে এক কান্না উঠল—ও মা, উমা, পাষাণ বলেই কি সইবে? তা সত্ত্বেও মনকে শক্ত করে সে বলল, 'আচ্ছা, চরণ, তুমি কি জানো, সুরেন সাঁপুই কী জাতি? বামুন কায়েত নয় বোধ হয়? তোমরা তো একসঙ্গে ওঠো বসো, খাওয়া-দাওয়া করো?

চরণ বলল, 'জাতি তো জানি না পোনমশাই, আর আড্ডায় অত বিচারও নেই'।

'চরণ, শুনলাম, নিয়োগীমশায় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু সুরেন হেঁসেলে ঢোকে, খায়'?

'ওদের সমাজে ওসব চলে'।

এতক্ষণে কৈলাসের চিন্তা যেন একাগ্র হল, আব তার তীক্ষ্ণতায় সে ভীত হয়ে এদিক-ওদিক চাইতে লাগল। নিয়োগীর স্ত্রী কাল বিকেলে বেড়াতে এসেছিলেন। তখন চারুর মাকে অনেক কথার মধ্যে বলেছেন—সুরেন সাঁপুই, যে নাকি রাজবাড়িতে কাজ করে, আশি টাকা বেতন পায়, যার স্ত্রী একটিমাত্র শিশু রেখে দু বছর হয় গত হয়েছেন, সেই সুরেন্দ্রর বয়স কখনও-ই পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। সে নাকি নিয়োগীর বাড়িতে চারুকে দেখেছে; দেখে বলেছে বেশ মেয়ে চারু।

চরণ বলল, 'আমি এখান থেকে কাট করব পোনমশাই'।

কৈলাস তার এই পুরনো ছাত্রটিকে যেন ইংরেজি ছড়াই পড়াচ্ছে এমনভাবে বলল হেসে, 'কাট, কাট, কাট, কাটান'।

চরণ চলে যাওয়ায় সে যেন বেঁচে গেল। বলল, 'এসব কি লোকজনের মধ্যে ভাবা যায়'? কিন্তু নির্জনে ভাবতে গিয়েও সে থরথর করে কেঁপে উঠল। হে ঈশ্বর, করুণাসিন্ধু, রক্ষা কর, রক্ষা কর।

সে কী করে চারুকে সুরেনের স্ত্রীরূপে কল্পনা করল! কৈলাসপণ্ডিতের শুকনো গাল বেয়ে জলের ধারা নামল। পথের উপরে দাঁড়িয়ে যেন চারুকেই বলছে এমনভাবে যুক্তকরে কেঁদে উঠল : ও মা, ভবদারা, পাষাণ ফেটে যায় দ্যাখো।

তখন চরণের খুব তাড়াতাড়ির সময়। কৈলাসপণ্ডিতকে ছাড়িয়ে এসে সে খুব তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। তার নিজের কৃষাণরা আসবে কাজকর্মের হিসাব দিতে, রোগীরা আসবে ডিসপেনসারিতে, ওদিকে রিহার্সালেও যাওয়া দরকার। এসব কাজ না-থাকলেও তাকে তাড়াতাড়ি করতে হতো। সে জানে এ-সময়ে বনদুর্গা মাঝে মাঝেই তার শোবার ঘরের জানলায় এসে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করলে স্বীকার করে না।

কয়েক পা গিয়ে সে ভাবল, সে পোনমশাইকে ঠকায়নি। ধর্ম সম্বন্ধে সে কিছুই কি জানে? আত্মা, পরমাত্মা, দেব দেবী, ব্রহ্ম—এসব কথা সে শুনেছে। কলকাতা-ফেরত গৌরী, বেজো এরাও, সুরেনবাবু, নরেশবাবু তো কলকেতারই মানুষ, নিয়োগীমশায় তো তাকে বাইবেলই পড়ান যা ধর্মেরই বই, কাজেই ধর্মের কথা উঠে পড়েই। সে-ও কালই এক ফাঁকিবাজ ক্ষেতমজুরকে বলেছিল—অতটা নয়, ধর্মে সইবে না।

কিন্তু ধর্ম বলে কি কিছু সত্যিই আছে যা থেকে অন্যায়ের পাপের শাস্তি হয়? কে শাস্তি পায়? সেই আত্মা বলেই কি কিছু আছে? পায় নাকি ডানকানরা শাস্তি? নাকি ওদের ধর্মে তেমন করে মানুষকে পীড়ন করা অন্যায় নয়? পাপ হয় না, বাঘ মানুষ খেলে যেমন তার পাপ নেই, যেমন আমরা মোষ-গোরুকে পিটলে পাপ নেই?

আর আত্মা? ... চরণ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। শিরোমণি আজ নতুন ধরনের কথা বলেছেন। মানুষ নাকি দিবিশ্চ্যুত দেবতা নয়। পশু থেকে উঠছে। নিয়োগীমশায় আবার যেন বাইবেলের গল্পের মতো খানিকটা বিশ্বাস করেন। মানুষ নাকি আবার অমৃতস্য পুত্রা। ডানকানও? ওদিকে মানুষ যে দেবত্বে যাবে শিরোমণির শরীরটা দ্যাখো। তার আর কী হবে? তবে কী আত্মা?

আত্মা সম্বন্ধে বলা ভালো নয়। নিজে সে একদিন বলেছিল। বনদুর্গা বলেছিল একদিন ঘাট থেকে ফিরে—আমাদের সেই পোস্টমাস্টার গোবর্ধনের কথা মনে পড়ে, চরণ?

মনে না-পড়ার কথা নয়। সে তো একইসঙ্গে তার আর বনদুর্গার বন্ধু ছিল। তাদের বিবাহ তো তারই উদ্যোগে।

এখন তো জানাই যাচ্ছে বুজরুকের সঙ্গে সেই চলে যাওয়ার পরে আর কখনও সে ফিরবে না। কিন্তু বনদুর্গা জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা চরণ, আবার কখনও কি গোবর্ধনবাবুর সঙ্গে আমাদের দেখা হতে পারে'?

চরণের বলা উচিত ছিল, তা হয় না বলেই আমরা শোকে কাঁদি। কিন্তু সে বোকার মতো বলেছিল, 'হবে বইকি, আমাদের আত্মা আছে না'?

রাত্রিতে ছেলে ঘুমালে বনদুর্গা চরণের বিছানায় এসেছিল। সে চরণের বক্ষসংলগ্না, কিন্তু তার চোখ দুটি প্রদীপের আলোয় অন্য সময়ের চাইতে আয়ত মনে হচ্ছিল। সে বলেছিল—আচ্ছা চরণ, তোমার সেই দাদার সঙ্গেও কি আবার দেখা হতে পারে, আমার কিংবা তোমার?

একটা অব্যক্ত নিষ্ঠুরতা আছে যেন কোথাও আত্মার ব্যাপারে, যার হিসাব আমাদের পৃথিবীর হিসাবকে তছনছ করে দেয়। আত্মা কি নিঃসঙ্গ যেমন সে মরেলগঞ্জের অত্যাচারে বিষণ্ণ বনদুর্গার পূর্ব-স্বামী, তার সেই জ্ঞাতি-ভ্রাতাকে কখনও-কখনও কল্পনা করে?

চরণ তার বাড়ির কাছে এসে গিয়েছিল। জানলায় বনদুর্গার চোখ দুটিকে দেখার আশায় সে চোখ তুলল, সে বরং তার বাড়ির বাইরের বারান্দার পাশে ঘোড়ার পিঠে একজনকে দেখতে পেল।

চরণ সাগ্রহে এগিয়ে বলল, 'গোপালদা যে, কখন এলে? বসোনি কেন? ঘোড়ার পিঠে রয়েছ?

গোপাল বলল, 'তোমার সঙ্গে কইতে এলাম, চরণ, বেশকিছুক দিন মরেলগঞ্জ যাচ্ছনি। সেখেনে তোমার ভুঁই ফাঁকা, চাষ পড়ছে না'।

চরণ সলজ্জভাবে বলল, 'ঠিয়াটারের রির্সেল নিয়ে পড়েছি, আর কয়েকদিন। তারপরেই ভাবছি... এস, বসিগে, পান-তামুক খাও'।

'না গো, চর চারিদিগে'।

'এখানে চর কোথাকে? নদী ডেরকোশ'।

'ভালো, ভালো'। গোপাল গলা নিচু করল, বলল, 'ডানকান এবার দাদন দিচ্ছে নি'।

চরণ বারান্দায় উঠতে থমকে দাঁড়াল। একমুহূর্তে তার মনের আবহাওয়াই যেন বদলে গেল। থিয়েটার, ধর্ম, বনদুর্গা এসব থেকে অনেক দূরে এই এক জায়গা। তার মুখটাই যেন সারাদিনের রোদে কালো এবং ক্লান্ত হয়ে উঠল।

তা সত্ত্বেও সে হাসল। বলল, 'বেশ যা হোক, না-দেয় তোমার কী'?

গোপাল বলল, 'মনোহর শা কইছে বিঘে প্রতি দু-দশ টাকা ঋণ দিতে পারে সাহেবকে ধরাধবি করলে'।

'কেন, নীলের যন্তর কি তুলে দিচ্ছে'?

'অনেক কইছে। কইছে নীলের দাম পড়ছে, ফাটকায় মার খেয়েছে সগলেই, কাব-ঠাকুব কোম্পানিই বরবাদ, দাদন আর হবে নি। বিঘেতে হদ্দ দশ টাকা ধার পেতে পারো'।

চরণের ধোঁকা লাগল, বলল, 'রোসো-রোসো, এর মধ্যে প্যাঁচ আসছে। অমন অখিদে হয না। জমি বাঁধা দিয়ে ধার? ভাবতে হবে, গোপালদা'।

'কিন্তুক ধার নেওয়া তো শুরু হয়েছে'।

চরণের মুখ শুকিয়ে উঠল, বলল, 'ভেবে দ্যাখো গোপালদা, ধার নয় নিলে, শুধবে তো সেই নীল বেচে? কিনবে তো সেই ডানকান? যদি বলে কেনার গরজ নি। যদি এমন বলে এক বিঘার নীলের দাম ঋণের টাকার কম হয়? সে মণ প্রতি দাদনের চাইতে খারাপ। না, গোপালদা, ভালো ঠেকছে নি। ঋণ নিও না। এখন তো সকলের হাতে কিছু ধান হবে। অন্তত পিছিয়ে দাও না ধার নেওয়া'।

গোপাল কম অভিজ্ঞ নয়, বলল, 'ধান বেচে এগোতে কইছো, কজনা পারবে? খাওযাব ধান বেচে, শেষে? সে ধান সগলে হাটে আনলে তার দামও পড়ে, বোঝো'?

চরণ ভাবতে লাগল। বলল, 'এতে কিন্তুক শয়তানি আছে,—গোপালদা—কলকেতার শয়তানি। গত বছরের গোলমালের কথা ভাবো। যশোব-নদের কৃষকেরা এককাট্টা হয়েছিল। আমার মনে হচ্ছে তো নীলে-শালারাও এককাট্টা হচ্ছে। দু'সন নীল আমদানি কম ছিল, দাম কমে কেন'?

গোপাল বলল, 'তোমার তো পুবো পঞ্চাশ বিঘে সেখেনে। ত্রিশে নীল কব। সব তো শুনলে, এখন'?

'আরো শুনব, গোপালদা'।

'সগলে গিয়ে একবার ডানকানকে ধরলে হয় না'!

'না। ভাবতে দাও। অমর্ত্যদা কী বলে'?

'দাবা খেলে চলতে বলছে। শোনো, চরণ, গতবার অন্য জেলার গোলমালে ডানকান নরম ছিল। এবার'?

'দাদন না-নিয়ে ইচ্ছামতো চাষ'।

'কিন্তু চরণ, শেষে যদি সে তোমার নীল না-ছোঁয়, দাদনের টাকা আদায়ের তাগিদ থাকবে না। তোমার নীল কি তখন খড়ি হবে আখার'?

শীতের বিকেল, তা সত্ত্বেও আঙুল দিয়ে কপালের ঘাম চেঁছে ফেলল চরণদাস। সে রেগে উঠে বলল, 'বললাম তো ভাবতে সময় দাও'।

গোপাল বলল, 'আচ্ছা, চরণ, এখন তুমি খাটনি করে এসেছ। দিন তিনেকে আবার আসব। তো দাবার মতোই ভেব। এ-সময়ে প্রতি সালেই দাদনের নগদ পায় চাষী। হঠাৎ দাদন বন্ধ হলে ধারই নিতে চাইবে। মনোহর শালা বলছিল কলকেতায় নাকি কমিছন বসেছে। তাতেই দাদন বন্ধ। দাদনেই নাকি সাহেবকুলের

বদনাম। সেজন্যেই নাকি কমিছন। রঙ্গ করে কয়েছে, তো দাদনের পাপই আর না। ভেবো, নগদের অভাবে চাষীতে-চাষীতে-হাহাকার পড়বে।

গোপাল চলে গেলে চরণ তার দাওয়ায় গুম হয়ে বসে রইল। ডানকানের প্যাঁচটা ধরেও ধর৩ে ারছে না। জমি খাস করতে চায় রেহানে জমি রেখে-রেখে, নাকি দাদনে ঘাটতি লাগিয়ে মণ-করা আরো কম দাদন দেবে?

বনদুর্গা দরজার আড়াল থেকে শুনছিল। গোপালের ঘোড়ার শব্দ মিলিয়ে যেতে বেরিয়ে এসে বলল, 'বসি তাহলে এখেনেই'।

চরণ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, 'চলো যাই'।

বনদুর্গা বলল, 'হাত-মুখ ধোও। রির্সেল থেকে ফেরার সময়ে একটু চুয়া আনবে।

চরণ বলল, 'দোক্তা ধরবে নাকি? তাকে কিন্তু দাঁত ...

'সাধ্যি কী দাঁত কালো করি? আমার লোভই বুঝি কম? চুয়া ধূপে দিলে সুগন্ধ বেশি হয় তুলসীতলায়। আর শোনো, তোমার ঠিয়াটার দেখতে কিন্তুক আমি যাবই, আর ছেলে নিযে। আমাকে একটু ভালো দেখে বসার জায়গা দিতে হবে। রানীমার জন্মতিথি কিন্তুক এসেই গেল।

দ শ ম প রি চ্ছে দ

তখন রাজনগরের সবচাইতে বড় সংবাদ রানীমার জন্মতিথির উৎসব। তা যে সমাসন্ন তা ক্রমশই গ্রামবাসীদের চালচলন কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছিল। রাজনগর আর তার নিকটবর্তী গ্রামগুলোর পণ্য-উৎপাদকেরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

মুনিষ লেগেছে মাটি ঢেলে পিটে গ্রামের প্রধান পথগুলোকে সমান করতে, পথেব ধারের আগাছা কেটে তুলতে। অত বড় রাজবাড়ি সাফ-সুতরো করা, রং করা এসব তো আছেই। যারা কিছু করছে না তারাও আলো, আতসবাজি, ভোজ, থিয়েটারের চিন্তায় উত্তেজিত আলাপ করছে। গ্রাম ভেঙে আসবে সেই সন্ধ্যায় রাজবাড়িতে।

প্রকৃতপক্ষে বলা যায় না এ-রকম কেন হতো। বোধ হয় সেবার উৎসবে আমন্ত্রিতদের মধ্যে রাজনগরের একজনই মাত্র যোগ দেয়নি। অন্যান্যবার বাগচী অনুপস্থিত থাকত। সেবার, তার ডায়েরিই প্রমাণ, সর্বরঞ্জনপ্রসাদই ছিল একমাত্র আমন্ত্রিত যে যায়নি।

উৎসবের দিন সকালে, ছুটির দিন, একটু বেলায় ব্রেকফাস্ট শেষ করে উঠেছে তখন বাগচী, সর্বরঞ্জনপ্রসাদ তার কুঠিতে এসেছিল, তার কথা অনুসারে, সম্মান জানাতে। রবিবারে ছুটি থাকে বটে, কিন্তু সকালগুলো তার প্রার্থনাতে কাটে, এবং সে অনুমান করে হেডমাস্টারসাহেবেরও তাই হয়। আজ অন্য একটা ছোট্ট প্রশ্ন তার মনে নেই এমন নয়।

এসব আলোচনার পর সে একটু চিন্তা করে নিয়ে সেই প্রশ্নটায় এল। সূত্রপাতে বলল, 'মিস্টার ওসুলিভানের সঙ্গে দেখা হল। অনেকটা আলাপ করলেন'।

মিস্টার শব্দটা বাগচীকে বিপথে নেওয়ায় সে জিজ্ঞাসা করল, 'কে'?

নিয়োগী বলল, 'দু-তিন দিন হয় এসেছেন আবার। এক নৌকা মদ এনেছেন নাকি'।

বাগচী বলল, 'ওহো, ওসুলিভান! এত আগেই এসে গিয়েছে? তা তো আসবেই, সে তো ফেলিসিটার

নামে মদ-ব্যবসায়ীর কর্মচারী। এই প্রথম দেখলেন বুঝি? ওসবই বোধ হয় মরেলগঞ্জের জন্য'।

নিয়োগী বলল, 'শুধু কি তাই, রাজবাড়িতেও আলো আতসবাজি ইত্যাদিতে পাঁচ হাজার টাকা খরচ হবে। সেসবেও আর এক নৌকো'।

বাগচী হাসিমুখে বলল, 'তাহলে এজন্যই তাড়াতাড়ি এসেছে। আলো আতসবাজিতে এমন অনেক খরচ হয় বলেই গ্রামের লোকেরা তার প্রতীক্ষা করছে। আমাদের কাছে পাঁচ হাজার টাকা অবশ্যই অনেক, এক বৎসরে উপার্জন হয় না'।

'তাহলেই দেখুন। আর তা শুধু এক বীভৎস পুতুলপূজার আড়ম্বর বাড়াতে। কী অপব্যয়, অর্থের কী অপচয়! আশ্চর্য, গ্রামের লোকেরা একটা প্রতিবাদ করে না, বরং নির্লজ্জের মতো উত্তেজিত! ভাবতে গিয়ে আজ সকালেই মনে হল, এসব টাকাও তো রায়তকে শোষণ করে। উৎসব তো রাজবাড়ির, তোমাদের কী? এমন নির্বুদ্ধিতা দেখলে রাগ হয় না'?

বাগচী আলাপটাকে হালকা রাখার চেষ্টায় একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'রায়তের কাছে খাজনা পৃথিবীর সব দেশেই এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়, তাই না? তাছাড়া যদি ভেবে দেখেন, ভগবানই যেন মানুষকে কেমন নির্বোধ করেছেন! বিখ্যাত একটা মন্দির বা চার্চের ছবি দেখলে আমরা খুশি হই, অন্যের বাগানে ফুলের সমারোহেও তা হই, আকাশে রামধনুর মতো অলীক নিয়ে তো কবিতাই আছে। হিমালয়ের কাছে গেলে সে আমাকে ভ্রূক্ষেপও করে না, অথচ তার জন্য আমার বলে গর্ব বোধ হয়'।

সর্বরঞ্জন আলোচনায় সুবিধা করতে পারল না। সে বললেও, 'তাহলেও কিন্তু এই উৎসবে, আমন্ত্রিত হলেও আমাদের যাওয়া উচিত হচ্ছে না। আপনি কি এই উৎসবে যোগ দিয়ে থাকেন'?

বাগচী বলল, 'এবার যাব স্থির করেছি'।

নিয়োগীকে চিন্তিত দেখাল। একটু পরে সে বলল, 'আমার এই প্রথম। শিক্ষক হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েও না-যাই যদি তবে তা কি রাজবাড়ির, বিশেষ দেওয়ানজির, অসন্তুষ্টির কারণ হয়'?

বাগচী বলল, 'তা আমার মনে হয় না। আমন্ত্রিতদের কে এল গেল তা খেয়াল রাখার জন্য নিশ্চয়ই কেউ-কেউ আছেন, কিন্তু আপনি না-গেলে তা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলবে মনে করি না'।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে থেকে সর্বরঞ্জন ভারী মনে বিদায় নিয়েছিল।

সর্বরঞ্জনপ্রসাদ চলে গেলে বাগচী অনুভব করল, কী যেন একটা ব্যথার কথা হচ্ছিল? ও, সার্ফ—রায়ত। হ্যাঁ, নিদারুণ পরিশ্রম আর দারিদ্র্য। কিন্তু ওরাই পাবে। সে আপন মনে হাসল। না, এটা কারণ নয় যে দরিদ্র বলে পাবে। হয়তো দারিদ্র্য আর শ্রমে পাপ-বিলাসের অবকাশ কম। রোমের সেনেটার লাঙল দিয়ে জমি চাষ করত এমন গল্প আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে, সেই গমের ক্ষেতে এবং অলিভ-বাগিচায় যারা কাজ করত তারা ক্রীতদাস, যেমন এখনও আমেরিকার তুলার ক্ষেতে। হয় ক্রীতদাস, নয় রায়ত। ইংল্যান্ডে তো বটেই, ফরাসি বিপ্লবের পরেও ইউরোপে রায়ত থেকে গেল। আর তারা খাজনা দেয়। আচ্ছা, আচ্ছা, মনে-মনে এই বলে সে হাসল, খাজনা মানে ফসলের উদ্বৃত্ত অংশ-পরিবারের যা লাগে তার উদ্‌বৃত্ত। ওহো, এই উদ্‌বৃত্ত যদি রায়ত না-দেয় হেডমাস্টার খায় কী? উদ্‌বৃত্ত নিজের ইচ্ছায় দেবে এমন হয় কি? অন্যদিকে দ্যাখো, কি ইংল্যান্ডে কি ভারতে রায়ত সুখে নেই।

এটা সে-সময়ের একজনের চিন্তার প্রতিচ্ছবি হতে পারে, ব্যক্তিবিশেষের চরিত্রের এক পাশ। এমনও বলা যায়, বাগচী উৎসবে যোগ দেওয়া স্থির করেছিল বলেই তার চিন্তা এই পথে চলেছিল ; নিয়োগী উৎসবে যোগ দেবে না বলেই রায়তদের কথা তুলেছিল।

বাগচী পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখল, বসবার ঘরে যেখানে বেশ খানিকটা রোদ এসে পড়েছে সেখানে কেট চেয়ার টেনে কিছু করছে। সে আবার মনে-মনে হাসল, ওয়েল, ওয়েল, এটা সেই এমারেল্ড গাউনটা। কেপ আর গ্লাভস, দ্যাখো, গ্লাভসটাও এমারেল্ড! আর সব ঢেকে গাঢ় নীলের এই ক্যাপটা থাকবে কেটের। এটা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, দারুণ সাহসী পদক্ষেপ এটা কেটের এই নিজে থেকে

উৎসবে যাওয়া। কিন্তু পদক্ষেপটা কোন দিকে? কেট তার হালকা নীল সোয়েডের উঁচু গোড়ালির জুতোজোড়া রোদে দিতে এসে থমকে দাঁড়াল। বিবর্ণ হল তার মুখ। বাগচীও উৎকর্ণ হয়েছিল। হেসে বলল, 'ঢাকা বলে। বোধ হয় একসঙ্গে একশোটা।

একশো না-হোক পঞ্চাশ হতেই পারে। পূজার বা উৎসবের অঙ্গ হিসাবে না-হতে পারে, হয়তো তারা এতক্ষণ পুরো দলটা একত্র হয়েছে বলেই তারা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে ঢাকগুলোর মাথায় খাড়া করা চামর দুলিয়ে, দুলে-দুলে, বাতাসে হেলান দিয়ে জোড়কাঠিতে তেহাই দিয়ে হাসি-হাসি মুখে পরস্পরের ওস্তাদির তারিফ করল।

তা হতেই পারে। পূজা তো সেই মাঝরাতে, উৎসব শুরু হয়েছে ভোরের সানাইয়ে। সন্ধ্যায় তা হাউই, তুবড়ি, রংমশালের ঝাড়ে উৎসারিত হবে। হাউই-তুবড়ির উচ্ছ্বাস মিটতে-মিটতে কাছারির চত্বরে শুরু হবে নাকি ঠিয়াটার যা কলকেতায় হচ্ছে। ভিনগ্রামের আমন্ত্রিতরা আগেই জলযোগে বসে যাবে কাছারির ঘরে-ঘরে, এমনকী অন্দরেরও কোনো-কোনো হলে। রাত গভীর হবে ক্রমশ, ফেলিসিটারের চেষ্টা সত্ত্বেও অভিনয়ের আসর ছাড়া অন্যত্র আলোগুলো লালচে হয়ে আসতে থাকবে। আর তখন অন্দরে যাওয়ার পশ্চিমের খিলানের ওপারে একটা স্তিমিত ঔজ্জ্বল্য দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আর সেখানে তখন সারাদিন এখানে-ওখানে কারণে-অকারণে চমকে দিয়ে যে ঢাকগুলো বেজেছে সেসবগুলো একসঙ্গে বেজে উঠবে, পুরোহিতের উচ্চকণ্ঠের মন্ত্রোচ্চারণ শোনা যাবে, আর তা ছাপিয়ে কারো-কারো 'মা মা' ডাক।

সকাল থেকে শুরু, মাঝরাত অবধি ভিড়। সে ভিড় বাড়ে, কমে, সরে, নড়ে, আর তাতে বোঝা যায় উৎসবের কোন অংশ কোথায় গুরুত্ব পাচ্ছে। আর ভিড়ও উৎসবকে মনে করিয়ে দিচ্ছে, তা সারাদিন ধরেই। কর্মচারী, দাসদাসী, বরকন্দাজ, বরদার, এরা তো ভিড়ের সর্বত্রই, সকলেই সজ্জিত। তাদের পরনে নতুন কোরা ধুতি শাড়ি, পুরুষদের মাথায় নতুন গামছা, কারো মাথায় তা পগ্‌গ করে বাঁধা। দাসীদের মুখ পানে রাঙা, পায়ে আলতা, তাদের অনেকেই রেশমি ধোকড় পেয়েছে, কেউ কেউ পশমি বনাতও।

উৎসবের আসল ব্যাপারটা অর্থাৎ যেখানে পূজা সেখানে সকাল থেকে ভিড়ের চেহারা স্বতন্ত্র। ডাঁই-করা ফুল বেলপাতা প্রকাণ্ড রূপার পুষ্পপাত্রে বেছে দেখে সাজানো হচ্ছে। ডাঁই করা আনাজ তেমনি প্রকাণ্ড পিতলেব কাঁসার পরাতে। চাল, ডাল, মশলার স্তূপগুলোকে ঝেড়ে বেছে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া চলছে। হাত চলেছে, মাথা দুলছে, কোথাও চুড়ি-বালার শব্দ, কিন্তু কথা কম, খুবই কম, হুঁ-হাঁর বেশি নয়। সাবধান, থুতু না-ছেটোয়। এ তো সেই ভয়ঙ্করী, এই ভয়ানক দুঃসময়ে যার কঠোর কর্কশতায় লুকানো স্নেহই একমাত্র ভরসা।

এসব তো প্রতি উৎসবেই। এবার কি কিছু পার্থক্য চোখে পড়ছে? মণ্ডপে রানীমাকে দেখা যাচ্ছে না, বরং নয়ন-ঠাকরুণ মাঝে মাঝে ঘুরছে। রানী কাল তাকে গোপনে ডেকে বলেছিলেন বটে—মণ্ডপে থাকতে হবে, আমি পারছি না। মণ্ডপে যেমন নয়নতারা, অন্দরের জলযোগের হলগুলোতে তেমন হৈমী, দরবার হলের মাঝামাঝি তেমন নায়েবগিন্নি।

শীতের সন্ধ্যা ঝুপ করে নামে। বাইরে আকাশে কিছু আলো, কিন্তু মণ্ডপের দরদালানে আলো জ্বালাতে হয়। প্রতিমার চোখ আর তিলক নিয়ে কিছু অসুবিধা ঘটেছে। এখানেই একদিনেই তো কাঁচা মাটির প্রতিমাকে আকারে রঙে জীবন্ত করে তুলতে হবে। কী অসম্ভব ব্যাপার! নিচের মাটি সরস, উপরে রঙয়ে চোখ ধাঁধাবে। আচার্যি-কারিগরমশায় সাগরেদ নিয়ে তুলি হাতে রং ছোঁয়াচ্ছে, পিছিয়ে-পিছিয়ে দেখছে। সন্দেহ হয়, তার চোখে কীসের চাপে জল আসছে যেন। চোখগুলি একইসঙ্গে ডাকাতের মতো তীব্র আর মায়ের মতো স্নিগ্ধ করতে হবে না? আচার্যিমশায় ফিরে-ফিরে নয়নতারাকে বলছে, 'দেখুন, মা,

এবার। ভয়ের কথা বইকি! মাঝরাতে রানীমা নিজে এসে প্রতিমার দিকে মুখ করে বসবেন না? এখন প্রতিমার তিলফুল নাকে সোনার নথ ওঠেনি, কানে দোলেনি কাঁধছোঁয়া কুণ্ডল'!

৩

উৎসবটা ধর্মের সঙ্গে জড়িত, তারা বিশেষ নিমন্ত্রিত হলেও ক্রিশ্চান। কোন দিকে গেলে অশোভন হয় না এ-রকম চিন্তা ছিল বাগচীর। রাজবাড়ির সদর-দবজায় পৌঁছলে যারা অভ্যর্থনায় তারা তো এগিয়ে এলই, নায়েবমশাইও তাদের দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে নির্দেশ দিল, 'বাগচীসাহেবকে নিয়ে আমার কামবায় বসাও। মেমসাহেবকে বড়গিন্নির কাছে পৌঁছে দিও। নাকি, আপনারা দেওয়ানকুঠিতে যাবেন'?

বাগচী মনে-মনে বলল, সমস্যাটা অন্যরকম হল দেখছি। সে বলল, 'এ দিকেই তো আলো, আলোরই তো উৎসব'।

সন্ধ্যা থেকে আলো কিন্তু রাত যত বাড়ছে তত যেন উজ্জ্বলতর। যারা আগেও দেখেছে তাদের মনে হচ্ছে সেবার কাছারির বারান্দাগুলোতে, কামরায়-কামরায়, রাজবাড়ির ঘরে-ঘবে এত আলো ছিল না। অন্যদিকে সেবারের দেওয়ানকুঠি যত উজ্জ্বল ছিল এবার তা নয়। অনুমান সত্যই হবে। শিশাওয়াল তো এখন ঘুরছে এখানে-ওখানে তার সেই সাহেব সহকারী নিয়ে এখন এখানে একটা বিচিত্র চেহাবার ডোম, ওখানে একটা দেয়ালগিবি বসিয়ে চলেছে। কাছারি আর বাজবাড়ির মাঝের চত্বরে সেবাব সামিযানাব নিচে বেলদার ঝাড়ের আলো, সামিযানার থামে-থামে হাবিকেন ঝুলিয়ে বিদ্যাসুন্দবের পালা হযেছিল। এবার সেখানে থিয়েটাবের মঞ্চ আলোয ঝকঝক করছে।

একজন কর্মচারী কেটকে পথ দেখিয়ে বাজবাড়িব দিকে নিযে গেল। বাগচী যেখানে বসল কাছাবিব সেই ঘরে গ্রামের বিশিষ্টদেব আসন। বাগচী যেন চোখ বুলিয়ে দেখল, নিয়োগী সেখানে কোথাও আছে কিনা। নায়েবমশাই সেখানেই উঠে এল, বলল, 'একটু বসে নিই, বুড়ো হযেছি তো ; কী বলো'?

নায়েবমশাই বসতেই তার হুঁকাবরদার তামাক নিযে এল। সে-ই বাগচীকে জিজ্ঞাসা কবল তাকেও তামাক দেওয়া হবে কিনা। বাগচী পাইপ বার করল, হেসে বলল, 'আমাব হুঁকো সঙ্গেই থাকে'।

একজন অভ্যাগত জোতদার বলল, 'আমাদেব এই গ্রামে আর-একজনকে মাত্র এমন দেখা যেত, শিরোমণিমশায়ের জ্যেঠা সার্বভৌমকে'।

'তিনিও পাইপ নাকি'? বাগচী জিজ্ঞাসা করল।

'না, থেলো হুঁকো থাকত সঙ্গে, কিন্তু তেমন নিটোল ছোট খোলটি পাওয়া কঠিন'।

একজন রসিকতা করে বলল, 'কেউ জাত মেবে দেবে ভয় ছিল নাকি'?

'সাধ্য কী'? প্রথমজন বলল, 'ব্রাহ্মণের হুঁকোতেও খেতেন না। বলতেন উচ্ছিষ্ট উচ্ছিষ্টই, তা ব্রাহ্মণের হলেও'।

নায়েব বলল, 'কড়া লোক ছিলেন। শুনেছি, নিজের গৃহবিগ্রহ নারাযণের প্রসাদ ছাড়া অন্য পূজার প্রসাদও পেতেন না'।

মনে হল পূজার প্রসাদ দেবতার উচ্ছিষ্ট কিনা এ নিয়ে আলোচনা হবে। কিন্তু কাছেপিঠে সদর-আমিন সোনাউল্লা কাজি ছিল। পিছন থেকে সে বলল, তিনি কি, অর্থাৎ তাঁর কি ব্রাহ্মণী ছিল না'?

'তা ছিল বইকি'?

'তাহলে আর উচ্ছিষ্ট মুখে না-দেওয়ার প্রতিজ্ঞা থাকে না, জী'।

'মানে'?

নায়েব বলল, 'আ, সোনাউল্লা'!

মুখের হাসি আড়াল করে নায়েব উঠে পড়ল। বলল, 'তুমি এদিকে আছ, সোনাউল্লা, আমি ওদিকে

দেখি। যিনি যখনই যান, কিন্তু জলযোগ না-করে নয়, দেখো'।

কুল্লাযুক্ত শিরপেঁচ দুলিয়ে হেসে সোনাউল্লা জমিয়ে নেবে মনে হল, কিন্তু একজন সোনাউল্লার কানে ফিসফিস করে বলল, 'মুসলমান জোতদাররা যেখানে জলযোগে বসেছেন সেখানে একবার যাওয়া দরকার। কিছু ত্রুটি থাকায় তাঁরা মুখ টিপে হাসছেন। সুমারনবিশ ঠিক পারছেন না। পীরজাদা আপনাকে বলতে বললেন'।

ঠিক এই সময়েই, সদর-দরজার পাশে পটপট দুমদুম শব্দ হল। মঞ্চের সামনে যারা হৈ-হুল্লোড় করছিল সেই ছেলের দল হো-হো করে ছুটল সদর দরজার দিকে। কাছারির বারান্দায় ভিড় করে দাঁড়াল অনেকে। রাজবাড়ির আলোর মালার নিচে-নিচে নড়াচড়া দেখে বোঝা গেল সেখানেও আতসবাজি দেখার জন্য ভিড় হয়েছে।

একতলার হলঘরে, যাকে দরবার হলও বলা হয়, সেখানেই মহিলা অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা। সেখানে তেমন ভিড় ছিল না। কারণ সেখানে কিছুক্ষণ থেকেই মহিলারা প্রতিমা দেখতে অথবা জলযোগের ঘরে সরে যাচ্ছে। তাহলেও দরবার-ঘরের সৌন্দর্য, বিশালতা ইত্যাদির আকর্ষণ আছে। কিছু কিছু স্ত্রীলোকের যাওয়া-আসা ছিলই। বিশেষ তারা তো ছিলই যাদের সকলের পরনে একইরকম লালপাড় শাড়ি এবং গায়ে রেশমের চৌখুপি ধোকড়। কেট বুঝল, এরা কর্মচারী। সে-ঘরে একজন বর্ষীয়সীরই প্রাধান্য। কেটকে সেই কর্মচারী তার কাছে এনে উপস্থিত করে চলে গিয়েছিল। কেট অনুমান করেছিল, রানী অবশ্যই নয়, কারণ সেই বর্ষীয়সীর কপাল-ছোঁয়া সাদা চুলে চওড়া করে দেয়া সিঁদুর, পরনে হালকা রঙের হলেও উজ্জ্বল ব্রোকেড এবং কণ্ঠা থেকে বুক-ঢাকা অলংকার স্তরে-স্তরে যেন ব্লাউজের কাজ করছে।

লোকের কথায় ঠাহর করল কেট উনি বড়গিন্নি। ইংরেজিতে তর্জমা করে অনুমান করলে চিফ মেট্রন হবে। তার অবশ্যই জানার উপায় ছিল না তিনিই দোর্দণ্ডপ্রতাপ নায়িব-ই-রিয়াসতের স্ত্রী।

কেটকে তাঁর পাশের শোফায় বসতে বললেন।

কেটের সঙ্গে গ্রামের কজনেরই-বা পরিচয়! কিন্তু সে তো কৌতূহলের বিষয়। কাজেই তার চারিদিকে কিছু ভিড় হল আবার।

যখন কেট বলল, 'আপনিই বড়গিন্নি'? তখন এই ভাষা শুনে এমনকী বড়গিন্নির দূরে সরে যাওয়া দৃষ্টি যেন হেঁটে এসে কেটের সিঁদুরহীন কপালে দস্তানায় ঢাকা পুরো বাহুতে পড়ল। কিন্তু বড়গিন্নির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেল যখন তার সেই অনুত্তেজিত মুখে, বয়স এবং সাদা চুল সত্ত্বেও, ব্রীড়ার গভীর রং দেখা দিল।

বড়গিন্নি বলল, 'রানীমা বড়গিন্নি বলেন। আসলে আমি গোবর্ধনের মামি। আমি কি আপনার নাম জানি'?

কেট বলল, 'ক্যাথারিন'।

বড়গিন্নি বলল, 'সুন্দর নাম। ভারি সুন্দর নাম। তা, শাড়ি পরে গণেশ কোলে বসলে কাত্যায়নীর মতোই দেখাবে'।

হলঘরের ভিতরে এবং বাইরে সবকিছুই উৎসবের কথাই মনে করিয়ে দিতে থাকে। গতবার, তার আগেরবার কেমন হয়েছিল এসব আলোচনা শুরু হল।

একজন বলল, 'কিন্তু যা আসছে তার তুলনায় এ কিছুই নয়'।

আর-একজন বলল, 'আমাদের রাজকুমারের বিয়ের কথা নাকি'?

বড়গিন্নি বলল, 'হ্যাঁ, সে উৎসবও নিশ্চয়ই অনেকদিন মনে রাখার মতো হবে'।

অন্য একজন বলল, 'বিয়ের ঘটকালি নাকি ব্রহ্মঠাকরুণ করছেন? তিনি নাকি নতুন আসা নিয়োগীমাস্টারের বোন'?

একজন বলল, 'যোগাড়ে লোক বলতে হবে। কদিন আর এসেছে, এরই মধ্যে খোদ রানীমার দরবারে'।

বড়গিন্নি কেটে দিয়ে বলল, 'ওটা কী-আর দরকারি কথা'!

কেট কৌতূহল নিয়েই শুনছিল। আলাপটা একটু ঘোরাপথে হচ্ছে বটে, হয়তো মাধুর্যকে এমনভাবে গভীর করাই উদ্দেশ্য। সে বলল, 'এ বিষয়ে আসল কথা নয়ন-ঠাকরুণের কাছে জানা যাবে বোধ হয়'।

অনেকেই এদিক-ওদিক চাইল যেন।

কিন্তু আলাপটা এগোল না। পটপট চড়বড় করে বাজি ফুটে উঠতেই আতস দেখবার জন্য নিমন্ত্রিতদের অধিকাংশ দরবার-ঘরের বাইরে চলে গেল। শুধু পটকা নয়, ফানুস, হাউই, ফুলেন তুবড়ি, রংমশাল। কেট বসে-বসে দেখছিল। কিন্তু রংমশাল যখন কখনও নীল, কখনও লাল, কখনও সবুজ আলোয় কাছের লোকগুলিকে রঙে স্নান করাচ্ছে, 'ভারি সুন্দর তো' বলে সে উঠে দাঁড়াল।

বড়গিন্নি বলল, 'সামনের বড় জানলাটার কাছে গেলে আরো ভালো দেখা যাবে'। এই বলে সে নিজেও তেমন একটা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

যারা বাইরে গেছে তারা বাইরে, ঘরে যারা ছিল তারা কোনো-না-কোনো দরজা বা জানলার কাছে। কেট একটা জানলায় একাই ছিল। আতসবাজি যখন জ্বলে ওঠে তখন যারা তৈরি করে তারাও অবাক হয়ে যায়।

হঠাৎ যেন কেউ পাশে এসে দাঁড়িয়ে, আরো ভালো করে দেখার জন্য, অথবা আনন্দের উত্তেজনায় কেটের হাতের উপরে হাত রাখল।

একটু ফিরে দাঁড়াল কেট। বাইরের রংমশালের আলো এসে পড়েছে মহিলাটির মুখে, সবুজ পান্নার আলো, কিংবা তা কি তার গলার পান্নার কণ্ঠীর থেকে? মাথায় ঈষৎ ঘোমটা, ঘোমটা ঘিরে রক্তলাল শাল। কী বলবে, কী বলা উচিত ভাবল কেট এক মুহূর্ত। রংমশালটা নিবতে সাদা আলোয় চিনতে পেরে সে হেসে বলল, 'নয়ন-ঠাকরুন'?

নয়নতারা নিজের হাতের নিচে ধরা কেটের হাতটায় চাপ দিল। বলল, 'এসেছেন শুনেছিলাম। অসুবিধা হচ্ছে না তো'?

'না। কিন্তু এদিকে-ওদিকে চেয়ে আপনার প্রত্যাশা করছিলাম'। কেট দু' হাতে তার হাতের উপরে রাখা নয়নতারার হাতটাকে ধরল। হেসে বলল, 'এখন তো অভিনন্দন নেওয়ার সময়, আমার অভিনন্দন নিন'।

নয়নতারা একটু বিব্রত হল। কেটের চোখের দিকে সে কিছুক্ষণ চাইল। ঠিক এই সময়েই একটা বড় আকারের ফানুস উঠতে শুরু করায় তার সুবিধা হল, সে বলল—ওই দেখুন, ওই দেখুন, ভারি সুন্দর, নয়'?

ফানুসটা অবাক করে দিয়ে, প্রথমে ধীরে-ধীরে, পরে বেশ জোরে আর সোজা উঠে গেল। কিন্তু আচমকা কেঁপেও গেল।

কেট বলল, 'সংবাদ পেয়ে আমি যে কী সুখী হয়েছি, আমাদের দেশে হলে আপনার ঘোমটা সরিয়ে ওই সুন্দর গালে চুমু দিতাম'।

'কীসের সংবাদ'? নয়নতারা জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু হঠাৎ যেন নিজেই কিছুটা আন্দাজ করল, তার গাল দুটোর যতখানি চোখে পড়ে তা যেন রংমশালের আলো পেয়ে লাল হল।

'কিংবা', কেট বলল, 'রাজকুমার নিজে বলেননি বলে আমাদের চুপ করে থাকা উচিত? কিন্তু আপনিও তো বলেননি'।

সাঁ করে একটা হাউই উঠল চমকে দিয়ে, দুম করে সেটা ফাটল, লাল-নীল-সবুজ আলোর কয়েকটি বল শূন্যে নেচে-নেচে ফেটে-ফেটে আকাশকুসুম রচনা করল, তারপর নক্ষত্রচ্যুতির মতো নিবে-নিবে খসে-খসে পড়ল।

আর তাতেই যেন অন্ধকার হল। তখন নয়নতারা যেন কারো ডাক শুনতে পেয়ে একটু গলা তুলে বলল, 'যাচ্ছি'।

কেটের হাতের উপরে এবার একটু জোরে চাপ দিয়ে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি চলে গেল। তার শাড়ির মৃদু খসখস শব্দ হল একটা।

৪

আতসবাজির কাছে আসতে হরদয়ালের আধ ঘণ্টা দেরি হল। সে বাগচীকে দেখতে পেয়ে বলল ডানকানের জন্য অপেক্ষা করতেই দেরি। এবার ওরা আসছে না দেখছি। সেই কীবল ছোকরা বোধ হয় কালীপূজা নিয়ে আরো ঠাট্টা করেছে।

বাগচীর সেই লাঞ্চের কথা মনে পড়ল যেখানে ডানকানের কালীপূজা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। সে কুণ্ঠিত হয়ে ভাবল বিষয়টাকে। ডানকান ক্রিশ্চান, তা মনেপ্রাণে না-হোক, এতদিন এ উৎসবে যোগ দিত, এবার দিল না। এটা কি কোনো নতুন পবিস্থিতির সূচনা? কিন্তু কী আশ্চর্য, তার চোখের সামনে একটা ফুলবাগান যা বিভিন্ন রঙের আলোর তৈরি। বাগানটা মিলিয়ে গেল। হরদয়াল হাসিমুখে বলল, 'আপনি কী ঘুরে-ঘুরে দেখেছেন? আসুন, আমরা রাজবাড়ির কাছে যাই'।

তারা উঠে যেদিকে থিয়েটারের মঞ্চ সেদিকে হাঁটতে শুরু করল। হরদয়াল বলল, ' মিসেস বাগচীও বোধ হয় ঘুরে-ঘুরে দেখেননি'?

তারা যখন কাছারির চত্বরের মাঝামাঝি হরদয়াল একজন দাসীকে দেখতে পেয়ে বলল, 'বাগচীসাহেবের মেম অন্দরে আছেন। তাঁকে বলো আমরা এখানে অপেক্ষা করছি'।

গ্রামে মেমসাহেব তো একজনই, কাজেই খুঁজে বার করে সংবাদ দিতে দাসীর অসুবিধা হল না। ফলে থিয়েটারের সামিয়ানার কাছাকাছি হরদয়াল এবং বাগচী পৌঁছতেই কেট এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিল।

তখন হরদয়াল বলল, 'এবার একটা কথা বলি। যাঁরাই উৎসবে এসেছেন তাঁদের সকলেরই জলযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি ভাবছিলাম মিসেস বাগচী এবং আপনার জন্য সে-ব্যবস্থাটা আমার কুঠিতে কেমন হয়'?

কেট বলল, 'না-না, এসবের জন্য আপনি ভাববেন না। ওটা কিছু নয়। আলোটাই আসল'।

হরদয়াল বলল, 'আপনাদের বিশেষ ব্যবস্থা নায়েবমশায় নিশ্চয়ই করে রেখেছেন, তার বদলে যদি আমার কুঠিতে একটা ছোট্ট ডিনার—জাস্ট টু কিপ এ লোনলি ব্যাচেলর কম্পানি'?

বাগচী হেসে ফেলল। এরপরে আর আপত্তি করা চলে না। নটায় সে ডিনার হবে স্থির করে তারা আলোকজ্জ্বল প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেল।

তারা একটা উঁচু আলোকিত খিলানের পথে এসে পড়ল। এরকম খিলান আরো আছে, সেগুলোর নিচে দরজা এবং সম্মুখে সিঁড়ি, এটার তলায় একটা প্রকাণ্ড ঝাড় যা নিচের পথটাকে আলোকিত করে রেখেছে। হরদয়াল বলল, 'এদিকেই পূজা'।

বাগচী বলল, 'দেখবার মতো কাছে যাওয়া যায় না-ছুঁয়ে? যাবে কেট? মনে করো ডানকান বেকায়দায় একবার কালীপূজা করেছিল'।

এরপরে যা ঘটল তা ইতিহাসের পক্ষে অপ্রয়োজনের। তারা কাছাকাছি যেতে যেন জোড়ায়-জোড়ায় অনেকগুলো ঢাক বেজে উঠল। নাচছে ঢাকিরা। ঢাকের উপরে চামরগুলো তালে-তালে নাচছে, লাফাচ্ছে, ঢাকিদের মাথায় বাঁধা রঙিন নতুন গামছার পগ্‌গ দুলছে। প্রতিমার দালানে আলোয় আলোময়। প্রতিমার দালানের মুখোমুখি রকে অনেক স্ত্রীলোকের ভিড়। তাদের রেশমে আর সোনারূপায় আলো পড়ছে। তারা থেকে-থেকে বহু কণ্ঠে উলু দিয়ে উঠছে। সেই রক আর প্রতিমার দালানের মাঝখানে নিচু গলিপথ।

সেই পথে অনেক পুরুষ। তারা যুক্তকরে প্রতিমার মুখের দিকে চেয়ে। প্রতিমার দালানে লোহার রেলিংয়ে দুটি ভাগ, তা যেন প্রতিমাকে কিংবা পূজার স্থলকে পৃথক করেছে। সেই ঘেরের বাইরে একজনমাত্র মহিলা যাঁর পরনে দুধ-শাদা গরদের থান, যিনি প্রতিমার মুখের দিকে মুখ করে স্তব্ধ। ঘেরের এপারে নামাবলি গলায় দুজন পুরুষ, যারা নিশ্চয় পুরোহিত এবং তন্ত্রধার, এবং চার-পাঁচজন মহিলামাত্র। তারা একটা চালনে প্রদীপ ইত্যাদি রেখে চার-পাঁচজনে একসঙ্গে ধরে প্রতিমার মুখের কাছে তুলছে, পায়ের কাছে নামাচ্ছে। কেট একটু ঠাহর করে তাদের মধ্যে বড়গিন্নিকে দেখতে পেল।

তারা অবশেষে সেই চালন পূজার ঘেরের মধ্যে একপাশে রেখে বেরিয়ে এল। কেট অবাক হল দেখে বড়গিন্নি মুখে আঁচল দিয়ে নিঃশব্দে ফুলে-ফুলে কাঁদছে। কেট বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা না-করে পারল না।

হরদয়াল বলল, 'এসব আমরা বুঝি না। হয়তো মেয়ে বাড়িতে আসছে এ-রকম অনুভব করছেন। হয়তো সঙ্গে-সঙ্গে নিজের দুঃখের কথাও সেই মেয়েকে বলতে চাইছেন। বোধ হয় উনি নায়েবমশায়ের স্ত্রী'।

কিন্তু আলোর প্রদীপমালার মধ্যে যে মধ্যমণির মতো, যার সামনে দুজন পুরুষ অতি সন্ত্রস্তভাবে পূজার উপকরণ নামাচ্ছে, যা একইসঙ্গে সুন্দর, ভয়ঙ্কর, হাস্যময়ী, লোলজিহ্বা, লজ্জিতা অথচ দিগম্বরী।

কেটের মুখ নীল হয়ে উঠল। সে বিড়বিড় করে কিছু বলল।

হরদয়াল কী লক্ষ্য করছে তা সবসময়ে বোঝা যায় না। বাগচী কথা বলার জন্য কেটের মুখের দিকে চেয়েছিল। সে বলল, 'তোমার কি গরম লাগছে ডারলিং'? এই শীতেও অনেক প্রদীপে জায়গাটা গরম।

হরদয়ালও বলল, 'হ্যাঁ চলুন, আমবা ফাঁকা জায়গায় যাই'।

রাজবাড়ির বাইরে কাছারির দিকে আতসবাজি তখনও। কিন্তু লোক-চলাচলে অনুমান উৎসবের টান এখন অন্যদিকে। তাদের পথনাটকের সামিয়ানার পাশ দিয়ে। শুধু ভিড় নয়, বাজনাও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বেহালা, সারেঙ্গি কোঁ-কোঁ করছে, সানাই বাঁশি বাজছে, ঢোল তাল ঠুকছে, সব মিলে একটা পরিচিত সুরের দিকে, কিন্তু তুলনায় শব্দ বেশি।

আড়াআড়ি ঘাসে-ঢাকা চত্বর পার হয়ে সামিয়ানার কাছে যেতেই সেদিকের এক কর্মকর্তা 'আসুন হুজুর ; আসুন স্যার ; আসুন ম্যাডাম' বলে অভ্যর্থনা করল।

সামিয়ানার নিচে মঞ্চের সামনে ডাইনে-বাঁয়ে কিছু নিচু সুদৃশ্য কৌচ। তারপর থেকে চেয়ার ও বেঞ্চ। সামনের সারিটা উচ্চস্তরের জন্য বোঝা যায়। রাজকুমার আসেননি। অভ্যর্থনাকারী হরদয়াল প্রভৃতিকে সেদিকে নিয়ে গেল। দেখা গেল, বাঁদিকের একটা কোচে নায়েবমশাই একা বসে, তার মুখে বিড়ম্বনা।

হরদয়াল এবং বাগচী দম্পতী বসলে নায়েবমশাই বলল, 'তবু যা হোক, একা ভয়ই করছিল।

হরদয়াল হেসে বলল, 'রাজবাড়ির প্রাচীরের মধ্যে কী ভয়'?

কিন্তু দারুণভাবে কনসার্ট বেজে ওঠায় কথা বলার সুবিধা থাকল না। কিন্তু বাজনাটা দপ করে থামল। তখন সেই অভ্যর্থনার কর্মচারী বলল, 'আর-একবার ছোট্ট একটু বেজেই পর্দা উঠবে'।

সেই অবসরে হরদয়াল বলল, 'কী নাটক হচ্ছে শেষ পর্যন্ত'?

নায়েব বলল, 'কী যেন, একেই বলে বুড়ো শালিখ...

অভ্যর্থনাকারী বলল, 'আসলে নায়েবমশাই কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না দুটো নাটক'।

নায়েব বলল, 'বেশ করেছ, বাপসকল, টাকাটা যে খরচা করলে তার যেন মান থাকে'।

হরদয়াল হেসে বলল, 'অনেক চাইছে বুঝি'?

'আর বলেন কেন? পোশাক রে, পরচুলা রে, রং রে, আবার কী ছিন-ছিনারি! তা পটো এঁকেছে ভালো। আর এবারে শিশাওয়ালও মজা পেয়েছে। সে-ও সব ঘোমটা পরা আলো দিয়েছে শুনি। ঠাহর পাচ্ছি না, কত-বা হাঁকে'!

সেই ছোট বাজনা বেজে উঠল। নায়েবমশায় আর হরদয়ালের গড়গড়া এসে গেল তাদের হুঁকা-বরদারদের হাতে। এটুকু করতে না-পারলে তাদের আর চাকরি কীসের? এখন বেশি আলাপের সময় নয়, সিন উঠে গেল। নাটকটা মনে হচ্ছে প্রহসন। নাট্যকার যেভাবে হাসাতে চেয়েছিল হাসিটা তা থেকে স্বতন্ত্র ধরনের হতে লাগল মাঝে মাঝে। স্ত্রী-চরিত্রে অভিনেতা এক ছোকরা পরচুলা নিয়ে ফ্যাসাদ ঘটাতে-না-ঘটাতে তার বক্তব্য অন্যে বলে ফেলে জিভ কাটল। কথা শেষ করার আগেই কেউ নেপথ্যে গিয়ে ওদিকের তাড়া খেয়ে গলা বাড়িয়ে বক্তব্যের বাকিটুকু বলে দিল। তা সত্ত্বেও ব্যাপারটার অভিনবত্ব দর্শকদের টানছে।

কখনও মানুষকে অটল গাম্ভীর্য নিয়ে থাকতে হয়। গড়গড়ার ধোঁয়ার আড়ালে নায়েবমশায় যেন কোন গোপন ব্যথায় পীড়িত। হরদয়াল মাঝে মাঝে মুখের উপরে হাত রাখছে, তাতে তার ঠোঁট দুটি আর চিবুক ঢাকা পড়ছে। বাগচী কিছু অনভিজ্ঞ। সে পাইপ কামড়াচ্ছে বটে, কিন্তু কি তার পাইপ, কি তার দাড়ি তার চোরাহাসি গোপন করতে পারছে না।

একবার সাধারণ দর্শকরা হো-হো করে হেসে উঠল। এতক্ষণ যে মোটামুটি ভালো পার্ট করছিল, সম্ভবত ল-মোহরার গৌরী, সে ভুল পথে তার যেখানে আদৌ থাকা উচিত নয়, সেখানে এসে এক দারুণ বিপত্তি সৃষ্টি করে দুম দুম করে পালাল। তৎক্ষণাৎ সিন পড়ল এবং দারুণভাবে বাজনা বেজে উঠল।

কেট পিছন ফিরে দর্শকদের হাসিটাকে লক্ষ্য করল যেন। কিন্তু বলল, 'জমিদার দেখছি অত্যন্ত প্রজাপীড়ক এবং নীতিহীন, রায়তরা ক্ষেপে না-যায়'। বাগচী হাসতে-হাসতে বলল, 'নিয়োগীমশায় দেখলে ভালো করতেন। তাঁর সাসপেনশন অব ডিসবিলিফ নিয়ে ভয় রইত না'।

কিন্তু নায়েবমশায় যেন এই সুযোগের অপেক্ষা করছিল। বলল, 'বুড়োমানুষ তো। একভাবে এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকা কষ্টের। আপনারা বসুন। ওদিকে দেখি ঠিক চলছে কিনা'।

হরদয়াল বলল, 'আপনাকে বলা হয়নি। মিস্টার ও মিসেস বাগচীকে জলযোগের বদলে আমার সঙ্গে রাতের খাওয়া সারতে বলেছি'।

'বাঃ বেশ, অতি উত্তম করেছেন'—বলে নায়েব উঠে দাঁড়াল। কিন্তু যেতে গিয়ে বোধ হয় কিছু দরকারি কথা মনে পড়ল। বলল, 'রানীমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাকি? বিকেলের দিকে খুঁজছিলেন আপনাকে, পরে বললেন, থাক আজ'।

'বাইরে গিয়েছিলাম একটু'। বলল হরদয়াল।

'এবারের উৎসবের উপহার শুনেছেন? এবার কিন্তু বেতন বেড়ে যাচ্ছে না। বলেছেন, সব কর্মচারীকে বারো দিনের বেতন অতিরিক্ত এককালীন দেওয়া হবে। আদায় ভালো হয়নি, তাই সারা বছরের এবং ভবিষ্যতের জন্য বেতনবৃদ্ধি নাকচ করেছেন'।

'কিন্তু বর্তমানে তো নগদ বেশি যাবে'—হরদয়াল বলল।

'তা হবে। এবার দুটো নতুন পদ সৃষ্টি হচ্ছে। তাদের মধ্যে একটি রাজকুমারের ব্যক্তিগত পরামর্শদাতার। বললেন, সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছে। এই পদে উনি এমন একজনকে চান যিনি রাজবাড়ির ধরন-ধারণ বোঝেন, রাজকুমারকে ভালোবাসতে পারবেন, নিজে বিশেষ সচ্চরিত্র হবেন, অথচ ইংরেজিতে ভালো'।

হরদয়াল বলল, 'এমনটি রানী কিছুদিন থেকে ভাবছেন। সে-রকম একটি মানুষ পেতে হবে তো'।

'দেখা যাক'—বলে নায়েব চলতে শুরু করল।

হরদয়াল ঘড়ি বার করে বলল, 'সে কী, পৌনে নয় হচ্ছে। আসুন মিস্টার বাগচী, এই সুযোগে আমরাও উঠি। ডিনার জুড়োতে দিলে হবে না'।

দেওয়ানকুঠি রাজবাড়ির প্রাচীরের মধ্যেই, সুতরাং তারও কিছু আলোকসজ্জা আছে। যদিও তা অন্যান্য অংশ থেকে স্তিমিত। আলো দেওয়ার কৌশলে কুঠির স্থাপত্য-সৌন্দর্যকেই শুধু প্রকাশ করা হয়েছে। বাগচী দম্পতিকে নিয়ে সেদিকে যেতে-যেতে হরদয়ালের মন প্রথম উৎসবের দিকে ফিরে গেল। তখন সে-ই দেওয়ান। আর গোটা উৎসবটা ছিল তার ফরমায়েশ মতো। সেবার এতক্ষণে কুঠির হলঘরে সারেঙ্গি, পাখোয়াজ বাজছে, বাঈজি নাচছে। ডানকান মদের ঘোরে বোকার মতো হাসছে, বাইজিদের সম্বন্ধে উত্তেজনা গোপন করতে পারছে না। শেষে পিয়েত্রো বলেছিল—তুমি বাঘে-বলদে একঘাটে জল খাওয়ালে, হে দেওয়ান।

তারা দেওয়ানকুঠির সিঁড়িতে পা রাখতে হরদয়ালের ভৃত্য পর্দা টেনে ধরে দাঁড়াল। এটা হয়তো হরদয়ালের পছন্দ যে ভিতরের ও বাইরের আলো এরকম নয়। এটা তার বসবার ঘর যেখানে টিপয়ে রাখা একটা হারিকেনমাত্র স্তিমিত আলো দিচ্ছে। কিন্তু বসবার ঘরে না-বসে সে তার লাইব্রেরিতে গেল। সেখানে জলচৌকির উপরে ঢোলক আকৃতি চকচকে কাচের ডোমে উজ্জ্বল মোমের শামাদান। জলচৌকির কাছাকাছি কয়েকটা সোফা, হরদয়ালের নিজের আরামকেদারা।

হরদয়াল বলল, 'মিস্টার বাগচী, ওরা টেবিল পাততে-পাততে ক্ষুধা বাড়াতে একটু চলবে কি'? বাগচী কিছু বলার আগে হরদয়াল নিজেই ওয়াইনের বোতল আর গ্লাস নিয়ে এল। সে তিনটি গ্লাসে ঢালল। কিন্তু কেট বলল, 'আমি এ রকম কখনও-ই খাই না। আপনারা খান। আমি বরং আপনার লাইব্রেরি দেখি। আগে যেমন দেখেছিলাম তার চাইতে বই আব শেল্‌ফ দুই-ই বেড়েছে মনে হচ্ছে'। সে দেযাল বরাবর সাজানো শেল্‌ফগুলোর দিকে হাঁটতে শুরু করল। সুতরাং গ্লাস হাতে বাগচী এবং হরদয়াল তাকে অনুসরণ করল। কেট একবার বলল, 'দেওয়ানজিকে কিন্তু এই লাইব্রেরিতে না-ঢুকলে বোঝা যায় না'।

বিব্রত হরদয়াল বলল, 'না-না, এ সবই রানীর আনুকূল্যে'।

বাগচী বলল, 'কিন্তু বই বাছাই করার রুচি'?

হরদয়াল তা সত্ত্বেও বলল, 'বই আর এত কোথায় আসছে এদেশে যে বাছাই করা হবে। যা পাওয়া যায় তাই কিনে ফেলা হয়'।

কেট বলল, 'বই-এর জন্য টাকা খরচ কিন্তু সংস্কৃতির একটা প্রমাণ'।

তারা ঘরের মাঝামাঝি একত্র হলে বাগচী ভাবল : কালচার, ও হ্যাঁ, কালচার। সে বলল, 'দেওয়ানজি, রামমোহন রাজার সব বই কি আপনার আছে'?

'আপনার কি বিশেষ কোনোটির কথা মনে পড়েছে'?

বাগচী বলল, 'সেই পার্লামেন্টের উদ্দেশে লেখা প্রবন্ধ'।

'কোনটি? সেই রিমারক্‌স অন দ্য কলোনাইজেশন অব ইন্ডিয়া বাই ইউরোপীয়ানস'?

'তাই হবে নাম। যেটায় রাজা ইংল্যান্ডের কিছু লোককে জমিদার হিসাবে ভারতে স্থায়ী বসবাস করানোর প্রস্তাব দিয়েছিলেন'।

হরদয়াল বলল, 'ওটা কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে আছে। কলকাতায পেয়ে নকল করে রেখেছিলাম'।

'আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, সেই প্রবন্ধের কি এই উদ্দেশ্য যে সেই ইংরেজ জমিদাররা স্থায়ীভাবে এদেশে বসবাস করলে এদেশের টাকা এ দেশেই থাকবে, নাকি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, ইনডাস্ট্রির প্রসার, এসবের আশাও করেছিলেন'।

হরদয়াল বলল, 'আবার তাহলে পড়তে হবে। যতদূর মনে পড়ে সেসব ছাড়াও ধর্ম এবং সংস্কৃতির কথাও ছিল। বোধ হয় সংস্কৃতির বিনিময়ও। কিন্তু বিশ বছর আগেকার মত, রাজা কি বর্তমানে মত পরিবর্তন করতেন না'? হরদয়াল হাসল। কিন্তু তার ভ্রূর কাছে গাম্ভীর্যও দেখা দিল। সে ভাবল : যেমন

আজ ডানকানরা এল না। সে বলল, 'কলকাতায় কিন্তু এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে ৫৭-৫৮র সেইসব ব্যাপারের পরে ইংল্যান্ডের লোকেরা দূরে-দূরে সরবে'।

আলাপটা এগোল না। টেবিল পাতা হয়েছে এই খবর জানাল হরদয়ালের ভৃত্য। অপেক্ষাকৃত ছোট টেবিলে প্রকাণ্ড উজ্জ্বল হারিকেন ঘিরে তিনজনের ডিনার। বসা হলে হরদয়াল বলল, 'এক কাজ করলে হয়—আমাদের খাবারগুলো দিয়ে ওরা যদি চলে যায়, মিসেস বাগচী তবে ফ্যামিলি ডিনারের মতো আমাদের সার্ভ করতে পারেন। বেশ ইনফর্ম্যাল হয়'।

কেট বলল, 'নিশ্চয়, সে তো খুব ভালোই হবে'।

ভৃত্য ও বাবুর্চি দুজনে সার্ভ করবে স্থির ছিল। হরদয়াল তাদের ডেকে বলল, 'তোমরা কোর্স ক'টিকে একইসঙ্গে টেবিলে রাখো। মেমসাহেব ব্যবস্থা করবেন। তাছাড়া তোমরা তো এতক্ষণ বেরোতে পারোনি, এবার একটু ঘুরেফিরে আনন্দ করো।

তারা ব্যাপারটাকে আদেশ মনে করেই টেবিল সাজিয়ে দিয়ে চলে গেলে কেটের অসুবিধা হল। সুপটাকে বোঝা যায়। মাছ ভাজা, মাংসের কারিকে বোঝা যাচ্ছে। লুচি সম্বন্ধেও কিছু জ্ঞান আছে তার। কিন্তু দুটো সুদৃশ্য পাত্রে দু-রকমের পোলাও দেখে সে বিব্রত হল। কোনটা কোন কোর্সে চলবে, কোনটির পরে কোনটি—এটা তাকে চিন্তিত করল।

তখন হরদয়াল বলল, 'হোস্টেসের রুচিই আমাদের রুচি'।

বাগচী বলল হাসতে-হাসতে, 'দেখ কেট, বই বাছাই-এর ব্যাপারে দেওয়ানজির রুচির কথা তুলেছিলাম, এবার কিন্তু ...

সুপের সঙ্গে-সঙ্গে রুচির কথাকেই ফিরিয়ে আনল হরদয়াল। বলল, বলার আগে ভাবল—যেন নিজের মনের দিকে চেয়ে কিছু অনুভব করার চেষ্টা করল—তাকে সলজ্জ দেখাল। 'আচ্ছা, মিস্টার বাগচী, আপনার কি কখনও এমন হয়েছে যে আপনার ফেভারিট কোনো কবিব চাইতে সেদিন অন্য কবিকে ভালো লাগছে'।

'একটু বুঝিয়ে বলুন'।

'মনে করুন শেলীর তুলনায় কীটস'।

'কীটস নিশ্চয়ই বড় কবি। বিশেষ কোনো মনের অবস্থায় কাউকে আরো ভালো লাগে যদি অন্যায় কী'?

হরদয়াল ভাবল, তার চিন্তাটা স্বচ্ছ হল না। সে টেবিলে মন ফেরাল।

কিন্তু কেট মুশকিলে পড়ল। সে নিজে ভেবে ঠিক করতে না-পেরে হরদয়ালকে জিজ্ঞাসা করল, 'নিরামিষ পোলাও যদি আগে দিই তার সঙ্গে কী দেব, মাছভাজা কি'?

হরদয়াল বলল, 'সে আর কঠিন কী'? কিন্তু সে থমকে যেন মনে করার চেষ্টা করল। পরে বলল, 'আমার মনে হয়, সেবার রাজবাড়িতে নিরামিষ দোলমা দিয়ে খেয়েছিলাম। মাছ খেলে সুগন্ধ নষ্ট'।

বাগচী হেসে উঠে বলল, 'দেওয়ানজি, খাওয়ার ব্যাপারে স্মৃতিতে নির্ভর করা সবসময়ে ভালো নয়। তোমার মনে পড়ে, কেট'?

কেট বলল, 'গুড গড, এ কি সে-রকম হতে যাচ্ছে নাকি? সে যেন কী? ও, বড়ি। বড়ি ...

হরদয়াল বলল, 'কী রকম'?

কেট বলল, 'হরিবল্। সেদিন হেডমাস্টারের খেয়াল হল নতুন লাঞ্চ খাবে। বোধ হয় ডালের সেই কোণগুলো যাকে বলল বড়ি। বলল, কিছু করতে হবে না, চাল আর এগুলো একসঙ্গে সিদ্ধ করলে সুগন্ধে ঘরসুদ্ধ ভরে যাবে। বড়জোর খাওয়ার আগে তেল দিয়ে নিও'।

কৌতুক বোধ করে হরদয়াল বলল, 'আচ্ছা'।

কেট বলল, 'সে কি খেতে পারা যায়? হরিবল্, স্ট্রেঞ্জ'!

বাগচী বলল, 'কী জানি সে-রকম কেন হল'! অথচ আমার স্পষ্ট মনে আছে আমার সেই সাত-আট বছরে এটা ছিল একটা ট্রিট। আমার মনে হয় কিছু একটা মা দিতেন যা আমরা না-জানায় দিতে পারিনি। অবশ্য তখন আমরা খুবই গরিব ছিলাম'।

কেট বলল হেসে, 'সে জিনিসটার নাম নস্ট্যালজিয়া'।

হরদয়াল বলল, 'ওইসব ভালো লাগা হয়তো বড় হলে চলে যায়, তখন স্মৃতিটা থাকে। এ বিষয়ে একটা প্রমাণ দিতে পারি। আমাদের রাজকুমার সবরকমই খান। কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি সেদিনও, তিনি উত্তেজিত, বিরক্ত, খুব মন খারাপ করে থাকলে রানী একটা সহজ কৌশল করেন। বলেন—স্নান করে আয়, আমার সঙ্গে খাবি। সে কিন্তু নিরামিষ আর খুবই অল্প আয়োজনের'। হরদয়াল হাসল।

তখনও আতসবাজি শেষ হয়নি, কিংবা সেটা হয়তো শেষ হাউই-গোছার একটি। তার আলো কোনো জানলা দিয়ে টেবিলে এসে পড়ল। সে আলোটা সরে গেলে হরদয়াল নতুন আলাপ খুঁজে নিল। বলল, 'মিস্টার বাগচী, নায়েবমশায় থিয়েটারে যা বলছিলেন তা কি শুনেছিলেন'?

'আপনাদের বেতন বৃদ্ধির একটা ব্যাপার ছিল'।

'হ্যাঁ, সেই সময়ের কথাই। সেই নতুন দুটি পদ তৈরির কথা। দুটির মধ্যে একটি বোধ হয় ধর্ম সম্বন্ধে, দেবত্র আর ওয়াকফ। অন্যটি রাজকুমারের প্রাইভেট সেক্রেটারি'।

বাগচী বলল, 'হ্যাঁ, শুনেছিলাম। রাজবাড়িকে ভালোবাসবে, তার ধরন-ধারণ জানবে, ইংবেজিতে দক্ষ এবং বিশেষ সচ্চরিত্র হতে হবে। ইংরেজিতে দক্ষ মানুষ আজকাল কলকাতায় পাওয়া যায়, সচ্চরিত্র কথাটার ব্যাখ্যা নিয়ে গোলমাল আছে বটে, তবে বোঝা যায় কী বলা হচ্ছে। সে-বকম পাওয়া একটু কঠিন। কিন্তু রাজবাড়িকে আপন মনে করবে, তার ধরন-ধারণ জানবে সে-লোক এ গ্রামের বাইরে কোথায়'?

হরদয়াল একটু ইতস্তত করে বলল, 'কথাটা পরে বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু উঠে পড়ল। কিছু মনে যদি না-করেন, বলি। প্রকৃতপক্ষে যা বলতে যাচ্ছি তাতে আমার লোকসান, গ্রামেরও ক্ষতি। কিন্তু রানী যেদিন প্রথম এ-কথাটা তুলেছিলেন তখন, আমার ধাবণা, তাঁব চোখের সামনে আপনি ছিলেন'।

বাগচী বলল, 'না-না, এ আপনি কী বলছেন? ইংরেজিতে না-হয় দক্ষতা হয়েছে, আর তা ইংরেজ পরিবারে ত্রিশ বছর কাটিয়ে। কিন্তু অন্য গুণগুলো'?

হরদয়াল বলল, 'আমি আপনাকে এত রাতে মত দিতে বলছি না, কিন্তু ব্যাপারটা শুনুন। নায়েবমশায় এই এস্টেটে পঞ্চাশ বছর কাজ করছেন। বয়স সত্তর হয়। নিজেকে ক্লান্ত বলছেন। এ অবস্থায় রানীমা একজন কর্মচারীকে সেই পদের উপযুক্ত করে ট্রেনিং দিয়ে নিতে চান। এই প্রাইভেট সেক্রেটারির পদটা একটা স্টেপিং স্টোন। রানীর কথা শুনে আমিও ভেবেছি। স্কুলটার সর্বময় কর্তৃত্ব আপনারই থাকবে। হয়তো হেডমাস্টার অন্য কেউ হবে। আপনি কিউরেটর রূপে থাকতে পারেন। আমার মনে হয়, প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ এক্ষেত্রে রাজকুমারকে কিছুটা পরামর্শ দেওয়াও বটে'।

'কিন্তু রাজবাড়ির ব্যাপার'। বাগচী বলল, 'আমি তো বুঝতেই পারছি না'।

হরদয়াল বলল, 'এটা এমন নয় যে আমরা খাওয়া থামাব। মিসেস বাগচী, এরপরে আমাদের কী দেবেন? আমার মনে হয়, আপনি যে রাজকুমারের সঙ্গে আজকাল সন্ধ্যায় গল্পগাছা করেন তা রানী জানেন, আর তা থেকেই আপনাকে নিয়োগ করার কথা রানীর মনে হয়েছে'।

হরদয়াল নতুন একটা খালি প্লেট সেকেন্ড কোর্স নেওয়ার জন্য কেটের সামনে বাড়িয়ে ধরল। বলল, 'এবার যদি বিরিয়ানি দেন আমি মাছভাজা চাইব। বাগচী সাহেব যদি মাংস নেন আমার আপত্তি নেই'। এই বলে সে হাসল। প্লেটটা নিজের সামনে নামিয়ে নিয়ে মাছের ফর্ক খুঁজে নিয়ে সে খেতে আরম্ভ করে বলল আবার, 'এমন হতে পারে, মশাই, রানী লক্ষ্য করেছেন সেইসব আসবে আপনি মদ খান বটে, কিন্তু তা সন্ধ্যার ঠোঁট ভিজানোমাত্র। পাইপ টানেন, তা কদাচিৎ'।

বাগচীর মুখে আশঙ্কার চিহ্ন দেখা দিল। তার উপরে নজর রাখা হচ্ছে এ-রকম ভেবে সে বিপন্ন বোধ করল। হরদয়াল হেসে বলল, 'না, সে রকম নয়। আমাদের সকলকেই এমনভাবে দেখে নেওয়া হয়েছে। শুনেছি নায়েবমশায় তখন আমিন যখন রানীমার হাতে এস্টেট আসে; বিচার করে তাঁকে নায়েব-ই-রিয়াসৎ করেছেন'।

হেসে বাগচী বলল, 'দেওয়ানজি, আর-কিছু না-হোক, রাজবাড়ির এই একটা ধরন আমার জানা হল'।

হরদয়ালও হেসে উঠল।

৬

ডিনার ও ওয়াইন শেষ করে তারা বাইরে এলে হরদয়াল জানতে চাইল বাগচী আর-একবার থিয়েটারের দিকে যেতে চায় কিনা। ঘড়ি দেখে বাগচী বলল, 'রাত এগারোটা হতে চলে'।

তারা সদর-দরজার কাছে এসেছিল। তখনও সেখানে বেশ লোকজন, পালকি, গোরুগাড়ি। বোধ হয় নিমন্ত্রিতরা ফিরে যেতে শুরু করেছে।

হরদয়াল হেসে বলল, 'রাজবাড়ির আমরা আজ কেউই ঘুমব না। আপনাদের সঙ্গে খানিকটা চলি'।

তারা পথে চলতে শুরু করলে কেট বলল, 'এঁরা এত রাতে ফিরছেন, পথে বিপদ হতে পারে না'?

'সম্ভাবনা কম', বলল হরদয়াল। 'যতদূর জানি নতুন ঠগী-ঠ্যাঙাড়ের দল তৈরি হয়নি আর'।

বাগচী বলল, 'শ্লীম্যানের কথা বলছেন? এখানে তা হলে ঠগী-ঠ্যাঙাড়ে ছিল'?

হরদয়াল কথাটা বলার আগে হাসল, একটু দ্বিধা করে বলল, 'না। বছর চল্লিশ আগেকার কথা। আমাদের নায়েবমশায় তখন তশিলদার। তখনকার রাজার হুকুমে বরকন্দাজ নিয়ে পথে নেমেছিল। লোকে বলে দুই সপ্তাহে দশ দিনে পঞ্চাশজনকে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিল যাদের কিছু তখনও জীবন্ত'।

কেট বলল, 'কী সাংঘাতিক! এই নায়েবমশায়'?

বাগচীও চমকে উঠেছিল। বলল, 'বটে? না, সে ভদ্রলোক তো হিসাবমতো বছর ত্রিশের একজন তখন'। কিন্তু সে-ও ভাবল, এখন সেই দুর্দম বৈর কি বয়সে নিশ্চিহ্ন? হোক ঠ্যাঙাড়ে-ঠগী, তাহলেও সেভাবে বিনা বিচারে শেষ শাস্তি দেয় অতগুলো মানুষকে? সেই নৃশংসভাবে? কিন্তু এটা তো আজকের আবহাওয়া নয়। সে বরং প্রাচীরের উপর দিয়ে আলোয় উজ্জ্বল রাজবাড়ির দিকে লক্ষ্য করে বলল, 'অনেক খরচ হবে, কী বলেন'?

শীতের রাত এগারোটা। অন্ধকার তো বটেই, বাতাসেরও কামড় আছে। সে রাতে উপরন্তু ধোঁয়ানো মশাল ছিল পথের উপরে এখানে-ওখানে। একটা-দুটো ছুটে চলা পালকি, কোথাও ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে গোরুগাড়ি। পায়ে হেঁটে চাদরে মাথা মুড়ে পথচারী। অনভিজ্ঞ বাগচী-দম্পতির কাছে কখনও-বা স্বপ্নে দেখা এমনই বোধ হতে লাগল।

হরদয়াল হেসে বলল, 'আমাদের রানীর এই এক বদনাম আছে, তিনি কৃপণ। কাজেই এ ব্যাপারে হাজার পঞ্চাশের বেশি খরচ হতে দেবে না নায়েবমশায়'। হরদয়াল রানীকে কৃপণ বলে বোধহয় মজা পেল। সে বলল, 'আপনাকে একটা ব্যাপার বলতে পারি। রানী কয়েকটি ব্যাপারে প্রোটেস্টান্ট কিংবা পিউরিটানদের মতো যেমন নিজের খাওয়াদাওয়া, পূজাটুজা, যেমন টাকা জমানো। আপনি শুনলে অবাক হবেন, জমিদারির লভ্যাংশের শতকরা প্রায় চল্লিশ দিয়ে প্রতি বছর, বছরে দু'বার করে স্টক ইত্যাদি কেনা হয়। রেলের স্টক, কয়লাখাদের ডিবেঞ্চার, বিশেষ কম্পানির কাগজ'।

তারা স্কুলবাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছিল। বাগচী এবার বলল, 'দেওয়ানজি, আপনার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। আপনি কুঠিতে ফিরুন'।

হরদয়াল থেমে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, 'গুডনাইট। একটা ভালো ডিনারের জন্য এক নিঃসঙ্গ

মানুষের ধন্যবাদ নিন'।

একবার বাগচী ফিরে দেখল, হরদয়াল যেন দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু হরদয়ালের অজ্ঞাতসারে তার গতিবিধি লক্ষ্য করা ভালো হবে না মনে করে তারা হাঁটতে লাগল।

কেট বলল, 'আশ্চর্য নয়? এই মানুষ, যাকে লোকে বাঘের মতো ভয় পায়, কত কাছে আসতে পারেন অবলীলায়'।

বাগচী বলল, 'কিন্তু, কেট, ওটা কি দেওয়ানজির আদেশ, ওই চাকরিটা নেওয়া'?

কেট ব্যাপারটার এ-রকম ব্যাখ্যা আশা করেনি। সে বিস্মিত হয়ে বলল, 'তাই মনে করো'?

'দেওয়ানজি বলছিলেন রানীমা আমাকে দেখেই পদটির কথা চিন্তা করেছেন'।

কেট হাই তুলল। বলল, 'কিন্তু ওটা কি কথা হল পিউরিটান সম্বন্ধে'?

বাগচী বলল, 'এ-রকম কথা আছে বটে। পিউরিটানরা টাকা ধার দিতে আপত্তি করেন না। আধ পয়সা সুদ মাপ করাকে দলিলকে সুতরাং সত্যকে অবজ্ঞা করা মনে করেন। বলা হয়, ইংল্যান্ডের ক্যাপিটালের অনেকটা এইসব পিউরিটানের সঞ্চয়'।

হরদয়াল চলতে শুরু করে পথচারীদের এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করতে লাগল। পথচারীরা তাকে চিনতে পারলে কথা বলতে চাইবে, যা তাব এখন ভালো লাগবে না।

সে রাজবাড়ির হাতায় পৌঁছাল। সদরদরজা দিয়ে খানিকটা গিয়ে পরে তার কুঠিতে যাওয়ার পথ। সে এক মুহূর্ত যেন দ্বিধা করল কোনদিকে যাবে। আতসবাজি শেষ হয়েছে, বাজবাড়ির দেয়ালের আলোগুলোও এখন স্তিমিত। তার মন যেন একটা সুখ ও একটা নিরানন্দেব মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ল। সে নিজেকে শোনাল : কীটস্ই তো। এতক্ষণ তো কীটস্ই মনে ছিল। সে হিম ও পবিপক্ক ফলে আনত ঋতু। সেই হেমন্তের কবিতা। মনে-মনে কবিতাটা আবৃত্তি করতে গিয়ে শেষের দিকে পৌঁছে তার মন উদাস হয়ে গেল।

সে নিজের বাংলোর দিকে চলতে-চলতে ভাবল : সে এখন তাব লাইব্রেরিতে যেতে পারে। তার আর-কিছুই করার নেই। বলতে পারা যায় সেই প্রথমবারের পব থেকে তার কাজ কমে যাচ্ছিল। তাহলেও গতবারেও নায়েবমশায় কী হবে-কী হবে না তা নিয়ে আলাপ করেছিল। এবার...প্রথমবাব সেই উৎসবে দেওয়ানকুঠিরই যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। সেই বাঈজি নাচ যা থেকে উঠে গিয়ে পিযেত্রো বাঘে-বলদে একঘাটে জল খাওয়ানোর কথা বলে সতর্ক করে দিয়েছিল—দেখো, স্ত্রীলোক নিয়ে নাচের আসরে গোল না-হয়। ডানকান ও সদরওয়ালা ডেপুটি দুইয়েরই তখন মদে বেসামাল অবস্থা। সেই রাতেও তার নিঃসঙ্গ মনে হয়েছিল নিজেকে, কিন্তু পরমুহূর্তেই কর্তব্যের অনেক কোলাহল তার চারিদিকে কৌশল, মন্ত্রণা, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

হরদয়াল তার বসবার ঘরে বসল। চিন্তার খেই তুলে নিল একটা। তো, বাগচীকে কিন্তু রাজবাড়ির কাছাকাছি আনলেও বলা যাবে না এই উৎসবটা প্রকৃতপক্ষে সেই একটা ঘটনার উপরে পর্দা টেনে দেওয়া। যেন কিছুই হয়নি বোঝাতে ডানকানকে নিমন্ত্রণ করা। তদন্তে এসেছে এমন সদরওয়ালাকে বিভ্রান্ত করা। বাগচীকে বলা যাবে না রানীর জন্ম বৈশাখে বলেই তাঁর এক নাম বিশাখা।

হরদয়াল জামা জুতো খুলল। তৃষ্ণা পেয়েছে তার। ডিনারে মদটা ভালো ছিল। আর্মেনিটা এই এক ব্যাপারে ঠকায় না। সে উঠে টেবিল থেকে পোর্টের অর্ধসমাপ্ত বোতলটা এবং একটা নতুন গ্লাস নিয়ে ফিরল। এখন পোর্টই। কলকাতায় এ-রকম প্রবাদ, পোর্ট হজমের সাহায্য করে। আবার কলকাতা থেকেই বন্ধু লিখেছে মদ্যপান নিবারণের কথা, যা হয়তো এ মাসের শেষ আধুনিক কথা। ঠোঁটে সেই গাঢ় রঙের মদ তুলে হরদয়াল মনে-মনে হাসল। 'একেই কী বলে সভ্যতা'র ফল নাকি? সে-নাটকে মদ্যপানকে ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন এই, মাইকেল ডাট্ মদ ছেড়েছেন কি?

গ্লাসটা শেষ করেও তৃষ্ণা না-মেটায় সে ভাবল : বোধ হয় বাতাসে যাওয়া আরামের হবে। সে নিজেকে

মৃদু ঠাট্টা করে মৃদু হেসে ভাবল, এত রাতে কীট্‌স আর অটম্‌ হয় না!

শোবার ঘরে গিয়ে জামাজোড়া খুলে চটি পরে চাদর গায়ে দিতে গিয়ে হাতের সামনে যে-শাল পেল তাই পরে পায়চারির ভঙ্গিতে কুঠি থেকে বার হল। বাইরের আলো শালে পড়ায় সে ভাবল, এটা কেন? ভৃত্যদের কাজ। বালাপোষ সরিয়ে তার জায়গায় নতুন কোনো শাল রেখেছে।

আলো অনেক স্তিমিত, তাহলেও এখনও যথেষ্ট, এখনও মানুষজন চলেছে। সদরের পেটাঘড়িতে বারোটা বাজল।

শালটা এমারেল্ড রঙের, মহামূল্য তাতে সন্দেহ কি! য্যাকব নিজেই বলেছিল। আজ সকালের কথাই তো। য্যাকব তার পুঁটুলি নিয়ে এসে খুলে শালটা বার করে বলেছিল—এটা, সার, আপনার জন্য। হরদয়াল বলেছিল—রাখো, রাখো। যা আছে তা পরি কখন? তখন য্যাকব বলেছিল—রানীমা নিজে পছন্দ করে এটা আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। আমার শুধু পৌঁছে দেওয়া।

রাজবাড়ির সেই একটা খিলান বিশেষ আলোকিত। সেখানে কয়েকজন ব্যস্তসমস্ত দাসদাসীকেও দেখা যাচ্ছে। থিয়েটারের চত্বর পার হয়ে সে পূজামণ্ডপের খিলানটার দিকে গেল।

আসলে তো মন্দির নয়। রাজবাড়ির অন্দরে ঘোড়া ও পালকি ঢোকার পথ। তারই পাশের দালানে রদবদল করে, দেয়াল তুলে, রেলিং-এ ঘিরে পূজার জায়গা করা হয়েছিল। প্রথমবার এত আলো ছিল না। কিন্তু আন্তরিকতা কি বেশি ছিল? রাজকুমারের বিপদমুক্তির দরুন কৃতজ্ঞতা জানানোর ব্যাকুলতাও ছিল।

হঠাৎ হরদয়াল স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। চিন্তাটা কোথা থেকে উঠল ভেবে পেল না। কিন্তু তা তার মনকে বিবশ করে দিল। কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হলে সে বরখাস্তই হয়। রানী তাকে দেওয়ান পদ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন, কিন্তু বিতাড়িত করেননি। কুঠিতে থাকতে দিয়েছেন, তার স্কুলে টাকা দিচ্ছেন, লাইব্রেরির বই কেনার খরচ দিয়ে চলেছেন, সে কি এজন্যই যে রাজকুমারের সেই অপরাধের সংবাদ সে জানে? যে-বিবেক সেবার সে বিসর্জন দিয়েছিল রাজকুমারকে রক্ষা করতে, যার মৃত দেহটাকে যেন সে টেনে চলেছে, তা যেন তাকে অস্থির করে তুলল।

সেই প্রথমবার দেওয়ানকুঠির নাচের আসরের আলো নিবে গেলে সে এ-রকম মাঝরাতে এই পূজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। রানী উঠে এসেছিলেন। পিয়েত্রো, ডানকান প্রভৃতি নাচমহলে খুশি হয়েছে জেনে নিয়ে রানী জানিয়েছিলেন পূজা শেষ হতে দেরি আছে। এখন দেওয়ান বিশ্রাম নিতে পারে।

চেহারার বৈশিষ্ট্য বলো, কিংবা বসার ভঙ্গি, অনেক ভিড়ের মধ্যেও তাঁকে চিনতে পারা যায়। হরদয়াল দেখতে পেল কিছু দূর থেকেই, দালানের মেঝেতে রানী বসে আছেন। এখানকার আলো চোখ ধাঁধানো নয়। অনেক প্রদীপ, কিন্তু আলোটা কোমল। রানীর পরনে দুধ-গরদের থান, তাঁর চোখ দুটো আয়ত।

দালানের নিচে হরদয়ালের সামনে আট-দশজন মানুষ, তারা পূজায় উৎসাহী। ওপারের রকে পুরনারীদের ভিড় এখনও রেশমে অলঙ্কারে উজ্জ্বল। পুরুষদের মধ্যে একজন কথা বলল। গলার স্বরে নায়েবমশায়কে চিনতে পারা গেল।

নায়েবমশায় বলল, 'সব ব্যবস্থা ঠিক করা আছে। দশজন বরকন্দাজ ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। এবার আমি যাই'।

এ রকম অনুমতি রানীর কাছেই চাওয়া হয়। রানী বললেন, 'এসো, বাবা'।

হরদয়াল তো দেখতেই পাচ্ছে সব ব্যবস্থা ঠিক করা আছে। নায়েবমশায়ের চালটা ধীর, কিন্তু নিশ্চয় ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকে না। বরকন্দাজদের কাঁধে আজ বন্দুক থাকবে।

কী হবে কিছু খোঁজ ক'রে?

কিন্তু রানী উঠলেন। যেখানে নায়েবমশায় দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে না-গিয়ে রেলিং বরাবর সরে এলেন। বললেন, 'হরদয়াল? এখনও পুজো শেষ হতে ঘণ্টাতিনেক। তুমিও বিশ্রাম নিতে পারো'।

আশ্চর্য নয়? হরদয়াল চোখ তুলে তাকাল, যেন ঘোমটা ঘেরা মুখটাতে সে একটু স্পষ্ট করে দেখল। রানী ঈষৎ হাসলেন। বললেন, 'শালটা ঠকায়নি। মানিয়েছে তোমাকে'।

৭

দ্বিতীয় নাটক শেষ হওয়ার কিছু আগেই চিকের আসন থেকে উঠে পড়েছিল নয়নতারা। সে পূজার কাছে আমন্ত্রিত মহিলাদের রকে গিয়ে বসল। কে একজন জিজ্ঞাসা করল, 'নাটক থেকে এলেন? কেমন হচ্ছে নাটক'? 'হচ্ছেই তো'—বলে নয়নতারা পাশ কাটাল।

পুরোহিতের ঈষৎ প্রকাশিত মন্ত্রোচ্চারণ দ্রুততর হয়েছে এখন, যেন তা শব্দ ঝংকারের নেশা। মাঝে মাঝে দ্রুত লয়ে ঢাক বেজে উঠছে কিছুক্ষণের জন্য। রাত বেশি হলে তা অনুভূতিতে ধরা পড়ে।

আসল কথা, সারা রাজবাড়ি জুড়ে যে-আলো ছিল তা এখন মৃদু হয়ে আসছে। আলো এখানেও কোমল। সেজন্য বোধহয় স্ত্রীলোকদের ভিড় ক্বচিৎ ঝিকমিক করছে। নয়নতারার মনে নিজের জড়োয়ার কণ্ঠীর কথা উঠল। সেই কবে সেটা রানীমা দিয়েছিলেন নিজে হাতে তুলে।

আলোর দিকে আবার চোখ পড়ল তার। হ্যাঁ, উৎসবই তো। নয়নতারা কিছুক্ষণ যেন এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় ব্যস্ত রইল যে মশালচিরা আন্দাজ করতে পারে কতটুকু তেলে আলোগুলো কতক্ষণ জ্বলবে, ফলে একবার জ্বেলে দেওয়ার পরে আলোগুলোকে আর উস্কে দেওয়ার দরকার হয় না।

উস্কে দিতে গিয়ে প্রদীপটা নিবে গিয়েছিল। ... কিন্তু তখন অনেক রাত হবে। দরজা খুলে অন্ধকারে রাজকুমারকে দেখে সে অবাক হয়ে গিয়েছিল। রাজকুমারের চোখ দুটো আয়ত। কোথা থেকে একটা মদির সুঘ্রাণ উঠছে। সে নিজে বলতে পেরেছিল শুধু—বসো, রাজকুমার, আমি আসছি। ফিরতে একটু দেরিই হয়েছিল তার। ফিরে সে দেখেছিল, রাজু তার বিছানাতে ঘুমিয়ে পড়েছে। নিশ্চিন্ত ঘুমের নিঃশ্বাসে বুক ওঠা-পড়া করছে। একটু কি হেসেছিল তখন সে? আর-একটু গাঢ় হোক ঘুম বোধ হয় এই ভেবে সে প্রদীপের সামনে বসে ছিল। তখন প্রদীপটা উস্কে দিতে গিয়ে নিবিয়ে ফেলেছিল। বিছানায় গিয়ে রাজকুমারের অধিকার করা বালিশের কোণে মাথা রেখে সে-ও দেখতে-দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কী অবুঝ, কী কিশোর, রাজকুমার!

ঢং করে একটা শব্দ হল। তবে একটা মৃদু প্রতিধ্বনিও উঠল। রাত একটা হল পেটাঘড়িতে। কে একজন পানের অভাব অনুভব করল। পান তখনও নিশ্চয় অনেক থাকতে পারে কিন্তু ততটা রাতে কে আনবে তা যোগাড় করে?

কিন্তু নবকুমার সব জায়গাতেই থাকে। নয়নতারা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখছি'।

দরবার-হলের পিছন দিকের একটা ঘরেই পান সাজা হচ্ছিল। আর সেদিকটা, যেন হঠাৎ লক্ষ্য করল নয়নতারা, যেন জনশূন্য হয়ে এসেছে। ছিঃ নয়নতারা!

নাটক আর পূজার আকর্ষণ তখন দাসদাসীদেরও টেনে নিয়েছে। তা বলে একেবারেই কেউ নেই এমন নয়। দূরে বাঁধানো উঠোনের একপাশে একজন এখনই ঝাঁটা নিয়ে ব্যস্ত। ওদিকের দালানের খিলানের থামের পাশে আর-একজন প্রদীপের আলোয় সলতে পাকাচ্ছে, যদি দরকার হয়। পান সাজার ঘরের ঝাড়লণ্ঠনের বেশ কয়েকটা শাখা নিবে গিয়েছে। পানের সরঞ্জামের সামনে একজন দাসী বটে। আলো যেখানে লালমেঝেতে পড়ার ফলে রঙিন, সেখানে দাসীটি পা ছড়িয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ঘুমোচ্ছে। দরজার কাছে নয়নতারা বলল, 'শুনছ, ওরা পান চাইছে'।

কথাটা বলে নয়নতারা সরে এল। তার ঠোঁট দুটিতে একটা হাসির ভাব ফুটল। অনেকের ঘুমের ভঙ্গি হাস্যকর।

পূজার দিকটায় গুমোট, এদিকে বরং বাতাস চলছে। খিলান ধরে রাখা থামের আড়ালে টানা দালান,

কিন্তু ওখানে পথটা মোড় নিয়েছে দুই দেয়ালের জোড়ে। আর জোড়ের কাছেই দেয়াল। সিঁড়িটা সন্ধ্যার মতো না-হলেও এখনও উজ্জ্বল—যেন খানিকটা জায়গায় দুধ ঢালা। এপারে-ওপারে আলো কম। মাঝখানে ওটা যেন স্রোতের ব্যবধান। সাবধানে পার হতে হবে। ঝটিতি আলোটুকু পার হল নয়নতারা। কিন্তু কোথায়?

একটা সিঁড়ি এখানে নিচের বাঁধানো চত্বরে নেমে গিয়েছে। থামের গায়ে হেলান দিয়ে কে একজন বসে সে-সিঁড়িতে। নয়নতারা চাদরের ঘোমটাকে কপাল মুখের দু'পাশ ঢেকে ঠোঁটের কোণ পর্যন্ত এগিয়ে আনল। সিঁড়ির লোকটি মাথা ফেরাল।

শাড়ি ঘিরে এই পশমিনা চাদর যা আর শাল নয়, মোটা বুনোটের যা আধো-অন্ধকারে গড়া থেকে পৃথক নয়। কিন্তু এ কি সত্য প্রত্যেকের হাঁটার ভঙ্গি পৃথক যাতে শুধু হাঁটা দেখে বোঝা যায় কে চলেছে? লোকটি সম্ভবত রূপচাঁদ। হয়তো এখনই জানতে চাইবে নয়নতারাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে কিনা। নয়নতারা দেয়াল ঘেঁষে সেই দেয়ালগিরি পার হয়ে এল। ছি-ছি, নয়নতারা!

চাদরটাকে একটু টেনে নিজের হাত দু'খানাকেও ঢাকল সে। সামনে একটা ছোট দেয়াল। এখানে পথ বাছাই করতে হবে তাকে। সামনের দেয়ালটার গায়ে তার ছায়া পড়ল। মাথাটা একটু নিচু করে যেন নিজের ছায়াতে ডুবে দেয়ালটার বাঁ পাশ ঘুরে দেয়ালটাকে পার হল সে, এবং তারই ফলে যেন উপরের মহলে যাওয়ার সিঁড়ির সামনে এসে পড়ল। উপরের মহল, যেখানে রানী এবং রাজকুমারের ঘরগুলি। রানীমা তো এখন পূজার সামনে।

কাচকড়ার দেয়ালগিরি সিঁড়িতে। কাঠের সিঁড়ি। কী অসম্ভব নির্জনতায় চওড়া, পিছল ধাপগুলো চকচক করছে। যাকে ল্যানডিং বলা হয় তার উপরে বেশ খানিকটা আলো। রাজকুমারের ঘরের দরজা ল্যানডিং থেকে একপাক ঘুরলেই। কিন্তু আলোটা কি তার ঘরের? জেগে আছে কেউ?

এ কি নিমন্ত্রিতদের জন্য পান আনতে যাওয়া?

নিঃশ্বাসে একটা অসমতা দেখা দিচ্ছে। কিন্তু তাই-বা কেন, সে তো এখনও সিঁড়ির গোড়ায়। মানসিক শ্রম? নিঃশ্বাসের অসমতা তার অনুভূতির ভুল ভাবতে গিয়ে তার অন্ত্রে কোথাও কাঁপন লাগল। বুকের মধ্যে রক্ত কেমন করছে, সেজন্যই যেন ঠোঁট দুটিও ঈষৎ ফুলে গেল।

রাজু কি জেগে আছে? এখন তো অনেক রাত, নাকি তার ত্বকেই এটা কাঁপন। সে নিজেই লক্ষ্য করেছে, রাজু নাটক দেখতে যায়নি।

আসলে... আসলে এইসব বিচিত্র রকমের আলোই দায়ী। ঠিক যেন আলোও নয়। রক্তস্রোতে সেই আলো মিশে গিয়ে কী সব ঘটাতে পারে।

সিঁড়ির গোড়া থেকে ডাইনে কিছু দূরে একটা বড় জানালা, নাকি 'ফ্রেঞ্চ উইনডো বলে। নয়নতারা একটু তাড়াতাড়ি সেদিকে সরে গেল। সে তো পান নিতে এসেছে। সে বড় জানলাটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল, আর তখন এক ঝাপটা ঠাণ্ডা বাতাস লাগল তার কপালে।

কী আশ্চর্য! নিচে কাছারির আঙিনার এদিকে-ওদিকে আলো এখন অনেক কম। সদর-দরজার নিচে ঝাড়টা বেশ স্পষ্ট। কাছারির বারান্দার দেয়ালগিরি যেগুলো চোখে পড়ছে, প্রদীপের মতো মৃদু। এত সহজে এত তাড়াতাড়ি কেমন একটা পরিবর্তন হয়। রাজবাড়ির দেয়ালের আলো, কাছারির দেয়ালের আলো, সদরদরজার আলো সব মিলে আলোর একটা জাজিম বিছানো ছিল। যেন বিভিন্ন উৎসের আলো খানিকটা গিয়ে থেমে যাচ্ছে, মধ্যে-মধ্যে অন্ধকারের গলিপথ।

জানলাটার নিচে দু'ধাপ সিঁড়ি।

নয়নতারা নিজের গলার মধ্যে কী অনুভব করল। যেন তা বাষ্পের মতো, যা থেকে জল হয়। হঠাৎ তার মনে হল, কেটের অভিনন্দনই তাকে এমন কষ্ট দিচ্ছে। তার বলা উচিত ছিল, মিথ্যা। আর বুকের মধ্যে যে-চাপ সে তো উপোসের জন্য। মিথ্যা নয়, রাজকুমারের বিয়েতে যে-উৎসব হবে এই উৎসব

দিয়ে তার ধারণাই করা যায় না।

উপোস রানীমাও করছেন রাজকুমারের কল্যাণ কামনায়। অনেক বেলায় সে একবার রানীমার চোখে পড়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন—মুখ শুকনো দেখছি, খাওনি তুমি? সে বলেছিল—রাত হয়ে গেল, এখন আর খাব না ভাবছি।

দুটো বাজল দেউড়িতে। এরই মধ্যে! কৌতুকের তো! শব্দ লক্ষ্য করে অস্পষ্ট হলেও নয়নতারা দেউড়ির সেই বরকন্দাজকে দেখতে পেল যে ঘড়ি পিটল।

কিন্তু তিরস্কারে কার না চোখে জল আসে?

ওরা বোধ হয় থিয়েটারের দল যারা মঞ্চের সামনে নেমে সব জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলছে। তাদের শরীরের উপরের দিকটায় কিছু আলো। .

তিরস্কার কোথায়? সেই যে ব্রহ্মঠাকুরানী একটা হাসির অঙ্কের ধাঁধা পেতেছিল।

লোকগুলোর, দ্যাখো, পিঠে আলো পড়ছে। সুতরাং ওই ছোট-ছোট দলগুলো যা চোখে পড়ছে, যারা দেউড়ির দিকে চলেছে, তারা উৎসব শেষে ঘরে ফেরার দল। দেউড়ির বাইরেও এই রাতেও তাহলে লোক চলেছে। তাদের কেউ-কেউ নিশ্চয় সার্বভৌমপাড়ার পথ দিয়ে যাবে।

ফ্রেঞ্চ উইনডোর নিচে সিঁড়িতে পা দিল নয়নতারা। একটু অসুবিধা হয়ই, ধাপগুলো স্বাভাবিকের চাইতে উঁচু। কিন্তু মাটিতে পা দিয়েই সে তরতর করে হেঁটে চলতে পারছে। কোনো একটা দলের পিছনে পৌঁছে, দলটার পাশ কাটিয়ে একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে তার আগের দলটিকে ধরে, এমন করে একটু তাডাতাড়ি চলে। শাড়ি-চাদরে সে তো নিজেকে ভালো করেই ঢেকে নিয়েছে, সে নিজের বাড়িতে পৌঁছে যেতে পারবে। হলই-বা শেষ রাত।

প্রতিমার সামনে রাখা ঘিয়ের প্রদীপের সারিতে তন্ত্রধার পলতেগুলোকে উস্কে দিল। পূজা এখন শেষ হতে চলেছে, বোধ হয় যজ্ঞ শুরু হবে। পুরোহিতের কিছু পিছনে যাঁকে প্রতিমার মুখের দিকে চেয়ে স্তব্ধভাবে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে, তিনি রানীমা-ই। এখানে আসবার আগে স্নান করেছিলেন। চুলগুলো ভিজে ছিল, নির্জনতায় এখন ঘোমটার পাশ দিয়ে সেগুলোকে সামনে এনেছেন। সে চুল অজস্র, আসনের উপরে লুটোচ্ছে।

রানী ভাবলেন : ইনি মহান অর্থাৎ অনন্তকালের প্রতীক। কোটিকে কোটি দিয়ে গুণ করেও অনন্ত হয় না। যাহা হয় তাহা কালেই হয়। কালের বাইরে কিছু হয় না। হওয়া অর্থে জন্ম, বেড়ে ওঠা, মৃত্যু, মিলন, বিচ্ছেদ। আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, অনুভূতিতে ইনি সীমাযুক্তা কিন্তু অনন্ত ব্যাপ্তিতে প্রবাহিতা, সুতরাং জ্ঞান ও অনুভূতি উভয়ের প্রতি উদাস। সুখ কী? দুঃখ কী?

পুরোহিত ঘণ্টা বাজাল মৃদু শব্দ করে। ঝুঁকে পড়ে একমুঠো ফুল নিয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে বসল। দ্রুত অস্ফুট স্বরে কিছু বলছে, তার বুকের পাশ দুটো যেন ফোঁপাচ্ছে। দ্যাখো তন্ত্রধারকের গাল বেয়ে ধারা। রানীমা বলেছিলেন বটে, আমার হয়ে অঞ্জলি দিও। সে কি ভয় পাচ্ছে? ফুলের সঙ্গে-সঙ্গে ফুলকে প্রতীক করে নিজের চেতনার সীমা দ্বারা আবদ্ধ সবকিছুকে সীমাহীনতায় নিমগ্ন করার ভয়?

৮

নয়নতারা তার বাড়ির কাছাকাছি এসে একটু আস্তে চলতে শুরু করল। মৃদু ক্লান্তিও বোধ করছে সে। রাত জাগার ক্লান্তির সঙ্গে উপবাসের লঘুতা। সার্বভৌমপাড়ার এই পথেও দূরে-দূরে দু-একজন লোক, গাছের ছায়ায়, আলো-অন্ধকারে চলেছে। শেষ রাতের হিমেল বাতাসে শেষ রাতের মলিন চাঁদের আলোতে পথের ধারের দু'একটা পল্লব মৃদু-মৃদু নড়ছে।

একটু চমকে গেল সে। একটা মাঝারি চেহারার পালকি নিঃশব্দে, বিনা হাঁকে কিন্তু অস্বাভাবিক দৌড়ে,

যেন তার গায়ে এসে পড়তে পারে, সে সরে দাঁড়ানোতে তার পাশ কাটিয়ে উড়ে গেল যেন। একজন ছিপছিপে চেহারার বরকন্দাজই যেন পালকির ওপাশে দৌড়চ্ছে।

নয়নতারা কৌতুক বোধ করল। কৌতূহলও। এ পথে এখন কে এমন যায় পালকিতে? হতে পারে কোনো জোতদার যে আমন্ত্রণ সেরে ফিরছে। কিন্তু মজা দ্যাখো, হুমহাম নেই বেহারাদের। অবশ্য সে শুনেছে, জোতদাররা রাজবাড়িতে সম্মান দেখাতে রাজার নিজগ্রামে যানবাহনের ব্যবহারে বাহুল্য করে না।

কৌতূহল ও কৌতুক নয়। বিদেশি বাক্‌রীতিতে, বিস্ময় ও ভয়ই তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সে নিজের বাড়ির দরজায় পা দিয়ে দেখল, পালকিটা আরো এগিয়ে তার বাড়ির উঠোনে দাওয়া ঘেঁষে নামানো হল। মলিন নিষ্প্রভ আলো সত্ত্বেও পালকির চতুষ্কোণ গাঢ় ছায়া, বেহারাদের ছায়া-কালো ঘন-সন্নিবিষ্ট দীর্ঘতা—চোখের ভুল হতে পারে না। আগের চিন্তার ছায়া পড়ল মনে, কোনো অর্থশালী জোতদার? সঙ্গে-সঙ্গে 'কী' এই একটা অনুচ্চারিত শব্দ প্রতিস্পর্ধায় তার সমস্ত চেতনায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

কিন্তু অন্যপক্ষেরও চোখ ছিল। সেই ছদ্মবেশী বরকন্দাজ অত্যন্ত দ্রুত নিঃশব্দে এগিয়ে এল। সে খুক করে কাশল। তারপর যেন অব্যক্ত কান্নার শব্দ করল।

'রূপচাঁদ'? নয়নতারা বিস্মিত প্রশ্ন করল।

'মা, আপনাকে মা-জি বলেছি সেই কতদিন আগে'।

'বেশ তো! তাতে কী হল'?

'ভালোই লাগছিল। বললেন, চল তো সব ঘুরে দেখি। এ-ঘর ও-ঘর, এখানে আলোর নিচে, ওখানে ছায়ায়, এ-মহল, সে-মহল, সঙ্গে বেড়াচ্ছিলাম, মনে হল হাসছেন, মনে হল কিছু খুঁজছেন, ক্রমশ রেগে যাচ্ছেন, এক জায়গায় হোঁচট খেলেন, তারপরে বললেন, তুই জানিস না, হতভাগা, আমি একা থাকতে পারি না? তারপর বললেন, কোথায় সে? আরো রেগে বললেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে যদি তাকে আমার ঘরে না-আনতে পারিস, কাল সকালে তোর মুখ যেন দেখি না'।

'রাজকুমারের কথা বলছ, রূপচাঁদ'?

'অমন রাগের কথা আমি কখনও শুনিনি। মনে হল, ভয়ঙ্কর রকমে জোর খাটাতে চাইছেন'।

'তুমি পালকি এনেছ কেন? গ্রাম ছাড়া হওয়ার ভয়ে'?

'তর্জন-গর্জন নয়, কিন্তু সে-রাগ এতটুকু মিথ্যা নয়'।

নয়নতারা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, তারপর কী ভেবে পালকিটার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু রূপচাঁদই এগিয়ে এসে পালকির দরজা আড়াল করে দাঁড়াল বরং।

বলল, 'মা-জি, মনে হল বে-এক্তিয়ার'।

'তুমি যেতে নিষেধ করছ?

'সাধ্য কী আমার? কী সর্বনাশ না-জানি হয়! আমি বরং গ্রাম ছাড়া হই এই রাতেই।

নয়নতারা চাপা গলায় প্রশ্ন করল, 'খুব মদ খেয়েছেন নাকি'? সে এগিয়ে গিয়ে মৃদু আলোতে পালকির দরজার চকচকে কাচের হাতলে হাত রাখল। রূপচাঁদ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। নয়নতারা নিজেই পালকির দরজা সরিয়ে হেঁট হয়ে পালকির গদিতে গিয়ে বসল। দরজা টেনে দেওয়ার আগে বলল, 'পালকি তুলতে বলো রূপচাঁদ'।

কাউকে-কাউকে অভ্যাসবশেই মাথা খাটিয়ে চলতে হয়। রাতের শেষ প্রহরে রাজবাড়িতে পালকি করে পৌঁছলে বহু দূর-দূর ছড়ানো গল্পের একটা উপকরণ হবে। গল্পটা কী হবে সেটাই আসল কথা। সে পালকির দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে রূপচাঁদকে খুঁজল। রূপচাঁদ কি লজ্জায় পিছিয়ে পড়েছে? নয়নতারা লজ্জার মতোই কিছু অনুভব করল, যাকে বরং গ্লানি বলা উচিত। রাজবাড়ির হাতার যে-কোনো

আলো-নিবে-যাওয়া নির্জন জায়গায় নেমে পালকি আর রূপচাঁদকে বিদায় দেওয়া কি ভালো হবে? রাজবাড়ির সেই জায়গাটা রাজকুমারের মহল থেকে যত দূরে হয় ততই ভালো। রূপচাঁদের কথাতেই প্রমাণ ব্যাপারটাকে কী অর্থে নেওয়া সম্ভব।

রূপচাঁদের মনও চিন্তামুক্ত ছিল না। যেমন সে চিন্তার ভারে পিছিয়ে পড়ছিল তেমন চিন্তার চাপেই এগিয়ে এল। তখন রাজবাড়ির সদর-দরজায় ঝুলানো ঝাড়ের আলো পড়ছে বেহারাদের মুখে।

বেহারারা অদ্ভুতভাবে নিঃশব্দ, তাই রূপচাঁদের চাপা গলা শুনতে পেল নয়নতারা। 'আপনি কি পূজার আঙিনায় নামবেন, মা-জি'?

এটাই কি ভালো হয়? বেচারারা যদি তাদের অভিজ্ঞতার গল্প করে, বলবে, পূজায় কী দরকার পড়ায় সার্বভৌমপাড়া থেকে নয়ন-ঠাকরুনকে আনতে হয়েছিল। নয়নতারা ভাবল, এটা কি একটা ধোঁকা তৈরি করছে রূপচাঁদ? কিংবা সে কি ভাবছে, তার এখন রানীমার কাছে আশ্রয় নেওয়া উচিত? পালকি নিঃশব্দ হলেও দ্রুতগতি। কী গ্লানি!

নয়নতারা একটু হাসল যেন, 'বলল, বলো কী রূপচাঁদ? সেখানে পূজার ভিড়ে কোথায় কোন কাজে আটকে পড়ব'! গলার কাছে একটা বাধা। সেটাকে গিলে ফেলে সে বলল, 'গাড়ি-বারান্দা থেকেই রাজকুমারের মহল কাছে হবে'।

গাড়ি-বারান্দার আলোটা যেন বাসি। গাড়ি-বারান্দা থেকে হল্, হল্ পার হয়ে ঢাকা অলিন্দ দিয়ে সিঁড়ির ঘর, এখন সব জায়গাতেই আলো কম। আলো থেকে দূরে-দূরে যে-অন্ধকার তাই বরং গুণবান, তার স্নিগ্ধতা আছে।

সিঁড়ির মাথায় চৌকোণ জায়গাটা যাকে ল্যানডিং বলা হচ্ছে সেখানে একটা আলোর পাত। নয়নতারা সেখানে পৌঁছতে রাজচন্দ্র বলে উঠল, 'কে নয়ন? কথা ছিল'।

এখন নয়নতারার অবাক লাগল যে তার এত নিঃশব্দ চলার শব্দও রাজকুমার শুনেছে! এই রাতে, রাত যখন শেষ হতে চলেছে, সে জেগে আছে! কিন্তু এসবের আড়াল থেকে তার মনে হল, কী ঘটেছে যে ঘুমোতে পারেনি? কী আশায় জেগে আছে?

একটু সাহসের সঙ্গে আধখোলা দরজাটার কাছে গিয়ে সে বলল, 'এই দেখুন, সকলের মধ্যে থেকে যদি এমন করে অনুরোধ করবেন'?

রাজচন্দ্র বলল, 'রাজকুমারের মনে থাকে না। কী করি? তুমি যে আমার নয়ন, বড় লাজুক। অথচ নিচে ওই যে জনারণ্যে যার কথা হচ্ছে সে কিন্তু বেশ সাহসিকা'।

নয়নতারা বলল, 'ঘুমোননি কেন'?

'তোমাদের এই উৎসবের এত সোরগোল'! এই বলে রাজচন্দ্র সরে এসে নয়নতারার মুখোমুখি দাঁড়াল, বলল, 'বাহ্ কী সুন্দর এই চুল কয়েকটি'!

নয়নতারা ভাবল, কার কথা বলছে রাজু? কে যথেষ্ট সাহসিকা?

রাজচন্দ্র বলল, 'আর দ্যাখো তো এই রূপসীর কপাল'!

নয়নতারা বলল, 'আপনি কি কোনো পালাগানের কথা ভাবছেন, রাজকুমার'?

রাজচন্দ্র হেসে বলল, 'তুমি কি আজও আবার মনে করিয়ে দেবে বিদ্যা নামে সে-কন্যে সাধারণী মানুষী নন'?

'আপনি ও-রকম করে কথা বলবেন না। আমি বলছিলাম, আজ নিচের চত্বরে নাটক হয়েছে। পালাগান হয়নি'।

নয়নতারা ভাবল, আশ্চর্য নয় কি যে জানলার নিচেই এত সোরগোল তুলে, ভালো হোক মন্দ হোক, একটা নতুন কিছু হল যার নাম নাটক, অথচ রাজকুমার যেন অন্য কোথাও থেকে এইমাত্র এল! যেন রাজবাড়ির কোথাও ছিল না!

রাজকুমার বলল, 'হয়নি? না-হোক। কিন্তু তা বলে তোমার চুলগুলি যদি এই রাতের আলোয় কপালে লতিয়ে সুন্দর দেখায়, কেউ কি বলবে না'?

'কেউ না-বলে, তুমি বলো। না-হয়, কাল কোথাও চলো, বেড়াতে যাব। কিংবা কাল এই প্রাসাদের নানা নির্জন ঘরের যে-কোনো একটিতে বসে আমরা সারাদিন গল্প করব'।

'কিছু বোঝো না তুমি নয়ন। আজ তোমাকে দরকার। বরং ভোরবেলায় কাক ডেকে উঠতে যখন তোমাদের পূজার সঙ্গে-সঙ্গে উৎসবের রাত্রি শেষ হবে, রানীমা ঘুমোতে যাবেন, তখন তাঁকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে তুমিও বাড়ি যেয়ো। বাহ্, কাছে এসো'।

নয়নতারা নিজের হাতের দিকে চোখ নামাল। কখনও কখনও আঙুলগুলো অশান্ত হয়।

রাজু ল্যানডিং-এর ব্যানিস্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। বলল, 'তোমার প্রথমবারের উৎসবের কথা মনে আছে নয়ন'? সে হাসল যেন। 'সকালে উঠে অবাক! কিংবা তখনও উঠিনি, ভাবছি এ কোথায়? দেখি, পাশে ঘুমিয়ে আছ তুমি। কী করে যে হয়? একটা রাত ঘুমিয়ে থাকলাম, একটা কথাও হয়নি! কোথা থেকে সুঘ্রাণ আসে'?

কথার কি নিজেরই জন্মানোর ক্ষমতা আছে? নয়নতারা বলল, 'শুনেছি, একরকম মৃগের ওই দশা হয়'।

কিন্তু কথাটা বলে ফেলেই পিছিয়ে এল নয়নতারা, যেন অদৃশ্য কোনোগণ্ডি তার পায়ের আঙুলে মুছে গিয়েছে। যেন অদৃশ্য এক পর্দা কিছু সরে গেল হাত লেগে। এরকম অ বস্থায় ভয়-ভয় করে ওঠে।

কিংবা খানিকটা ভয় তার ছিলই, যেজন্য রাজচন্দ্রকে সে ভালো করে দেখেনি। তার মনে হল, এমন মৃদু সুরার গন্ধ ছিল সেই প্রথম উৎসবের রাত্রিতে রাজুর মুখে! চোখের প্রান্তগুলো লাল হয়ে উঠেছে। আর যেন টালমাটাল করছে দৃষ্টি। পায়ের ডিম-ছোঁয়া ঢিলে জোব্বা, ঢিলে পাৎলুন, চটি, ধোঁয়াচ্ছে এমন পাইপ বাঁ হাতে, একগোছা চুল কপালের উপরে। বাঁ পায়ের পাৎলুনে রক্ত!

'এসো নয়ন' বলল রাজু।

'কোথায় যাব'? নয়নতারা ভাবল, রাজকুমারের কাছে গিয়ে কি তাকে অনুরোধ করা যায় ঘুমোতে যেতে?

রাজচন্দ্র ল্যানডিং বরাবর একটু সরল। এমন কোনো-কোনো জায়গা আছে যেখানে দাঁড়ালে কুয়োব গোড়ায় সিঁড়ির শেষ ধাপটা চোখে পড়ে। সেখানে কি কাউকে চোখে পড়ল? কেউ কি সেখানে ক্লান্তিতে বিবশ হয়ে মুখ ঢেকে বসে আছে?

রাজু বলল, 'এখন আর আমার কিছু দরকার নেই, রূপচাঁদ। ওদিকেও পুজো শেষ হতে চলল। একবারে স্নান শেষ করে পুজোর কাছ থেকে ঘুরে এসে ঘুমোব। তুমি ওদের ভোররাতেই গরম জল দিতে বলো'।

রাজু ব্যানিস্টার থেকে সরে এল। তার কি তখন পা টলল?

নয়নতারা বলল 'কোথাও যাবে বললে'?

রাজু এগিয়ে গিয়ে তার শোবার ঘরের দরজা খুলল। ঘরে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে তামাকের থলে বার করতেই নয়নতারা বলল, 'খুব হয়েছে! ভালো হয়েছে বাগচী-মাস্টারের শিক্ষা! কিন্তু এখন অনেক রাত'। রাজু পাইপ থেকে ভস্মাবশেষ গালিচার উপরেই ঢালছিল, হাত বাড়িয়ে পাইপটা নয়নতারার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাও'।

রাজকুমার হেঁটে গিয়ে চেয়ারে বসল। পিছন দিকে যেন আর-একটু ঘেঁষে বসল। কিন্তু এই চোখে কি ঘুম আসে? ইস্পাত হলে তা সাদা হতে হবে এমন নয়, নীলাভ হতে পারে। প্রান্তগুলো লাল, কোলে কালিমা।

নয়নতারা বলল, 'এই তামাকই ঘুম তাড়িয়েছে'।

রাজু চোখ মেলে চাইল। নয়নতারাই বরং চোখ নামাল। রাজু হাসল। অনুচ্চ, কিন্তু তা যেন সেই গ্রামের তুলনায় তরল। যেন কয়েকটি কাচের গুলি একসঙ্গে গড়িয়ে গেল। সে বলল, 'বলো এখন কী করি? কিংবা দ্যাখো আমাদের দুজনকে ঘিরে কেমন নিস্তব্ধ অগাধ রাত্রি এই মহলে। তুমি কি ওই দেয়ালগিরি দুটোকে নিবিয়ে দেবে'?

নয়নতারা জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এতক্ষণ কী করছিলে, রাজকুমার'?

রাজকুমার বলল, 'সে এক ভারি মজার ব্যাপার! রূপচাঁদকে সঙ্গে নিয়ে রাজবাড়ির নিরাপত্তা পরীক্ষা করতে বেরিয়েছিলাম। (মুখটা কঠিন হল যেন)। রূপচাঁদ হয়তো গুলি খেয়েছিল, আমি মদ ছাড়া কিছু খাইনি। জানো, একবার রূপচাঁদকে জিজ্ঞাসা করলাম, বল তো কোন ঘরটা মানায় নয়নকে'?

'কিন্তু তার জন্য রাত জাগতে হবে কেন'?

'বাহ্, অন্যান্য দিন দেখার সুবিধা কোথায়? লোকজনে আসবাবপত্রে গিস্‌গিস্ করে না? জানো, অনেক কিছু জানতাম না এই রাজবাড়ির। জানো, রূপচাঁদ ক্রীতদাস? জানতে না তো'? রাজু হাসল।

'এতে হাসির কিছু নেই'।

'নেই? জানো রূপচাঁদের উপরে খুশি হয়ে বললাম, বাগচীমাস্টার বলেছে আইনে আর ক্রীতদাস রাখা যায় না। তুই তোর লখনউ-এ ফিরে যা। তাতে ও যেন কাঁদল। নাকি আমি ভয় পেলাম। ওব চোখ দুটো ভিতরে ঢুকে গেল যেন মড়ার খুলিতে। বলল, রাজবাড়ির বাইরে যেতে তার খুব লজ্জা করবে। আচ্ছা, আমি ঠিক উচ্চারণ করছি তো কথাগুলো'?

'এ রকম ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না, রাজকুমার। আমাকে কি তোমার কাছে যেতে দেবে? পা-টা একটু দেখব'।

'আসলে রূপচাঁদ ঠিকই বলেছে। আমাকে যদি কেউ রাজবাড়ির বাইবে যেতে বলে আমারও লজ্জা করবে'।

'তুমি কি আজকাল রূপচাঁদের সঙ্গে তুলনা করছ নিজেকে'?

'কী যে বলো! রূপচাঁদ গুলি খায়! উ-উ, লাগে'!

'একটু স্নানের ঘরে এসো। পা-টা ধোয়া দরকার'।

'আচ্ছা, নয়ন, তেলাপোকাকে শুঁড় নাড়তে দেখেছ? আমাব নিজেরই মনে হল আজ তা দেখে—পণ্ডিতরা বলেন, তা ক'রে নাকি ওরা বুঝতে চেষ্টা করে কোথায় আছে'।

'কথাটা অসংলগ্ন হল। এই শীতের ভোররাতে তোমার তেলাপোকা আবিষ্কাবে উৎসাহ বোধ কবছি না'।

'রাগ কোরো না। আমি রাজবাড়িটাকে মেপে দেখছিলাম মনে-মনে'। রাজকুমাবের দৃষ্টিটা হঠাৎ যেন গভীর হল। সে বলল, 'গোড়াতে ছিল না। পরে ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ মনে হল, আমার মা, আমার নয়নতারা, আমার গ্রাম, আমার বাড়ি তার মধ্যে ঠিক যেন আমি কোথায় বুঝতে পারছিলাম না। জানো, আর বিদ্রোহ হবে না'।

নয়নতারা বলল, 'তাও ভালো, আমি ভাবি নতুন রানী এলে তার জন্য প্রাসাদের কোথায় কী বদলাবে তাই দেখতে ঘুরছিলে'।

মধুর রসিকতাটার উত্তর দিতেই যেন অভ্যাসবশে মুখটা তুলল রাজকুমার, কিন্তু উত্তরের মুহূর্তটা পার হয়ে গেল।

নয়নতারা ভাবল, কিছু কি দুশ্চিন্তা করতে হবে রাজকুমারের জন্য? এগুলো কি নেশার ঘোরের গোপনে জেগে ওঠা কোনো ব্যথা?

নয়নতারা বলল, 'রাজু, আমি তোমার বিছানায় বসলে কি তোমার ঘুম হবে'?

রাজচন্দ্র বলল, 'না বোধ হয়। তার চাইতে চলো তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিই। অন্ধকারে খানিকটা

হাঁটা হবে'।

দরজায় এখন ইংরেজি কায়দায় গা-তালা। নয়নতারা চাবি ঘুরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। বলল, 'পকেটে হাত দিচ্ছ? তামুক খেতে ভালো লাগবে'?

'না', রাজকুমার বলল, 'গলার ভেতরটা যেন শুকিয়ে উঠেছে'।

'একটু মদ খেলে কী হয়? কিংবা রাত শেষ হতে এখন দুঘণ্টা বাকি'।

'আমরা বরং...রাজু উঠল। একটা জানালার কাছে গিয়ে সেটাকে খুলল। ফিরে দাঁড়িয়ে হাসল। বলল, 'এমনকী রানীমার এই জন্মতিথি-উৎসবের মূলেও...

নয়নতারা বলল, 'ঘটনাটা আমি জানি। তুমি আমাকে জানতে দিয়েছ। কী ভাবছ বুঝতে পারছি না। তোমার এই জবরজং জোব্বাটা খুলে দিই'?

'তুমি তো জানবেই। তোমাকে বলতে পেরে ভারমুক্ত হয়েছিলাম। আর কী লজ্জা, বলো, তুমি সেই ভার নিয়ে একজনকে রাজকুমার করে ফেললে'।

নয়নতারা বলল, 'এই উৎসবটার উৎসব হিসাবেও মূল্য আছে'। সে হালকা সুরে বলল। 'প্রিয়জনের কল্যাণে অনেক কিছু করতে হয়। জানো, সেসব শুনে আমিও স্থির করে রেখেছি, মানুষের পানীয় জলের জন্য একটা পুকুর কাটিয়ে দেব'।

রাজচন্দ্র নয়নতারার দিকে সরে এল। যেন নয়নতারা কী বলল তা ভালো করে বুঝতে। বলল হেসে, 'এই, দ্যাখো, নৈনা, তুমিও একজনের পাপস্খালনের চেষ্টায় আছো। একটি প্রাণ হরণ করে অন্য অনেক প্রাণ পোষণ করলে শোধ হয়'?

নয়নতারা ভাবল, এখনই রাজকুমার বলল, আর কোনো বিদ্রোহ হবে না। এমন জায়গায় কথাটা বলা হয়েছে যে মনে হবে আর-একটা বিদ্রোহ হলে সে নিজেকে খুঁজে পায়, রাজবাড়ির ঘরে-ঘরে নিজেকে খুঁজতে হয় না। আর তখন, নয়নতারার মনে পড়ল, সেই কিশোর রাজুকে সে বলেছিল, যেহেতু রাজা অনেক আত্মসম্মানের প্রতীক, সেহেতু রাজাকে নিজের আত্মসম্মান রক্ষায় নির্দয় হতে হয়। সে ভাবল, মরেলগঞ্জের কটুভাষী সেই তহশিলদারকে হত্যা করার ব্যাপারটাই তো রাজকুমারের মনে। তা হতেই পারে। এই জন্মতিথির উৎসব তো সেই নরহত্যাকে আলোর আড়ালে লুকিয়ে ফেলতেই শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু তাকে কি নিরর্থক আর ভয়ঙ্কর বোঝা বলে মনে হয়, যদি একজন নিজেকে আর রাজা মনে করতে না-পারে! সে মনে-মনে বলল, ঈশ্বর সাক্ষী, আমি তোমাকে ঠকাইনি। তখন সেই বিদ্রোহের আয়োজনে তোমাকে রাজকুমারই মনে হতো।

ব্যাকুল হয়ে বলল, 'রাজু, এসব তুমি ভাবছ কেন? রাজু'!

'নয়ন'!

নয়নতারা মুখ নামাল। রাজু হাসল। বলল, 'নয়ন, একবার এক বোকাছেলে তোমাকে নিজের আংটি দিয়ে তোমার আংটি নিয়েছিল। মুখ তোলো। এই জানলাটার পাশে আসবে, নয়ন'?

নযনতারা বলল, 'রাজু তোমার জোব্বাটা খোলো। বিছানায় এসো। আমি চুল খুলে দিচ্ছি'।

খাটের বাজু ধরে দাঁড়াল নয়নতারা। তারপর সে বিছানার এক প্রান্তে বসল। রাজচন্দ্র তার সামনে এসে দাঁড়াল। কোথা থেকে মুখে একটা হালকা হাসি আনল, বলল, 'এ কী নয়ন? তোমার চোখের কোণগুলিতে মুক্তো? এসব কথা তুলে আমি অন্যায় করেছি। আমাকে মাপ করো। জানো, একা-একা আমার মনে হতে লাগল, সেই একটা মানুষ একটা গুলিতে মাটিতে পড়ে কেমন হাহাকার করেছিল! তুমি দেখো, তুমি দেখো, এই রাত্রির প্রভাব রাত্রি শেষ হতেই শেষ হবে। তুমি মুখ তোলো, ওই জল আমার সহ্য হয় না'।

নয়নতারা বলল, 'তোমার মদ তো এ ঘরেই থাকে, কোথায় আছে বলো'।

'এঃ'? রাজচন্দ্র বলল।

নয়নতারা ভাবল, সারাদিন নির্জলা উপবাস করেই বোধ হয় তার এ রকম বোধ হচ্ছে। কেমন যেন ছায়া-ছায়া নয়? অথচ দ্যাখো, রাজকুমার বিদেশি এই জবরজং পোশাকের দু'পকেটে হাত দিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে। এমন তো নয় যে সে ভুলে যাবে কী করে শেষ রাতে সে নিজে এ-ঘরে এসে পৌঁছল। এটা কি এক অভিনয়ের পোশাক? কিংবা...কিংবা এটাই কি একমাত্র কিছু যা রাজকুমারকে এই বর্তমানের, এই বাস্তবের অস্তিত্বে ধরে রাখছে? এমন উপবাস ভালো হয়নি। ভয়-ভয় করে উঠল তার। রানীমা কিংবা পিয়েত্রোর সম্ভাব্য বিদ্রোহের নায়ক, তার নিজের এক কাল্পনিক সিংহাসনের রাজার অস্তিত্ব থেকে সরে এসে রাজকুমার কি সত্যই অতীত এবং বায়বীয় হতে পারে? এগুলোর চাইতে বিষণ্ণ আর কী আছে?

উৎসবের রাত্রিতে তখন নিদ্রা ও বিশ্রামের শ্লথতা লেগেছে। জানলার নিচে তখন আলোর তুলনায় কোমল শীতল অন্ধকার। কালো আকাশে অজস্র হীরার টুকরার মতো তারা। হঠাৎ আবার সাড়া-জাগানো ঢাকের শব্দ কানে এল। রাজচন্দ্র বলল, 'দ্যাখো, দ্যাখো নয়ন, এ আবার কী জুলুস'!

মশাল, পুরোহিত, ঢাক—কোথাও যাচ্ছে, সদর-দরজার কাছে দেখা গেল।

নয়নতারা উঠে এল। রাজচন্দ্র বলল, 'বুঝেছি, শেয়ালকে দিতে যাচ্ছে। তাহলে যজ্ঞ শুরু হতে দেরি নেই। জানো নয়ন, এবার উৎসবে আমার কী লাভ? রানীমা এবার আমাকে কী উপহার দিচ্ছেন? বিশেষভাবে ইংরেজি ভাষায় দক্ষ একজন সবসময়ের সহচর থাকবে। নাকি প্রাইভেট সেক্রেটারি। ছোটলাট, বড়লাট, জঙ্গিলাট সকলেরই নাকি একজন করে থাকে। রানীমার প্রস্তাব। নায়েব-ই-রিয়াসত মন্তব্যের জন্য আমাকে পাঠিযেছিলেন। লিখে দিলাম, আপত্তি নেই।

নয়নতারা ভাবল : কী বিষণ্ণ রাজু! আর এ বিষণ্ণতার মধ্যে দ্যাখো ঠাট্টা যেন অপমানের মতো।

রাজু বলল, 'নয়ন, আমাকে মার্জনা করো। চলো না-হয় পুজোব কাছে'।

নয়নতারা ভাবল : আর আমি নিজে সময় নিয়ে অঙ্ক কষছি যেন কোন ব্রহ্ম-ঠাকরুণের অঙ্কেব হিসাবে পৃথিবী চলে। এদিকে এখনই ভাবছিলাম (অনুভূতিকে ভাবনা মনে হল), রাজু সময়ের তলায তলিয়ে গেল, আমরা আর-সকলে যখন অনায়াসে ভাবছি।

কিন্তু সে হাসল, যেমন করে সে-ই পারে। উঠে দাঁড়াতেই তার চুলগুলো পিঠের উপরে ছড়িয়ে পড়ল। রাত জাগার কাজল চোখে, চোখ দুটো ঝিকমিক করল। বলল, 'তুমি এখন ঘুমোবে না বুঝতে পারছি। আমি এখন পুজোর কাছে যাব। তুমি আসবে? কিংবা কিছুক্ষণ পবে তোমাকে ডাকতে পাঠাব কাউকে'।

সে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলল।

একাদশ পবিচ্ছেদ

ইতিহাসের এই এক নিয়ম, তার উপকরণ না-পেলে সংক্ষেপে বলা ভালো। আমাদের অনুমান ইতিহাস-কথাতেও সে রকম প্রথাই থাকা উচিত। মরেলগঞ্জে এবং রাজনগরে এক বিদ্বেষ-প্রীতির টানাপোড়েনের সম্বন্ধ তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু সেই শীতে রানীমার জন্মতিথিতে ডানকানের পক্ষ থেকে কেউ না-আসলেও বিদ্বেষটা না-বেড়ে প্রীতির ভাবটাই দেখা দিয়েছিল যেন। দিন চার-পাঁচ পরে ডানকানের এই উপেক্ষার কথা না-তুলেও নায়েবমশাই বলেছিলেন, ওকে চাপে রাখো। কেন তা হল না তা নিয়ে অনেক গবেষণা চলতে পারে, কিন্তু সঠিক যেটা জানা যায় তা বিশেষ সংক্ষিপ্ত। যেমন জন্মতিথির এক সপ্তাহ গেল না।

নায়েবমশাই অন্য অনেক দপ্তরের কাজের মধ্যে ল-মোহরারের দপ্তর দেখতে-দেখতে বলেছিলেন—মনোহর সিং-এর সেই টেরেসপাসের হামলার কী হাল? গৌরী বলেছিল—আজ্ঞে, আপনি ঢিলে দিতে বলেছিলেন। নায়েব বললেন—আর কেন? তদ্বির করো, সমন বার করাও। কিন্তু সে সকালেই বাড়ি যাওয়ার মুখে যখন, তাঁর নিজের ভাষায় বুড়ো হাড়ে রোদ লাগাতে তিনি বারান্দায়, দেখলেন, মরেলগঞ্জের ফিটন ঢুকল রাজবাড়ির দরজায়। অবাক কাণ্ড! ফিটন থেকে নামল মনোহর সিং। এদিক-ওদিক না-চেয়ে সোজা চলে গেল দেওয়ানকুঠিতে। এখন তো সকালের কাছারি ভাঙতে আরো আধঘণ্টা। রোদে রাখা চেয়ারটায় বসেই গৌরীকে ইঙ্গিত করলেন। মনোহর সিং আধঘণ্টা বাদেই ফিরে গেল। গৌরী দেওয়ানকুঠিতে গেল। হরদয়ালকে জানাল নায়েবমশায় জানতে চাইলেন, যে এসেছিল সে সত্যি মনোহর সিং কিনা। দেওয়ানের কাছে গৌরী জানাল—মনোহর সিং কাঁদছিল! তার বিবাহ একাধিক, কিন্তু ছেলে একটিই। সে নাকি কলকাতায় লেখাপড়া করত। কী করে কার পাল্লায় পড়ে ক্রিশ্চান হয়েছে কিংবা হবে। আমাদের দেওয়ানজি তাঁকে উদ্ধার করার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন কিনা। নায়েব তামাক খাচ্ছিলেন। তিনি ঠাট্টা করে হেসে উঠতে গিয়ে বেদম হলেন। দশ-বিশ মিনিট কথা বলতে পারলেন না। তাঁর বাড়িতে যাওয়ার পালকি এল। বাড়িতে যেতে উঠলেন হাসি-হাসি মুখে। পালকির পাশে দাঁড়ালেন। গৌরীকে ডাকলেন। সে এলে ভ্রূকুটি করে ভাবলেন। বললেন—মনোহরের ওই একই ছেলে? আচ্ছা, গৌরী, মামলায় কী-বা হয়? তা, তুমি টেরেসপাসের মামলাটা তুলেই নাও। তিনি পালকিতে উঠলেন। নায়েবমশায়ের হঠাৎ এই মত পরিবর্তন কাছারিকে ধোঁকায় ফেলেছিল। কিন্তু সেই ধোঁকা দূর করার মতো কোনো বিশদ বিবরণ কি পাওয়া যায়?

এ রকমই একটা ছোট ঘটনায় হেডমাস্টার বাগচীর ক্রোধের বিবরণ পাওয়া যায়। অথচ সে তো আদৌ ক্রোধী ছিল বলে মনে হয় না। তখন বাগচীর স্কুলে সেই পরীক্ষা নেওয়ার পরীক্ষা চলেছে। স্কুলের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে সর্বরঞ্জন ইংরাজির পরীক্ষা নিচ্ছে, অন্যান্য শিক্ষকেরা নানা শ্রেণী নিয়ে ব্যস্ত। মৌখিক পরীক্ষা, সুতরাং শিক্ষকদের পরিশ্রম করতে হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে, তা জন্মোৎসবের পরে এবং সেবারের ক্রিস্টমাসের আগে, কিন্তু ঠিক কখন ধরা যায় না। পরীক্ষার একটা উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। রোল-নাম্বার অনুসারে ষষ্ঠ বালক ইসমাইল আসতে বাগচী বলল, 'বোসো, ইসমাইল, বলো এবার, তোমার ধর্ম কী'?

'মুসলমান'।

'তোমার ভগবান কজন'?

'একজনা, স্যার'।

'বাহ্! তুমি প্রার্থনা করো? কোন দিকে মুখ করে করো?

'পশ্চিম, স্যার'।

'কেন, তা কেন? অন্য দিক নয় কেন'?

'পশ্চিমে মক্কা স্যার'।

'ও, আচ্ছা-আচ্ছা। ওই ম্যাপটার কাছে যাও। বলো পশ্চিম কোন দিক হয় ম্যাপে'?

'বাঁ দিক'।

'বাহ্! ম্যাপটা'?

'আশিয়ার, স্যার'।

'সুন্দর! মক্কা কোন দেশে'?

'আরব দেশে'।

'বেশ, আরব দেশ প্রথমে, পরে মক্কা দেখাও'।

ইসমাইল মক্কা খুঁজে বার করতে পারল না। বাগচী তখন তাকে মক্কার গল্প, মহম্মদের গল্প বলে জিজ্ঞাসা করল, ক্লাসে কখন মক্কার ম্যাপ দেখেছিল কিনা? মক্কা কোথায় জানতে ইচ্ছা হয়েছিল কিনা?

সে কি কিছু মুখস্ত বলতে পারে? ইসমাইল নমাজের একটুখানি আবৃত্তি করল। বাগচী বলল, 'তাহলে মক্কা বার করা উচিত ছিল'। এই সময়ে ইসমাইল ভয়ে-ভয়ে বলল, 'চোখে কম দেখছি, স্যার'।

'কম দেখছ'? বাগচী সোজা হয়ে বসল। ভূগোল, ইতিহাস, স্মৃতিশক্তি, সপ্রতিভতা—এসব নিয়ে পরীক্ষা। সব থমকে গেল। 'কেন কম দেখছ'?

ইসমাইল দ্বিধা করতে লাগল। তখন হঠাৎ বাগচীর মনে পড়ল, কিছুদিন আগে তার এক ছাত্রের চোখের অসুখ নিয়ে কথা হয়েছিল। অন্য ছাত্ররাও ছিল। তার নাম তো ইসমাইলই বটে। সে কি এই ইসমাইল?

বাগচী চেয়ার থেকে উঠে ইসমাইলকে জানলার ধারে আলোয় নিয়ে তার চিবুক তুলে ধরে চোখ পরীক্ষা করল। তার তো এখন ঠিকই মনে পড়ছে বটে। বিশ্রী রকমের কনজাংটিভাইটিস ছিল সেটা। সে ইসমাইলকে জিজ্ঞাসা করল, চরণবাবু ওষুধ দিচ্ছিল কিনা, সে ওষুধ খেয়েছে কিনা? অবশেষে বলল, 'চরণবাবুকে ডেকে আনো তো, পরামর্শ আছে'।

চরণ এলে বাগচী বলল, 'কী ব্যাপার চরণ, ইসমাইলের চোখটা—কী ওষুধ দিয়েছ?

চরণ বলল, 'হ্যামোমেলিস, স্যার, আর্নিকা দেব কিনা ভাবছি'।

বাগচী বলল, 'ডাক্তার হয়েছ, না? বুদ্ধিতে কুলোয়নি, আমাকে খবর দিলে না কেন'?

চরণ একটু দ্বিধা করে বলল, 'আপনি কনজাংটিভাইটিস বলেছিলেন, আসলে ওটা ঘুষির ফলে। কীবল ঘুষি মেরেছিল'।

বাগচী হুড়মুড় করে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল। সে কী করবে খুঁজে পাচ্ছে না! তার চিৎকার করে কিছু বলতে ইচ্ছা করছে! তার দু-হাত দু-পাশে ঝোলানো, তাদের আঙুলগুলো তেলোকে কুরছে। তার চোখে রাগ আর জল যেন প্রতিযোগিতা করছে! সে তোতলাতে-তোতলাতে বলল, 'কীবল? কেন? কেন বলোনি'?

চরণ ভুল করে সত্য বলে ফেলল,—'কীবলসাহেব আপনাদের বন্ধুলোক, স্যার'।

বাগচী কী বলবে ভেবে পেল না। তার সম্মুখে বাড়ানো ডান হাতের তর্জনী ডাইনে-বাঁয়ে দুলতে লাগল। বলল, 'কেন, কেন বলোনি আমাকে? ছেলেটার চোখ নষ্ট করে দিলে? এত অবিশ্বাস আমাকে? এত ঘৃণা করো আমার ধর্মকে? গেট আউট, গেট আউট'!

বাগচী নিজেই তার ঘর থেকে হনহন করে বেরিয়ে গেল।

বলা হয়, সাহেব হলে কী হবে, রাগটা বামুনে। অর্থাৎ বাগচীর রাগ পড়েছিল। লাঞ্চশেষে যথাসময়ে স্কুলে ফিরে পরীক্ষা নিয়েছিল। তাকে নাকি রোগা দেখাচ্ছিল, অসুখে ভুগলে যেমন হয়। কিন্তু একটা যেন পরিবর্তন হল। কেট দেখল, বাগচী যেন শীতকাতর হয়েছে। শীতের নাম করে স্কুল-ফেরত বাড়ির বার হচ্ছে না। কফি নিয়ে স্টাডিতে ঢোকে, লেখাপড়া করে। পরীক্ষা চলছেই।

লাঞ্চে ফেরবার সময়ও হাতে বই পত্রিকা দেখা যায়। একদিন বলল, স্কুল থেকে দেওয়ানজির কাছে গিয়েছিলাম, আগস্টের টাইমসগুলো নিয়ে এলাম। আর-একদিন তার হাতে বড় এক বান্ডিল পত্রিকা দেখে কেট জিজ্ঞাসা করলে বলল—কলকাতার পত্রিকা। হিন্দু পেট্রিয়ট। দেওয়ানজির কাছে নিয়মমতো আসে। গত ছ মাসের কাগজ নিয়ে এলাম। সময় কাটবে।

এটাই আশ্চর্য, যার সময়ের অভাব ছিল, তার সময় কাটানোর কথা উঠল। এক সন্ধ্যায় কেট তাকে পত্রিকায় মুখ দিয়ে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল—কী এমন বিষয়, এত মনোযোগে'? বাগচী হেসে মুখ তুলে বলল, 'আ, ডারলিং, বোসো বোসো, তেমন কিছু নয়। ইংরেজিটা গ্রামারে ঠিক, কিন্তু ভাষার

যা আসল কথা ইমেজারি নেই, একটু বাসি মনে হয়। আর শুধু রায়তদের কথা, তাদের সুবিধা-অসুবিধা, নীলচাষ, তার দাদন এইসব। তবে প্রশংসা করতে হবে। এই হরিশ মুখুয্যে সরকারি চাকরি করেন, তার উপরে এই পত্রিকার সম্পাদক, লেখক, প্রিন্টার একাধারে একাই সব প্রায়। ভদ্রলোক সময় পান কী করে'?

কেট বলল, 'তবে যে বলেছিলে ভাষাটা বড় নয়, ভাষা শিক্ষার চাইতে ভুল বানান হলেও অন্য সব শিখে নেওয়া ভালো। তোমার কি মনে হয় না ভাষা আর কালচার খুব কাছাকাছি ব্যাপার'?

বাগচী হেসে বলল, 'এই দ্যাখো, ডারলিং, আমি কি ইংরেজি ভাষা আর কালচারকে বাদ দিতে বলেছি? একজনের মুখের ইংরেজি শব্দগুলো কীভাবে ঠোঁট দুটিকে ফুলে পরিণত করে তা না-দেখলে জগৎ অন্ধকার'।

এক রবিবারে ব্রেকফাস্টের পরে কেট বলল—রাজকুমার অনেকদিন এদিক দিয়ে যান না। তুমি তো বিকেলে বার হচ্ছোই না।

বাগচী বলল—তাতে আর কী হল?

সে নিজের চারিদিকে চাইল। জীবন সংযুক্ত হলে স্মৃতিও সংযুক্ত হতে পারে। হঠাৎ কেটের তখন মনে হল বাগচীর এই ভঙ্গিটা তার পরিচিত। এখানে আসার আগে, এমনকী এখানে আসার পরও প্রথম দিকে যেমন নিজেদের বসবার ঘরের বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে নিস্পৃহ ছিল—এটা যেন তেমনই। তখন এ রকম বই পড়া ছিল। বাগচী বলল বটে, তাতে কী হল, কিন্তু তখনই বলল—তুমি ভাবছ আমি ঘরকুনো হচ্ছি? আদৌ না, আমি এখনই বেরোতে পারি। বলতে কি যোগাযোগ দেখা দিয়েছে। কাল স্কুলে শুনলাম, আমাদের শিরোমণিমশায় পড়ে হাত ভেঙেছেন। না, ওষুধ দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। ভদ্রতা রক্ষা। তাছাড়া দেওয়ানজির সঙ্গে দেখা করা দরকার। ওই যে সেই চাকরিটার কথা, তার কিন্তু উত্তর দেওয়া হয়নি। শিরোমণির বাড়ি থেকে দেওয়ানজির কাছে যাব। ডিকেন্সের বই যে ক'খানা আছে তোমার জন্য নিয়ে আসব ভাবছি।

সেদিন বাগচী রবিবার উপভোগ করতেই বেরিয়ে পড়েছিল। সে রকম মেজাজে অনেক বিচিত্র সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে। শিরোমণির টোলের খবর, সেখানকার সংস্কার-কুসংস্কার এই সংবাদের মধ্যে ছিল। কেটকে যা সে বলেছিল তাতে বোঝা যায় সেখানে শিরোমণির চিকিৎসার জন্য এক দরবেশ উপস্থিত ছিল। সেই দরবেশ দাবি করেছিল সে বা তার গুরুপরম্পরায় কোনো বৃদ্ধ-গুরু কাছাকাছি থাকলে আলিবর্দি খাঁ সেভাবে মরত না। হোক তরোয়ালের চোপ, সে সারতই। তবে কিন্তু আছে, গুরুরা খবর পায়নি এজন্য যে আলিবর্দির পাপের 'শরীল', মনিবের সঙ্গে বেইমানি, বন্ধুত্বের নাম করে কোন পণ্ডিতকে নাকি খুন করেছিল। সেই দরবেশের জীবনটা যেমন রহস্যের, সে জীবনটাকেও তেমন রহস্যময় মনে করে। ঠাকুরদা ছিল ওস্তাদ ঢুলি, শেষ বয়সে এক মুসলমানি বাইজির জন্য সমাজের বাইরে গিয়েছিল ; বাপ ছিল লেঠেল ডাকাত, এক বোষ্টুমিকে নিয়ে তিলক সেবা-টেবা করত। দরবেশ তার গুরুদত্ত গুণ নিয়ে ভালোই আছে, পদস্খলিতা এক ভৈরবী জটা ও ত্রিশূল সত্ত্বেও ওর গৃহ রক্ষা করে। দরবেশের এই এক গুণ, ভাঙা গায়ে হাত দিয়ে ব্যথা অর্ধেক কমায়।

শিরোমণির টোলে ছাত্রসংখ্যা তখন কমতে-কমতে পাঁচ। কুড়িজন ছাত্রের জন্য সেই কবে থেকে দেওয়া ত্রিশ বিঘা দু-ফসলি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর। ছাত্ররাও বিচিত্র। তিনজন উপস্থিত ছিল, তাদের একজন ন্যায়, একজন স্মৃতি, তৃতীয়জন বেদান্ত পড়ছে। শিরোমণিই পরিচয় করে দিয়েছিল। সে বলেছিল—এটির নাম গোপাল। পিতার অর্থশালী যজমান আছে। আশৈশব পিতামহ পিতাকে দেখে পূজা বিবাহাদি ব্যাপারে মন্ত্রে দক্ষ। নিজগ্রামে কবিভূষণ উপাধি পেয়েছিল। এখানে স্মৃতি পড়েছে। তন্ত্রে কিছু অধিকার আছে। কিন্তু জননীর ইচ্ছায় এবং দৃঢ়তায় এখানে ফিরে নতুন করে ন্যায় পড়ছে। ওই ফুটফুটে ছাত্রটিকে দেখুন, ব্রজ গোঁসাই, অদ্বৈত বংশের। পিতা অনেক ধনী জোতদার মহাজনের কুলগুরু। কথকতায় ইতিমধ্যে

জুড়ি পাওয়া ভার। ইতিমধ্যে ন্যায় ও স্মৃতির উপাধি আছে। এই টোলে ফিরেছে বেদান্তের জন্যে। কোনো এক তোতাপুরী সন্ন্যাসী নাকি ওদের গ্রামে বারমাস্যায় ছিল। তিনি নাকি বলে গিয়েছেন, কৃষ্ণ কালী ইত্যাদি অলীক কাব্যমাত্র। একমাত্র নির্গুণ অব্যক্ত ব্রহ্মই সত্য, যিনি পূজা ইত্যাদিতে ভ্রূক্ষেপ করেন, ভ্রূই নেই তার ক্ষেপ। ব্রজ বোধ হয় ব্রহ্মের এ-রকম ব্যাখ্যায় বিড়ম্বনা বোধ করল। সে কিছুটা মুখ লাল করে বলল, গুরুমশায়, তোতাপুরী কিন্তু আমার মাকে শুধু নয়, সন্দেহ হয় এখানকার রানীমাকেও মন্ত্রণা দিয়ে থাকবেন। তাছাড়া আপনার কৃত বেদান্তসার-পাণ্ডুলিপিতে—সে থতমত হয়ে মাঝপথে থেমে গেল। কপিল নামে তৃতীয় ছাত্রটি বয়ঃকনিষ্ঠ। শিরোমণি বলেছিল...বারান্দার নিচে খড়ি ফাড়ছে, ওর নাম কপিল। একরকমের স্মৃতিধর। গত বৎসর পড়া বন্ধ করে আমার পুত্রের সঙ্গে কলকাতা গিয়েছিল। ছ মাস ছিল চাকরির খোঁজে। তারপর সেখান থেকে পদব্রজে পালিয়েছে। আহা, ও আমার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ভালোবাসে, একটু খেতে ভালোবাসে। কলকাতায় নাকি নেটিভপাড়া আছে। সেখানে নাকি হাতি-গেলা কালো গঙ্গা বয়। একটু রয়ে-সয়ে থাকলে দু-তিন বছরে এন্টান্সো পাস করে উকিল মোক্তার হতে পারত। বাগচী এই জায়গায় জিজ্ঞাসা করেছিল—আপনার এখানে ইংরেজি পড়া হয় না? সেটা তো অর্থকরীও বটে। কপিল খড়ি গুছিয়ে রাখছিল। কথাটা তার কানে গেল। গুরুর পক্ষে সে কথা বলেছিল। বাগচীকে প্রায় চমকে দিয়ে সে বলেছিল—দি অ্যাজাম্‌পশন ইজ রং, স্যার। অলরেডি দেয়ার আর দেয়ার স্কোরস অব আন্ডার এমপ্লয়েড গ্র্যাজুয়েটস্‌ হু ইক্‌ আউট আ মিজারেবল ইগজিস্টেন্স ইন আনক্লিন স্লামস্‌। শিরোমণি বলল—কী বলল কে জানে! বাগচী কিছুটা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল—তুমি তো কলকাতায় ছিলে, সেখানে রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচরণ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে দ্যাখোনি? কপিল দ্বিধা করল। দু হাতে জড়ো করা খড়িগুলোকে স্থানান্তরে নিতে বুকে জড়িয়ে তুলে, ইতিমধ্যেই সে লজ্জিতও বটে, বলল—এক্‌সেপশন্‌স্‌ টেন্ড টু প্রূভ দ্য রুল, ডোন্‌ট দে?

কিন্তু আসল কৌতুকটা অন্য দিকে। এক ঘোর কুসংস্কার যেন তাদের। তারা বহুবিবাহ প্রথা লোপ অথবা বিধবাবিবাহ-প্রথার প্রচলনকে নিতান্ত মূল্যহীন মনে করে, স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে নিজ-নিজ জননীর কথা মনে রেখে কৌতুক বোধ করে। বহুবিবাহ সম্বন্ধে তাদের যুক্তি রামলক্ষ্মণাদির একদারনিষ্ঠা, ভীমার্জুনেব বহুবিবাহ সমাজে কী এমন ক্ষতিবৃদ্ধি করে? বহুবিবাহ কি ভদ্রসমাজে ছিল? শ্রীচৈতন্যের কাল থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত যাঁদের নাম আমরা জানি সকলেরই পিতা, দেখা যাচ্ছে, একদারনিষ্ঠ। অন্য দিকে বহুবিবাহ গণিতশাস্ত্র অনুসারে অসম্ভব। যেহেতু স্ত্রী-পুরুষের সংখ্যা সবসময়ে সমান থাকে, বহুবিবাহ ব্যাপক চলতে থাকলে বহু অবিবাহিত পুরুষ থেকে যায়, যাদের হিংস্রতায় বহুবিবাহকারীরা নিহত হতো। সতীদাহ প্রথা লোপ হওয়াকে তারা ভালোই বলে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করে বৎসরে হাজার রমণীর সেই মৃত্যুর চাইতে তেমনি হাজার রমণীর বারাঙ্গনায় পরিণত হওয়াকে হেডমাস্টারমশায় সুখদায়ক মনে করেন কিনা? যারা সতীদাহ প্রথা লোপে অগ্রণী তাদের সমাজে বারাঙ্গনা-প্রীতি যথেষ্ট। তাদের বক্তব্য বিধবাবিবাহ প্রথা হিসাবে অচল হবে, কেননা যে-দেশে কুমারীর বিবাহই সমস্যা সে-দেশে বিধবার সুযোগ কোথায়? গোপাল একটু বয়স্ক, সে বলেছিল এই কথাতেই আমরা পুরুষের সমস্যায় আসি। সে বাঁকা করে বলেছিল, কলকাতার তাঁরা পুরুষের সমস্যার কথা তোলেন না, কারণ তাহলে তাদের পৃষ্ঠপোষক ইংরেজ শাসকের সঙ্গে বিবাদে অবতীর্ণ হতে হবে। পুরুষের সমস্যা অবশ্যই অর্থ-উপার্জনের, সমস্যা বলহীনতার যা নারীকে আদর করে, রক্ষা করে।

তখন টপ-হ্যাট মাথায় ঠিক করে বসিয়ে বাগচী একজন বলশালী পুরুষের মতো দীর্ঘ পদক্ষেপে চলেছে। তার হাতের ছড়ি অনেক সময় শূন্যে চক্র খাচ্ছে, ফরাসি গোটিযুক্ত মুখে হাসি-হাসি ভাব। চতুষ্পাঠীতে যা সে শুনে এল তা সব পিছিয়ে-যাওয়ার ব্যাপার, যে পথে সে এবং তার স্কুল, শিরোমণির পথটা যেন তার বিপরীত দিকে। কিংবা বলবে সেই টোলটি এক পুরনো মতবাদের গভীর কিন্তু স্রোতহীন দহ? ওটা কিন্তু দারুণ প্রশ্ন—বৈধব্য জীবনযাপন, সতী হিসাবে দগ্ধ হওয়া কিংবা কলকাতার বারাঙ্গনার

সংখ্যা বৃদ্ধি করা কোনটি বেশি যন্ত্রণার? ও দিকে দ্যাখো, ভীমার্জুন এমনকী দ্রৌপদীর বহুপত্নীত্ব বা বহুপতিত্ব কোন নীতির? তাদের সেই সমাজে কি তাদের কেউ ধিক্কার দিয়েছে? যদিও সেই সমাজে একপতিত্ব নীতির পরাকাষ্ঠা গান্ধারী বর্তমান। এর কারণ কি এই যে ভীমার্জুন বলশালী, দ্রৌপদী ওজস্বিনী। যেন বিবাহের ব্যাপারটাই গৌণ, আলোচনার গুরুত্ব পায় না।

বাগচী ভাবল, তা নির্বলই এ-সমাজ। পুরুষের সমস্যাই তো প্রবল। কলকাতায় যারা ভাগ্যান্বেষণে, তাদের কজনই-বা সার্থক? এটা কি সত্য পুরুষের সমস্যা নিয়ে কথা উঠলেই শাসকের সঙ্গে বিবাদ অবশ্যম্ভাবী? এদিকেও দ্যাখো, রাজবাড়ির বাইরে এদেশে দাদনের সমস্যাটাকেই কাটিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। কৃষক তাঁতি সবাই সমান সমস্যাজর্জর। তার মনে একবার ধনঞ্জয়ের একবার চরণের ক্লিষ্ট মুখ ফুটে উঠল। ধর্ম কি মানুষের অতীত হীনমন্যতা, নীতিহীনতা থেকে মুক্ত করে বলশালী করতে পারে? তার মনে পড়ে গেল কে এক ব্রহ্মবাদী সন্ন্যাসী রানীমার কাছে মূল্য পেয়েছে। কিছুক্ষণ সংবাদটাকে সে মনে-মনে ওজন করল। সংবাদটা নতুন। ওদিকে দ্যাখো, বোধহয় ব্রজগোঁসাই-ই ব্রহ্ম সম্বন্ধে জানতে শিরোমণির কাছে পড়ছে। তাহলে কিন্তু নতুন ধর্ম-আন্দোলন যা কলকাতায় ইংল্যান্ডের ইভানজেলিস্টদের মতো সরব, তার নতুনত্ব থাকছে না। সেদিন এই শিরোমণি এক নতুন মত বলেছিল, জন্মটা পাপ থেকে নয়, মৃত্যুও দুঃখের নয়—সবই বড়জোর সময়ের ব্যাপার।

বাগচী একটু ধীরে চলতে শুরু করে নিজেকে ঠাট্টা করল, ওদের চিন্তাকে সমর্থন করছ নাকি? না না, সত্যই তো, বলেরই তো প্রয়োজন—যে বল কৃষক ও কারিগরকে এক নীরোগ সমাজে স্থাপন করে! সে অবাক হয়ে ভাবল, আশ্চর্য, এমনকী হতে পারে, এইসব—কোন দহে এক আশ্চর্য ফোয়ারা আছে যা অকস্মাৎ দহকে এক বেগবতী নদীতে পরিণত করতে পারে? এমনকী হতে পারে, এমন কোন এক তোতাপুরী দেখা দেবে, যে বলশালী হয়ে ব্রহ্মবিদ্যা আয়ত্ত করবে এবং সমাজকে বলশালী করতে তাঁতিদের, চাষীদের নানা সমস্যা নিয়ে চিন্তা করবে, ধার্মিক হয়েও বলেরই প্রশংসা করবে?

সে অন্যমনস্কের মতো চলে রাজবাড়ির কাছে এসে পড়েছিল। তখন তো বেশ বেলাই হয়েছে। কিন্তু সে চোখ তুলতেই দেখতে পেল, সদরদরজার খিলানের নিচে দেওয়ানজি, তার সঙ্গে ফেলিসিটার। দেওয়ান ফেলিসিটারকে কিছু বুঝিয়ে দিল। হরদয়ালও বাগচীকে দেখতে পেয়ে ফেলিসিটারকে পিছনে রেখে এগিয়ে এল। অভ্যর্থনা জানাল। বলল, 'আপনার কথাই ভাবছিলাম। ডিকেন্সের খানতিনেক নভেল সোফার উপরে একত্র দেখে মনে হল পরে, হয়তো আপনি পড়ার জন্যে নামিয়েছিলেন। আজই আপনার কুঠিতে পাঠাচ্ছিলাম। চলুন, বসি গে'।

বাগচী হেসে বলল, 'সেদিন ডারউইন পড়তে-পড়তে উত্তেজিত হয়ে ওই কাজ। গৃহিণীর জন্য নামিয়েছিলাম ডিকেন্স। এখন সেগুলো নিয়ে যাই। সন্ধ্যায় যদি আসি, বসব'।

হরদয়াল বলল, 'ডারউইনে এত উত্তেজনা কেন? অ্যাডাম থাকছে না বলে'? সে-ও হাসল।

দুজনে পাশাপাশি দেওয়ানকুঠির দিকে চলতে লাগল। এই সময়ে পিছন থেকে ফেলিসিটার বলল, 'আমার কথাটা একবার ভাববেন, সার'!

হরদয়াল চলতে-চলতে খানিকটা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোমার সেই রোডরোলার তো? তা কিন্তু নৌকোয় আনতে মরেলগঞ্জের সেই এক গ্রোসে ঠোকাঠুকি হয়ে যেতে পারে'। সে বাগচীকে বলল, 'এবার ডানকানের দারুণ ক্রিস্টমাস। অনেক গেস্ট। ইয়াকোভের মতে তা নাকি কমিশন। কিন্তু কমিশনারদের কারো-কারো মেমসাহেবও আসছেন, অবশ্য যাদের তা আছে'।

তারা তখন দেওয়ানকুঠির সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। পায়ের শব্দে হরদয়াল মুখ ফিরিয়ে বলল, 'ও, তুমি যাওনি? আরো কিছু আছে নাকি সওদা'?

'তাহলে রোডরোলারটা মঞ্জুর তো সার? ও ছাড়া কি পাকা রাস্তা হয়, সার'?

'আমি তো বলেছি, নরেশ কলকাতা যাচ্ছে, সে দেখবে। পছন্দ করে নেওয়া হবে। আচ্ছা, রোসো।

তুমি যখন থেকেই গেলে, তোমাকে সেই আহিরিটোলার বাড়িটা সম্বন্ধে বলে দিই'।

তখন বাগচীকে একদিকে ফেলিসিটারকে অন্যদিকে নিয়ে হরদয়াল তার ড্রয়িংরুমে বসল। বাগচীর কাছে অনুমতি চেয়ে নিয়ে ফেলিসিটারকে একটা বাড়ির নকশা দেখাল। বলল, 'নরেশকে সব বলে দেওয়া আছে। সে-ই সব কাজ দেখে করাবে। তোমাকে প্রয়োজন মতো মিস্ত্রি, কুলি সরঞ্জাম যোগান দিতে হবে। নকশাটা দ্যাখো। নিচের এই হলটাতে ক্রিস্টমাস গাছ হবে। সেটাই সেদিন বসবার ঘর। তার পশ্চিমের এই বড়ঘরটাতে হবে ডাইনিং-রুম। এই হল্ আর ডাইনিং-রুমের উত্তর-দক্ষিণের ঘরগুলোর সব কটিতেই শোবার ঘর করে সাজাবে। গালচে, খাট, বসার কিছু আসন, আয়না, টেবিল, সাইডবোর্ড। ফার্নিচার যেন খেলো রং-চটা না-হয়, ভাড়া নেওয়ার সময় দেখবে। ওসব ঘরে ধরো আমি, বাগচীসাহেব, এমন আরো কেউ-কেউ থাকব। দোতলার ঘরগুলোর জন্য তোমার ভাবনা নেই। সাফসুতরো করাবে ভালো করে। মেঝের পুরনো শ্বেতপাথরে কিছু করাতে পারবে না। কিন্তু দেয়ালে ছাদে দাগ না-থাকে। ফার্নিচার সবই এখান থেকে যাবে। ওখানে রানীমা, রাজকুমার, আর তাঁদের পরিবারের যাঁরা যাবেন থাকবেন। তুমি দেখবে, নরেশ পৌঁছে কোনো অসুবিধায় না-পড়ে'।

ফেলিসিটার অবশ্যই উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল। বলল, 'আপনারা কবে তক গিয়ে পৌঁছবেন'?

হরদয়াল বলল, 'সেটা ভেব না। নরেশ পরশু সকালে নৌকোয় রওনা হচ্ছে। তুমি তার সঙ্গে যেতে পারবে? নাকি মরেলগঞ্জের কাজ শেষ হয়নি? তাহলে তুমিও পরশু নৌকো ছাড়ো। পনেরোই ডিসেম্বরে বাসা সবদিক দিয়ে তৈরি হওয়া চাই'।

য্যাকব ফেলিসিটার এতদিনে অবশ্য বুঝতে পারে দেওয়ানজির কথার সুর কখন কার দরবার শেষ করছে। সে 'ইয়েস, সার, মোস্ট ডেফিনিটলি সার্টেন, সার' বলে উঠে গেল।

তখন হরদয়াল হেসে বলল, 'এবার ক্রিস্টমাসে রানীমা কলকাতা যাচ্ছেন। রাজকুমার তো বটেই। তাহলে আপনিও চলুন। বাসাটার কথা তো শুনলেন। আর সবদিক দিয়ে ভালো, সামনের লনটা ছোট। ও, আচ্ছা, সেই কথাটা। এখনও কিন্তু আপনার মত জানতে পারিনি'।

বাগচী বলল, 'আমি ডিসেম্বরটা ভেবে দেখি। শেষদিকে জানাব'।

'তা মন্দ হবে না, যদি পয়লা জানুয়ারি থেকেই টেক আপ করেন'। হরদয়াল হাসিমুখে বলল, 'অতঃপর? লাঞ্চের সময় এসে যাচ্ছে, একটু অ্যাপিটাইজার...

বাগচী হেসে বলল, 'না-না। সন্ধ্যায় যদি আসি, তখন অবশ্যই'।

বাগচী ডিকেন্সের নভেল তিনখানা নিয়ে চলে এসেছিল। পথে একবার তার মনে হয়েছিল, ভাগ্যে এখানে দেওয়ানজি আর তার লাইব্রেরি আছে।

সেদিন সন্ধ্যায় কফির কাপ নিয়ে বাগচী তার স্টাডিতে ঢুকলে কেটও তাকে অনুসরণ করল। কফি শেষ হয়েছিল। দু-চারটি সংসারের কথার পর কেট ডিকেন্স্ পেয়ে তা নিয়ে বসেছিল। বাগচী তো কিছুদিন থেকেই যেন ভারতীয় জার্নালিজমের ভক্ত হয়ে পড়েছে। আজও সে হিন্দু পেট্রিয়টের ফাইল নিয়ে বসেছে। ঘণ্টাদেড়েক পার হয়েছে এর মধ্যে একটাই কথা হয়েছে। বাগচী পাইপ সাজিয়ে বলেছিল, 'ম্যাচটা'?

কেট বাগচীর হাতে ম্যাচবক্স তুলে দিয়েছিল। কিন্তু একটানা ডিকেন্স্ পড়তে চোখ অন্তত ক্লান্ত হয়। কেট বলল, 'ও, আচ্ছা, আজ তো রাজবাড়িতেও গেলে না'?

বাগচী যেন চমকে উঠল। পকেট থেকে ঘড়ি বার করে বলল, 'তাই তো'! তারপর হেসে বলল, 'তাতে কী, আজ তো একবার রাজবাড়িতে গিয়েছিলাম। বই আনলাম না? তাছাড়া গ্রামের লোকের সঙ্গেও মিশেছি। তোমাকে শিরোমণির টোলের গল্প বলব'?

বাগচী শিরোমণির টোলের গল্প করল রাতের খাওয়ার সময় পর্যন্ত। খেতে-খেতে বাগচী বলল, 'একটু পিয়ানো বাজাও না আজ। ভেবে দেখো, ওটা রাজকুমার রেখেছিলেন এখানে বেশিরভাগ তুমি একা,

কখনও কখনও তিনি, বাজাবেন বলে'। সে-রাতে খানিকটা পিয়ানো বাজানো হয়েছিল।

কিন্তু কখনও কখনও একটা অনুভূতি হয় যার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। কেটের অনুভূতি হল তারা যেন আবার তাদের সেই মধ্যপ্রদেশের বাংলোর আবহাওয়া তৈরি করে নিচ্ছে। যেন মাঝখানে নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছিল, আবার গুটিয়ে নিজেদের নিঃসঙ্গ করে নিচ্ছে। কী আশ্চর্য, বাগচী এই দু-সপ্তাহ তো, কি সকালে কি বিকালে, একবারও তাদের সেই ডিসপেনসারিতে যায়নি।

২

এ রকম একটা সংবাদই আছে মরেলগঞ্জের জীবন সম্বন্ধে। নীলকুঠির বাংলোর পুবমুখী বারান্দায় সেদিন ব্রেকফাস্টে বসেছিল কীবল ও ডানকান। শীতের রোদ টেবিলে, বারান্দা বটে কাঠের ফ্রেমে তারের জালে ঘেরা। বাংলোর দেয়াল পাকা, খড়ের ছাদ। আটচালা। নিচে সুরকির সড়কে ইতিমধ্যে পাশাপাশি দুটি ঘোড়া। টেবলে ইংলিশ ক্রকারি, ড্রেসডেনের বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। ভাস্-এ গোলাপ। খাদ্যগুলি ইংরেজি হতে পারে না। ডিম, মুরগি, চাপাটি—সকালে, লাঞ্চে, ডিনারে। বেকন, হ্যাম, পর্ক আশা করা যায় না, ভালো ব্রেডও নয়। পরশুদিন বীফ হয়েছিল, কারণ কালেক্টর ম্যাকফার্লান এসেছিল। তার সঙ্গে কীবল সদর পর্যন্ত গিয়েছিল, ফিরতে বিকেল।

ডানকান কি বিচলিত? তার কাবার্ডে কি অনেক কঙ্কাল? ইন্ডিগো কমিশন নিয়েই চিন্তা! আলোচনায় আর্চি হিলের নাম উঠেছিল। ম্যাক আর্চির নাম জানে না। ডানকান বলেছিল, আর্চি একজন প্ল্যান্টার যার কথার মূল্য আছে। আলোচনায় লর্ড পামারস্টোন এবং গ্ল্যাডস্টোনের কথা উঠেছিল। গ্ল্যাডস্টোন, যে নাকি চ্যান্সেলার অব দি এক্সচেকার। ডানকান বলেছিল, হুইগ্‌রা ব্যবসা-বাণিজ্যকে শেষ না-করে ছাড়বে না। ম্যাক কীবলের সমবয়সী হবে। সে কিন্তু খুব সহজভাবে একটা পরিবর্তনের কথা বলেছিল। সে আর কম্পানির কর্মচারী নয়, সেক্রেটারি অব স্টেটের কর্মচারী।

আজ কথা কম হচ্ছে, ডানকান ভাবছে। হয়তো কমিশন নয়, স্ত্রী-পুত্রের কথাই ভাবছে। তারা সেই ৫৭-তে হোমে গিয়েছে, এদেশে আসতে চাইছে না। যদিও ১৮৫৭-৫৮র ব্যাপারগুলো তারা প্রত্যক্ষভাবে জানে না। ফলে এখন এই ১৮৬০-এর শেষেও এই মরেলগঞ্জ স্ত্রীলোকহীন। এই পর্যন্ত ভেবেই কীবল তাড়াতাড়ি মুখ তুলল, বলল, 'হোয়াইট, তুমি কি মনে করো কম্পানি রুল আর সেক্রেটারি অব স্টেটের শাসনে সত্যই তফাত হয়? কাল্পনিক নয়'?

ডানকান বলল, 'তুমি কি হোয়াইট মিউটিনির খবর রাখো'?

কীবল হেসে বলল, 'তা আবার কবে করলে, কিংবা করতে চলেছ?

ডানকান রসিকতার দিকে না-গিয়ে বলল, 'দুই শাসন এক হলে কম্পানির দশ হাজার ইংরেজ সৈনিক ও অফিসার পদত্যাগ করতে চায় কেন? তারা কম বোঝে? আর সবচাইতে বড় প্রমাণ এই কমিশন! জাস্ট থিংক অব ইট! আমি আমার রায়তদের সঙ্গে কী করেছি, তার বিচার? ম্যাঞ্চেস্টারে কাপড় হবে, কিন্তু তার রং? এদিকে দ্যাখো, ম্যাক ছোকরা বলছিল, সে চায় না কমিশন তার জেলায় কিছু কেলেঙ্কারি খুঁজে পায়। যেন আমরা তার অধীন আর আমাদের কাজের জন্য তার দায়িত্ব আছে। এর চাইতে বড় ঔদ্ধত্য স্বপ্নে দ্যাখো? উত্তেজিত ডানকান ঢেকুর তুলল'।

ব্রেকফাস্টে হালকা বিষয়ই ভালো, তাছাড়া সে কি ক্লান্ত নয়? না, সকালে কেন ক্লান্ত হবে? এই ভেবে কীবল বলল, 'তুমি কি সত্যই যাচ্ছ হোমে'?

'নিশ্চয়, ইস্টারে অবশ্যই। তার আগে তোমার পিক আপ করা চাই। তবে কিডিসদের আনব কিনা ভাবতে হবে'।

'কেন, এখানে কি তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বোধ করেছ? ১৮৫৭ বারবার হয় না'।

ডানকানের মুখ একটু লাল হল, সে বলল, 'ইন এ সেন্স তা বলতে পারো। ১৮৫৯-এর চাষিদের ঔদ্ধত্য ভাবো। আমার মনে হয়, এর চাইতে গায়েনা ভালো, নীলের চাইতে সুগার ভালো ; সেখানে অন্তত কোয়েকাররা নেই'।

'এখানে কোয়েকার? কোথায়, কলকাতায়'?

'নয় তো কমিশন বসায়? জাস্ট থিংক অব ইট'!

কীবলের গায়ে রোদ। উষ্ণতায় অনুভব করল, ঘুমিয়ে নিলে হয় ব্রেকফাস্টের পরে। কিন্তু সে নিজেকে সজাগ করল। বলল, 'তুমি কিন্তু কোয়েকারদের প্রশংসাই করতে, যদি আমার ঠিক মনে থেকে থাকে'।

ডানকান বলল, 'সে তাদের ধর্মের ভণ্ডামির জন্য নয়। লন্ডন স্টক মার্কেটের বিশিষ্ট ফোর্স হিসাবে। বলা হতো, যত ধার্মিক তত রেলওয়ের স্টক'।

প্লেট বদলে দিল আয়া। কীবল বলল, 'ধর্মের কথায় বলি, রলের চার্চ মিশনের জন্য একশো একরের টিলাটা আমি আবার দেখেছি। ওটাই ভালো হবে। সদরে কিছু খবরও জেনে এসেছি। ওটা ফরাসডাঙার পিয়েত্রোর ছিল'।

ডানকান গুমরে ওঠার ভঙ্গিতে বলল, 'তার জন্য সদরে যাওয়া দরকার ছিল না। ওটা ইদিলপুর পরগনা। মনোহর সব খবর রাখে। পরগনাটা সেই খেঁকশিয়াল পিয়েত্রোর ছিল। কিছু খাস ছিল যার গোটাটাই সে তার তাঁতিদের, রায়তদের, বরকন্দাজদের মোকরারি দিয়ে গিয়েছে। বাকিটা জোতদারদের। পাঁচ-ছজন তারা। তাদের নাম মনোহর দিতে পারে'।

কীবল ডানকানের চাইতে একদিকে অন্তত এগিয়ে তা বোঝানোব সুযোগ নিল, বলল, 'কিন্তু পিয়েত্রো জীবিত নয়। রেভেনু কে দিচ্ছে পরগনার'? ম্যাকফার্লান নিজেও শুনে অবাক। বলল, 'জানতাম না তো, খোঁজ নিচ্ছি'।

চা নিয়ে এল ডানকানের আয়া। মাঝখানে চেরা একমাথা খয়েরি চুলের নিচে বড়-বড় চোখ, তার নিচে বাদামি ফুলোফুলো গাল যাতে অনেক ব্রণ, চোখের মণিকে নীলচে গ্রে রং বলতে হবে, ছাপা ছিটের গাউনে ঢাকা পিছন দিকটা ঘোটকীকে পরাস্ত করে। কীবল মুখ না-তুলে চোরাচোখে চাইল। ফুলী ততক্ষণে কিচেনের দরজার কাছে। বাইশ হতে পারে বয়স। হয়তো ডানকানের আগে যে ছিল তার, কিংবা কলকাতা থেকে আনা। কিন্তু কয়েকদিন আগে ভোররাতে স্নাইপ শুটিং-এর জন্য বন্দুক আনতে গিয়ে তাকে ডানকানের শোবার ঘরের দরজা খুলে বেরোতে দেখা গিয়েছিল। আর সে কিন্তু এতটুকু বিব্রত ছিল না। বরং কিচেনে ডেকে ছোটসাহেবকে গরম এক কাপ চা করে দিয়েছিল।

কিচেনের দরজার পাশে কীবল জুড়ান পাইকের সেই তৃতীয় স্ত্রীকে দেখতে পেল। জুড়ান, তার মনে পড়ল, সে এখানে আসার এক সপ্তাহের মধ্যে বল্লমের খোঁচায় এক রায়তকে খোঁড়া করে দিয়েছিল। একটা ঝোপের মাত্র ব্যবধান ছিল তার আর সেই ঘটনার মধ্যে। সেই রায়তের পা থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে। সে ডানকানকে জিজ্ঞাসা করেছিল, বাধ্য হয়েই যেন, এটা কী? এ রকম কেন হবে? জুড়ান পাইকের তৃতীয় স্ত্রীর পরনে সবজে চেকশাড়ি, দাসীরা যেমন পরে।

কীবল বলল, 'খাটের রেভেনু তো কেউ-না-কেউ দিয়েছে। অথচ পিয়েত্রো তখন মৃত'। ম্যাক অবাক হয়ে বলল, 'তাই তো, নীলামে ওঠেনি পরগনা! তুমি বোধ হয় এসব আগে ভাবোনি, হোয়াইট'?

ডানকান বলল, '১৮৫৮-৫৯ ভালো ছিল না। ৬০টা দেখে নেওয়া গেল। হাতের তাস কি সবসময়ে টেবলে ফেলা যায়? আমার বন্ধু আর্চিবলড হিল কলকাতায় খোঁজ নিচ্ছে'।

চা শেষ করে ডানকান উঠল। তার তো পোশাক পরাই ছিল। রাস্তায় ঘোড়া ধরে সহিস। এখন প্ল্যান্টেশন দেখতে বেরবে। দেখা দরকারই তা নয়। আরামদায়ক রোদে ঘোরা, ব্যায়ামও বলতে পারো। তবে নিশ্চয়ই জানিয়ে দেওয়া আমি এখানেই।

কিন্তু আশ্চর্য, সবুজ শাড়ি পরা স্ত্রীলোকটি কি তাকে লক্ষ্য করছে? কীবল চা শেষ করে উঠল।

ডানকান ঘোড়ায় উঠছে। কীবলের নিজেরও পরনে ব্রিচেস, রাইডিং কোট, হাতে ক্রপ্-হুইপ, তার জন্যও ঘোড়া অপেক্ষা করছে।

সে ঘোড়ায় উঠল। বারান্দা-দেওয়া টুপিটা টেনে দিল কপালে। সামনে পথের উপরে রায়তদের ছোট এক জটলা দেখে সেদিকে চলল সে, যেন ভিড়টাকে ভেঙে দিতে। 'এখানে কী করছ তোমরা'?

তাদের একজন বলল, 'আমি কৃষ্ণানন্দ। দেওয়ান মনোহর সিং-এর কাছ থেকে ফিরছি। দাদনের সময় যায়, এবার কী বন্দোবস্ত? আমরা কি ধানের দিকে যাব? বড়সাহেব মনোহর সিং-এর কাছে শুনতে বলেছিলেন। মনোহর বলল—ছোটোসাহেব ব্যবস্থা করছেন'।

কীবল ঘোড়ার লাগামে ঢিল দিয়ে ঘোড়ার পেটে গোড়ালি দিয়ে আঘাত করে বলল, 'বড়সাহেব কিছু না-বললে কিছু হবে না'।

ঘোড়াটা ক্যান্টারে চলেছে। আচ্ছা, সে ভাবল, এদিকে প্ল্যান্টেশনের এদিকের সীমায় এসে পড়া গেল। ঘোড়াটার মুখ ফিরিয়ে বাঁয়ে চক্কর দেবে নাকি? কিন্তু তার মনে পড়ল, বেডশীট দুটোকেই বদলে নিতে হবে। রাগ্‌টাকেও। এই ভেবে তার মন থমকে দাঁড়াল, যদিও ঘোড়া তার হাত ও পায়ের ইঙ্গিতে গ্যালপে চলেছে। তার থমকে-থাকা মন ঘোড়ার খুরের ধপধপ শব্দটাকে যেন গবেষণা করছে।

কিন্তু, আশ্চর্য, ঘটল কী করে? তখন বিকেল শেষ হচ্ছে। সদর থেকে ফিরে সে কিছু ক্লান্ত, হাতে-পায়ে ব্যথা যেন। বারান্দাতেই ফুলী চায়ের সরঞ্জাম গোছাচ্ছে। দাঁতে বোঁটা চেপে ধরা একটা গোলাপ ঝুলছে চিবুকে। সে নিজে বোধ হয় জিজ্ঞাসা করেছিল, হোয়াইট কোথায়? ফুলী হেসে তার ইয়ার-ড্রপ দুলিয়ে ইঙ্গিত করেছিল। আটচালা বড় হলেও, অনেক পার্টিশন কাঠের। গোসলখানা থেকে জলের শব্দ ও ডানকানের মোটা গলার গান আসছিল। কীবল ফুলীর ডান-কনুইয়ের উপরে চেপে ধরেছিল। ফুলী কিন্তু তার দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে হেসেছিল।

কিন্তু আধঘণ্টা বাদে নিজের শোবার ঘরে গিয়ে সে নতুন আয়াকে দেখতে পেয়েছিল, ম্যাকফার্লান আসবে বলে তিন-চার দিন আগে যে নিযুক্ত হয়েছিল। নীলে সাদা ডুরে খাটো-শাড়ি, দাঁতগুলো ছোট ছোট, ঝকঝকে সাদা, চোখ দুটো কিন্তু আশ্চর্য রকমের বড়। যেন বিছানা ঝাড়ছে। আধঘণ্টা বাদে আবার সে-ই লণ্ঠন দিয়ে গিয়েছিল। পোশাক ছেড়ে ডানকানের সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার সময়ে তার অনুমান হয়েছিল, জানলার বাইরে ওপাশের বারান্দায় সে দাঁড়িয়ে আছে।

কীবল বুঝতে পারছে, সে আবাদের অনেক বাইরে এখন। অনেক রোদ যা তাকে স্নান করাচ্ছে যেন।...যখন সে ডিনারে যাচ্ছে সেই আয়া বলেছিল, সে বাড়ি যাবে কিনা? আর কাজ আছে কিনা? কীবল কোনো উত্তরই দেয়নি।

কীবল বুঝতে পারল না কখন সে লাগাম টেনেছে। ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়েছে, তার দুই উরুর মধ্যে হাঁপাচ্ছে, কাঁপছে।

ডিনার শেষে ডানকান শিস দিতে-দিতে উঠে গেলে সে-ও শিস দিতে-দিতে তার শোবার ঘরে ফিরেছিল। আর তখন দেখেছিল, শোবার ঘরের অ্যান্টি-চেম্বারের মেঝেতে একটা মোমের আলোর পাশে আয়া বসে আছে। তখন রাত ন'টা তো বটেই। বাংলো নিঃশব্দ।

'এই, খেয়েছ তুমি? দরজা বন্ধ করে দাও। আশ্চর্য যে কত সহজে ঘটে! ঘোড়াটাও, দ্যাখো, আবার গ্যালপ করছে। আর শেষ রাতে সে বলেছিল, তার নাম মেহের, সে জুড়ান পাইকের তৃতীয় স্ত্রী। ওটাও একটা নিশ্চিন্ততা।

সে অবশ্যই জুড়ানকে ভয় করে না। জুড়ান বল্লম, সড়কিতে ওস্তাদ। কিন্তু পিস্তলের কাছে? জুড়ান যদি খুলিফাটা হয়ে আবাদে কোথাও পড়ে থাকে, তার এত শত্রু যে তাদের কে দায়ী খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর ওটা কি একরকমের নিশ্চিন্ততাই যে জুড়ানের স্ত্রী শেষরাতে তাকে জানিয়েছে, তার উদরে তিনমাসের বাচ্চা আছে।

কীবল নিজের চারিদিকে চেয়ে বুঝতে পারল, সে মরেলগঞ্জের সীমার বাইরে তো বটেই, রাজা গ্রামের গঞ্জের কাছে এসে পড়েছে। কী আশ্চর্য, এত কালো, সাধারণ, দাঁতগুলো সুন্দর, শরীর নিটোল, আর এত বোকা যে কিছু গোপন করতে জানে না। তাই বলে একজন কি পরের দিন সকালে উঠেই পালাতে পারে? আর যাই হোক, সে ব্রিটিশ আর্মির একজন অফিসার ছিল। কীবল ঢোক গিলল। খুব জোরে-জোরে সে ছুটেছে নাকি? ফোঁপাচ্ছে যেন কিছু তার ভিতরে। কিন্তু বেডশীট হয়তো ফুলীই এতক্ষণে বদলে ফেলেছে। রাগ্‌টাকে সে নিজেই বদলে নেবে। কী আশ্চর্য, সে, লেফটেন্যান্ট আর্থার হোগার্থ কীবল, কী করে পবিত্রতা হারিয়ে ফেলল?

কীবল তাড়াতাড়ি তার ঘোড়াটাকে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেল। সে দেখতে পেল একটা ঘোড়া আসছে। তার উপরে এক সওয়ার। অবশ্যই সে ডাকঘরে যাচ্ছে না, সে কি এরপরে ম্যাগিকে, অন্তত আজই, চিঠি লিখতে পাবে? সামনে বাঁদিকে বরং সেই ক্যাথরীন বাগচীর বাড়ি।

এখন, ক্যাথরীন বাগচীর কুঠির দিকে কেন এসে পড়েছিল কীবল তা কখনও জানা যাবে না। যদি এ রকম বলা হয়, সে প্রমাণ করতে চাইছিল মেহের নামে অদ্ভুত সুন্দর, জন্তুপ্রায়, স্ত্রীজন্তুই একজন তাকে চেনার অতীত বদলে দিতে পারে না ; আর ক্যাথরীন নামা ইংরেজ মহিলা যদি তাকে আগের মতোই সহাস্যে রিসিভ করে তাহলে বোঝা যাবে সে ময়লা নয়, তাহলে কিন্তু মনের এমন কথা বলা হয় যার প্রমাণ নেই। এর এই এক সমর্থন, সে লাঞ্চের আগে-আগে ফিরেছিল মরেলগঞ্জে, তখন তার কপালে কুঞ্চন ছিল না। উল্টো যুক্তি দেওয়া যেতে পারে। সে লাঞ্চের আগে-আগে মবেলগঞ্জে ফিরে গিয়েছিল তার ঘোড়াতেই, আর ঘোড়াও ক্যান্টার কবছিল। তখন সে ভাবছিল—এটা কি খুব ভাবার কিছু? দশ টাকাব একট নোট দিলে মিটে যাবে না? দশ টাকা, ত্রিশ টাকা, পঞ্চাশ টাকা? বেশ, আজ বাতে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া যাবে। প্রকৃতপক্ষে এটা এমন ঘটে যাচ্ছে এখানে, জুড়ান পাইক বা ফুলী নতুবা তেমন চোখ পায় কোথায় কালো চামড়ায়? জুড়ান সম্বন্ধে অনেকেই বলে সে মরেলসাহেবের। কিন্তু কাল মেহের বলেছিল ফুলী জুড়ানের মায়ের বটে, কিন্তু মরেলের নয়। তাহলে? কীবল অবাক হল আবার—ডানকানেরই! কিন্তু তার মন আবার থমকে দাঁড়াল—আজ রাতে জিজ্ঞাসা করবে মানে?

কিন্তু সে তখন ঘোটকীটাকে দেখছে। ওয়েলার নয়। মুখটা সরু হওয়ায় ঘাড়টা অপেক্ষাকৃত লম্বা, পাগুলো সরু, যদিও গাঢ় খয়েরি। ঘাম-ধোঁয়ানো নিতম্ব দেখে শক্তির আন্দাজ হয়। ঘোড়াটার পিঠে সুবেশ রূপবান সওয়ার। এটাকেই কি সকাল থেকে খুঁজছিল? শীতের সকালের রোদে তপ্ত সাদার দাগটানা নীল আকাশের নিচে এমন ঘোটকীটা!

সে নিজেকে বলল : দ্যাখো, দ্যাখো। সে ঝোপটার বাইরে এল। ছুটন্ত ঘোটকীর পিঠে সেই সওয়ার স্ক্যাবার্ড থেকে লং সোর্ডটাকে টেনে বার করতে চাইছে, কিন্তু সোর্ডটা এত লম্বা যে, দুবার তো তার চোখের সামনেই ঘটল, তা পেরে উঠছে না। তা করতে গেলে ঘোটকীর বাঁ কানটাই উড়ে যাবে।

অভ্যস্ত ভঙ্গিতে, সে তো ক্যাভালরিরই লোক, কীবল নিজের ঘোড়াটাকে সেই ঘোটকীর প্রায় পাশে এনে ফেলে গ্যালপ করাতে শুরু করে, ক্যাভালরিরই তো কায়দা, বলল, 'ইউ ডোন্ট ডু ইট লাইক দ্যাট'।

অন্য সওয়ার মুহূর্তে ঘোড়ার রাশ টেনে ঘোড়াকে প্রায় পুরো ঘুরিয়ে পাশ থেকে সামনে গিয়ে কীবলের মুখোমুখি হল, কীবলকেও তখন বিপরীতে চক্কর দিয়ে মুখোমুখি ধাক্কা থেকে নিজেকে আর ঘোড়াকে বাঁচাতে হল। এক মুহূর্তেই দুজনে দম নিয়ে নিল। কীবল বলল, 'আপনি কে হন? প্রিন্স কী'? একইসঙ্গে রাজচন্দ্র বলল, 'তুমি কে? কী তেমন করা যায় না বলছ'?

'আমি লেফটেন্যান্ট আর্থার হোগার্থ কীবল। ক্যাভালরিতে গ্যালপিং ঘোড়ার উপরে লং সোর্ড টানা হয় না। ঘোড়া এবং পাশের মানুষ ইনজিওর্ড হয়। সেজন্য চার্জের আগেই সোর্ড আনশীদ করা হয়'।

কথাগুলো ইংরেজিতে বলে সে প্রিন্সের মুখে বিস্ময় দেখে ইংরেজিতেই জিজ্ঞাসা করল'—'প্রিন্স ইংরাজি বলেন কিনা'?

রাজচন্দ্র খানিকটা বুঝছিল। সে ফরাসিতে বলল, 'তুমি কি ফরাসি বলো? একজন দোভাষী পেলে হতো। আমি রায় রাজচন্দ্র খাঁখানান'।

রাজকুমার যেন দোভাষীর জন্য এদিক-ওদিক লক্ষ্য করল। তার মুখ ব্যায়ামের ফলে রক্তাভ, এখন যেন খানিকটা বিব্রত হওয়ার কুমারীর ব্রীড়ার মতো রক্ত চলাচল করছে গালে। সে কিছু না-বলে অদূরে বাগচীর কুঠিটাকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'কাম'।

তার কুঠির এত কাছে দুজনে বলেই বলা যায় ভিন্ন-ভিন্ন কারণে তারা বাগচীর বাড়িতেই যাচ্ছিল।

সে-সময়ে বাগচী তার স্কুলে ছিল, মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ট্যাবুলেশন এবং মডারেশনে সে ব্যস্তই ছিল। লাঞ্চের পরেই সে বাড়িতে থাকবে স্থির করেছিল। কেট তাকে বরং সকালের ঘটনাটাকে এ-রকম করে বলেছিল। লাঞ্চের পক্ষে একটু দেরি করেই এসেছিল বাগচী। কেট বরং অপ্রস্তুত, তার কাজ তখন শেষ হয়নি। সুতরাং 'এসো, এসো, কিচেনেই বসো। যেটুকু বাকি তা করতে-করতে গল্প করব'।—বলে বাগচীকে কিচেনে বসিয়ে কেট বলল : সে তখন সেই লাল সার্জটাকে কাটার যোগাড় করে নিয়েছে, এমন সময় দুজন পুরুষকে একসঙ্গে ঢুকতে দেখে বিস্ময়ে বাকবন্ধ তার। দুজনেরই মুখ লাল। কপালে ঘাম, দুজনের মাথাই যেন তাদের পার্লারের সিলিং ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছে। একজনের পরনে শালের আচকান, শালের চুস্ত, কুল্লাদার মুরেঠা, কোমবে লম্বা সোর্ড। আব-একজনের পরনে ফ্ল্যানেলের রাইডিং কোট, ব্রিচেস, হাতে রুপো-বাঁধানো ক্রপ। বাগচী মিটমিট করে হেসে বলল, 'একজন তো রাজকুমার'। তখন কেট হেসে বলেছিল, রাজকুমাব হেসে বললেন—কেট, মিট মাই ফ্রেন্ড লেফটেন্যান্ট কীবল, মাই ফ্রেন্ড মিসেস ক্যাথরীন বাগচী। আমার ইংরেজি ফুরিয়ে গেল। কীবল আমাকে কিছু শেখাতে চায়। তুমি প্রথমে ক্লান্তদের কফি খাওয়াও, পরে দোভাষীর কাজ করো।

কেটের শুধু বিস্ময় নয়, ভয়-ভয়ও করছিল। কিন্তু গল্পটা বলতে গিয়ে সে অনুভব করল, তা বোধ হয় বলা যায় না। ভযই কি সেটা? কীবলের চাহনিতে কী যেন ছিল যাকে আগ্রহ জাতের কিছু বলা যায়। এবং তাতে তার মনটা যেন কেমন শিউরে উঠছিল। যাই হোক, কী করা উচিত বুঝতে না-পেবে কেট কফি করতে চলে গিয়েছিল। ভাবছিল, সে সময়ে কী না ঘটে। কিন্তু দু-মিনিটেই পিয়ানো বাজতে শুনেছিল। তা যে রাজকুমার তা বুঝতে পেরেছিল।

কেট কফি নিয়ে এসেছিল। ততক্ষণে কীবল রুমাল দিয়ে ঘাম মুছে ফেলেছে, রাজকুমার পিয়ানোর টুল থেকে উঠে এলেন। কিন্তু কফি নামাতে গিয়ে কেট দেখল সেই সেন্টারপিসটার উপরে লাল মখমলে ঢাকা একটা প্রকাণ্ড তরোয়াল। রাজকুমার সেটাকে কোলে নিয়ে বসলে কফি খাওয়া শুরু হল। আর আলাপও। দোভাষী হিসাবে তাকে মাঝখানে বসতে হয়েছিল।

রাজকুমার একবার জিজ্ঞাসা করলেন, কীবল আধুনিক যুদ্ধে যোগ দিয়েছে কিনা? যখন গোলাগুলি চলতে থাকে তখন ঘোড়সওয়াররা কীরকম ভাবে অগ্রসর হয়? কীবল বলেছিল বটে ঘোড়া ছোটানোর আগেই তরোয়াল হাতে নেওয়া হয়, ঘোড়াই-বা কী গতিতে চলে?

এটাকে কেট ইংরাজিতে অনুবাদ করে দিলে কীবল যা বলেছিল তা ক্রিমিয়ার গল্প। শত্রুদলের ব্যাটারি দখল করতে তাদের ক্যাভালরি চার্জ করেছিল। শত্রুরা প্রস্তুত ছিল এটা জানা ছিল না। ফলে সাতশো জনের মধ্যে তিনশো জন ফিরেছিল মাত্র। তখন মনের অবস্থা কী রকম হয় বলা যায় না। নেশা, ভয়, পিছুটান, সম্মুখবেগ সবই থাকে। জীবনের প্রথম নারী কিংবা প্রথম বেত্রক্রিয়ার কথা মনে এসে যেতে পারে, কিংবা নিজের ঘরের কথা। কিন্তু ঘোড়ার উন্মত্ত গতি ; কামানের শব্দ, আঘাত ; সঙ্গীদের আর্তনাদ ও রাগের চিৎকার ; অফিসারদের চিৎকার-করে-বলা নির্দেশ ; তরোয়াল, বল্লম, লাগাম ঠিক করে রাখা ; গোলার গর্ত, পড়ে যাওয়া সঙ্গীকে ও তার ঘোড়াকে টপকে যাওয়া ; দু-পাশের ঘোড়ার ধাক্কা

থেকে নিজেকে ও ঘোড়াকে বাঁচানো—অন্য সবকিছুকে মন থেকে তাড়িয়ে দেয়।

কেটের বেশ স্পষ্ট মনে আছে এই কথাগুলো বলতে-বলতে কীবল যেন অতীতকে মনে এনে উত্তেজিত হয়েছিল। কেট প্রত্যেকটা বাক্যের বাংলা অনুবাদ করে যাচ্ছিল। এই জায়গায় থেমে কীবল বলেছিল, অফিসাররা ঘোড়ায় ওঠবার আগেই তরোয়াল খুলে হাতে নেয় বটে। কিন্তু এই রকম নয়, এটা ক্যাভালরির তরোয়াল নয়।

কেট এটাকে অনুবাদ করে দিলে রাজকুমার বলেছিল, এটা ক্যাভালরির কেন হবে? পিয়েত্রোর। দ্যাখো। লেফটেন্যান্ট, এটায় সোনার অক্ষরে পিয়েত্রোর নাম লেখা আছে। এই বলে রাজকুমার খাপসমেত তরোয়ালটাকে কীবলের হাতে দিয়েছিল। কীবল খাপ থেকে তরোয়াল বার করে সোনা দিয়ে এমবস করে লেখা 'জাঁ পিয়েত্রো' দেখে বলেছিল, আশ্চর্য, এটা সেই ওয়াইলি ফকস পিয়েত্রোর? কেটের নিজের দ্বিধা হচ্ছিল, পিয়েত্রোকে যে ফকস বলা হল তা অনুবাদ করা চলে কিনা। কিন্তু রাজকুমার বলেছিল, কেট, ডারলিং, ফকস মানে আমি জানি। তুমি হয়তো পিয়েত্রোকে রোঁয়া-ওঠা একটা উলফ মনে করো। তা হোক, তুমি বলো, এটা পিয়েত্রো পায়ে দাঁড়িয়ে ভাঁজতেন।

কেট অনুবাদ করলে কীবল বলেছিল, তা কী করে হবে? এ তো ফেনসিং-এর উপযুক্ত নয়।

কেটের তর্জমা শুনে রাজকুমার উঠে দাঁড়িয়ে সস্নেহে তরোয়ালটা খাপসমেত নিজের হাতে নিয়ে মুঠি ধরে তাকে টেনে বার করল। তখন কেট লক্ষ্য করেছিল, রাজকুমার কীবলের চাইতেও কয়েক ইঞ্চি লম্বা। রাজকুমার হেসে বলল, কিছুক্ষণ আগেই তো এটাকে নিয়ে খেলছিলাম। তাকেই তো ফেনসিং বলে, না কী?

কেটের অনুবাদ শুনে কীবল বলেছিল, না, রায় খানখানান, তা আপনার পক্ষে উচিত হবে না। এটা ফেনসিং-এর ফয়েল নয়। এত ভারি এবং ধারালো তরোয়াল যে এতটুকু ভুলেই খেলার সঙ্গীর প্রাণ যাবে। ফেনসিং-এর তরোয়াল হালকা, তুলনায় ছোট হয়, ধার প্রায় থাকেই না। সে-রকম ফয়েলের জন্য কলকাতায় খোঁজ করতে হয়।

রাজকুমার শুনে ভাবল। পরে বলেছিল, কেট, জিজ্ঞাসা করো, আমি কলকাতা থেকে ফয়েল আনিয়ে নিলে লেফটেন্যান্ট আমাকে ইংরেজি তরোয়াল চালানো শেখাতে পারে কি না, আর তা শেখালে কত করে কী নেবে?

কেটের তর্জমা শুনে কীবল বলেছিল, আপনি আনিয়ে নিন, আমি যথাসাধ্য করব যদি আপনি ইংলিশ স্টাইলটা শিখতে আগ্রহী থাকেন।

কেট এই জায়গায় আর-একবার প্রস্তাব করলে রাজকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, কীবলকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দাও।

কীবল বলেছিল, প্রিন্সকেও ধন্যবাদ। এখন বিশ্বাস করছি, ডানকান যেমন বলেছিল, আপনার মতো লোক না-থাকলে পিয়েত্রো এখানে রক্তপাত ঘটাত।

কেট এটাকে অনুবাদ করলে রাজকুমার বেশ জোরে-জোরে হেসে উঠল। বলল, তা বটে, তা বটে। একবার পার্লারে পায়চারি করল, তারপর কীবলের সামনে এসে বাও করে বলল—মের্সি, শের আমি, বঁজুর মঁশিয়ে লেফতেন্যান্ত।

৩

কীবল লাঞ্চের জন্য ফিরতে-ফিরতে কী ভাবছিল তা বলা হয়েছে। সে যখন মরেলগঞ্জের কুঠির সামনে তখন ভাবল, ডানকানের ব্যাপারটা ভাবো। উত্তেজনার মুখে কী করে বোঝাল মেহের, ফুলী জুড়ানের বোন হতে পারে, কিন্তু ডানকানের মেয়ে, যদিও সঙ্গে ঘুমোয়। এ কি অ্যাবসলিউট পাওয়ারের লক্ষণ?

যা হোক, এটা তো আর মাস দুয়েকের ব্যাপার, তারপর জুড়ানের কাছে ফিরবে, তখন তো ভুলেও যাবে। গোটা দু-তিন গিনি দিলেই যথেষ্ট। কিন্তু কনডিশন, জুড়ান জানলে চলবে না। একই গাধায় সে আর জুড়ান চড়েছে এটা গোপন রাখা চাই।

যখন সে কুঠির সামনে নামবে, ঘোড়ার উপরে থাকায়, দৃশ্যটা কীবলের চোখে পড়ল। একটা ছোট শোভাযাত্রা যেন এগিয়ে আসছে। কিন্তু ঘোড়া থেকে নেমে সে একটু বিষণ্ণ বোধ করল আবার। মনে মনে বলল : ম্যাগি, তুমি নিজেই বলেছিলে তুমি সোলজার, তারা একটু এদিক-ওদিক করে, কিন্তু সাবধান, খোরপোশ করতে না-হয়। যা শুনি সেখানে তো সবই নেগ্রেস...তাছাড়া, দ্যাখো, কেট কিছু মনে করেনি।

কীবল অবাক হল, শোভাযাত্রাটা সুরকির পথ ধরে তাদের বাংলোর কাছাকাছি এসে পড়েছে। সামনের লোকটি কি পাগল? গায়ে কামিজ, কিন্তু কোমর থেকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার হাত দুখানা পিঠমোড়া করে বাঁধা, বোধ হয় তারই ধুতিতে। তার বাহু আর পিঠের মধ্যে একটা লাঠি ঢোকানো আর সেই লাঠিটাকে দু প্রান্তে ধরে দুজনে লোকটিকে সামনে ঠেলছে। তারা হাসছে। সেই উলঙ্গ লোকটি ভাঙা গলায় অব্যক্ত চাপা আর্তনাদ করছে।

সিঁড়ির উপরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল কীবল। তারা আর-একটু কাছে আসতে কীবল চিনতে পারল, পিছনের লোকদের মধ্যে একজন জুড়ান পাইক। সামনের লোকটিকেও চেনা-চেনা মনে হল। একটু ঠাহর করে দেখে নামটা মনে পড়ল। এই সেই অমর্ত্য দাস। লোকটি একদিন ফ্যাক্টরির কাছে খুব প্রতিবাদ করেছিল বটে। লোকটি ধার্মিক, অবশ্য পেগানরা যেমন হয়, আর কিছু-কিছু লেখাপড়াও জানে। আর এখন তো বোঝাই যাচ্ছে, পাগলরা ধরা দেওয়ার আগে যেমন করে, তেমন ধস্তাধস্তি করে থাকবে, সেজন্য তার গায়ে ধুলো এবং রক্ত।

কীবল বলল, 'আহা জুড়ান, পাগলকে কষ্ট দেয় না। তাছাড়া এই কুদৃশ্য এদিকে কেন'?

কথাটা বলে পিছন ফিরে সে দেখল, তার আশঙ্কা সত্য হতে চলেছে। ঘেরা বারান্দার জালের ওপারে ফুলী দাঁড়িয়ে, যেন উপভোগ করছে।

জুড়ান জানাল, এখন পূর্বদিকের গ্রামটাতে ঘোরানো হয়নি। এর আত্মীয়স্বজনরা সেদিকেও আছে, তারা দেখবে না? মুহূর্তে কীবল বুঝতে পারল, সেটা পাগলকে আটকানোর ব্যাপার নয়। উদ্দেশ্যটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু সেটা এক অভূতপূর্ব শয়তানী জুড়ানের।

লাঞ্চে সে ডানকানকে বলল, ডানকান প্রথমে না-জানার ভান করল। পরে বলল, মারধোর করলে কমিশন দোষ দেখবে। এটা কি এমন অপরাধ পিনালকোডে কোনো ধারায় পড়বে? সে হাসল। পরে আবার বলল, 'যাই হোক লোকটা অসন্তোষ ছড়ায়। তুমি চিনে রাখলে ভালো করবে। রায়তদের বলছে, দাদন নিও না, ঋণ নিও না। পিছিয়ে-পিছিয়ে যাও, এড়িয়ে-এড়িয়ে চলো'।

'বুদ্ধিটা তবে তোমার'? কীবল জিজ্ঞাসা করল।

ডানকান হো-হো করে হেসে বলল, 'বিশ্বাস করো, তা নয়'।

কীবলের একবার মনে হল, পুরুষের কি এর চাইতে বড় অপমান আছে?

কিছুক্ষণ পরে আবার তার মনে হল, এ অবস্থায় ভারতীয় স্ত্রীলোকেরাও বোধ হয় রটায় না। তাছাড়া এই তো ডানকানও, সেখানে কেট এমনকী প্রিন্স যেমন, কেউই কিন্তু তাকে দেখে কোনো পার্থক্য বুঝতে পারছে না।

লাঞ্চের শেষে কেট ও বাগচী পার্লারে বসবে ঠিক করল। বাগচী জানাল, তখন আর সে স্কুলে যাচ্ছে না। কেট জানাল, বাগচীর আপত্তি না-থাকলে সে সার্জের জামাটাকে কাটা শেষ করবে। বাগচী জানাল, তা করতে-করতে কেট যদি গল্প করে তবে বাগচীর আপত্তি থাকবে না।

কিন্তু পার্লারে ঢুকে কিছুক্ষণের জন্য আবার তারা পুরনো কথায় ফিরে গেল।

বাগচী বসতে গিয়ে অবাক, বলল, 'আরে এ কী? এই দ্যাখো, এটাই কি সেই তরোয়ালটা রাজকুমারের, যার গল্প করছিলেন? কী কাণ্ড'।

কেটও অবাক। বলল, 'আচ্ছা অন্যমনস্ক তো রাজকুমার। এখন কী হবে'?

বাগচী বলল, 'তুমিও কম অন্যমনস্ক নও। নইলে এর আগেই দেখতে পেতে। কিন্তু এখন? এ তো মারাত্মক ব্যাপার। দিয়ে আসব? নাকি কাউকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে রাজকুমারের কাছে জানতে চাইব? রোসো, না-হয় শোবার ঘরের কাবার্ডে রেখে আসি'।

বাগচী খাপসমেত তরোয়ালটা শোবার ঘরে রাখতে গেল। তখন কেট আবার একটু ভাবল। তার মুখ তো চিন্তার ফলেই উজ্জ্বল। তার সেই সকালের দৃশ্যটা মনে এল, পাশাপাশি যেমন কীবল ও রাজকুমারকে দেখেছিল। সুন্দর! দুজনকেই দু-রকম সুন্দর দেখাচ্ছিল। তফাতও আছে। তার আবার মনে পড়ল, কীবলের চোখ দুটিতে যেন নেশার মতো কোনো আগ্রহ ছিল। অন্যদিকে রাজকুমারের চোখ দুটি যেন দূরকে দেখছিল। নাকি অস্থির বলবে? অস্থিরতাই বোধ হয়। দুজনকে মুখোমুখি বসিয়ে কফি করতে গিয়ে সে তো নিশ্চয়ই আশঙ্কা করছিল, সেই আতপ্ত উত্তেজিত পুরুষ দুটি কী-বা ঘটায়! কিন্তু তার মধ্যেই হঠাৎ পিয়ানো শুনেছিল। কেটের মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল হল।

বাগচী ফিরে বলল, 'দ্যাখো, একজনের যা খেলার, অন্যের তাতে কত ভয়'?

কেট বলল, 'কিন্তু জানো একটা কথা? কীবল সৈনিক, সে বোঝে। এ নিয়ে কি বাজকুমারের ফেনসিং খেলা উচিত হচ্ছে'?

বাগচী ভাবল, এটা কি ছেলেমানুষের অজ্ঞতা? তাহলে কি আজ সন্ধ্যায় দেখা করে এটাকে খেলায় ব্যবহার করতে নিষেধ করবে? বলল, 'তুমি একটা অসুবিধায় ফেললে, ডার্লিং'।

কেটও ভাবছিল। সে বুদ্ধি করে বলল, 'এক কাজ করলে হয়। আমি কী নয়ন-ঠাকরুনকে বলে দেব'?

এই সময়ে কেট ভাবল, এসব কি রাজকুমারের অস্থিরতা? নাকি চপলতা বলবে? নাকি কিছু না-ভেবে যেদিকে খুশি বয়ে যাওয়া?

সময় তখন সন্ধ্যার দিকে। আলোর রাত নয়, অন্তত চাঁদের আলো থাকলেও নিতান্ত ক্ষীণ ছিল। বাগচী ইতিমধ্যে তার স্টাডিতে, কেট সন্ধ্যায় কফি তৈরি করতে কিচেনে। কেট শুনতে পেয়েছিল, পার্লারে কারা কথা বলতে-বলতে ঢুকছে। সে বেরিয়ে এসে আপাদমস্তক চাদরে ঢাকা নয়নতারা এবং পুরো ইংরেজি পোশাকে রাজচন্দ্রকে দেখতে পেল। তার উচ্চকণ্ঠের অভ্যর্থনার সাড়া পেয়ে বাগচীও বেরিয়ে এসেছিল।

তাদের বসিয়ে বাগচীকে সেখানে রেখে কফি করে আনল কেট।

রাজচন্দ্র তখন বলল, 'দ্যাখো, কেট, কেমন ধরে এনেছি। বাড়ি ফিরছিলেন দিনের কাজ শেষ করে। আমি তো বাপু আজ আমার বেতো চওড়া পিঠের ঘোড়াকে ব্যায়াম করাব বলে রাস্তার পাশ দিয়ে চলেছিলাম। এদিকে পালকিটা দেখি রাজকুমারকে অগ্রাহ্য করে সার্বভৌমপাড়ায় ঢোকে। থামাতে হল। তো দেখি পাতার আড়ালে ঘুমন্ত ফুল। বললুম—চলো, না-হয় একটু ঘুরি। রাজি কি হয়? শেষে বললুম, যা কখন দ্যাখোনি তাই দেখাব। পিয়ানো বাজাব তোমার সামনে। অবশ্য পথে অন্য সমস্যাও উঠেছে'।

নয়নতারা নিভৃতে কেটকে চোখের ইশারা করল, যেন বলল, সবটুকু বিশ্বাস করবে কি?

উৎসাহিত কেট বলল, 'তাহলে কফির পরে পিয়ানো হোক। সকালে যেটা একটু হচ্ছিল'।

রাজচন্দ্র বলল, 'আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে মাস্টারমশাই আমাদের মামলাটা শুনুন'।

নয়নতারা বিপন্ন বোধ করল। কিন্তু এই বুদ্ধি করল, বাধা দিলে উল্টোপাল্টা ফল হবে, অনেক অর্ধসত্য রসিকতাচ্ছলে বলে যাবেন রাজকুমার। মুখে কিছু আটকাবে?

রাজচন্দ্র বলল, 'মামলার বিবরণ দেওয়ার আগে একটা ফয়সালা হোক। একজন জমিদার তার প্রজাকে নিঃশর্ত কিছু দান করতে পারে কিনা'?

এটা তো একটা হালকা মেজাজের কিছু, যা খেলার মতো। বাগচী বলল, 'দানের অধিকার সকলেরই আছে, আর তা নিঃশর্ত হওয়াই উচিত'।

নয়নতারা নিচু গলায় বলল, 'মাস্টারমশাই ডিক্রি দিলেও, রাজকুমার, মামলাটা উঠে যায় না। দানটা যদি জমি হয় তবে বুঝতে হবে রাজকুমার তা অন্য কোনো প্রজার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে দান করবেন'।

হাসিমুখে বাগচী বলল, 'তাহলে আমি বোধ হয় ভুল করেছি। এ কথাটাও ঠিক বটে, রাজকুমারের সব জমিই কোনো-না-কোনো প্রজার দখলে থাকার কথা। মামলার বিবরণটা শোনা দরকার'।

রাজচন্দ্র বলল, 'জনৈক মহিলার প্রিয়জনের পাপস্খালনের জন্য এই বৈশাখে জলদানের ইচ্ছা দেখা দিয়েছে। জলদান নাকি প্রাণদান। জলদানের সব চাইতে ভালো উপায় দিঘি খুঁড়ে দেওয়া। দিঘি তো শূন্যে হয় না। জমিতে হবে। আর জমি দিঘি হয়ে গেলে সেখানে চাষের জমি কিংবা বসতবাড়ি আর থাকে না। এখন সেই মহিলার ধারণা চাষের জমি কিংবা বসতবাড়ি নাকি শুধু তাই নয়, অনেক স্মৃতিতে জড়ানো নিজের জীবনের অংশ'।

বাগচী বলল, 'তো বটেই। একথা একশোবার সত্য'।

'সেই মহিলার মতে প্রত্যেক পুরুষের একমুঠো মাটি থাকা দরকার, যা তার জীবনের দুর্গ, যা গেলে নাকি তার পৌরুষেরও কিছু থাকে না'।

বাগচী জিজ্ঞাসা করল 'জমিদার যদি জমিটা কিনে নেন দান করার আগে'?

'সে নাকি আরো খারাপ। তা নাকি টাকার প্রলোভনে নীতিভ্রান্ত করা। ঘুষ দিয়ে দুর্গ দখল'। বাগচী এক মুহূর্ত ভেবে নিল। আন্দাজ হচ্ছে এটা রাজকুমার এবং নয়ন ঠাকরুনের মধ্যে কোনো ব্যাপার। হয়তো লঘু প্রমোদও আছে। সে বলল, 'রাজকুমার যদি গ্রামের মাঝখানে একটা দীঘি কাটিয়ে দেন তাহলে কিন্তু জনসাধারণের উপকারই হয়'।

নয়নতারা বলল, 'রাজকুমার, আপনি না-হয় আপনার আর্জিটা মাস্টারমশাইকে দিয়ে যান। উনি দেখবেন। কফি খাবেন না কী বলছিলেন? কিংবা নাকি বাজনা হবে'?

বাগচী বলল, 'ও, হ্যাঁ। রাজকুমার আপনার সেই তরোয়ালটা। সেটা তো এখানেই রয়েছে'।

কেট বলল, 'রাজকুমার, ও কফিটা আপনি খাবেন না, জুড়িয়ে গিয়েছে। আমি আবার করে আনছি'।

কেট কফি করতে উঠল। বাগচী তরোয়ালটা আনতে গেল। রাজকুমার উঠে পিয়ানোর দিকে গেল। বাগচী তরোয়াল এনে সোফার উপরে রাখল। রাজকুমার পিয়ানোর ডালা খুলে কিছু ভাবছে তখন। নয়নতারা একেবারে স্থির হয়ে বসে।

কিন্তু পার্লারের দরজার কাছে এসে কেট নয়নতারাকে ডাকল। নয়নতারা সেদিকে উঠে গেল। কিছুক্ষণ তারা কিচেনেই আলাপ করল সম্ভবত। কেট কফি নিয়ে ফেরার আগে নয়নতারা ফিরল না।

কেট টিপয়ে কফি রাখলে রাজচন্দ্র সেদিকে এসে বসল।

রাজচন্দ্র কফি নিলে নয়নতারা বলল, 'একটা কথা বলব। ভরসা দেবেন? এ ব্যাপারে মাস্টারমশাই আর কেটও আগ্রহী। কীবল নামে একজন গোরা সিপাহী নাকি আছে। সে নিশ্চয় আমাদের চাইতে ভালো চেনে অস্ত্রশস্ত্র'।

রাজচন্দ্র কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, 'সন্দেহ কী? নইলে কি বাহাদুর শা, কি নানা এমন মার খায়? অন্তত ব্রিচলোডার রাইফেল আরো সংগ্রহ করা উচিত ছিল নামার আগে'।

নয়নতারা বলল, 'আমি শুনেছি বন্দার সঙ্গে সকালে রোজ তরোয়াল খেলেন আজকাল'?

'তাতে কী'?

'কীবল বলেছে, কেটও এখন বলছে, এই ধারালো তরোয়াল নিয়ে তা উচিত হয় না'—নয়নতারা বলল।

বাগচীও বলল, 'হ্যাঁ, রাজকুমার, নয়নতারা ঠাকরুন এ-বিষয়ে ঠিকই বলছেন'।

নয়নতারা হাসতে গেল, কিন্তু তার স্বরটা গাঢ় হল। বলল, 'এটা আমাকে দান করতে হবে, রাজকুমার'।

রাজকুমার একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'ও'! কিন্তু সে নয়নতারার মুখের দিকে চাইল। একমুহূর্ত পরেই হেসে বলল, মাস্টারমশাই, আপনি সাক্ষী, নয়নতারা আমার দান নিতে রাজি হয়েছে। তাহলে বলো, দিঘিটা কোথায় হচ্ছে, কতটা লম্বা চওড়া হবে'?

বাগচী ও কেট এতক্ষণের আলাপের এদিকে গতি দেখে কৌতুক ও আনন্দে হাসিমুখে বসে রইল। কিছু বলতে ভুলে গেল। নয়নতারা নিচু গলায় চোখ নিচু করে বলল, 'তাই যদি শর্ত হয় হোক, তাহলে কিন্তু এটা আর খেলা হবে না'।

সেদিন কিন্তু পিয়ানো বাজানো হল না। রাজচন্দ্র পিয়ানোর কাছে গেল, পিয়ানোর ডালা খুলে বলল, 'সেই সকালেরটাই বলছ? তাহলে তোমরা কাছে এসো'। কিন্তু পিয়ানোর ডালায় আটকানো রূপার ফলকটা আর তাতে লেখা নামটা এই সময়ে তার চোখে পড়ল। রাজচন্দ্র বলল, 'দেখে যাও নয়ন'।

নয়নতারা কাছে গেলে বলল, 'দেখছ? এটা একটা বিলিতি নাম। উচ্চারণ 'বাইচে'। বলো তো কেন? পিয়েত্রোরা শুধু তরোয়ালবাজ ভাবলে ভুল করবে। এটা তাঁর প্রেমিকার নাম। এই নামে তিনি ডাকতেন তাঁকে'। কেটও বিস্মিত হল। নয়নতারা তো হবেই। কেটের বাড়িতেই তো পিয়েত্রোর এই পিয়ানো রাখা হয়েছিল।

পুরনো প্রেমকে লোকে ঠাট্টা করতে পারে। নয়নতারা বলল, 'সেই ফরাসি মহিলা কি এদেশে আসতে রাজি হয়নি'?

রাজচন্দ্র বলল, 'তাহলে আর-একটু গোড়া থেকে বলতে হয়। পিযেত্রোর জননী ভারতীয় মহিলা ছিলেন তা কি তাঁর আনুকূল্যে বসানো এই স্কুল থেকে আন্দাজ করতে পারোনি? মায়ের নাম পিযেত্রো আমাকে বলেননি বটে, কিন্তু আমার ধারণা তাঁর নাম জ্ঞানদা ছিল। পিয়েত্রোর মামা ছিলেন এক স্মার্ত ব্রাহ্মণ। তিনি তাঁর বিধবা বোনকে পিয়েত্রোর পিতার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে স্বদেশ ও স্বসমাজ ত্যাগ করেছিলেন। পশ্চিমের কোনো তীর্থশহরে বাস করতেন বলে ধারণা হয়। তখন পিয়েত্রোর বয়স হয়েছে, চল্লিশের দিকে চলেছে। জাহাজের ব্যবসা করেন। এদেশের রেশম ও মসলিন ইউরোপে পাঠান; উত্তর-ভারতেও বন্দুক, ব্রোকেড ও রেশমের ব্যবসা করেন। পিযেত্রো কখনও কখনও সেই স্মার্তবাড়িতে যেতেন। সেই স্মার্তমশায়ের পরিবারের কন্যাদের ফরাসিনী না-হয়ে স্মার্তকন্যা হওযাই স্বাভাবিক। চোখে চোখ না-পড়লে ভালোবাসাও হয় না। নিজের মনের মতো করে নাম রাখাও যায় না। ওদিকে স্মার্তকন্যারা যে কী নির্দয হতে পারে'!

স্মার্তকন্যা নয়নতারার ভ্রূকুটি কেট ও বাগচী লক্ষ্য করল না, কারণ কটাক্ষটা হল শালের অবগুণ্ঠনেব ভিতর থেকে।

বাগচী বলল, 'পিয়েত্রোর কাছে আমি যা শুনেছি তাতে মনে হয়, এটা চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের কথা'।

রাজচন্দ্র বলল, 'তা হতে পারে। সেখানেই পিয়েত্রো সেই ফুটফুটে ননীর পুতুল হেন চতুর্দশীকে দেখে থাকবে, আর সঙ্গে-সঙ্গে, তাঁর নিজের ভাষায়, নিজের হৃদয় দু'হাতে উপড়ে সেই বালিকার পায়ে রেখেছিলেন। আসলে তার তো আর ইটালীয়ান নাম হয় না। তাকে না-পেয়ে অতৃপ্ত মধুর যন্ত্রণায় এক ইটালীয়ান মহিলার স্মরণে তার নাম রেখেছিলেন বিয়াত্রিচে, যেটা সংক্ষেপে এই 'বাইচে'।'

কেট বলল, 'এমন একটা ছোট্ট মেয়েকে পিয়েত্রোর হৃদয় দেওয়া উচিত হয়নি'।

বাগচী বলল, 'কেট, আমি কিন্তু আসল বিয়াত্রিচেরও এ রকম বয়সই ছিল বলে পড়েছি। তাছাড়া ভালোবাসা বোধ হয় বয়সকে গ্রাহ্যে আনে না। তাঁকে যখন চিকিৎসা করতাম, পিয়েত্রো বলেছিলেন, সেই বালিকার প্রেম চাঁপার সুঘ্রাণের চাইতেও সুন্দর ছিল, এমনকী সর্বশ্রেষ্ঠ ফরাসি মদের বোকেও তার তুলনায় কিছু নয়'।

কেট বলল, 'এটা কিন্তু ফরাসি অতিশয়োক্তি, যদিও সুন্দর'।

নয়নতারা বলল, 'শেষ পর্যন্ত কিন্তু বয়সের, ধর্মের ব্যবধান বাধা হয়'।

বাগচী বলল, 'আমার তা মনে হয়নি। সেই মহিলা ছিলেন পিয়েত্রোর সেই স্মার্তমামার মেয়ে। হিন্দুদের মধ্যে এ-রকম সম্বন্ধ থাকলে বিবাহ হয় না'।

বাগচী তার পাইপ ধরাল। রাজচন্দ্র পিয়ানোর উপরে আঙুল রাখায় তার ঝংকার উঠল। কিন্তু সে বরং কেটের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'গুড নাইট কেট, এরপরে বাজালে চাঁপার সুঘ্রাণটা থাকে না। অন্য একদিন এসে সকালের সেই বাজনার স্কোর তোমাকে দিয়ে যাব। ভালোই। আমি নাম জানতাম না। শর্প্যা নামে একজনের'।

রাজচন্দ্র উঠে তরোয়ালটাকে কোমরে বেঁধে নিল। নয়নতারা হেসে বলল, 'এ পোশাকেও তো ওটা বেশ মানায়'। তারা দরজার দিকে গেলে বাগচী ও কেট তাদের এগিয়ে দিতে গেল গেট পর্যন্ত। এই সময়ে কেট দেখতে পেল পায়রার ডিমের রঙের শালের ঘোমটা মুখের দুপাশ বেয়ে নেমে এমনকী হাত দু'খানাকে ঢেকে নয়নতারার হাঁটু অবধি নেমেছে। শালের ঘেরের নিচে লাল স্বচ্ছ শাড়ি। সারা গায়ে অলংকার নেই, কিন্তু জুতো-ছাড়া সুন্দর পা দুটোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই যেন একজোড়া সুন্দর অ্যাংকলেট, তা সোনারই হবে। রাজকুমারের গায়ের জ্যাকেটটার গাঢ় আকাশি রং, ট্রাউজার্সটার নীলে-সাদা টান। একটা ঘোড়া বাঁধা আছে বটে। বাইরের সন্ধ্যা তো এখন প্রায় গাঢ় হয়েরি। চাঁদ আলো করতে পারছে না। কেট শুনল, নয়নতারা বলছে—পালকিটাকে তাড়িয়েছেন দেখছি।

নয়নতারা ও রাজকুমার হাঁটতে শুরু করল। ঘোড়াটা নিজে থেকেই পিছনে চলল।

কেট ঘরে ফিরতে-ফিরতে সুখী মুখে ভাবল, রাজকুমার যেমন বলেছিলেন ঘোড়াটাকে চওড়া পিঠের মনে হচ্ছিল। তাহলে তারা সরে গেলে রাজকুমার কি নয়নতারাকেও ঘোড়ায় তুলে নেবেন?

দ্বা দ শ প রি চ্ছে দ

এ-রকম সংবাদ আছে, সেই বৎসরের শীতেই সেই প্রথম অ্যালবেট্রস নামে স্টিমশিপ রাজনগরের নদীতে চলাচল করেছিল, কুতঘাটে একবেলা থেমেছিল। যে রাজনগরের কাছাকাছি রেলরোড ছিল না তখন, যে গ্রামের অধিকাংশ মানুষের কাছে স্টিম-এঞ্জিন মাত্রই তখনও গল্পের বিষয়, সেই এক কুয়াশা-আচ্ছন্ন নদীর বুকে ভোরের অস্পষ্টতার সেই কলের জাহাজ তার আলো এবং হর্ন, এবং কালো আকৃতি নিয়ে নিশ্চয়ই বিস্ময়, কৌতূহল এবং অজানা আশঙ্কার সৃষ্টি করে থাকবে। তা যেন এমন এক একচক্ষু জলদানব যার অশুভ উচ্চ ছাগনিনাদের কথা এমনকী কোনো কাব্যে-পুরাণেও বলা যায়নি। হরদয়ালের চিঠিপত্র থেকে একটা মন্তব্য পাওয়া যায় :

> স্টিমশিপ অবশ্যই উন্নয়নের সহায়ক হইবে। ব্যক্তিগতভাবে এই প্রচেষ্টাকে আমরা সমর্থন করি, কেননা যেখানে নদীপথ আছে সেখানে রেলপাতার তুলনায় স্টিমশিপ লাইন প্রবর্তন অনেক কম শ্রমে ও অনেক কম ব্যয়ে হইতে পারে। কিন্তু বলিব কী, হয়তো বহু দিনের সংস্কারে মনে হইল সব দিক দিয়া আচ্ছন্ন হইলেও হয়তো-বা রক্তে কোথাও আরোগ্যের বীজ ছিল, কিন্তু এই স্টিমশিপ যেন নদীরূপ শিরা বাহিয়া দেশের অন্তঃকরণকেও আক্রমণ করিল। কিছু আর অজিত রহিল না।

এই স্টিমশিপ কেন এসেছিল তা নিয়ে মতদ্বৈধ কিছু আছে। অ্যালবেট্রস জাহাজ যে একবেলা কুতঘাটে

ছিল সে ঠিক নয়। কারণ সেটা পরে নিয়মিত কয়েকবার এসেছিল। এ-রকম মত আছে এই 'অ্যালবেট্রস' স্টিমশিপে সেই শীতেই পরে জঙ্গিলাট এসেছিল রাজনগরে। জঙ্গিলাট যে এসেছিল এবং প্রায় এক সপ্তাহ ছিল রাজনগরে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে : রাজবাড়ির সেই বুলন্দ-দরওয়াজার অনুকরণে তৈরি সদর-দরজার সামনে রাখা ক্যারেজসমেত দুটি গান-মেটালের কামান। কামানের চোং-এ মেরামত করা ফাটল থেকে তার ব্যবহারযোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চয় সন্দেহ করা যায়। কিন্তু তার গায়ে খোদাই করা সংবাদ থেকে জানা যায় কামান দুটি কানপুরকে বিদ্রোহমুক্ত করতে ব্যবহার হয়েছিল। এবং তা জঙ্গিলাটের উপহার। অ্যালবেট্রস জঙ্গিলাটকে নিয়ে যাওয়া-আসা করেছিল তা প্রায় নিশ্চিত।

প্রথমবার তা হয়তো জলপথের গভীরতা নাব্যতা ইত্যাদি পরীক্ষা করতেই এসেছিল, পরে কিছুদিন কিন্তু মাঝে মাঝেই আসত, অন্তত যতদিন শীতের ভাবটা ছিল। বসন্তের মাঝামাঝি হঠাৎ একবার চলে গিয়ে আর আসেনি। ডুবেছিল কি? পরে, তা অনেকদিন পরেই, অন্য জাহাজ চলত এই লাইনে। কিন্তু এটা সম্ভব নয় যে ইন্ডিগো কমিশনের সাহেবরা এসেছিল অ্যালবেট্রসে। কারণ অ্যালবেট্রস প্রথম এসেছিল সরস্বতী পূজার সকালে, তখন জানুয়ারির শীত, আর ইন্ডিগো কমিশনের সভ্যরা এসেছিল ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। ক্রিস্টমাসের বরং আগে।

সুতরাং ডিসেম্বরের কথা আগে বলে নিতে হয়। তখন স্কুলের পরীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। প্রমোশন শুধু বাকি। বাগচী এবং শিক্ষকেরা নতুন বছরের শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক নিয়ে আলোচনার জন্যই দুপুরে একবার করে স্কুলে যাচ্ছে। বাগচীর হাতে ঢালা অবসর। ব্রেকফাস্টের পরও সে এখন মাঝে মাঝে স্টাডিতে ঢুকে লাঞ্চের সময় পর্যন্ত কাটিয়ে দেয়। কেটকেই বলতে হয় স্কুলে যাবে কিনা সে? সন্ধ্যায় মাঝে মাঝে রাজবাড়িতে যাওয়া আছে। সেখানে রাজকুমারের সঙ্গে অথবা হরদয়ালের সঙ্গে সময় কেটে যায়। একজন হেডমাস্টারের পক্ষে পড়ার ঝোঁক থাকাই স্বাভাবিক। শুধু স্কুলের পাঠ্যপুস্তক পড়ে নির্বাচন করাই নয়।

নিজের পড়াশোনা আছে। কেট লক্ষ্য করেছে হিন্দু পেট্রিয়টের পুরনো ফাইলগুলোর বদলে তারই নতুন সংখ্যাগুলো এখন বাগচীর টেবিলে। ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট বইটা তাকে তোলা, তার বদলে নিও-প্লেটোনিক দর্শন পাঠ হচ্ছে কখনও কখনও।

আগের দিন সন্ধ্যায় রাজবাড়ি থেকে ফিরে বাগচী বলেছিল—রাজকুমার, রানীমা, দেওয়ানজি ঠিক পনেরোই ডিসেম্বর রওনা হবেন। দুখানা বোট আছে। সঙ্গে আরো কয়েকখানি দেশি নৌকো থাকবে। আমাদের যাওয়া তো একরকম ঠিকই। দেওয়ানজি বলেছেন একটা-দুটো পোর্টম্যান্টোতে পোশাক নিলেই হবে শুধু।

কেট বলল—এখন দিন সাতেক দেরি। একটা কথা কিন্তু বলি।

বাগচী চোখের সামনে থেকে বই সরিয়ে কেটের দিকে ফিরল—বলো, কিছু ভাবছ মনে হচ্ছে।

—একটা কথা কি...না, তোমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে তা কখনওই নয়, কিন্তু কথাটা কি, তুমি কিন্তু বেশ অনেকদিন থেকে বাড়িতেই বসে থাকছ।

—কেন, মাঝে মাঝেই রাজবাড়িতে যাচ্ছি না, স্কুলে ছাড়াও?

—বলব কি? প্রায় সপ্তাহ তিনেক হয়, তুমি কিন্তু কি সকালে, কি বিকেলে তোমাদের সেই ডিসপেনসারিতে একবারও যাওনি বোধ হয়।

বাগচী যেন বিস্মিত হয়ে গেল এই আবিষ্কারে। কিছুপরে হেসে বলল—কেন যেতে হবে? সেটা কি আমার প্রফেশন? সে বেশ খানিকটা হো-হো করে হাসল কেটের অযুক্তি ধরে ফেলে।

সেদিন সকালে উঠেই বাগচী বলল—কথা তুমি মন্দ বলোনি, ডারলিং। চলো, আজ সন্ধ্যায় আমরা দুজনেই দেওয়ানকুঠিতে যাব। তারা সেদিন সন্ধ্যায় দেওয়ানকুঠিতে অনেকটা সময় কাটাল। তারা লাইব্রেরিতেই ইচ্ছা করে বসেছিল, সুতরাং আলাপে বই-এর কথাই বেশি হল। আসবার সময়ে বাগচী

নিজে থেকেই বলল—দেওয়ানজি, আমি ভেবে দেখলাম রাজকুমারের সেই চাকরিটা আমার গ্রহণ করাই উচিত হচ্ছে। তা শুনে হরদয়াল বলল—এটা খুব ভালো সংবাদ। আমি রানীমাকে জানিয়ে দেব।

তারা যখন পথে বেরিয়েছে, তখন মাঝারি ধরনের জ্যোৎস্না পথে। এতক্ষণ আলাপের পরে তারা দুজনেই নিঃশব্দে চলেছিল। তারা যখন গঞ্জের কাছে, কেট বলল—চাকরিটা কিন্তু অন্য জাতের। হঠাৎ কথা দিয়ে ফেললে না তো?

বাগচী বলল—তা কেন? ওটা কি একরকমের শক্তি দেয় না, ওই রকম চাকরি? হঠাৎ কেন?

কিন্তু হঠাৎ দৃশ্যটা তাদেব চোখে পড়ল। গঞ্জের দোকানগুলোতে আলো থাকে, কিন্তু তারপরেই রাস্তাটা বরং আজ আলো-আঁধারি থাকার কথা, কিন্তু কিছু উঁচুতে একটা ফানুসের মতো আলো যেন। কেট তাই বলে বাগচীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিন্তু ভালো করে দেখে ফানুস বলা গেল না। বিস্মিত কেট জিজ্ঞাসা করল—স্ট্রিট লাইটিং! আশ্চর্য! এই গ্রামে?

বাগচী বলল—হতেই পারে, হতেই পারে। কে যেন বলছিল আমাদের গ্রামটা মিদনাপুর না হুগলির মতো শহর হতে চলেছে।

তাদের বেড়াতে ভালোই লাগছে, মনটাও লঘু। কেট বলল—তাহলেও আশ্চর্য হতে হবে। দ্যাখো, মিদনাপুর আর হুগলি কলকাতার কথা নাই তুললাম, সেসব জায়গায় আলো দেয় তো গভর্নমেন্ট, দেশের রাজা। এখানে এঁদের কি এত টাকা? আর এঁরা দেশের রাজাও নন।

বাগচীও লঘুভাবে বলল—অপচয় বলছ? এঁদের উপরে দেশের মঙ্গল দেখার ভার নেই বলছ? দ্যাখো, ডারলিং, আমরা নেহাত মধ্যবিত্ত। মধ্যবিত্ত নয় এমন এক দলের কাছাকাছি ঘেঁষে কি আমাদের এসব চিন্তা? সে হেসে নিল। বলল—টাকা থাকলে অপচয় হয় বটে, কিন্তু দ্যাখো তার কিছু ঘটানোর ক্ষমতাও আছে।

কেট বলল—ডারলিং, ইতিমধ্যে তুমি যেন রাজবাড়ির ধরন-ধারণকে ভালোবেসে ফেলেছ।

বাগচী হো-হো করে হেসে বলল—বলছ, চাকরি পাওয়ার আগেই হল? কিন্তু একটু গম্ভীর হল সে। বলল, টাকা, টংকা, রূপিয়া, পৌন্ড যে নামেই বলো, ক্রাইস্ট অনেক দিন আগেই বলেছেন, ওটা থাকলে স্বর্গে যেতে দেরি হয়। হয়তো এ রাজবাড়ির পিতামহ পিতার সময়ে লুটপাট ইত্যাদি অর্থ সংগ্রহের ভিত্তি ছিল। আমার তো মনে হয়, ও জিনিসটার সঞ্চয়ের গোড়ায় লুট, ধ্বংস, নৃশংসতা থাকেই। যদিও এখানকার প্রচুর ধনের কারণ কার্পণ্য। তুমি, উৎসবের রাতে দেওয়ানজি যা বলেছিলেন মনে করো। তিনি হয়তো বলতে চাইছিলেন—কলকাতার কোনো কোনো রাজা যেমন সাহেব-মেমেদের মদ আর খানা দিয়ে লাখপতি থেকে কোটিপতি হতে চলেন, এখানে এই এক আধুনিকতা যে ইংল্যান্ডের ধার্মিক মানুষদের মতো রানী স্টকে এবং কম্পানির কাগজে টাকা রেখে যাচ্ছেন।

—তুমি কি সত্যি বিশ্বাস করো ধর্ম, অর্থাৎ পিউরিটানদের যেটা, তার সঙ্গে টাকার যোগ আছে?

—আদৌ না। এখান থেকে লুটপাট করে যাঁরা ন্যেবর হয়ে ফেরেন তাঁরাও স্টকে ঢালেন। কিন্তু আমার সন্দেহ তাঁরা অন্য স্রোতেও ঢালেন। ফলে যারা সেখানে তিল-তিল ক'রে সঞ্চয় করে আর আচার-ব্যবহারে পিউরিটান, অন্তত নির্দয়ভাবে মর‍্যালিস্ট তারাই প্রায় সব রেলরোডের মালিক।

—তুমি কিন্তু টাকার শক্তির দিকটাই তুলে ধরছ শুধু।

—তা তো বটেই, তা তো বটেই। এমনকী এখানে ডানকানের যে-শক্তি তাও তো তাই। নয় কি?

সেদিন ডিনারে বসেও বোধ হয় তাদের মনে হালকা ভাব ছিল। তারা যেমন গল্প করছিল তেমনই করতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ কেট বলে বসল, তোমাকে একটা গল্প বলতে পারি।

বাগচী বলল—নিশ্চয়। বলো।

কেট বলল—কতগুলি শক্তি নয় কি যা আমরা দেখি? যেমন ধরো রাজকুমার এই গ্রামের একরকম শক্তির প্রতীক।

বাগচী বলল—ভেরি গুড। তাই বলে ডানকানের শক্তি থাকলেও তাকে কিন্তু অন্য নাম দিতে হয়।

কেট বলল—বলতে দিচ্ছ না কেন? যেমন ধরো দেওয়ানজি আর-এক রকমের শক্তির প্রতীক।

—এটা অস্বীকার করা যায় না। তুমি তৃতীয় শক্তির প্রতীক হিসেবে তাহলে রানীমাকে দেখছ? কেমন ধরিনি?

বাগচী খুশিতে হাসল।

কেট বলল—তা হবে কেন? আমাকে বলতে দিচ্ছ না। তৃতীয়টি এক দারুণ মর‍্যাল শক্তি। আমার আনন্দ, তার প্রতীক আমার ঘরে।

বাগচী যেন চমকে গেল। হাসতে গিয়ে গম্ভীর হল। ঠাট্টার সুরে বলল—এ একেবারে নিজের কোলে ঝোল টানা। রাজকুমার আর দেওয়ানজির পাশে আমার মতো...। কিন্তু তার এ রকম মনে হল, এ ধরনের চিন্তা কি সে-ও করেছে সন্ধ্যা থেকে? যেন শক্তি পাওয়ার ইচ্ছা।

সে দেখল, কেটের গাল দুটো লাল দেখাচ্ছে, চোখ দুটি উজ্জ্বল। সে ভাবতে চেষ্টা করল, এই অদ্ভুত গল্পটা যা এখন কেট বলল, তার কিছু কি ভিত্তি আছে?

সম্ভবত পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের আগেই বাগচী তার কুঠির পিছন দিকের বাগানটার গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে একটা কিচেন গার্ডেন। সহিস তদারক করে। সেখানেই তার প্যাডকও, যেখানে তার টাট্টুটা থাকে। সে রোদে-রোদে ঘুরছিল। শীতে তা আরামই লাগে। সে সহিসকে বাড়তি ঘাস কেটে ফেলতে দেখে জিজ্ঞাসা করল—দু'একটা করে ফুলগাছ লাগালে কেমন হয়? অলসভাবে রোদ পোয়ানোর ভঙ্গিতে সে প্রকৃতপক্ষে গোলাপ নিয়ে আলাপ করল। কিন্তু টাট্টুটা তাকে দেখে ফেলেছিল। সে নাক না-ঝেড়ে পারল না। বাগচী হাসল। কিন্তু তাব মনে পডল তিন সপ্তাহ, কম করেও, সে টাট্টুটাকে ব্যবহাব করেনি। সে জিজ্ঞাসা করল—সহিস তাকে হাওযা খাওয়াচ্ছে কিনা। বলে দিল, অন্তত মাইল দুয়েক যেন রোজ হাঁটায়। সেখানে কেট এল তাকে কিচেনের জানলায় দেখে। সে বলল—এখানে কী হচ্ছে? বাগচী হেসে বলল—ভাবছ রোদ পোয়াচ্ছি? মোটেই না। বাগানটার উন্নতির কথা ভাবছিলাম। তুমি হয়তো জানো না, আমাদের কুঠি একেবারে মরেলগঞ্জের কুঠিব স্টাইলে। শুধু আকারে ছোট। কাজেই একটা বাগিচা থাকলে ভালো হয় না? তাছাড়া ভেবে দ্যাখো, আমাদের আয় তো জানুয়ারি থেকে একজন সিনিয়র ডেপুটির সমান বটে।

কেট হেসে বলল—বিউটিফুল।

কিন্তু বাগচী লজ্জিত হল, অবাক হল, আবিষ্কাব করল, দ্যাখো কাণ্ড! সত্যিই তো সহিসের সঙ্গে গোলাপ লাগানোর কথা বলছিল। এখন যা বলল তাহলে কি তা ঠাট্টা নয়? এ রকমই নিজে না-জেনেই ভাবছে?

কিন্তু সেদিন রবিবারও বটে। ব্রেকফাস্ট শেষে তখন তারা পার্লারে, সর্বরঞ্জনপ্রসাদ আজ আবার শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হল। আজও তার ছোট্ট একটা প্রস্তাব ছিল, শ্রদ্ধা জানানোর শেষে সে বলল—আমার একটা নিবেদন আছে, সার। ক্রিস্টমাস আগতপ্রায় এখন কি একটা সভার আয়োজন করতে পারি না? স্কুল বন্ধ হতে পারে, কিন্তু আপনি অনুমতি করলে অনায়াসে আমাদের অধিকাংশ ছাত্র এবং তাদের অভিভাবকদেরও সংবাদ দেওয়া যায়। এটা কি ভালো হয় না যে আমরা শিক্ষকেরা এবং তাবা ছাত্রেরা মিলে এই বিশেষ দিনটিতে লোকত্রাতা ঈশ্বরপুত্রকে স্মরণ করি?

বাগচী নিয়োগীর কথার মৃদু টানা স্রোতে যেন ভেসে যাচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল, ভদ্রলোক যে উন্নত মনের সন্দেহ কী? প্রস্তাবটা তো ভালোই। কিন্তু হঠাৎ কিছুতে যেন তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটালো। সে বলল,—'আচ্ছা মশাই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি? আপনি কি ক্রাইস্টকে—আচ্ছা, কেন শ্রদ্ধা করেন ক্রাইস্টকে? প্রেমের জন্য কি'?

নিয়োগী বলল, 'সেটাই কি সত্য নয়? প্রেমই কি নয়? তিনি এমন প্রেম করিলেন যে...'

বাগচী বলল, 'আচ্ছা মশাই, আপনি হিন্দু না-হতে পারেন, ক্রিশ্চিয়ানও তো নন। এমন দুর্বল কেন বলুন তো? আপনি কি কখনও শ্রীচৈতন্যের জন্মদিবসে সভা করার কথা ভেবেছেন? তিনিও শুনি প্রেমের পথেই...না-না, ওসব সভা হবে না। তাছাড়া আপনি কি পারবেন? আচ্ছা, আপনাকে ইন্ ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট বইটা পড়তে দেব। সে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। ক্রিশ্চিয়ানরা পারছে'?

নিয়োগী অবশ্যই শ্রীচৈতন্যর ধর্মের সঙ্গে যুক্ত পরকীয়া ইত্যাদির কথা মনে যুক্তি হিসাবে গুছিয়ে নিচ্ছিল, কিন্তু সেদিন সে ভারাক্রান্ত মনে বিষণ্ণ মুখেই বিদায় নিতে বাধ্য হল। বাগচীকে নিত্যন্ত চিন্তাকুল দেখাচ্ছিল।

কেট তার সেলাই-এর ঝুড়ি নিয়ে এল। আজ সকালেই সে স্থির করেছিল সারাদিন বুনলে রাজকুমারের সোয়েটারটা শেষ হবে। তারপরে তিনদিনে তার নতুন সার্জের গাউনটাকে সেলাই করে নেওয়া যাবে। তারপর সোয়েটারটাকে নয়নঠাকরুনকে পৌঁছে দিতে হবে কোনোভাবে। নয়ন সেটাকে রাজকুমারের গায়ে তুলে দিলে যে-দৃশ্যটা হবে তার আলোটাকে সে অনুভব করছিল।

কিন্তু কথা অন্যভাবে শুরু হয়। সে বলল, 'নিয়োগীমশায়...দুর্বলের কথা কী বলছিলেন'?

বাগচী বলল, 'তুমি শুনেছ নাকি আমাদের কথা? ভালো নয়, ভালো বলতে পারিনি। বোধ হয় খুব তাড়াতাড়ি ভাবতে গিয়ে মনে হল তখন। দ্যাখো, এটা তো ঠিকই ক্রাইস্ট ইহুদিদেরই একজন যারা তখন প্রায় বর্বর ধনী রোমকদের পদানত ; দ্যাখো, এটা তো ঠিকই প্রথম যারা তাঁর ধর্মকে নিয়েছিল তারা তো ছিল উৎপীড়িত ক্রীতদাস'। তখন হঠাৎ মনে হল, চৈতন্য যখন এদেশে প্রেমের ঈশ্বরের কথা বলেছিলেন তখনও পাঠানের উৎপীড়নে ছিল একটা জাতি। মনে হল দুর্বলতাতেই, পরাজিত হলেই মানুষ প্রেমের প্রচার করে নাকি? বাগচীর মুখটা নিয়োগীর চাইতেও বিষণ্ণ হল। কেট মুখ তুলে কিছু বলতে গেল, কিন্তু তার যেন এই ভয় হল, অত তাড়াতাড়ি এসব বিষয়ে কথা বলতে নেই। তার অস্পষ্টভাবে মনে হল, ক্রিশ্চান সব চার্চই তাদের ইউনিটারিয়ান মতকে বিদ্রূপ করে তা সত্ত্বেও ক্যাথলিক রলের চার্চ মিশনের ব্যাপারে বাগচীর উৎসাহ দেখে সে এরকম কিছুই বলতে গিয়েছিল। সে-ও বিষণ্ণ হল।

কেটকে সংসারের কাজে কিছুক্ষণের জন্য উঠে যেতে হল—তা মিনিট দশেক হবে। সে ফিরে এসে অবাক। ইতিমধ্যে বাগচী ইদানীং অভ্যস্ত ড্রেসিং-গাউন বদলে বাইরের পোশাক পরা শেষ করে সযত্নে ক্র্যাভাট বাঁধছে। কেট বসল ; যেন কৌতুক ঘটবে কিছু। বাগচী তার টুপিটাকে ব্রাশ করে মাথায় চাপাল। এক টুকরো কাপড় তুলে তার ছড়িটাকেও ঘষে নিল।

কেট একটু কৌতুকের সুরেই বলল, 'সে কী, কোথায়'?

বাগচী বলল, 'আজ রবিবার নয়? ডিসপেনসারিতে যেতে হয় না? সহিসকে জানলা দিয়ে বলো ঘোড়া আনতে'।

বাগচী ভাবল : কী আশ্চর্য, কী ভয়ঙ্কর, সে কি ধর্ম থেকে এতদূর সরে গিয়েছে? আজ সম্ভবত বিশ দিন হয়, চরণের সঙ্গে প্রতিদিনই দেখা হয়েছে, কিন্তু ইসমাইলের সেই পরীক্ষার পর থেকে একটা কথাও তার সঙ্গে বলেনি। এও রাগ নাকি? আশ্চর্য! ইসমাইলের চোখেরই-বা কী হল? না-হয় চরণ তোমার ধর্মকে আঘাত করেছে, তোমার সংস্কৃতিকে বিদ্বেষ করে, কিন্তু ইসমাইলের কী অপরাধ যে বিনা চিকিৎসায় তার চোখ নষ্ট হবে? সে মনে মনে বলল, ভগবান, আমার জন্য কি ক্ষমা আছে? কুড়ি দিনে অন্তত কুড়িবার মনে হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও চরণকে ক্ষমা করতে পারিনি।

পথে বাগচী স্থির করল, চরণকে গোটা ব্যাপারটা সে বুঝিয়ে বলবে। সে তো যেমন পাদরি, তেমন হেডমাস্টারও। ধর্মের কথা নাই হল, হেডমাস্টার, শুধু ছাত্রদের নয়, শিক্ষকদের সঙ্গেও তো আলোচনা করে তাদের গাইড করে। হয়তো চরণ বলবে, আমরা তো সার, ক্রীতদাস। তখন কিন্তু বলতে হবে, হ্যাঁ, চরণ, স্বীকার করি যে আমরা পরাধীন, কিন্তু তাই বলে ক্রীতদাস? তুমি কি জাহাজের খোলে বেতের বাঁধনে বাঁধা সেই কালো-কালো মানুষের যন্ত্রণা আর গোঙানির কথা জানো? রোসো, তোমাকে পড়তে

দেব। দেওয়ানজির লাইব্রেরিতে পাবে সেই টমচাচার গল্প। সোজা ইংরেজি। তাই-বা কেন, আজ চরণকে উইলবারফোর্স আর ক্ল্যাপহ্যাম সেক্‌টের কথা বলতে হবে। সেই যারা ইংল্যান্ডে বসে ক্রীতদাস প্রথাকে লোপ করেছে। বলতে পারো, চরণ, ইংরেজরাই বেশি জাহাজ নামিয়েছিল ক্রীতদাসের ব্যবসায়। তারাই কিন্তু ক্রীতদাসপ্রথা লোপও করেছে। তুমি কি কলকাতাতে রাজাদের বাড়িতেও আর ক্রীতদাস দ্যাখো? একটাও পাবে না। হাবসিবাগান আছে বটে, কিন্তু সেখানে ক্রীতদাস নেই। অথচ এই দেশে এমনকী নুরজাহাঁও ক্রীতদাস ছিল। তোমাকে আরো বলি, সে আপন মনে হাসল, এরা কিন্তু সকলেই ডানকানের কীবলের জাতি। ক্রিশ্চিয়ানই ধর্মে। তাদের স্বীকার করার সাহস আছে তাদের দেশে কল-কারখানায় শ্বেত-ক্রীতদাস আছে। তারা কিন্তু তার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করে। বেশ কথা, ইংল্যান্ডেব কথা যদি তোমার বিশ্বাস না-হয়, আমেরিকাকে দ্যাখো। সেখানে সবচাইতে বেশি ক্রীতদাস। সেখানেই কিন্তু গত এক দশক সব চাইতে বেশি আন্দোলনও। এমন হতে পারে সেখানে এ নিয়ে যুদ্ধ লেগে যেতে পারে। টাইমস পড়েছ?

তিন সপ্তাহের নিরুদ্ধ আবেগে এসব ভেবে যখন চবণদের পাড়ায় ঢুকছে, নিজেব আবেগেব দরুন লজ্জিত হয়েই চিন্তাটাকে যেন মাটিতে নামিয়ে আনল। ব্যাপাবটা তো ডানকানের নীল চাষ আর দাদন নিয়ে। নীল চাষ যে করা হয় তা লাভের বলেই। দাদনটাও যে কী তা আমরা তাঁতিপাড়ায় দেখেছি। দাদন পেলেই তবে তাঁতে রেশম চাপায়। বিক্রির নিশ্চয়তার জন্যই দাদন নেওয়া। নীলেও দ্যাখো, বিক্রির নিশ্চয়তার জন্যই দাদন চলেছে। কেউ তো আর জমিতে নীল চাষ করে নীল বার করে, তারপরে জাহাজ কিনে, জাহাজে মাল চালান দিতে পারে না। দাদন অন্তত এই নিশ্চয়তা দেয়, ফসল মাঠে পড়ে থাকবে না। মুশকিল হচ্ছে এই, মহাজনের সংখ্যা কমলে, প্রতিযোগিতার অভাবে তারা দাদনেব পরিমাণ কমায়। নীলের ব্যাপারেও মহাজনের এই সুবিধা—একটাই তো নীলকুঠি ও অঞ্চলে। রাগ না-করে ভাবতে হবে, যারা নীলচাষ নিয়ে ধর্মঘট করেছিল তারাও নীল চাষই করছে আবাব।

কিন্তু ততক্ষণে সে চ।ণের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছে।

তাদের সেই ডিসপেনসারিতে কয়েকজন রোগী ছিল। বাগচী যেন কিছুই নয় এমনভাবে গুডমর্নিং বলে বারান্দায় উঠে তার জন্য নির্দিষ্ট চেয়ারে চেপে বসে হেসে বলল, 'ক্যারি অন, চবণ, ক্যাবি অন'। সে আধঘণ্টা ধরে চরণের চিকিৎসা দেখতে লাগল। শেষ রোগীটা চলে গেলে বারান্দাটা ফাঁকা যখন, বাগচী বলল, 'হ্যাঁ, চরণ, আমাদের ইসমাইলের খবর কী? তার চোখটা'?

চরণ বলল, 'সারেনি, কিন্তু অনেকদিন আসছেও না। এরাই বলছিল, সে নাকি এখন এক সোলোমান সাহেবের সঙ্গে নৌকায় করে মাছ ধরে বেড়ায়। সোলোমান না কী সোলোভান নাম তার'।

বাগচী বলল, 'কীবলের সঙ্গে যখন মারামারি, ইসমাইলদের তাহলে মরেলগঞ্জে জমি ছিল? ওইটুকু ছেলে, ও কি মাছ ধরে কিছু করতে পারছে'?

'নিজের পেট চলছে বোধ হয়'।

'নিজের পেট? ও কি তার আত্মীয়স্বজন থেকে পৃথক'?

চরণ একটু অসুবিধায় পড়ল। সে ভাবল, একবার কীবলের কথা গোপন করে মুশকিল হয়েছিল, যা আজই মাত্র মিটতে চলেছে। সে স্থির করল সাধারণত যা বলা হয় না তেমন কথাও গোপন করা উচিত হবে না। সে বলল, মাস ছয়েক আগে ইসমাইলের বাপ মরেছে। সংসারে থাকার মধ্যে মা আর ছেলে। ছেলে চাষ না-করে স্কুলে যেত বলেই জুড়ান তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ছোটসাহেবের কাছে। সেজন্যই চোখের ওই অবস্থা। তা এখন নিশ্চিন্ত, জুড়ানই ওর মাকে নিয়ে থাকছে।

বাগচীর মনে করুণা আর ঘৃণায় মিশ্রিত একটা অব্যক্ত ভাব দেখা দিল। কিন্তু আবার কি ধর্মনীতির কথা ওঠে? এই ভেবে সে একরকম হাসল। বলল, 'সলোমান, সোলেভান বললে, সে কি ডিসিলভা কিংবা ওসুলিভান হতে পারে? ফেলিসিটারের সেই লোকটি কি এখন এই গ্রামে'?

'সেই হবে। এক হতভাগা তাতে সন্দেহ নেই। কয়েকদিন আগে ইসমাইলকে গঞ্জে ধরেছিলাম। বললাম, জলে-জলে ভাসছিস...! তা, বলল, সাহেবও ভেসে যাওয়ার কথা বলে। ভাসতে-ভাসতে একদিন নাকি চোখ ভালো হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু এটা তো এমন নয় যার জন্য সে এসেছে আজ। বাগচী বলল, 'তোমার সঙ্গে আজ নীল চাষের কথা বলব। গত তিন সপ্তাহ এ বিষয়ে পড়েছি, ভেবেছি। মনে করো আমরা নীল চাষ করব না। কী করব—ধান, কলাই, সরষে, আখ'?

চরণ একটু ভেবে বলল, 'গোপালদা এসব বিষয়ে ভাবছে। বলছিল, সবাই ধান কলাই করলে তার দাম এমন পড়ে যায় যে তাতে যারা কিনে খায় সেই বাবুদের সুবিধা, চাষিরা কিন্তু না-খেয়ে থাকে?

'তাহলে কি আখ'?

চরণ আবার ভাবল। বলল, 'আগে এদিকে আখ হতো, গুড় হতো। মরেলগঞ্জের পশ্চিমে সোহাগপুরে এখন গুড় আছে। কিন্তু তারাও অন্য চাষের কথা ভাবছে। বলে, জাহাজি চিনির সঙ্গে, জাহাজি গুড়ের সঙ্গে এঁটে ওঠা যাচ্ছে না। পূজা ছাড়া, বামুন কায়েতের বিধবারা ছাড়া কে আর দেশি গুড় আর দেশি চিনি খাচ্ছে?

বাগচীর নিজের ঘরের সুগার-বউলের কথা মনে পড়ল। চকচকে বড় দানার সেই চিনি যা গঞ্জের বাজার থেকে সহিস নিয়ে গিয়েছে তা কিন্তু দেশি বলে মনে হয়নি।

বাগচী খানিকটা সময় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। পাইপ ধরাল। তা পুড়িয়ে শেষ করল। বলল, 'চরণ, এখন তো টানা ছুটি স্কুলের। ক্রিস্টমাসে একবার কলকাতা যাব। কিন্তু তার আগে রোজই আসব। দু-বেলাই। রোগীদের খবর দিও। কলকাতা যাওয়ার আগে ক্রনিক রোগীদের ওষুধ দিয়ে যাব।

সে ভাবতে লাগল। এই সময়েই কথাটা তার মনে হল, 'আচ্ছা, চরণ, ইন্ডিগো কমিশনের কথা শুনছ কিছু? এ কি সত্য যে মরেলগঞ্জে কমিশন আসছে? তারা কি মরেলগঞ্জের অন্যায় নিয়ে খোঁজখবর করবে?

চরণ বলল, 'হ্যাঁ, সার। দিন তিনেক আগে সকলকে নুটিশ দিয়েছে। যার যার ইচ্ছা কমিশনকে বলতে পারে অভাব-অভিযোগের কথা। বড়দিন পর্যন্ত লিখিত অভিযোগ নেবে। তারপর জানুয়ারির শেষ দিকে তারা আবার এলে সেই দরখাস্তের উপরে জেরা হবে'।

একবার বাগচীর মনে হল সে বলবে : দ্যাখো, তাহলে এখানেও ইংরেজরা কমিশন বসাচ্ছে! এটা কি একটা ভালোর লক্ষণ নয়? কিন্তু সে চরণের মুখে অপ্রীতিকর কিছু শোনাকে এড়িয়ে যেতে অন্য কথায় গিয়ে বলল, 'তাহলে, চরণ, কঠিন রোগীদের, বিশেষ ক্রনিক রোগীদের যেন সংবাদটা জানানো হয়। কলকাতায় যাওয়ার আগে ওষুধ দিয়ে যাব'।

দিন তিন-চার পরে বিকেলের দিকে সে রোগী দেখা শেষ করে তখন কুঠিতে ফেরার উপক্রম করছে, চরণের বাড়ির দিকে দু-তিনজনকে একত্র আসতে দেখে সে বারান্দার নিচে দাঁড়াল। পাশে দাঁড়ান চরণকে জিজ্ঞাসা করল, 'রোগী নাকি চরণ'? ততক্ষণে তাদের দেখতে পেয়ে চরণ গম্ভীর হয়ে গিয়েছে। আগন্তুকদের একজন প্রৌঢ় আর দুজন যুবক। চরণ একটু বিরক্তির স্বরেই বলল, 'অমর্ত্যমামাকে এখন এখানে আনতে গেলে কেন, কৃষ্ণকাকা'?

সেই প্রৌঢ় বলল, 'তুমিই তো লোককে জানিয়েছ, ডাক্তারসাহেব কলকাতা যাওয়ার আগে রোগী দেখবেন—তাই শুনেই অমর্ত্য ধরেছে তাকে একবার দেখতে'।

বাগচী কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল, 'অমর্ত্য কোনটি, তার কী হয়েছে, এরাই-বা কে'?

চরণ আবার সমস্যায় পড়ল। আবার কী গোপন করবে, আর তার ফলে আবার এক ভুল বোঝাবুঝি? সে তখন পরিচয় দিয়ে জানাল প্রৌঢ়টির নাম কৃষ্ণানন্দ, তার স্ত্রীর পূর্ব পক্ষের শ্বশুর এবং তারও খুড়ো সম্বন্ধে। অমর্ত্য কৃষ্ণানন্দের সম্বন্ধে শ্যালক। বললে, অমর্ত্যর কিছুদিন থেকে একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তার স্ত্রী এবং কন্যা, সংসারে নিজের বলতে তারাই। তাদের সঙ্গে ব্যবহারের পরিবর্তন হয়েছে।

সংসারের বাইরে যারা তাদের সঙ্গে তো বটেই। সবসময়েই প্রায় চুপচাপ থাকে, কথা বলতে গেলে চিনতে পারে না, অন্য সময়ে রেগে গিয়ে ঘরের জিনিসপত্র নষ্ট করে।

বাগচী গলা নিচু করে বলল, 'তুমি কি এটাকে মেন্টাল কেস বলছ'?

তখন চরণ কিছুটা ইতস্তত ক'রে কীভাবে অমর্ত্যকে ডানকানের হুকুমে জুড়ান পাইক সারাটা মরেলগঞ্জে উলঙ্গ ক'রে ঘুরিয়েছে তা বলল।

বাগচী স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে হাসবে যেন এমন ভাব হল তার মনে। পরমুহূর্তে রক্ত যেন মাথায় চড়ে গেল, কথা বলতে কষ্ট হতে লাগল। সে-অবস্থায় সে ভাবল : না, বর্বর নয়, শয়তান।

বাসায় ফিরে বাগচী অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল। এমনকী ডিনারের আগে পর্যন্ত কেটের সঙ্গেও খুব কমই কথা হল। ডিনারে বসে সে বলল, 'আচ্ছা কেট, এবারেও ক্রিস্টমাসে যদি কলকাতায় না-যাই আমরা'?

পরের দিন সকালে, তখন তো কলকাতায় রওনা হতে আর দিন তিনেক বাকি, সে দেওয়ানকুঠিতে গেল। হরদয়ালকে পেয়ে জানাল তার পক্ষে কলকাতা যাওয়া একেবারেই সম্ভব হচ্ছে না। মরেলগঞ্জে ইন্ডিগো কমিশন আসছে। ২৫ তারিখ পর্যন্ত তারা নালিশ নেবে। পরে তার উপরে জেরা হবে। মরেলগঞ্জে অনেক নালিশ। কিন্তু কেই-বা তাদের সেসব নালিশ লিখে দেয়?

হরদয়াল জিজ্ঞাসা করল, বাগচী সেখানকার রায়তদের পক্ষে উকিল হিসাবে দাঁড়াতে চাইছে কিনা।

বাগচী হেসে বলল—আপাতত নালিশগুলো লিখে দিতে হবে। আর পরিচিত-অপরিচিত মিলিয়ে অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটা নালিশ তো হবেই মনে হচ্ছে। সময়ও লাগবে। তাদের জেরা করে নিখুঁত সত্য উদ্‌ঘাটন করে তা লেখা ২৫ তারিখের মধ্যে পেরে উঠলে হয়'।

চরণের বাড়িতে গিয়ে সে বলল, 'শোনো, আমার গায়ের রং কালো, তা বেশ কালোই ; কিন্তু আমি নিজেই জানি ইংরেজিটা আমি ভালো লিখি। একশোটা তো কম করেই নালিশ হবে। আর কদিনই-বা বাকি ২৫-এর। এর মধ্যে সকলের সঙ্গে আলাপ করে নিয়ে সত্যকে স্থির করে নিয়ে নালিশগুলোকে লিখতে হবে। চরণ এ তো বুঝতে পারা যাচ্ছে এ নালিশগুলো কখনও যদি প্রকাশ পায় পার্লামেন্টের সভ্যরা লজ্জায় লাল হবে। আমি জানি কী করে চোখের জল আর আগুনের আংরা ইংরেজিতে ভরে দেওয়া যায়। ইসমাইলের মা, ইসমাইল, অমর্ত্য কারো কথা বাদ যাবে না'।

এ রকম সিদ্ধান্ত করলে, সময় তো তখন বেশি ছিল না। একশোটা না হোক অন্তত পঞ্চাশটা নালিশ বাগচী খাড়া করেছিল। যাদের নালিশ তাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে অতীত ও বর্তমানের অত্যাচার, অনাচারের কাহিনীকে সত্যের ভিত্তিতে নির্ণয় করা, তাকে উপযুক্ত ভাষায় লেখা—বাগচীর দিনরাত কেটে যেতে লাগল। কিছুদিন যেমন তাকে বাড়ির বাইরে দেখা যেত না, তখন আবার খাওয়ার সময়ে ছাড়া কুঠিতেই পাওয়া যায় না। এমনি হল।

এক রাতে বাগচী বলল, 'আর দুদিন, ডারলিং। বোধ হয় পেরে উঠব শেষ করতে। তা তো হবেই, ছাপালে আড়াই তিনশো পাতার বই হবে'।

কেট বলল, 'তোমার শীত করছে না তো? পায়ের উপরে রাগ্‌ দেব'?

হয়তো সে নানারকম গরম কাপড়ের কথাই ভাবল। হঠাৎ যেন গল্পটা মনে পড়ল, মুখ তুলে বলল, 'সেই বনাতওয়ালা, জানো, ফেলিসিটার তো চলে গিয়েছে কিন্তু বনাতওয়ালা সেই ওসুলিভানকে দেখলাম কাল পথ দিয়ে যেতে'।

বাগচী তার কাগজ থেকে মুখ তুলল। অন্যমনস্কভাবে বলল, 'শুনেছি বটে সে নাকি ভেসে বেড়ানোর কথা বলছে'।

'ভেসে বেড়ানো? তুমি কি শ্যাওলার কথা ভাবছ, নাকি জলের উপরে ভাসা স্কাম'?

বাগচী আবার কাগজে মুখ নামাল। কেট বলল, 'আচ্ছা, ডারলিং, এরা কি সবাই রুটলেস? সবাই

কি ধর্মহীন? ওসুলিভানের বাবা-মা হয়তো দুই জাতির, তাই নয়'?

কেট সম্ভবত পথে ওসুলিভানকে দেখার পরেই কিছু ভেবেছে। সে আবার বলল, আচ্ছা, 'ডারলিং, মানে এদের মতো মানুষদের বাবা-মায়ের একত্র হওয়া কি অন্য কিছু? ওয়ান ইন গড হওয়া নয়'?

অন্যমনস্ক বাগচী বলল, 'তা তো বটেই। খানিকটা তো বটেই'।

শোবার সময় হলে বাগচীর গায়ের উপরে রাগ্ বিছিয়ে দিতে-দিতে কেট তার বিছানাতেই কিছু সময়ের জন্য বসল। বলল, 'আচ্ছা, ডারলিং, আমার ভয় করে, আমরা ধর্ম থেকে সরে যাচ্ছি না তো'?

বাগচী বলল, কেন? সামনে ক্রিস্টমাস। এবার কিন্তু আমরা পরপর দুদিনই বেশ অনেকটা সময় প্রার্থনা করব'।

সে রাতটাকে ক্রিস্টমাস ইভ বলা হয়। ডিনারের অসাধারণ আয়োজন করেছিল কেট। বাগচীর জানার কথা নয় কেট কখন কী বোনে। নতুন একটা সোয়েটার তাকে পরতেই হয়েছে। খেতে-খেতে বাগচীর হাসি দেখে কেট বলল—হাসছো যে একা একা? আমি ভাগ পেতে অধিকারী।

'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমার মনে হচ্ছিল, খড়ের বাড়িতে খড়ের কুচিতে গা ঢাকলে কি শীত যায়? তা থেকে আরো মজার কথা মনে হল। পাগলা ফ্র্যান্সিসের কথা।

'পাগলা'?

'নয়? ভাবো ইটালিতে তো এ-সময়ে বরফও পড়ে। ভাবো খালি গায়ে তুষার, চুলে তুষার, দাড়িতে তুষার। বোধ হয় এ-রকম কোনো ঋতুতেই বরফ দেখে বলেছিলেন—আগুন আমার ভাই'!

'বোন বলেছিলেন বোধ হয়'। কেট বলল।

'কেমন, অসাধারণ অনুভব করার শক্তি নয়? যেন এক মহাকবি'?

কেট দেখল—বাগচীর চোখের কোণ দুটো চিকচিক করছে।

রাত তখন এগারোটা হবে। কেটের হাই উঠল। বাগচী বলল, 'তুমি একটু শুয়ে নাও ডারলিং, আমি ঠিক রাত বারোটায় তোমাকে ডেকে তুলব। সারাদিন খেটেছ উৎসবের আয়োজনে।

'ঘুমিয়ে পড়বে না তো'?

'না না, আমি ঠায় বসে থাকব। এই সোয়েটার এমন আরামদায়ক, খুলতে ইচ্ছা করছে না'।

রাত বারোটার কিছু পরে কেটের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। সে তাড়াতাড়ি সময় ঠিক করতে এসে দেখল, বাগচী তার টেবিলে আলোর সামনে, কাগজের উপরে ঝুঁকে পড়ে লিখে যাচ্ছে।

ত্র য়ো দ শ প রি চ্ছে দ

সেবার রাজকুমার কলকাতায় পুরো একমাস ছিল। জানুয়ারির মাঝামাঝির আগে ফেরেনি, যদিও হরদয়াল ও রানীমা কিছু আগে চলে এসেছিলেন। তাতে অসুবিধারও কিছু হয়নি। উপরতলায় হৈমী ছিল, একতলায় রূপচাঁদ ছিল, নরেশ ওভারসিয়ার, হরদয়ালের সেরেস্তাদার ব্রজ ছিল, দাসদাসী বরকন্দাজেরা ছিল। উপরন্তু বড়দিনের পরেও যে নববর্ষের উৎসব, তখন তো হরদয়ালই ছিল তত্ত্বাবধানে।

এ রকম আন্দাজ হয়েছিল, জঙ্গিলাট আর রাজকুমার একইসঙ্গে আসবেন। কিন্তু হরদয়াল অবশ্যই সঠিক জানত। দুদিক দিয়ে সংবাদ আসছিল তাঁর, সদরে সওয়ার বহাল ছিল যাতে টেলিগ্রাম এলেই তা নিয়ে আসে, দীর্ঘতর পত্রাদি আসছিল ছিপ মারফত। পথে দাঁড়ি বদলে তারা আড়াই দিনে কলকাতার সঙ্গে যোগ রাখছে।

হরদয়ালের দুর্ভাবনা বরং কমে আসছিল, এবং সংবাদটা ক্রমশ ধীরে ধীরে কাছারির এ-মুখে ও-মুখে শোনা যাচ্ছিল। এমন তো ঘটতে দেওয়া যায় না যে রটে গেল জঙ্গিলাট রাজনগরে তিন-চারদিনের জন্য ক্যাম্প করবেন, অথচ তিনি এলেন না। অন্যের কানে সংবাদ তখনই গেল যখন কমিসারিয়েটের কনট্রাকটর জানাল জঙ্গিলাট আর তাঁর পার্টির জন্য অ্যালবেট্রস জাহাজ চার্টার করা হয়েছে। কলকাতা থেকে রাজনগর নদীপথটাকে অবশ্যই দেখে নেওয়া হবে। এখনকার মতো তখনও এইসব ট্যুরের খবর তখনই প্রকাশ করা হতো যখন উদ্যোক্তারা সব আয়োজন প্রায় শেষ করে এনেছে।

কিন্তু অ্যালবেট্রস? হরদয়ালের দিন দশেক আগেকার কথা মনে পড়ল। তার মুখে হালকা একটা চিন্তা যাওয়া-আসা করল। সেটা একটা বিশেষ দিন ছিল। যেদিন অ্যালবেট্রস অশ্রুতপূর্ব জলদানের মতো রাজনগরের ভোররাতের নদীতে দেখা দিয়েছিল। এমন নয় যে কুতঘাটে সংবাদ আনার লোক ছিল। হরদয়াল হাসল এবার মনে মনে। জেলেরা খবর এনেছিল। সেদিন তাদের আবার ইলিশ ধরার সূচনা। সরস্বতীপূজা তো। সেদিন থেকেই আবার ইলিশ খাওয়া হবে। তার কুঠিতে হয় না। কিন্তু রাজবাড়ির অন্দরেও জোড়া ইলিশ, জোড়া বড়ি, ধানদুর্বা, সিঁদুর এসব দিয়ে ইলিশকে অভ্যর্থনা করা হয়। যেমন গ্রামের পথে পথে, তেমন রাজবাড়িব দিকেও জেলেরা ঝাঁকা মাথায় ছুটতে থাকে। ইলিশ তো জীবিত থাকে না অন্য মাছের মতো, কিন্তু এমন চাই যে তখনও রক্ত গড়িয়ে আসছে কানকো থেকে। দেওয়ানকুঠিতেও মাছ দিতে আসবে তারা। সেখানে দাম নয়। দুটো মাছে দশটাকা বকশিশ তো!

তারাই প্রথম অ্যালবেট্রসের কথা বলেছিল। ভোর ভোর রাতে তখন বেড়জাল গুটিয়ে আনার চেষ্টা চলছে, প্রথমে আলোর ঝলকানি—যেন সূর্য উঠল অকালে ; কিন্তু দিকটা তো পুব নয়, দক্ষিণ। আর সূর্যের আলো কি জলের বুকে ঝাঁটায়? আর তখন বিরাট একটা ছাগলেব ভ্যাঁ ভ্যাঁ। কিন্তু জল কাঁপছে, ঢেউ উঠছে, তাদের ডিঙিগুলো নাচছে, জাল টানতে অন্যরকম লাগছে হাতে। অবাক হতে হতে, ভয় কাটাতে কাটাতে তাবা গেল গেল করে উঠল। সেই দানব তো জালের উপরেই উঠে পড়তে চায়। জাল বাঁচাতে চার-পাঁচখানা ডিঙ্গি, তারাই তো সেদিকে, ঢেউ অগ্রাহ্য করে ছুটল। জাল বাঁচল, কিন্তু শ্রীমন্তর নৌকাখানা ডুবেছে। বাপাবেটা মিলে তারা চারজন সাঁতরে উঠেছে বটে। তবে (জেলে দুজন হাসল এই জায়গায) মাছও এবার উঠেছে! বোধ হয় সেই কলের নৌকাই ঝেঁটিয়ে এনেছে মাছ।

এ বিষয়ে হরদয়ালের প্রথম চিন্তা আমরা শুনেছি ইতিপূর্বে—এটা একটা এগিয়ে যাওয়া, কিন্তু কিছুই আর অর্জিত রইল না। এ বিষয়ে সর্বরঞ্জনপ্রসাদের মনোভাবেরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। সে বাড়ির সামনে, গঞ্জে নয়, জেলে দেখে অবাক হয়েছিল। জেলেরা যখন প্রায় জোর করেই তাকে জোড়া ইলিশ দিতে চাইল, সে প্রথম বলল, এখানে এ রকম পাওয়া যায়? কিন্তু তার মনে পড়ে গেল, সেদিন পূজার ব্যাপার একটা আছে। তার মনে বিমুখতা দেখা দল। গৃহিণীর উৎসাহকে সে দৃঢ়ভাবে নিরস্ত করল, না না, এ কি কখনও... না-না, এ হতে পারে না যে এমন কুসংস্কারকে আমরা প্রশ্রয় দেব।

আদর্শবাদী মানুষদের চিন্তা যেন আদর্শের তাড়নাতেই দ্রুততর হয়। সর্বরঞ্জনপ্রসাদ জেলেদের প্রায় পিছন পিছন বেরিয়ে পড়েছিল। সে তাদের প্রায় সবগুলো পথ দিয়েই ছুটতে দেখল। কোথাও কি তাদের গতিরোধ হবে? হঠাৎ অনুপ্রেরণার মতোই তার মনে পড়ে গেল : এদিকে চরণই একমাত্র, অন্তত একদিক দিয়ে, আধুনিক মনের পরিচয় দিয়েছে, অন্তত বিবাহে আর পুরোহিতের অসুবিধা বলে চরণের বাড়িতে পূজা নেই। সে একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চরণের বাড়ির দিকে চলেছিল। আদর্শবাদীদের মতোই আবার পরাজয় তার প্রতীক্ষা করছিল। সে তখন চরণের বাইরের দিকের ঘরের বারান্দার কাছে। সে স্তম্ভিত হয়ে গেল। দেখল : চরণের মাথায় নতুন গামছা বাঁধা, সে খুরপি হতে বাড়ির সামনে একটা কঞ্চি-ঘেরা জায়গায় মাটি ঠিক করছে ; চরণের বউ থালা হাতে বেরিয়ে এল উলু দিতে দিতে। চরণ যে জায়গাটা খুঁড়ছিল সেখানে থালা কাত করে যা ঢেলে দিল তা যে রক্ত তা দূর থেকেই বোঝা যায় ; আর আঁশগুলোও রোদে চকচক করে উঠল ; চরণ তার ট্যাক থেকে কীসের বীজ বার করে সে মাটিতে পুঁতে দিল।

সর্বরঞ্জনপ্রসাদ গলা-খাঁকারি দিয়ে নিজের উপস্থিতি না-জানিয়ে পারল না। বনদুর্গা, চরণের স্ত্রী, দৌড়ে পালাল। চরণ মাথার গামছা খুলে তাড়াতাড়ি হাত মুছে সলজ্জভাবে বলল, 'এত সকালে যে'?

সর্বরঞ্জন নিশ্চয়ই শিক্ষিত ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ। সে তো বুঝতেই পারছে এইমাত্র যা সে দেখল, তা পৌত্তলিকতার চাইতেও অনেক পিছিয়ে থাকা—মাটি, রক্ত, বীজ নিয়ে এক ঘোরতর আদিমতা! সে কোনো কথা না-বলেই পিছন ফিরে নিজের বাড়ির দিকে চলতে শুরু করল।

চরণ একটু অবাক, এমনকী একটু লজ্জিতও হয়েছিল বটে, কিন্তু তখন তাকে একটু ভাবতেই হল। তাতেও অ্যালবেট্রস দেখা দিয়েছিল। তা বিশেষভাবেই, সকালের ব্যাপারটাকে পূর্বাপর সাজিয়ে নিয়ে ভাবতে আগ্রহ হচ্ছে তার। বনদুর্গার দাবি মেটানোর পরে।

মরেলগঞ্জ থেকে নদীর ধারে যেতে রাজনগর কিংবা ফরাসডাঙর উপর দিয়ে যেতে হয়। মাছ কিনতে গোপাল দাস নদীর ধারে যাওয়ার পথে চরণদাসের বাড়িতে এসেছিল ভোর-সকালে। চরণ শুনে বলেছিল—তোমার সুখের কমতি নেই, গোপালদা। কিন্তু 'চলো যাই' বলে সে-ও সঙ্গী হয়েছিল। বাছাই মাছ পেতে নদীর ধারই ভালো।

তারা একা একা যখন তখন তো ভাবেই, একত্র হলে ভাবনাটা বাড়া স্বাভাবিক।

চরণ বলল—এ মাসের শেষ থেকে তো আমাদের সাক্ষী দিতে শুরু হবে।

গোপাল নিস্পৃহভাবে বলল—বামুনাদিয়াড়া, শালুকডুবি, হিমায়েতপুর সেরে কাল নাকি সদরের দিকে গেল। কালেক্টরও নাকি সঙ্গে আসবে তখন এখানে।

চরণ জিজ্ঞাসা করেছিল—কিছু বুঝলে সেখানে কী হল?

—কী করে জানব? কাল বিশে চাষ দিচ্ছিল। বিশেকে তুমি চেনো না এমন নয়। তার দরখাস্ত ঠিক করতে হেডমাস্টারের একবেলা লেগেছিল। জিজ্ঞাসা করলাম ওসব জায়গার রায়তরা কমিশনে কী বলেছে, না বলেছে। বিশে লাঙল ঘুরিয়ে নিয়ে দূরে গেল যেন কানে শোনে না।

চরণ একবার গত সনেই ইলিশের কথা তুলেছিল। সেখান থেকে সরে এসে আবার বলল—বামুনদিয়াড়া, শালুকডুবি সব তো রাজার জমিদারিতেই, সেখানে তো গুড় হতো।

—হতো তো। শাবাবু আর পালবাবু পত্তনিদার। ডানকানের সঙ্গে কমিশনে নীলের চাষ করায়।

খবরটা দুজনেরই জানা, আলাপে বিষয়টাকে এনে খতিয়ে দেখল যেন।

খানিকটা গিয়ে গোপাল বলেছিল—এসব কী শুনি, চরণ, তোমাদের গ্রামে ইংরেজি মাসেই নাকি কারা সব আসবে? তারাও সব ইংরেজ নাকি?

—তুমি হাসালে গোপালদা, জঙ্গিলাট বাঙালি হবে, না মুসলমান?

নদীর ঘাটে ইলিশ তো অবশ্যই উত্তেজনার কারণ, ক্রেতা জেলে ফড়ের ভিড়। নামানো চুবড়ি-ডালাগুলো ঘিরে ক্রেতাদের ভিড়, জেলের মাথার চুবড়ি ঘাটে আসতে তাকে টেনে নামানোর চেষ্টা চলেছে, কোনো কোনো জেলে না-না করে অন্য গ্রামে যেতে ছুটছে। কিন্তু ভিড় যেন দো-মনা। অন্য কোথাও যেন আর-এক উত্তেজনার কারণ থাকতে পারে।

চরণ বলল—এবার বেশ মাছ।

গোপাল বলল—হুঁ।

দুজনে ভিড়ে গলে মাছ পছন্দ করছিল। চরণ একজোড়া পছন্দ করে কিনে ফেলল। গোপাল বলল—আর-একটি দেখি, দাঁড়াও। তারা দুজনে আর-এক ভিড়ে ঢুকল। তখন সেখানে মাছের চাইতে কলের নৌকোর কথা বেশি। গোপাল সেই গল্পবাজ জেলেকে বলল—রাখো, রাখো, মাছ দেখাও। জলে নাকি রেলগাড়ি চলে।

মাছ কেনা যখন শেষ তখন তাড়াতাড়ি ফেরা ভালো। চরণ বলেছিল—ফরাসডাঙা দিয়ে চলো, তাড়াতাড়ি হবে।

খানিকটা গিয়ে চরণ বলল—গোপালদা, চুপচাপ যে?

গোপাল বলল—অমর্ত্য আর কৃষ্ণানন্দ আউসের খোঁজ করছে, তুমি কী ভাবছ, চরণ?

—এখন ভাবিনি, কমিশনটা মিটুক।

—মিটবে? যারা কমিশনে কাগজ পাঠায়নি তারা এখন যে যা পাচ্ছে দাদন নিচ্ছে।

—নেবে তো। খাওয়ার ধান কিনতে টাকা লাগে।

—যারা দাদন পেল না, তারা কিন্তু রেগে কাঁই। আমার জমিতে কিন্তু এর আগেও আউস তেমন ফলতো না।

চরণ বলল—উল্টোপাল্টা কী বলছ, গোপালদা?

দুজনেই মাথা নিচু করে পায়ের দিকে চেয়ে হাঁটছিল। চিন্তার ভারই তো ঘাড়ে।

নদী বরাবর চলে ফরাসডাঙায় উঠতে কুতঘাট পেরোতে হয়। তারা সামনে আট-দশজন গ্রাম্যমানুষ এবং কয়েকটি উলঙ্গ বালককে জটলা করতে দেখতে পেয়েছিল। গলা বাড়িয়ে দেখতে গিয়ে জটলার মধ্যে অভূতপূর্ব পোশাকের দুজন লালমুখোকে দেখতে না দেখতে তাদের পিছনে কুতঘাটে বাঁধা সেই চোংদার কলের নৌকোকে দেখতে পেয়েছিল। এমনকী কপালের উপরে দুহাতে বারান্দা করে সেই জাহাজের গায়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অক্ষরে লেখা অ্যালবেট্রস শব্দটাকেও পড়তে পেরেছিল চরণ।

কিন্তু সেই লালমুখোরাও তাদের দেখতে পেয়েছিল। তাদের পোশাক জটলার লোকদের চাইতে কিছু উন্নত হওয়াতেই বোধ হয় লালমুখোদের একটা বলল—হে, ব্ল্যাকি! ডু ই নো দা ওয়ে টু প্ল্যানটেশন।

ইংরেজি-পড়া চরণ থমকে দাঁড়াল। কিছু একটা তাকে আঘাত করেছে এই রকম অনুভূতির সঙ্গে তার রাগ চড়চড় করে উঠছিল : ইউ ব্লাডি সোয়াইন, ইউ ফিলদি শ্বেতী, এ-রকম সব কথা তার মনে আসছিল।

কিন্তু সে দাঁড়াল না, গোপালের হাত টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে শুরু করল। জাহাজি গোরা দুটো হেই, ইউ দেয়ার, ইউ—এমন সব চিৎকার করতে লাগল।

বেশ খানিকটা চলে এসে গোপাল জিজ্ঞাসা করল—পালিয়ে এলে যেন, কী কইছিল? ধমকালো যেন তোমাকে?

চরণ বলল—ডানকানের কাছে যেতে চায়। তা পথ খুঁজে নিক না।

গোপাল বলল—ওরা তো ওই কলের জাহাজ থেকেই, নয় কি? ঘাটে তো নৌকোও ছিল, বিলিতি মনে হল যেন।

আরো খানিকটা চলে গোপাল বলেছিল—এই এরা, আবার জঙ্গিলাট, আবার কমিশনের তারা—সবাই কিন্তু এক জাত।

চরণ ভাবছিল। তখন গোপাল বলল—মুশকিল এই, চরণ, তোমার জমির অনেকটা মরেলগঞ্জে কিন্তু বাড়িটা রাজনগরে, ডানকানের এলাকায় নয়।

—এ কথা যে?

—ভাবছি।

তারা তখন সেখানে এসেছে যেখানে পথটার এক-শাখা মরেলগঞ্জে, অন্যটি রাজনগরের দিকে গিয়েছে। চরণ একটু দাঁড়াল, বলল—গোপালদা, সকলকেই কিন্তু সাক্ষী দিতে একইসঙ্গে যেতে হবে। পরের পর সাক্ষী দিয়ে যাব। প্রথমে আমরা দিলে আর সকলে জোর পাবে। হেডমাস্টারমশায়ের কাছে আবার বসতে হয় কিন্তু।

চরণ অনেকক্ষণ ধরে কথাগুলোকে মনের মধ্যে তোলাপাড়া করল। তার একটা খটকা লাগছে মনে।

গোপালদা কী বলতে চাইছে? শেষে সে ভাবল এখন আট-দশ দিন, দেখা যাক।

সর্বরঞ্জনপ্রসাদ অবশ্যই সেদিন অ্যালবেট্রসের কথা শোনেনি। সে-ও নিতান্ত ভারাক্রান্ত মনে নিজের বাসার দিকে ফিরে চলেছিল। গঞ্জের উপর দিয়ে তাড়াতাড়ি হবে। তা করতে গিয়ে সে ভুলে গেল, দুদিন আগেই প্রতিজ্ঞা করেছিল এ পথটাকে সে ভবিষ্যতে বর্জন করবে। পরপর কয়েকটি কুমোরদের চালা। সেখানে কুমোরেরা পট ও প্রতিমা তৈরি করছিল। বয়স্ক পুরুষ, নারী, বালক, বালিকা সকলেই কাজ করছে। বালকদের মধ্যে তার পরিচিত ছাত্ররাও কয়েকটি। অবাকই লাগে দেখতে, সাদা সরার উপরে কী অবলীলায় তুলি টানছে সেই বালকেরা এবং স্ত্রীলোকেরা। কিন্তু সেখানে কোনো ভদ্রব্যক্তিরই থাকা চলে? অধোবদনে পালাতে হয় না? কী এত অভূতপূর্ব নির্লজ্জতায় সেই কুমোরেরা নারীদেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তৈরি করছে। নিতম্বের বর্তুলতা এবং মসৃণতা, স্তনের বর্তুলতা এবং তারও মসৃণতা, এমনকী পা দুটির সন্নিহিত ভাঁজ। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে পালিয়েছিল সর্বরঞ্জন। তাড়াতাড়ির মাথায় এখন সেখানেই এসে পড়ে বিপদ থেকে বাঁচার জন্য চোখ তুলতেই সে দেখতে পেল, তেমনি বড় বড় দুটো প্রতিমাকে শাড়ি পরানোর তোড়জোড় চলেছে।

হতাশ, বিপন্ন, দুঃখার্ত সর্বরঞ্জন কী ভাববে তাই ভেবে পেল না। একবার তার মনে হল, এই গ্রামে এমনই সব ঘটবে। কী ভয়ঙ্কর এই এক আদিম অন্ধকার।

কিন্তু সত্যকে স্বীকার না-করে উপায় নেই। প্রকৃতপক্ষে সেদিনটা তো ভালোই ছিল। সকাল দশটাতেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। গম্ভীর সর্বরঞ্জন হেসে ফেলল। এমনকী কথা বলার ছন্দে গোলমাল হয়ে গেল। সে বলল—দেখে যাও, দেখে যাও, দিদির চিঠি।

ব্রহ্ম-ঠাকরুনের চিঠি। সে লিখেছিল গুণাঢ্যমশায়ের কন্যাকে রানীমা পছন্দ করেছেন।

২

অ্যালবেট্রসে জঙ্গিলাটের আসার সংবাদ হরদয়ালকে অবশ্য নিশ্চিন্ত করেছিল। জঙ্গিলাট, তাঁর পরিবারের মহিলারা। তাঁর দেহরক্ষীর দল, তাঁর অফিসাররা। তাদের জন্য তাঁবু ইত্যাদি, তাদের প্রভিশন, এসব নৌকো, পান্‌সি, বোট আনা সহজ ছিল না। এখন তো এই একটা জাহাজে সবই ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। এমনকী কয়েকটা ঘোড়াও আসবে সঙ্গে। এ বুদ্ধিটা সিম্পসন সানিয়াল কম্পানি ভালোই করেছে।

কিন্তু তখন আসল সংবাদ তো রাজকুমারের ফিরে আসা।

সেই সকালে কুয়াশার গায়ে রোদ খেলা করছে তখন। কেট তাদের কুঠির সেই কিচেন গার্ডেন থেকে ভাসের জন্য ফুল সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। সে জানত না, সহিস মূলা লাগিয়েছিল। সহিস কেটের কাঁচি চেয়ে নিয়ে মূলার কচিপাতা সংগ্রহ করে দিচ্ছিল। কিছু দূর থেকে তাদের চেনা যায় না কুয়াশায়। কিন্তু কেট সম্ভবত শাকের ব্যাপারে খুব বেশি মনোযোগ দিয়েছিল, নতুবা কুয়াশার ওপারের খুরের শব্দ, চামড়ার শ্যাড্‌লের মৃদু ক্যাঁচকোঁচ শব্দ কানে আসত। সেজন্যই সে চমকে উঠল যখন সে অনুভব করল একটা ঘোড়া ঠিক তাদের কাঁধের উপরে নাক ঝাড়ল। অনুভূতিটা ঠিক নয়। সে দেখতে পেল ফেনসিং-এর ধারে লাগানো স্থলপদ্ম ঝোপটার লম্বা লম্বা ডালের মধ্যে দিয়ে ঘোড়া আর তার সওয়ারকে অস্পষ্টভাবে হলেও দেখা যাচ্ছে। এক মুহূর্ত ভয়ে ভয়ে কাটিয়েই সে চিনতে পারল। আর তখন দৌড়ে স্থলপদ্মটার গোড়ায় গিয়ে সম্ভাষণ করল, 'রাজকুমার'!

রাজকুমার বলল, 'আমি ভাবছিলাম, কেট, শীত পড়েছে, একটু কফি খেলে হয়, কিন্তু তুমি তো গৃহকাজে বাঁধা'।

কেট হেসে বলল, 'আ, ডারলিং, খুব হয়েছে। আসুন'।

বাড়িটাকে ঘুরে আসতে রাজকুমারের যে সময় লাগে তার মধ্যে কুঠিতে ফিরে, হাত পা, জামা, চুল থেকে শিশির ও ভেজা-কুটো সরিয়ে, বাগচীর ঘুম ভাঙিয়ে, রান্নাঘরে কফির জল চাপিয়ে, বাইরের দরজা খুলে দেওয়ার সময় করে নিতে কেটকে তো পরিশ্রম করতেই হল। ফলে সে যখন পার্লারে রাজকুমারকে ডেকে আনছে, তার বুক মৃদু ওঠাপড়া করছে, গাল দুটো লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্লারের জানলাগুলো খোলা যায়নি, ফলে সেখানে অন্ধকার ; কুশনগুলো অগোছালো, পর্দাগুলো বিপর্যস্ত। কেট রাজকুমারের দৃষ্টি আকর্ষণ না-করে সেসব দিকে ঝুঁকতেই রাজচন্দ্র বলল, 'অন্ধকার থাক, তুমি কফি আনো।

বাগচী ঘুম ভেঙে রাজকুমারের কথা শুনে ততটা বিস্মিত হল না, যতটা হল সে এই সকালেই তার কুঠিতে এসেছে শুনে। কাল দুপুরে সে রাজবাড়িতে গিয়েছিল। জানুয়ারি থেকেই সে যাচ্ছে, কারণ নতুন চাকরিটা তো সে গ্রহণ করেছেই। আর রাজবাড়ি সম্বন্ধে যদি জানতে চাও তবে নায়েবমশায়ের চেম্বারেই তো সংবাদ। সেখানেই সে কাল শুনেছিল : ছিপ ফিরেছে, রাজকুমারের বোট সুতরাং বিকেলের পরপরই কুতঘাটে ভিড়বে। নায়েবমশায় আলোচনা থামিয়ে তখনই ঘাটে যানবাহন রাখার বন্দোবস্ত করতে উঠে পড়েছিল।

আলোচনাটা আর বিশেষ কী? বাগচীর মনে হয়েছিল কমিশনের ব্যাপারে সে যেটুকু করেছে, তাতে মরেলগঞ্জের সঙ্গে অসদ্ভাব ঘটার সম্ভাবনা। এখন তো সে রাজবাড়ির সঙ্গে জড়িতই। তাই অসদ্ভাবটায় রাজবাড়িও জড়িযে না পড়ে। আগে থেকে নায়েবমশাইকে জানিয়ে রাখা ভালো। সুতরাং সে কমিশনের কাছে দরখাস্ত নালিশ লিখে দেওয়ার কথা বলেছিল নায়েবকে। নাযেবমশায় শুনে বলল, আমার মনে হয় এসব ব্যাপারে রাযমশায় ভালো বুঝবেন। আমার খবর এই, যারা দরখাস্ত পেশ করেছিল চরণ তাদেব খুব বোঝাচ্ছে, কিন্তু অনেকেই সাক্ষী দিতে চাচ্ছে না। দোযও দেওযা যায় না। ডানকান জনাত্রিশেক রাযতকে তৈবি করেছে যারা ডানকানেব প্রশংসা করে সাক্ষী দেবে।

প্রকৃতপক্ষে বাগচীর ঘুম তো আগেই ভেঙেছিল, সে শুযে থেকে এসবই ভাবছিল। সে অবাক হয়ে যাচ্ছিল, আশ্চর্য, এদিকটা সে ভেবে দেখেনি। নায়েবমশায না-বললে সে আশঙ্কাই কবত না।

রাজকুমার এসেছেন শুনে সে উঠে বসল। কোনোরকমে প্রস্তুত হযে সে বসবার ঘরে পৌঁছে দেখল, সেই প্রায়ান্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে কেট রাজকুমারের সঙ্গে গল্প করছে।

রাজকুমারের মুখে খুশি চকচক করছে।

বাগচী বলল, 'ঘর অন্ধকাব তো। জানলা খুললে বোদ আসতে পারে'।

রাজচন্দ্র বলল, 'থাক মশায। গেঁয়োমানুষ গাঁয়ে ফিবেছি। এবার যাও, কেট, শিগ্‌গির তিন কাপ কফি। ওসব জানলা দবজা খোলা-টোলা কাল থেকেই হৈ চৈ ধুন্ধুমার করে রাজবাড়িতে হচ্ছে না মনে করো? জানো, কেট, এখানে তোমার বাড়িটা যেমন এক পালানোর জায়গা তেমন কলকাতায় ছিল না'।

কেট কফি করতে গেলে বাগচী জিজ্ঞাসা করল, 'ভালো ছিলেন কলকাতায়? ভালোই দেখাচ্ছে আপনাকে'।

'আ ছিলাম'। রাজচন্দ্র নিজেই একটা জানলা খুলে দিল। খানিকটা কোমল রোদ এসে পড়ল। তার মধ্যে বসে সে আবার বলল, 'বোধ হয় কানে কিছু কম শুনছি, আর হজমটা কেমন হচ্ছে ঠিক ঠাহর করতে পারছি না'।

বাগচী কি অভ্যাসের ফলে চিকিৎসার কথা ভাবতে গেল?

রাজচন্দ্র বলল, 'মানুষ অত শব্দ করে কেন, বলুন তো? খেতে বসেও অত কথা! তা মশায়, ওটা আপনার অন্যায়—ওই লোকগুলোর কথা আমাকে আগে থাকতে না 'বলে দেওয়া'।

'কাদের কথা বলছেন, রাজকুমার'?

'কেন, দিনকর রাও, সালর জং, জং বাহাদুর রাণা'।

'এরা'?

'আমি কি জানতাম, এঁরা কত আধুনিক, কত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন'?

কেট এল কফি নিয়ে। রাজচন্দ্র 'বাঁচালে' বলে কফি টেনে নিল।

এই সময়ে কেট লক্ষ্য করল রাজচন্দ্রের গায়ের পুলোভারের ডিজাইনটা উল্টো উল্টো লাগছে। আরো একটু ভালো করে দেখতে গিয়ে সে বুঝল সেটা উল্টো করে পরা হয়েছে। রাজচন্দ্রও বুঝল সে কিছু ভুল করেছে, অনুমান করল তা পোশাকেই। বলল, 'ও, কেট, কফিটুকু খেতে দাও, তুমিও দেখছি হৈমবতী'।

কেট নিজের সঙ্কোচ কাটাতে তাড়াতাড়ি বলল, 'হৈমবতী কী'?

'কী না, কে। তোমার মতোই, আর তারও আছে একজনের পোশাকের দিকে এমন ট্যারচা করে চাইবার অভ্যাস'।

'কে হৈমবতী, রাজকুমার'? কেট এই বলে অনুমান করতে চেষ্টা করল, রাজবাড়িতে এই নামের কোনো মহিলা কি এসেছেন?

রাজকুমারের পোশাকের উপরে এমন দৃষ্টি নয়নতারা ছাড়া আর কার হতে পারে?

রাজচন্দ্র বলল, 'তুমি হৈমীকে দ্যাখোনি বুঝি? তোমার মতোই বরফে তৈরি, চোখ দুটোতে তোমার যেমন সোনার ভাব, তার তেমন নীলের। তা, তোমার মতোই সুন্দরী বলা যায়'।

কেট একটু রঙ্গভরে বলল, 'কিন্তু নয়নঠাকরুনের চাইতে...

রাজচন্দ্র বলস, 'তিনি কি আছেন গ্রামে'?

কফি শেষ করে রাজচন্দ্র উঠল। হেসে বলল, 'আর একদিন আসব কেট। নতুন কয়েকটা স্কোরশীট এনেছি। ভালো কথা, তুমি কি জানতে, কেট, প্রকৃতপক্ষে লাট তিনজনা? জঙ্গিলাটের এক শ্যালি আছেন, তাঁরও পিয়ানোর বাতিক। আমি তাঁকে তোমার কথা বললাম। যদি আসেন এখানে তখন দেখব বাগচী মাস্টারমশায়ের পোশাক নিয়ে কী হেনস্তা করো তুমি'!

বাগচী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তাঁরা কি এই গ্রামে আসবেন'?

রাজচন্দ্র এই বিস্ময়ের সুযোগে দরজার কাছাকাছি চলে গিয়েছিল, সেখানে দাঁড়িয়ে হেসে বলল, 'আমাদের হরদয়াল পারেও বটে। ভাগ্যে আমাদের খানিকটা জঙ্গল আছে আর তাতে বাঘ, চিতা, হরিণ, মোষ এসব থাকতে পারে'।

তারা অবশ্যই দরজা পর্যন্ত এমনকী কুঠির গেট পর্যন্ত এগিয়ে গেল। ঘোড়াটা ল্যাজ নেড়ে দুলকি চালে চলতে আরম্ভ করলে বাগচী বলল, 'একটা হাওয়ার মতো, নয়'?

৩

তখন জঙ্গিলাটের সপারিষদ সপরিবার রাজনগরে ক্যাম্প করা, শিকার করা ইত্যাদির সংবাদে আর সংশয় নেই। ব্রজ, নরেশ আরো কিছু সংবাদ এনেছে। হৈমীও তো তাদের সঙ্গেই পরে এসেছে, তার কাছেও কিছু সংবাদ থাকবে। রাজকুমার, হৈমী, ব্রজ ইত্যাদির গ্রামে ফেরার দিন চারেক পরে রানী হরদয়ালকে ডেকে পাঠালেন। হরদয়াল অনুমান করল রানী অবশ্যই জঙ্গিলাটের ক্যাম্প সম্বন্ধেই বলতে চান।

হরদয়ালের কিছু দেরি হল দরবারে যেতে। কারণ তখনই বাগচী এসে বসেছিল। সে ইন্ডিগো কমিশন সম্বন্ধে কিছু বলতে চায়। সে তো ইতিমধ্যে চরণের সঙ্গে আলাপ করেছে। নায়েবমশায়ের কাছে যা সে শুনেছিল তা চরণকে বলে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'রোজ দেখা হচ্ছে, এসব তো বলোনি'? দারুণ লজ্জায়

চরণের মুখের চেহারা বদলে গিয়েছিল, একবার তো মনে হল সে ফোঁপাচ্ছে। অবশেষে বলেছিল, 'এ রকমই আমরা। গোপালদারই তো সবচাইতে শক্তি, সে এখন বলছে, ভাবছি। তার পাড়ার যারা দরখাস্ত করেছে তাদের অন্তত পনেরোজনকে অনুরোধ করেছি। মুখ ঘুরিয়ে থাকে, যেন চেনে না'। বাগচী হরদয়ালকে সমস্যার কথাই বলল। হরদয়াল মিনিট পাঁচ-সাত চুপ করে থেকে বলল, 'আপনাকে এখনই হতাশ হতে বলি না ; কিন্তু কুমিরের সঙ্গে জলে থেকে বিবাদ না-করার প্রবাদটা কত দিনের ভেবে দেখুন।

বাগচী বলল, 'আমি ভাবছি কমিশন চলে যাওয়ার পরে কী হয়'।

এই সূত্রেই বড় ইংরেজ এবং ছোট ইংরেজের আলাপ উঠবে এমন হল। তারা দুজনেই ক্লাইভ ইম্পের কথা জানত, বার্ক শেরিডানের কথাও। বার্ক শেরিডানের বক্তৃতা তো গ্রন্থাকারেই হরদয়ালের লাইব্রেরিতে। তারা জানত অস্ট্রেলিয়া আফ্রিকায় যারা আদিবাসীদের গুলি কবা আর পশু শিকার করা একই মনে করে, এবং সে রকম গুলি করে এসে লাঞ্চ বা ডিনারে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে, স্ত্রীদের সঙ্গে, হাসি তামাসা প্রণয় করে, বাইবেল পড়ে, যারা ধর্মের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমেরিকা গিয়ে সেখানকার রেড ইন্ডিয়ানদের নির্মূল করে নিজেদের মহাবীর মনে করেছিল, যারা পশ্চিম আফ্রিকা থেকে জাহাজের খোলে ভরে ক্রীতদাস চালান দেয়, আর যারা সেখানে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করে, তারা একই ইংরেজ জাতি। সে জাতে হিগিন-বোথামের মতো দাস-ব্যবসায়ী এবং উইলবারফোর্সের মতো ক্রীতদাস-মুক্তির আন্দোলনে সমর্পিত-প্রাণ মানুষ আছে, নীলকর ডানকান আছে, আর্চি হিল আছে, উইলিয়াম জোন্স, হেয়ার, বীটন আছে। তারা সুতরাং এদিকে আলোচনায় গেল না।

হরদয়াল হেসে বলল, 'আপনি কি মনে করেন, মিস্টার বাগচী, আর্মি কমিশনে ইংল্যান্ডের রাজকীয় অফিসারদের কেউ-কেউ মিথ্যা সাক্ষী দেবে না? চাইল্ড লেবার কমিশনের ফলে ওদেশেব শিশুদের মিলের কয়েদখানায় কিংবা খনির মৃত্যু ফাঁদে যাওয়া বন্ধ হবে? ডানকানেরা যে ভালো না-ও হতে পারে এ রকম প্রশ্ন তো স্বীকৃত হচ্ছে। হয়তো চরণদাসের মতো কেউ কেউ সাক্ষী দেবে'।

হরদয়াল রাজবাড়িতে গিয়ে শুনল, রানী খানিকক্ষণ আগে নিচেব বসবার ঘর থেকে উঠে গিয়েছেন। কিন্তু সেই দাসীই বলল, 'আপনাকে বলতে বলেছেন, এখন সম্ভবত উপবের বসবাব ঘরে থাকবেন। দোতলায় পৌঁছেও হরদয়ালকে কিছুক্ষণ বসবার ঘরেব অ্যান্টিচেম্বাবে অপেক্ষা করতে হল। সে শুনতে পেলো রানী কাদের সঙ্গে কথা বলছেন। আলাপের বিষয়গুলো অনেকটাই তার কানে আসতে লাগল। তা অবশ্যই এমন নয় যে কোনো দিক দিয়েই তাকে সঙ্কুচিত হতে হবে।

রানীর ঘরে তখন নয়নতারা আর হৈমী। নয়নতারা বোধ হয় তাঁকে কিছু পড়ে শোনাচ্ছিল।

হরদয়াল এসেছেন—দাসী এই খবর দিলে নয়নতারা পুঁথিটাকে পাটায় জড়িয়ে বাঁধল। কিন্তু হাসতে-হাসতে বলল, 'রানীমা, পৌত্রকে রাজা করতে হলে ভীমার্জুনের বয়স তখন কম করেও ষাট-সত্তরে দাঁড়ায় ; কৃষ্ণ তাদের সখা, তারও সে-রকমই বয়স হবে। ষাট-সত্তরে কি আর গাণ্ডীব টানা যায়, না সুদর্শন তোলা যায়? বেচারীরা'!

হৈমী বলল, 'কৃষ্ণেরও মহাপ্রস্থানে যাওয়া ভালো ছিল, তাহলে ব্যাধের হাতে প্রাণ দিতে হতো না। তখন কী অবস্থা দেশের! একদিকে ডাকাত অন্যদিকে ব্যাধ, তাদের হাতে ক্ষত্রিয়রা যদুবীরেরা মার খাচ্ছে। তাদের স্ত্রীদের কেড়ে নিচ্ছে। এখনকার ভীলদের পূর্বপুরুষ হতে পারে। বোধ হয় পরীক্ষিত বাদশার বাদশাহীও ছিল দিল্লি সে পালাম তক'।

রানী খিলখিল করে হেসে উঠলেন—বললেন, 'খুব হয়েছে। হৈমী, তাহলে কলকাতায় এ রকম আলোচনাও তুমি শুনেছ? কৃষ্ণ ঐতিহাসিক মানুষ একজন, বিষ্ণু নন? তোমরা আমাকে ব্রাহ্ম না-করে ছাড়বে না দেখছি'।

নয়নতারা বলল, 'আমাদের শিরোমণিমশায়...

'তাঁর আবার কী'?

'এক গল্প ছড়াচ্ছে আবার। আমাদের রাজবাড়ির পুরোহিতমশায় সেদিন বলছিলেন। শিরোমণিমশায় নাকি তাঁকে কী কথায় ধমকে দিয়েছেন, তুই তো বাপু ব্রাহ্মই। রোজই তো যা ভেবেছিস, বলেছিস, করেছিস, স্বপ্ন দেখিস সব'ই তো ব্রহ্মাকে সমর্পণ করিস।

রানী হেসে বললেন, 'সেকেলে ব্রাহ্মণদের রসিকতার তল নেই। হৈমী, এবার বাপু তুমি ওঠো। রাজুকে দেখছিলাম ময়লা পায়জামা আচকান পরতে। তুমি বাপু, কলকাতায় ওর পোশাক ভালো রাখতে, এখানেও তেমনি রাখো। ওর ঘরের আলমারিটা আজ খুলো। কে যেন বলছিল ঘোড়ায় চড়ার, শিকারে যাওয়ার, এমনকী নাকি ঘোড়ায় চড়ে শোর মারারও আলাদা-আলাদা পোশাক দরকার হয়। তা কি আছে ওর? না হয় কাউকে দিয়ে খালেক ওস্তাগরকে খবর দিও'।

হৈমী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সিমসন তো রাজকুমারের দলের সঙ্গে অনেক কাপড়-চোপড় দিয়ে গ্রাহামকে পাঠিয়েছে। সেই আর্মির টেলার। রাজকুমারের পোশাক বানাতে শুরুও করেছে'।

'দ্যাখো', রানী হেসে বললেন, 'হরদয়ালের কী রকম সবদিকে দৃষ্টি। জানো, নয়ন, এবার কলকাতায় অনেক নতুন ব্যাপার হয়েছে, তাই না, হৈমী? আমাদের রাজু এবার পীরালি হতে পেরেছে। হরদয়ালের বাবুর্চি সোলটান আর পিয়েত্রোর বাবুর্চি বন্দার রান্নাই খুব খেয়েছে। শোর-টোর কীসব খেয়ে থাকবে'।

নয়নতারা বলল, 'অ্যা, মাগো'!

হৈমী বলল, 'না, রানীমা, শোর একদিনও ছিল না'।

বানী বললেন, 'তবে যে সেই মেয়েটি, আমাদের হরদয়ালের বন্ধুপত্নী বলল, মহাভারতেই আছে— অর্জুন তো বটেই, এমনকী যাকে নিরামিষাশী বলে চালাচ্ছ সেই শিবঠাকুরও দারুণ শোরভক্ত ছিলেন। তাই মরা শোর নিয়ে নাকি যুদ্ধ, নাকি এক কাব্যও আছে'।

নয়নতারা হেসে বলল, 'দেখলেন, ওরা কলকাতায় এখন ইংরেজদের মতো বুদ্ধিমান হয়েছে, কাব্যের মানে কবতে আটকায় না আর'।

বানী আবার বললেন, 'জানে আবার না? আমাকে সেই ভাদুড়ীবউই বলেছিল "সঙোসকিতো" নামে নাকি এক ভাষা আছে, আর তাতে নাকি গোগ্নো বলে এক শব্দও আছে, যাতে প্রমাণ মুনি-ঋষিরা আকছার ভগবতী খেতেন আর তাতেই পোষ্টাই'।

নয়নতারা খিলখিল করে হেসে বলল, 'এবার আমাদের রানীমা বেশ জ্ঞান নিয়ে ফিরেছেন। ভাগ্যে তিনি বলেননি ভগবতী খাওয়া ছেড়েই হিন্দুরা যুদ্ধে হেরেছে বারবার'।

হৈমী বলল, 'কিন্তু রানীমা, দুবার তো ভোজ হয়েছে, দুবারই কিন্তু হরিণ, তিতির আর হাঁস শিকার করেছিলেন রাজকুমার। কলকাতার কাছেই তো জঙ্গল। হরিণ খেতে-খেতেই তো এখানকার জঙ্গলে হরিণ আব নদীতে চখা শিকারের কথা উঠল জঙ্গিলাটের'।

রানী বললেন, 'দ্যাখো আমাদের হরদয়ালকে; দরকারে সে কেমন হরিণসমেত জঙ্গল যোগাড় করতে পারে। কিন্তু হৈমী, তোমাকে যেজন্য ডেকেছি তাই জিজ্ঞাসা করা হয়নি। তুমি কি জঙ্গিলাটের স্ত্রী আর শ্যালিকে হার দুটো দিয়ে আসতে পেরেছিলে, তাদের হাতেই? রাজু কি সঙ্গে গিয়েছিল? হার পছন্দ হয়েছে তো'?

হৈমী বলল, 'ভেবেছিলাম একই প্রায় দেখতে, স্ত্রী আর শ্যালিতে গোল না বাধে। কিন্তু রানীমা, ওদের অত দামি না-দিলেও হতো'।

রানী হেসে বললেন, 'পাগল কোথাকার! লক্ষ্য করোনি ওটা একটা পুরনো সাত নহর ভেঙে তার পাঁচ নহরে দুটো বানিয়ে ওদের দেওয়া হয়েছে। আর গোল হওয়ার কথাও নয়, একটা তিন নহর, অন্যটা দু নহর ছিল'।

'কিন্তু মুক্তো তো'? হৈমী বলল।

'এই দ্যাখো, তাছাড়া আমি কি দিতে পারতাম? ভালো কথা মনে করেছ। স্যাকরাকে আজই ডাকিও তো। কলকাতায় সেই হার দুটিকে গড়াতে দেব ভেবেছিলাম। বাকি দু নহরে দুটো বানাতে দিও। তোমার কাছেই তো আছে। বাগচী মাস্টারমশায়ের স্ত্রী তো এখন প্রাইভেট সেক্রেটারির স্ত্রী হয়ে জঙ্গিলাটের পরিবার এলে মিশবে-টিশবে। তার কী আছে আমি জানি না। আমার পক্ষ হয়ে তাকে দিও একটা। আর দ্যাখো বাপু, তুমি তো সব সাদাই পরো। অন্যটাকে তুমি সবসময়ে পরবার জন্য না হয় বানিয়ে নিলে। একেবারে গলা খালি রাখো'!

নয়নতারা উঠে বলল, 'আপনি কি এখন স্নানে যাবেন'?

রানী বললেন, 'তোমরা এসো। হরদয়াল ও-ঘরে অপেক্ষা করছে, তাব সঙ্গে কথা বলে নিই। কাউকে বলে দিও হরদয়ালকে আসতে বলে দিতে'।

রানী এখন দেখা করবেন দাসীর মুখে জেনে হরদযাল রানীর বসবার ঘরে গেল। এ অঞ্চলটা তো সবসময়েই স্নিগ্ধভাবে নিঃশব্দ, ফলে এ ঘরেব আলাপ অ্যান্টিচেম্বারে স্পষ্টই শোনা যায়। কথাগুলো হরদয়ালের মুখে একটা স্মিত হাসি হয়ে রইল। সে এই ভাবতে-ভাবতে ঢুকল, মুক্তোর নহরের সংখ্যায় কি যারা পরবে তাদের স্তরভেদ হয়?

ততক্ষণে রানী কথা বলতে শুরু করেছেন। সুরেনকে ডেকেছিলাম। লাটের কথা বলতেই হকচকিয়ে গেল। বলল, 'যত লোকই লাগানো হোক এই শীত ঋতুতেই কি তেমন একটা করা যাবে'?

'তা তো নয়ই', হরদয়াল বলল। 'সেজন্যই কি এখন সে নরেশকে সঙ্গে নিয়ে পিয়েত্রোর বাংলোব দিকে গেল'?

'সেটাকে কিছু করা যায় কিনা তাই বোধ হয় ভাবছে। বোধ হয় ফিবে এসে তোমাকে জানানোর মতলব'।

হরদয়াল বলল, 'এখন কিছু নতুন করে করার সময় পাওযা যাচ্ছে না। এ রকম একটা আন্দাজ করছি, লাট আর তাঁর পরিবারের যে দু-তিনজন তাঁরা আপনাব দেওয়ানকুঠিতে থাকতে পারবেন। আমার অভিজ্ঞতায় তা যে-কোনো শহরের সার্কিট-হাউস বা কালেক্টব-বাংলোর নিচু নয়। তাঁর সঙ্গী অন্য জনাদশেক অফিসার অনায়াসে পিয়েত্রোর বাংলোয় থাকতে পারবে। দেহরক্ষী টমিরা অবশ্য লাটের কাছাকাছি থাকতে চাইবে। তাদের জন্য দেওয়ানকুঠির লনে ছোলদারি টেন্ট খাটানো যেতে পারবে। সিমসন সেই রকম উদ্যোগ করছে। তবে তোশাখানা থেকে কিছু গালিচা বার করতে হতে পাবে। আপনার এ ব্যবস্থা পছন্দ হলে টমিদের ছোলদারি আর দেওয়ানকুঠি ঘিরে ফুট ছয়েক উঁচু ফেনসিং-এ রাজবাড়ি থেকে তাকে আলাদা করে দেওয়ার কথাও ভাবছি। আমি কি এ ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চিন্ত থাকতে অনুরোধ করব'?

রানী বললেন, 'তা যদি বলো তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু, 'রানী হাসলেন। হরদয়াল বলল, 'সিমসন সানিয়াল দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ থেকে কমিসারিয়টের কাজ করছে। সে সময়ে তো শুধু খাদ্য নয়, ঘোড়া, তাঁবু সবই জাহাজে গুছিয়ে নেওয়ার অভ্যাস করেছিল। এদিকে পাটনা থেকে মীরাট পর্যন্ত যে ইংরেজ সৈন্যদল ছিল তাদের খাদ্য, তাঁবু, ঘোড়া এসবের যোগান দিয়েছে। এবার সেই সিমসনই ঘোড়া, তাঁবু, প্রভিশন ইত্যাদি পাঠাবে'।

রানী খানিকটা ভাবলেন। ঈষৎ হেসে বললেন, 'এই সানিয়ালদের একজনই তো গুণাঢ্য লিখছে পদবি। তার কন্যা সম্বন্ধে তুমি আর কী ভাবলে'?

হরদয়াল একটু ইতস্তত করে বলল, 'এরকম প্রচার ছিল কনে বছর পনেরোর হয়েছে...

রানী বললেন, 'ঠিক নয়। তোমার বন্ধুর স্ত্রী আমাকে বলেছেন বছর তেরো হল। ওদের সমাজে আজকাল কম বয়সের মেয়ের বিবাহ নিন্দার, সেজন্য ঘটকী বয়স বাড়িয়ে থাকবে'।

হরদয়াল নিজের করতলের দিকে মুখ রেখে বলল, 'সেজন্যই বলছিলাম...

রানী বললেন, 'খোঁজ নিয়েছিলে, সংযুক্ত প্রদেশে গুণাঢ্য সত্যিই জমিদারি কিনেছে কিনা'?

'হ্যাঁ, দু লাখের মতো হবে। কিন্তু একটা কথা এই, গুণাঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু ইদানীং ব্রাহ্ম, এবং উপবীত ত্যাগ করার কথাও ভাবছেন'।

রানী বললেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখেছ ওটা সত্য কিনা যে গুণাঢ্য-কন্যা বিলিতি মেমের কাছে লেখাপড়া শিখেছে, দরকারে ইংরেজিতে কথা বলে কিনা'?

'এটাও সত্য'।

'উপবীতের কথা ভাবছ? রানী হাসলেন, একটু দ্বিধা করলেন, বললেন পরে, 'তুমি কি জানো না, তোতাপুরী এরকম পরিচয় দিয়েছিল নিজের? লোটা, চিমটে, হরিণ-চামড়া সম্বল। নাগাই বলতে পারো একরকম। গত বর্ষায় শিরোমণি তাকে মন্দিরের পিছনে শালবাগান দেখিয়ে দিয়েছিল। রাজবাড়ি থেকে ধুনির কাঠ আর সিধে দেওয়া হতো। তার কিন্তু শিখা উপবীত ছিল না। সাকার পূজাকে ব্যর্থ পুতুলপূজা বলত'।

হরদয়াল অবাক হল। সে ভাবল, কে এই তোতাপুরী যে একসময়ে এসে রাজবাড়ির সীমার মধ্যে মন্দিরের পিছনে শালবাগানে আশ্রয় পেয়েছিল? সেটা কৌতূহলের নয়, সে যে তেমন আশ্রয় পেয়েছিল সেটাই কি আবার তাকে অবাক করে দেবে? সে কিন্তু এত কাছে থেকেও এই বহিরাগতের তেমন রাজবাড়ির সীমার মধ্যে আশ্রয় পাওয়ার বিষয়ে কিছু জানতে পারেনি! এটা কি তেমন আর একটা বিষয় যা প্রমাণ করে রানী কাছারির এতগুলো সতর্ক দৃষ্টির ভিতরেও, যে-কোনো সময়েই অভাবনীয় কিছু ঘটাতে পারেন!

হরদয়ালের এই অনুভূতি যখন তার অভিমানকে মৃদু আলোড়িত করছে, সে শুনতে পেলো রানী বলছেন, 'তাকেও তুমি উপবীত-ত্যাগী ব্রাহ্ম বলতে পারো, যদিও সে আকাশ-মন্দির'।

হরদয়াল বলল, 'আপনি আদেশ কবলে এ বিবাহ হবে'।

রানী বললেন, 'তাছাড়া আমি শুনেছি কনেকে তাদের বাড়িতে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রাজকুমার কেমন? তাতে সে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে নাকি বলেছে, খুব ভালো। ওদিকে কিন্তু যতগুলি দেখলাম এইটিই সুন্দরী হয়ে উঠবে মনে হয়'।

রানীমার সামনে এসব বিষয়ে আলোচনা হয় না। হরদয়াল মুখ নিচু করে শুনল।

রানী আবার বললেন, 'এখনই ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। সুরেন তোমার কাছে যাবে। সে তো বলছে রাজকুমারের বিয়ের উপযুক্ত করে আমাদেব গ্রামকে সাজাতে কয়েক লাখ ইট লাগবে। আর অঘ্রান মাসের আগে তা হয়ে উঠবে না। (রানী হাসলেন)। এক বছরেরই ধাক্কা। ও পক্ষকেও তো প্রস্তুত হতে সময় দিতে হবে'!

রানী স্নানের জন্য উঠলেন।

হরদয়াল তার কুঠিতে ফিরল। কমিসারিয়টের কনট্রাকটররা অবশ্যই জানে লাটের এরকম ক্যাম্পে কী কী লাগে। তাছাড়া তারা অবশ্যই লাটের দপ্তরে যোগাযোগ রেখে চলেছে। লাটের অসুবিধা হলে তারাও কি অসন্তোষ থেকে রেহাই পায়? ব্রজনাথ ইতিমধ্যে ঝাড়, দেয়ালগিরি, লণ্ঠন, টেবল-ল্যাম্প ইত্যাদির লিস্ট করে রাজবাড়ির গুদাম তোলপাড় করছে। ছোট আকারের কার্পেটগুলোতে পিয়েত্রোব বাংলোয় চলে যাবে, কিন্তু রাজবাড়ির নতুন কার্পেটগুলো সবই কি বড় মাপের নয়? সেগুলো কি দেওয়ানকুঠিতে হবে? না-হলে মাপ দিয়ে কলকাতায় লোক পাঠাতে হয়। ওদিকেও দ্যাখো রাজকুমারের বন্দুক, ঘোড়া, হাতি আছে, কিন্তু সেই শোর শিকারের বল্লম? আর কুকুরও লাগে বোধহয়। তাহলে কি ব্রজকেই পাঠাতে হয় কলকাতায়? পারবে ছিপে যাওয়া-আসা করে। তার চাইতে তার করা ভালো।

কিন্তু নরেশ এল। সে আসতে হরদয়াল বলল, 'সুরেন বাংলো দেখছে। তুমি পথ ঘাট দ্যাখো। কৃতঘাটে জেটি তৈরির কতদূর? এদিকে বলতে ভুলেছি, দেওয়ানকুঠি আর রাজবাড়ির মধ্যে অন্তত ফুট ছয়েক উঁচু ফেনসিং খাড়া করে দাও। দেখতে খারাপ না-হয়। কাঠেরই। মাপ নাও গে। আর নায়েবমশায়কে বলে যেও, আমি বুনোদের জন্য অপেক্ষা করছি'।

বুনোরা এলে জেনে নিতে হবে হরিণ, বাঘ, চিতা, কোন কোন অঞ্চলে পাওয়া সম্ভব। সেদিকের পথঘাটের কিছু কিছু উন্নতি করা দরকার।

৪

সন্ধ্যার আগে আগে বাগচী রাজবাড়ি পৌঁছল। পথে হরদয়ালের লাইব্রেরি থেকে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহের টাইমসগুলোকে সে সংগ্রহ করেছে। তার সাড়া পেয়ে রূপচাঁদ, যে এতক্ষণ ফরাশ আর মশালচিদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল, সে-ই 'এদিকে সার' বলে পথ দেখিয়ে বাজকুমারেব দোতলার বসবার ঘরে নিয়ে গেল বাগচীকে। ইতিমধ্যে সে-ঘবের পরিবর্তন হয়েছে, কি আসবাবে, কি আলোতে। চীনা লেকারের কাজ-করা ছোট টেবিলের চারিদিকে খয়েরিতে সোনার ছাপ মখমলের গদিদার ইংরেজি সোফা। টেবিলের উপরে রূপার বড় শ্যামাদানে জ্বলন্ত মোমকে ঘিরে ঝকঝকে কাঁচের গোলক। সেই আলোতে একটা দাবার ছকে গুঁটি সাজিয়ে রাজকুমার একাই দুজনেব হয়ে খেলছে।

বাগচী ভাবতে-ভাবতেই উঠছিল, তার স্বীকার করতে আপত্তি নেই সে বুঝতে পারছে না কী তার কাজ, কেন তাকে বেতন দেওয়া হবে? প্রকৃতপক্ষে আজই তো সে তার নতুন কাজে যোগ দিতে এসেছে। রাজবাড়ির ধরন-ধারণ জেনে নেওয়া তো কারো কর্তব্য হতে পাবে না। রাজকুমাবের সঙ্গে গল্প করা? তা তো সে করতই, এই ঘরেই; কিন্তু আজ, দ্যাখো, ঘরটারও পরিবর্তন হয়েছে। গল্প করা? কাল সন্ধ্যাতে রাজকুমারের দেখা না-পেয়ে সে যখন ফিরে যাচ্ছে তখন সদর-দরজার কাছে বাজকুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন কী করে হঠাৎ লন্ডনের ইভান্‌জেলিস্টদের কথা উঠে পড়েছিল। বাগচী বলেছিল, ব্যবসা-বাণিজ্যে হাতে টাকা হওয়ার পরেও কিছু লোক দেখল সমাজে সম্মানটা যতটা পাওয়া উচিত ততটা তারা পাচ্ছে না। সে রকম সম্মান তখনও বিশপ ইত্যাদির; তখন সেই লোকেরা ধর্মের দিকে ঝুঁকেছিল এরকম একটা মত আছে। রাজকুমার হেসে উঠেছিল। কিছুক্ষণ পরে বলেছিল, কলকাতাতে বেশ কিছুদিন থেকে ধর্ম নিয়েই আন্দোলন। যতদূর জানা যায় তাদের বেশিরভাগ নিতান্ত মধ্যবিত্ত, ব্যবসা বাণিজ্যে টাকা হয়েছে মনে হয় না। বাগচী তখন বলেছিল, তাঁরাও একরকম সম্মান পান বইকি। নিছক একজন কেরানি কিংবা শিক্ষকের চাইতে ধর্ম-আন্দোলনে যুক্ত তেমন শিক্ষক কেরানির সমাজে কিছু বেশি মান। রাজকুমার বলেছিল, আপনার এই মত ভালো নয়। বাগচী হেসে বলেছিল, ঠিক আমার মত নয়, একটা প্রচলিত মত, যা হয়তো কোণঠাসা কোনো বিশপ ইভান্‌জেলিস্টদেব হীন দেখাতে তৈরি করেছে। আপনি কি বলবেন, যে ধর্ম দীর্ঘ দিন নিন্দায়, ধিক্কারে কুণ্ঠিত ছিল তা এখন নতুন রূপে নিজের স্থান খুঁজছে?

কিন্তু এসব তো সময় কাটানোর আলাপ। তার ইংরেজিতে দক্ষতাই বা কী কাজে লাগে?

বাগচী লক্ষ্য করল, রাজকুমারের দুটো হাত যেন দু পক্ষের হয়ে চাল দিচ্ছে। বাগচী দরজার কাছে গুড ইভনিং বলে ঢুকতে-ঢুকতে বলল, 'আমি একটা হাত নেব কি'? রাজকুমার ছক থেকে হাসিমুখ তুলল। হয়তো আধঘণ্টার চিন্তায় দু রঙের যে দুটো ব্যূহ সাজিয়েছিল ছক ধরে উল্টে দিয়ে তা ভেঙে দিয়ে, ছকটাকে একপাশে সরিয়ে রাখল। গলা একটু তুলে বলল, 'কে আছ, হৈমীকে ডেকে দিও'।

হৈমী দু-চার মিনিটে এলে রাজচন্দ্র বলল, 'ইনি হৈমী, রানীমার লোক। ইনি মিস্টার বাগচী, আমার সেক্রেটারি। তো, হৈমী কলকাতায় ব্র্যান্ডি লাঞ্চ খাইয়েছিলে। এখন একটু চাই যে। চিনিটা কমিয়ে নেবুর বদলে নারাঙ্গি দিলে কী হয় দ্যাখো'।

হৈমী চলে গেলে রাজকুমাব বলল, 'আচ্ছা, মাস্টারমশাই, আমি কী জাতি? আপনি বলেছিলেন, বিপ্লবের আগে-পরে ফরাসি দেশে একটা জাতি। নেপোলিয়নের সৈন্যদল সেই জাতির হয়ে যুদ্ধ করত। আপনি, আমি, কেট, রাজনগরওয়ালি, ডানকান হোয়াইট কি এক জাতি? দিল্লিওয়ালে মুসলমানরা মারাঠাদের বিরুদ্ধে আবদালিকে সাহায্য করেছিল, তারা আর মারাঠিরা এক জাতি নয়। নানাসাহেব গোয়ালিয়রের বিশ হাজার সৈন্যকে টেনেছিল সেই বর্গিরা আর রোহিলারা কি এক জাতি? ওদিকে রানীমা বড় রানীর এক ঘোষণাপত্রের অনুবাদ পড়তে দিয়েছেন। আমরা আর কম্পানির প্রজা নই, তাতে আমি আর ডানকান কি এক জাতি হলাম'?

বাগচী বিব্রত বোধ করল বললে কমই বলা হয়। রাজকুমারের মুখ কি আলোর জন্য রক্তাভ? রাজকুমাবের দাবা খেলার সঙ্গে কি এই চিন্তার যোগ থাকতে পারে? এ কি কোনো জাতিবৈর যা রাজকুমারকে বিচলিত করছে?

বাগচী কিছু বলার আগে রাজকুমার জেব থেকে রুমাল বার করে আঙুলগুলোকে মুছে নিল। আর তখনই ভৃত্যের হাতে রূপার ট্রেতে ব্র্যান্ডি, গরম জল, চিনি, সন্তরা, রাম দিয়ে হৈমী তার পিছন-পিছন এল। রূপার ও কাচের ঔজ্জ্বল্যে মনে হল গরম জলের জাগটাতে অন্য কোনো মদ আছে।

রাজকুমার হেসে বলল 'মের্সি মাদমোয়াজেল। তুমি পাঞ্চটা বানাতে থাকো, আমরা দুই ছাত্র শিখে নিই। কিংবা মনে হচ্ছে মেশোনোর ব্যাপারটা পরিশ্রমসাপেক্ষ ; তুমি মেপে দিতে থাকো, আমি শেকিংটা করি। পিয়েত্রোকে বুজরুকের জন্য নিজের হাতে বানিয়ে দিতে দেখেছি, তাতে অবশ্য গরম জল থাকত না। বোসো হৈমী, এটা আমার প্রাইভেট চেম্বার'।

হৈমীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে রাজকুমার বাগচীর দিকে চাইল। বলল, 'আপনার হাতে কি আখবরের রোল? টাইমস না কী যাতে মেফেয়ার, নাইটিংগেল, সার সিডনির কথা লেখে'?

বাগচী বলল, 'এখন চীন আর মিশরের কথাই বেশি। চীনের যুদ্ধ। ওয়াং বিদ্রোহ'।

রাজকুমার হেসে বলল, 'দ্যাখো, হৈমী তাহলে তো তুমি ঠিকই বলেছ। মুকুন্দ তো তাহলে ঠিকই যুদ্ধে গিয়েছে। কিন্তু ওয়াংটা ঠিক কী মাস্টারমশাই'?

বাগচী বলল, 'ওয়াং একজন লোকের নিজেব নেওয়া উপাধি। সে নিজেকে তিয়েন ওয়াং বলে। নিজেকে ক্রাইস্টের ছোটভাই বলে, সে পৃথিবীতে তাইপিং অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য স্থাপন করতে চায়'।

রাজকুমার হেসে উঠল, এই চমকপ্রদ গল্পটা তার ভালো লেগে গেল। বলল, 'হৈমী বলেছিল, সে যুদ্ধে ইংরেজও একপক্ষ। কেন, সেটা কি বড় যিশু ছোট যিশুর যুদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে'?

বাগচী বলল, 'আমার কিন্তু মনে হয়, এটা মূলত মাঞ্চু আর মিং-এর লড়াই। যুদ্ধটা গড়াতে-গড়াতে ইংরেজের বাণিজ্যকুঠির দিকে গেলেই তারা জড়িয়ে পড়ছে।

রাজকুমার বলল, 'তা জড়িয়ে পড়া ওদের কেমন একটা স্বভাব। সেখানেও কি কোনো সম্রাট তাদের দেওয়ানি দিয়েছে? তোমার কী মনে হয়, হৈমী? তুমি তো আবার যুদ্ধ সম্বন্ধে জানো'।

হৈমীর পাঞ্চ-প্রস্তুতরত হাত দুখানা থামল, তার মার্বল-সাদা গাল রক্তাভ হল।

রাজকুমার বলল, 'এবারে কলকাতায় শেষেব কয়েকদিন হৈমী আমাকে অনেক গল্প শুনিয়েছে। একটা বিষয় আপনাকে জানাই, মাস্টারমশাই। হৈমীর স্বামী কিন্তু খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। ক্যাপটেন বিলি। দানাপুরের অ্যামিউনিশন ডিপো তাঁর অধীনে ছিল'।

দুটো ঝকঝকে গ্লাস মিশানো মদে পূর্ণ করে তার উপরে চাকা-করে কাটা সন্তরা ভাসিয়ে দিল হৈমী। রাজচন্দ্র বলল, 'ক্যাপটেনের কথায় মনে পড়ল,... কিন্তু হৈমী, তোমার গ্লাস কই? কিছু নাও। কী যেন তুমি বলেছিলে কলকাতায়—রিল্যাক্স্। মনে পড়ল, লাট আসছেন শিকারে। হরদয়াল এতদিনে জেনে নিয়েছে বনমহলের কোথায় চিতা, কোথায় হরিণ, কোথায়-বা বাঘ। বুনোমোষের দিকে জেনারেল না যায় তাই ভালো। ওদের লোভ দেখিয়ে বাইরে আনা কঠিন'।

হৈমী একটা গ্লাসে নিজের জন্য পাঞ্চ নিল। এই সময়ে এই এক অদ্ভুত ভাবনা হল বাগচীর, আজই তো সে প্রথম এ ঘরে বসছে না ; কিন্তু নতুন চাকরির পরে এই প্রথম। আজই দ্যাখো আবহাওয়াটা যেন কেমন বদলে গিয়েছে, যেন কতদিনের অভ্যস্ত এই ব্যাপারগুলো।

কিন্তু রাজকুমার বলল, 'আমি বিলির জন্য দুঃখিত। সাতদিনের বিবাহিত জীবনের পরেই তাকে প্রাণ দিতে হল। কিন্তু হৈমীর কাছে শুনেই আমার মনে হয়েছিল : কানোয়ারের লোকেরা তো দেশপ্রেমের আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়েছিল। বিলি? এটা তো তার স্বদেশ নয়। কীসের জন্য প্রাণটা দিল'?

বাগচী হৈমীর দিকে চাইল। সে মুখ নিচু করে গ্লাসটার দিকে চেয়ে আছে। বাগচী তাড়াতাড়ি করে বলল, 'লয়্যালটিও তো একটা আদর্শ'। বাগচীর মনে হল এই সময়ে, রাজকুমার কী নির্দয়, যে এখানে এই কথাগুলো তুলছে? কিংবা একি একরকমের নিস্পৃহতা?

হৈমী বলল, 'রাজকুমার, আর-একটু দেব কি আপনাকে, এখনও গরম আছে'।

রাজকুমারের আর দরকার হল না। একটু থেমে সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'মিস্টার বাগচী, আপনি তো একাধিকবার লন্ডনে গিয়ে থাকবেন, সেখানে কি দশসালার বন্দোবস্ত আছে'?

বাগচী বলল, 'কিছু-কিছু লর্ড আছেন যাঁরা পারমানেন্ট। কিন্তু সেখানে এই নতুনত্ব—একটি ছেলেই বিষয় পায়'।

কৌতুক বোধ করে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করল, 'অন্যরা তবে'?

'অনেকক্ষেত্রেই আর্মিতে-নেভিতে যায়, নতুবা...আজকাল কেউ-কেউ ব্যবসা করতে শুরু করেছে'।

রাজচন্দ্র হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'তাহলে, হৈমী, মুকুন্দ ঠিকই করেছে'।

সেদিন কুঠিতে ফিরতে-ফিরতে বাগচীর মনে হল, একি অন্য রাজকুমার? কিংবা এটা কি এই সন্ধ্যারই ধরন? কিছুদিন পরে, সেদিন সে কায়েতবাড়ির বিষয়ে জেনেছে (এখন তো রানী ব্যাপারটাকে প্রকাশ্যে এনেছেন, অনেকেই জেনেছে)। বাগচীর রাজকুমারের এই আবেগশূন্য হাসিটাকে মনে পড়েছিল।

সেই সন্ধ্যায় হরদয়াল বেশ ক্লান্ত হয়ে তার কুঠিতে ফিরেছে। এখন সে বিশ্রাম নিতে পারে। মনে মনে রাজবাড়ি, দেওয়ানকুঠি, পিয়েত্রোর বাংলো, গ্রামের কয়েকটি পথ, বনমহলের এ-অংশ সে-অংশ সে তো একজায়গাতে বসেই দেখতে পাচ্ছে।

তুলনা দিতে হলে একটা সুদৃশ্য জাল বুনে তার একপ্রান্তে সে যেন এখন অলক্ষিতভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারে। তাহলেও শেষ কাজটার কথা না-ভেবে সে পারছে না। কিছুক্ষণ আগে শুরু হয়েছে, আলো জ্বেলে অনেক রাত পর্যন্ত করবে। জাহাজ ভিড়বার জেটি কুতঘাট থেকে সরিয়ে কিছুটা নতুন পথ করতে হয়েছে বটে, কিন্তু নদীর বাঁকটায় সেখানে জল গভীর থাকায় জেটিটা লম্বায় কম হয়েছে। বিলমহলে যাওয়ার হাতিঘাসের বনের মধ্যে দুধারে ঘাস রেখে মাঝখানের দশ ফুট পথটা দেখতে বেশ লাগছিল কিন্তু। ওটাও খুবই ভালো, গাছের উপরে সেই দু-কামরার বাড়িটা ; সিঁড়িটা কতকটা মই-এর মতোই হল, কিন্তু মহিলারা পছন্দ করলে তার উপরে থেকে অনেকটা দূর পর্যন্ত শিকারের দলকে দেখতে পাবে। সিমসন জানিয়েছে কুকুর পার্টির সঙ্গেই যাবে, শুয়োর-বল্লমের কথা কখনও-ই ভুল হবে না। টেলিগ্রাম সে পেয়েছে। কিন্তু সবচাইতে ভালো বুদ্ধি হয়েছে দেওয়ানকুঠি আর রাজবাড়ির মধ্যে ফেনসিংটার ব্যাপারে। ফেনসিং খাড়া হলে তাতে রং আর নকশা থাকলেও কেমন যেন কৃত্রিম আর ন্যাড়া মনে হচ্ছিল। তারপর বুদ্ধিটা এল। দু-তিন গাড়ি সোনালিলতা আনা হল তো। ফেনসিং-এ লতাগুলো তুলে দিলে একটা সোনালি বাগান স্ক্রিনের মতো দেখাবে। মনে হবে লতাগুলো সেখানেই জন্মেছে। এই লতাগুলোয় সবুজ থাকে না বলে ছ-সাত দিন অবিকৃত থাকবে।

হরদয়াল ক্লান্তিটাকে খুশির মতো অনুভব করল। তার লাইব্রেরিতে উজ্জ্বল আলো। সেদিকে যেতে যেতে তার মনে হল : 'সেটা আগামীকাল। ব্রজই দেখবে ব্যাপারটা। লাট থাকার কয়েকদিন সদর-গেট থেকে দেওয়ানকুঠি পর্যন্ত, ফেনসিং-এর ধারে-ধারে, রাজবাড়ির বাইরের দেয়ালে, সদর দরজার বাইরে

পিয়েত্রোর বাংলোর দরজা পর্যন্ত যে আলো জ্বলবে তখন সেই আলো জ্বালিয়ে দেখা হবে। দেওয়ানকুঠির বা পিয়োত্রার বাংলোর ভিতরের আলোটা মশালচিরাই পারবে। আর এই লাইব্রেরি, লাটের শ্যালি এবং স্ত্রী কি উপন্যাসই খুঁজবে শুধু? এই সময়ে তার মনে হল রানীমাকে কি বলা যায় আপনি বেরিয়ে আলোর মহড়াটা একবার দেখুন?

কিন্তু আর-একটা কাজ আছে তার। সেদিন রানী বলেছিলেন গুণাঢ্যর কন্যা সম্বন্ধে লিখতে। হরদয়াল দাঁড়িয়ে পড়ল। রানী গুণাঢ্য-কন্যাকে পছন্দ করেছেন তার একটা কারণ এই : সে মেমসাহেবের কাছে পড়ে, ইংরেজি শেখে, পিয়ানো শিখছে। রানী ইংরোজ আদব-কায়দার কথা উহ্য রেখেছেন। তাহলে?

হরদয়ালের মুখে আবার হাসি দেখা দিল। যেন সে মনে-মনে বলবে : এটা কেমন হচ্ছে না? সেই কেট তো এখন প্রাইভেট সেক্রেটারির স্ত্রী হিসেবে ইংরেজ এবং খ্রিস্টান হওয়া সত্ত্বেও আদরের হল। মুক্তোর হার হচ্ছে না? তার মনের মধ্যে যে-কথাটা উঠেছিল সেটা ফুটবার আগেই তার মনের মধ্যেই কারো রুচিতে আটকালো। শেযোক্তজন যেন বলল, বারবার কেন সেই কথা? কিন্তু সে বিস্মিত হয়ে গেল যেন। এটা তো সে ভাবেনি। এখানকাব এই নায়েব-ই-রিয়াসৎ তো তখনও ছিলেন যখন তাঁকে ডিঙিয়ে হরদয়ালকে দেওয়ান করা হয়। সে কি তার ইংরেজি দক্ষতা এবং বরং আধুনিক চালচলনের জন্য নয়? সেই কবে তখনই তো রানী খানিকটা আধুনিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। এতদিনের হিসাবটা তবে ভুল?

অসাধারণ বুদ্ধিমতী রানী। নতুবা রাজার মৃত্যুর পরে এই বিশ বছর হতে চলে, আয় না-কমে দ্বিগুণে দাঁড়াত না। কিছুই ক্ষতি হয়নি, সর্বত্র বৃদ্ধি পেয়েছে। বলবে রানী ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে নিশ্চিন্ত, কী ক'রে তা হবে সে চিন্তা নায়েব ও দেওয়ানের? কিন্তু ইচ্ছাটা?

কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমতীর পক্ষেও ওটা একটা ঝুঁকি, বিষে বিষ দূর করার চেষ্টা হয় যদি। হৈমী কি অসাধারণ রূপসী নয়? বলবে দুঃখিনী, আশ্রয়প্রার্থিনী, রাজবাড়িকে প্রভাবিত করতে পারে না?

সে কিন্তু এখানেই থেকে গিয়েছে। সে লাইব্রেরির বইগুলোকে দেখল ঘুরে-ঘুরে। ওটাকে স্মৃতিই বলতে হয়। প্রায় শিশু সেই রাজকুমারকে বালক ও কৈশোরে পৌঁছে দেয়া একপাশে উপস্থিত থেকে। অন্যপাশে রানী।

চিঠিটা লেখাই দরকার। সে লাইব্রেরি থেকে বসবার ঘরের ডেস্কে গেল। সেখানেই কয়েকদিন থেকেই কাজ হচ্ছে। সেখানেই প্যাড, কলম, সিহাই।

ভাদুড়িকেই তো চিঠি, সুতরাং তার এবং তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ল। কোনো-কোনো মানুষকে দেখে মনে হয় বটে জীবন যেন নিজ বেগে উচ্ছল স্রোতমাত্র নয়, বরং যেন এক নৌকা যাকে বিচক্ষণতার সঙ্গে চালনার চেষ্টা করতে হয়। এই যোগাযোগের ব্যাপারে ভাদুড়িও একজন, কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর বিবাহের সে ঘোর-বিরোধী। ধর্মবিশ্বাসে সে স্বীকার করে : সে হয়তো অজ্ঞেয়বাদী, কিন্তু বিশ্বাস করতে একমাত্র তেমন ঈশ্বরকে করা যায় যার সম্বন্ধে পুরাণে কিছু বলা হয়নি। পুরাণের দেবদেবীকে সে দুশ্চরিত্র নরনারী মাত্র মনে করে। একবার বৈষ্ণব কাব্যের কথায় রজকিনীর কথা ওঠামাত্রই সে কানে আঙুল দিয়ে নিজের বৈঠকখানা থেকে পালিয়েছিল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে সে তার বন্ধুকে লিখল :

> ব্যাপারটা সম্ভবত ক্যাচ দেম ইয়ং। রানীমাতা গুণাঢ্য মহাশয়ের কন্যাটিকে পছন্দ করিয়াছেন। তুমি তাহার বয়স বিবেচনায় নীতিগত আপত্তি তুলিতে পারো, কিন্তু গুণাঢ্যকে সংবাদটি দিবে। সংবাদ দিবার সময় তাহাকে তোমার নীতিগত আপত্তির কথা বলিতে পারো। গুণাঢ্য প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি। তাহার পর সে অগ্রসর হইলে তোমাতে দোষ অর্শে না। অবশ্যই তুমি এরূপ ধারণা দিবে না যে রানীমাতা নিতান্ত আগ্রহী, শেষেরটি গুণাঢ্যের তরফে প্রকাশ হওয়া চাই।
>
> অপর, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনের কোনো সংবাদ পাইতেছি না এরূপ কিছুদিন গেল। অবগত

> আছ যে রাজপরিবারের পক্ষে উক্ত সভার আমি সভ্য। এবার কলিকাতায় রাজকার্যে ব্যস্ত থাকায় যোগাযোগ করিতে পারি নাই। আমি তাহাদের ঠিকানায় পত্র দিয়াছি। কিন্তু এরূপ সন্দেহ তাহাদের ঠিকানা বদল হওয়ায় পত্র না পঁহুছিতে পারে।...

হরদয়াল একটু ভাবল, একটু যেন দ্বিধাও করল। পরে আবার লিখল :

...এই সুযোগে তোমাকে অন্য এক বিষয়েও বলিতে পারি। কলিকাতায় থাকাকালীন আমি 'হিন্দু' হরিশ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে কিছু সংবাদ পাইয়াছি। প্রকৃতপক্ষে তাহার চেষ্টাতেই যে ইন্ডিগো কমিশন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই কমিশন বর্তমানে এই অঞ্চলে। কিন্তু যাহা শুনিয়াছি তাহা এই যে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাস্থ্য ভালো চলে না, হয়তো এরূপও সত্য অর্থকৃচ্ছ্রতা দেখা দিয়াছে। অবগত আছি, তোমাদের সমাজের একাংশে তাহার কার্যকলাপে নিরুৎসাহ আছে ; অধিকন্তু সেখানে তাহার পানদোষ এবং আনুষঙ্গিক 'ধনাঢ্যদের পীড়া' সম্বন্ধে বক্র-ইঙ্গিত শুনিয়াছি। সে বিষয়ে আমার বলিবার নাই। শুনিয়াছি সে গৃহের দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিতেছে। ইহা নিন্দার প্রচারমাত্র হইতে পারে। যাহা হউক, যদি পুস্তকাদি বিক্রয় দ্যাখো, বিশেষ পুরাতন এডিনবরা রিভ্যুর মতো পত্রিকা, তুমি গোপনে আমার পক্ষ হইতে একটা দাম বলিবে। এক এক বৎসরের এডিনবরা রিভ্যুর জন্য আমি এক এক হাজার দিতে প্রস্তুত জানিবে। টাকাব জন্য প্রয়োজনে আমাদের নতুন স্থাপিত কলিকাতার দপ্তরে যোগাযোগ করিতে পারো। কিন্তু অবশ্যই লক্ষ্য রাখিও মুখোপাধ্যায় মহাশয় দাম শুনিয়া ক্রেতার বদান্যতা এরূপ সন্দেহ না করে, যেন মানেব হানি না হয়।. .

চিঠি শেষ করে তামাকে মন দিল হরদয়াল।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

অনুমান করি সে-বৎস., বসন্ত রাজনগরে আগে এসে পড়েছিল। বসন্ত যে তাতে ভুল নেই ; করবী তা নানা রঙের, টগর তা নানা মাপের, গোলাপ যা রাজবাড়ির হাতায় পৌঁছে বসরাই, চম্পক, চাঁপা, কৃষ্ণচূড়া, গুলমোর—এসব তো বটেই, শালে-আমে সে বসন্তরই এসে পড়া। এমনকী পাখিরাও তা বুঝতে পেরে গিয়েছিল। গম্ভীর কোনো পথচারীকে চমকে দিয়ে পথের ধারে ছোটঝোপটা থেকে পরিষ্কার উঁচু গলায় কেউ আচমকা গান করে উঠছিল, তারপর মানুষের গাম্ভীর্য দেখে মাথা-ঠোঁট এদিক-ওদিক করে যেন যা করেছে, না-দেখে করেছে এমনভাবে নিজের পোকা খোঁজায় গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল। বনে কী ফুটছে, কত ফুটছে, তার ইয়ত্তা করা যায় না।

একটা প্রাকৃতির কারণ দেখানো যায় : অঘ্রান, পৌষ, মাঘ তিনটি মাস গেল একফোঁটা বর্ষা হয়নি; বসন্তের শুকনো ভাবটাকে, বাতাসের হালকা ভাবটাকে তা এগিয়ে আনতে পারে। অন্য কারণ বোধ হয় এই যে জঙ্গিলাটের ক্যাম্পের উজ্জ্বলতা আর বসন্তের ঘটনাগুলোর মাঝখানে যে ঘটনাগুলো ঘটেছিল তা যেন নিষ্প্রভ কুয়াশা-ঢাকা, যেন দুইপাশের উজ্জ্বলতার মাঝে চোখে পড়তে চায় না।

জঙ্গিলাটের সেই ক্যাম্প নিশ্চয়ই সুদীর্ঘকাল মনে রাখার মতো ছিল। অত যার আয়োজন, অত যার বাহুল্য, যা যেন চোখকে ধাঁধায়, তা মিটে যাওয়ার পরও যেন চোখের সামনে ঘটতে দেখা যায়। গ্রামটাই যেন সাহেবদের হয়ে গিয়েছিল। সেই ভোর-সকালে বিউগল বেজে উঠতে ফরাসডাঙায় কুচ। সেই তালে-তালে রাজবাড়ির দিকে গিয়ে অবশেষে লাটের সামনে নাকি পতাকায় অভিবাদন করে, বিউগল বাজে। আবার সন্ধ্যায় বিউগল। আর তারপরই দপ করে যেন একসঙ্গে সব আলো জ্বলে ওঠে, ওদিকে ফরাসডাঙা এদিকে রাজবাড়ি একটানা আলোয় ঝলমল করে ওঠে। রানীমার জন্মতিথির উৎসবে আলো হয় ; কিন্তু সে তো রাজবাড়িতে, সে আলো এমন করে পথে-পথে ছড়ায় না। তুমি বলতে পারো না, আলো জ্বলে উঠলে রাজবাড়ির হাতার মধ্যে দেওয়ানকুঠিতে কী হতো ; কারণ রাজবাড়ির দরজা দিয়েই

তো দেওয়ানকুঠির পথ ; সেই দরজার সামনে সারাদিনই তো লালকুর্তা সিপাহি বন্দুক ঘাড়ে এ-মাথা থেকে ও-মাথা করছে অষ্টপ্রহর। কিছুপরে আবার এক রকম বাজত। তাই নাকি 'ব্যাগপাইপ', নাকি 'গোরার বাদ্যি'। আর তখন নাকি লাট খেতে বসেছেন।

আর এর মাঝে তো গোটা দিনটাই ব্যস্তসমস্ত সওয়াররা রাজবাড়ি থেকে ফরাসডাঙা, ফরাসডাঙা থেকে রাজবাড়ি করছে। কত ঘোড়া, কত রকমের রং। আর বেলা দশটা বাজে কি না-বাজে, সারিসারি হাওদাদার হাতি বেরোল রাজবাড়ি থেকে। সব হাওদায় দু-তিনজন করে সাহেব, একটিতে কখনও কখনও মেমসাহেব, এই মেমসাহেবদের হাওদায় কখনও কখনও রাজকুমারকে দেখা যেত। রাজকুমারের কথা যদি বলো, এক ঘোড়ার পিঠেই না তাকে কত রকম দেখা যেত, কত রঙের পোশাকে। কত রঙের শুধু নয় ; কত জাতের তা। আর ঘোড়াগুলোও। সেটা সব চাইতে ভালো দেখা যেত সেই সময়ে যখন রাজবাড়ি থেকে একদল সাহেব, তাদের সঙ্গে রাজকুমারও, হাতে বল্লম, হৈ-হৈ করে ঘোড়া ছুটিয়ে যেন কোনো দুর্গ আক্রমণ করতে যেত। ঘোড়াগুলোর পায়ে-পায়ে একদল কুকুর ছুটত পিলপিল করে, চাপা পড়ত না আশ্চর্য।

কিন্তু তা তো চিরস্থায়ী নয়। তখন তো প্রগাঢ় শীত আর কুয়াশাও বটে। শীত কমার আগেই সেই অ্যালবেট্রসে চেপেই তারা চলে গিয়েছিল। ভোজবাজি নয়, তার প্রমাণ পথের সেই স্ট্রিট লাইটিং কিছু-কিছু থেকেই গিয়েছে। রাজবাড়ির গেটে দুটো পিতল রঙের চকচকে কামান, বিলমহলে যাওয়ার জন্য হাতিঘাস বনের পথটাকে এখন ঘাসে ঢেকে দিতে পারেনি, একটা গাছের উপরে নাকি এক কাঠের তৈরি বাড়ি এখন আছে।

এই ক্যাম্প কেন তা নিয়ে অবশ্যই এখনকার মতো তখন কেউ-কেউ ভেবেছিল। একই উত্তরে সকলে পৌঁছতে অবশ্যই পারেনি। সে সময়ের কোনো খবরের কাগজে লাটের এই ট্যুর সম্বন্ধে কিছু না-লেখায় এ-রকম সন্দেহ থাকে, তা হয়তো প্রাইভেট কিংবা সিক্রেট ছিল। এদিকে সব লাটই যে আত্মজীবনী কিংবা মেমোয়ার্স রেখে যাবে তাও হয় না।

রাজবাড়ির পক্ষে কি এই আয়োজন সার্থক হয়েছিল? একটা মত এই : সন্ধ্যায় কেট, লাটের শ্যালি, লাটের মহিষী একত্র পিয়ানোর কাছে বসতেন। লাট নিজেও কি অদূরে থাকতেন না? সেই রকম এক সন্ধ্যায় রাজকুমারকে নিয়ে আলাপ হয়েছিল। লাট-ললনা—বলেছিল, রাজার পুত্র রাজাই হয় ; স্ট্রেঞ্জ, এখন তা হয়নি! আচ্ছা, আজ ডিনারে হিজ একসেলেন্সিকে বলব তো!

চিন্তা করার লোক রাজনগরে অবশ্যই ছিল। হরদয়ালের চিন্তার কথা জানা যায় না। সে তো অ্যালবেট্রসের লাট-পার্টির সঙ্গে কলকাতায় গিয়েছিল। বাগচী, যাকে দু'একবার লাটের পার্টির সামনাসামনি হতে হয়েছে, যার সঙ্গে তাঁর পার্টির সেই ডাক্তার মেজর চীবসের গ্রামের চিকিৎসা-বন্দোবস্ত নিয়েও কিছু আলোচনা হয়েছে ; সে যেন অন্য কোনোদিকে ব্যস্ত। নায়েবের চিন্তার কথা বলা যায়।

তারা চলে গেলে নায়েব একদিন যখন তার খাসকামরায়, হঠাৎ তার মনে হল : সদরের খবর, এই ডানকানের উস্কানিতে কালেক্টর ম্যাকফার্লান অনেকবার কলকাতায় লিখেছে পিয়েত্রোর সিপাহি বিদ্রোহের সঙ্গে যোগ থাকার কথা। সেইজন্যই কি জঙ্গিলাট তদন্ত করে গেল? নায়েবের মুখে হাসি দেখা দিয়েছিল। এত ভয়! এখনও? দেখছে, ঘাসের ছাই-এর নিচে স্ফুলিঙ্গ আছে কিনা? কিন্তু সে গম্ভীরও হল। সদরের এটাও খবর, ম্যাকফার্লান কালেকটরিতে খোঁজ নিচ্ছে, পিয়েত্রো দু'সন আগে গত হয়েছে, তাহলে ফরাসডাঙার লাট জমা পড়ল কী করে? জমা তো পিয়েত্রোর উকিলই দিয়েছে। কিন্তু...

তাই বলে কিছুই ঘটেনি শীতের সেই শেষ কয়েকটি দিনে, এমন হয় না। যেমন বাগচী তো লাটের ক্যাম্পের কয়েকটি দিন তাদের ডিসপেনসারিতে যেতেই পারেনি। সে কিছু করছে না রোগীদের সম্বন্ধে এ রকম চাপ ছিল মনে। উপরন্তু মেজর চীবসের সঙ্গে আলোচনায় জানতে পেরেছে যে বাংলাদেশের যশোর খুলনা জেলা জুড়ে ম্যালেরিয়া এপিডেমিকের চেহারা নিচ্ছে ক্রমশ। জ্বর হলেই এখন থেকে

তাই লিভার ও স্প্রিনের কথা ভাবতে হবে। সুতরাং সে জঙ্গিলাট চলে যাওয়ার দু'এক দিনের মধ্যেই চরণের ডিসপেনসারিতে গিয়েছিল। রোগী ছিল না, চরণকে বাগচী জিজ্ঞাসা করল—তুমি তো আমাকে কমিশনের সামনে যেতে নিষেধ করছ? তোমার কথা শুনে কি ঠিক করলাম? না হয়, যারা সাহস করে সাক্ষী দিতে পারছে না, এখানেই ডাকো তাদের, কথা বলি। লোকগুলোকে খারাপ মনে হয় না। আজ কালই তো সাক্ষ্যের দিন বোধ হয়।

চরণ বলল, 'সাক্ষ্য গতকাল হয়েছে। আরো দুদিন হওয়ার কথা। গোপালদার পাড়ার কেউ সাক্ষ্য দেবেই না। কাল আমরা চারজন সাক্ষী দিয়েছি। আমি, অমর্ত্যমামা, শ্বশুরমশায়, কৃষ্ণানন্দ, আর ইসমাইল। একটু থেমে আবার সে বলল, ইসমাইলকে নিয়ে এসেছিল ওসুলিভান। ওসুলিভান সকলের বেলাতেই দোভাষীর কাজ করেছে।

বাগচী সংবাদটার নতুনত্বের বাইরে যখন তার মূল্যটাকে ওজন করেছে, চরণ বলেছিল, সাক্ষ্য না-দেওয়া তো ছিল ভালো। যাদের দরখাস্ত লিখে দিয়েছেন তাদের জনাকুড়ি আমাদের সামনেই এক লাইন করে হলফ নিয়ে গেল : তারা দরখাস্তর বিষয়ে কিছু জানে না, সবই চরণদাস আর রাজনগরের বাগচীমাস্টারের কাজ।

'বলো কী' বলে চমকে ওঠা যায়, তাতে কিন্তু চিন্তা শেষ হয় না। বাগচী দিন দুয়েকের মধ্যে সব ব্যাপারটা আনুপূর্বিক রাজকুমারকে বলেছিল।

রাজকুমার কী ভাবল বোঝা গেল না। পরে বলল—আপনি কিন্তু এখন আর রাজনগরের হেডমাস্টার নন। আপনাকে এদিকটা দেখতে হয়। আপনার টাট্টু ভালোই। কিন্তু আজ আমাব সঙ্গে আস্তাবলে যাবেন। সেখান থেকে যে-ঘোড়াটা পছন্দ হয় নেবেন। আপনাব সহিস ঘোড়া চিনবে না। সহিস আমি ঠিক করে দেব। আর কথা এই, সেই সহিস কিন্তু মাথায় পাগড়ি-টাগড়ি বাঁধবে। গ্রামে ঘুরতে হলে সে তার ঘোড়ায় আপনার সঙ্গে থাকবে। একটু থেমে থেকে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করেছিল—দিনকর রাও আর সালর জং দুজনেই নাকি 'সার' উপাধি পেয়েছে?

এ ঘটনাটা নিশ্চয় সামান্য, কিন্তু সেই শিবচতুর্দশীব পূজা এবং তার মেলা? সে-রাতে কিন্তু খুব শীতই ছিল। আর সেই শিব তো রানীমার প্রতিষ্ঠিত। দু-দিন ধবে মেলা হয়েছিল। সেই মেলায় তো অনেকেই গিয়েছিল। পরিচিতদের মধ্যে কেট ও বাগচীর নাম করতে হয়। বনদুর্গা আর চরণও গিয়েছিল। চরণের তবু দ্বিধা ছিল। বনদুর্গা তো শেষ প্রহরের পূজা না-দিয়েই ছাড়েনি। চরণ বলেছিল—সেখানে কি আমাদের পূজা হয়, সেখানে কি যেতে আছে? বনদুর্গা হেসে বলেছিল—মশায় কিছু জানেন না। গ্রামের সব লোক জানে, রানীমা নিজে মুখে বলেছেন, সে নাকি খেস্টানি শিব, সকলেই পূজা দিতে পারে, ছুঁতে পারে। কথাটা তো সত্যি, দ্যাখো। সে তো খেস্টানের হাওয়াঘরের ভিতেই।

মেলা খুব বড় নয় বটে, কিন্তু দু-দিন তো চলেছিল। দ্বিতীয় দিনে কেট ও বাগচী গিয়েছিল। কেটই উৎসাহী। তার উৎসাহ কি এজন্য যে বাগচীর নিরুৎসাহের সময় চলেছিল? সে বাগচীর পাশে পাশে, তার সুদৃশ্য গুলফ দেখিয়ে যেন কিছুটা নেচে-নেচে, চলেছিল। পুরুষ হলে বলা যেত, সে যেন বলছে, লেটস টেক ইট ইন আওয়ার স্ট্রাইড। একবার পিছন ফিরে সে কিছু বিপন্ন বোধ করছিল। তাদের দু-তিন হাত পিছনে, যেন তাদের গায়েই এসে পড়বে, একজন প্রকাণ্ড চেহারার মানুষ যার ঝালরদার পাগড়িতে জরি, যার লম্বা আচকানের বোতামগুলো যেন সোনার, হাতে ঝকঝকে তীক্ষ্ণ ফলার লম্বা বল্লম। কেট-এর দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকে দেখে বাগচী বলেছিল—তোমার বডিগার্ড আমরা আর হেডমাস্টার নই, কেমন কিনা? মেলাতেও একটা কৌতুক হয়েছিল। কেটই দূর থেকে বলেছিল—দ্যাখো, গাছতলাটায় কি ক্রাইস্টের মিশনারি? একদল চাষি একজন লোককে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আর সে ভাঙা বাংলায় ইংবেজি শব্দ মিলিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। একেবারে মুখোমুখি না-হয়ে, কৌতূহল মেটানো যায় তেমনভাবে ভিড়ের কাছে বাগচী এগিয়েছিল। তার মনে দুঃখই হয়েছিল। সুরটা মিশনারিদের, তাদের

মতোই কখনও আকাশের দিকে আঙুল তুলছে, কখনও দিগন্তের দিকে হাত বিস্তার করে দিচ্ছে। কিন্তু সে ওসুলিভান এবং নিশ্চয় নেশার ঘোরে। প্যারাডাইস, স্বর্গ বোঝাতে শান্তির দ্বীপ, সুস্বাদু জল, উজ্জ্বল সূর্যালোক, ছোট-ছোট কুটির এবং যার যত চাষ করার ক্ষমতা এমন জমির কথা কোনো বাইবেল বলে না। বাগচী শুনল, সে বলছে : আমরা ভাসিয়া যাইব, এই পুরাতন হইতে নতুনে, এবং আমরা শান্তির দ্বীপে পহুঁছিব। কেটেরও ধারণা হয়েছিল, মাতাল। বাগচী তার মনোভাব দূর করতে বলল, ও নাকি পূর্বজন্মে কবি ছিল।

আর শিবমন্দির তো রানীমারই। ভোরের শেষ প্রহরের পূজার আগে তাঁর হাতি গলার ঘণ্টা বাজিয়ে মন্দির-চত্বরের নিচে থেমেছিল। যারা পিয়েত্রোর বাংলোয় পূজার জন্য রাত্রিবাস করছিল তাদের সে সংবাদে উৎসাহিত হওয়ারই কথা। তারা সকলেই বলল—দুধজল দিলে তবেই আমরা সারি বেঁধে তাঁর পিছন-পিছন এগোব। তখন ভোরের আলো ফুটছে, পূজা শেষ হয়েছে। রানী নয়নতারাকে ডেকে হাওদায় নিয়ে রওনা হয়েছিলেন। মাহুতকে বলেছিলেন নদীর খাতের দিকে যেতে। অনেকটা ঘুরে, কুতঘাটের কাছে যেখানে নতুন জেটি, সেখানে বাঁধ এড়িয়ে নদীর পার ধরা যায়। পার ধরে ক্রমশ ফরাসডাঙার কাছে বাঁধের নিচে হাতি পৌঁছলে রানী বলেছিলেন—এই নাকি তোমার বাঁধ, নয়ন? এ নিয়ে তোমার দুর্ভাবনা? কিন্তু একসময় ফাটলগুলো চোখে পড়েছিল। তখন রানীমার মুখে হাসির পাশে-পাশে চিন্তা দেখা দিয়েছিল।

২

কিন্তু এসবকে উপেক্ষা করে, ছাপিয়ে যেন সেই দ্রুতগামী বসন্ত এসেছিল। বনে ছায়ায়-ছায়ায় কী ফুল, কত ফুল তার খবর অবশ্যই কম রাখা হয়। গ্রামের এখানে ওখানে টগর, করবী, জবা, চীনাজবা, গন্ধরাজ, গোলাপ, চাঁপা তো অজস্রই তখন। আমের মুকুল দেশ-বিদেশের মৌমাছি ডেকে আনায় তার গুঞ্জরণও আছে। গাছের আশ্রয়ে পাখপাখালির ডাকাডাকি ঝুটোপটি তো নিশ্চয়ই। সকালের দিকে শিশির পড়ে এখনও, তাতেই ফুলের জোর তো। কিন্তু যেখানে ফুল নয়, গাছ নয়, চাষের জমি, সেখানে সকাল ফুরোতে-না-ফুরোতে গরম হয়ে ওঠে বাতাস। দুপুরে খালি মাঠগুলোর দিকে, হলুদ বাদামি মাঠগুলোর দিকে চাওয়া যায় না। সকালে শিশির বরং ক্ষতিই করছে, তাকে কিছুটা ভেজে বলেই দুপুরের রোদে ফাল্গুনেই মাঠ ফেটে যাচ্ছে।

দিনের হিসাবে সেটা শিবচতুর্দশীর দু-তিন দিন পরে হতে পারে। রাজকুমার রাজচন্দ্র তার ঘরের কাছারির দিকের ঝুল-বারান্দায়। নিচে যে ফেনসিং দেওয়া হয়েছিল রাজবাড়িকে দেওয়ানকুঠি আর টমিদের তাঁবু থেকে পর্দানশিন রাখতে সেগুলো খোলা হচ্ছে। তার মনে এই 'পর্দানশিন' কথাটাই উঠল, সেটাই খেলা কবল সেখানে।

কিছুক্ষণ পরে যেন অসংলগ্ন এমনভাবে তার মনে পড়ল, কয়েকদিন আগে বেলা আটটা-নটার আলোতে কাছারির সামনে দিয়ে হাতিটা এগিয়ে গিয়ে রাজবাড়ির কাছাকাছি বসেছিল। হাতিতে হাওদা ছিল, হাওদার মাথায় নকল মুক্তোর ঝালরদার রঙিন ছাতা। হাতিটা রামপিয়ারী নয়, বরং পিয়েত্রোর বেঁটে হাতিটা। এ রকমটা সচরাচর দেখা যায় না। রাজচন্দ্র তখন ফিরছিল তার ঘোড়ায় বেড়ানো শেষ করে। হাতিটা তার আগে-আগে ঢুকেছে গেট দিয়ে। সে দূর থেকে দেখেছিল একই রকম চাদরে জড়ানো, একই রকম অবগুণ্ঠন, দুজন হাতি থেকে নেমে রাজবাড়ির গাড়িবারান্দার দিকে চলে গেল। এ রকমটাও সচরাচর দেখা যায় না। রানীমার হাতি বাগান দিয়ে ঘুরে গিয়ে অন্দরে বসে। পিয়েত্রোর হাতি, মাহুতটিও তার। এ বাড়িতে সে নতুনই তো। রাজকুমারের পাশ দিয়ে হাতিটা যখন পিলখানার দিকে ফিরে যাচ্ছে, রাজচন্দ্র জিজ্ঞাসা করে ফেলল—কে রে? মাহুত বলেছিল—দুজন রানী এলেন।

রোদটা এখন আর আরামের নয়। ঝুল-বারান্দা থেকে সরতে গিয়ে মনে হল তার, নতুন মাহুত বুঝতে ভুল করেছে। জিজ্ঞাসা নাকরলেও চলত। দূরে হলেও হাঁটার ভঙ্গিতে বোঝা গিয়েছিল তারা নয়নতারা এবং রানী। রাজু নিজের মনে-মনে হেসে ঝুল-বারান্দা থেকে বরং ছায়ার দিকে সরল। আজ সে সকালেই উঠেছে। কিন্তু কাল ঘুমোতে বেশ দেরি হয়েছিল।

সে অনুভব করল সেজন্য সে ক্লান্ত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। বলা যায়, রাত দুটো পর্যন্ত হৈমী তার ঘরে ছিল। পিয়ানো শেখার কথা হয়েছিল একবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হৈমীর ব্যক্তিগত জীবনের কথা হয়েছিল। এটা খুব খারাপ লাগছে। হৈমী তার আশ্রিতা বলেই কি তেমন উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল তার প্রশ্নের! না, ভালো নয়। একজন মানুষের বুকের ভিতরে তেমন নির্দয়ভাবে প্রবেশ করা। এখন তো ভাবতে গিয়ে খারাপ লাগছে যে হৈমী তেমন করে বলেছিল, সে তারই আশ্রিত।

রাজচন্দ্র তার ঘরে এল। ঘর পার হয়ে উল্টোদিকের দরজা খুলে আবার সেদিকের ঝুল-বারান্দায় দাঁড়াল। তখন তার হঠাৎ মনে হল, এটা কি আশ্চর্য বলবে না কেউ-ই, যে রানীমার জন্মতিথির সেই রাতে 'তুমি তাহলে পূজার কাছে এসো' বলে চলে যাওয়ার পর নয়নতারাকে আজ পর্যন্ত সে আর দেখেনি! অথচ সেদিন সেভাবে হাওদা থেকে নামায় প্রমাণ হয়, সে তো রাজবাড়িতে এসেছিল! সে কি রানীর উজিরাইন বলে ঠাট্টা করবে?

অনেকসময় ঠাট্টা করলেও রাগ যায় না। সে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। দোতলার অলিন্দ দিয়ে রানীমহলের দিকে চলতে লাগল। তখন মনে-মনে বলল : বলে গেলেই হতো আর তোমার সঙ্গে দেখা হবে না রাজু। রানীর মহলে রানী ছিলেন। কিন্তু তাঁকে তো বলা যায় না, তার সামনেও বলা যায় না, উজিরাইন কোথায়? দোতলা থেকে নেমে সে মন্দিরের দিকে চলল। সে ভাবল : মনে তো হয় সে এ বাড়িতে এলেই পূজা, মন্দির ইত্যাদির কাছে থাকে আজকাল।

মন্দিরের কাছাকাছি গিয়ে রাজচন্দ্র দেখতে পেল, কয়েকজন পুরস্ত্রী সেখানে দাঁড়িযে কথা বলছে। তার কি চিনতে দেরি হয়? আর এখন তো অবগুণ্ঠনও নেই। মাঝখানের সেই গজ বিশেক মাটি সে খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে গেল। যারা দাঁড়িয়েছিল তারাও তো তাকে দেখেছিল। কিন্তু তারা সরে যাওয়ার আগেই সে নয়নতারার মুখোমুখি দাঁড়াল, এমন যে হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারে। সে বলল, 'তুমি আসবে? না, হাত ধরে নিয়ে যেতে হবে'?

হতচকিত নয়নতারা পিছন-পিছন, কখনও পাশে, অন্দর পার হয়ে একতলার অলিন্দ দিয়ে হাঁটছে তখন, রাজু গলা তুলে বলল, 'রূপচাঁদকে বলো, হাওদা-হাতি আনবে'।

নয়নতারা বলতে গেল এভাবে কোথায়?

ততক্ষণে রাজচন্দ্র দরবারের হল্ পার হয়ে গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়েছে। সে বলল, 'তোমার কি চাদর ছাড়া খুব অসুবিধা হবে নয়ন? কাজটা আমি হয়তো ভালো করলাম না। রূপচাঁদ তোমাকে দেখে গেল, সে টোপর-হাওদা আনবে'।

তারপর সে হাসল, বলল, 'চলো না নয়ন, আজ একটু বেরিয়ে আসি'।

হাতি তখন গ্রামের পথ ছাড়িয়ে বনের দিকে চলে এসেছে। রাজচন্দ্র বলল, 'তোমার সঙ্গে কথা না-বললে আমার চলছিল না'। নয়নতারা হাত বাড়িয়ে টোপর-হাওদার ছাদ থেকে ঝোলানো পর্দাটা ফেলে মাহুত থেকে নিজেদের আলাদা করে নিল।

রাজচন্দ্র পাশের খিলান দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল নয়নতারার থেকে মুখ আড়াল করে। হেসে বলল, 'একবার দ্যাখো নয়ন, হরদয়ালের কীর্তি, গাছের উপরে বাড়ি'। কিন্তু নয়নতারা সেটাকে দেখল কি না-দেখল, রাজচন্দ্র বলল, 'নয়ন, তোমার সঙ্গে দু-আড়াই মাস দেখা হয় না। আচ্ছা নয়ন, তুমি কি আমাকে ঘৃণা করো? আমি আর রাজকুমার নেই বলে? তুমি কি দরজায় বসানো কামান দুটোর মতোই আমাকে জাল মনে করো'?

নয়নতারাকে একটু ভাবতে হল। চেষ্টা করে সে হাসি আনতে পারল না। বলল, 'তোমার খোঁজ নিইনি বললে ঠিক বলা হয় না। তোমার বাজনা মাঝে মাঝেই শুনি। হৈমীদিদি তোমার সব ব্যাপার দেখছে তো'। সে তাড়াতাড়ি নিজের কথা থেকে সরে আসতে বলল, 'এই হৈমীদিদি, সেই ছ-আনির কুমার, এদের কথা বেশ আশ্চর্য না'?

খানিকটা দূরে গিয়ে রাজচন্দ্র বলল, 'হাতিটা ছেড়ে দিই। কাছে থাকো। চলো আমরা হাঁটি। এই বনে ছোট একটা নদী আছে। তার উপরে লাটের জন্য ছোট কিন্তু মজবুত সাঁকো হয়েছিল। চলো দেখি গে'।

হাতি থেকে নেমে তারা পায়ে হেঁটে চলল।

যখন অনেক কথা বলতে ইচ্ছা করে তখনই যেন কথা বলা যায় না। সাঁকো পেরিয়ে প্রায় একশো গজ হেঁটে একটা ঘাসে ঢাকা জমি দেখে রাজচন্দ্র বলল, 'এসো বসি। দ্যাখো, পাখি ডাকছে। তুমি একবার আমার সঙ্গে শিকারে আসবে বলেছিলে, দ্যাখো আজ তা হল।

রাজচন্দ্র বলল, 'ইতিমধ্যে দু'এক বিকেলে তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম। দু-বারই শুনলাম, তুমি রাজবাড়িতে। অনুমান, রানীমহলে লুকিয়ে থাকছ'।

'হুকুম করলেই আসতাম'।

'হুকুম, নয়ন'?

নয়নতারা মুখ নামিয়েছিল, মুখ তুলে বলল, 'আমাকে কিছুদিনের ছুটি দিতে হবে, রাজকুমার। মামাবাড়ি যাব'।

'তোমার মামাবাড়িও কাশী'?

'মহাভারত পড়তে গিয়ে দেখি এখন অনেক জায়গা স্পষ্ট বুঝি না'।

'গত তিন-চার বছরেও হল না? সেবার আমি পশ্চিমে গেলে তুমিও তো কোথায় চলে গিয়েছিলে! এই তো আমি এবার কলকাতা যাওয়ার আগে থেকেই আড়াই মাস হবে দূরে-দূরে ছিলে'।

নয়নতারা যেন সময়টাকে আঙুলে গুনবে।

রাজচন্দ্র বলল, 'আমার অনুমতি দিতে ইচ্ছা নেই'।

এটাই তো নয়নতাবার ভয়। তবু সে সাহস করে বলল, 'অবুঝ হতে নেই।

রাজচন্দ্র বলল, 'বানীমা তোমাকে নিজের কাছে রেখে নিজের বস্ত্রালঙ্কারে সাজিয়ে—তোমরা ভালো জানো, হয়তো মেয়েদের ছেলে থাকার মতো একটি মেয়ে থাকাও দরকার মনে হয়—কিন্তু তোমাকে সকলের অপ্রাপণীয়া করে তুলেছেন'।

নয়নতারা জোড়াসনে বসে ছিল। তার নিজের পায়ের সোনার কামদার মোটা মলজোড়ায় চোখ পড়ল।

সেই কবে পুরনো সিন্দুক সাফ করতে গিয়ে এটা বেরিয়েছিল। নয়নতারা কৌতূহল দেখিয়েছিল। রানী তার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন—পরো তুমি। ক্ষতি কী? কিন্তু সোনা যে! নয়নতারার এই দ্বিধায় রানী হেসে বলেছিলেন—আমি পরতাম, তাতে দোষ কেটে গিয়েছে।

নয়নতারা লজ্জায় পুড়ে গেল যেন। রানী পরতে বলেছিলেন—পরেছিল। রানী ছাড়া কাউকে কি মানায়? কেউ যেন বলল—খুলে ফেলোনি কেন?

সে বলল, 'রাজকুমার, আমার স্পর্ধা, হয়েছে, আমাকে মাপ করো'।

রাজচন্দ্র বলল, 'দ্যাখো নয়ন, তুমি কী নির্দয়! আমার কথার ভুলকে ক্ষমা করো না। আমি কি তাই বলেছি? সে হেসে বলল, আচ্ছা নয়ন, তোমার সেই 'বাইচে' নামে একটা মেয়ের কথা মনে পড়ে'?

'তুমি গল্প করেছিলে বটে। সেই পিয়ানোর গায়ে নাম তো? যার তেরো-চৌদ্দ বয়সের সুঘ্রাণ ছিল'? সে বলেই ভাবল, রাজকুমার কি কলকাতার কনে সম্বন্ধে কিছু বলতে চায়? তার সম্বন্ধে কোনো অনুভূতি বা সুঘ্রাণের কিংবা তার অভাবের? তা কি বলতে দেওয়া উচিত?

কিন্তু রাজচন্দ্র বলল, 'জানো, চরণদাস, গ্রামের পোস্টমাস্টার, ওদের খুব দুঃসময়। খুব বিপদে পড়েছে। কাল বিকেলে তার বাড়ির চারিদিকে ঘোড়া নিয়ে ঘুরতে ইচ্ছা হল। চরণ আমাকে দেখেনি। আমি কিন্তু দেখলাম, বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে তার ভারি মুখটা উজ্জ্বল হল'।

নয়নতারা গলাটাকে চেপে ধরার চেষ্টায় বলল, 'দুঃসময়ের কথা বলছিলে'।

রাজচন্দ্র বলল, 'একই গল্প। কাল সন্ধ্যায় দাবা খেলতে-খেলতে বাগচী হা-হা করে হাসছিলেন। তিনি যাদের জন্য দরখাস্ত লিখে দিয়েছিলেন তারা অনেকেই তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রমাণ করেছে। হাসি দেখে আমার বলতে কষ্ট হল, ডানকান আরো এগিয়ে গিয়েছে, তাদের নামে মিথ্যা দলিল তৈরি করার মামলা আনছে। আচ্ছা নয়ন, তা সত্ত্বেও এদের মুখে হাসি দেখে কি মনে হয় না'?

'কী রাজকুমার'?

'যে এদের স্ত্রী আছে'?

নয়নতারা অবাক হল। সে একবার হাসিমুখে বলতে গেল, সেই চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু তার আগেই রাজচন্দ্র বলল, 'আচ্ছা নয়নতারা, তুমি কি কখনও-ই আমার হবে না'?

নয়নতারার চোখে জল এসে যাচ্ছে। সে অনুভব করল, কথা বলতে গেলে ঠোঁট দুটোকে শাসনে রাখা যাবে না। ফুঁপিয়ে উঠবে নাকি শেষে? সে সেসবের পাশ কাটিয়ে হাসিমুখে পৌঁছাল। বলল, 'সেই কবে থেকেই এই দ্যাখো, সেই আংটিটা আজ আবার পরেছি'।

সে যেন নিজের হাতটাকে রাজচন্দ্রর চোখের সামনে ধরবে। কিন্তু রাজকুমার হাতজোড় করেছে কি? তেমনভাবে কি কিছু বলছে? সে দেখতে পেল না, শুনতে পেল—স্ত্রীরা যেমনভাবে পুরুষের নিজের হয়?

নয়নতারা দু'এক মিনিট দম বন্ধ করে বসে রইল। নিচের দাঁত ঠোঁটে চেপে ধরে চোখের জল ঝরে না-যায় এমন করে মাথাটাকে ডাইনে বাঁয়ে দোলাল।

একসময়ে রাজচন্দ্র হেসে উঠল। 'চলো নয়ন, আজ আর শিকার হবে না'।

৩

তারা যখন রাজবাড়ির হাতায় ঢুকছে বেলা দুটোর ঘণ্টা পড়ল। নয়নতারা বলতে গেল, আজ সারাদিন স্নানাহার হল না। তখন কাছারি আবার বসেছে। কাছারির চত্বরে তো মানুষজনের ভিড়ই। হাতিটা চলছে, তা সত্ত্বেও সেই ভিড়ের দু'একজন যেন হাতিটার দিকে এগোল। হাতি বসলে বাজকুমার তাদের একজনকে চরণদাস বলে চিনতে পারল। কাছারির একজন কর্মচারী এগিয়ে এসে বলল, 'এরা সকাল থেকে হুজুরের সঙ্গে দেখা করতে এসে বসে আছে। এখন কি তাই বলে দেখা হয়'?

রাজচন্দ্র বলল, 'এদের দরবারে বসাও'।

তারা চলে গেলে নয়নতারাকে নামতে সাহায্য করল রাজচন্দ্র। বলল, 'দেখেছ, এদেরও খাওয়া-দাওয়া হয়নি আজ। তুমি কি এখন বাড়িতে ফিরবে? যদি পারো থাকো না-হয়, বিকেলে কথা বলব'।

নয়নতারাকে বাড়িতে যেতে হলেও তো রানীকে বলে যেতে হয়। অন্দরে যেতেই হবে। সকালের সেই দৃশ্যটার কথা কি এতক্ষণে সর্বত্র ছড়ায়নি? একরকম লজ্জায় নয়নতারার পা দুখানা যেন পড়তে চাইছে না। কিন্তু রাজচন্দ্র বলল, 'শোনো নয়ন, এক কাজ করো-না হয়—কাউকে বলে দাও এদের কিছু খেতে দেবে'।

চরণ তো রাজকুমারের পরিচিতই। তাদের বিপন্নতার কথা সে বরং তাদের চাইতেও বেশি জানে। তারা হয়তো এখনও সেই মামলার কথা শোনেনি যা রাজবাড়ির চরেরা সংগ্রহ করেছে ইতিমধ্যে। দরবারের আসনে বসেই রাজচন্দ্র সেজন্য বলল, 'তোমরা কী ভেবে এসেছ? আমি তোমাদের জন্য কী

করতে পারি? তোমরা কি মরেলগঞ্জের জমি ছেড়ে চলে আসতে চাইছ'?

তারা কী-বা বলতে পারে? তাদের সমস্যার কি কোনো সমাধান আছে কোথাও? চরণ দু'একবার কথা বলতে গিয়েও থেমে গেল। রাজচন্দ্র ভাবল : এই সময়ে মরেলগঞ্জের বাড়ি জমি ছেড়ে আসতেই-বা এদের কী রকম লাগবে? তার মনে পড়ল : নয়নতারা একদিন জমি সম্বন্ধে কী-সব বলেছিল। সে তাদের চুপ করে থাকতে দেখে বলল, 'আচ্ছা, এ কি সত্যি সেই জমি যার জন্য তোমাদের কষ্ট, অপমান, তা ছেড়ে আসতে কি তোমাদের খুব কষ্ট হয়? এ কি সত্যি যে সেই জমি তোমাদের আত্মীয়স্বজনের মতো আপন হয়ে যায়'?

চরণ বলল, 'সে জমি যদি আমরা ছেড়ে দিয়ে আসি, তাতে কিন্তু ডানকানেরই সুবিধা। যে কিনবে সে তো তার কথাতেই সেই নীল চাষই করবে'।

রাজচন্দ্র ভাবল : ওটা হয়তো নয়নতারার ভাবুকতা যে জমিকে অনেক স্মৃতিতে জড়ানো জননীর মতো মনে হয়। চরণ বলল, 'রাজকুমার, বাপ-পিতামোর কথা মনে এসে যায়। তাঁদের কষ্টের, আদরের, যত্নে বাড়িয়ে তোলা জমিকে ডানকানের লোভ থেকে বাঁচাতে ইচ্ছা করে। সে জমি যদি বিক্রি করতে হয়, ইচ্ছা হয় যে তা এমন কেউ নিক যে ডানকানকে ছুঁতে দেবে না'।

রাজচন্দ্র বলল, 'চরণ, তোমাকে একটু কষ্ট দিই, নায়েবমশায় এসে থাকবেন, তাঁকে এখানে একটু আসতে বলো'।

চরণ নায়েবকে ডাকতে গেলে রাজচন্দ্র পরিচয় নিয়ে জানল বাকি দুজন অমর্ত্য আর কৃষ্ণানন্দ। তাদের দুজনের এবং চরণের জমি পাশাপাশি। যোগ করলে একশো বিঘায় দাঁড়াবে। জমিগুলো সবই মরেলগঞ্জ রাজনগরের সীমা ঘেঁষে।

সে বলল, 'নায়েবমশায় খোঁজখবর করে বিলমহলে তোমাদের জমি দিতে পারবেন। হয়তো পাশাপাশি হবে না, কাছাকাছি হবে, এমন করা যাবে। কিন্তু ওটা কি হয়, যে তোমাদের মরেলগঞ্জের জমি নেবে সে ডানকানকে জমি ছুঁতে দেবে না? এমন তো করা যায় না তোমাদের মরেলগঞ্জের জমি হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। এ তো সত্যি মা নয় যে বুড়িকে মাথায় নিয়ে পালাবে'? রাজকুমার হাসল।

নায়েব এলে রাজচন্দ্র তাদের সমস্যার কথা বলে বলল, 'এদের একটা ব্যবস্থা করুন, তাই বলে ডানকানকে ধরে এনে পিটিয়ে দেওয়ার কথা ভাববেন না'।

নায়েব হেসে বলল, 'খুব কড়কে দেওয়া যায়, বছরখানেক মুখ নিচু করে চলবে। তাতে কিন্তু রানীমার মত নিতে হবে। এদের না-হয় জমি দেওয়া গেল, কিন্তু মরেলগঞ্জের মায়া তো ছাড়তেই হবে। ছেলেমানুষি কি চলে? সে-জমি যে কিনবে তাকে তো ডানকানকে মানতেই হবে। নীলের ফসল তোলা চাই'।

রাজচন্দ্র বলতে গেল, দেখলে চরণ, দেখলে অমর্ত্য! কিন্তু সে কিছু ভাবল। তার মুখের হাসিটার অর্থ ধরা যায় না, কিন্তু বোঝা যায়, চিন্তাটা বিচিত্র খাতে চলেছে। সে বলল, 'নায়েবমশায়, এরা চাইছে জমিটা এমনভাবে বিক্রি হোক যাতে বরং পতিত থাকবে কিন্তু ডানকানের জোর খাটবে না। হোক না ওটা রাজবাড়ির নামে কিংবা আমার নামে কেনা'।

নায়েব বলল, 'রাজকুমার, তা কি ভালো দেখায়? ডানকানরা খাজনা দেয় না, লীজে একবারে আগাম দিয়েছে। কিন্তু মরেলগঞ্জের দরুন লাট তো আমরাই দিই। প্রজাব জমি খাস করা যায়, আপনার নামে কেনা যায় কি'?

একজন ভৃত্য ও একজন দাসী চরণদাসদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছিল। রাজকুমার বলল, 'তোমরা কি নয়নতারা-ঠাকরুনকে চেনো? তিনি যদি রাজবাড়িতে থাকেন, এখনই একবার তাঁকে দরবারে আসতে অনুরোধ করো'। রাজচন্দ্রের মুখে একটা বিচিত্র হাসিই যেন। সে বলল, 'খাও তোমরা, চরণ'। সে যেন মনে-মনে এমন লোক খুঁজতে লাগল যে এদের জমি কিনতে পারে অথচ ডানকানকে পরোয়া করবে না।

নায়েবমশায় অনুমতি নিয়ে চলে গেল। নয়নতারা এল। এই সময়ে রাজচন্দ্র হেসে উঠেছিল। সে বলল, 'বোসো নয়ন, এরা সকলেই আমায় কিছু করতে বলছে'। সে গলা না-তুলে বলল, 'নায়েবমশায়কে আবার ডাকো তো'। নয়নতারাকে বলল, 'তুমি একদিন জমি নিয়ে বলেছিলে, এদেরও সেই সমস্যা। জমি আর স্ত্রী কিংবা মা কিন্তু এক নয়। জমিকে মাথায় করে পালানো যায় না'।

বিব্রত নয়নতারা কী বলবে খুঁজে পেল না।

রাজচন্দ্র মৃদু-মৃদু হেসে বলল, 'রোসো, নায়েবমশায় আসুন'।

নায়েব তখন কাছারি পৌঁছায়নি যখন তাকে ভৃত্য আবার ডেকে আনল।

রাজচন্দ্র বলল, 'আসুন, আসুন। লোক খুঁজছিলেন তো মনে-মনে একশো বিঘার। জমিটা আমি যদি নয়নতারার নামে কিনি'?

নায়েবও কী বলবে খুঁজে পেল না। এটা কেমন এক লজ্জার ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে না? লজ্জা এবং অবিবেচনার?

রাজচন্দ্র বলল, 'হ্যাঁ, এই ঠিক হয়েছে। তোমরা রাজি হয়ে যাও। প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিটা নয়নঠাকরুনই আমাকে দিয়েছিলেন। এদের কথাও থাকছে। নয়নঠাকরুনকে ডানকান নীল বুনতে বলবে না নিশ্চয়। তাছাড়া, নয়ন, এরা যেমন চাইছে তাও নয়। জমিকেই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যায়। ওটা এক একশো বিঘার দিঘি হতে পারে'।

নয়নতারা খুব মৃদু করে বলল, 'রাজকুমার'! কিন্তু চাদরের ঘোমটা থাকায় সেই মৃদুস্বরকে যে-ভ্রূভঙ্গি অর্থবহ করবে তা প্রকাশ পেল না।

রাজকুমার বলল, 'এই ভালো হল, নয়নতারা। ও জমিতে আর চাষ হতে হয় না। ও জমি আমার চাই। বুঝেছ তোমরা? বৈশাখের আগেই, নয়ন, ওই মাটিটুকু কেটে উড়িয়ে দেওয়া যাবে। একটা দিঘি, কিন্তু এমনভাবে কাটবে যেন বৈশাখে জল আসে। তারপরে লম্বার দিকটা চওড়া করে আবার কাটাব, ফের লম্বার দিকটাকে চওড়ার দিক করে দিলে তোমার একশো বিঘা ঢেকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা দীঘিই হবে। তোমরা খাও। আমি এবার উঠব। নায়েবমশায়, আপনি এদের আগাম দিয়ে বায়নাপত্রে দস্তখত নিয়ে রাখবেন। কিংবা নগদে দাম চায়, দিয়ে দেবেন, আর তা আজই। নয়নঠাকরুনের যদি সই করতে হয়, ইনি আপাতত রাজবাড়িতে থাকবেন'।

নয়ন স্তম্ভিত, নায়েবমশায় বাক্‌রুদ্ধ। তখন বোধ হয়, চরণদাসদের মাথা ঝিমঝিম করছে।

নয়নতারা কিছু বলতেই হবে এ রকম ভেবে মিনমিন করে বলল, 'আমাকে কি সই করতে হবে'?

নায়েব কথা খুঁজে পেয়ে বলল, 'তা তো করতেই হবে, মাঠাকরুন'।

রাজু বলল, 'চলো নয়নতারা, সারাদিন আজ স্নানাহার করতে দিলে না। কী পুকুর তোমার মাথায় ঢুকেছে! অবশ্য একশো বিঘার দীঘি না-করে একটা ভালো বাড়ির জন্যও জমি ছেড়ে রাখা যায়। তোমার বাড়ি হলে আমিও কি যাব না মাঝে মাঝে? চরণ, অমর্ত্য, কৃষ্ণানন্দ, খাও তোমরা। না-খেয়ে যেয়ো না। ভয় নেই তোমাদের। নায়েবমশায় তোমাদের জমির ন্যায্য দাম দেবেন'।

তখনকার দিনেও এমন মত ছিল, 'ধনাঢ্যদের পীড়া' একসময়ে প্রকাশ পাবেই। কাছারির লোকেদের যাদের ঘটনাটা সেই সন্ধ্যার আগেই টাকার অঙ্কসমেত জানা হয়েছিল তাদের মনোভাব এ রকম হল: সম্বন্ধটা যে-কোনোভাবেই প্রকাশ পেতে পারত। তাদের কেউ-কেউ এ রকম চিন্তা করল বরং, 'গোলমাল বাধার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। সে গ্রামে তখন ন্যায়নীতি নিয়ে চিন্তা করার লোকও ছিল, যাদের পক্ষে ধনাঢ্যদের পীড়া বলেই উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এ রকম সংবাদ কাছারির বাইরে যেতে কিছু সময় লাগে, কিন্তু যেহেতু নরেশ, সুরেন প্রভৃতি জমি বিক্রির ব্যাপারটা চরণের সঙ্গে আলাপ করেছিল, সংবাদটা নিয়োগীর

কানে একটু তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেল।

তাকে তো এখন অধ্যক্ষের কাজও কিছু-কিছু করতে হচ্ছে, সুতরাং সে-ও দু-একদিন সংবাদটাকে নিজের মধ্যে ধরে রাখতে বাধ্য হল। কিন্তু রবিবার এসে যাওয়াতে সে সকালের দিকেই বাগচীর কুঠিতে উপস্থিত হল। বিষম বিপদ যে, এই ঘৃণার ব্যাপারটা সেখানে কীভাবেই-বা আলোচনায় আনা যায়! অন্যত্র এই এক সুবিধা থাকে যে গৃহের মহিলারা আলোচনায় যোগ দেন না, অথবা ইংরেজি বোঝেন না। এক্ষেত্রে তো ইংরেজিতে আলোচনারও সুবিধা নাই। কিন্তু কর্তব্য তো কর্তব্যই বটে। তাছাড়া ঋষিপ্রতিম ওয়ার্ডসওয়ার্থ কি কর্তব্যকে স্বয়ং ঈশ্বরের গম্ভীরা কন্যা বলেন নাই? অন্যদিকে সেই-বা কলকাতার সমাজে কীভাবে মুখ দেখায়? দিদি ব্রহ্মঠাকুরানীই-বা অতঃপর কী করেন? না-না, এ আমাকে বলতে হবে, অবিবাহিত একটি স্ত্রীলোককে পুকুরসমেত বাগানবাড়ি করে দেওয়াকে তাই বলে, ধনাঢ্যদের পীড়াই।

সর্বরঞ্জন সেদিন যত কম কথায় সম্ভব বাগচীর সঙ্গে আলোচনা করবে স্থির করে নিল। সে প্রায় বসতে-বসতেই বলল, 'এটা আমাদের স্কুলের বিষয় নয়, এ থেকে আমরা কানে আঙুল দিয়ে দূরে থাকতে পারতাম, কিন্তু একটি কুমারীকন্যার সর্বনাশকে তো আর নিঃশব্দে উপেক্ষা করা যায় না'।

বাগচী ও কেট কারোপক্ষেই সর্বরঞ্জনের বক্তব্য বুঝতে সহজ হল না। বাগচী এমন কী কল্পনা করল, নিয়োগী হয়তো কৈলাশ পণ্ডিতের সেই অবিবাহিতা কন্যার কথা কিছু বলছে। বাগচী বলল, 'এ সম্বন্ধে কি কাছারিতে প্রতিকার চাওয়া হয়েছে'?

সর্বরঞ্জন বলল, 'সেটাই তো বিপদের উৎস। আপনি কি শোনেননি? নয়নতারা নামে এক অবিবাহিতা স্ত্রীলোককে রাজকুমার বাগানবাড়ি কিনে দিচ্ছেন, তাও প্রকাশ্যে'?

বাগচী প্রায় হেসে ফেলল, কেটের মুখে তো হাসি খেলা করলই! সে খুব মৃদুস্বরে বলল, 'সেন্ট বটল'?

সেন্ট বটলের ব্যাপারটা মাথায় না-ঢুকলেও সেই সকালে নিয়োগী বাগচী এবং কেটকে প্রায় বিপর্যস্ত করে দিতে পেরেছিল। সে অনেকবার শুরু করে, মাঝপথে ছেড়ে দিয়ে, আবার শুরু করে, ডাইনে-বাঁয়ে মাথা দুলিয়ে, দু-একবার লাল হয়ে বাগচীকে বুঝিয়ে দিতে পারল—নয়নতারা একজন অবিবাহিতা স্ত্রীলোক। তাকেই রাজকুমার বাগানবাড়ি তৈরি করে দিচ্ছেন, ঠিক তখনই, যখন কলকাতার এক কুসুম-কোমল কুমারীকন্যার সঙ্গে তার বিবাহ প্রায় স্থির। সে কী ক'রে-বা এই পাপে অংশ নিতে পারে? কেননা এখানে সত্য গোপন করা কি পাপে অংশীদার হওয়া নয়? বিশেষ সেই কন্যা যখন হিন্দু নয়, বরং নবধর্মের বিশিষ্ট সদস্য, এমনকী ইংরাজি-দক্ষা আধুনিকাও বটে।

বাগচীকে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকতে হল। তার এবং কেটের একটা আনন্দোজ্জ্বল ধারণা যা রাজকুমারের বিবাহ সম্বন্ধে তাদের আনন্দের কারণ হয়েছিল সেটা কি কলঙ্কিত হবে? কেটের মুখটা শুকনো দেখাল। কিন্তু বাগচী বলল, 'একে অন্যের কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারে না। আমি আপনাকে এই বলতে পারি, রাজপরিবারে এ রকম ঘটে থাকে। আপনি প্রচার করবেন কিনা আপনার বিবেচনার বিষয়'।

সর্বরঞ্জন নিয়োগী নিতান্ত চিন্তাকুল মুখেই চলে গেল।

সে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে কেট জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি এখন রাজবাড়িতে যাচ্ছ'?

'হ্যাঁ, দশটা বাজে। আমি তো কাছারির নিয়মে বসি না'। বাগচী রাজবাড়িতে যাওয়ার জন্য টুপি হাতে করল। তার মুখটা অস্বাভাবিক কঠোর দেখাল।

প ঞ্চ দ শ প রি চ্ছে দ

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, বসন্ত যেন আগে এসেছিল রাজনগরে। এখন তো চৈত্র এসে গেল। অনাবৃষ্টিতে নদীর জলও শুকিয়ে উঠছে। কিন্তু দোলও এসে পড়েছে। ঘাটের কাছে সকালের থেকেই যেন প্রচ্ছন্ন একটা জ্বালা অনুভব করা যায়। খরার কথা উঠে পড়ছে। স্মরণকালে এমন হয়নি।

সেদিনটা অন্যদিনের মতোই। বাগচীকে রাজবাড়িতে যেতে হয় বলে সে বরং বেশ সকালেই চরণের ডিসপেনসারিতে যায়। কিন্তু রোগী আজকাল যেন কমেছে। বাগচী বেশ গম্ভীরভাবেই বলল, 'দ্যাখো, চরণ, বাদলা ভাব না-থাকায় জ্বর, সর্দি, পেটের পীড়া কম'। চরণও তেমন গম্ভীরভাবেই মন্তব্য করল, 'এ তো শুকনো বসন্ত, বসন্ত না লেগে যায়'। বাগচী বলল, 'রোগটার সঙ্গে কিন্তু ঋতুর যোগ নেই'।

এটা তো দুজনেই লক্ষ্য করছে রোগীর সংখ্যা খুবই কম। বিশেষ মরেলগঞ্জের রোগী গত কয়েকদিনে একটিও আসেনি। সেখানে পুরাতন রোগের রোগী কোনো অঞ্চল থেকেই কম নয়। বাগচীর একবার মনে হল সে জিজ্ঞাসা করে, মামলার খবর চরণ আর-কিছু শুনেছে কিনা। কিন্তু তার বরং এই অদ্ভুত অনুভূতি হল, ডানকান মামলা করছে, উকিল-ব্যারিস্টারে অনেক খরচ করবে, তার চাইতেও বড় কথা সে অনেকগুলি লোককে হলফ করে ঈশ্বরের নামে মিথ্যা বলতে বাধ্য করবে। এই সময়ে একটি অপরিচিত ভীত চেহারার বালককে চরণেব বাড়ি থেকে বেরোতে দেখে বাগচী তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। চরণ বলল, 'অমর্ত্যর ছেলে। অমর্ত্যর স্ত্রী কন্যা এখনও মরেলগঞ্জে আছে। দোলের পূজা করে তারা রাজনগরে চলে আসবে। কৃষ্ণানন্দও সেদিন থেকেই উঠে আসবে। আপাতত তারা চরণের বাড়িব কাছেই তারই জমিতে ঘর তুলে নেবে'।

বাগচী বলল, 'ওদের তো মরেলগঞ্জের সঙ্গে কোনো যোগই থাকল না'।

রাজবাড়ির দিকে যেতে-যেতে বাগচীর মনে হল, পড়া টাইমসগুলোকে ফেরত দিয়ে নতুন টাইমস আনতে হয়। সুতরাং সে কুঠিতে ফিরে তার স্টাডিতে ঢুকল। কেট এখন খানিকটা সময় বিশ্রাম করে। অনেকসময়ে বাগানে গিয়ে বসে।

সুতরাং তার খোঁজ না-করেই সে স্টাডি থেকে বেরিয়ে আসছিল। এই সময়ে তার মনে হল, পার্লারে কেউ কথা বলছে। হয়তো রাজকুমার—এই ভেবে উঁকি দিয়ে সে অবাক হল।

পার্লারে রাজকুমারের বদলে ওসুলিভান। বোঝা যায় সে কিছুক্ষণ এসেছে। তার সামনে ধোঁয়াচ্ছে এমন কফির কাপ। বাগচী হাসিমুখে বলল, 'বনাত কিনছ নাকি, কেট? নাকি সিল্ক, এখন গরম পড়বে তো'?

কেটও হেসে বলল, 'না। মিস্টার ওসুলিভানের সঙ্গে গল্প করছিলাম'।

'বেশ, করো। আমি রাজবাড়িতে যাচ্ছি'। বলে বাগচী বেরিয়ে গিয়েছিল।

লাঞ্চে কেট বলল, 'ভারি মজার কথা বাগচী, ওসুলিভান বলেই ফেলল, আমিই নাকি প্রথম ইউরোপীয়ান মহিলা যে তাকে বসতে বলেছে, নিজে থেকে কথা বলেছে, বাড়িতে ঢুকতে আমন্ত্রণ করেছে'।

বাগচীর মন তখন প্লেটে, মনের অন্য অংশে বোধ হয় কেটের সান্নিধ্য ও রাজকুমারের ফেনসিং অভ্যাসের কথা সমানভাবে। সে মনের উপরিভাগ থেকে বলল হেসে, 'তাহলে দ্যাখো হেট দ্য সিন, নট দ্য সিনার—এই উপদেশটা কত কম লোকে মানে। তাছাড়া দেখা যাবে হয়তো ওসুলিভান দরিদ্র বটে, পিতামাতার সিনের ফলভাগী, নিজে সিনার নয়'।

দোলউৎসবের আগের দিন ছিল সেটা। রাজবাড়িতে উৎসবের আয়োজন শুরু হয়েছে। রানী নয়নতারাকে

বললেন—তোমার কাজ শেষ হতে চায় না। বিকেলে বেড়াতে যাবে এমন সময় হয় না। তুমি কি নতুন জেটি ছাড়া আর কিছু দেখেছ? কাল সন্ধ্যার পরে শব্দ শুনে জানা গেল সেই অ্যালবেট্রস জাহাজ নাকি আবার ভিড়েছে ঘাটে। ভোররাতেও তার ভোঁ শুনলাম। নয়নতারা তো বুঝতেই পারছে, রানীর বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছা। সে বলল—পালকি দিতে বলব রানীমা?

রানীর সেদিন হাতি পছন্দ হল। তাঁরা দুপুর শেষ হওয়ার আগেই বেরিয়ে পড়লেন। তাতে অসুবিধা হল না। টোপর-হাওদার চারদিকের জানলার মাথায় বাইরে ছড়ানো ঢাকনা থাকে, জানলায় রেশমের পর্দাও। রানী সেদিন জয়নালকে পছন্দ করেছিলেন। অনেকটা উঁচুতেই সুতরাং সেই হাওদা। খানিকটা দূরে গিয়েই রানী বললেন—হাওয়া দিচ্ছে কিন্তু এখানে।

সেই বিকেলে অনেকটা সময় তাঁরা বেড়ালেন। নতুন জেটিতে খানিকটা দূরে থেকেই একটা গাছতলায় হাতি থামিয়ে তাঁরা অ্যালবেট্রসকে দেখলেন। রানী বললেন—কত জোরে-বা চলে! যাই বলো বাপু, ইংরেজদের যথেষ্ট বুদ্ধি আছে। একেবারে দাগাবাজ নয়।

নয়নতারার হঠাৎ মনে হল, এটা কিন্তু সুলুপ নয়। দু-চারটে বন্দুকের গুলিতে এটা বানচাল হয় না।

রানীও বললেন—আচ্ছা, নয়ন, এটা পতাকা নয়? ওর নামই কি ইউনিয়ন জ্যাক?

সেদিন রানীর শখ হল ফরাসডাঙার পথে ঘুরে বেড়াতে। মন্দিরের পাশ দিয়ে তাঁরা ফরাসডাঙার প্রথম পথগুলোকে দেখে-দেখে বেড়ালেন। অবশেষে যখন বিকেল হয়ে গিয়েছে রানী মাহুতকে বললেন, এদিকে একটা ডিয়ার পার্ক ছিল। চেনো? নয়নতারাকে বললেন—জানো নয়ন, জমিটা চারপাশের জমি থেকে বেশ উঁচু। একসময় হরিণ থাকত, এখন আর নেই। নয়নতারা কৌতূহল প্রকাশ করলে, রানী হেসে বললেন—কী জানি, খেস্টান তো। নিজেই খেয়েছিল হয়তো।

নয়নতারা বলল—দেখুন, রানীমা কত পাখি! হাঁস নয় তো? নাকি বক?

রানী দেখতে না-পেয়ে এদিক-ওদিক চাইলেন। হাতিটা তখন কয়েক পা মাত্র চলেছে। নয়নতারা তার দিকের জানলা দিয়ে ঝুঁকেছিল, হঠাৎ মুখ সরিয়ে আনল, বলল—রানীমা, সাহেব যে!

ততক্ষণে রানীমার চোখেও পড়েছে। হাতিটা এখন যেখানে তা থেকে স্পষ্টই তিন-চারজন শ্বেতাঙ্গকে ডিয়ার পার্কের টিলার কাছে দেখতে পাওয়া গেল। রানীমা হাতিকে গাছের আড়ালে নিতে বললেন।

নয়নতারা জিজ্ঞাসা করল—অ্যালবেট্রসের নাকি? চড়ুইভাতি করছে?

রানী বললেন—সোভান, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, এবার ফিরে চলো।

সেদিন সন্ধ্যার পর রাজকুমারের কাছে বিদায় নিয়ে বাগচী রাজনগরে অগ্রগতির কথা ভাবছিল। রাজকুমার বলেছিল, গ্রামের পাশ দিয়ে রেললাইন গেলে গ্রামের উন্নতি হয় কিনা, হলে তা কেন হবে? বাগচীর মনে হচ্ছিল সে ভালো যুক্তি দিতে পারেনি। কিন্তু কথাটা উঠেছিল সন্ধ্যায় বাতাসে ভেসে আসা স্টিমশিপের হর্ন থেকে। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করেছিল, ওরা কি এখন যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করবে নিয়মিতভাবে? তাহলে তো একটা স্টেশনও করতে হয় ওদের। সেই স্টেশন থেকেই রেলের কথা উঠেছিল।

চিন্তা বিচিত্র গতি নিয়ে থাকে। রাজনগরের অগ্রগতির থেকে বাগচীর মন চরণদের সমস্যায় চলে গেল। বিষণ্ণ মনে সে ভাবল, ভালো হবে বলে যা কিছু করেছে তার ফলেই তারা আরো বিপন্ন হয়ে পড়ল। অন্তত দুটো পরিবারকে উদ্বাস্তু হতে হল।

তার এ রকম মনে হল, যা তার সাধ্যাতীত ছিল তা করতে গিয়েই এই বিপত্তি। তার এ রকমও মনে হল, চরণের চরিত্রে অনেকখানি ছিল আদর্শবাদ। সেই আদর্শবাদ এরপরে আর কখনও মাথা তুলতে পারবে কি? এ অবস্থায় তার এরকমও মনে হল, পাদরির পক্ষে বাইবেলের বাইরে যাওয়াই ভুল হয়েছে।

সে-রাত্রিতে ডিনারের আগে-পরে সে চিন্তা করার জন্য অনেকক্ষণ স্টাডিতে বসে রইল।

তার মনে পড়ল রাতের পর রাত জেগে মেমোর‍্যান্ডামগুলোকে তৈরি করেছিল। সে কিছু পড়ার জন্য বুকশেল্‌ফটাতে খুঁজল কিছুক্ষণ, কিন্তু কিছুই যেন পছন্দ হল না। বরং লেখার অভ্যাসটাই তাকে প্ররোচনা দিতে থাকল।

হঠাৎ বুদ্ধিটা মাথায় এল তার। সে অস্ফুটস্বরে বলল : না, চরণ, আদর্শবাদের মৃত্যুটা অত সহজে মেনে নেওয়া যায় না, যায় কি? না, চরণ। তুমি তো তাহলেও রোগ সারাবে, কেমন কিনা?

সে আর-একটু ভাবল। মজা পেয়ে মিটমিট করে হাসল। নিজেকে বলল, এতক্ষণ বুদ্ধিটা আসেনি। এতেই প্রমাণ হয় আজকাল তেমন তীক্ষ্ণ করে সে ভাবে না আর। সে উঠে ডায়েরি-ক্যালেন্ডার খুলে তারিখ খুঁজল। গুড ফ্রাইডের তারিখটাকে পেয়ে মনের আনন্দে হেসে ফেলল। সেই পুনরুত্থানের সূচনা নয়? যখন আদর্শবাদ মৃত্যুর অতীত হয়? আঙুলে গুণে দেখল গুড ফ্রাইডের আর পাঁচদিন বাকি।

সে কাগজ-কলম টেনে নিয়ে তার চেয়ারে বসে পড়ল। পারতেই হবে, নিজেকে বলল : না-পারলে চলবে কেন? সে মনে-মনে চরণকে বোঝাল, চিকিৎসা তুমি ভালো শিখেছ বটে, কিন্তু ইংরেজি মেটেরিয়া মেডিকা বুঝতে তো অসুবিধা হয়ই। বাংলায় হলে? আপাতত বারোটা পলিক্রেস্ট।

বাগচী পাঁচদিনে বারোটা প্রধান ওষুধের রোগলক্ষণ, নিজের অভিজ্ঞতা, এবং মেটেরিয়া মেডিকার অনুবাদের সাহায্যে লিখতে শুরু করল।

সেদিন রাত এগারোটার সময় কেট এসেছিল একবার খোঁজ নিতে। বাগচী হেসে বলল—যাচ্ছি ডারলিং, কিছুই না। প্রকৃতপক্ষে গুড ফ্রাইডের কথা মনে হল। তুমি যাও, আসছি এখনই।

২

সকালটা অন্যদিনের মতোই শুরু হয়েছিল চরণের। বনদুর্গা জল পান তামাক দিয়ে বলল, 'আজই অমর্ত্যমামাদের শেষ দোল মরেলগঞ্জে, তুমি তোমার ছেলে, আর অমর্ত্যমামার ছেলেকে নিয়ে একবার যাও'। চরণ এসব ব্যাপারে বনদুর্গার কথা সহজেই মেনে থাকে। কিন্তু আজ সে বলল, 'তার মন ভালো লাগছে না। দোলের আর আনন্দ কোথায়'?

চরণ যখন কৃষ্ণানন্দের বাড়ির কাছাকাছি তখন বেলা দশটা বাজে। অন্যান্যবার সে কি এ রকম সময়ে আসে, কিংবা আরো আগে? অন্যান্যবার এ সময়ে মৃদঙ্গের শব্দ শোনা যায়। সে ভাবল : লজ্জা হতেই পারে। মানুষ যখন কেবলই হেরে যেতে থাকে তখন তার তো মনে হয়ই আমার আবার উৎসব কেন? আর আজ কিনা মদন-বিমোহন যাঁর রূপ, তাঁকে রং দিয়ে, ফুলের সৌরভ দিয়ে সাজাবে। বোধ হয় চুপচাপ ফিরে যাওয়াই ভালো।

অমর্ত্যর বাড়ি আগে পড়ে। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নিঃসাড় দেখে সে ভাবল : সকলেই তাহলে কৃষ্ণানন্দের বাড়িতে পূজার কাজে। সে নিজেকে বোঝাল, তা ভালো, বিপদে একত্র হতে হয়। কৃষ্ণানন্দর বাড়িতে মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। তার বাইরের দিকের ঘরেই বেশ কয়েকজন মানুষ। চরণ ঢুকতে ঢুকতে দেখল কৃষ্ণানন্দ ছাড়াও পাড়ার দু-চারজন পুরুষ আছে, একপাশ ঘেঁষে কৃষ্ণানন্দর পরিবার ছাড়াও স্ত্রীলোকও কয়েকজন। চরণকে ঢুকতে দেখেই তাদের একজন হু-হু করে কেঁদে উঠল। এসবক্ষেত্রে মেয়েদের দিকে চাওয়া হয় না। কিন্তু আনন্দের দিন তো বটে, তখন এ-রকম হল কেন? যেন এই ভেবে চোখ তুলে চরণ দেখল, যে কেঁদে উঠল সে অমর্ত্যর স্ত্রী বটে।

কৃষ্ণানন্দ বোধ হয় নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করছে যদিও সেই প্লাবনে পাড় ভেঙে পড়া থেকে বাঁচানোর মতো মহীরুহ সে নয়। সে তো নিজেই থরথর করে কাঁপছে। সে বলল, 'দ্যাখো, চরণ, এই চিঠিটা অমর্ত্যর বিছানায় ছিল'।

ফাঁকা কাগজে একছত্র লেখা : 'চললেম, সখি'। অমর্ত্যর বাইরেটা শক্ত ছিল, বলবান ছিল সে, কিন্তু রসিকতা ছিল নিজেদের মধ্যে। এটা তার স্ত্রীকেই লিখে থাকবে। কিন্তু এই দুঃসময়ে এটা কী রকম রসিকতা? স্ত্রী বলেছে, অমর্ত্য তার মাথা খারাপ হওয়ার আগে কখনও কখনও তাকে সখি বলত বটে। তাই বলে ভোররাত থেকে মানুষটার দেখা নেই! তাছাড়া কৃষ্ণানন্দ কোমরের কাপড় থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে বলল, 'আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলাম চরণ, এই চিঠিটা তোমাকে লেখা ইংরেজিতে, তাই আমি পড়িনি। চোপ, ফের কাঁদছ তোমরা'! এই বলে ঘরের স্ত্রী-পুরুষকে ধমকাতে গিয়ে কৃষ্ণানন্দ নিজেই ভ্যাক করে কেঁদে ফেলল।

কৃষ্ণানন্দ ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, 'গোপালদার এক কিষাণ কুতঘাট থেকে এদিকে আসছিল, তার হাতে এই চিঠিটা দিয়েছে সেই ওসুলিভান'।

চিঠিটা ইংরেজিতে লেখা নয়, চরণকে লেখাও নয়। এতক্ষণ এই মিথ্যা ছলনায় কি কৃষ্ণানন্দ এই বিপন্ন বিহুল লোকগুলিকে শান্ত রাখছিল? সে কি ভেবেছিল এত বড় দুর্ভাগ্যের কথা প্রকাশ করে শত্রুকে হাসতে দেওয়া যায় না? তার হয়তো মনে হয়েছিল কিছু করতে হলে চরণের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়া দরকার।

অমর্ত্য লিখেছে :

> কৃষ্ণদাদা, তুমি আমাকে মানুষ করেছ। তোমাকে ছেড়ে যেতেও কষ্ট। সাহেব বলেছে, সে-দেশ নতুন, সেখানে নীলচাষ নাই। জমি বিক্রির টাকা রাজকুমারের কাছে গচ্ছিত আছে। তা দিয়ে বউ-ছেলেকে. .(লেখাটায় এখানে জলের দাগ)...চরণকে বলো সে যেন আমাকে না-খোঁজে। মাঝরাতেই আমরা দূরে চলে যাব। এইটুকু শুনেছি, সে দেশের নাম মরিসস্। অ্যালবেট্রস... (এখানে লেখায় জল পড়েছে, তা মোছার চেষ্টায় লেখাও মুছে গিয়েছে)।

চরণ লাফিয়ে উঠে ছুটতে শুরু করল। সে তো জানেই কুতঘাটের নতুন জেটিতে অ্যালবেট্রস বাঁধা আছে।

সে কুতঘাটে পৌঁছে অ্যালবেট্রসকে দেখতে পেল না। একটা জেলেনৌকো ভিড়ল। চরণ তাকে জিজ্ঞাসা করতেই জানল মাঝরাতে মাইলচারেক ভাঁটিতে তারা কলের জাহাজকে পেরিয়েছে বটে।

চরণ ফোঁপাতে লাগল। সে বুঝতে পারল না, যা কাঁপছে, ভেঙে পড়তে চাচ্ছে, তাকে চোখে দেখতে দিচ্ছে না, তা আলো-ঢালা-নদীর জল কিনা।

ষো ড় শ প রি চ্ছে দ

রানীর পক্ষে সংবাদ পাওয়া কঠিন নয়। কাছারির লোক ছাড়াও তাঁর নিজেরও তো সংবাদ সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন সূত্রে খবর পাওয়া যেত বলেই তো তার কাছে পৌঁছানো সংবাদকে নির্ভুল মনে করা হতো। সিদ্ধান্ত নিতেই যেন দেরি হচ্ছে। তিনি জানেন অ্যালবেট্রসের লোকেরা চড়ুইভাতি করতে নামেনি। তিনি জানেন সেই সাহেবের দলে মরেলগঞ্জের নীলকররা ছিল ; কালেক্টর, যার নাম ম্যাকফার্লান ছিল ; কলকাতা থেকে আসা এক সাহেব ছিল, যার নাম সিবাস্টিয়ান। বলে, সে নাকি পাদরি। তারা ডিয়ার পার্কের টিলার উপরের দিকের কয়েকটা মেহগ্নি গাছ ইতিমধ্যে কেটেছে। তারা সেদিন জরিপ করছিল। ওখানে একটা চার্চ বসাবে। তারা জায়গাটাকে খুব পছন্দের মনে করেছে। এমন ঢেউ খেলানো জমি আর এদিকে কোথায়? অন্যদিকে প্রজাও নেই, পিয়েত্রোর খাসে ছিল। কাউকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও নেই। চার্চ আর মিশনারি সাহেবদের বাংলোর পক্ষে এমন জায়গা আর হয় না। সামনের গুড ফ্রাইডে,

পবিত্র দিন, সেদিনই চার্চের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে। চার্চের নামও নাকি হবে চার্চ অব দ্য হোলি অ্যাসেনশন।

শেষ পর্যন্ত সেদিন সকালে রানী তাঁর মহলের অলিন্দ দিয়ে চলতে-চলতে বললেন, 'রূপসী, রূপচাঁদকে ডাকো'। রূপচাঁদ উঠতে-উঠতে তাঁকে সিঁড়ি দিয়ে দরবার হলের দিকে নামতে দেখল। রানী রূপচাঁদকে বললেন, 'নায়েবমশায়কে দরবার হলে আসতে বলো'।

রানী দরবারের ঘরে বসতেই রূপসী জানাতে এল রূপচাঁদকে সে খবর দিয়েছে। রানী মিষ্টি করে হেসে বললেন, 'রূপী, একবার রাজকুমারের মহলে যাও। রাজকুমারের সময় থাকলে জানিও, আমি কথা বলব'।

যদি বলা হয় নায়েবমশায় কিংবা হরদয়াল তখন জানত না চার্চের কথা, তবে বলতে হয় দুজনেই বয়সের ভারে শ্লথ হয়ে পড়েছিল। নায়েব শুনে নিজেকে বলেছিল—তাতে তোমার কী-রে বাপু? যে খবর এনেছিল তাকে বলেছিল, দূরে-দূরে থাকো গা। হরদয়ালকে খবরটা দিয়েছিল বাগচী নিজে। আবার রলের চিঠি পেয়েছিল বাগচী। সে এই ভাবতে চেষ্টা করেছিল, রলে হয়তো মরেলগঞ্জের এবং ইন্ডিগো কমিশনের কথা জানে না। সে ভাবছে, হয়তো এখনও সব আগের মতোই আছে। কিন্তু সংবাদটা হরদয়ালকে জানানো দরকার যদিও রলের চিঠিব প্রস্তাব মতো হরদয়ালকে অনুকূলে আনার চেষ্টা সে আর করতে পারে না।

হরদয়াল ও নায়েব, প্রায় একইসঙ্গে এসেছে তারা, বসলে বানী বললেন, 'ফরাসডাঙায় চার্চ হচ্ছে'?

'আজ্ঞা, হাঁ'।

'শুনেছ কালেক্টর নিজে নাকি উদ্যোগের পিছনে'।

নায়েব বলল, 'অতটা শুনিনি'।

রানী একটু ভেবে বললেন, 'এবার লাটের দিন এখনও আসেনি। গত সনের ফরাসডাঙার লাট নাকি পিয়েত্রোর উকিল দয়ালকৃষ্ণ দিয়েছে'।

হরদয়াল বলল, 'এ রকম কিছু অসম্ভব নয়। নতুবা গত সনে ডাকে উঠত'।

নায়েবমশায় বলল, 'গৌরী খবরাখবর নেয়। সে বলেছিল, পিয়েত্রো মৃত্যুর আগে দয়ালকৃষ্ণকে এই মর্মে আমমোক্তারনামা দিয়েছে যে ৬১ সন তক সে আদায় করবে এবং লাট দিতে থাকবে'।

হরদয়াল ভেবে বললে, 'এটা একটা আইনের ব্যাপার দাঁড়াচ্ছে, উকিল তো ওয়ারিশ নয়'।

রানী বললেন, 'ওয়ারিশ নেই বলে, লাট দেওয়া সত্ত্বেও কালেক্টর কি ওটাকে খাস করে নিচ্ছে মনে করো'?

হরদয়াল বলল, 'খাস এখনও করেনি, চার্চের সাহেবদের অনুমতি দিয়েছে, পবে খাস হবে স্থির করেছে হয়তো। চৈত্র শেষ হতে আর ক-দিন'?

রানী যেন খুব লজ্জিত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'অথচ, দ্যাখো, ভেবেছিলাম ওই টিলাটায় একটা সুন্দর বাড়ি হয়। আবার হয়তো ডিয়ার পার্ক হয়ে ওঠে'।

হরদয়াল বিমর্ষ বোধ করল, কারণ উত্তরটা সুখের হয় না। নায়েব ভাবল : রানী কি ভেবেছিলেন যেমন শিবমন্দিরের বেলায় তেমন এই প্রাসাদের ব্যাপারে জবরদখল করে বেওয়ারিশ পিয়েত্রোর খাসজমি রাজবাড়ির সম্পত্তি করে নেবেন?

নায়েব বলল, 'রায়মশায় ঠিকই বলেছেন। ওটা আইনের প্রশ্নই দাঁড়াচ্ছে। মৃতের আমমোক্তারনামাও অচল। যদি-বা লাট জমা পড়ে থাকে তা কিন্তু পিয়েত্রো জীবিতই এ রকম বিশ্বাসে'।

রানী ভাবতে লাগলেন। একবার তাঁর মুখ রাঙা হয়ে উঠল, একবার তাঁর সুন্দর ছোট কপালটা যেন ছায়া পড়ে বিবর্ণ হল। তিনি হঠাৎ বেশ জোর দিয়ে বললেন, 'না, তা হয় না। ফরাসডাঙার কিছুই খাস হতে দিতে পারি না'।

এই সময় রাজকুমার বাগচীকে নিয়ে দরবারে এসে বসল।

রানী তা দেখে বললেন, 'রাজু, পিয়েত্রোর ফরাসডাঙা সরকার খাস করার মতলব নিয়েছে বোধ হয়'।

রাজকুমার একটু ভেবে বলল, 'আপনার মন্দিরটাকেও দখলে নেবে নাকি'?

রানী বললেন, 'তুমি এখন বড় হয়েছ, রাজু'। একটু থেমে বললেন, 'শুনুন নায়েবমশায়, শোনো' হরদয়াল। ওটা আমার চাই'।

নায়েব বেশ বিচলিত হল। হরদয়াল বলল, 'কী করে তা পারা যাবে যদি ওটা লাটের নিলামে ডাকার সুবিধা না-হয়? আমরা জানি না কালেক্টর কলকাতায় পিয়েত্রো সম্বন্ধে কিছু লিখেছে কিনা, সেখান থেকে খাস করার মতো আনিয়েছে কিনা রেভেনু বোর্ডের'।

রানীর ঠোঁটের কোণ দুটি শক্ত হল। বললেন, 'তাহলে রেভেনু বোর্ডের সঙ্গে লড়তে তৈরি হও'।

নায়েব বলল, 'তার আগে কিন্তু কালেক্টর চার্চ তোলার অনুমতি দিয়ে বসেছে। চার্চ উঠে যাবে'।

রানী বললেন, 'এমন কি কেউ নেই যে টিলাটাকে আমার দখলে এনে দিতে পারে? আমি নতুন বন্দোবস্তে তাকেই ফরাসডাঙার পত্তনিস্বত্ব দেব'।

হরদয়াল বলল, 'দখল করে নেওয়ার ঝুঁকি আছে এক্ষেত্রে। তাছাড়া, রেভেনু বোর্ডের সঙ্গে মামলা লড়ে যাওয়ার জন্যই এমন কিছু দখল নেওয়া যায় না'।

রানী বললেন, 'আমরা বিলেতে প্রিভি কাউন্সিলেও যেতে পারি তো'?

হরদয়াল মৃদু হেসে বলল, 'রানীমা, মামলায় তো অন্তত কিছুটা যুক্তি থাকবে। বেওয়ারিশ একজন ফরাসির সম্পত্তির ব্যাপারে কালেক্টরের আদেশকে অগ্রাহ্য করার পক্ষে অন্তত কিছু স্বত্বের জোর থাকা দরকার'।

রানী মুখ নিচু করে নিজের হাত দেখছিলেন। মুখ তুলে বললেন, মুখ তাঁর থমথম করছে, 'ও ফরাসডাঙার সবই রাজুর, রাজুর মাতুল-সম্পত্তি। রাজু ব্যতীত পিয়েত্রোর আর-কোনো ওয়ারিশ নেই'। যেন লজ্জায় শিউবে, রানী উঠে দাঁড়ালেন।

বাগচী হঠাৎ বলে উঠল, 'আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি, রানীমা সঠিক যুক্তি দিয়েছেন। আমি মঁসিয়ে পিয়েত্রোর কাছে শুনেছিলাম, তাঁর মাতুল-কন্যা, তিনি ব্রাহ্মণ-কন্যাও বটেন, কোথাও রানী। এখন বুঝতে পারছি, তিনিই আমাদের রানীমাতা'।

হরদয়াল ও নায়েব রানীর উঠে দাঁড়ানো দেখে বুঝতে পেরেছিল দরবার শেষ হয়েছে। নায়েব আজকাল আগের মতো তাড়াতাড়ি নড়াচড়া করে না। সে চিন্তাকুলও বটে ইতিমধ্যে। সে ধীরে-ধীরে উঠে রানীমাকে নমস্কার করতে গিয়ে দেখল রানী চলে গিয়েছেন। নায়েব চলে গেলেও হরদয়াল দু-এক মিনিট তেমনি বসে রইল। তার বিস্ময় যেন কাটতে চাইছে না।

রাজকুমার আর বাগচীও উঠে দাঁড়াল। রাজকুমার যেন কৌতুক দেখেছে এমনভাবে বাগচীর দিকে চেয়ে হাসল।

তখন কাছারি পুরোদমে চলেছে। নায়েব তার খাসকামরায় ঢুকে দু-চার মিনিট চুপ করে বসে রইল। তামাক দিতে বলল। ল-মোহরার আসবার অনুমতি চাইলে বলল, 'বিকেলে'। জমানবিশ নিজে এলে বলল, 'তোমাকে ডাকিনি, আমিনকে'। জমানবিশ চলে গেলে তার খাস-বরদারকে বলল, 'রাজবাড়ির নতুন রসুইওয়ালা বন্দাকে চেনো? তাকে বলবে ডেকেছি'। আমিন এলে বলল, 'বিলমহলের গজাকে চেনো? কাল ভোরে তাকে চাই। বেরিয়ে পড়ো, মুখের এত্তেলা নয়'। নায়েব গড়াগড়ার নল রেখে বারান্দায় এল। বরকন্দাজদের একজনকে দেখে আঙুলের ইশারায় ডাকল। সে এলে বলল, 'বুনোদের রেমো আর পেল্লাদকে চেনো? সন্ধে নাগাদ কাছারিতে আসে যেন'। সে আবার তার খাসকামরায় ঢুকল, ল-মোহরারকেই ডাকল এবার, 'খাওয়া-দাওয়া করে সদরে যাও তো। ইদিক-উদিকে খবর করো, গুড

ফ্রাইডে না কী আছে তোমাদের, সেই ছুটি কাটাতে কালেক্টর কোন দিকে যাচ্ছে'?

হরদয়ালও চিন্তা করতে-করতেই তার কুঠির দিকে চলেছিল। এটা কিন্তু খুব বিস্ময়ের হবে যদি প্রমাণ হয় যে জাঁ পিয়েত্রো রানীর আপন পিসিমার ছেলে। আর এখন তো তা প্রমাণ হলই। সে ভাবল, তাহলে কি রানীর খ্রিস্টান ধর্ম ও ইউরোপীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক মনোভঙ্গির বিশ্লেষণ হয়? তার মনে পড়ে গেল, রাজকুমার বালকত্ব পার হয়ে কৈশোরের দিকে যেতে তার শিক্ষাদীক্ষার ভারই যেন পিয়েত্রো বুজরুকের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। অন্তত দিনের অনেকসময়েই ফরাসডাঙায় কাটাত রাজকুমার। একটা পক্ষপাতই ছিল যেন রানীর রাজকুমারের বেড়ে ওঠার ব্যাপারে।

সে যখন তার কুঠিতে ঢুকেছে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। সিঁড়ির উপরে যেন রাজবাড়ির দিকে ফিরে কিছু দেখবে। সে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল : এখন তাহলে কি ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে? এমনকী হতে পারে, সেই বিশেষ এক রাতে যখন রাজকুমারকে বুজরুকের সহায়তা করতে সে বাধা দিয়েছিল তখনই রানী ক্রুদ্ধা হয়েছিলেন? সেজন্যই কি তাকে পদচ্যুত করা হয়েছে? বুজরুকের পরিকল্পনা যে পিয়েত্রোরও পরিকল্পনা তা তো সহজেই জানা যায়। কিন্তু এ কি সম্ভব, রানী ভেবেছিলেন এই রাজবাড়ি, বিশেষ রাজকুমার, সেই '৫৭-এর ব্যাপারে জড়ায? কী হতো? কী লাভ হয়েছে কার? কিংবা রানী নিজেও কি বুঝেছিলেন পরিকল্পনা ব্যর্থ হবেই? তা সত্ত্বেও পিয়েত্রোর কাছ থেকে রাজকুমারকে সরিয়ে আনাও সহ্য করতে পারছিলেন না? তার পদচ্যুতি কি এক দুঃসহ নিরুপায় ক্রোধের প্রকাশমাত্র? তাতে কিন্তু প্রমাণ হয়, পিয়েত্রো রানীর কত কাছের মানুষ ছিলেন। কিন্তু কোনোদিনই কি কেউ পিয়েত্রোব সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে তাঁকে?

সেদিন গুড ফ্রাইডে।

বাগচী দু-তিন দিন আগেই বলেছিল—রাজকুমার, ছুটি চাই। একটা বই লিখে শেষ করতে হবে। আর তিনদিন সময়মাত্র হাতে। রাজকুমার বলেছিল—ছুটি নয়, বই লেখার জন্য অবসর। বাগচী সেই সন্ধ্যার পর থেকে আসছে না।

কারো কথা ভাবতে গেলে মন অনেকসময়ে তাকে যেখানে শেষ দেখেছিল সেখানে ফিরে যেতে পারে। বাগচী না-আসায় তার সন্ধ্যাগুলো ফাঁকা যাচ্ছে এই অনুভূতি থেকে তার মন যেন বাগচীকে অনুসরণ করে তার কুঠিতে গেল। তার মনে পড়ল, সেদিন বেশ হাসাহাসি হয়েছিল কিন্তু নয়নতারার দিঘির জমি দেখার কথা নিয়ে। আর বোধ হয় পিয়েত্রোর তরোয়াল নিয়েও। আর সেই সময়ে, তার মনে পড়ল, পিয়ানোর ডালায় সেই রূপার ফলকে, পিয়েত্রোর পিয়ানোই তো সেটা, লেখা সেই 'বাইচে' নাম। ও, সেই চতুর্দশীর সুঘ্রাণ! সেই 'বাইচে' যে নাকি পিয়েত্রোর আদরের মামাতো বোন।

রূপচাঁদ এসে জিজ্ঞাসা করল, রাজকুমার তখনই বাইরে যাবেন কিনা?

রাজচন্দ্র বলল, 'তা দিয়ে তোমার কী হবে? তুমি দুলকিকে আনতে বলো'।

কিন্তু রূপচাঁদ যাওয়ার আগে রাজচন্দ্র তাকে থামিয়ে বলল, 'হ্যাঁরে রূপচাঁদ, তোর সঙ্গে কাঠের মিস্ত্রির জানাশোনা আছে? তুই কি গাছের উপরে সেই দুখানা ঘরের বাড়ি দেখেছিস? আমি জানতে চাইছি, সেই গাছের আর-একটু নিচের দিকে আর খানদুয়েক ঘর হয় কিনা? মিস্ত্রিরা পারে কিনা? কাঠের সিঁড়িও করে দিতে হবে এ-ঘরে ও-ঘরে যোগ করে। সব মিলিয়ে একটা বাড়ির মতো। খোঁজ নিয়ে জানাস তো আজ সন্ধ্যায়। আর-একটা কাজ করিস। পিয়ানোটাকে ভালো করে মেপে নিবি। গাছের উপরে যে-ঘর দুটো তার কোনটিতে সেটাকে বসানো যায় কিনা দেখে আসিস একসময়ে'।

রূপচাদ বলল, 'আজ্ঞে আচ্ছা। কিন্তু সেখানে কি রাজকুমার একা থাকবেন'?

'তুই বুঝি যেতে চাস'?

'আজ্ঞে না, সে আমার বেশ ভয় করবে। আপনারও খুব একা লাগবে'?

'আচ্ছা বাঁদর হয়েছিস। যা, সহিসকে ঘোড়া আনতে বল'।

রূপচাঁদ চলে গেলে রাজচন্দ্র ভাবল, কী যেন সে ভাবছিল। হৈমীর কথা? না, হৈমী কাল রাতে বলছিল মুকুন্দর চিঠি এসেছে চীন থেকে। আর তা নিয়ে কাদম্বিনীই এসেছেন কায়েতবাড়ি থেকে। হৈমীর কথাতেও বোঝা যাচ্ছিল মুকুন্দ প্রকৃতপক্ষে এই রাজবাড়িরই কুমার বটে। এসব ভাবতে কিন্তু অবাক লাগে। আগেকার মানুষগুলোকে একটু স্পষ্ট করে চেনা যায় যেন।

সহিস রাজচন্দ্রের কথা মতো অর্থাৎ তার খয়েরি রঙের প্রিয় ঘোটকীটাকেই এনেছে।

রাজচন্দ্র ঘণ্টাখানেক চলে গাছ-ঘরের কাছে পৌঁছে গেল। ঘোড়াটাকে ঘরে উঠবার মই-সিঁড়ির রেলিং-এ বেঁধে দিয়ে সে বরং আতপ্ত ঘাসের উপরে বসল।

রাজচন্দ্র ভাবল : একসময়ে সে কিন্তু ভাবত, পিয়েত্রোর গল্প শোনার পর, যদি পিয়েত্রোর আত্মীয়া সেই রানী তাদের বাড়িরই হতো তবে ভালোই হতো। এ রকম হয় না, হলে ভালো হতো, এ রকম অনুভব করেই সে মায়ের কাছে প্রস্তাব করেছিল অসুস্থ পিয়েত্রোকে রাজবাড়িতে এনে রাখতে। রানী বলেছিলেন, মানুষ বয়স্ক হলেই একা হয়ে যায়—তিনি নিজের কথা, পিয়েত্রোর কথা তুলে যেন একা হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বুঝিয়েছিলেন। তখন পিয়েত্রো তার আত্মীয় জানলে সে কি আর রানীর কথা শুনত? শেষে কিন্তু পিয়েত্রোর মৃত্যুর মুহূর্তে দয়াশীলা রানী পিয়েত্রোর নিভে-আসা চোখের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন একবার।

এই সময়েই হঠাৎ যেন রাজচন্দ্র এতদিনে নিজেকে প্রাপ্তবয়স্ক মনে করল। ওটা তো ভালোবাসার গল্পই। বিচিত্র সুঘ্রাণের ভালোবাসা। সে মনে-মনে হাসল, যেন মনে মনেই বলল : তাহলে কিন্তু রানীমা মা থাকো না। আমাদেব মতো মানুষ হয়ে যাও, যার নিজের সুখ-দুঃখ আছে।

সে অনুভব করল, এতদিন কি সে মায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল, আর এখন প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে মায়ের থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে?

প্রথমে পায়ের শব্দ, তারপর দেখতে পেল রূপচাঁদকে। সে ভাবল, তাহলে কিছু না-করে, কিছু না-ভেবে পুরো দিনটা কাটিয়ে দিয়েছে নাকি? হয়তো বনের বাইরে সূর্য ঢলে পড়ছে। কিন্তু রূপচাঁদ হাঁপাচ্ছে, ছুটে এসেছে সন্দেহ কী?

রূপচাঁদ বলল, 'হুজুর আপনি এখানে'?

'এখানে কী দোষ করেছে'?

রূপচাঁদ বলল, 'ওদিকে যে সর্বনাশ! শিগ্‌গির চলুন। আপনাকে নিয়ে যেতে না-পারলে হৈমীদিদি আমাকে সদরদরজার সামনেই গুলি করে মারবে বলেছেন। নিজেও সেখানে দু-তিনজন বরকন্দাজ নিয়ে পথ আগলাচ্ছেন'।

রাজচন্দ্র কপট আশঙ্কায় বলল, 'সে কী রে, হাতে কি বন্দুকও নাকি'?

রূপচাঁদ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, হুজুর, আপনার রাইফেলই একটা আর তাতে গুলিও ভরা'।

এবাব রাজচন্দ্রকে উঠে বসতে হল। কারো তার রাইফেল ছোঁয়া সে পছন্দ করে না। বিরক্ত হয়ে বলল, এসব কেন'?

রূপচাঁদ বলল, 'হুজুর, বন্দাকে মেরে ফেলেছে'।

'বন্দাকে? কে? কেন'?

'বন্দা মরেলগঞ্জের নতুন জমিতে পুকুর কাটাতে গিয়েছিল একশো কোদাল নিয়ে। জুড়ান পাইক সড়কি চালালে বন্দা তাকে দুফালা করে ফেলেছিল। তখন কীবল এসে দূর থেকে বন্দাকে গুলি করে মেরেছে। হুজুর, শিগ্‌গির চলুন। ওদিকে আরো। ফরাসডাঙায় গিয়েছে গজা মণ্ডলের দল। সাহেবদের ভিতের পাথর গাড়ার কাজ ভেঙে উড়িয়ে দিতে। সেখানে শুনি কালেক্টর, তার ফৌজ, ডানকান আর

কে-কে সব সাহেব! কটার-বা প্রাণ গেল সেখানে! আপনাকে কোথাও না-পেয়ে আপনি ফরাসডাঙায় ভেবে মাসি পালকি করে সেদিকে গেলেন। কী যে বিপদ! আমাকে বললেন, রূপচাঁদ, রাজকুমারের হাতে যে বন্দুকটা সবচাইতে ভাল চলে সেটা দাও পালকিতে। গুলি আর বন্দুক তুলে নিয়ে বেহারাদের বললেন, উড়ে চলো, বকশিশ দেব। রূপচাঁদ কেঁদে ফেলল, 'হুজুর, আমারই ভুল। আমি বলেছিলাম, রাজকুমার খালি হাতে বেরিয়েছেন'।

রাজচন্দ্রের ঘোড়া ততক্ষণে ধাপে ছুটতে শুরু করেছে।

২

বাগচী ভাবছিল আজ সারাদিন সারারাত লিখেই কি শেষ করতে পারবে, 'এই শেষ দুটি ওষুধের কথা? ইতিমধ্যে বেলা দুটো হয়ে গেল। চরণের হাতে এ দুটি ওষুধ কত যন্ত্রণা কত হতাশাকেই না দূর করতে পারবে! কত রকমেরই তো দুঃখ, যন্ত্রণা, অপমান, হীনতা! তাদের পক্ষে অনেকগুলিই দূর করা সম্ভব নয়। আত্মার যন্ত্রণা, মনের যন্ত্রণার কিছুই কি করতে পারে তারা! কিন্তু দেহের যন্ত্রণার কিছু লাঘব করতে চেষ্টা করা সম্ভব। রোগগ্রস্ততাও তো একরকমের হীনতা, অপমানও বটে। সে স্থির করল এই রকম পাইপ টানার জন্য যে-সময় ব্যয় হবে তাছাড়া অন্য সময়টুকু সে লিখে যাবে। সে অবশ্যই এ পর্যন্ত ক্রাইস্টের কাছে ঈশ্বরজ্ঞানে কিছু চায়নি। কিন্তু তাঁর হাতের স্পর্শে যে নিরাময়গুলি সম্ভব হয়েছিল তেমন নিরাময়কেই সে প্রার্থনা করছে এখন।

অস্বাভাবিক শব্দে বাগচী তার স্টাডি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। কেট অবশ্যই এখন কিচেনে, তার কুঠিতে এ-রকম সব শব্দ কেন হয়? সে দেখতে পেল, এক উন্মাদিনী বিলাপ করতে করতে তার কুঠিতে ঢুকে পড়েছে। খোলা চুল পিঠের উপরে। হয়তো ছুটতে গিয়ে পড়ে গিয়ে থাকবে, ফলে বিস্রস্ত শাড়ি ছেঁড়াও বটে। তার প্রথমেই মনে হল সে কি কেটকে কিছু পোশাক আনতে বলবে? তার এ-রকমও মনে হল, হায়, এ কি মরেলগঞ্জের কোনো উৎপীড়িতা? সেই উন্মাদিনী হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, সে চরণের বউ। চরণকে কাল সন্ধ্যার সময় কালেক্টরের পেয়াদা ধরে নিয়ে গিয়েছে। এখনও ফেরেনি। আর কি ফিরবে? এই কাগজ দেখুন।

চরণের স্ত্রীর বনদুর্গা বোধ হয় তার শক্তির শেষ সীমায় এসেছিল, সে হাহাকার করে কেঁদে বসে পড়ল। কাগজটাকে পড়ে বাগচী পকেটে পুরল। সে বলতে গেল, চরণের বউ, তুমি কেঁদো না। আমি এখনই এই মুহূর্তে যাচ্ছি, দেখব কেমন কালেক্টর, আর কেমন তাব বিচার! কিন্তু হঠাৎ তার প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল। পার্লারের কোণে তার নানারকম ওয়াকিং স্টিক। সে সবচাইতে মোটা আর বড় মালাক্কা বেতের লাঠিটাকে বেছে নিয়ে সেটাকে মেঝেতে ঠুকতে-ঠুকতে বলল, 'তুমি কিছু ভেব না, কিছু ভেব না, চরণের বউ। সীমা আছে অত্যাচারের। ভারি ইংরেজ হয়েছে! ভেবেছে আমার গায়ের রং কালো বলে ওরা আমার চাইতে বড় ইংরেজ! আমি টাইমসে লিখব, আমি পার্লামেন্টে কোশ্চেন তুলব। আমি, আমি...আমি চরণকে না-নিয়ে ফিরব না'।

এইসব সোরগোলে কেট ছুটে এসেছিল। বাগচী কেটের সঙ্গে একটাও কথা না-বলে লাঠি হাতে ছুটতে-ছুটতে বেরিয়ে গেল।

ঘোটকী তখন তীরবেগেই ছুটছে। রাজচন্দ্র বিরক্ত মুখে ভাবল, এসব কি নায়েবমশায়ের হুকুম? কে বলেছিল এখনই তাঁকে দিঘি কাটাতে? কী লাভ? শুধু কয়েকটা মানুষের প্রাণ যায়! কী হয় ফরাসডাঙার পরগনাটাকে রাজনগরের সঙ্গে যোগ করলে! অকারণে কিছু নরহত্যা। মনে করো ডানকানের কুঠিকে

নিশ্চিহ্ন করা হল, তা কি হাস্যকর প্রস্তাব নয়? বন্দার কথা মনে পড়ল তার। ও, সেই ফেনসিং-বিশারদ কীবল! রাজচন্দ্রর মনে হল, কাপুরুষ। বন্দার তরোয়াল যে খেলার নয় তা বুঝে দূর থেকে গুলি করে মেরেছে! একটা দুঃসহ ক্রোধ উঠে পড়ছে, ছুটন্ত ঘোটকীর উপরে সেটাকে সে শান্ত করার চেষ্টা করতে লাগল। ওদিকে আবার হৈমী কী বোকামি করে বসেছে! রাজকুমারের হাতে তার সবচাইতে শক্তিশালী রাইফেলটা তুলে দিতে পারলেই কি কিছু হয়? এতক্ষণে কি সে ফরাসডাঙায় পৌঁছে গেল?

সেই খয়েরি ঘোটকী মুখে ফেনা নিয়ে রূপার বিট্ কামড়ে ধরে যেন চারখানা পায়ে একটামাত্র শব্দ তুলে রাজবাড়ির সদর-দরজা পার হয়ে গেল।

বাঁ হাতের দিকে তখন গাছের মাথাগুলোর উপর দিয়ে পাক খাওয়া সাদা-কালো ধোঁয়া, দুপুরের রোদের আকাশকেও লাল করে আগুনের আভা।

উভয় পক্ষেই গোপন করার চেষ্টা ছিল, ফলে সেই গুড ফ্রাইডেতে ঠিক কী ঘটেছিল তার বিবরণ উদ্ধার করা সহজসাধ্য নয়। দিঘি কাটার সেই জমিটাতে অকরুণ আকাশের সূর্যের নিচে রৌদ্রদগ্ধ মাটির উপরে দুটি শব পড়ে ছিল সন্ধ্যা পর্যন্ত। একশো জন কোদালি না-হলেও, তখনও কিছু কোদাল যন্ত্রের মতো মাটি কেটে চলেছে।

মরেলগঞ্জের দেওয়ান মনোহর সিং-এর সেই প্রকাণ্ড আটচালাসমেত গোটা বাড়িটা দাউদাউ করে জ্বলছে। গজা মণ্ডল, যার আসল নাম মেন্ডোজা ছিল একসময়ে, যার কাঁধের মাপ এক গজ বলে নতুন নাম মানিয়ে যায়, সে জানতে পেরেছিল চরণকে শেষ দেখা গিয়েছিল মনোহর সিং-এর আটচালাতেই। কিন্তু তন্ন তন্ন করে প্রত্যেকটি ঘর খুঁজেও তাকে না-পেয়ে, দড়িতে বাঁধা মনোহরকে লাঠিতে খুঁচিয়েও যখন চরণের সম্বন্ধে জানা যাচ্ছে না, তখন তার সঙ্গের লোকেরা আগুনের ভয় দেখাতে গিয়েই নাকি আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। চৈত্র-বৈশাখের দিনে সে-আগুন কি থামানো যায়? নতুবা গজার ইচ্ছে ছিল না মানুষকে পুড়িয়ে মারার।

এসবই অনেকপরে গজার বিচারের সময়ে জানা গিয়েছিল। গজারই শাস্তি হয়েছিল। নায়েবমশায় দণ্ড কমাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বোকা রোকনুদ্দিন, কাজটা খুবই ভুল করেছিল। মনোহর সিং-এর চতুর্থ স্ত্রী, যাকে গজার বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছিল রোকনুদ্দিন, সে গজাকে শনাক্ত করেছিল।

গজাকে যখন সেই ঘোষজা ডেপুটি ধরে নিয়ে যায় তার আগে সেই ডেপুটির লোকেরা বিলমহলে কবর খুঁড়ে রহিম আর রমজানের শবও বার করেছিল। তাদের গায়ে তখনও ঘায়ের চিহ্ন ছিল, কিন্তু সে বিশ্বাস করেনি তা বসন্তের। বরং আগুনের পোড়া হওয়াই সম্ভব এই মত ছিল তার।

কিন্তু তখন দেওয়ান মনোহর সিং-এর কুঠি দাউদাউ করে জ্বলছে, যদিও দিন শেষ হয়ে আসছে। বিলমহলের থেকে যারা এসেছিল তারা তখন ফরাসডাঙায় পিছিয়ে এসেছে আর সেই পিছিয়ে যাওয়ার টানে ডিয়ার পার্কের টিলার উপরে চার্চ অব হোলি অ্যাসেনশানের যে ভিত্তি গাঁথা হয়েছিল তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে।

৩

বিলমহলের সেই ভিড় দুপুর থেকেই ফরাসডাঙার পথে ছড়িয়ে পিয়েত্রোর বাংলোর এপাশে-ওপাশে অনেকটা সময় ছিল, তারপরে সন্ধ্যার অন্ধকারে ক্রমশ মিলিয়ে গিয়েছিল। এ রকম প্রমাণ আছে তারা ততক্ষণই ছিল ফরাসডাঙায় যতক্ষণ রাজকুমার পিয়েত্রোর বাংলোয় ছিল সেদিন।

পিয়েত্রোর বাংলোয় একই সময়ে কালেক্টর, ডানকান, বাগচী এবং রাজকুমার ছিল। কী হয়েছিল সেখানে সেটাই তো আসল গোপন করার বিষয়।

তখন বেশ রাত হয়েছে। দেওয়ানকুঠির বসবার ঘরে হরদয়াল আর ম্যাকফার্লান মুখোমুখি। হরদয়াল বলল, 'বোসো ম্যাকফার্লান, তোমার সঙ্গে এই প্রথম আলাপ আমার। একটু ওয়াইন আনি'?

ম্যাকফার্লানের এই কালো রঙের দেওয়ানটির কথা বলার ভঙ্গিটা ভালো লাগছিল না। সার তো বলছেই না, নামের আগে মিস্টারও বলছে না। তার এ রকমও মনে হল, আজ সারাদিন যা ঘটেছে তারপরে তিনজনমাত্র সিপাহির ভরসায় রাজবাড়ির ভিতরে ঢোকা ভালো হয়েছে কি?

হরদয়াল ওয়াইন নিয়ে ফিরল। গ্লাসে ভরে দিল। বলল, 'আমি বার্গান্ডিতে সোডা খাই না, জলও না। তুমি'? তারপরই হেসে বলল, 'আমি কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না তুমি আর হোয়াইট কী করে তখন পিয়েত্রোর বাংলোয় ঢুকলে'!

ম্যাকফার্লান বলল, 'ইংল্যান্ড আশা করে তার ছেলেরা তাদের কর্তব্য করবে'।

'আহা, তুমি উত্তেজিত হচ্ছ কেন? ওটা তো নেলসন না কে বলেছিল, আর তা যুদ্ধের সময়ে। এটা তো সামান্য জমি নিয়ে হাঙ্গামা। তুমি কালেক্টর, নিশ্চয় জানো, রাজকুমারের খরিদ-করা জমিতে রাজকুমারের দীঘি কাটানোর এক্তিয়ার আছে। জুড়ান পাইক এবং কীবল ছোকরা ট্রেসপাস করেছিল। তুমি কি কীবলকে ইতিমধ্যে অ্যারেস্ট করেছ? ট্রেসপাস এবং খুন'।

কথা ইংরেজিতে হচ্ছিল। ম্যাকফার্লান বলল, 'তুমি আমার ডিউটি আমাকে শিখিয়ো না। তুমি বলছ মরেলগঞ্জের মধ্যে সেটা রাজকুমারের জমি'?

'প্রমাণ চাও? যাকগে, সেটা কলকাতার কোর্ট বুঝবে। তুমি নিজে ট্রেসপাস করেছিলে কেন ফরাসডাঙার কুঠিতে? না কি সেটাও কর্তব্য ছিল? বলবে, রাজকুমার কিংবা মিস্টার বাগচীকে অ্যারেস্ট করতে'? হরদয়াল হাসল। বলল আবার, 'তুমিই বলছিলে, বাগচী প্রথমে, পরে রাজকুমার তোমাদের পরে সেখানে গিয়েছিল। আর তখন তো কেউ কোনো অপরাধই করেনি'।

ম্যাকফার্লান বলল, 'ট্রেসপাস! সেটাও কি তোমাদের রাজকুমারের বাড়ি নাকি'?

হরদয়াল নিঃশব্দে হাসল। বলল, 'এতদিন তো তাই জানতাম, যদিও ওটা রাজকুমারের বাসের উপযুক্ত নয়। তুমি বোধ হয় জানতে না? সেজন্যই আজ সকালে ফরাসডাঙার টিলাব কী একটা ভিত গাড়ার সময় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখেছ, প্রতিবাদ করোনি? ভেবে দ্যাখোনি, রাজকুমারের কলকাতার গেস্টরা ওই বাংলোতেই ছিল'?

'সিলি'!

'কোনটা? ডানকানের মতো লোকের গুড ফ্রাইডেতে চার্চ করার ব্যাপারে উৎসাহ'?

অন্যমনস্কের মতো ওয়াইন-কাপের স্টেমে আঙুল রেখেছিল ম্যাকফার্লান। সে নিজেকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে সোজা হয়ে বসল, বলল, 'তুমি রাজকুমারকে এখানে আসতে বলবে? অথবা আমি কি তাকে অ্যারেস্ট করতে রাজবাড়িতে ঢুকব'?

হরদয়াল বলল, 'ওয়াইনের বোকেটা কিন্তু আকর্ষণ করে, তাই না? কিন্তু রাজকুমারের অপরাধ কী তাই ভালো করে জানি না। তুমি বলছ, রাজকুমার ডানকান হোয়াইটকে ঘোড়ার ক্রপ-চাবুক দিয়ে চাবকেছে। সে তো শুনেছি ডানকান রাজকুমারকে গাল দেওয়ায়। রাজকুমার যদি তাকে লাথি মেরে থাকে সে তো ডানকান রেভরেন্ড বাগচীর সহধর্মিণীকে বিচ এবং প্রস্টিট্যুট বলার রাগে। আর রেভরেন্ড বাগচী যা করেছিল সে তো সেল্‌ফ-ডিফেন্স। ডানকানের রিভলবারটা কার দিকে লক্ষ্য করা ছিল তা কি বোঝা যায়? তা যে রাজকুমারকে মারতেই তা সে কী করে বুঝবে? ভেবেছিল হয়তো সে নিজেই তার শিকার। সেল্‌ফ-ডিফেন্সে সে ডানকানের কোমরে লাঠি মেরেছে। এমন তো হতে পারে তার জন্য ডানকানের বাতই দায়ী। তাড়াতাড়ি সরে যেতে পারেনি বলেই, বাগচী তাকে চেয়ার তুলেও মেরেছিল। কিন্তু ও-কাজটা কি তোমার ভালো হয়েছে? তুমি বাগচীকে অত ক্লোজ রেঞ্জে গুলি করলে! হয়তো তার পাটাকে বাদ দিতে হবে, যদি হেমারেজে মৃত্যু না-হয়'।

ম্যাকফার্লান বলল, 'তাকেও অ্যারেস্ট করব। আর তা আজ রাতেই'।

'তা কী করে পারবে? আমি তো তাকে আর তার স্ত্রীকে সন্ধ্যাতেই কলকাতায় পাঠিয়েছি। আগে তো বলোনি। এতক্ষণে তারা বিশ-পঁচিশ ক্রোশ চলে গিয়েছে। আশা করছি কাল দুপুরে নাগাদ মেজর টীবসের সাহায্য পাবে'। হরদয়াল যেন একটু ভাবল। বলল আবার, 'তা, জয়নাল বুড়ো হয়েছে বটে। কিন্তু প্রায় সাড়ে ন ফুট উঁচু, আর পাগলার মতো ছোটে এখনও ; আশা করছি কোল্যাপ্স না-করা পর্যন্ত সে ঘণ্টায় পনেরো-বিশ মাইল ছুটবে, শিকারি হাতি তো'।

ম্যাকফার্লানের সন্দেহ হল, লোকটি কি কথা বলে-বলে সময় নিচ্ছে? রাজকুমারকে পালাতে সাহায্য করছে? ইতিমধ্যে নায়েবকে পাওয়া যাচ্ছে না, গা-ঢাকা দিয়েছে সে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি রাজকুমারকে আনবে? না, আমি রাজবাড়িতে ঢুকব? স্ত্রীলোকদের সরে যেতে বলবে'?

হরদয়াল বলল, 'বোসো, কালেক্টরসাহেব। রাজকুমারকে আনি'।

হরদয়াল ভ্রূকুটি করে প্রাসাদে ঢুকল। রানীর কাছেই দরকার। সে দেখল রানী তাঁর বসবার ঘরে। রানীর সামনে একটি শেজ। শেজের গোড়ায় রূপার ট্রেতে যা মৃদু আলোয় ঝকঝক করছে তাকে পৃথক পৃথক করে চেনা শক্ত, কিন্তু তা যে নানা দামি পাথর আর সোনার একটা ছোট স্তূপ তা বোঝা যাচ্ছে। রানী কী ভাবছেন বোঝা শক্ত। অনুশোচনা নাকি তাঁর? কিন্তু একেবারে স্থির। হরদয়াল কথা বলতে গেল। কী করে যেন, কোথা থেকে যেন হরদয়ালের চোখের কোণ দুটি ভিজে উঠল।

সে বলল, 'অতটা নয়। আমি ভাবছি হাজার দশেক পাউন্ড মোহরে। তোশাখানা কি খোলা আছে? চাবিটা? রাজকুমারকে পোশাক পরতে বলুন'।

হরদয়াল তোশাখানার চাবি নিয়ে সেখান থেকে একটা থলি সংগ্রহ করে তার বসবার ঘরে ফিরতে মিনিট বিশেক সময় নিল। টেবিলের ওয়াইনের পাশে একটা জিংলিং শব্দ করে সেই সিল্কের থলিটাকে নামাল। তাকে তখন কিছুটা ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বলল, 'রাজকুমার পোশাক পরছেন'।

ম্যাকফার্লান বলল, 'নো ফানি বিজনেস। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি'।

হরদয়াল তার স্কার্লেটে সাদায় আঙুরলতার নক্সা নাইট-গাউনের জেব থেকে একটা কাগজ বার করল। আলোর সামনে ধরে পড়ল। সেটাকে পকেটে রেখে সিগার ধরাল। 'তুমি খাবে, কালেক্টর? রিয়্যাল টার্কিশ। অবশ্য তোমার পার্মিশন নিচ্ছি'। সে গলা সাফ করল। আলতো করে গলা নামিয়ে বলল, 'চরণদাস বলে একজনের কথা জানো'?

ম্যাকফার্লান বলল, 'আমি কী জানি'!

হরদয়াল তার জেব থেকে কাগজটাকে বার করল, বলল, 'এই কাগজটায় কিন্তু তোমার দস্তখত এবং মোহরও। তুমি কি জানো, ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে যাকে সামন্ করা হয় তাকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব থাকে ম্যাজিস্ট্রেটের'? হরদয়ালের এই প্রথম যেন রাগ প্রকাশ পেল। তার শান্ত মুখে দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল একবার। 'আমি যদি বলি তুমি এখানে আসার কিছু আগেই চরণদাসের কাঁচা কবর খুঁড়েছে আমার লোকেরা। তার বিকৃত শরীরটাও পাওয়া গিয়েছে। তোমার সামনে মনোহর তাকে চাবকাচ্ছিল। হুকুমটা কি তোমার'?

ম্যাকফার্লানের মুখটা কিছু বিবর্ণ হল।

হরদয়াল বলল হেসে, 'আমি বলি কি এখানে এই থলিতে দশ হাজার পাউন্ড সভরেন আছে'।

দু-তিন মিনিট ছটফট করল ম্যাকফার্লান। গলা নামিয়ে বলল, 'তুমি বলছ, কিন্তু ...

এসব ব্যাপারে মনস্থির করতে সময় নেয়। অন্যপক্ষের ধীর শান্ত কোমল প্ররোচনা দরকার। আধঘণ্টা সময় লাগল। অবশেষে বার্গান্ডি স্পর্শ করল ম্যাকফার্লান। হরদয়াল ফিসফিস করে বলল, 'একটা রসিদ সই করে দাও, দুই দিক থেকেই সুবিধা। একটা আই ও ইউ তো। অসুবিধা হলে তুমি বলবে ধার নিয়েছ। আমারও একটা দলিল থাকে'।

ম্যাকফার্লান অবশেষে বলল, 'কিন্তু রাজকুমারকে অ্যারেস্ট তো করতে হবে। কলকাতা আছে...

'অবশ্যই, অবশ্যই'।

অবশেষে এই স্থির হয়েছিল, রাজকুমার দু-তিন মাস পিয়েত্রোর বাংলোর নজরবন্দী রূপে থাকবেন। একজন ঝি, একজন চাকর থাকতে পারবে। দুজন সিপাহি বাংলোর বাইরে থাকবে বটে। কিন্তু ওয়ার্ড অব অনার—রাজকুমার পালাতে চেষ্টা করবেন না। তারপরে তদন্ত শেষ হবে।

হরদয়াল অতিশয় গম্ভীর মুখে বলেছিল, 'ওয়ার্ড অব অনার'।

তখন মাঝরাতের কাছে সময়। একটা ধোঁয়ানো মশাল। তার পিছনে একটা ঘোড়া। ঘোড়াটার গলা যেন বৃত্তাকারে মাটিতে ঝুঁকেছে। ঘোড়ার পিঠে স্থির রাজকুমার পিয়েত্রোর বাংলোর দিকে এগিয়ে

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

তারপরে মাস দেড়েক চলে গিয়েছে। এতদিনে দু'এক পশলা বৃষ্টি নেমেছে, কিন্তু এতবড় নদীর ধারে বর্ষাকাল এভাবে সাধারণত আসে না। ফরাসডাঙার টিলায় নতুন করে চার্চের ভিত বসেনি। দয়ালকৃষ্ণ ফরাসডাঙার লাট জমা দিয়েছে যেমন সে অনেকদিন থেকে দিয়ে আসছে। ওয়ারিশের প্রশ্ন এবারও ওঠেনি। ম্যাকফার্লান রেভেনু বোর্ডে কী লিখেছে জানা যাচ্ছে না।

রাজনগরের লোকেরা কালক্রমে যে-গল্পটাকে মেনে নেবে তা এখনই কারো-কারো মুখে শোনা যাচ্ছে : কী একটা গোলমাল আছে ফরাসডাঙার স্বত্বে, সেক্ষেত্রে দখলদারি প্রমাণ করতে রাজকুমারের স্বয়ং সেখানে থাকা ভালো। রানীর শিবমন্দিরই দখল প্রমাণ করে বটে, রাজকুমার নিজে থাকলে যা হয় তেমন কী করে হবে? রাজকুমারের স্বত্বটা হয় কীসে, সে প্রশ্ন তুললে বলতে হয়, পাল্টা স্বত্ব নিয়েই-বা কে এগিয়েছে?

দিঘিটা সব কাটা হয়নি। বিঘা পঁচিশেক কাটা হয়েছে উপর-উপর, বৈশাখে জল আসেনি।

নায়েবমশায় ইতিমধ্যে ফরাসডাঙায় পালকি থামিয়ে নেমেছিলেন। পত্তনিদারদের দুজনকেই প্রথম ধাপে ডাকিয়েছিলেন। বলেছেন—দয়ালকৃষ্ণ আসবে, তোমাদের নিয়ে আমার সেরেস্তায় যাবে। ভালো দিন দেখে নজর দিয়ে এসো।

নায়েবমশায়ের গা-ঢাকা দেওয়ার গল্পটাকে কাছারির আমলারা হেসে উড়িয়ে দেয়। উনি তো বিলমহলের তসিল-কাছারিতে তখন। বছরে একবার করে তো যেতেই হয়।

তবে নাকি ডেপুটির পালকির বেহারা বদলে গিয়েছিল মাঝপথে? তার উত্তরে সদর আমিন বলে—তোমরাও যেমন। বেহারা বদলালে কী হয়? ডেপুটির চার বেহারার পালকি ধিকিধিকি করছে তখন। ওদিকে তখন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। বিলমহলের পথও তো সুবিধার নয়। সেজন্যই নায়েবমশায়ের আট বেহারার পালকিটা এগিয়ে এসেছিল। কী? এত মশাল কেন? এই পালকি কেন পথে? হুজুর, রাত হয়, আপনার কষ্ট, নায়েবমশায় আপনার জন্য পাঠালেন। ডেপুটি সঙ্গের সিপাহিদের সতর্ক হয়ে আসতে বলে সেই বড় পালকিটায় উঠেছিল। বেহারাদের ভুল। নায়েবমশায় কালেক্টরকে আশা করেছিলেন। ডেপুটি জানলে কি আর নিজের পালকি পাঠান? তো, তোমার তেলেঙ্গি সিপাহি কি বিলমহলের জঙ্গলে পথ চিনবে হাতে মশাল থাকলেই? সেদিন গোলমাল ছিল, নায়েবমশায়ের বরকন্দাজরা ভালো মশাল জ্বালাতে পারেনি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের মশাল নিবে গিয়েছিল। কাজেই ডেপুটির পালকি আর তেলেঙ্গিরা গেল একদিকে, অন্যপথে নায়েবমশায়ের পালকিতে ডেপুটি। অন্ধকারে এ রকম

আকছার হয়ই। নায়েবমশায় যে কালেক্টরকে আশা করেছিলেন তার প্রমাণ কাহাররা বেদম ধমক খেয়েছিল। আরে ছোঃ, এ কী? কাকে এনেছ?

সদর আমিন চিরকালই কথায় লোক হাসাতে পারে। ডেপুটি 'ছোঃ' শুনে একটু তেড়ে উঠেছিল। তা বাপু তখনও সে 'হ্মঃ' শোনেনি। তখন নায়েবমশায় গড়গড়ায় মুখ দিয়ে খানিকটা টানলেন। 'হ্মঃ' করলেন। পরে বললেন—বুড়ো হয়েছি, বাপু, কথার দোষ নিও না। তুমি তো সেই ঘোষ ছোকরা? তা বলি কুলীন কায়েত? নাকি শ্রীকৃষ্ণের জাত?

ডেপুটি তবু মাথা নাড়া দেয়। তখন নায়েব বলেছিলেন—ছোট হলেও জাত বটে। তাহলে তোমাকেই জামাই আদরটা দিতে হয়। এটাই গল্পের উৎপত্তি। সত্যি কি আর নায়েবমশায় তাকে কুলীন কায়েতের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে কায়েত করতে চেয়েছিলেন, না, বিলমহলের খাসের তহসিল তাকে বিনা-নজরে পত্তনি দিতে চেয়েছিলেন?

(বিলমহলের খাস তহসীলের আধখানা নিয়ে এক ঘোষ পত্তনিদার বংশে কিছুদিন আগেও ছিল বটে। তাছাড়া ও-গল্পের, যা নায়েবমশায়ের কাশীলাভের পরে কিছুটা চালু হয়েছিল, যে ঘোষ ডেপুটিকে আট-ন ফুট লম্বা, দু হাত চওড়া, হাত দুয়েক গভীর কালো একটা অন্ধকার খাদ নায়েবমশায়ের সামনের মেঝে থেকে গালিচা সরিয়ে দেখানো হয়েছিল, নতুবা সেই-বা কায়েত-কন্যাকে কেন শেষ পর্যন্ত বিবাহে রাজি হবে? তার কোনো প্রমাণ নেই)।

একটা ধাঁধা আছে যা কখনও কখনও, বেশ কিছুদিন ধরে, মনে হতো হরদয়ালের। দশ হাজার রানী ভিক্টোরিয়ার মোহরের থলিগুলো ধীরে-ধীরে যোগাড় করতে হয় বটে। কিন্তু সে রকম কিছু কিছু থলি তোশাখানায় আছে তা সে-ই যখন জানত, রানী কি জানতেন না? ফরাসডাঙার দখল নিতে ম্যাকফার্লানকে ডেকে আগেই থলিটা দিলে হতো। এতসব ঘটার কি দরকার ছিল? ভরসা, এই ডেপুটি মনোহর সিং-এর বাড়ির ব্যাপারটাকেই তদন্তের বিষয় করেছে। ছেলেটি বুদ্ধিমান, তদন্তটা বিলমহলের দিকে গড়িয়ে দিয়েছে। মরেলগঞ্জ ও ফরাসডাঙার তদন্তের ভার তো কালেক্টরের নিজের হাতেই। গত মাসে ছোকরা একবার এসেছিল, নায়েবমশায়ের সঙ্গে আলোচনা করেছে, জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তখনই জানা গিয়েছিল গজার বাড়িতে মনোহরের নাবালিকা স্ত্রীকে পাওয়া গিয়েছে। নায়েবমশায় হরদয়ালকে এসব বলেছিল। পরে নিজেই আবার বলল, গজার বিপদের কথা তাই রানীমার কানে আনা যাবে না। হরদয়াল বলেছিল, একদিক দিয়ে ফুটে বেরোবেই, ভালো উকিল দিয়ে কিছু করা যায়?

কিন্তু আসল কথা, কেন এসব? বুদ্ধিমতী রানীর এটা আর-এক হিসাবের ভুল? সেই দশ হাজার তো দিতেই হল।

রাজচন্দ্র এ বিষয়টাকে আর ভাবে না। সেই রাতেই কালেক্টর জিজ্ঞাসা করতে শুরু করলেই সে বলেছিল—আপনাদের দেশে কী হয় জানি না। আমাদের দেশে নায়েব, দেওয়ান যখন যা করে রাজার হুকুমেই করে। আমার কোনো কর্মচারী কিংবা প্রজাবর্গ কোনো কিছুর জন্য দায়ী হয় না। হরদয়াল, কালেক্টরকে ইংরেজি করে বুঝিয়ে দাও। ন্যায়, অন্যায়, ভালোমন্দর দায়িত্ব রাজবাড়ির একমাত্র সক্ষম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ হিসাবে আমারই।

তার মনে বাগচী সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা ছিল। বাগচীকে তো নিজের চোখেই সে কালেক্টরের গুলি খেয়ে ঘুরে পড়তে দেখেছিল। কয়েকদিন পরে যে দাসী ঘরের কাজ করে সে খুব নিচু গলায় বলছিল, হৈমীদিদি বলেছিলেন শিবঠাকুরের পুরোহিতকে, পুরোহিত আমাকে জানালেন, বাগচীমাস্টার ক্রমশ ভালো হচ্ছেন

তবে কিছুই আর ভাবার নেই। বাগচী কোথায় তা জেনেই-বা কী হবে? নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও

সে কি ভাবছে? দিনরাত্রি মিলে বর্তমান একটা যেন স্তব্ধ তড়াগ। অতীতকে ভেবেই-বা কী লাভ? একদিন সে ভাবতে গিয়ে হেসে ফেলেছিল, অতীতকে আমরা মনে আনি ভবিষ্যতের জন্য। বর্তমানের জন্য আদৌ নয়।

একদিন তার ভৃত্য বলেছিল—হুজুর, রূপকাকা পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনার সকালে-বিকালে বেড়ানো হয় কিনা। তা আমি তেলেঙ্গি দুটোকে জিজ্ঞাসা করলাম। তারাও বলল, হুজুরকে তারাও বেড়াতে দেখেনি। মন্দির দিয়ে, মাঠ দিয়ে, নদীর ধার দিয়ে কতই তো বেড়ানোর জায়গা।

রাজচন্দ্র একসময়ে তার সেই নতুন ঘোটকীর কথা মনে করেছিল। ছুটতে পারে বটে। একবার ছুটিয়ে আনলে শরীর ঝরঝরে হয়ে যায় সারাদিনের মতো। একদিন হঠাৎ তার পিয়ানোর কথা মনে হয়েছিল। খুবই সত্য যে পিয়ানোর ঘাটে হাত রাখলে মন ফাঁকা থাকে না।

পিয়েত্রোর বাংলোর জানলা দিয়ে নদীর বাঁধানো পার চোখে পড়ে। সে জানে পারের পরেই শুকনো খাত, তার অনেক পরে জল। একদিন বাংলোর বারান্দার রেলিং-এ হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে তার মনে হয়েছিল আলোতে নদীর জল কাঁপছে, মৃদু ঢেউ তুলছে। এমন যে চোখে ধাঁধা লাগে, চোখে আর দেখতে পায় না। সে কিন্তু চোখের ভুল, সেখান থেকে নদীর জল চোখে পড়ে না।

কিন্তু রাজবাড়ি থেকেই তো তার আহার ও পরিচ্ছদের উপকরণ আসে। একদিন সেখানে খবর গেল, রাজকুমার ইদানীং অর্ধেকও খাচ্ছেন না। শরীর কি শুকিয়েছে? রাজবাড়িতে কথা হল ঝিয়ের বদলে একজন রাঁধুনি পাঠালে হয়। নায়েবের পরামর্শ চাইলে জানা গেল, এক আসবে এক যাবে, তাতে তেলেঙ্গিদের আপত্তি কী?

দু-চারদিনে রাজচন্দ্র একবার খেয়াল করল রান্নার স্বাদে পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এ রকম অদ্ভুত ব্যাপার হল, যে স্বাদের কথা তুলল আর যে পাত্রটাকে ঠেলে দিয়ে উঠে গেল তারা এক লোক নয়। সে যখন খেতে বসে সামনে ভৃত্য থাকে, ঝি তার পিছনে। গোড়া থেকেই তাই ব্যবস্থা। সেও কথা বলে না, তাদের সাহস কী কথা বলে? প্রথম কয়েকদিন তবু ভৃত্য এসে বলত—খেতে দেব, হুজুর? খেতে দেওয়া হয়েছে। এখন সে-ই নিয়মমতো গিয়ে বসে খাওয়ার জায়গায়।

একদিন এক মুহূর্তের জন্য অসাবধানতার ফলে রাঁধুনি ভৃত্যের আগে দাঁড়িয়েছিল। রাজচন্দ্রর মনে হল জাল-জাল কম দামের শাড়ির পায়ের কাছে কিছু একটা চক-চক করছে। সোনার মল? যে সোনার মল দেখল, যে আহারের স্বাদ নিচ্ছে তারা যেন দুজন মানুষ।

একদিন আবার রাজচন্দ্রর মনে হল সময় যদি স্রোত হয় তবে তার দহও থাকতে পারে। স্রোতটা বয়ে যেতে থাকলে উপর থেকে কোথায় দহ বোঝা যায় না। কিন্তু স্রোতের গতি কমলে জলটা দহে জমতে থাকে। দহের পার ছাপিয়ে আর বহতা থাকে না।

কয়েকদিন থেকেই নদীর দিকে চেয়ে থাকলে, বিশেষ দুপুর যখন শেষ হতে থাকে, ধুলো ওড়ে। বাঁধের উপরে ঝুঁকে থাকা আকাশে ধূসর রং দেখা যায় হালকা নীলের নিচে-নিচে। ইতিমধ্যে একদিন বিকেলে আকাশে একরকমের অদ্ভুত সব্জে মেঘ দেখা দিয়েছিল। হলুদ, সবুজ, ধোঁয়ার রং মিলে একটা থমথমে ভাব। হতেই পারে। জ্যৈষ্ঠ শেষ হতে চলে, কালবৈশাখী হয়নি একঘণ্টার জন্যও।

সেদিন দুপুরের পরপরই হঠাৎ নদীর দিক থেকে কয়েকটা ধুলোর ঝাপটা এল। কিছুক্ষণ বাদে সেদিকের আকাশে খানিকটা কালো মেঘ দেখা দিল। সেই কালো মেঘের মধ্যে দিয়ে কয়েকটা পাখি উড়ে গেল। খানিকটা বাদে যেন বাতাস একদম বন্ধ। একদল কাক তাড়াতাড়ি ডেকে উড়ে পালাল। মিনিট দশেক গেল না বিকেলের আকাশে সন্ধ্যা নেমে গেল যেন। এমন যে নদীর উপরের আকাশটা বিদ্যুতে চিরছে মনে হল।

রাঁধুনি আর ভৃত্য জানলা দিয়ে দেখছিল। ভৃত্য বলল, 'আলো জ্বালাতে হবে'।

ভৃত্য ঘরে-ঘরে আলো জ্বালতে চলে গেল।

রাঁধুনি দেখল রাজকুমার বাংলোর বারান্দায় এল। খানিকটা সময় সেখানে দাঁড়িয়ে রাজকুমার বারান্দা থেকে মাঠে নামল। মাঠে থেকে-থেকে একটা বাদামি রং পড়ছে, যেন উপর থেকে। রাজকুমার মাঠে ঘুরে-ঘুরে অবশেষে মন্দিরের সেই উঁচু চত্বর, যা প্রকৃতপক্ষে ফরাসি পিয়েত্রোর হাওয়া ঘরের ভিত, তার উপর গিয়ে দাঁড়াল। হাঁটতে-হাঁটতে একেবারে চত্বরের কিনারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। দূর থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যেন কৌতুকে আর কৌতূহলে কিছু দেখছে।

আর-এক ঝাঁক পাখি খুব ব্যস্তসমস্ত হয়ে উড়ে গেল। মাঠের উপরের বাদামি রংটা ছাইয়ের রং নিল এবার।

এই দ্যাখো, নিজের মনে মন্তব্য করল রাঁধুনি, রাজকুমার চত্বর থেকে নেমে ডানদিকে চলেছে! ওটা কি হাতিশুঁড়ো যা নিচে থেকে বাঁধ ছাড়িয়ে উঠল এবার? রাজকুমার কিন্তু সেটাকে আমল দিল না। দাঁড়িয়ে পড়ে শূন্যে দুহাত তুলছে। এত দূর থেকে বোঝা যায় না কিন্তু আকাশে কি কিছু আছে, যার দিকে হাত তুলছে?

রাঁধুনি বারান্দায় এল। সে দেখল ডানদিকে বাঁধের উপরে একটা অদ্ভুত চেহারার কালো মেঘের টুকরো। সেটাই যেন রাজকুমারের লক্ষ্যে। কালো আর সাদায় মিশিয়ে তৈরি সেই মেঘ। তার জন্যই যেন হাত দুটো আকাশের দিকে তোলা।

এ তো ঝড়, এ তো ঝড়—এই বলল রাঁধুনি। মাটির উপরে সরসর খরখর করে, দরজা-জানালার ঝাপটা শব্দ দিয়ে, বাতাসটা বারান্দাতে ধাক্কা মারল। নদীর ধারে-কাছে বাতাসে বালি থাকবেই। নাকি সেই হাতিশুঁড়োটা ভেঙে পড়ল? গাছপালা নেই, এত শোঁ-শোঁ শব্দ কীসের?

কিন্তু এ কী কাণ্ড! রাজকুমারকে দেখা যায়, যায়ও না। দ্যাখো, ঝড় উঠে এসেছে, ঝড়। পাক খাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে গেল। রাজকুমার সেই মেঘের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে মুখটা এখনও উঁচুদিকে। হঠাৎ ভয় হল রাঁধুনির, যেভাবে চলেছেন বাঁধের ধার থেকে নিচে পড়ে যান যদি!

রাঁধুনি বারান্দা থেকে নেমে নিজেকে বলল, দাঁড়ানো যায় না দেখি। কিছু যেন তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল। সে কি ডাকবে রাজকুমারকে? এই শব্দে তা কি শোনা যাবে? দাঁড়ানোই যায় না। চাদর খুলে গিয়ে পতাকার মতো উড়ছে। তার প্রান্তটাকে গুটিয়ে আনাও কঠিন, তা করতে গেলে পায়ের পাতার ওপরের শাড়ি হাঁটুর কাছে উঠে পাক খাচ্ছে। কিন্তু রাজকুমার? পড়ে গেলেন নাকি?

রাঁধুনি ডাকল, রাজকু-মা-র! ডাকটা এক হাত দূরে গেল কিনা সন্দেহ। রাঁধুনি ছুটতে-ছুটতে ডাকল, রা-জু-! তার পায়ের মলের শব্দ দূরের কথা, তার ফোঁপানোর শব্দও শোনা গেল না।

নয়নতারা ছুটতে-ছুটতে ঘাটের মাথায় এসে দেখল, দেখাই কি যায় চোখ মেলে, নিচে যেন তোলপাড় চলেছে, যেন বাঁধের কোলে নদীর খাত একটা প্রকাণ্ড মন্থন-ভাঁড়। ধুলোর বাতাস ঘূর্ণি তুলে পাক খাচ্ছে। সে কি নামতে পারে? রাজকুমার হাত-ধরে ধরে নামিয়েছিল তাকে এই ভাঙাঘাটে। চুল এলো হয়েছিল, হাত তুলে চুল জড়ো করতে গিয়ে চাদরটা গা থেকে উড়ে সিঁড়িগুলোর পাশ দিয়ে নিচে পড়ে অদৃশ্য হল। কিন্তু রাজকুমার? তাকে তো দেখাই যাচ্ছে না! নয়নতারা চিৎকার করে ডাকল, রা ..জু! ডাকটা বাতাসের শব্দে ডুবে গেল না শুধু, যেন তার চাপে ফিরে এসে তার মুখে জড়িয়ে গেল কান্নার মতো হয়ে। ঘাটের ধাপ বেয়ে নামতে-নামতে, সে তো হাতে পায়েই চলা, শাড়ির আঁচল ছিঁড়ে গেল নিজের পায়ে জড়িয়ে।

শেষ ধাপটা সে লাফিয়ে নামল। কিন্তু রাজকুমার কোথায়? লাফিয়ে নামতে গিয়ে সে হামা দিয়ে পড়েছিল। এ কী, জলও যে এখানে! এ কি বাতাসের তাড়ায় নদীর জলের উপরে উঠে আসা? উঠতে গিয়ে কাঁধের শাড়ি কোমরে নেমে পৎ-পৎ শোঁ-শোঁ করে উড়ছে। তা সত্ত্বেও সেই শব্দকে—সব শব্দকে ডুবিয়ে নয়নতারা হাহাকার করে উঠল, 'রা...জু, আমার রাজু . . .

ঝড়ের গতির বিরুদ্ধে, প্রবাদ আছে, এই গঙ্গার বুকে যখন সেই ঝড়, হাজার পাঁচ হাজার মুণি হলেও,

পাল নামিয়ে না-দিলে পাল ছিঁড়ে রসাতলে যায় নৌকো। মাস্তুলসমেত পাল উড়ে যায়। বাতাসের ঝাপটায় নৌকোকে চরে তুলে দেয়। ধুলোর ঝাপটায় আলোর চোখ অন্ধ করে। নয়নতারার পক্ষে শাড়ি ধরে রাখাই কি সম্ভব! শেষবার বালিয়াড়িটার মাথায় উঠতে গেলে তা কোমর থেকে নেমে একপাকে হাঁটুর কাছ জড়িয়ে ছিল। কে-আর দেখছে সেসব দিকে? সে তো বালির উপরে কপাল চাপড়ে, আমার রাজু বলে, কাঁদছে তখন।

আর তখন আকাশ থেকে তেরচা ধারে জলও নামছে। পায়ের তলে তখন মাঝে মাঝে অগভীর জল। বালিয়াড়িটার, তার মাথাও তো তখন ঝড়ে অনেকটাই উড়ে গিয়েছে, ওপারের গড়ান গায়ে প্রায়ান্ধকার সেই আলোতে নয়নতারা একটা স্তূপের মতো কিছু পড়ে থাকতে দেখল বটে। সে কি বিশ্বাস করবে? সে ভয়ে-ভয়ে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে শেষে আতঙ্কে কেঁদে উঠে দৌড়ল আবার।

ঝড়ে কি শোনা যায়? এই একটু সুবিধা, নয়নতারা তখন দু-হাতে জড়িয়ে রাজুর মুখকে নিজের বুকের উপরে তুলে নিতে পেরেছে। রাজুর কান তার ঠোঁটের কাছে। সে বলল, 'রাজু! রাজু'!

রাজুর মন তার শরীরে ফিরল। সে একবার জিজ্ঞাসা করল, 'কে? নয়ন? নয়নতারা'? কিন্তু সে-মনটা যেন অন্য কারো। যেন ঘুমের ঘোরে সে-মন।

নয়নতারা বলল, 'বা, ওঠো। চলো, আমরা চলে যাই'।

রাজচন্দ্র হঠাৎ সম্বিত পেয়ে উঠে বসে বলল, 'আরে ছি-ছি, নয়নতারা, এই ঝড়ে এভাবে বার হতে হয়'?

নয়নতারা চোখ মুদল না, দু হাতের বাঁধন একটু আলগা করে দিল, নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেরই ঠোঁট দুটিকে রাজুর কপালে ছোঁয়াল।

দু'এক পা চলে রাজচন্দ্র বলল, 'ওমা, এ কী?

নয়নতারা বলল, 'ওভাবে তাকিয়ো না, দেখো না কোথায় খসে পড়েছে। ঠাট্টা কোরো না'।

রাজচন্দ্র হাসল, 'চাইব কেন? অনুভবে ধরা পড়ে'।

তখন বাতাস কমেছে। বাঁকা বৃষ্টির ফলায় শীত লাগিয়ে দিচ্ছে। নয়নতারার পা ঠিকমতো পড়তে চাইছে না। রাজচন্দ্র বলল, 'একেবারে অন্ধকার না-হলে বাংলোয় ফিরবে কী করে'?

গাঢ় অন্ধকার হলে তারা বাংলোয় ফিরে থাকবে।

তখন রাত হয়েছে। বলল, 'আলোটা? থাকবে'?

শেজের আলোতে সে ঘরের চারিদিকে চাইল, যেন ঘরটা তার পরিচিত হওয়াতেই ভালো লাগছে না। বলে, 'চলে যাব, চলো। এখানে আসা তো সেই রাজনগর ফরাসডাঙাতে ফেরাই'।

কিন্তু নয়নতারা শয্যায় এল। বলল, 'বা, আমাকে বুঝি দেখবে না'?

শেজের আলোয় নয়নতারা ঝিকমিক করে হাসল।

অ ষ্টা দ শ প রি চ্ছে দ

সেটা ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের শীতকাল। আবার প্রশ্ন উঠবে, শীত তো খ্রিস্টবর্ষের প্রথমেও থাকে, শেষেও; অর্থাৎ তখন নভেম্বর-ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি? আমার ধারণা নভেম্বর-ডিসেম্বর সময়টাই যুক্তিযুক্ত হবে। শীতকালে প্রকৃতিতে সবুজ কমে, বাদামি, হলুদ, সোনালি বাড়ে। এতক্ষণ তো রেলপথের দু-পারেই মাঠগুলোতে, কৃষকদের বাড়িগুলোতে অনেক গাছের পাতায় সেই বাদামি, হলুদ, লাল এবং সোনালি। তখন গাড়িটা বেশ দ্রুত গতিতে চলেছিল, কিন্তু দিনের আলো ছিল ; এখন ধীরে চললেও দিনের আলোও তো কমে আসছে। ফলে তখন জানলার বাইরে রোদ-মাখানো দৃশ্যগুলোই আকর্ষণ করছিল। তখন রেল রোড এত নতুন যে কামরার জানলায় এ রকম দৃশ্য-পরিবর্তন বিশেষ আনন্দজনক। কারো কাছেই একঘেয়ে লাগার মতো হয়ে ওঠেনি। কিন্তু এখন সেদিক থেকে চোখ সরিয়ে কামরার ভিতরে আনতে হয়। বাতাসটাও ঠাণ্ডা। সার রাজচন্দ্র পরপর দুটো জানলার শার্সি ফেলে দিয়ে কামরার ভিতরের দিকে দৃষ্টি দিল। প্রথম শ্রেণীর কামরা। এখন যেমন তখনও তেমন কিছুটা বৈশিষ্ট্য তো ছিলই অন্য শ্রেণী থেকে। এই কামরাটার আর-একটু বৈশিষ্ট্য বলে নেওয়া যায়। লোহালক্কড়, রিবেট, স্ক্রু সব সোনালি রঙের—পিতলের হবে, সিলিং-এর আলোটা তো পিতলেরই, আর বসবার গদিগুলো প্রকৃতপক্ষে উজ্জ্বল পালিশদার চামড়ার। এটা বলা সম্ভব নয়, এই গাড়িটাতে এ রকম কামরা বরাবর থাকত কিনা। সেদিন ছিল, কয়েকখানাই ছিল। বরং সাধারণের জন্য কামরাই কম। এই কামরায় আপাতত তিনজন যাত্রী। সার রাজচন্দ্র নামে এই দশাসই পুরুষ। তার পায়ের ভারি পুরু সোলের বিলিতি জুতো ওর্স্টেড ট্রাউজার্স ও জুতার মধ্যে দৃশ্যমান খয়েরিতে সাদার ফুল তোলা উলের মোজা, গায়ের চেক টুইড কোট থেকে বোঝা যায়, তার চল্লিশোর্ধ্ব শরীরটা এখন বেশ ভারি, যদিও মজবুত। মাথার পিছন দিকের চুলগুলো ঈষৎ লাল। কলপ? মুখটায় একটা লালচে ভাব আছে যাকে সান্-ট্যান্ বলা যায়। তার উপরে বেশ বড় মাপের খয়েরি-বাদামি গোঁফ। দুটো বাঙ্ক। এপারের বাঙ্কে সার রাজচন্দ্র। ওপারেরটিতে দুজন। একজন মহিলা, অন্যজন পুরুষ। মহিলাটির পরনে দুধ-গরদ, কিন্তু পাড় নেই। সাদা কারো-কারো পছন্দের হয়। সেজন্য গলায় এক লহরের একটা মুক্তার হার, হাতে দুগাছা মুক্তার বালা।

স্নানের সুবিধা কোথায়? তাহলেও কিছুক্ষণ আগে, বিকেলের অভ্যাস অনুসারেই, পাশের ক্লোজেটে গিয়ে শাড়ি পালটে ফিরেছে। এক দুধ-গরদ থেকে অন্য দুধ-গরদ, তখনই চুলগুলো ব্রাশে উজ্জ্বল করে পিঠে ছড়ানো হয়েছে। ফলে মাথা ঝাঁকালে মৃদু সৌরভ উঠছে। সেই বাঙ্কের পুরুষযাত্রীটি বয়সে তরুণ। তাকে এরকম বললে বা তার বয়স একুশ-বাইশ বললেই তারুণ্যটাকে বোঝা যায় না। কারো-কারো চোখে মুখেও বিষয়টা সুখের আকারে জড়ানো থাকে। মনে হয় যেন পৃথিবীর চূড়ায় বসে। খুবই গৌরবর্ণ রং। চুলগুলো কালো এবং কপাল-ঢাকা অবাধ্য। চোখ দুটো ডাগর, চঞ্চলা কোনো মেয়ের যেন। ঠোঁট লাল, তার উপরে সরু গোঁফের রেখা। কারো-কারো এসব পুরুষালি চিহ্ন পরে প্রকাশ পায়। এই তরুণটিকে এখন কিছুটা সলজ্জ দেখাচ্ছে, আর তা বেড়েছে সার রাজচন্দ্র শার্সি নামিয়ে কামরার ভিতরে চোখ রাখাতে। কারণ তরুণটির ট্রাউজার্সের হাঁটুর উপরে একটা সুদৃশ্য তোয়ালে, তার উপরে অনেক রকমের অনেক মিষ্টিযুক্ত রূপার একটি থালা। তরুণটি বুঝতে পারছে না মহিলাটিতে ঝাঁজ কিংবা মিষ্টি বেশি। মিষ্টি সাজিয়ে দিয়ে হাতের উপরে থালা রেখে বলেছিল, হাত দিয়েই খাও, লজ্জা কী? প্রায় একশো মাইল দক্ষিণে একটা স্টেশনে সে তার সুটকেসটা হাতে গাড়ির কামরায় কামরায় টুঁ মেরে বেড়াচ্ছিল। এই কামরার হাতলে হাত দিয়ে এটাকেও রিজার্ভড দেখে সে ফিরে যাচ্ছিল। এই সময়ে মহিলাটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়েছিল। মহিলা বলেছিল, কোথায় যাওয়া হবে? তরুণের গন্তব্য শুনে বলেছিল, আসুন। আমরাও তাই। তরুণ উঠে এসে ইংরেজিতে ধন্যবাদ দিলে মহিলাটিও যথোপযুক্ত উত্তর দিয়েছিল সেই ভাষাতেই। কিন্তু সেই অত্যন্ত রাজকীয় মহিলার আর-একটি দিক টিজ করা, খোঁচান, খেপান। প্রথম

পাঁচ মিনিটেই এইরকম কথা হয়েছিল।

তরুণ, 'সবগুলো ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভড। সবগুলোতে লালমুখো বাঁদর'।

সার রাজচন্দ্র, 'হতেই পারে। এটাকে স্পেশাল ট্রেন বলা যায়'।

মহিলা, 'কারো ল্যাজ টানোনি তো'?

তারপর এক ঘণ্টার মধ্যে তরুণের নাম কুমারনারায়ণ জেনে তাকে কুমার বলে যাচ্ছে এই মহিলা। একবার তরুণ বলেছিল দুটো শব্দ মিলে একটা নাম। মহিলাটি বলেছিল, 'আমরা 'কুমার' বলতে অভ্যস্ত। অসুবিধা হচ্ছে না'। সার রাজচন্দ্র গাড়ির ভিতরের দিকে মুখ ফেরালে তরুণটি ভাবল, এই সার লোকটি? চটপটে তো বটেই, যদিও চোখে দেখে অন্য রকম মনে হতে পারে। নৃশংস? নাকি কিছু ভেবে কাজ করে না? এর আগের স্টেশন ছাড়ার কয়েক মিনিট পরেই ট্রেনটাকে চেন টেনে থামিয়ে রাইফেল নিয়ে নেমেছিল। যে হরিণটাকে ছুটন্ত ট্রেনের সব যাত্রী দু-তিন মিনিট ধরে দেখে অবাক হচ্ছিল, সেটাকে গুলি করে মারল। যাই হোক, গাড়িটার সেখানে, সেই মাঠের মধ্যে, আধঘণ্টা দেরি হয়ে গিয়েছে। আর এখন তো ধিকিধিকি চলেছে। নতুন লাইন, মাত্র দুমাস আগে শেষ হয়েছে। এখন ট্রেন এই লাইনের বর্তমান শেষ স্টেশন তারাবাড়ির উদ্দেশ্যে চলেছে।

আর কয়েক মাইল পরেই সেই তারাবাড়ি স্টেশন। এখানে এখনও প্রধান যোগাযোগ তো স্টিমারেই ছিল। তার স্টেশনের নাম তারাবাড়িঘাট। এখন এই রেল-স্টেশন হওয়ার পরে হয়তো স্টিমার-স্টেশনটার মর্যাদা কমে যাবে। আজ সেই তারাবাড়ি রেল-স্টেশনে, তার নতুন বাড়িতে, নতুন-করা প্ল্যাটফর্মে, যাতে এখানে-ওখানে রাখা টবের গাছ, নিশ্চয় এতক্ষণে অনেক আলো জ্বালানো হয়েছে। নতুন স্টেশনমাস্টার তার স্টাফ নিয়ে এই প্রথম ট্রেনের অপেক্ষায় ঘর-বার করছে। আমাদের ভাবাই অভ্যাস। এই তারাবাড়ি নাম নিয়ে ভাবাটা অবশ্য কিছু পুরনো, কারণ তারাবাড়িঘাট তো বছর পনেরোই হয়েছে। ধর্মের দেশে ধর্মের কথাই আগে মনে আসে। কিন্তু তারাবাড়িতে সার রাজচন্দ্রের প্রকাণ্ড বাড়িটার দিকে মুখ করে দাঁড়ালে যে একমাত্র মন্দিরটা দেখতে পাও, সেটা বিশেষ সুন্দরই, যদিও রক্ষণাবেক্ষণে কিছু ত্রুটি চোখে পড়ে, সেটা কিন্তু শিবের, আর মন্দির বলতে এখানে ওই একটিই। পুরোহিতকে এ রকম বলায় সে নাকি বলেছিল, তা তারা গৌরী একই তো ; গৌরীপাটেই তো তারারও অধিষ্ঠান ধরা যায়। তাছাড়া শিবের অন্তরে কি তারা নেই?

মহিলা বলল, 'তোমাকে স্যান্ডউইচ দু-একটা'?

সার রাজচন্দ্র প্রথমে বলল, 'না। পরে বলল—একটু পোর্ট দাও'।

মহিলা উঠে বেত কাঠ পিতলের সমন্বয়ে তৈরি সুদৃশ্য ঝাঁপি খুলে প্লেট ইত্যাদি বার করে, একটা প্লেটে একটা স্যান্ডউইচ সার রাজচন্দ্রর বাঙ্কে তার পাশে রাখল। দুটো ওয়াইন-কাপ বার করে আর-একটা তেমন প্লেটে রাখল। একটা গাঢ় ব্রাউন রঙের বোতল বার করে রাখল তার উপরে। তরুণ নিষেধ করলেও খান-দুয়েক স্যান্ডউইচ তার প্লেটে তুলে দিল মহিলা। বলল, 'মাটন ওনলি'। সার রাজচন্দ্র বোতল খুলল, নিজের ওয়াইন-কাপটাকে পুরো ভরে নিয়ে দ্বিতীয় কাপটাকে আধাআধি ভরে মহিলাকে 'নাও' বলে তুলে দিল।

একবার মহিলা বলল, 'এতগুলো গেস্ট নিয়ে চলেছ, অথচ গাড়ি তো যেন শামুক। ডিনার শেষ হতে মাঝরাত না-হয়। ঘরগুলোর-বা কী ব্যবস্থা হয়েছে, কে জানে'!

সার রাজচন্দ্র বলল, 'তুমি তো তাদের টেলিগ্রাম করেই জানিয়েছ গেস্টের কথা; কেন মিছে উদ্বেগ'?

তরুণ কুমারনারায়ণ ভাবল, সম্বন্ধটা স্বামী-স্ত্রীর মতো মনে হয় ; বোধ হয় হিন্দু নয়। সিঁদুর তো নেই-ই, শাড়ি সাদা। আর এখন দ্যাখো। ওয়াইন কাপটা অবলীলায় ...! সার রাজচন্দ্র তবু তো স্যান্ডউইচ চিবোচ্ছেন, এঁর দ্যাখো, নিছক ওয়াইন।

ট্রেনটা জোরে ক'টা হুইসিল দিল, তাহলে তারাবাড়ি নামে সেই নতুন স্টেশনের আলো চোখে

পড়েছে। তরুণ জানলার কাচ দিয়ে একবার চাইল। দূরে যে আলোকবিন্দু তা কোথায় কত দূরে কত অন্ধকারের গভীরে বোঝা যায় না। তাহলেও গন্তব্যের আর বেশি দেরি নেই। সে তার লাগেজ বলতে একমাত্র বড় সুটকেসটার উপরে চোখ বুলিয়ে নিল। বোঝাটা বড় নয়, আসল ব্যাপারটা অন্ধকার। ট্রেনটার শিডিউল স্টপ বিকেল পাঁচটায়, এখন সাতটা বাজতে চলেছে। ওই আলোকবিন্দুই প্রমাণ করে তার চারিদিকে কী রকম অন্ধকার হবে গ্রামের পথে। লোককে জিজ্ঞাসা করেই যেতে হবে, হয়তো পথে লোকও থাকবে না। উপরন্তু যে-রকম হদিশ পাত্তা নিয়ে সে রওনা হয়েছিল, এখন ব্যাপারটা তার কিছু অন্য রকম দেখছে। সে শুনেছিল, মরেলগঞ্জে রেলওয়ে স্টেশন নেই। কিন্তু সেটা রাজনগরের মাইল দুয়েক উত্তরে। রাজনগর নামে যে-স্টেশনটা তারা পার হয়ে এসেছে তা নাকি মরেলগঞ্জ থেকে ক্রোশ পাঁচ-ছয় দূরে। রাজনগর আসছে শুনে সে নামার জন্য প্রস্তুত হতে গেলে মহিলা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি রাজনগরে নামবে বলেছিলে না'?

'এটাই তো'?

মহিলা বলেছিল, 'রাজনগর স্টেশনে, না রাজনগরে? এটা রাজনগর নয়, আসলে এটাকে কায়েতবাড়ি বলে। রাজা এখানেই থাকতেন বলে স্টেশনের নাম রাজনগর। আসল রাজনগর তারাবাড়ি নামে নতুন স্টেশনের দিকে, বরং তাকেও ছাড়িয়ে দু ক্রোশ। তোমার তারাবাড়িতে নামা ভালো। তারাবাড়িও আসল নাম নয়। আসল নাম ফরাসডাঙাই এখনও চলে'।

তরুণের সম্ভবত রাজা সম্বন্ধে কৌতূহল ছিল অন্য অনেকের মতো। সে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রাজার কথা তুলেছিল। তখন মহিলা বলেছিল, রাজার নাম ছিল মহারাজা কর্নেল সার মুকুন্দবিলাস স্মৃতি খাঁ, কে. সি. বি.। কিন্তু বছর দুয়েক হল তিনি গত হয়েছেন। মহারানী পুত্রকন্যাদের নিয়ে বিলেতেই থাকেন প্রায়।

পোর্টের বোকেটা বিশেষ ভালো। কামরাটা ভরে উঠেছে গন্ধে। সার রাজচন্দ্র সিগার ধরাল। টান দিয়ে কাশতে শুরু করলে মহিলা বলল, 'পাহাড় থেকে নামা সাত দিন হয়ে গেল। কাশিটা রয়ে গেল। কিছুতে শুনলে না ডাক্তার দেখানোর কথা, কলকাতায় থেকেও ...

সার রাজচন্দ্র কথাটাকে কিংবা মুখের সামনের ধোঁয়াটাকে মৃদু হাত নেড়ে সরিয়ে দিল। তার আঙুলগুলো লম্বা, শরীরের গড়নের তুলনায় বরং সরু আর হালকা। সে হেসে বলল, 'তার চাইতে মজার কথাটা ভাবো হৈমী, রানীমারই লোকসান হয়েছিল। তাঁর বন্দা আর গজা গিয়েছিল ; ওদের তো একটা পাইক'।

হৈমী বলল, 'মনোহর সিং-এর ব্যাপারটা'?

'সেটা একটা ভাঁড় ছিল না'?

সার রাজচন্দ্র, ধোঁয়া লাগলে যেমন, চোখ দুটোকে স্তিমিত করে একটু ভাবল।

হৈমী বলল, 'মশাল নাকি'?

রাজচন্দ্র কাঁচের উপরে পিছলে যাওয়া ধোঁয়াটে লাল আলোটাকে দেখে নিয়ে বলল, 'লাইন ক্লিয়ারেন্স। তাহলে তোমার তারাবাড়ি আর এক ফারলং'। সে সিগারেটকে কামরার অ্যাশট্রেতে রেখে নিজের ওয়াইন-কাপটা আবার ভরে নিল, হৈমীর ওয়াইন-কাপটাতেও ঢেলে দিল প্রায় পুরো কাপ।

কুমারনারায়ণ নামে সেই তরুণের একটা বিচিত্র অনুভূতি হল। এক ফারলং যেতে কতটুকুই-বা সময়, কিন্তু দ্যাখো, নামার আগে যে গোছগাছ করা হয় তার কোনো চেষ্টা নেই। বাস্পারটার ডালা খোলা হয়েছিল, তেমন খোলা। এদিকে-ওদিকে অনেক মালপত্র ছড়ানো। দু-দুটো রাইফেল, পাহাড়ে বেড়ানোর দু-একটা লাঠি, শহরে বেড়ানোর লাঠি, শাল, কোট, রাগ, এখানে-ওখানে রাখা ; তাছাড়া স্তূপাকার ট্রাঙ্ক, সুটকেস। সে মনে-মনে হেসে ভাবল : ওয়াইন-কাপ হাতেই নামবে? হয়তো বোতলটা, গ্লাসগুলোও ছড়ানো থাকবে কামরায়। হয়তো ভৃত্যরা এসে গুছিয়ে নামাবে সবকিছু।

ওয়াইন-কাপটা তুলে ঠোঁটের কাছে এনে হৈমী সলজ্জভাবে হাসল। এই প্রথম তার মার্বল-সাদা গালে কিছু অন্য রং দেখা দিল। লজ্জা বোধ হল তার। তার মনে পড়ল, লজ্জায় পড়েছিল সে। বিশ বছর আগেকার সে-লজ্জা অবশ্যই পালাতে বলে না। গল্পের মতো মনে পড়ে।

হ্যাঁ, বেশ লজ্জাই। যা কেউ ভাবতে পারে না তেমন করে নিজের মহল থেকে রাজকুমারের মহল পর্যন্ত সমস্তটা পথ দাসদাসী, আত্মীয়স্বজন, কর্মচারীদের ভীত সন্ত্রস্ত করে রানী নিজে রাজকুমারের শোবার ঘরে এসে দাঁড়ালেন। বলতে-বলতে ঢুকলেন—কী আক্কেল তোমার, রাজু? স্নানের সময় হয়। ওরা গন্ধ নিয়ে, কত রকমের জল নিয়ে বসে...কিন্তু কথা শেষ করার আগে রাজকুমারের বিছানার দিকে চোখ পড়েছিল। বিছানার উপরে রাজকুমার, তার হাতে ওয়াইন-গ্লাসে ভরা হুইস্কি তখন। এক হাত দূরে হৈমী, তার হাতেও তেমন। মনে হয়েছিল, রানীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেউ রং ঢেলে দিল। যেন ফিরে যাবেন, দৌড়ে পালাবেন। কিন্তু লোহার মতো শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন, বললেন—'হৈমী'!

হৈমী উঠে দাঁড়াল। হুইস্কি চলকে পড়ল, কিন্তু যা সে বুঝতে পারেনি, ততটা হুইস্কি, অনেকবার অল্প-অল্প করে হলেও, তার ভিতরে তখন। পা টলে উঠলে সে খাটের থাম ধরে দাঁড়িয়েছিল।

রানী ছিঃ-ছিঃ বলতে গেলেন, কিন্তু দৃঢ়স্বরে বললেন ...

এটা স্বীকার করতেই হবে, হৈমী ভাবল, তখন কম বয়সের তুলনাতেও, বোকা ছিলাম। নতুবা কেউ একজন অনুরোধ করতে থাকলেই প্রায় এক দেড় ঘণ্টা ধরে, কারো সঙ্গী হওয়ার জন্যই, একটু-একটু করে অতটা হুইস্কি কেন খেয়ে ফেলব যাতে পা টলে যায়, সবকিছু স্বপ্ন-স্বপ্ন লাগে? রাজকুমার বে-এক্তিয়ারই ছিলেন। তা না-হলে কেউ কি বলে, যেমন বলছিলেন—এত লোক, বাড়ি-ভরা এত মানুষ, এর মধ্যে কি নয়নতারা নেই? নয়ন আসেনি বলছ? এত উৎসব, এত আয়োজন, তবু নয়নতারা ফেরেনি, এ কি বিশ্বাস করতে বলো? অথচ দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পর থেকে রাজকুমার একেবারে স্তব্ধ ছিলেন। সেই পাঁচ-ছয় মাসে কারো সঙ্গেই কি কথা বলেছেন? রাজবাড়ির সংসার তেমনই চলছিল যেমন চলে, বরং সেই উৎসবের আয়োজনগুলো ধীরে ধীরে ...। এটা কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপারই যে রাজবাড়ির বোটটা থেকে কেউ তেমন পড়ে যেতে পারে, শুধু দুই নদী কেমন মিলছে দেখতে গিয়ে। হোক তা ভাদ্রের গঙ্গা। সংবাদ পেয়ে স্বয়ং হরদয়াল গিয়েছিল তদন্তে, কিন্তু এলাহাবাদের কাছে গঙ্গায় জাল ফেলে কি কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়? রূপচাঁদ তো প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জলে লাফিয়ে পড়েছিল; সেও তলিয়ে গিয়েছিল মাত্র। কারো-কারো জীবন দুর্ঘটনাবহুল হয়।

রানী দৃঢ়স্বরে বললেন—হৈমী, রাজকুমারকে বাথে নিয়ে যাও স্নান করাতে, রূপচাঁদকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। খবরটা যেন বাইরে না-যায়। রাজু, আজ তোমার বিবাহের দিন তা জানতে, অথচ ...

রাজচন্দ্র উঠে দাঁড়াল। তার মুখ কথা বলার আবেগে লাল হয়ে উঠল। সে যে দু পায়ের উপরে টলছে তা বোঝা গেল। কথা তৈরি করার চেষ্টায় ডান হাতে বাড়িয়ে যেন শূন্যে অক্ষর আঁকতে লাগল। কিন্তু কথা এসেও গেল—বিয়ে? কার বিয়ে? কী যে বলো তুমি, মা!

হঠাৎ রাজকুমার যেন রানীমাকে এতক্ষণে দেখতে পেল, নিজের মুখের উপরে হাত রাখল, বেশ স্পষ্ট করে ভেবে নিল, বলল—ও, তুমি আমার বিবাহের কথা বলছ? তা সব লোককে বিবাহ করতে হবে কেন? নাঃ, আমি বিবাহ করব না।

রানীমা কী বুঝলেন কে জানে? ধমক দিতে গেলেন, কিন্তু গলা নামিয়ে বললেন—রাজু, এখন আর তা বলা যায় না। কন্যাপক্ষ উপস্থিত। কন্যার অধিবাস হয়ে গিয়েছে। তার মুখ চেয়েও ... । কথাটা শেষ হল না।

শেষ করা যায় না। সকলেই জেনেছিল, হৈমীর তো বেশি জানার কথাই। গুণাঢ্য মহাশয় সপরিবারে

সবান্ধবে তখন রাজনগরে। একটা গোলমাল চলেছিল বটে। তা কিন্তু বিবাহ হবে না এমন কথা নয়। রানী নাকি বিবাহের আগের বিকেলে আবদার তুলেছিলেন শালগ্রামশিলা সাক্ষী রাখা হোক, মন্ত্রগুলো সংস্কৃতে পাঠ করা হোক, আমার একইমাত্র ছেলে। এটা কি তাৎক্ষণিক আবেগ? অথবা অনেকদিনের পরিকল্পনা? ব্রাহ্ম মেয়েকে পুত্রবধূ করছি অথচ বিবাহটা হবে হিন্দু মতে? গুণাঢ্য মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর পরিবার ছাড়াও সমাজের অনেক প্রধান স্থানীয় ব্যক্তি। তাঁরা বলে পাঠালেন, এমন অপমানজনক প্রস্তাবে রাজি হওয়ার চাইতে তাঁরা বরং কন্যাকে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। তখন রানীর সেটা আর অনুরোধে রইল না। সন্ধ্যার কিছু পরে গুণাঢ্য আর তাঁর কন্যাকে তাঁদের আপত্তি সত্ত্বেও রাজবাড়িতে এনে রাখা হয়েছে। অবশিষ্ট কন্যাযাত্রী তখন? আমোদ-আহ্লাদ, খাওয়া-দাওয়া, বিভূগুণগান সব চলতে পারে, বিবাহকর্ম সমাধা না-হওয়া পর্যন্ত কেউ সেই বাড়ির বাইরে যাবে না। রানীমার হুকুম। অন্তত ত্রিশজন বরকন্দাজ যেন তাদের সম্মানের জন্য বাড়িটাকে চারদিক ঘিরে পাহারা দিচ্ছিল।

কিন্তু রানীর সেটা পরাজয়ের দিন ছিল। পরাজয়কে জয়ে পরিণত করার কৌশলগুলো কি একটাও খাটল? কবিরাজ রাজচন্দ্রকে ঘুমের ওষুধ দিয়েছিল। সন্ধ্যার কিছু আগে রাজচন্দ্র ঘুম থেকে উঠেছিল। ইতিমধ্যে দাসীরাও হৈমীকে ঘুম থেকে তুলে বলেছিল, রানী বলেছেন রাজকুমারকে স্নান করিয়ে সাজিয়ে দিতে। হৈমী এসে দেখেছিল, রাজকুমার তার রাইডিং কোট পরছে। আর তখন রানী দ্বিতীয়বার এসেছিলেন রাজচন্দ্রর শোবার ঘরে। কথা কি আর বেশি হল? দুজন তো দুজনকে চেনেনই।

রানীকে তখন বরং শান্ত দেখাচ্ছিল। তাঁর ঠোঁট কাঁপছিল মনে হলেও, কথাগুলি নিচু স্বরের হলেও, তা সব খুব স্পষ্ট ছিল। তিনি বললেন—তুমি কি বাইরে যাচ্ছ, পিয়েত্রোর বাংলোয় ফিরে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ, মা। সেটাই ভালো লাগবে মনে হচ্ছে।

রানী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললেন—তোমার বিবাহের ব্যাপারে ইতিমধ্যে আমি কেলেঙ্কারি করেছি।

—বিবাহ আমি করছি না।

—এইসব মানুষেরা অপমানিত হয়ে ফিরে যাবে? সেই নির্দোষ কন্যাটির কথাও ভাবো।

—আমি নিরুপায়। কিছু টাকা দিয়ে দাও।

রানী গলাটাকে আরো নামালেন—শোনো, রাজু, তোমাদের সম্পত্তির চার আনা অংশ আমার, তা জানো? আমি আজ সেই চার আনা অংশ আমার ভাবী পুত্রবধূর নামে লিখে দিয়েছি। গুণাঢ্যমশায় নিজে তার একজন সাক্ষী। আমি সে দস্তখত ফেরত নিতে পারব না। তার অর্থ কী হয় জানো?

রাজু বলল—ওটাই তো যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হয়েছে।

—এটা হাসির কথা নয়, রাজু। মুকুন্দ এখন সাবালক, তাকেও তার ছ আনা দিয়ে দিতে হবে। তোমার তাহলে কী রইল?

রাজু বলল—আমাকে কি তোমার পা ছুঁয়ে বলতে হবে বাকি ছ আনাতেও আমার লোভ নেই?

রানী অদ্ভুতভাবে হাসলেন। বললেন—যেন রসিকতাই, অবশ্য তোমার ফরাসডাঙা থাকে।

বিবাহ হয়েছিল, আর তা গুণাঢ্যর সমাজকে খুশি করেই, ব্রাহ্মমতে। গুণাঢ্যকে ধাক্কাটা সামলে নিতে সময় দিয়ে সকন্যা তাঁকে কন্যা-নিবাসে ফেরত পাঠিয়েছিলেন রানী। কায়েত-কুমার মুকুন্দ তো এই উৎসবের জন্যই ফারলো নিয়ে চীন থেকে এসেছিল, আর মায়ের সঙ্গে রাজবাড়িতেই উপস্থিত ছিল। সেই রাত্রিতেই গুণাঢ্যর কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল তার। ঘুমের ঘোরে কন্যা কি টের পেয়েছিল যে বর বদলে গেল?

সে দিনই জানা গিয়েছিল, কায়েত বাড়ির কুমারও এ বাড়িরই রাজকুমার, বরং সেই জ্যেষ্ঠ এবং তার নামটা অত বড়, 'মুকুন্দবিলাসস্মৃতি।

অবশ্য বলা যায়, হৈমী সার বাজচন্দ্রকে একবার দেখে নিল, সম্পত্তির ছ-আনা অংশের সঙ্গে ফরাসডাঙা আর নানা শেয়ার ও স্টক যোগ হলে কম হয় না, যদিও রাজনগরের রাজবাড়িটাও রানীমার

চার-আনি অংশের মধ্যে পড়ে বলে তা হাতছাড়া হয় ; আর তখনকার দিনে গুণাঢ্যর সহায়তা না-পেলে ফরাসডাঙাকে নিয়ে অত কেলেঙ্কারির পরে কারো আর রাজা উপাধি পাওয়া সম্ভব ছিল না।

২

সেই রাত্রির সেই ব্যাপারে মৃত রাজার সম্পত্তির ট্রাস্টি হিসাবে রানী একটা দীর্ঘদিনের ভুলকে শুধরে নিলেন কিনা বলা যায় না। কিন্তু গাড়িটা থামল। যেমন ছিল তেমন অবস্থাতেই সার রাজচন্দ্র প্রথমে, পরে হৈমী নামল গাড়ি থেকে। ভৃত্যরা, কর্মচারীরা তো প্রস্তুত ছিলই। তারা মালপত্র গুছিয়ে নিতে গাড়িতে উঠল। কুমারনাবায়ণেরই বরং তাদের ভিড় এড়িয়ে নামতে অসুবিধা হল। ততক্ষণে পাশাপাশি আর-সব কামরা থেকে কুমারনারায়ণের সেই লালমুখোরা নামছে। সার রাজচন্দ্র একজন কর্মচারীকে তাদের দেখিয়ে দিল। তারা অবশ্যই শুধু লালমুখো নয়। রেলের বড় অফিসার, জেলার কালেক্টর, ছোটলাটের প্রাইভেট সেক্রেটারি ইত্যাদি।

তারা সকলেই কর্মচারীদের যার-যার মালপত্র দেখিয়ে দিতে ব্যস্ত, তাছাড়া তারপরেও তো তাদের স্টেশন পরিদর্শন নামে কর্তব্য আছে। নতুন স্টেশনে সেই সন্ধ্যাতেই তো প্রথম গাড়ি এসেছে। স্টেশনটাকেও সেজন্যই সুসজ্জিত করা।

তারা সকলেই আবার সে রাত্রির জন্য বাজচন্দ্রর গেস্ট। রাজচন্দ্র এবং হৈমী স্টেশনের টিকেট-গেটের পাশে আলোর নিচে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। কুমাবনারায়ণ তার সুটকেসটাকে টানতে-টানতে, স্টেশনের আলো আর সেই আলোর বাইরে অন্ধকাব, যাকে সূচীভেদ্য বলা যায়, দেখতে-দেখতে গেটের কাছেই এসে পৌঁছল। হৈমী তাকে আগে দেখতে পেল। সে নিজে তো অন্ধকার দেখেই চিন্তাকুল।

হৈমী বলল, 'এই যে কুমার, জার্নিস এন্ড'?

কুমারনারায়ণ হেসে বলল, 'আপনাদের কর্মচারীর ভিড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম, অসংখ্য ধন্যবাদ'।

'নট অ্যাট অল। এখন কোথায় যাবে মনস্থ করেছ? তোমার গাড়ি এসেছে'?

কুমার জানাল, সে মরেলগঞ্জে যাবে, তার গাড়ি আসার কোনো কথা নেই।

'মরেলগঞ্জ। সেখানে? সেখানে অন্ধকারে কী করে যাবে? আগে কখন গিয়েছ?

কুমার বলল, 'অন্ধকার দেখে এখন আশঙ্কা বটে। পথপ্রদর্শক, অন্তত একটা হারিকেন পেলেও হতো'।

'তা তোমাকে দেওয়া যায়', হৈমী হাসল, 'কিন্তু এমন সোফিস্টিকেটেড মানুষ, সেই অজ-পাড়াগাঁয়ে এত রাতে কোথায় যাবে'?

'মরেলগঞ্জে আমার মামার বাড়ি'।

'তাহলে লোক ঠিক করে দেব? আমি অবশ্য মরেলগঞ্জের কাউকে চিনি না। শুনছ, এই যুবক মরেলগঞ্জে যেতে চাইছে'।

সার রাজচন্দ্র ছিল। সে হৈমীর কথা শুনে আপাদমস্তক ইউরোপীয় পোশাক-পরা কুমারকে দেখে নিল, সে তো গাড়িতে অনেকক্ষণ ধরেই তার ইউরোপীয় ম্যানার্স লক্ষ্যও করেছে, সে অন্যমনস্কর মতোই বলল, 'কিন্তু নীলকুঠি তো বছর বিশেক আগে থেকেই উঠে গিয়েছে। সেখানে একমাত্র তাদেরই বাসযোগ্য বাংলো ছিল। হ্যাঁ, বিশ বছর তো হলই। খোঁড়া ডানকান ফিরেছিল বটে, কিন্তু তারপর তারা সকলেই তো আমাদের চা-বাগানে। তারা তখনই বুঝেছিল নীলের চাইতে চায়ে লাভ বেশি। বাংলো-টাংলোও সম্পত্তিসমেত মহারাজার কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। বোধ হয় বছর দশেক আগে একটি ট্যাশ মেয়ে থাকত বটে সেই ভাঙাচোরা বাংলোয়'।

সার রাজচন্দ্র কর্তব্য শেষ করে শিস দেওয়ার জন্য ঠোঁট গোল করল। বোঝা যাচ্ছে, নিজের বাড়িতে ফিরে বেশ সুখী।

হৈমী কুমারকে এবার বেশ বিব্রত দেখতে পেল। বলল, 'তাহলে? কাল দিনের বেলা বরং মামাকে খুঁজো। আজ বরং আমাদের কাছে থাকবে? এখানে সম্ভবত ওয়েটিং-রুম হয়নি এখনও'।

'কিন্তু এমনিই তো আপনাদের অনেক গেস্ট শুনলাম'।

হৈমী বলল, 'শুনছ, এই ছেলেটি বলছে তোমার অনেক গেস্ট সেজন্য তাকে রাত করে মরেলগঞ্জ যেতে হচ্ছে'।

রাজচন্দ্র সবার উপর দিয়ে সেই লালমুখোদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখছিল, বলল, 'সিলি! গলা তুলে একটু উঁচু করে বলল, ও, বিলি, আই'ম্ ওয়েটিং'।

বিলি সম্ভবত ছোটলাটের সেক্রেটারি, কাঁধে-হাতে ভঙ্গি করে বলল, 'দিজ রেলওয়েমেন্...!

সুতরাং অন্যান্য গেস্টরা দু-তিনটে ব্রুহ্যামে ভাগ করে উঠলে, জোড়া ঘোড়ার ল্যান্ডোটাতে হৈমী ও সার রাজচন্দ্রের সঙ্গে কুমারকে উঠতে হল।

সাতজন গেস্ট তো ছিলই ; টেলিগ্রাম পেয়ে অল্প সময়ে ভৃত্যরা একতলার সাতটা শোবার ঘর প্রস্তুত রেখেছিল। দোতলায় ওঠার স্টেয়ারকেসের বাঁ দিকে আরো দু-তিনখানা ঘর। পুরো শীতটা সেগুলো তালাবন্ধ ছিল। লন পার হয়ে গাড়িবারান্দার দুপাশের ঘরগুলোতে 'দিস ইয়োর্স' বলে এক-একজন গেস্টকে দেখিয়ে দিয়ে এবং 'ড্রিংকস্ পাঠাচ্ছি, কিন্তু বোধ হয় আধঘণ্টায় ডিনার গং' বলে সিঁড়ির গোড়ায় তখন সার রাজচন্দ্র এবং হৈমী। তখনও কুমারনারায়ণ তাদের পিছনে। তাকে দেখে ভৃত্যরা একটু মুশকিলে পড়ল। বন্ধ ঘরের তালা খুলবে কিনা এই দ্বিধা করতে লাগল। তখন রাজচন্দ্র বলল, 'ও ঘর তো ঠাণ্ডা হবে, তুমি বরং ওপরে এসো, মিস্টার কুমারনারায়ণ।

দোতলায় রাজচন্দ্র বলল, 'তুমি এই ড্রয়িংরুমে আপাতত বোসো। এটার সঙ্গে বাথ আছে। এখানে তুমি তৈরি হয়ে নাও। ইনফরম্যাল ডিনার, পোশাক না-পাল্টালেও চলবে। আমি তোমার শোবার ঘর ঠিক করে দেব। তোমার ড্রিংকস্'?

কুমার 'শুধু চা' বললে, রাজচন্দ্র বলল, 'বেশ-বেশ, হৈমী এসে ততক্ষণ গল্প করবে। আমি একটু গেস্টদের ড্রিংকসের ব্যবস্থা দেখে আসছি'।

সুতরাং কিছু রিফ্রেশড হয়ে কুমার বসতে না বসতেই ভৃত্য তার চা নিয়ে এল এবং কিছুপরেই হৈমীরও হাসিমুখ দেখা দিল। ইতিমধ্যে সে আবার পোশাক পালটেছে। শাড়ি তেমন সাদাই বটে, মুক্তোর বদলে কানে হাতে গলায় পোখরাজ। গল্পটা কোনদিকে গড়ায়, সূচনায় যাই থাক, তা সম্ভবত যে গল্প করছে তার মনের নিকটতর বিষয়গুলোর দিকে গড়িয়ে যায়। সুতরাং কুমার যখন সেই ড্রয়িংরুমের কোণে রাখা পাহাড়ে চলা লাঠির দিকে লক্ষ্য করে বলল, আপনারা দুজনেই পাহাড়ে গিয়েছিলেন? অনেক দূর উঠেছিলেন নাকি? হৈমী এক কথায় 'হাঁ-না' না বলে বলল, এই তো দিন সাতেক আগে পাহাড় থেকে নামা হল। আমি অবশ্য আলমোড়ার চাইতে বেশি ওপরে উঠিনি। সার রাজচন্দ্র অনেক দূরই গিয়েছিলেন। 'তুমি কি ওদিকের পাহাড়ে কখনো গিয়েছো? সার রাজচন্দ্রেরও এবার এই প্রথম। কিন্তু আসকোট, বালুয়াকোট, সাংখোলা, গারবিয়ং, লিপুধুরা পর্যন্ত এবার গিয়েছিলেন।

কুমার বলল, 'এসব তো বিখ্যাত জায়গা নয়। তাহলে জানতাম বোধ হয়। আমি আলমোড়ার এক প্রাইভেট স্কুলে কিছুদিন পড়েছি। আলমোড়াই সবচাইতে বড় জায়গা ওদিকে, কিন্তু সেটাও তো বন, আর পাহাড়, চীর বন, আর বড়জোর ঝর্না'।

হৈমী বলল, 'না, বড় জায়গা নয়। আসলে সার রাজচন্দ্র একজনকে সি-অফ করতে গিয়েছিলেন'। হৈমী একটু ভাবল, সার রাজচন্দ্র ফিরে এসে যে পথের কষ্টের কথা বলেছে, অনেক জায়গাতেই যে বরফ ছিল, আবহাওয়ার তাপমান যে হিমাঙ্কের নিচে, সব পথটাই প্রাণ হাতে করে চলা, তা তার

অনুভূতিতে ফিরল। বলল, 'হ্যাঁ, এটা সার রাজচন্দ্রর খুবই দৃঢ়তা আর সহনশীলতার পরিচয়। তুমি নিশ্চয় মানস-সরোবরের নাম শুনেছ'।

'হ্যাঁ, তা তো তিব্বতে।

'নিশ্চয়। লিপুধুরাতে পৌঁছেতেই হাত-পা অবশ হয়ে যায়। প্রচুর শীতবস্ত্র না-থাকলে মৃত্যু হওয়া অসম্ভব নয় এই শীতে। আর পথ তো পাথরে-পাথরে পা রেখে চলা, ভালো গাইড না-থাকলে আর তারা সাহায্য না-করলে আমাদের মতো মানুষেরা এক পা-ও বাড়াতে পারবে না। আর মানস সরোবর সে তো শুনেছি বরফে চলা আর প্রতি মুহূর্তে পড়ে প্রাণ হারানোর ঝুঁকি নয় শুধু, ডাকাতের হাতে পড়ার আশঙ্কা'।

আগ্রহ বোধ করে কুমার বলল, 'আপনি সি-অফ করার কথা বলছিলেন, ও পথে সি-অফ মানে? ওটা কোথাকার পথ'?

হৈমী ভাবল কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা, কিন্তু পরে সেই গল্পটার আবেগই যেন নিজে থেকে তার মনে আত্মপ্রকাশের চাপ দিল। সে বলল, 'তিনি একজন বৃদ্ধা, না-না, প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন বৃদ্ধা রানী। তিনি মানস-সরোবরের উদ্দেশে গেলেন কিনা। বয়স প্রায় ষাট হয়েছে। সঙ্গে দু-একজন মাত্র লোক। তা সেই ভৃত্যটিও বৃদ্ধ। গাইডটা অবশ্য মাঝবয়সী। পাহাড়ি ঘোড়ায় হয়তো এখনও চলেছেন। এই দারুণ শীতে আর সেই নিঃসঙ্গ বরফ-ঢাকা পাহাড়ে দিনে তিন-চার মাইলের বেশি কি আর চলা সম্ভব? আর রোজ কি চলতেও পারবেন'? হৈমী তার সাদা শালটাকে টেনে হাত দুটোকে ঢেকে নিল।

কুমার বলল, 'বাপ্‌রে! তিনি খুব ধর্মপ্রাণা? এ যে মহাপ্রস্থানের মতো! এ রকম গেলে তো আর ফেরার সম্ভাবনাই থাকে না। আশ্চর্য কিন্তু, নয়'?

কিন্তু ডিনারের ড্রেসিং গং বেজে উঠল। সার রাজচন্দ্র, গেস্টদের ঘরে যখন ভৃত্যরা ড্রিংকসের ট্রে নিয়ে ঢুকছে, প্রত্যেক দরজার সামনে একবার করে হাসিমুখ দেখিয়ে 'হ্যালো জো', 'হেল্প ইয়োরসেলফ বিলি' ইত্যাদি বলে দোতলায় ফিরে বাথে ঢুকেছিল। গরম বাথটাবে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে ল্যাভেন্ডার ঘ্রাণটাকে উপভোগ করছিল। ড্রেসিং গং-এর শব্দে বাথটাব থেকে উঠে পড়ল। এতগুলো গেস্ট! কিন্তু সেই গরম থেকে উঠেই স্বগতোক্তি করল, কী ঠাণ্ডা, কী শীত! সে তাড়া-তাড়ি শরীর ঘষতে লাগল টাওয়েলে। মনে মনে বলল, বাব্বা, এ যে লিপুধুরা। গায়ে জামা চাপিয়ে তার মনে হল, তা অবশ্য নয়। লিপুধুরায় সেদিন তুষার পড়ছিল। সাদা ছাড়া কোনো রংই ছিল না চারিদিকে। সে তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরতে লাগল। তার মুখটা উদাসীন নিস্পৃহ, কিন্তু চোখ দুটো যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন কিংবা সজল। ঠাণ্ডা লাগলে যেমন হয়। তার চোখ দুটোয় কালো গ্লাসে ঢাকবার আগের কয়েক মিনিটেই, সেই সাদা দেখে, ঠাণ্ডা লেগে কষ্ট দিচ্ছিল।

কিন্তু লিপুধুরায় পৌঁছে সে কাউকেই দেখতে পায়নি। তার গাইড অনেক চেষ্টায় বরফে বারো আনা ঢাকা ছোট গোম্‌ফায় একজন লামাকে পেয়েছিল। সেই লামাই বলেছিল—এখন তো সব লোকই আসকোটের দিকে নেমে গিয়েছে। তবে সকালে একটিমাত্র দল তিনটি ঘোড়া নিয়ে লিপুধুরা ছেড়ে তাক্‌লাখারের দিকে রওনা হয়েছে, নিষেধ শোনেনি। যদি বরফ পড়ার আগে পুরাং-এর জং-এ আশ্রয় পায় ...। সার রাজচন্দ্রর কঠিন মুখে গগল্‌স-ঢাকা চোখ থেকে জলের ধারা নেমেছিল।

সারা পথটাই এমন হয়েছে। কখনও একবেলা আগে, কখনও একদিন আগে, রানীমার এগিয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল। স্থানীয় দুঃসাহসী লোকেরা অতি প্রয়োজনে যাওয়া-আসা করছিল, নতুবা সাধারণ গ্রামবাসীদের অধিকাংশ তখন নিচে নেমে গিয়েছে। উপায়হীন শীতে বন্দী যারা ছিল তারাও একটা

তিনজনের দলকে ক্রমশ উপরের দিকে চলতে দেখেছে। বালুয়াকোটের প্রধানের অতিথিশালায় পৌঁছে সে আর বাগচী সেই শেঠানীর কাছে শুনেছিল, আগের দিন রানী রওনা হয়ে গিয়েছেন। লিপুধুরায় তবু তো সময়টা কমে একবেলার তফাতে দাঁড়িয়েছিল। শেঠানী বাগচীর মারফত জানিয়েছিল রাজচন্দ্রর ফিরে যাওয়া উচিত হবে। কারণ তার ধারণা কারো সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা থাকলে সেই দলটা থেকে যেত সেদিনও। সেই রকম কথাই হয়েছিল রাতে। সকালে উঠে সেই রানী যখন রওনা হওয়ার জেদ করলেন, তখন শেঠানী ঘোড়া তিনটে বদলে দিয়েছে আর এখানকার সবচাইতে ভালো গাইডটাকেই দিয়েছে।

রাজচন্দ্রর ইচ্ছা ছিল, শেঠানীর সঙ্গে সরাসরি কথা বলে, কিন্তু বাদামি সিল্কের অবগুণ্ঠনে ঢাকা সেই ধনী শেঠানী পর্দার আড়ালেই ছিল। বাগচীর রোগী বলে তার সঙ্গে কথা বলে, অন্যের সঙ্গে কথা বলবে কেন? রাজচন্দ্র পর্দার নিচে তার পা দুখানা দেখেছিল আর পর্দা একবার একটু সরে গেলে একটামাত্র চোখ।

লিপুধুরার সেই লামা বলেছিল, বরফ আরো বেশি পড়লে কালাপানি দিয়ে নামা যাবে না। আপনারা নেমে যান এখনই। শেঠানীও তেমন বলেছিল—আপনারা আর উঠবার চেষ্টা না-করে নেমে যান।

বালুয়াকোটে রাত্রিতে খেতে বসেছিল, সে আর বাগচী। বাগচী বলেছিল, আলমোড়ায় সংবাদ পেয়েই টেলিগ্রাম করেছিলাম। আমার ধারণা হয়েছিল রানীমা মানস যাওয়ার আগে আপনাকে একবার দেখতে চান। আপনিও তো ঠিক এসেই পড়েছিলেন, কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম হল। এ যেন মহাপ্রস্থান। কয়েক বছর থেকেই হিমালয়ের এদিক-ওদিক ঘুরছিলেন। বছরে দু-একবার করে আলমোড়ায় নামতেন। কিন্তু এখন অন্য রকম মনে হচ্ছে।

রাজচন্দ্র বলেছিল—আপনি আলমোড়ায় ফিরে যান, আপনার প্রাইভেট স্কুলের ছাত্ররা আছে, রোগীরা আছে। শেঠানীকে অনুরোধ করুন যাতে আমি দুটো ভালো ঘোড়া ও একজন গাইড পাই। যা টাকা লাগে দেব।

পরের দিন সকালেও রাজচন্দ্রকে বাগচী নিরস্ত করার চেষ্টা করেছিল। রাজচন্দ্র একটু শক্ত হয়ে বলেছিল, কাল রাতে আপনি শেঠানীর সঙ্গে আলাপ করছিলেন আমি শুনেছি। এই মহাপ্রস্থানকে আমার সুইসাইডাল মনে হয়।

তখন শেঠানীর সেই মৃদু গলা আবার শোনা গিয়েছিল—রাজাসাহেবের ইংরেজিটা আমি বুঝলাম না। কিন্তু মহাপ্রস্থান আগেও হয়েছে।

—সে তো কাব্যে, রাজচন্দ্র বলেছিল।

পর্দার ওপার থেকে শেঠানী সেই একবার তাকে সরাসরি কিছু বলে ফেলেছিল। রাজাসাহেব, কাব্য কি মিথ্যা? কাব্যে যা সম্ভব কোনো-কোনো মানুষ নিজের জীবনে তেমন কিছু করতে চাইবে। সেই সময়েই পর্দার নিচে বাদামি সিল্কে ঘেরা পা দুখানা আর তার মলদুটো আবার চোখে পড়েছিল রাজচন্দ্রর।

আর সে-কথাটা বোধহয় বাগচী বলেছিল আলমোড়ায় ফিরে যেতে। রাজচন্দ্র নেমে এসে বাগচীকে বালুয়াকোটেই পেয়েছিল। বলেছিল—শেঠানী নামতে দেয়নি। বাগচী বলেছিল—মনে আছে রাজকুমার, সেই চতুর্দশীয় সৌরভ? আমরা ভুলে যাই সেই চতুর্দশীর মনেও ব্যূঢ়োরস্ক, বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ এক স্বপ্ন থাকতে পারে। এই পাহাড়ে বিশ বছর কাটিয়ে আমার মনে হয়, এই হিমালয়কে, হাজার-হাজার বছর ধরে, তেমন একজন পুরুষ বলে কল্পনা করা হয়েছে। তারপর একটু হেসে বলেছিল, জাঁ পিয়েত্রোর ছবি আপনার যা মনে আছে তাও কি এক বৃদ্ধের নয়?

টাইটা বাঁধল রাজচন্দ্র নিখুঁত করে। গলাটা উঁচু করে আয়নায় বাঁধনটাকে লক্ষ্য করতে করতে রাজচন্দ্র ভাবল, আলমোড়া থেকে সে অবশ্য বাগচীর টেলিগ্রাম পেয়ে অবাক হয়নি।

'ও না, তা সে ভাবছিল না। রানীমা যে অবিরত পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরতেন ইদানীং, তার ব্যাখ্যা কি বাগচীর ও কথায় হয়?

৩

ডিনারের পরে গেস্টরা শুতে গেল। সার রাজচন্দ্রর মনে হল এখনও তার অষ্টম গেস্ট সেই কুমারনারায়ণের শোবার ঘর ঠিক করে দেওয়া হয়নি। হৈমী সে ব্যবস্থা করবে ভেবে সময় কাটানোর জন্য সার রাজচন্দ্র তাকে নিয়ে নিজের শোবার ঘরে গেল। বলল, 'বোসো, গল্প করি। তুমি খেতে বসে যে বলছিলে ইংরেজ তোমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে, তা কি অন্তর থেকে বলেছিলে'?

কুমারনারায়ণ হেসে বলল, 'ডিমোক্র্যাসি, লিবার্যালিজম, ন্যাশন্যালিজম, এগুলো তো শিখেছি। তাছাড়া বোধ হয় আন্দোলন করতেও'।

রাজচন্দ্র হেসে বলল, 'এটা কী রকম কথা হল'?

কুমার হেসে বলল, 'দু রকমে। প্রথমত, ওদের দেশের আন্দোলনের ঐতিহ্যটার পরিচয় দিয়ে ; দ্বিতীয়ত, ভালো আদর্শ তুলে ধরে সেই আদর্শ নিজেরাই ভেঙে দিয়ে বরং দমনমূলক এবং পক্ষপাতমূলক আইন তৈরি করে। ভিকটোরিয়ার ডিক্লারেশনের আদর্শ নিজেরা মানেনি। একটা উদাহরণ দেখুন, তার ফলেই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে আন্দোলন, লালমোহন ঘোষের লন্ডনে যাওয়া। আর্মস অ্যাক্ট এবং ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট নিয়ে আন্দোলন তো দমনমূলক ও পক্ষপাতমূলক আইনের বিরুদ্ধে, তা কিন্তু আমাদের রাজনৈতিক চেতনাকে বাড়িয়েছে। এখন তো ইলবার্ট বিলের ব্যাপারটা দেখতেই পাচ্ছেন'।

সার রাজচন্দ্র আবার হেসে বলল, 'তুমি খেতে বসে ওদের বলছিলে বটে ইংরেজদের ইলবার্ট বিল বিরোধী আন্দোলনের জন্য তুমি সুখী। তোমার এ মন্তব্য আমার গেস্টদের আনন্দিত করেছে'।

কুমার হেসে বলল, 'আপনি বলছেন, ছলনা করা উচিত নয়। কিন্তু আমি সত্যি সুখী। ওদের আন্দোলনের জয় না-হলে সুরেন্দ্র ব্যানার্জির অল ইন্ডিয়া ন্যাশন্যাল ফান্ড তৈরি হতো না। সারা ভারতবর্ষ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে যে ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্স হতে চলেছে, তাও হতো না। এই অল ইন্ডিয়া, সারা ভারতবর্ষ সর্বভারতীয় শব্দগুলোই সবচাইতে মূল্যবান'।

রাজচন্দ্র বলল, 'তুমি, মনে হচ্ছে, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির পক্ষপাতী। এইসব ব্যাপারেই কি কলকাতা এসেছিলে'?

কুমার একটু দ্বিধা করে বলল, 'কিছুটা তা বলতে পারেন'। আবার হেসে বলল, 'আপনাদের জেনারেশনে কিন্তু এই সর্বভারতের বোধটা ছিল না'। সে হাসল। বলল, 'সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে, তখন আপনাদের বয়স সম্ভবত আমার এখনকার বয়সের মতো ছিল, আপনারা কিছু করতে পারেননি, কারণ তখন মারাঠা, শিখ, বাঙালি, হায়দ্রাবাদী, দিল্লিওয়ালা এইসব স্বার্থ পৃথক ছিল। কলকাতা আসার অন্য কারণ, কিছুদিনের মধ্যে বিলেতে যাব। বাঙালি হয়েও এর আগে বাঙলা দেশে আসিনি, তাই ঘুরে যাওয়া'।

রাজচন্দ্র বলল, 'তোমার হাই উঠছে, মিস্টার কুমার। আচ্ছা, না-হয় তুমি এই ঘরেই শোও। এ ঘর কি তোমার পছন্দ হচ্ছে'?

কুমার চারিদিকে চেয়ে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে, প্রিন্সলি। বোধহয় এটাই রাজকীয় বাড়িতে সব চাইতে রাজকীয়। বরং সঙ্কোচ হচ্ছে, হয়তো এটা আপনার নিজের ব্যবহারের'।

'সে কিছু নয়। কাল তোমার মামাবাড়ির গল্প শুনব। মরেলগঞ্জে একাধিক পুকুর থাকার কথা। নীলের জন্য জল লাগে'। রাজচন্দ্র হাসল। বলল, 'মামাবাড়ি খুঁজে পেতে পুকুর মেপে বেড়াতে না হয়। তার চাইতে এক কাজ করো। আমি লোক পাঠিয়ে বাড়িটা খুঁজে বার করতে পারি তোমার জন্য। তোমার কম্পানি বেশ লাগছে।...আরে দ্যাখো, সেই থেকে তোমাকে মিস্টার কুমার বলছি। কুমার তো তোমাদের উপাধি নয়, নিশ্চয়? নাকি রাজনৈতিক কারণে ইন্‌কগনিটো'?

কুমারের মুখটা মুহূর্তের জন্য লাল হল। কিন্তু তখনই সে বিড়ম্বনাটা পার হল। হেসে বলল, 'আধুনিক

কালে পূর্বপুরুষের নাম সবক্ষেত্রে না-করাই ভালো। মনে করুন কেউ যদি রাজার ছেলেই হয়ে থাকে, তবে সিপাহি বিদ্রোহের সময়ে সেই রাজা কী করেছিল তাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। হয় সেই রাজা বিদ্রোহে প্রাণ দিয়েছে, ফলে রানীকে আত্মগোপন করতে হচ্ছে। অথবা সেই সময়ে সেই রাজা এমন কিছু করেছে যে তার পুত্রদের লজ্জায় থাকতে হয়, সেই রাজা বেঁচে থাকলেও এখন হয়তো এমন একজন প্রৌঢ় যার মধ্যে রাজাকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। আমাদের উপাধি রায়। আসলে এমন কি হয় না যে আজ আমাকে যেমন দেখে আমার কম্প্যানি ভালো লাগছে, এখন থেকে বিশ বছর পরে আবার যদি দেখা হয় আমাকে আপনার তেমন না-লাগতেও পারে। তাহলেও যেহেতু মরেলগঞ্জের সঙ্গে আমার মায়ের যোগ, সুতরাং আমারও যোগ, আমি কিন্তু আপনার এস্টেটের ব্যারিস্টার হওয়ার ইচ্ছা এখনই প্রকাশ করছি'। সার রাজচন্দ্র হেসে বলল, 'বিউটিফুল! আচ্ছা, এবার বিছানায় যাও। কাল দিনের আলোয় মামাবাড়ির খোঁজ কোরো'।

সার রাজচন্দ্র বারান্দায় এল। সারাদিন ট্রেনে চলার পরে এখন বিছানার কথা মনে হচ্ছে বটে। বারান্দা দিয়ে চলতে-চলতে কুমারনারায়ণের কথা বলার ভঙ্গিটাকেই আবার ভাবল। কেউ কি এমন করে ঘুরিয়ে বলে কথা আর হাসির আড়ালে চিরকাল লুকিয়ে থাকত? হতে পারে, এই ছেলেটির জননী প্রবাসী বাঙালি পরিবারের মেয়ে। সে তো আমাদের রানীমাও ছিলেন। হয়তো সিপাহি বিদ্রোহের সমসাময়িক কালে ওসব দেশের কোনো রাজপুত্র অথবা সামন্তপুত্রকে ভালোবেসেছিল। তারপর ছাড়াছাড়ি। এরকম হয়। পাশাপাশি দুটো আলোকোজ্জ্বল ঘর থেকে পর্দার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে বারান্দায়। দুইটি আলোর চিত্রের মাঝখানে কোমল অন্ধকারটায় সার রাজচন্দ্র থেমে দাঁড়াল। তারপর আলোকোজ্জ্বল ড্রয়িংরুম পার হয়ে তার পাশের ঘরটায় ঢুকল।

সেটা শোবার ঘর। কিন্তু শয্যা থেকে অদূরে বসবার বন্দোবস্ত। টিপয়ের উপরে আলোয় হীরার মতো ঝকঝকে দুটি হুইস্কির গ্লাস। পাশে একটি হুইস্কির বোতল। প্ল্যাটিনাম ব্লোন্ড হৈমী টিপয়টার সম্মুখে বসে। সার রাজচন্দ্রকে ঢুকতে দেখে সে বলল, 'ঘুমোতে হবে, না কী'?

রাজচন্দ্র টিপয়টার অন্যদিকে বসল। গ্লাস দুটোকে হুইস্কিতে পূর্ণ করল। একবার ভাবল, কুমারনারায়ণ রায়ের কথা বলবে। কিন্তু বলল, 'আচ্ছা হৈমী, হিন্দুরা কি সচরাচর সোনার মল পরে? কী একটা সংস্কার আছে না'?

'সোনা পায়ে পরা লক্ষ্মীকে অপমান'? হৈমী জিজ্ঞাসা করল, 'তাই বলছ? এত রাতে'?

'এমন হতে পারে, হৈমী, তা সত্ত্বেও কোনো শেঠানী যদি তা পারে, তাহলে কি এই প্রমাণ হয় সে খুব দাম্ভিকা? খুবই দাম্ভিকা? শুধু ধনের দম্ভ নয় . . .

'ঘুমোবে না আজ? আমার ঘুম পায়, বাপু'।

হুইস্কির গ্লাসটাকে এক চুমুকে প্রায় শেষ করল রাজচন্দ্র। বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। চলো, এবার আমরা ইউরোপ ঘুরে আসি। যাবে? তুমিও তো ঘুরতেই ভালোবাসো। বেশ এটাই কথা রইল'।

গল্প

দীপিতার ঘরে রাত্রি

দীপিতার সঙ্গে পরিচয় হবার আগেই ইন্দু তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। ব্যাপারটা বোধ করি ঠিক এ-শব্দটা দিয়ে বোঝানো যায় না। সাধারণত ভিন্নমুখী দুটি শক্তিকে এনে পাশাপাশি দাঁড় করানো গেলে বলা যায় এ-কথাটা। কিন্তু কতগুলি অসাধারণ ক্ষেত্রেও আছে যখন বৈপরীত্য বোধটা পাশাপাশি অবস্থানের উপর নির্ভর করে না, যখন তুলনার বিষয় দুটিও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, যেমন গোমড়ামুখো মন আর শরৎকালের প্রারম্ভিক রোদ, পলিটিক্যাল পরাজয়ের অনুশোচনা ও যে-কোনো একটা জেঠামেয়ের হাসির মাঝখানে স্যান্ডউইচ করা তার নরম কাঁধের শ্রাগ।

শান দেওয়া শহরের মেয়ে দীপিতা ; কথা যখন সে বলে চশমার সোনার ফ্রেম সেগুলিতে পালিশ লাগিয়ে দেয়, কানের অদ্ভুত-গড়ন দুলজোড়া দুলে, ডিগবাজি খেয়ে কাঁধের আনতিতে ফুটে ওঠা যতি, কমা, কোলোন, জিজ্ঞাসাচিহ্নের প্রকাশগুলি স্পষ্ট করে তোলে।

দীপিতা খদ্দরেই অভ্যস্ত ; শুধু শাড়িতে নয়, তার বসবার ধরন, বুকের কাছে বইগুলি কুড়িয়ে নেবার পদ্ধতিটাতেই শুধু খদ্দর নয়, উঁচু করে কথা সে বলে না, উঁচু গলায় হাসে না।

কিন্তু এ সত্ত্বেও লোকে বলে : হঠাৎ কিছুদিন ধরে আঁচলের একপ্রান্ত একটু তুলে খোঁপাটাকে আড়াল করার যে-রেওয়াজ উঠেছিল কলেজে তার পেছনে দীপিতার শুধু প্রশ্রয়ই ছিল না। তেমনি ডাক-পিওনদের মতো চামড়ার অর্ধচন্দ্রকার ব্যাগ কাঁধে ঝোলানোর ব্যাপারটাতেও দীপিতার নাম জুড়ে গেছে।

কিন্তু লোকে প্রকাশ্যে বলে না। পাছাপেড়ে শাড়ি কলকাতায় কী করে জুটল, এর চাইতেও বড় সমস্যা হল একদিন সেটা পরে কলেজে আসবার কথা দীপিতা কী করে ভাবতে পারল! শুধু পরা নয় যেখানে যে-রকম টানটোন দেয়া দরকার তেমনি করে দেহকে ফুটিয়ে তুলে! সারাদিন তাকে কেন্দ্র করে কলেজে একটা বাতাস খেলে গেল। প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলেনি, হয়তো হাস্যকর ব্যাপারও অভিভূত করে দেবার মতো ভালো লেগে যায় কখনো।

দীপিতা নিজেও জানে এগুলি তার একসেন্ট্রিসিটি, আগে টের পায় না, পায় ঘটে যাবার পর। কলেজে নতুন পাশ-করা কোনো অধ্যাপককে বিব্রত করে, লেডি চ্যাটারলির লালসার সমালোচনা তাঁর মৌনতা থেকে টেনে বার করে-করে, শেষ পর্যন্ত উপন্যাসের প্রথম একশো-তিরাশি পাতা স্রেফ গ্রন্থের কলেবর বাড়ানোর জন্যে লেখা বলিয়ে নিয়ে, লরেন্সের প্রশংসা নিন্দায় পরিণত করে দীপিতা যখন তার বেঞ্চটাতে বসে তখন সে ভাবে এটাও একসেন্ট্রিসিটি হল।

ডিবেটিং-ক্লাবের দীপিতা, ভারতীয় ফেবিয়ান-ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা 'এমাজন' নয়। কেউ তাকে দেখেনি হেদোর উঁচু ব্রিজ থেকে কালো পোশাকে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে জলে। কল্পনাও করা যায় না।

কিন্তু যখন সে বাড়ি ফিরে যায় কেউ কি দেখেছে তাকে? একটা ব্লাউস থেকে আর-একটায় যাবার ক্ষণটুকু দীর্ঘায়ত হয়ে আয়নায় যখন প্রতিবিম্বিত হয় তখন ক্লান্তির স্বেদমালা নাভির কাছে জন্ম নিয়ে বিপন্ন স্তনযুগলের মাঝখান দিয়ে কাঁধের দুদিকে ছড়িয়ে পড়ে ঘাড়ের পেছনে আবার একত্রিত হয়ে মাথাটাকে সামনের দিকে নত করে দেয় যেন। দীপিতা 'আঃ' বলে পাশের চেয়ারটায় গা ঢেলে দেয়। সে শুধু উনিশ বছরের একটি মেয়ে।

পরেশ মিত্তির বেড়িয়ে ফিরে আদ্দির পাঞ্জাবি খুলল, চুনট-করা কোঁচাটা এক অদ্ভুত কায়দায় জড়িয়ে

আলনায় ঝুলিয়ে রাখল। কালো পাম্পশুটা খুলে ব্রাশ দিয়ে ঝেড়ে গুছিয়ে রাখল, পাঞ্জাবির তলে যে মোটা গেঞ্জিটা পরা ছিল সেটা পালটে মসলিনের মতো হালকা একটা পরল। হালকা রঙের সিল্কের লুঙ্গিটার বাঁধন আলগা করে পায়ের দুপাশে মাথা হেলিয়ে-হেলিয়ে লুঙ্গির ঘের মাটি স্পর্শ করেছে দেখে নিশ্চিন্ত হল। আলনা থেকে বিলিতি তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে বাথরুমের দিকে যেতে-যেতে ফিরে দাঁড়াল, আলনাটার পায়ের কাছে বসে জুতো চটিগুলি সোজা করে রাখল।

কাঁধ থেকে চুলের গোড়া, আঙুলের ডগা থেকে কনুই অবধি সাবান দিয়ে ধুয়ে পরেশ যখন ঘরে ফিরে সরু ধাতব ফ্রেমের চশমা খাপে পুরে কালো ফ্রেমের পুরু কাচের বই-পড়বার চশমা বার করে বসেছে টেবিলের সম্মুখে তখন ইন্দুর ফিরবার সময় হল।

ইন্দুর বর্ণনা করা বেশ একটু কঠিন। যতই গম্ভীর হয়ে বিচার করতে বসা যাক, বর্ণনা খানিকটা হাস্যকর হবেই। নস্য রঙের সিল্কের পাঞ্জাবিটা আধো-অন্ধকারেও দৃশ্য হচ্ছে। হাতে একগোছা গোলাপ ফুল। তার গলার সাড়া পেয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর দু-তিনটে ছেলে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। ঘরের তালায় চাবি পরাতে-পরাতে ইন্দু তাদের দেখে ফিরে ঘরগুলির সম্মুখে বারান্দায় রেলিঙের কাছে দুটো থামের মাঝখানে যে-কোণটুকু আছে তার কাছে ফিরে দাঁড়াল—ভাবখানা এই, এস হল্লা করি খানিকটা।

একটা ছেলে কচি গলায় বললে, 'গোলাপের উঠনো বন্দোবস্ত আছে নাকি, ইন্দুদা'? আর-একজন রসিকতা করবার চেষ্টা করে বললে, 'প্রেমের ব্যাপার নাকি, ইন্দুদা, শুনেছি তিনি বন্ধুপত্নী'।

ইন্দু খক-খক করে হেসে উঠে বললে, 'তা প্রেম বই কি। দাদাকে অজস্র মুঠি-মুঠি বিলোবার পরও বউদির ভাঁড়ারে কিছু কিঞ্চিৎ থাকে, আমাকে ডুবিয়ে দিতে সেইটুকুই যথেষ্ট'।

দীপিতা স্বীকার করে ইন্দুর বর্ণনাটা আগাগোড়াই কল্পনা, হয়তো-বা খানিকটা পক্ষপাতদুষ্ট। সে হয়তো নস্য রঙের সিল্কের ভক্ত নয়, কিন্তু ইন্দুর কথা মনে হলেই এ-রকম দৃশ্যই তার মনে পড়ে। অনেক অজুহাতেই পরেশ মিত্তিরের ঘরখানা সে দেখেছে। সেটা কল্পনা নয়, ঘর গুছিয়ে রাখে পরেশ। কিছু বললে বলে—নিজের হাতে সাতদিনের জঞ্জাল এক রবিবারে সাফ করবার চাইতে জঞ্জাল জমতে না-দেওয়াই ভালো। কিন্তু ইন্দু?

দীপিতা না-দেখেও বলে দিতে পারে ইন্দুর ঘরের দুর্দশার কথা। সিগারেটের দগ্ধাবশেষ, টিনের খাবারের খালি আধার, ময়লা কাপড়-জামা, ধুলোয় ঢাকা টেবিল এসবই থাকবে—যেন শরৎবাবুর কোনো নায়ক ; কোনো নায়িকা এসে ঘর গুছিয়ে দেবে, গুছিয়ে দেবার মধ্যে ফুটে উঠবে—নিশ্চিন্তে আরাম এনে দেবার মতো স্ত্রী হতে পারি তোমার। মানুষকে চেনা গেলে তার সম্বন্ধের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি কল্পনা করা কঠিন নয়।

ইন্দুর কথায় পরেশের মনে হয় : মানুষের জীবন কেন বাহুল্য-বর্জিতের একটা তরঙ্গে গঠিত হয় না।

দুজনে একসঙ্গে ঝরনা কলম কিনতে গিয়েছিল দোকানে ; পরেশ কিনল ধূসর রঙের স্ট্রিমলাইন্ড একটা-কিছু আর ইন্দু নিল কলরব-করে-ওঠা ফিরোজরঙের দামি পার্কার সোনার খাপে মোড়া। এইখানেই রুচির তফাত, এই পার্থক্যই দুজনের সর্বত্র।

পরেশের বন্ধু হিসাবে ইন্দু চলতে পারে না। বহুদিন পরে, ম্যাট্রিক পাশ করবার পর চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে এসে, দেখা ; পরেশও খুশি হয়েছিল বইকি ; হাত জোড় করে স্মিত হাসিতে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিল—ইন্দুবাবু! ভালোই হল, পুরনো দিনের অনেক কথা বলা যাবে। প্রত্যুত্তরে ইন্দু—আরে বাঁটলো যে রে, বলে লাফিয়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরেছিল পরেশকে।

ইন্দুর সঙ্গে পরেশের বিচ্ছেদের যা কারণ সেটাকে এই রকম বলা যায় ; রবিবারের পাগল ইন্দু ; প্রতি রবিবারে সকাল থেকে বেলা বারোটা অবধি কলকাতার পথে-পথে হৈ-হৈ করে হা-হা করে হেসে,

কেবল সিগারেট ফুঁকে রেস্তোঁরা-কাফেতে চা খেয়ে ঘুরে বেড়াবে। এই বোহেমিয়ানা যে এক শতাব্দীর পুরোনো হয়ে গেছে এ ইন্দু বোঝেও না, জানে না।

কিন্তু এ-কথাগুলি ভাবলেও, কী শোভন প্রকাশ করেছিল তার পরেশ, এতটুকু ক্ষোভ নেই, এতটুকু বিচলন নেই, শান্ত মৃদুস্বরে বলেছিল, 'ওর স্বাস্থ্য ভালো, ও পারে, পিছিয়ে পড়লুম আমি।... এইসব দিয়ে ইন্দু গড়া, পরেশও।

মাঝে মাঝে কিন্তু ইন্দুর রুচি মোহগ্রস্ত করতে পারে চারিপাশের লোককে। দীপিতার গত জন্মদিনে এ রকমের একটা ব্যাপার ঘটেছিল ; অন্য অনেকের মতো ইন্দুও উপহার দিয়েছিল। সত্যিকারের কাজ যাতে আছে এমন একটি রুপোর রেকাবিতে একটা কালচে-লাল রঙের দগদগে গোলাপ। টাকার দেমাক না-দেখিয়ে যতটা ব্যয় করা ছাত্রের পক্ষে সম্ভব ততটা নিশ্চয় হয়েছিল রেকাবিখানা কিনতে, কিন্তু তার চাইতে প্রাধান্য পেয়েছিল ক্ষণস্থায়ী গোলাপটি। এমনকী দীপিতার গালেও ব্রীড়ার রং লেগেছিল।

তেমনি হয়তো ভালো লাগার উপাদান থাকে তার হঠাৎ বলা কোনো কথায়। পরেশ বলেছিল—এখনও অর্ধেক কল্পনায় ঘিরে রাখতে চাই নারীকে। হর্ষে, দুঃখে, উদারতায়, হিংসার সার্টের আড়ালের মানুষটির সঙ্গে বডিসের অন্তবর্তিনীর কোনো প্রভেদ নেই, এ বুঝব আমরা কবে? এখনও এই বিংশ শতকের মাঝামাঝি এসেও বলব, তুমি হেঁটে গেলে পদ্ম ফুটে ওঠে। এসব কথা, ছেলে ভুলানো ছড়া আর-কতদিন চলবে।

দীপিতা বলতে যাচ্ছিল—ছেলে ভুলানো ছড়া যাদের জন্য সেই শিশুমনগুলিতে এখনও আছে, এমনি সব লাল রং দেখে হাত-বাড়ানো শিশু।

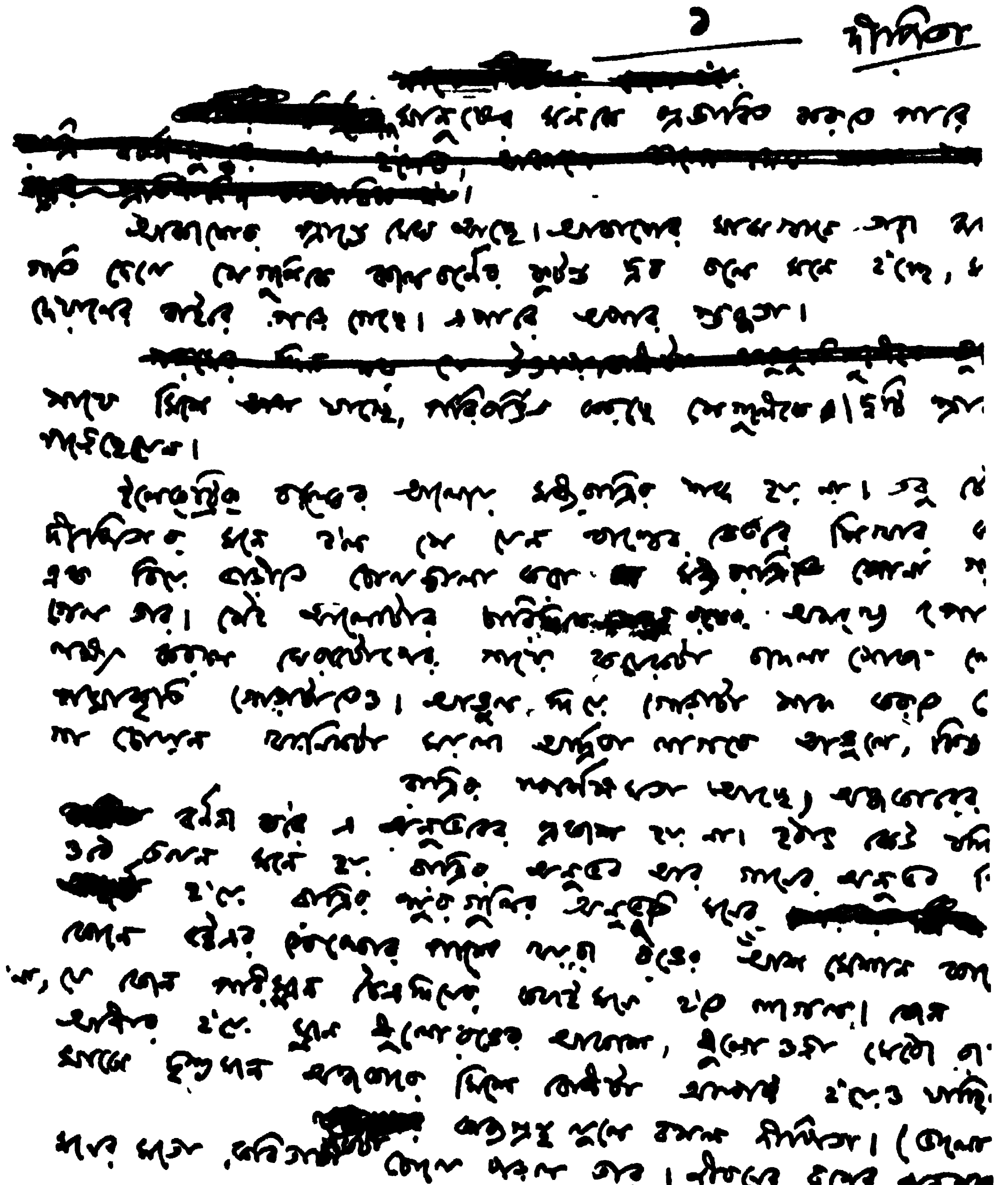
প্রথম দিকে ইন্দু চুপ করেছিল, হঠাৎ বলে উঠল—বিংশ শতকের কাচের বাক্সে রাখা জীবন আমাদের ; শো-কেসে রাখা প্রজাপতির ডানার পরাগের মতো খসে গেছে আমাদের কল্পনা ; অনেক গালভরা টানা-টানা লাতিন নাম সুস্পষ্ট পাইকায় লিখে দিয়েছি বাক্সের গায়ে-গায়ে ; তবু পরাগ-উঠে-যাওয়া জীবন। তারপর সে দীর্ঘঃনিশ্বাসও ফেলেছিল।

মাঝে-মাঝে মনে হয় লোকটি কথা বলছে না যেন স্ফটিক নিয়ে খেলা করছে। কিন্তু এ-ব্যাপারটা তার পিছিয়ে থাকবার নজিরও বটে ; কথার এই সুবিবেচিত প্রয়োগ, লক্ষ্যে পড়ে যাবার মতো প্যাঁচের প্রাচুর্য। বস্তুত ইন্দু লক্ষ্যের মাঝখানে গিয়ে পড়বেই, তার সুগৌর প্রকাণ্ড দেহের মতো প্রাধান্য-কাঙাল যেন তার রুচি, ফলে গোলাপের মতন বর্ণচ্ছটায় ও আবেগের উত্তাপে ভরে ওঠে সে।

ইন্দু নিজেও জানে তার পদ্ধতিতে সেকেলেমি ছাড়া আর-কিছু নেই, সেও ধীরে-ধীরে বিকাশের প্রভাব মেনে নিচ্ছে। বিকাশ দীপিতার দাদা, তার সংস্পর্শে এসে ইন্দুর বলবার ভাষার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, অনাড়ম্বর, প্রজ্ঞাদীপ্ত, উৎপ্রেক্ষাহীন হয়ে উঠবার লক্ষণ দিয়েছে ইতিমধ্যে।

এ-বাড়ির কথা বলতে গেলে বিকাশের কথা বলতে হয়। খদ্দর পরেন না তিনি, সাধারণ বাঙালির মতো দোকানের কাপড় কিনে পরেন। জেল তাঁকে বারংবার খাটতে হয়েছে গান্ধী-মহারাজের ডাকে। কোনোদিন কেউ মাথায় দেখেনি গান্ধীটুপি, খুব বিরক্ত করলে মধুর পরিহাস করে বলেন : বাঙালির ছেলে, হঠাৎ নগ্নমাথায় খাপ উঠলে বেখাপ্পা দেখাবে। জেল থেকে বেরিয়ে কেউ দেখেনি তাকে ফুলের মালা গলায় পরতে, জেলে ঢুকবার সময়ে কেউ শোনেনি বন্দেমাতরম বলতে বুক ভরে। দেশ আমার, আমার দেশকে আমার বলতে শ্লোকে গান গেয়ে উঠতে হবে কেন স্বর্গাদপী গরিয়সী বলে? আমার মা আমার ছেলে বললে কেউ কি কোনোদিন গান গেয়ে ওঠে।

এ-বাড়ির আবহাওয়া বিকাশের জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার মতো স্বল্পবাক, বাহুল্যবর্জিত জীবনের তৈরি।


১ — দীপিতা

কোথা থেকে কী হল কলেজে, কী কেলেঙ্কারি ঘটে গেল। দরজাব পাল্লায় হাত ছেঁচে রক্তারক্তি। দরজার পাল্লায় মানুষের দু-তিনটে আঙুল অমন বীভৎসভাবে জখম হতে পারে এ না-দেখলে বিশ্বাস হয় না। অতটা বাড়াবাড়ি যেন ইন্দুর ক্ষেত্রে ছাড়া ঘটতও না। স্যোসালিস্ট এক নেতার সংবর্ধনার ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করে ঘটল ব্যাপার। দীপিতা ও পরেশ, ঝগড়া করতে নয়, ইন্দু ও তার পেছনে কয়েকটি ছেলের একটি দল তৈরি হচ্ছিল, তাদের বোঝাতে গিয়েছিল ; কেলেঙ্কারিটা ঘটে গেল। কেউ-কেউ বলে পরেশ ইচ্ছা করে দরজাটা চেপে দিয়েছিল, কেউ বলে ইচ্ছা করে দিলেও ইন্দুকে জখম করবার জন্য নয়, দিয়েছিল নিজের বিরক্তির নাটকীয় প্রতীক সৃষ্টি করতে। কিন্তু আর্ত চিৎকার করে হাত চেপে ধরে ইন্দু যখন বসে পড়ল এতসব ভাববার অবকাশ কারো ছিল না। দীপিতা স্তব্ধ হয়ে দেখল, ছ-ফিট উঁচু পুরুষটির দেহটা একেবারে তার পায়ের কাছে নুয়ে পড়েছে ; বেদনায় এমন হাহাকার করতে কাউকে সে শোনেনি, দেখেনি এমন করে পুরুষকে কান্না চাপবাব বৃথা চেষ্টা করতে। অ্যাম্বুলেন্স, প্রফেসাররা, ছাত্ররা যখন এল তখন দীপিতা ইন্দুর অনতিদূরে চৌকাঠে মাথা রেখে বসে আছে, তার চোখ বন্ধ, হাত মুঠো করা, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে, ইন্দুর রক্ত গড়িয়ে এসে তার শাড়ির খানিকটা ভিজে গেছে।

সম্ভবত রক্ত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কম বলেই কথাটা তার মনে দাগ কেটেছিল। পরেশ মিত্তির সম্বন্ধে কেউ-কেউ সন্দেহ আরোপ করেছিল। সহসা একটা আবেগের মতো বোধ হতে প্যাড টেনে নিয়ে দীপিতা খসখস করে একদিন লিখল : পরেশবাবু, আজকেব ব্যাপারের জন্য তোমার লজ্জিত হওয়া উচিত ; সুরেন্দ্র তোমার ইকনমিক্সের নোট চুরি করে পড়েছে এই অজুহাতে কলেজে যে-রোল উঠেছিল তার পেছনে তুমি ছিলে এ রকম সন্দেহ হচ্ছে আমার।

এই পর্যন্ত লিখে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলেছিল সে, ডাকে দেয়া যেত, চাকরের হাতেও পৌঁছে দেয়া যেত, বাধা সেটা নয় ; চিঠি লিখবার কোনো যুক্তিই নেই, বরং ভাবাতিশয্য প্রকাশ পাবে ; নাটকের মতো হবে ব্যাপারটা।

রাত্রিতে সে খেল না, ইন্দুর রক্তাক্ত হাতের কথা মনে হতে গা ঘেঁটে উঠতে লাগল। পরের দিন কলেজে যেতে কুণ্ঠা হচ্ছিল তার, কিন্তু না-গেলে বাড়বে হৈ-চৈ, গেল সে, পরেশও এল ; অন্যান্য দশদিনের মতো স্বাভাবিক হয়ে চলল তারা। তিনদিনের মাথায় ব্যাপারটা থিতিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু কলেজ থেকে ফিরে দীপিতা চিঠি পেল, ভেবেছিল পরিচিত কারো, তলে নাম দেখে অবাক হল। ইন্দু চিঠি লিখেছে! লিখেছে .

> শ-দেড়েক টাকার আজই প্রযোজন ; হাতের অবস্থা ভালো নয়। হাসপাতালের ব্যবস্থায় কেটে বাদ দিতে হবে দুটি আঙুল। আমার অমন সুন্দর আঙুলগুলি হারাতে চাই না, বাইরে বড় কাউকে দেখাব। টাকাটা আজই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

ইন্দু চিঠি লিখেছে, তাকে লিখেছে, লিখে টাকা চেয়েছে! পোস্টকার্ডখানা উল্টেপাল্টে দেখে তার শুধু মনে হল হিং টিং ছট। উপন্যাসের নায়িকা যেন সে, জোর করে মন কেড়ে নেবার পার্ট যেন তার সম্মুখে। দেড়শোটা টাকা এমন-কিছু নয়, এর আগে চাঁদা হিসাবে সে দিয়েছে, বড় জোর মা একটু হুঁশিয়ার করে দেবেন, কিন্তু ইন্দুর টাকা চাইবার কী যুক্তি এত লোকের মধ্যে বেছে-বেছে তার কাছে। টাকা পাঠাবার কথা ভাবতে গিয়ে তার মনে হতে লাগল উপন্যাসের পূর্বরাগের কথা।

রাত্রিতে শুতে গিয়ে একলা অন্ধকারে তার মনে হল চিঠিটার কথা, হাসিও পেল। কিন্তু চিন্তাগুলিকে যখন ঘুমের গহ্বর থেকে টেনে বার করতে হচ্ছে দীপিতার মনে হয়েছিল : নন্তুটা (তার ছোটভাই) এমন করে মাঝে মাঝে পয়সা চায় বটে, কিন্তু ক্লাস সিক্সের ছেলে নন্তু আর ইন্দু একই অর্থে পুরুষ নয়।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে বৈকালে, অধ্যাপক দু-তিনদিন আসেননি, তাঁর অসুখ করেছে কিনা এ-খোঁজ করতে গিয়ে দীপিতা আটকে পড়ল অধ্যাপক যখন বললেন—গাড়ি রাখো, শম্ভু পণ্ডিতের হাসপাতালে

ইন্দুকে দেখে যাব তোমাদের বাড়িতে, চা খাওয়া হয়নি, তোমাদের ওখানেই খাব।

এরপরে অজুহাত দেখানো চলে, না-যাওয়া চলে না। বাড়াবাড়ি হয়, জেদের মতো একটা-কিছু প্রকাশ হয়ে পড়ে।

ইন্দু বিছানায় উঠে বসেছিল। ক্লান্ত নিষ্প্রভ দৃষ্টি, গভীর শোক ছাড়া এমন চেহারা হয় না কারো। অধ্যাপকের প্রশ্নের উত্তরে ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত তুলে দেখাল ইন্দু, ব্যান্ডেজের ফের দেখেই বোঝা গেল কঠিন সত্যটুকু, দুটি আঙুলই কেটে বাদ দিতে হয়েছে। অধ্যাপক ধীরতা সম্বন্ধে কী-একটা উপদেশ দিতে ইন্দু টেনে-টেনে হেসে উঠেছিল, কিন্তু দীপিতাব দিকে চোখ পড়তেই ওর হাসি থেমে গেল ; গভীর অভিমানে মুখের চেহারা যেমন হয় তেমনি হল, চোখেও জল এল।

একদিন মুখ নিচু করে বই গোছাতে-গোছাতে দীপিতা শুনছিল ইন্দুর অসুখের কথা অধ্যাপকের মুখে। তিনি একসময়ে বলেছিলেন, বেচারার আঙুলগুলির জন্য দুঃখ হয়। বাইরের কাউকে দেখাতে চেয়েছিল শুধু কিছু টাকার জন্যই হল না।

'আপনি দিলেন না কেন,' দীপিতা বলেছিল, চিঠির কথা মনে পড়েছিল তার।

'দিয়েছি, কিন্তু বাইরের ডাক্তার এসে বললেন, অপকারটুকু হয়ে গেছে'। অতঃপর অধ্যাপক বললেন, 'কে একজন ওর আছে, তার কাছে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে, বলেছে তিনি টাকা পাঠালে আমার ধার শোধ করে দেবে। আমি ভেবেই পেলুম না কলকাতায় থেকে এত বড় বিপদের কথা শুনেও টাকা পাঠাতে দেরি করলেন কেন তিনি। অমন বন্ধু থেকে লাভ কী? ধার হিসাবেও তো টাকাটা দেয়া যায়'।

দীপিতা সোজাসুজি একটু তীক্ষ্ণ করে অধ্যাপকের দিকে চাইল, সন্দেহ হয়েছে তিনি চিঠির কথা জানেন, বিঁধবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তা নয়। অধ্যাপককে এমন একটি বৃত্তি আরোপ করার জন্যই দীপিতা কুণ্ঠাবোধ করল।

অধ্যাপক চলে গেলে দীপিতা ভাবল—পাঠালেও হতো টাকাটা, ইন্দুকে যা ভেবেছিল তা হয়তো নয় সে। টাকার প্রয়োজনে লিখেছিল, দীপিতাদের দেবাব ক্ষমতা আছে জেনে। হৃদয়ের অনুসন্ধান সে করেনি উপন্যাসের নায়কের মতো। টাকাটা দিতে হবে, অধ্যাপকের ধার যখন ইন্দু শোধ করতে চায় তখন টাকার প্রয়োজন ফুরায়নি, ইন্দুকে অঋণী করতে আগ্রহ হল তার।

পরদিন টাকাটা পাঠাতে গিয়ে আগ্রহটা তাকে সংকুচিত করেছিল, ইন্দু যদি তার আগ্রহে কোনো গভীরতর বৃত্তি আরোপ করে বসে। কিন্তু একটা ভালো লাগার বোধও ছিল এ-কুণ্ঠার মধ্যে। মনি-অর্ডারের কুপনে সে লিখল : পাঠাতে দেরি হল বলে আমি দুঃখিত।

তার লিখতে ইচ্ছা হল : আপনি নিতান্ত ছেলেমানুষ, এত অল্পদিনের পরিচয়, যাকে পরিচয়ই বলা যায় না, তাতেই আপনি টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন, আপনার আত্মপ্রত্যয়ের মূল অনুসন্ধান করতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু দীপিতার মতো মেয়ে এ-কথা কাউকে লিখতে পারে না, বরং ভালো লাগার বোধটাকে আড়াল করবার জন্য কুপনে লিখল—যখন সম্ভব হয় শোধ করে দেবেন।

টাকাটা পাঠিয়ে রাত্রির অন্ধকার অপূর্ব বোধ হতে লাগল। ইন্দু কি তাকে ভালোবাসে?

দীপিতা বালিশে মুখ গুঁজে হেসে ফেলেছিল। কিন্তু একজন পুরুষ তাকে ভালোবাসে এ-বোধটা হাস্যকর হলেও, পুরাতন হলেও প্রত্যেকটি মেয়ে প্রথম যখন অনুভব করে তখন বোধ হয় কৌতুক ও কৌতূহলে উন্মনা হয়ে ওঠে—ভাবল দীপিতা।

পরের দিন সকালে টাকা পাঠানোর ব্যাপারটায় নিজেকে খুবই বোকা বললে দীপিতা। ইন্দুকে অঋণী করবার জন্য টাকাটাও পাঠতে হবে এতটা আগ্রহ হওয়া উচিত ছিল না। দু-পাঁচদিন ডাকের দেরি হলেও ইন্দুর বাড়ি থেকেই নিশ্চয় এসেছিল টাকাটা।

কিন্তু খুব খারাপ লাগছে না, কুণ্ঠার মধ্যে ভালো লাগার বোধ একটা থাকেই, বিশেষ করে আজকের

রাত্রিটায় যেন ভালো লাগছে চিন্তা করতে।

একদিন সশরীরে ইন্দু এসেছিল দীপিতাদের বাড়িতে, অন্য অনেকবারের মতো দীপিতা অবাক হয়ে শুনেছিল ইন্দুর রঙদারি ভাষা।

কিন্তু বিকাশ চলে গেলে, দীপিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল ইন্দু। ব্যথা নেই আর— দীপিতা বলেছিল।

অস্ফুট একটি—না।

একটুপরে আবার দীপিতা বললে—হোস্টেলে না-ফিরলে যদি চলে, খুব বৃষ্টি হচ্ছে না?

ইন্দু বললে—হোস্টেলে না-ফিরলে চলে।

আসলে ব্যাপারটা এই, পরে একদিন ভাবল দীপিতা—রোজকার ঘটনার বাহিরে যা সেটাই রোমান্স, আর সব ব্যাপারটার মূলে আছে ইন্দুর রোমান্সপ্রিয়তা। টাকা ধার করার ব্যাপারটা হয় কুসীদজীবীর সঙ্গে বা কুসীদজীবীর বিলেতি প্রতিরূপ ব্যাংক ও ব্যাংকারের কাছে থেকে। আমাদের দেশের মেয়েদের অর্থ সম্বন্ধে কোনো স্বাধীনতা নেই, দিতে হলে কাউকে কিছু তাদের অভিভাবকস্থানীয় পুরুষরা দেন। ঠিক এজন্যই হঠাৎ কোনো মেয়ের যদি অর্থনীতিগত স্বাধীনতা থাকে তার আবহাওয়া অনেক পুরুষের কাছে রোমান্টিক বোধ হয়। এমনকী অনেক মেয়েরও হয়, যেমন হয়েছিল স্বাগতার। স্বাগতা বুদ্ধিশানিতা মেয়ে, কলেজে সে রোমান্স কল্পনা করতে পারত না। কিন্তু কলেজ থেকে বেরিয়ে অধ্যাপিকা হিসাবে অর্থ উপার্জন করে সে রোমান্টিক হয়ে উঠল। তার চাইতে বয়েসে ছোট (লোকে বলে) একটি রোগা ফ্যাকাশে খদ্দর-পরা ছেলেকে এখন-তখন অর্থসাহায্য করতে-করতে একসময়ে সে তার মোহে কলেজ ছাড়ল, গ্রামে চলে গেল ছোট একটি রোমান্টিক কুটির গড়বার লোভে।

বিশ বছর আগে কলেজে পড়ার ব্যাপারটাই এমন রোমান্সের উপাদান হতো, মেয়েরা কলেজে পড়ছে এই নতুনত্ব। নতুন শাড়ি পরলে পুরনো বউকে যেমন ভালো লাগে, তেমনি স্ত্রীজাতি-বিমুখ অনেক কলেজের ছাত্রের চোখে এই নতুন রূপটি, বুকের কাছে বই কুড়িয়ে নিয়ে, ছাতা হাতে করে চলা মেয়েদের, ভালো লেগে উঠল। সাহিত্যিকদের উপরেও এসব পরিবর্তন প্রভাব বিস্তার করে।

দীপিতা সকালের ডাকে আসা কলম্বিয়া য়ুনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত বর্তমান ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের ধারা খুলে বসল। কিন্তু ঘুম পাচ্ছিল তার। মনে হল ঘুম পেলে ছেলে-ছাত্ররা নস্যি নেয়। হাই তুলে সে ভাবল একদিন নিয়ে দেখলে হয় ঘুম যায় কিনা, কিন্তু বড্ড নোংরা।

তাহলেও, ভাবলে দীপিতা—একদিন যদি দেখা যায় মেয়েরা নস্যি নিতে আরম্ভ করেছে, হয়তো সেটাই রোমান্সের উপকরণ হয়ে উঠবে।

এটা হাস্যকর কথা হলেও এর চাইতে বড়-বড় ঘটনার মূলেও এ-অভিনয়ের নেশা দেখা যায় বইকি। বস্তুত আজই দেখেছে সে, বিকাশের ঘরের পাশ দিয়ে আসতে-আসতে গানের মৃদুশব্দে অর্ধোন্মুক্ত দরজা দিয়ে চোখ পড়েছিল ঘরের মধ্যে, ভামিনী বউদিকে দেখা গিয়েছিল প্রসাধন করতে। একটু অবাক লেগেছিল বইকি দীপিতার। সবজে সাটিনের পায়জামা পরা, পিঠের চওড়া চ্যাপ্টা বেনি এসে পড়েছে নিতম্বে। আর্দ্র দৃষ্টি বেষ্টন করে যেন কাজলের রেখাও ছিল।

দুগাছি সরু সোনার চুড়িতে, একগাছা সরু সোনার হারে, লাল পাড় সাদা শাড়িতে দেখা ভামিনী বউদির সঙ্গে মেলে না। তার দাদা বিকাশ স্কুলের হেডমাস্টার, কিন্তু তাই বলে অর্ধ-সন্ন্যাসের আদর্শে খাড়া হবেন ছাত্রদের সম্মুখে এ মত নয় দীপিতার। রাত্রির প্রভাব, আদিম সূর্যোদয়ের চাইতেও প্রাচীন তমিস্রার রক্তে সঞ্চারিত স্মৃতি।

একবার একটা কবিতার কথা মনে হয়েছিল তার ; পুরুষ বলছে নারীকে : 'এইটুকু আমার কামনা, শুধু এইটুকু—তোমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার মন যখন করুণায় টলমল করে উঠেছে, সেই কারুণ্যের কাঁপন লাগুক তোমার মর্মমূলে, পরম সহ-অনুভবের প্রতিতরঙ্গ'। মিথ্যা নয় কবির আশা, আরো দু'এক শতক

পরে হয়তো মানুষের জীবনে সত্য হয়ে উঠবে।

কিন্তু তা না-হলেও ক্ষতি নেই। ইংরেজি সাহিত্যে ও বিজ্ঞান দীপিতার পাথেয়। যদিও সে এখনও ইংরেজি 'লাভ' কথাটাকে অপ্রচুর মনে করে মানুষের পারস্পরিক সবগুলি আকর্ষণ নির্দেশের পক্ষে, এবং যদিও সে স্নেহ ও শ্রদ্ধা কথা দুটিকে ইংরেজিতে চালানোর চেষ্টা করছে তাদের আদিম বাঙালি অর্থে, সে সবসময়েই স্বীকার করে ভারতবর্ষের লোক আমরা শত চেষ্টা করলেও দাম্পত্য ভালোবাসাকে স্নেহ ও শ্রদ্ধার স্তরে উন্নীত করতে পারব না, বাৎসায়নের এক্তিয়ারের বাইরে এনে।

কাল ভোর হতে-না-হতে দীপিতা প্রাত্যহিক ভোরাই চায়ের আসরে যোগ দিতে বিকাশের ঘরে যাবে। বাইরে চড়ুই পাখিটা সরু ঠোঁট দিয়ে ঠুকছে ঠুক-ঠুক করে কাঁচের শার্সি, কার্নিশের টবে একটি নিশাগন্ধার কলি আগামী রাত্রির তপস্যায় সংহত ও ঋজু হয়ে উঠবে। মিতভাষিণী ভামিনী বউদির মৃদু পরিহাসে ভোরের হাওয়ার মতো অনির্দেশ্য সুখের আমেজ আনবে।

কিন্তু কাল সকালে যদি মনে পড়ে যায় রাত্রির এই বেলোয়াড়ি আড়ম্বর, এই রঙ ও রেখার সপ্রচুরতা? ইন্দুর পক্ষে যা স্বাভাবিক তাই যেন ঘটে গেছে। যেন সে প্রভাবিত করছে। মিলিয়ে নেয়া কষ্টকর, আট পহরে দুপুরের বিশদ বস্ত্রের বিকাশের কথা ছেড়ে দিলেও, ভোবাই চায়ের আসরের অস্নাত অবিন্যস্ত কেশ বিকাশের সঙ্গেও মেলে না। দীপিতার প্রশ্ন হচ্ছে : বিকাশ কি সহ্য করতে পারে ভামিনী বউদির এই ভাবালুতা, রাত্রির রোমান্স গড়বার প্রয়াস। হয়তো করে, অপ্রিয় হবার জন্য কেউ প্রয়াস করে না, প্রসাধন করে না।

ইলেকট্রিকের বাল্বে মধ্যরাত্রির শব্দ হয় না। টেবিলের সম্মুখে বসে থাকতে-থাকতে দীপিতার মনে হল সে যেন বাল্বের অভ্যন্তরে কম্পমান শিখা দেখতে পাচ্ছে। অনেকদিন পূর্বের এক বিয়েবাড়িতে চোখ জ্বালা করা মধ্যরাত্রিতে শোনা গ্যাসের সাঁ-সাঁ শব্দটার কথা মনে পড়ে গেল তার। সেই আলোটার চারিদিকে অসংখ্য সবুজ রঙের পোকা গিজগিজ করছিল। দীপিতা এবার লক্ষ্য করলে ঘেরাটোপের গায়ে কতগুলি বাদলা পোকা 'লেগে আছে, স্ট্যান্ডের পক্ষাকৃতি গোড়াটাতেও। আঙুল দিয়ে গোড়াটা সাফ করতে গিয়ে সে আশা করেছিল আলোর গা চোয়ানো খানিকটা ময়লা আর্দ্রতা লাগবে আঙুলে, কিন্তু তাদের শুষ্কতা মনকে আকৃষ্ট করবার মতো।

আকাশের প্রান্তে মেঘ আছে। অজস্র কালো চুলের সীমার মধ্যে চকচকে অবিশ্বাস্য টাকের মতো আকাশে গুটিকয়েক তারাও চকচক করছে। দূরের মেঘগুলির গতি দেখে সেগুলিকে কালো বর্ণের ফুটন্ত দ্রব্য বলে মনে হচ্ছে, যা-কিছু বাতাস মেঘের বীচিভঙ্গে সৃষ্টি হচ্ছে, বাধা পাচ্ছে, মেঘমুক্ত আকাশের অংশটুকু যেন আতপ্ত সৈকত মেঘের ঢেউগুলির স্নিগ্ধতা বহন করে যে-বাতাসটুকু আসছে সেটুকু আতপ্ত তটভূমির স্পর্শে তপ্ত হয়ে উঠছে। রুক্ষতার একটা অনুভূতি অন্যান্য বোধগুলির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, পরিবর্তিত করেছে সেগুলিকে, দুটি শ্রাবণের ঘণ্টার মধ্যে একখণ্ড ফাল্গুনের সময় এসে পড়েছে যেন।

গর্হিত অন্যায় কিছু নয়, অবাক করবার মতো, ধাক্কা দিয়ে জাগ্রত করে দেবার মতো বিষয়—ভাবলে দীপিতা। হয়তো কৌতুকের জন্যই এই বেশভূষা, তবু এক-একটি ব্যাপার এমন সন্দিহান করে তোলে মনকে।

মনে প্রাণে কি আমরা উপচার-প্রয়াসী? আমাদের রিয়ালিস্টিক দৃষ্টির গভীরে, র‍্যাশন্যাল জীবনপদ্ধতির আড়ালে ইন্দুর মতো একজন লুকিয়ে আছে। সেইজন্যই কি দিনমানের উচ্ছ্বাসবৃত্তি রাত্রির অবসরে এমন প্রগল্ভ হয়ে ওঠে। এতটুকু ফিকে হতে দেবে না, উপচার-বাহুল্যে আস্বাদনকে পীড়িত না-করে ছাড়বে না? কীটসভক্ত ইন্দুর মতো।

এত স্বাভাবিক ছিল এসব ব্যাপার যে কেউ বিচার করার কথা চিন্তাও করেনি, আজ বিচার করতে হচ্ছে : মালা গেঁথেছিল, ভামিনী বউ শাদা বেলফুলের মালা, বিকাশের গলায় পরিয়ে দেননি ভামিনী বউদি, লজ্জার বাধা নয়, দীপিতা গেঁথেছিল, সেও পরাতো। বিকাশ ফিরে এসে মালা দেখে খুশি হয়েছিল,

প'রে নয়। এটা খুব বড় কথা নয়, জীবনদর্শনও নয়, তবু যেন রুচি ও চিন্তাধারার প্রতীক।

দীপিতা প্রশ্ন করল, অভ্যাসের ফলেই কি এমন হয়েছিল, নতুবা ভামিনীর কি সাধ ছিল বেলফুলের মালাটা প্রিয়জনের গলায় তুলে দিয়ে প্রতীক্ষায় উর্ধ্বমুখী হয়ে দাঁড়াতে, পারেনি অভ্যস্ত নয় বলে।

দীপিতা জানালার কাছে উঠে গিয়ে গরাদে দেহভার রেখে দাঁড়াল। অভ্যাসের ফলে হয়েছে, ভাবতে একটু কষ্ট হল, কারণ অভ্যাসের ফল মানে অনেকদিন অভিনয় করার ফল।

বিকাশের ছেলেটি, যে শুধু ভালোবাসা কেড়ে নেবার জন্য আঙুল বাড়াতে শিখেছিল, একদিন অব্যক্ত ব্যথায় মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে নীল হয়ে কেঁদে উঠে বিদায় নিয়েছিল। সেদিন দীপিতা হাহাকার করে কেঁদে উঠতে গিয়ে বিকাশের মুখের দিকে চেয়ে শঙ্কিত হয়েছিল, শোককে ছাপিয়ে উঠেছিল মানুষের মননশীলতার প্রতি শ্রদ্ধা। বিকাশ ম্লান হেসে বলেছিল—ওকে ফুল দিয়ে সাজাবি, বরং মসলিনের নিষ্পাপ কিছু একটা পরিয়ে দে। ভামিনী শিশুমুখের দিকে চেয়ে থেকে একটা-বা অশ্রুর ধারা মুছে রোজকার মতো সাজিয়ে দিলেন।

শুধু কি অভ্যস্ততা, এত বড় বেদনার মুহূর্তেও কি অভ্যাস বড় হয়ে ওঠে? দীপিতার সন্দেহ হল, সব আলো নিভিয়ে দিয়ে এল সন্দেহ, বোধ হয় অনুভব ছিল না, হাহাকার করে কেঁদে উঠবার মতো প্রাণের সাড়া।

কিন্তু দীপিতা হাসল, হেসে বলতে পারল নিজেকে : দীপিতা তুমি একটি উনিশ বছরের মেয়ে মাত্র। এখনও সুস্থ সবল চিন্তাধারা তোমার নিজস্বত্বের কাঠিন্য অর্জন করতে পারেনি, অন্যান্য কারো চিন্তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এখন হাতে-মুখে জল দিয়ে বিছানায় যাও। কপালের রগ দুটিকে মাসাজ করে দিয়ো, ঘুমিয়ে পড়বে। কাল সকালে যখন সকালের খটখটে রোদে উঠে দাঁড়াবে তখন এপস্টাইনের মর্মরের মতো বাহুল্যবর্জিতের পরিপূর্ণতায় প্রকাশ পাবে তুমি।

তবু ভাবল দীপিতা : এখন মনে পড়ে না ঘুমাবার আগে অর্গল খোলা ছিল কিম্বা ঘুমের মাঝখানে উঠে দাঁড়িয়ে দরজাটার দিকে চেয়ে তার মনে হয়েছিল ওপারে ইন্দু হয়তো হাত-দুখানা প্রসারিত করে দাঁড়িয়ে আছে তার মতো, দরজার অর্গল খুলে দিয়েছিল সে।

বর্ষণক্লান্ত আকাশের দিকে চেয়ে দীপিতা দাঁড়িয়েছিল, তখন ইন্দু এল ঘরে, তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল বাইরের দৃশ্যের অংশ নিয়ে।

ইন্দু বলেছিল—আপনার পড়বার ঘরে ব্রাউনিং খুঁজে পেলাম না।

ব্রাউনিং খুঁজে দিয়ে ফিরে আসবার অনুভূতি এখনও লেগে আছে গায়ে, কিন্তু আরো অদ্ভুত বোধ হয় ভাবতে গেলে। ইন্দু শুধু বলেছিল—শুনুন, দীপিতা ঘরের প্রায় আধখানা হেঁটে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ইন্দুর পাশে।

ইন্দু বলেছিল—তোমার চুলগুলি খুলে দাও বাইরের ঐ অন্ধকারকে আরো স্নিগ্ধ করে, কথা বোলো না। প্রজাপতি-ডানার নিচের অন্ধকারের মতো কোমল নীরবতায় ডুবে যাও ; কথা বোলো না, পাতার আড়ালে একটি ডানার ছায়ায় আর-এক জোড়া ডানা স্বপন দেখছে চ্যুতমঞ্জরীর।

ইন্দু কথা না-বললে কী হতো কে জানে, ইন্দুর কথায় দীপিতার সম্মোহন টুটে গিয়েছিল, হেসে সে বলেছিল—পিলিয়াস মেলিসান্ডার কথা বলছেন? মেটারলিংক তাহলে ভালো লাগে আপনার?

না, আঘাত দেয়নি দীপিতা। অধ্যাপকের উপস্থিতিতে সাহিত্য আলোচনা করবার মতো লঘু হাসি ছিল তার ঠোঁটে।

টিনের ঘরে ফিরে এসে মনে হয়েছিল, সিন ক্রিয়েট করা হল যেন। যেন প্রেমনিবেদনভীতা ত্রস্তা কিশোরীর পলায়ন।

অতঃপর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে স্বচ্ছ গলায় বলেছিল—ও ইন্দুবাবু, আসুন। ঘুম হচ্ছে না, হয়ও না এ-অবস্থায়, পোকার খেলি বরং।

দীপিতার সলিলকি করা অভ্যাস নয়, তবু মনে হল আবার : তুমি কি চেষ্টা করে আজ ঘুমাতে পার না। ইতিমধ্যে তুমি যা নয় তা চিন্তা করতে শুরু করেছ, আরো কিছুক্ষণ জেগে থাকলে নেশা মাথায় উঠবার মতো অবস্থা হবে তোমার। কাল সকালে থাকবে তা নয়, ঘুম ভালো না-হলে কাল সারাদিনই মস্তিষ্ক ভালো কাজ করবে না। নেশার পরে ভোঁতা বিস্বাদ জিহ্বার মতো হয়ে থাকবে মন। কাজেই বুঝলে... কাজেই উনিশ বছরের মেয়েটির মতো বিছানায় তালগোল পাকিয়ে রৌদ্রতৃপ্ত পুষির মতো ঘুমিয়ে পড়গে।

তথাপি প্রায় কেঁদে ফেলার মতো মুখ নিয়ে চেয়ারে ফিরে এল দীপিতা, ইন্দুর সেই মেটারলিংক প্রভাবিত রাত্রির কথা মনে পড়ে গেল। ইন্দুর ঘর তারই নিজেরই পড়বার ঘর, সেইদিন রাত্রির জন্য ইন্দুর ঘর হয়েছিল, ব্রাউনিং খুঁজে দিতে সবার মতো পুরুষের স্পর্শ-উদ্বেল অন্ধকার আজও ঘরে।

মনে হল : যে-আগ্রহে ইন্দু কবি হয়ে ওঠে সেটা কি ভাব?

ইন্দুর উপপাদ্য একটা বিষয় মনে পড়ল—বিংশ শতকে এসে দেখছি আমরা রুক্ষ হয়ে উঠেছি, যে-কূপ থেকে উদ্বেল হয়ে ওঠে প্রাণরস, শুকিয়ে গেছে সেটা। বিশ্বাস নেই কিছুতে। থাকলেও স্বীকার করি না, কারণ বিশ্বাস জিনিসটা মধ্যযুগের ব্যাপার, সেইজন্যই তাকে বর্জন করেছি।

খুব অন্যায় করেছি? মধ্যযুগের পোশাকটা বর্জন করবার সময়ে ন্যায় ও অন্যায়ের কোনো প্রশ্ন যেমন ওঠে না, এটার বেলাতে হলে ক্ষতি কী?

ইন্দু এ রকম পরিস্থিতিতে ঠোঁট দুটি আলগা করে রাখে, বোকামির চিহ্ন নয়, কথা বলবার, তর্কের কোণ চেপে ধরবার আগ্রহাতিশয্যে, সে টপ করে বলে বসল, 'দেখুন এই সাহিত্যিক অমিয়বাবুর কথাই ধরুন, আপনার প্রিয়জনস্থানীয় অমিয়বাবুর, যখন ভাবের প্রসারতায় সহানুভূতিতে যখন তাঁর চোখ দুটি করুণায় ভরে উঠবার লক্ষণ দেখাচ্ছে, কলমকে অব্যাহত ছেড়ে দিলে যখন গ্রীক ক্লাসিকের স্বল্প পরিমিত গভীর বেদনার দু-চারটে কথা লিখে ফেলবেন মনে হচ্ছে, ঠিক তখনই টপিকাল কোনো কথা উত্থাপন করে বাজে কথার অবতারণা করে নিজের ভাবাবেগকে ব্যঙ্গ করে নিজের লেখাটাকে থার্ড ক্লাস করে তুলবেন। এটা হচ্ছে একটা পোজ, যুগের ভঙ্গি। ডেমোক্রাসির রিঅ্যাকশন'।

বক্তৃতা দেবার সময়ে ইন্দুর মাংসল চোয়াল দুটি স্থূলভাবে নড়ে-নড়ে ওঠে।

দীপিতা জ্বালাময় চোখের সম্মুখে ভার্জিনিয়া উল্‌ফই খুলে বসল। হাতের কাছে পেয়ে এমন স্পষ্ট ভাষায় নিজেদের কথা কে বলেছে, কোথায় এমন বর্তমানের আলোকসম্পাত?

কিন্তু চোখে পড়ে গেল—না-না, আমরা পারছি না, প্রাচীনদের মতো কোনো মহৎ সৃষ্টি। সেই সুর, পরাজয়ের অবিশ্বাসের আজকের রাত্রির সুর। মনে হল : বিশ্বাস ত্যাগ করাটা উচিত হয়নি। বিশ্বাস জিনিসটা অবিভাজ্য, প্রাচীনের প্রতি সব বিশ্বাস ত্যাগ করতে গিয়ে বর্তমানে বিশ্বাস রাখা আর সম্ভব নয়।

মনে হল আশ্রয় চাই কিছু। সহসা সিগারেটের অনাস্বাদিতপূর্ব ধোঁয়ার অদম্য পিপাসা বোধ করল সে। ছেলেমানুষি করে কেনা ডাকপিওনের মতো চামড়ার কাঁধব্যাগ হাঁটকে বেরোল কয়েকদিন পূর্বে ব্রাভাডো দেখানোর জন্য সীতার কেনা বিবর্ণ এক প্যাকেট সিগারেট, যেটা দীপিতা শাসনের ভঙ্গিতে কেড়ে নিয়েছিল।

মুখে একটা তোবড়ানো সিগারেট গুঁজে পুরুষের ভঙ্গিতে টেবিলের উপরে পা তুলে বসল। নেই-নেই, কিছু নেই, মহৎ কোনো সম্পদ প্রাণরসের কোনো চিহ্ন—এমনি হাহাকারে শেষ হয়েছিল ভার্জিনিয়া উল্‌ফের জীবন, এ-কথাটাও মনে পড়ে গেল।

চেয়ারের পিঠে মাথা হেলিয়ে দীপিতা, মুখে তোবড়ানো সিগারেট ঝুলে আছে। হঠাৎ ঘুম এল দুর্নিবার মোহের মতো বাইরের আকাশে গুরু-গুরু শব্দে বর্ষণ নামামাত্র। বাঁদিকের বুকটায় গরাদের চাপে ব্যথা হয়ে আছে, ঘুমের ঘোরে একখানা হাত সে-ব্যথাটাকে স্পর্শ করে রইল।

কলঙ্ক

রাত্রিতে লীলা-সুধীরের ব্যাপারটা দাম্পত্যকলহের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল।

ব্যাপারটার মূলীভূত সুসি। সে যখন গাড়ি থেকে নামল তখন লীলা তার জানলা থেকে লক্ষ্য করেছিল তার পরনের শাড়ি ওড়না মাত্র হয়ে উঠেছে, ভাগ্যে স্কার্ট পরা ছিল। সিঁড়িতে সুসি-সুধীরের জোড়া হাসি টাল খেতে-খেতে জড়াজড়ি করে উঠছে, এও শুনেছিল লীলা। স্বামীর আহার্য সম্মুখে নিয়ে রাত জেগে বসেছিল সে। রাতজাগা মানে রাত দশটা। তা হোক, জীবনে প্রথম এই শোবার ঘরে স্বামীর আহার্য নিয়ে অপেক্ষা করার অভিজ্ঞতা, কাজেই সুধীর যখন বলল—বাইরে সে খেয়ে এসেছে তখন লীলা অপমানিত বোধ করল।

কলহের একসময়ে উত্তেজিত সুধীর বলেছিল—কথা বোলো না, ফাঁকি দেবার লজ্জায় মিশে যাও।

লীলা পুরনো ব্যথায় আঘাত পেয়ে জ্বলে উঠল—আমি গাইতে জানতাম কিনা এ খোঁজ নেবার প্রয়োজন কোনোদিনই বাবার হয়নি, এ পুরনো যুক্তি তুলব না। কিন্তু যদি বাইজিদের মতোও জানতাম, একটা মাতালকে ভুলিয়ে রাখতে হবে জানলে আমার বাবা বলতেন—গান জানে মেয়ে, বিয়ে দেব না।

—কী বললে? ছি-ছি, কী কেলেঙ্কারি!

—কলঙ্কের নয়।

—নিজের মনের তুলনাতেই সুসিকে অত সস্তা ভেবেছ।

—কী বললে? এবার লীলার পালা।

সকালের দিকে জেগে সুধীরের মনে হল ঘরে কেউ হাঁটছে। সিঁদুরে বেডলাইট। লীলার সব পছন্দ গাঢ় রঙের। তেমনি একটি মেয়ে সে যাকে গভীর রঙের সিল্কে মানায়, একগলা জড়োয়ার ভিতর থেকেও যার গ্রীবাটাই প্রধান হয়ে থাকে। সুধীর দেখল—লীলা তার শয্যা-উপকরণ গোছাচ্ছে, কোথাও যেন যাবে।

সে বলল, 'কেলেঙ্কারি বাড়িয়ো না'।

লীলা ফিরে দাঁড়াল। সাপের মতো দৃষ্টি। কিন্তু এক-একটি রূপ থাকে ভীষণ হলেই যা পূর্ণ হয়। লাল আলোয় স্বল্পবাস লীলাকে কাচকড়ার স্বচ্ছপাত্রে নিষিদ্ধ পানীয়র মতো দেখাল।

কিন্তু সুধীর অনুভব করল—হাত বাড়াতে নেই। তাহলে আলো নিভে যাবে, দরজা খুলে ছেলে কোলে করে লীলা শীতেব সকালে বেরিয়ে পড়বে। রাত্রির কলহটাকে গত রাত্রির দুঃস্বপ্ন করে দেয়া যাবে না, দিনের তীব্রতায় ঝকঝক করে উঠবে।

সুধীরের মা মলিনা অন্যদিনের চাইতে আজ সকালে উঠেছেন। বাড়িতে ননদ-ননদাই, না-উঠে উপায় কি। রাত্রির অবিন্যস্ত চুলের সিঁথিতে সিঁদুর পরে তিনি বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। চাবির গোছাটা হাতে ছিল, আঁচলে বাঁধলেন। বারান্দা দিয়ে চলতে-চলতে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন উঠোনের একটেরে ঝিরা কাজে লেগেছে।

ঘুম থেকে উঠে সিঁদুর পরা, আঁচলে চাবি বাঁধা, ঝুঁকে পড়ে ঝিদের খবর নেয়া এ-কাজগুলি তাঁর শাশুড়িই তাঁর মনে ক্রমাগত উপদেশে কষে বসিয়ে দিয়েছেন। কাজেই রোজ সকালের মতো এ-কাজগুলি করতে-করতে শাশুড়ির কথা মনে হল।

শাশুড়ির ঘরে যাবার সিঁড়ির পাশের ঘরখানি সুধীরের শোবার। চারিদিকে চেয়ে দেখে একটা কেলেঙ্কারি করে বসলেন মলিনা। সুধীরের দরজায় কান রাখলেন, চোখ রাখলেন চাবির ছ্যাঁদায়। সুধীর-লীলার কলহ কাল কানে গিয়েছিল তাঁর। কিন্তু ঝগড়া ওরা মিটিয়ে নিল কিনা এ জানবার কৌতূহল

যতই স্নেহাতুর হোক ছেলে-বউয়ের শোবার ঘরে আড়িপাতার লজ্জাটা তিনি অনুভব করলেন। পালিয়ে যাবার ভঙ্গিতে হাঁটতে লাগলেন তিনি।

এ-রকম সব কেলেঙ্কারি অনৈচ্ছিকভাবে ঘটে যায় মলিনার।

শাশুড়ির নাম চম্পাবতী। নামটা পঞ্চাশ বছরে চাপা পড়ে গিয়েছে। বড্ড যেন যৌবন-ঘেঁষা নাম। মনে হলে শাশুড়ির মুখের দিকে চাইতে লজ্জা করে মলিনার। বাড়ির খুব কম লোকেই জানে এ-নাম। জমিজমা-সংক্রান্ত কাগজে সই নিতে এসে নায়েবমশাইয়ের মনে হয়ে যায় এঁর নাম চম্পাবতী মৌলিক। জড়ানো-জড়ানো কাঁপা-কাঁপা অক্ষরে লেখা নামটি। পঞ্চাশ বছর আগে এঁর দিকে চেয়ে এ-নামটা কতখানি সার্থক বোধ হতো এ ভাবতে কৌতুক বোধ হয়। কিন্তু আর সকলে ভুলে গেলেও জমিদারির কাগজে সই দেবার বেলায় যেমন দু'একজনের চোখে পড়ে যায় নামটি, তেমনি স্বল্প-প্রকাশিত হয়ে পড়ে সে-নামের সার্থকতা এঁর বার্ধক্যলোল মুখাবয়বে হঠাৎ কোন এক মুহূর্তে। এঁর জমিদারিটাও তেমনি সবসময়ে নজরে পড়ে না। ক্ষয় হয়নি সেটা, নগণ্যও নয়, তবু তা বর্তমান সংসারের আয়ব্যয়েব হিসাবের মধ্যে ধর্তব্য নয়। জাহাজি ব্যবসায়ের লাখের হিসাবে যে-সংসার চলছে তার একপাশে পড়ে থাকে তাঁর জমিদারির সেহারোকর। যেমন সংসারের মেরুদণ্ড জাহাজি কারবারের সেক্রেটারিয়াটের পাশে তাঁর বুড়ো নায়েবের ফরাস-বিছানো সেরেস্তা। যেমন তাঁর নাম, যেমন তাঁর জমিদারি, তেমনি তার অস্তিত্ব : আছেন অথচ কার্যকরীভাবে আটপহরে সংসারিকতায় জড়িয়ে নেই। তিনি এবং তাঁর জমিদারি লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে সিঁদুর মাখানো আকবরি মোহর।

চম্পাবতীর সঙ্গে আজকাল সাংসারিক পরামর্শ হয় না, কিন্তু শুধু প্রণাম করে ফিরে গেলেও চলে না, দাঁড়িয়ে খানিকটা আলাপ করে যেতে হয়। নতুবা হয়তো আধঘণ্টা পরেই ভুলে যাবেন—মলিনা এসেছিলেন কিনা, কেমন দেখাচ্ছিল তাঁকে, হয়তো ক্রমাগত লোক পাঠিয়ে খবর করতে থাকবেন মলিনার স্বাস্থ্যের, বাড়িভরা লোকজনের সম্মুখে সেটা কম লজ্জার ব্যাপার নয়।

সেজন্যই মলিনা বললেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে, 'সুসি এসেছিল'?

'হ্যাঁ, দেখা করে গেছে'।

'কী রকম লাগল'?

'বেশ মেয়ে বউমা। কথাবার্তায় বেশ চুলবুলে। কিন্তু একটু যেন রুক্ষ। আমাদের কালই যেন ফিরে আসছে। অবশ্য আমরা পাউডার দিয়ে চুল রুক্ষ করতাম, ওদের যেন আপনা-আপনি হয়েছে। জানো বউমা তোমার শ্বশুরদের মান রাখবার জন্য আমাদেরও স্কার্ট পরতে হতো কখনও-কখনও, কিন্তু ওদের স্কার্টগুলো যেন বড় বেশি উঁচু'।

শাশুড়ির সঙ্গে এরকম আলাপ করতে মলিনা পারেন না। যেন শাশুড়ির মর্যাদা তরল হয়ে যায়। তাছাড়া সুসিকে আলোচনা করাটাই তো আলাপের উদ্দেশ্য নয়। অভ্যস্ত কৌশলে কথার মোড় ফিরিয়ে শাশুড়ির কাছে বিদায় নিয়ে মলিনা সংসারের দিকে চললেন।

একতলার বারান্দায় সুসি একটা ধূমায়মান পেয়ালায় চুমুক দিতে-দিতে হাঁটছে। তার এ-রকম পায়চারি করা যত না নতুন, এ-বাড়ির পক্ষে তার চাইতেও অভিনব তার পেয়ালাটি। মলিনা নিঃসংশয়ে বলতে পারেন সেটা সুসির আমদানি—একটা বিয়ার-মগ। ফায়ারপ্লেসের নিভন্ত আঁচে তাতিয়ে নেয়া যায় এমনি সব মগের কথা ইংরেজি উপন্যাসে পড়া গেছে।

সুসি বলল, 'তুমি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীঠাকরুন, মামিমা'।

'কেন বলো তো'?

'এই সকালে দুধটুকু না-পেলে মাথা তুলতে পারতাম না, এত মাথা ধরেছিল। তোমার ব্যবস্থার জন্য ধন্যবাদ'।

মলিনা হাসিমুখে বললেন, 'অমন পেয়ালাটা পেলে কোথায়'?

সুসি একবার হাতের পাত্রটার দিকে, একবার মলিনার দিকে চেয়ে অবশেষে হেসে বলল, 'আমার স্বীকার না-করে উপায় নেই, অভ্যাস বেমওকায় ফেলেছে'।

'বেশ করেছ'। মলিনা হাসিমুখে রান্নার মহলে চললেন।

মলিনা ভাবলেন : যাকে বারো থেকে বাইশ বছর ইয়োরোপে কাটাতে হয়েছে তার পোশাকের শালীনতার মান ভারতীয় হতে পারে না। আসল ব্যাপার হচ্ছে নিজের রুচি সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া, তাহলেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধটা থেকে যায়, নতুন গ্রহণ করা পোশাকের রীতিটিও মানিয়ে যায়। তাই হয়েছে সুসির ক্ষেত্রে। কিন্তু তবু অন্তর সায় দেয় না। বোম্বাই শহরে সুসিকে এতটুকু বেমানান বোধ হতো না, কলকাতার বাঙালির সমাজে চোখে লাগে। আলোচনাই করে হয়তো চাকররা ওর পায়ের গঠন নিয়ে। আর ওই বিয়ার-মগ! কিছু দরকার ছিল না ওটা ব্যবহার করার। দৃশ্যটা কটু।

কিন্তু মলিনাকে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়। সুধীর সিগারেট খায়, বাটারফ্লাই গোঁফ রাখে—সেগুলি মলিনাকে সহ্য করতে হয়, সুসির এগুলিও চোখ বুজে উপেক্ষা করতে হবে।

ভৃত্যের হাতে চায়ের উপকরণ দিয়ে মলিনা এরপরে ননদাই মহীন্দ্রর ঘরে গেলেন। কয়েক বছর থেকে, তা প্রায় দশ বছর হবে, মহীন্দ্র দু-চার বছরে একবার আসেন। মহীন্দ্র মুটিয়ে গেছেন, টাক পড়েছে। তাঁর চাকরির বদলি এখন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে হয়। অম্বিকাকে (মলিনার ননদ) তার মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়ে নিয়ে যান কোনো-কোনো বার। গত পাঁচ বছর ইয়োরোপ ছাড়েননি, বের্লিন থেকে রোমা, রোমা থেকে প্রাহা করেছেন। এবার বোধ হয় কানবারা কিংবা টোকিও।

চা গুছিয়ে মলিনা বললেন, 'এরা এখনও তেমনি সেকেলে থেকে গেল। টেবিলে বসার অভ্যাস হল না। কী কেলেঙ্কারি বলুন তো'।

মহীন্দ্র বললেন, 'পানাহার ব্যাপারটার সময়ে মানুষের মুখের চেহারা এমন কিছু সুদৃশ্য হয় না যে দলবদ্ধ হয়ে ও-কাজটা করতে হবে'।

মহীন্দ্র চায়ে বসলেন হাসিমুখে। এমনি চমকে দেয়ার মতো কথা বলাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। খুশি হলেন মলিনা, বললেন, 'এবার কিন্তু কিছুদিন থেকে যেতে হবে। মায়ের বয়স হয়েছে। এখন কিছুদিন দিদির কাছে থাকা উচিত'।

'নিশ্চয়'।

'এ-উত্তর বহুদিনের পুরনো, বরং যদি একটু চিন্তা করে বলতেন, আশা হতো'।

'কেন, আপনার ননদ কি থাকতে রাজি হবেন না'?

অনেক দিনের পুরনো রসিকতা। মহীন্দ্র যেবার ডিপ্লোম্যাটিক চাকরি নিয়ে ভারতের বাইরে যান সেবার থেকেই উৎপত্তি। মলিনা জানেন ও-চাকরির বেতন একজনের নামে পাওয়া গেলেও ঘরে-বাইরে দুজনকেই কাজে নামতে হয়।

মলিনা বললেন, 'তাই বলে চাকরি এবং আমার ননদেরই শুধু দোষ নয় চৌধুরীমশাই'।

'কে বলেছে'! মহীন্দ্র চমৎকার বিস্ময়ের ভান করলেন।

অনেকদিন পরে বাপের বাড়ি আসতে পেরেছেন অম্বিকা। বাথরুমে স্নান না-করে বাগানের ঝিলটায় গিয়েছিলেন নাইতে। ঠাণ্ডায় এবং খানিকটা বোধ হয় অ-বয়সোচিত সাঁতারের পরিশ্রমে মুখ লাল করে ফিরছিলেন, মলিনার সঙ্গে দেখা হল উঠোনে।

'সে কি, এই ঠাণ্ডায় কোথায় গিয়েছিলে নাইতে, দিদি'?

অম্বিকা বললেন, 'বেশ জল, কিন্তু বড্ড জোঁক'।

মলিনা শিউরে উঠে বললেন, 'বাপের বাড়ির জোঁকগুলিও মিষ্টি, এমনি বটে মেয়েমানুষ'।

অম্বিকা বললেন, 'তুমি যে কবে থেকে বেটাছেলে হয়েছ দাদাকে জিজ্ঞাসা করব'।

অম্বিকার রসিকতা শুরু হলে ছেলেমেয়ে ঝি-চাকর মানে না, মলিনা পালাই-পালাই করতে লাগলেন।

হাসিমুখে চলে যেতে-যেতে অম্বিকা ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন, 'কথাটা বলা দরকার, বউদি, কিন্তু দাদাকে বা মাকে বলা যাচ্ছে না'।

মলিনা চেয়ে দেখলেন, এ যেন অন্য কোনো অম্বিকা, মুখে রক্ত নেই, রস নেই। মলিনার মন অসাধারণ কিছু শোনার ভয়ে কুণ্ঠিত হয়ে উঠল। হয়তো সুসি সম্বন্ধেই কোনো কথা হবে।

অম্বিকা বললেন, 'তুমি ব্যবস্থা করে দাও, কাল পরশুর মধ্যে আমরা চলে যাব'।

কিন্তু এতে বিবর্ণ হওয়ার কী আছে! অম্বিকারা দুদিন বাদেই চলে যাবে এ তো এ-বাড়ির নগণ্যতম প্রাণীটিও জানে। বিদায়োন্মুখ মেয়ে-জামাইয়ের সম্মানের ব্যবস্থা করার কথা কি মলিনাকে বলে মনে করিয়ে দিতে হবে? মলিনার অনির্দিষ্ট একটা লজ্জাবোধ হল, কোনো ত্রুটি কি মহীন্দ্রর চোখে পড়েছে এবার আর বাপের বাড়ির ত্রুটিটা ঢাকবার চেষ্টা করছে অম্বিকা?

মলিনা বললেন, 'আমি ভেবেছিলাম কিছু দিন ধরে রাখব তোমাদের'।

অম্বিকা একটু দ্বিধা করলেন, কিন্তু কী একটা বলার সাহস হল না বলেই যেন না-বলে চলে গেলেন।

কাজে-অকাজে মলিনার অম্বিকার কথা মনে হতে থাকল।

সংসারের প্রথম তদারক পর্ব শেষ করে মলিনা তখন বাজার দেখে রান্নার ফর্দ করে দিতে বসেছেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলে দেখলেন লীলা ছেলেকে কোলে নিয়ে দুর্ভাবনায় মুখ ভরে পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। পৌত্রর অভ্যর্থনা সাংসারিক ব্যস্ততায় স্মিতহাসি হয়ে ফুটল। কিন্তু পৌত্র যে! বামনঠাকরুনদের তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য বললেন, 'তাহলে ঠিক হয়েছে? বাকিটুকু কালকের মতো হোক'। তারা চলে গেলে লীলার চিন্তাক্লিষ্ট ভ্রূ মলিনার চোখে পড়ল। আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি বললেন, 'অসুখবিসুখ নয় তো, লীলা'? সে কিছু বলার আগেই উঠে দাঁড়িয়ে আধ-ঘুমন্ত পৌত্রকে কোলে নিয়ে গালে গাল ঠেকিয়ে উত্তাপ অনুভব করে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, 'এ তোমাদের কোন দিশি ব্যাভার বাপু, বাড়ির কর্তাকে কোলে করে চলেছ, অথচ মুখে হাসি নেই'।

লীলা তথাপি নিরুত্তর। এটা তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। লীলা-সুধীরের গত রাত্রির কলহ মলিনার মনে পড়ল।

লীলা বলল গম্ভীর মুখে, 'আমি বাবার কাছে যাচ্ছি, মা'।

প্রস্তাবটা আকস্মিক, তার ভাষাটা তদপেক্ষা। সুধীর-লীলার কলহ যদি অজানা থাকত মলিনা নির্বাক উপেক্ষায় আকস্মিকতা ও দুষ্ট ভাষাকে দগ্ধ করতেন। তাঁর অনুভব হল : স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে বেটা-বউ যখন এসে বাপের বাড়ি যাবার অনুমতি চায় তার অর্থ, নিজেরা কলহের নিষ্পত্তি করতে না-পেরে অন্য কথায় বলছে—আমরা ভাব করার পথ পাচ্ছি না, তুমি মিলিয়ে দাও। কিন্তু শাশুড়িদের এ-রকম অবস্থায় গম্ভীর মুখেই কথাবার্তা বলতে হয়।

মলিনা বললেন, 'ভেবে দেখি'।

লীলা বলল, 'আমি ফোন করেছিলাম, দাদা আসবেন দুপুরের পরে নিতে'।

মলিনা চিন্তিত হলেন, লীলা ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়ে দিয়েছে। তিরস্কারের উদ্যোগটা চেপে তিনি বললেন, 'এসো তো আমার সঙ্গে'।

নিজের শোবার ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়ে মলিনা প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে'?

এ-প্রশ্নের উত্তর লীলার প্রস্তুত ছিল না। আবেগে তার বুক ওঠাপড়া করতে লাগল। কিছু বলবে না ভাবতে-ভাবতে সে বলে ফেলল, 'সুসি আমার সব সুখ পুড়িয়ে দিয়েছে'।

মলিনার মুখ বিবর্ণ হল। তাঁর পায়ের তলায় ঘরের মেঝে টলে উঠল। কাল রাত্রিতে হোটেলে খেয়েছে

সুধীর, হয় তো নাইট ক্লাবে হৈ-চৈ করেছে। সুসি শুধু বোন নয়, বন্ধুও বটে। কিন্তু একটি মেয়ে যখন অপরের সুখ পুড়িয়ে দেয় আর তাতে একজনের স্বামী জড়িয়ে থাকে...

বেদনায়, ক্রোধে, চোখে জল আসার উপক্রম হল মলিনার। কিন্তু যারা বলে মলিনা সংসারে ডুবে তাঁর প্রতিভার অপচয় করেছেন তারা আধখানামাত্র জানে। মলিনার প্রতিভা আছে—এটুকুই তাদের আধখানা জানা, তার অপচয় হয়েছে—এটুকু তাদের অজ্ঞতা।

মলিনা বললেন, 'আমার জন্যে অপেক্ষা করো এই ঘরে, আমি না-আসা পর্যন্ত কোথাও যেয়ো না।'

লীলা বুঝল দুর্গে বন্দিনী হল সে। এ-ঘরে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ অধিকার আছে সুধীরের আর হয়েছিল তার নিজের। লীলা বুঝতে পারল, এখন তার নিজের কিছু করা শেষ হল, মলিনার সময় ও সুযোগের মুখ চেয়ে থাকতে হবে।

একটা কেলেঙ্কারিকে দ্বার রুদ্ধ করে মলিনা ত্বরিত গতিতে নেমে এলেন। কিছুই ঘটেনি এমনি মুখের চেহারা করতে-করতে তাঁর মনে হল : সুধীর সাধারণত অন্যায় করে না। অবশ্য পুরুষমানুষের প্রকৃতিতে এমন দুর্দমতা আছে বটে অনেক বিষয়ে। প্রকৃতিটা তার ব্যক্তিত্বের একটা অংশ হবে, না তার বর্তমান ভবিষ্যৎ-জোড়া সর্বস্ব? দেখা যাক, অবশেষে ভাবলেন তিনি, শাস্তি যদি দিতে হয়, তবে সেটা গোপনে, দীর্ঘনিঃশ্বাস বুক চেপে।

এমনি একটা ঘটনা ঘটিয়ে নেবার পর মলিনার প্রয়োজন হয় স্বামীকে। পরামর্শ করার জন্য নয়, অন্যমনস্ক হওয়ার জন্য ; নতুবা ঘটনাটা বুকে চেপে বসে, ঘটনার দিনটা অনন্য হয়ে ওঠার চেষ্টা করে।

হেড়ম্বপ্রসাদকে পাওয়া গেল তাঁর স্টাডিতে।

মলিনা হেসে বলল, 'কাজ নেই হাতে'?

'না। হঠাৎ'?

'এমনি এলাম খবর করতে'।

হেড়ম্বপ্রসাদ স্ত্রীর উপস্থিতি অনুভব করে তৃপ্ত হলেন। গভীর রাজনৈতিক খবর দেয়ার সুরে বললেন, 'খবর শুনেছ? মা আবাব উইল করবেন বলে পাঠিয়েছেন'।

মলিনা হাসলেন, 'আজই আসবে নাকি অ্যাটর্নি, ক'বার হল'?

'মায়ের সেরেস্তাদার বলছিল চতুর্থ। প্রথমবারে শুনেছি আমি সব পেয়েছিলাম, দ্বিতীয়বারে সব অম্বিকা, তৃতীয়বার আমি আর অম্বিকা সমান-সমান'। দুজনেই হাসলেন। ছেলেমানুষি দেখে নিজেরাও নামতে পারে উপভোগের আশায় তাদের মতো হাসি।

'তোমার খবর কী'?

মলিনার মুখে ছায়া পড়ল একবার, তারপর বললেন, 'কিছু না'। মনকে খানিকটা হালকা করে মলিনা সংসারের পাশে দাঁড়ালেন আবার।

আহারে বসে কিন্তু অম্বিকা বললেন কথাটা, বলতে গিয়ে চোখে জল এল তাঁর। স্বামীর চাকরির অসুবিধায় কাঁদবার মেয়ে নয় অম্বিকা, তার চাইতে অনেক বড় বেদনা মহীন্দ্রর এই কলঙ্ক।

অম্বিকা স্বর নিচু করে বললেন, 'অথচ ওঁর কাজের বিচার শেষ পর্যন্ত করবে ইতিহাস'।

মলিনা বললেন, 'যেসব রাজনীতিওয়ালারা সমালোচনা করছে তারা কি চুক্তিটার প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছে না'?

'তাঁরা বলছেন দুই দেশের বিদ্বেষটার স্থান আছে শুধু ওঁর কল্পনাতেই। উদ্দেশ্য ছিল আর-এক ধাপ উপরে ওঠার জন্যে নিজের দিকে দেশের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। একটা কাগজ বলছে, এটা নাকি কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় নিজের নাম বার করার কৌশল'।

'ছি-ছি!'

'আরো কী বলছে জানো? উনি নাকি কিছু অর্থ পেয়েছেন এর ফলে। এদেশের মহাজনরা আর ওদের

মন্ত্রীরা নাকি সে অর্থ দিয়েছে'। কথা খুঁজে না-পেয়ে আহার্য নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন মলিনা। লজ্জায় লাল হয়ে উঠল তাঁর কানের পাশটা যেখানে দু'একটা পাকা চুল চিকচিক করছে।

অম্বিকা বললেন, 'ভবানীপুরের বাড়িটাতে আজকালের মধ্যে যাবার ব্যবস্থা করে দাও, বউদি। সেখানে নির্জনে উনি নিজের চিন্তাগুলি গুছিয়ে নেবেন'।

মলিনা নিজের শোবার ঘরে এসে দেখলেন পৌত্র তাঁর বিছানায় ঘুমুচ্ছে। মেঝেতে লীলা পাথরের মতো বসে। মলিনা পৌত্রের কপাল থেকে চুলগুলি সরিয়ে দিলেন, কপালে মৃদু চুমু খেলেন। লীলাকে কিছু-একটা বলবেন মনে হল, কিন্তু খানিকটা সময় তার দিকে চেয়ে-চেয়ে ভাবলেন, তারপরে বেরিয়ে গেলেন।

ঠিক কোনদিকে যাবেন ঠিক করতে না-পেরেও হাঁটতে লাগলেন। ভাবলেন, তোমার পরিচয় শুধু সুধীরের স্ত্রী নয়, লীলা। তুমি এ-বাড়ির একটা ছেলের মা-ও বটে। ভেবে দ্যাখো, সময় নাও। প্রকাশটাই কলঙ্ক, কলঙ্ক হিসাবে ছড়িয়ে না-দিয়েও অপরাধকে শাস্তি দেওয়া চলে।

অসময়ে দেখা হল হেড়ম্বপ্রসাদের সঙ্গে। এ-সময়ে হেড়ম্বপ্রসাদ অন্দবে আসেন না। মলিনা বিস্মিত হলেন, কিন্তু তখনও তিনি অন্যদিনের মতো চেহারা নিয়ে আসা এ-দিনটাব পরিণতি দেখতে পাননি।

হেড়ম্বপ্রসাদ বললেন, 'তোমাকে খুঁজছিলাম, বিপদ হয়েছে'।

বিপদ! সুধীর-লীলার সামাজিক কলঙ্ক, সুসির অসামাজিক কলঙ্ক, মহীন্দ্রব ঐতিহাসিক কেলেঙ্কারি, তার তুলনায় একটা বিপদ অনেক বেশি সুসহ।

মলিনা বললেন, 'কী হয়েছে'?

'মহীন এসেছিল, বললে ভবানীপুরের বাড়িটাতে এখন থাকবে। কয়েকটা দিন ঠেকিয়ে বাখতে পাববে না'?

'ওঁদের যাওয়াই তো ভালো। এখনও কর্মচাবীদেব, আত্মীয়দের জানতে বাকি আছে ব্যাপারটা'। বললেন মলিনা।

'কী হয়েছে'?

মলিনা তখন মহীন্দ্রর কথা বললেন।

হেড়ম্বপ্রসাদ তিক্ত হেসে বললেন, 'এ-রকম আশঙ্কা করেছিলাম, কিন্তু বাড়িটা আমার হাতে নেই'।

'সে কী'! মলিনার বিস্ময় বেদনাবোধে পর্যবসিত হল। 'কী বলছ তুমি'?

'হ্যাঁ। বিক্রি করতে হয়েছিল সেবার। ওরা তো কখনও থাকে না। দশ বছরের মধ্যে একদিনও না'।

'তাই বলে'—মলিনা কথা শেষ করতে পারলেন না।

'বাণিজ্যমন্ত্রীর এক নিকট আত্মীয়র খুব পছন্দ হল কিনা। দ্যাখো, বাণিজ্যিক আভিজাত্যের নিচতলাটা কী। কিন্তু শোনো এলগিন রোডেই একটা বাড়ি পাচ্ছি, কথাও চলছে'।

তথাপি মলিনা নিরুত্তর। এবার ব্যবসাযী হেডম্বপ্রসাদ বললেন, 'তাছাড়া বাড়িটা যে অম্বিকাদেরই ছিল...

মলিনার মনে হল স্বামীর ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে তাঁর কথা বন্ধ করবেন। এ-কথা বলা, বাড়ি-বিক্রির চাইতেও বড় কলঙ্ক। স্বত্বসাব্যস্ত করা, যার পরে আসে মামলা, কোর্টে গিয়ে হলফ পড়ে সাক্ষী দেওয়া। যে-বাড়িতে অম্বিকা এতবার থেকেছে কলকাতায় মহীন্দ্রর বাড়ি নেই বলে, সেটা প্রকৃতপক্ষে কার তাই নিয়ে কথা তোলা। এরপরে তাঁর ননদের এ-বাড়িতে থাকার অর্থ হবে দখল নেবার জন্য মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকা, আর তাঁদের থাকতে বলার অর্থ দাঁড়াবে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা। যেটা ছিল ঘনিষ্ঠ

আত্মীয়দের মিলন সেটা কী কদর্যই-না হয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু অম্বিকাকে ধরে রাখতে হবে। আর যাই হোক কেলেঙ্কারির মতো তীব্র হয়ে উঠতে দিলে চলবে না ব্যাপারটিকে। সময়ের সঙ্গে থিতিয়ে যাক, ভোঁতা হয়ে যাক।

মলিনা সেলাই ঘরে ঢুকলেন। উল আর কাঁটা ছিল পাশাপাশি। সেগুলি নিয়ে অত্যন্ত কঠিন প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্যাঁচালো একটা ছক তুলতে বসলেন। আঙুলের গতি দেখে মনে হল—প্রতিযোগিতায় নেমেছেন তিনি, কাউকে পিছনে ফেলে দৌড়বার চেষ্টা করছেন।

পড়ন্ত বিকেলে তাঁর কানে এল পাশের ঘরে সুধীর ও সুসি কথা বলছে। সুধীর বলল, 'তা আমি জানি না। তুমি বৈজ্ঞানিক, উপায়টা তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে'।

সুসি বলল, 'ঝগড়া করেছ'?

'হ্যাঁ, তাকে দাম্পত্য কলহ বলে না, বিশ্রী একটা ব্যাপার কবে বসেছি। হাসির ব্যাপার নয় সুসি, কাল আমার নেশা হয়েছিল। তোমার সঙ্গে ওছাই খেতে বসে দস্তুর মতো খাওযাই হয়েছে। পুরুষের দম্ভ না-করাই উচিত ছিল। ও-বিষয়ে তুমি আমার গুরুজন'।

'লীলা কোথায়'?

'খুঁজে পাচ্ছি না'।

এই প্রকৃত সুধীর। কঠিন কথাগুলোও যে হাসির মতো ক'রে প্রকাশ করে। ওদের কথাবার্তার শ্লথ গতি মলিনার আড়ষ্ট কঠিন মনকে নমনীয় করে দিতে লাগল। এ-পথে লীলাদের ব্যাপারটা নিরসন হবে কিনা বোঝা যাচ্ছে না, এটা অন্তত জানা যাচ্ছে সুধীর-সুসির কলঙ্ক এমন নয় যে লীলাকে আত্মসম্মান খোয়াতে হবে ফিরতে গেলে, নতুবা সুধীর সুসিকে এমনতর অনুরোধ করত না লীলাকে ফিরিয়ে আনতে।

মলিনার ব্যথা ধবে আসা আঙুলগুলি থামল। চেয়ারের পিঠে হেলে বসেই একটু বিশ্রাম নেবেন এমন মনে হল। একটা কলঙ্ক যেমন ফিকে হযে যাচ্ছে—সবগুলি যদি তেমন হতো।

কিন্তু তখনও অনেক কাজ বাকি। এখনও অম্বিকাকে থাকতে বলার প্রায়-অসাধ্য কর্তব্যটা করা হয়নি।

সন্ধ্যার শব্দগুলিতে সজাগ হয়ে মলিনা উঠে দাঁড়ালেন। অম্বিকার কাছে যেতে হবে, কিন্তু তারও আগে শাশুড়ির সঙ্গে নৈমিত্তিক সাক্ষাৎটা করে আসতে হবে। সৌভাগ্য এই এতক্ষণ পর্যন্ত কলঙ্কগুলি ছড়িয়ে পড়েনি অন্তত। যদি চাপা পড়ে না-ও যায় তবু একসঙ্গে সবগুলির প্রকাশ না-হয় যদি, তাও ভালো। একটা দিনের পক্ষে এতগুলোর চাপ দুঃসহের চাইতেও বেশি।

শাশুড়ির ঘরের দরজায় মলিনা থামলেন। ভিতরে মহীন্দ্রর গলা শোনা গেল আর বোধ হয় অ্যাটর্নি মিত্তিরের। রাষ্ট্রনীতির পুরনো একটা সংবাদের ভিতর-পিঠের আলোচনা করছেন তাঁরা। এ-আলোচনার জন্য তাঁরা এখানে এসে বসেছেন এটা সম্ভব নয়। দৃশ্যতই তাঁরা কারো প্রতীক্ষা করছেন।

অবগুণ্ঠনকে রুচিপূর্ণ করার অভ্যস্ত টানটা দিয়ে মলিনা ঘরে ঢুকলেন। মহীন্দ্র বললেন, 'আসুন, বউঠান। আপনার খোঁজে সরমি আর শতদল গিয়েছে'।

ঝিদের পক্ষে খুঁজে না-পাওয়া আশ্চর্য নয়, লীলার বিয়ের পর থেকে সেলাই ঘরে তিনি কদাচিৎ গেছেন।

অ্যাটর্নি বললেন, তিনি যে মনমতো একটা উইলও খাড়া করতে পারছেন না এই লজ্জা তাঁর স্বরে, 'আমি আবার এসেছি, এবার মায়ের একটি সর্বাঙ্গসুন্দর উইল করতে হবে'।

চম্পাবতী বললেন, 'বোসো বউমা, আমার পাশে এখানটায়। আমি তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। শুধু

সাক্ষী হলেই হবে না, ভাষাও যোগাতে হবে'।

মলিনা বসতেই তিনি আবার বললেন, 'কে পাবে সে আমার ঠিক হয়ে গেছে। সুসি ম্যুনে থেকে বিজ্ঞানে ডক্টর হয়েছে, অবিশ্যি জার্মানরা=K দিয়ে ডক্টর লেখে আর সুসি M Sc. না-পড়েই ডক্টর হয়েছে। তা হোক। সে বিয়ে-থা করবে না, বিজ্ঞান নিয়ে থাকবে। আমার নগদ টাকা যা আছে এবং সুসির জীবদ্দশায় আমার জমিদারির যা আয় হবে সব সে পাবে। তারপরে আমার জমিদারির আয় ফিরবে সুধীরের ছেলেতে। আর আমার বাড়িগুলি আমার পরে অম্বিকা ও হেড়ম্ব দুজনে ভাগ করে নেবে সে-ব্যবস্থাও করেছি'।

মহীন্দ্র বা মিত্তির কথা বললেন না। বাড়ির কথায় মলিনার ভিতরটা হিম হয়ে গিয়েছিল, তিনিও মুখ নিচু করে রাখলেন।

চম্পাবতী বললেন, 'আমি হেড়ম্বকে সর্বস্ব দিয়ে উইল করেছি, অম্বিকার বেলাতেও তাই, কিন্তু কোনোবারই মনের ধোঁকা আমার যায়নি। উইলও বদলাতে হয়েছে। কেন এমন হল শোনো। তারপরে তুমি আর মহীন সাক্ষীর জায়গায় সই করে দিও। আমি বুঝে উঠতে পারি না ওদের মধ্যে কার দাবি বেশি। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানের হাতে তুলে দিলাম'।

তিনি একটু জল খেলেন, একটা বক্তৃতা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন যেন। তাঁর চোয়ালের নিচে ঝুলে-পড়া পেশিগুলো গলার শিরাগুলোর সঙ্গে কাঁপতে লাগল।

চম্পাবতী বললেন, 'তোমরা জানো আমার অম্বিকা ও হেড়ম্ব যমজ। ওদের গায়ের রঙ, মুখেব চেহারায় তফাত আছে। মিলও কম নেই। কিন্তু এ দিয়ে এ-বিষয়ে কিছু নির্ধারণ করা যাবে না। ভর্সিলিয়েফ বলেন (এখানে একটু হাসলেন চম্পাবতী) এর চাইতে কম মিলেব যমজও দেখা গেছে। তার চাইতেও বড় কথা ওদের দুজনকে বিছানায় পাশাপাশি নিদ্রিত রেখে আমি মিলগুলো দেখেছি, পার্থক্যগুলো দেখেছি, তাতেও এর সমাধান হয়নি, তোমরা কী করে পারবে বল? প্রায় তিন দিনেব ছোট-বড় ওরা, কিন্তু কে বড় কে ছোট আমিও জানি না। হেড়ম্ব দৈহিক শক্তির প্রাধান্যে দাদা হযে বসেছে। ওবা ছোটবেলায় এ ওর গুরুজন হবার জন্য মারামারি করত'।

শেষ কথাটা বলে চম্পাবতী হাসলেন।

'ওদের দুজনের একজন, কে তা বলার উপায় নেই আমার, ভূমিষ্ঠ হবার পর আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। প্রায় তিনদিন পরে জ্ঞান হল, তারও প্রায় এক সপ্তাহ পরে ডাক্তার আমাকে প্রথম সন্তান স্পর্শ করতে দিলেন। ওরা আমার কোলে এনে দিল অম্বিকাকে। তখন তখনই কথাটা আমার মনে পড়েনি। আরো এক সপ্তাহ যাবার পরে একদিন হঠাৎ মনে পড়ল : জ্ঞান হারাবার ঠিক আগে কে যেন বলেছিল আমার ছেলে হয়েছে। মহীন্দ্র, তুমি কিছু মনে কোরো না বাপু, মায়েদের কেন যে প্রথম সন্তানকে পুত্র পেতে লোভ হয়, এ আমি বলতে পারব না। তোমার মায়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ; তিনিও স্বীকার করেছিলেন ছেলের উপরেই তাঁরও লোভ ছিল। তাই বলে অম্বিকা আমার হেড়ম্বর চাইতে কম নয়, ভগবান জানেন।

'তখন আমাদের ভয়ানক বিপদ। তোমাদের শ্বশুর তখন সেসন্‌সের বিচারে পাশের জেলায় গেছেন। আমার অমন অবস্থার খবরটাও তাঁর কাছে সময়মতো পৌঁছায়নি। খবর পেয়ে কলকাতা থেকে আমার দেওর ছোটজাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন আমার সেবা শুশ্রূষার জন্যে কিন্তু স্ত্রীকে রেখেই চলে গেলেন তাঁর রাজনৈতিক সভা করতে। দ্যাখো, এই জন্যেই সরকারি চাকরি আর রাজনীতিকে কোনোদিনই ভালো চোখে দেখতে পারলাম না। আমার দেওর বিজ্ঞানের অধ্যাপকদের মধ্যেও সবচাইতে কাণ্ডজ্ঞানহীন অধ্যাপক ছিলেন। আমার ছোটজাকে যখন তিনি আমার সেবা করতে আনলেন তখন তারও সময় পূর্ণ হয়েছে। আমার অবস্থা দেখে আতঙ্কে হোক কিম্বা অন্য যে-কোনো কারণে হোক আমার দু-দিনের মধ্যে তারও সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। আমার ও তার সন্তান দুটিকে দুপাশে রেখে সে কয়েকদিন বাঁচিয়ে রাখল।

তারপর ওরা আমার কাছে নিয়ে এল অম্বিকাকে'।

'মা'! মলিনা ব্যাকুল হয়ে এতদিনের গোপনে রাখা কঠোর সত্যটাকে প্রকাশ করতে নিষেধ করার চেষ্টা করলেন।

চম্পাবতী বললেন, 'অত সহজ ব্যাপার নয়, বউমা। জ্ঞান হবার পর এসব শুনলাম, দেখলাম। মনে হল এ ক'দিনেই বাসার সবাই আমার ছোটজায়ের বশংবদ হয়ে গেছে। আমার বোকা আয়াটাই দেখছি শুধু কড়ায় করে আগুন নিয়ে এ ঘর-ও ঘর করছে। এই সময়েই আমার মনে পড়ল—যেন কে বলেছে আমার ছেলে হয়েছে। এটা সত্যি কেউ বলেছিল কিনা আজও আমার সন্দেহ হয় কিন্তু...মনঃস্থির করতে আমার পাঁচ-সাত দিন গেল। তারপর একদিন আমার ছোটজায়ের ঘরে গিয়ে বদ্‌লে আনলাম। মেয়ের বদলে ছেলে। সে তখন ঘুমিয়েছিল। ভেবেছিল এটা হয়তো রসিকতা। চার-পাঁচ দিন হেড়ম্ব আমার কাছে রইল। একদিন এসে সে রাগ করে বলেছিল—সে কি দিদি, ছেলে দাও। না-হয় ছেলেমেয়ে দুই-ই দাও। না আর বলতে ভালো লাগে না'।

একটু থেমে চম্পাবতী আবার বললেন, 'আমার জা আমার চাইতে শিক্ষিতা ছিলেন, আমার তুলনায় ধনী ছিল তার পিতৃকুল। তবু কী রকম একটা কমপ্লেক্স ছিল তার—তার একটা ধারণা জন্মাচ্ছিল বাড়িতে সে যথাযোগ্য মর্যাদা পায় না আমার তুলনায়। জেদ বেড়ে যাচ্ছিল তার। একদিন সকালে ঘুম ভেঙে শুনলাম আমার আয়াটা চেঁচামিচি করছে। আমার জাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেঁদে-কেঁদে অম্বিকার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। এরপরে কোনোদিনই আর আমার জায়ের খোঁজ পাওয়া যায়নি। তখন আমরা গোপালপুরের বাড়িতে। সমুদ্রটাও যেন তখন আরো কাছে ছিল বাড়িটার। খবর পেয়ে সবাই এল, আমরাও গোপালপুর ছাড়লাম। ছেলে আর মেয়ের কে আমার তা আমি ঠাহর করতে পারিনি, আর সে চলে যাবার পর প্রয়োজন ছিল না, ইচ্ছাও হয়নি প্রমাণ খুঁজবার'।

খানিকটা চুপ করে থেকে চম্পাবতী বললেন, 'হ্যাঁ, সই করো এবার। তখন আমরা কেন কী করেছিলাম তা বলা যাবে না আজ। আজকালকার সব ডাক্তারই জানে প্রসূতির অনেকসময়ে সাময়িক গোলযোগও হয় মস্তিষ্কের'।

উইলে সই করে মলিনা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বহুক্ষণস্থায়ী সিনেমা-ছবি দেখার পর বেরিয়ে যেমন চোখে ধোঁয়াটে বোধ হয় সামনের সিঁড়িটাও তেমনি হল মলিনার। বিবর্ণ মখমলের খাপ থেকে হিংস্রধার কৃপাণের মতো লোলদেহগ্রন্থির নির্মোক থেকে ক্ষণেকের জন্য বাইশ বছরের চম্পাবতী তার সন্তানক্ষুধার আদিম বর্বরতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সামনে। সে-লোলুপতা একজনের মৃত্যুর নিমিত্ত হয়েছিল বললে তাকে যেন সীমাবদ্ধ করা হয় মাত্র। কিন্তু কী দরকার ছিল এটাকে এতদিন পরে প্রকাশ করার? উইল সম্বন্ধে মত পরিবর্তনের সমর্থন? শুধু কি তাই?

কয়েক পা যাবার পর সুসির দরজা। চম্পাবতীর উপাখ্যান থেকে পালাবার জন্য মন ব্যগ্র ছিল। সুসির সঙ্গে কথা বলবেন ভেবে দাঁড়াতে গিয়ে মলিনা দেখলেন, আধ-ভেজানো দরজার আড়ালে কিমোনো-পরা সুসি, টেবিলে সদ্য ঢালা এক মগ বিয়ার, ফেনাগুলো গড়িয়ে পড়ছে টেবিলে; তার এক হাতে জ্বলন্ত সিগারেট, অন্য হাতে সে কপাল টিপে ধরেছে।

দরজাটা বন্ধ করে দিলেও হতো, প্রায় কান্নার কাছে গিয়ে ভাবলেন মলিনা : অন্তঃপুরে এই প্রথম প্রবেশ লাভ করল।

কিন্তু পঞ্চাশ বছরের পুরনো কলঙ্ক যেন অন্য সবগুলোকে ছাপিয়ে উঠল।

দুলারহিনদের উপকথা

এই একটা দেশ। সবচাইতে কাছের রেলপথ পঁচিশ ক্রোশ দূর দিয়ে গেছে। বহু-বহু ক্রোশ চললেও কৃষকের দেশ শেষ হয় না। মকাই-জোয়ারের দেশ। বৃত্তের পরিধির মতো পাহাড় এবং শাল-মহুয়ার বন। সেই পাহাড় এবং অরণ্য যদি পায়ে হেঁটে পার হও তবে সভ্যতার প্রান্তগুলি চোখে পড়তে পারে।

সেই দেশে ভুখন কৃষকের জমিতে মজুরের কাজ করে, ভইসা টহলায়।

ভুখন একা নয়, তার সঙ্গে দুলারহিনও থাকে। ভুখন আর দুলারহিন নিজেদের ভাইবোন বলে ভাবতে শিখেছে। ওরা সহোদর নয়। ভুখনের মায়ের মৃত্যুর পরে ভুখনের বাবা সর্বস্বান্ত হয় যাকে ঘরে এনেছিল তারই ও-পক্ষের মেয়ে কিম্বা বেটা-বউ দুলারহিন।

দুলারহিন যখন এই কুঁড়েটিতে প্রথম আসে তখন ভুখনের বয়স ছ' বছর, দুলারহিনের নিজের আট-দশ হবে। দুলারহিন ভুখনের বাবা ও তার সৎমাকে ভুখনের মতোই বাবা-মা বলত। ভুখনেব যখন আট বছর এবং দুলারহিনের বছর বারো প্রায় একদিনেই এই কুঁড়ের বাপ-মা প্রাণী দুটি বিদায় নিল। এখন এমন কেউ নেই যে ওদের সম্বন্ধের জট খুলে দিতে পারে।

ভুখনের বয়স এখন একুশ-বাইশ হল, দুলারহিনের আরো দুবছর বেশি। প্রায় পনেরো বছর গড়িয়ে গেছে ওদের জীবনের। যাদের সম্বন্ধ নিয়ে এত খুঁটিনাটি তাদের জীবনের পনেরোটা বছর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার কী যুক্তি? বিশ্বাস করো, এ-সময়ের মধ্যে কিছু ঘটেনি।

ভুখনের চেহারা নিম্ন প্রকারের :

তামা ও ছাই রঙে মিশানো একটা রঙের ত্বক। স্ফীতপেশী দেহ, মস্ত বড় মুখে ছোট একটা নাক। মাথার চুলগুলি ধুলোয় কাটা, আর সেই খোঁচা-খোঁচা ছোট-ছোট চুলের মাঝখানে প্রকান্ড এক গোছা কড়কড়ে টিকি। পরনে দেড়হাত চওড়া কাপড়ের ফালি কতকটা পালোয়ানি ঢঙে পরা।

দুলারহিনের স্বাস্থ্য ভলো। বয়সের চাপে ত্বক যেন ফেটে যাবে। তার মুখাবয়বেও শাস্ত্রোক্ত সৌন্দর্য আছে বলা যায় না। গত পনেরো বছরের একটিমাত্র ঘটনা—তার বসন্ত হয়েছিল। দাগ রেখে গেছে। তার ফলে ফুটকিতে আচ্ছন্ন তার মুখ বেলেপাথরের বহু পুরাতন প্রতিমূর্তির মতো।

ওদের সংসার মন্দ চলছিল না। সংসারে লোক বাড়বে এমন সম্ভাবনা চোখে পড়ে না। ভুখন বিয়ে করতে পারছে না, অন্তত তিন-কুড়ি টাকা লাগবে যে-কোনোরকম একটা বিয়ে করতে, তার কমে কে মেয়ে ছাড়ে কিম্বা বোন। সদ্ভাবেই দিন যাচ্ছিল।

এমন নয় যে ঝগড়া হয় না, হয়, ইতিমধ্যেই একদিন হয়ে গেল। একই কুঁড়ের মেঝেতে খেজুরপাতার দু'খান চাটাই পেতে শোওয়া। বাপ-মা চলে যাওয়ার পরে ভুখন বহুকাল দুলারহিনের বক্ষলগ্ন হয়ে ঘুমিয়েছে, ইদানীং ছোট জায়গায় শুতে ভুখনের অসুবিধা হতো, অত বড় হাত-পাগুলোকে দুমড়ে ছোট করে সে এখন ঘুমোতে পারে না। কিন্তু একরাত্রিতে সে খুব বেকায়দায় পড়ে গেল। চাল ফুটো করা, বর্ষায় তার অংশের মেঝেটুকু কাদা হয়ে আছে। সে ভাবল দু-একরাত তার মস্ত শরীরটাকে গুটিয়ে কোনো প্রকারে দুলারহিনের পাশেই কাটিয়ে দেবে, কিন্তু আপত্তি তুলল দুলারহিন- নেহিন। —দেখ, দুলারি দুলারি কোরো না। এমন অবস্থা নয় আমার একদিনে চালটা সারিয়ে নেব। দু-একদিনই তো অসুবিধা হবে আমার, সে কিছু নয়।

দুলারহিন ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কুঁড়ের শুকনো জায়গাটায় ভুখনের চাটাই পেতে

দিয়ে ঘরের ঝাঁপ তুলে বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। রাগে ভুখনের ঘাড়ের শিরাগুলি অবধি ফুলে উঠল। লাফিয়ে গিয়ে দুলারহিনের কাঁধ দুটো তার দুই থাবা দিয়ে চেপে ধরল। দুলারহিন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে বলল—ছোড় দে, বহিন কো ছোড় দে। কি আশ্চর্য! বহিন বলেই না ভুখনের এত রাগ—অভিমান। এই বাদলা-রাতে বাইরে থাকা কত কষ্টের তা বোঝে বলেই না এত পীড়াপীড়ি করা। বেটাছেলে বাড়ির মালিক ভুখনের দায়িত্বজ্ঞানকে অপমান করা দুলারহিনের উচিত নয়, অন্য বিষয়ে সে যত ছেলেমানুষি করতে চায় করুক।

—যা ইচ্ছা হয় কর, শুধু কাঁদিস না।

হাল ছেড়ে ভুখন শুয়ে পড়ল।

কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে চলে না বেটাছেলের। কাঁচা কাঁচাই হোক, আহারের সংস্থান না-করেও কাঁচা কাশ কেটে বোঝা-বোঝা মাথায় বয়ে এনে স্তূপাকার করে ফেলল ভুখন কুঁড়ের সামনে। তারপর সারা বিকেল, সারা সন্ধ্যা, অনেক রাত অবধি অস্পষ্ট আলোয় বসে-বসে নতুন করে চাল ছাইল ভুখন।

দুলারহিন একদিন বলল—ঘর ছেয়েছিস, এবার সাদি কর।

—তাহলে তুইও একটা কাস্তে নিয়ে চল।

—কাস্তে দিয়ে আবার কী হবে?

—কেন দু'জনে মেলা-মেলা ঘাস কাটব।

—ঘাস কাটবি কেন? আমি তো তোকে সাদি কবতে বললাম।

—আমি ভাবলাম ও-দুটো একই কাজ।

কিন্তু সহজে ভুলবার মেয়ে নয় দুলারহিন। যখন-তখন একই কথা বলতে লাগল। অবশেষে একদিন বলল—পৃথিবীতে চাঁদ আর সুরজ ছাড়া আর কে আছে তাদের? বাপ-মা কোথায় গেল আর খুঁজে পাওযা যাবে না। এই বেলায় ভুখন যদি বিয়ে করে, কম দামে মেয়ে পাবে, বুড়ো হলে বুড়ি ছাড়া আর যা পাবে তার জন্য চড়া দাম দিতে হবে না? আর সব কথার উপরে বড় কথা : একজনের মৃত্যুর পবে একজনের কী উপায় হবে যদি ইতিমধ্যে তৃতীয় একজন এসে আপন না হয়ে যায়?

মুখ গম্ভীর কবে বুড়োদের মতো চিন্তাক্লিষ্ট মুখ করে ভুখন শুনল সব যুক্তি তারপরে বলল—টাকা যদি যোগাড় হয় সাদি করব, কিন্তু বউ যদি তোর সঙ্গে মারামারি করে তবে আমি দুজনকেই পিটব।

টাকা জমানোর চেষ্টায় মানুষ কী-না করে? এমনকী হঠাৎ মানুষ নিজের একটা বিশেষ গুণও আবিষ্কার করতে পারে। এইরকমভাবে ভুখন কাঠের পুতুল গড়ায় মন দিল।

ওস্তাদের বাড়িটা ছিল ভুখনের ঘরের কাছেই। ভুখন মাঝে মাঝে শীতকালে আগুনের কাছে বসতে তার বাড়িতে যেত। বসে-বসে দেখতে-দেখতে ভুখন একটা পুতুল একদিন বানিয়ে ফেলেছিল। কাঠের এক চিড়িয়া। টাকা জমানোর কথায় ভুখনের মনে হল পুতুল তৈরির কথা। মাথা ঝাঁকিয়ে সে মনস্থির করে ফেলল। ওস্তাদ যেসব বড়-বড় পুতুল তৈরি করে সেই সব চিড়িয়া, জানোয়ার আদমি-জনানা সে ছোট-ছোট করে তৈরি করবে। বিক্রির ভার ওস্তাদের।

—আর শোন, দুলারহিন এ-পয়সা দিয়ে খাওয়া চলবে না। খাওয়ার জন্য সকাল-সাঁঝ খেতির কাজে যা হয় তাই।

পুতুল বিক্রির খুচরো পয়সাগুলি রোজ সন্ধ্যায় গুনতে বসে দু'জনে। একদিন থাক-থাক করে সাজিয়ে রেখে ভুখন এমন চিৎকার করে উঠল যে দুলারহিন ভয়ে বাঁচে না। ছুটে কাছে এসে ভুখন বলল—ষোড়বৌ কুড়িসে চার কম, ত্রিপ চার।

ওদের জীবন ঠিক এইরকম সময়ে একটা মোড় নিল। সন্ধ্যায় বসে কথা হচ্ছিল। ভুখন বলল—যব্ তক্ শশুরা লোহার বাক্স একটা না-দেবে, ততক্ষণ কোনো শশুরা-কে-পুতই খিচুড়ি খাবে না। অর্থাৎ বিবাহ-ব্যাপারটা সমাধা হতে সে দেবে না।

অযুক্তির কথা নয়, ভাবলে দুলারহিন, হয়তো সেই রূপকথার কনোয়ারের মতো ভুখনের ভাগ্য নয়, হয়তো কোনো মেয়ের বাপ মেয়ে আর টাকা নিয়ে সাধাসাধি করবে না, যেমন সেই রূপকথার নায়কের বেলায় ঘটেছিল তাহলেও ভুখনের পক্ষে একটা লোহার রঙদার বাক্স চাওয়া অন্যায় নয়। তবু বিয়ের ব্যাপারে একটু হাসি-ঠাট্টা করতে হয়, দুলারহিন বলল—তুই তো ভেরুয়া হয়ে যাবি, টাকা দিয়ে বউ আনবি আর ফির, হুঁ-হুঁ, সে দেখা যাবে। তারই খিদ্‌মৎ করবি।

সেই রাত্রিতেই কিম্বা তার দু'এক দিন বাদে জ্বর হল দুলারহিনের। অল্প-অল্প জ্বর প্রথমে, সেই জ্বর দিন-কে-দিন বাড়তে লাগল। একদিন সারারাত দুলারহিন বেহুঁশ। সেদিন সকালে ওস্তাদের কাছে ভুখন শুনে এসেছে তাদের গ্রাম থেকে চার-পাঁচখানা গ্রাম পার হয়ে গেলে যে বড়গ্রাম সেখানে এক ওস্তাদ-ডাংদার আছে সে নাকি সব জ্বর ভালো করতে পারে। তার মনে হল কী অন্যায়ই সে করেছে এতদিনেও ডাংদার না-এনে। ডাংদার কথাটাই সে জানত না, নিজেকে প্রবোধ দেবার মতো এ-যুক্তিও তার মনে এল না। দুলারহিনের পায়ের কাছে বসে কাঁদতে-কাঁদতে তার বারবার মনে হতে লাগল। বিশঠো রূপয়া যার ঘরে তার দুলারহিন নাকি এমনি করে মরে।

ভোর-ভোর রাতে ভুখন উঠে দাঁড়াল, দুলারহিনের অজ্ঞান দেহের দিকে হাত বাড়িয়ে সে বলল—দ্যাখ, দুলারি দুলারি করিস না। ডাংদার আনতে চলল তোর ভুখনোয়া ; যদি ফাঁকি দিয়ে মরে যাস ...

চোখের জল মুছতে-মুছতে ডাংদারের গ্রামের দিকে ছুটতে লাগল ভুখন।

ডাংদার এসেছিল। বিশঠো রূপয়া তো গেছেই, আর বিশঠো তার কাছে ধার হয়েছে। সে ধাব আবার বছরে পান্ রূপয়া করে বাড়বে ; অর্থাৎ ভুখন সেই পুরনো জালে জড়িয়ে পড়ল। তা হোক দুলারহিন তো বেঁচে আছে।

আগের মতোই সংসার চলতে শুরু করল। মাঝের কয়েকটা দিন যেন স্বপ্ন। একটা নতুন আশার উত্তুঙ্গতা থেকে আছড়ে পড়ার ব্যাপারটাই যেন কতকটা।

কিন্তু অদ্ভুত মেয়ে দুলারহিন। কয়েকদিন যেতে-না-যেতেই আবার একদিন সে বলল—তুই তো আর পুতুল বানাস না?

—কী হবে?

—সাদি করবি না?

—ডাংদারের সঙ্গে সাদি করলাম যে।

দুলারহিন লজ্জিত হয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

আবার চেষ্টা করার কথা ভাবতে গিয়ে ভুখনের যে অনুভবটা হল সেটা এই : ছমাসের যত্নে যে বিশ টাকা জমে সেটা বিশ টাকা নয়, ছ'মাসের ঘর্মাক্ত শ্রমও বটে।

আর সেই ঘর্মাক্ত শ্রমকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কোনো বুদ্ধিমানই করে না। তার উপর এল সেই ডাংদার যাকে রোগী দেখতে আনতে গিয়ে ভুখনকে পায়ে লুটিয়ে পড়ে সাধ্য সাধনা করতে হয়েছিল। সে এল না-ডাকতে।

—ভুখন আছো, ভুখন?

—হ্যাঁ, সব ভালো আছি আমরা, দুলারহিন তো দিন-কে দিন মোটা হচ্ছে। একটি নিটোল হাসি ফুটল ভুখনের মুখে।

—বেশ, তাহলে সুদের টাকা ক'টা দাও। কোথায় পাবে? সে কি আমি বলে দেব? টাকা যতক্ষণ না-

দিচ্ছ আমি নড়ছি না। শহর চেনো, শহর? সেখানে থাকে পুলিস, তাদের ডেকে পাঠাব। ঘরে দু'চার পয়সা যা ছিল এনে দিল ভুখন। সব শুনে দুলারহিন চুপ করে রইল।

ছ'মাস পরে আবার ডাংদার এল। আড়াই টাকা পাওনা হয়েছে, দিতে হবে।

—আড়াই পয়সা নেই।

—দ্যাখো, ভুখন, ধার বাড়িয়ো না। বাড়তে-বাড়তে ধার এমন হয় যে, কোনোদিনই ও আর শোধ করা যায় না। বেশ, আড়াই টাকা যখন দেবে তখন আমার বিশ টাকা দিয়ে দাও, আর তার সঙ্গে ওই আড়াই টাকা।

—কী হবে যদি আমি না দি?

—যদি তুমি না দাও? (ডাংদার কথাটা উচ্চারণ করল যেন আর-একবার কানে শুনে অর্থটা পরিষ্কার করার জন্য) বেশ যদি তুমি না-দাও, ভগবান আছে মাথার উপরে। টাকা দেবে বলেই, ওষুধের দাম তো, তোমার দুলারহিনকে ভালো করেছে ভগবান! টাকা যদি না-দাও তাহলে...

—হেই ডাক্তার, খারাপ বোলো না। টাকা আমি দেব, তুমি কিছু বোলো না।

ঝাঁপের আড়াল থেকে সব শুনছিল দুলারহিন।

ভুখন ঘরে ঢুকতেই সে বলল—ডাংদারকে তুই আর টাকা দিবি না।

—টাকা দেব না তো তোর যদি আবার অসুখ হয়?

—টাকা তুই খরচা করতে পারবি না।

—টাকা আমার, যা ইচ্ছা আমি করব।

—কেন কববি? আমি তোর কে? তোর আপনার বহিন যে আমার জন্য টাকা বরবাদ করবি?

—কী বললি?

—না, একশোবার না। তোর সৎমায়ের বেটা-বউ আমি।

—আমার কেউ না?

—না, না।

ভুখন কথা বলল না, ঘর ছেড়ে চলে গেল।

কিন্তু ঝগড়া করার জন্য হলেও মুখোমুখি হতে হল তাদের। অবশেষে পুরুষালি প্রীতির চোখ-রাঙানির কাছে দুলারহিনের মেয়েলি-স্নেহ হার মেনে স্বীকার করল, আর সে নিজের অসুখের কথা বলবে না, আর কখনও আত্মীয়তা অস্বীকার করবে না, তবে সে রাত্রিতে ভুখন রোটি খেল।

খুব ভালো জোড়া লাগলেও কখনও কখনও একটা অস্পষ্ট দাগ থেকে যায়—দুলারহিনের কথাটাও সেই দাগ।

দুলারহিনের স্নেহ বাইরে হার মেনে গভীর হওয়ার অবকাশ পেয়েছে। সেই গভীর স্নেহ তার মাথায় বুদ্ধি এনে দিল। সে স্থির করল নিজে আগে সাদি করে সেই টাকা দিয়ে ভুখনের সাদি দেবে। নিজে সাদি করে টাকা পাওয়া সহজ নয় যদি এপক্ষ থেকে কোনো জোয়ান বেটাছেলে দাম না-চড়ায়। এদিকে ভুখনের বুদ্ধি যদি না-খেলে দুলারহিন নিজেই তাকে বুদ্ধি দেবে। অবশ্য কোনো জোয়ান বর হবে না তার, মুখে যে-রকম দাগ ; আর তাদের কেউ রাজি হলেও গরজ দেখাবে না টাকা দিয়ে। কয়েকদিন নিজের মনে কথাটা তোলপাড় করে একদিন দুলারহিন সেটাকে প্রকাশ করল।

ভুখন শুনে হো-হো করে হেসে উঠল—তোর সাদির ইচ্ছা তাই বল।

—না হয় তাই হল। তুই তাহলে আগে আমার ইচ্ছা মিটিয়ে দে। ডাংদারের টাকা, তুই সেই টাকা শোধ কর। তারপরও যে-টাকা থাকবে সেগুলো গেঁথে আমারই না-হয় হার বানিয়ে দিস।

দিন যেমন যায় তেমনি যায়। ভুখনের চাড় নেই। তার উপরে নতুন একটা উপসর্গ জুটেছে। পয়সা পেলেই দুলারহিনের জমাতে ইচ্ছা করে, আর ভুখনের খরচ করতে। এরই মধ্যে একদিন ওস্তাদকে দিয়ে

[illegible]।

এই একটি বেলা, সব চাইতে কাছের [illegible]
[illegible]

[illegible]

কোন প্রশ্ন নেই।

বরং ওদের আকৃতির বর্ণনা দিচ্ছি।

[illegible]

একজোড়া কাপড় আনিয়ে নিয়েছে ভুখন। শুধু কি তাই, নিজের খানা ছুপিয়েছে হলুদ রঙে আর দুলারিহনের খানা পাতলা লালে। সারাদিন যে খেতির কাজ ক'রে মাঝরাত অবধি বসে-বসে কেরোসিনের কুপির আলোয় পুতুল খোঁদাই করে তার শখকে কিছু বলা যায় না। দুলারহিনকে তাই চুপ করে থাকতে হয়।

কিন্তু চুপ করে কতই থাকা যায়।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ভুখন ঘরে ঢুকে বলল—দেখি, এদিকে আয় তো, আরো কাছে আয়।

দুলারহিন ভেবে অন্ত পায় না। হাত জোড় করে সে, প্রায় যেন আড়ষ্ট হয়ে যায়।

ভুখনই এগিয়ে এল।

—আরো ছাড়-ছাড়। হাত জোড় ক'রে মিনতি করতে লাগল দুলার্‌হিন, ততক্ষণে কাঁসার মলজোড়া দুলারহিনের পায়ে পরিয়ে দিয়েছে ভুখন।

—এ তুই করলি কেন?

—হামার হিচ্ছা।

প্রতিদান না-দিয়ে কী করে থাকা যায় বলো। একদিন সকালে দুলারহিন একটা অচিন্ত্যনীয় কাজ করে ফেলল। লাল শাড়িখানা পরে পায়ে কাঁসার মল দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরুল সে ভুখন যখন ভইসা টহলাতে গেছে। আর ফিরবে না দুলারহিন, যতদিন না টাকা আনতে পারে সে। যেখানে যত স্বজাতীয় আছে ডেকে সকলকে জিজ্ঞাসা করবে, তারা কেউ বিয়ে করতে চায় কিনা তাকে। যদি কেউ বলে : বিয়ে করব, অমনি সে বলবে : কত টাকা দেবে? যদি বলে পঁচিশ, অমনি সে বলবে : আমার ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলো, অত কমে হবে না।

নিজের গ্রাম ছাড়তে-ছাড়তে সূর্য প্রখর হয়ে উঠেছিল, তবু দুলারহিন তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলেছে ; এখনও ভিনগ্রামের স্বজাতীয়দের সঙ্গে দেখা হয়নি। সাহস খানিকটা যেন ইতিমধ্যে কমে এসেছে। নাগাদ দুপুর ভিনগ্রামের স্বজাতীয় বস্তিতে পৌঁছাল সে। এইবার তাকে বিক্রি শুরু করতে হবে। প্রথম দেখা হল একজন বিবাহিত মেয়ের সঙ্গে, জল তুলছিল সে চাকা ঘুরিয়ে। দুলারহিন কুয়োর পাশে গিয়ে আঁজলা পেতে দাঁড়াতেই সে জল খেতে দিল। তারপরে প্রশ্ন করল কোন জাত কোথায় ঘর। দুলারহিন পরিচয় দিল।

—একা-একা কোথায় যাচ্ছ?

দুলারহিন এদিক-ওদিক চেয়ে নিচু গলায় নিজের উদ্দেশ্য বলে বলল—সাহায্য করতে পারো বহিন?

বউটি হেসে বাঁচে না। একা-একা কত-আর হাসা যায়, একসময়ে থামতে হল তাকে। তখন সে বলল—তুমি খুব বোকা বহিন, আমি হলে ঘরের বাইরে যেতাম না ; দুজনেরই সাদি দরকার, কী কবতাম বলো তো?

দুলারহিন উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াল ভালো ফিকিরটা শোনার জন্যে, বউটি হেসে-হেসে চোখ ছোট-বড় করে বলল।

দুলারহিন কাঁদো-কাঁদো মুখে তার দিকে একবার চেয়ে হাঁটতে শুরু করল। মনে-মনে সে স্থির করল কোনো মেয়ের কাছে সে নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করবে না। ছিঃ-ছিঃ। মেয়েছেলের জিবে হুল আছে।

গ্রাম ছাড়তে দুপুর শেষ হল। শরীরের সঙ্গে মনও ক্লান্ত হয়েছে। ক্লান্ত মনে সে ভাবল : এত-যে সে করছে, সব কি মিছে নয়? ভুখন তো একবারও জোর করে বলেনি সে সাদি করতে চায়। কিন্তু আর-একখানা গ্রাম এসে পড়ছে সামনে, এমন সময়ে আবার সাহস ফিরে এল। না-হয় না বলেছে সে, তাই বলে কি তার ইচ্ছা পূরণ করতে হবে না? আর না-বলার কথা বলছ? বলে-না ব'লেই তার সাধ মেটাতে আরো সাধ যায়।

সামনের বড়-বড় কাশের ঝোপে ভরা মাঠখানি পার হলে আর-একখানি ভিনগ্রাম। আলো মুছে যাওয়ার আগেই এই গ্রামে পৌঁছে একটা নিষ্পত্তি করতে হবে। এখনই আলোর রং প্রায় বাদামি হয়ে উঠেছে। এই ভাবতে-ভাবতে জোরে-জোরে কয়েক পা যেতে-না-যেতেই পিছন থেকে কে বলল—কে যায়? দুলারহিন ফিরে দাঁড়াল।

—কোথায় যাচ্ছ একা?

লোকটি এগিয়ে এসে কাছে দাঁড়াল।

—বাড়ি থেকে রাগ করে এসেছ নাকি, বাপ-ভাই বিয়ে দেয় না বলে?

—না, নিজেই আমি বিয়ে করতে বেরিয়েছি।

—সাবাস। আমার সঙ্গে করবে?

—আমি টাকা চাই, অন্তত চার কুড়ি তো বটেই : ভাইকে টাকা দেব আমি।

—চার কুড়ি? বেশ তাই হবে। আমার সঙ্গে বিয়ের পরেও ভাইকে টাকা দিতে ইচ্ছা হয়, দেখা যাবে।

—না, টাকাটাই আগে দিতে হবে।

—ও, খুব দাম বাড়াতে পারো যা হোক। আগে দেখি কত দাম হতে পারে। এই বলে দুলারহিনের আঁচলের একপ্রান্ত চেপে ধরল লোকটি।

কিছুক্ষণ থেকেই দুলারহিনের মাথায় একটা কষ্ট হচ্ছিল। একটা গোটা দিনের রোদ গেছে মাথার উপর দিয়ে। তবু জেদ করে লোকটির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার চোখের পিছনে ক্লান্ত মস্তিষ্কের যে ধোঁয়াটে ছাপটা পড়েছিল তার চাহনিতে সেটাই বিবশ তন্ময়তায় মিথ্যারূপ নিয়েছিল। বোধ হয়, সেটাই লোকটির এত আকর্ষণ। কিন্তু কাঁধের কাছে আঁচলটায় টান পড়তেই দুলারহিনের পা দু'খানাও বিবশ হল। সে লোকটির গায়ের উপরে পড়ে গেল, আর সেখান থেকে মাটিতে। তখন তার কষ বেয়ে ফেনাও গড়াতে লাগল।

যখন ঘুম ভাঙল দুলারহিনের, সম্বিত ফেরার সময়ে তাই মনে হল তার, তখন মাঝরাত। চারিদিকে ভয়ংকর অন্ধকার। লোকটির কথা মনে পড়তেই সে শিউরে উঠে সরে বসল। কিন্তু লোকজন দূরের কথা, ধারে-কাছে বোধ হয় পোকামাকড়ও নেই, নতুবা ঝিঁঝিঁটা অন্তত ডাকত। আর বহুদূর থেকে কীসের একটা অদ্ভুত অর্থহীন শব্দহীন শব্দ আসছে। ভয়ে দুলারহিনের নিঃশ্বাস বড়-বড় হয়ে পড়তে-পড়তে সেটা অবশেষে চাপা কান্নায় পরিণত হল। কাঁদতে-কাঁদতে মনে হল যেদিন বাপ-মা চলে যায় সেদিনও এমনি কেঁদেছিল সে, কিন্তু তখন শক্ত পৃথিবীর বদলে বুকের কাছে যে-দৃঢ়তা অনুভব করেছিল সেটা প্রায়-শিশু ভুখনের ধূলিমলিন মুখখানা। নিঃশেষে শূন্য বুকে বোধ হয় বেশিক্ষণ কাঁদাও যায় না। সেই ভুখনের মঙ্গলের জন্যই আজ সে পথে বেরিয়েছে।

চাঁদ উঠল। সেই আলোতে অশ্রুভারাক্রান্ত চোখ মেলে দুলারহিন দেখল সে কাশবনের মধ্যেই পড়ে আছে। লম্বা-লম্বা ছায়া সজীব হয়ে দুলছে চারিদিকে। রাত্রির শব্দহীন ভাষা এবার প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল। খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে উঠল যেন।

হুরার?

কিন্তু দুলারহিন ভয় পাবে না। ঠোঁট ফুলে-ফুলে উঠছে তবু চোখের জল মুছে সে সোজাসুজি দেখতে চেষ্টা করল। যদি হুরারই হয় হোক। বাধা দেবে না, পালাবে না, সর্বাঙ্গ আঁচল দিয়ে ঢেকে গলাটা বাড়িয়ে দেবে। হুরারদের তো আঁচলের ওপরে লোভ নেই। যদি খুবলে-খুবলে খায়ও ততক্ষণ দেহের দুর্গতি দেখার জন্য প্রাণ থাকবে না। গলাটা সব প্রাণীরই সবচাইতে দুর্বল অংশ শরীরের। হঠাৎ ভুখনোয়ার কথাটা যেন মনে পড়ছে। আর-একবার তার সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভালো হতো। আর রান্না করে রেখে আসেনি সে। খেতির কাজ করে ফিরলে বড় ক্ষুধা পায় বেটাছেলেদের। তখন মুখের সামনে খাবার না-পেলে রাগই হয় পুরুষদের। কিন্তু তারপর সে হয়তো দুলারহিনকে খুঁজতে এ-পথেই আসবে। হয়তো

এখনও খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। আর যেমন লোক, হয়তো সঙ্গে একটা লাঠি পর্যন্ত আনেনি। আর দ্যাখো তেমনি ভয় এদিকে হুরারের। এই দুশমনের ব্যূহে নিরস্ত্র ভুখন। চোখের জলে মজ্জিত হয়ে আবার সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হা ভগবান! হা ভগবান! সে নিজেই তো ভুখনের মৃত্যুর কারণ।

ভুখন ঘরে ফিরে প্রথমে ভাবল দুলারহিন অবেলায় জল আনতে গিয়েছে। রাগ হতে লাগল তার প্রতীক্ষার সময় যত দীর্ঘ হল। সন্ধ্যা যখন গড়িয়ে গেল তখন সে কুঁড়ের ভিতরে দুমদুম করে পা ফেলে বেড়াতে লাগল।

রাত যখন প্রথম প্রহর, তখন সে ভাবল : ঠিক তাই হয়েছে, ও গিয়েছে নিজের সাদি ঠিক করতে। কেন বাপু, আমি কি বলেছিলাম ডাংদারের টাকা আমি শোধ করতে পারব না। তুমি শোধ করো সাদি করে? না-খেয়ে আছি তা যদি দেখতে না-এলে, তবে তোমার টাকা নিয়ে এসো, দেখব মাথা কোথায় রাখো।

কিছুক্ষণ পরে নিজের মাদুরখানা ঝেড়ে-ঝুড়ে ঠিক করে নিয়ে শুতে গিয়ে সে ভাবল : আসলে ওসব কিছুই নয়। তোমার নিজেরই সাদি করার ইচ্ছা, একা-একা ভালো লাগছিল না আর। আমি তোমাকে কখনও বলেছি দুলারহিন, আমি বউ চাই। মনে হবে না কেন, সব পুরুষের মনেই হয়। তাকে জলের ধারে দেখে আমিও এগিয়ে জলের ধারে দাঁড়িয়েছিলাম। সে-ও হেসে, রাগ করে কথা বলেছিল। কিন্তু আমি তো জানি বাপ-ভাইয়ে মিলে তার ছ'জন আছে, দু'কুড়ি টাকার কমে তারা রাজি হবে না। আমি হাতজোড় করে বলেছিলাম—মাপ্ কিজিয়ে। কিন্তু তার কথা তোমাকে বলেছি? বেশ তো, গিয়েছ, তোমার ভালো হোক। প্রায় মাঝরাতে অনিদ্রিত ভুখন ঝিঁঝির ডাক শুনতে-শুনতে চমকে উঠল। সেই নীরব রাত্রির রহস্যময়ী ভাষা। চকিতে সে উঠে দাঁড়াল। দুলারহিন যদি অন্ধকারে আশ্রয় না-পেয়ে থাকে।

আর-কিছু ভাববার সময় পেল না ভুখন। দরজার ঝাঁপ ভেঙে কোনোক্রমে রাস্তায় পড়ে অন্ধকারে ছুটতে লাগল সে, দু-লা-র-হি-ন ...

দুজনের দেখা হল সংযোগ হারানোর দ্বিতীয় দিনের দুপুরবেলায়। দুলারহিন তখন ক্লান্তদেহে তার চাইতেও ক্লান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরবার পথ ধরেছে। চোখমুখ বসে গেছে, তামাটে চুলগুলি উড়ছে বাতাসে।

দুলারহিন বললে, 'তুই এলি কেন আবার, আমিই তো ঘরে যাচ্ছিলাম'।

ভুখনের মুখে দু'হাজার দাঁত হো-হো করে হেসে উঠল, 'এলাম এমনি'।

সামনে একটা খাল, নদীর মতো তাতে স্রোত : সেটাকে পাশে করে কিছু দূর গেলে একটা গ্রাম। যখন ধুলো উড়ছে না তখন সেখানে একটা গোয়ালের দোকান চোখে পড়ছে। ওখানে যা হোক কিছু খাবার পাওয়া যেতে পারে।

ভুখন বলল, 'তুই স্নান করে নে, চেহারা খুব খারাপ দেখাচ্ছে'। দুলারহিনেরও খুব ইচ্ছা হয়েছিল কিন্তু ইতস্তত করতে হল তাকে।

ভুখন বলল, এক ক্রোশের মধ্যে কোনো লোক নেই।

তীরে শাড়ি রেখে তখন দুলারহিন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানকৌড়ির মতো।

'বাস্, আর গেলে ডুবে যাবি'।

ডুবে যাওয়ার ভঙ্গিতেই তবু আর-একটু সাঁতার কেটে, ভুখনকে ভয় দেখিয়ে তারপর দুলারহিন উঠল। তীরে দাঁড়িয়ে দু'হাত জড়ো করে চুলের জল ঝেড়ে ফেলতে-ফেলতে সে ভুখনকে স্নান করতে পাঠাল। স্নান শেষে তীরে উঠে পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে দুলারহিন বলল, 'যদি ডুবে যেতাম'।

'আমিও ডুবে মরতাম'।

দুলারহিন হাত বাড়িয়ে ভুখনের একখানা হাত জড়িয়ে ধরে হাঁটতে লাগল। গাঁয়ের দোকানে তারা

ভইসা দহি পেল আর মকাইয়ের খই।

একটি গাছতলায় বসে যত না খাওয়া তার চাইতে বেশি কোলাহল করে তারা আহারপর্ব সমাধা করল। গাছতলায় হাত-পা ছড়িয়ে বসে ভুখন প্রশ্ন করল, 'দুলারি, আর কখনও আমাকে ছেড়ে যাবি না, বল'।

'না'।

রোদের ঝাঁঝ কমে এল। ঝিরঝিরে হাওয়ায় পথ চলতে শুরু করল তারা। এত হালকা মন তারা বহুদিন অনুভব করেনি। ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই যেন শখ করে দু'জনে বেড়াতে বেরিয়েছে। কয়েক পা গিয়ে ভুখন বলল, 'দুলারি, এখন যদি কোনো মহুয়াইয়ের দোকান পেতাম...

'তুই তো নেশা করিস না, তবে ও-কথা বলছিস কেন'?

'কিছুতেই যেন ঠিক ফুর্তিটা হচ্ছে না'।

নিজেদের গ্রামে পৌঁছনোর আগে সন্ধ্যার আগেকার বাদামি আলোয় কাশের বড়-বড় ঝোপে-ভরা মাঠটিতে তারা এসে পৌঁছল। দিনের বেলায় ভইসা থাকে, ভইসা নিয়ে রাখালরা এখন ফিবে গেছে। ছোটবেলায় যখন দুলারহিন ভইসা তাড়ানো ছাড়া আর-কোনো কাজ পারত না, তখন এখানে একটা ভারি মজার ব্যাপার হতো। ভুখন যখন ডাকত তাকে, সে লুকিয়ে বেড়াত এক ঝোপের আড়াল থেকে অন্য ঝোপের আড়ালে। আর মাঝে মাঝেই 'কুই' করে সাড়া দিত।

মাঠটা পার হতে-হতে ঝিকমিকিয়ে হেসে দুলারহিন বলল, 'আমি যদি এখানে লুকিয়ে থাকি খুঁজে বার করতে পারিস'?

'না, পারি না। এখনও তেমনি ছোট আছি, হোঁচট খাব'।

দুলারহিন কয়েক পা আগে চলছিল, হঠাৎ ধাঁ করে সে লুকিযে পড়ল। ভুখন মনে-মনে হাসল, ছোটবেলায় খেলতাম, এই মনে করলেই কি আর তেমন খেলা হয়। এখন সে হাত বাড়ালেই ঝোপের এপার থেকে ওপারের ঘাস সরিয়ে দুলারহিনকে দেখতে পাবে। কিন্তু দুলারহিন ভারি সুন্দর লুকাতে পাবে। আর তার পায়ের গোড়ালি যেন ধনুকের ছিলায় তৈবি। একটি ঝোপের আড়ালে তার সাড়া পেয়ে তার কাছে গিয়ে দেখল ভুখন, সে ততক্ষণে অন্য আর-একটির কাছে সরে গেছে। তার শাড়ির একটুখানি দেখা যাচ্ছে। সেখানে যেতে দুলারহিন উধাও। দু-তিন বারের চেষ্টায় একবার ভুখন দুলারহিনকে ছুঁতে পারল।

'নে এবার চল'।

ভুখন ভেবেছিল খেলা শেষ হয়েছে, কিন্তু দুলারহিন আবার অদৃশ্য হয়ে গেল হাসতে-হাসতে। খেলাটা বাল্যের মতো দুর্দম হয়ে উঠেছিল। ইতিমধ্যে একবার দুলারহিনকে সে দু'হাতে চেপে ধরেছিল বুকের উপরে, কিন্তু হাতের ফাঁক গলিয়ে দুলারহিন আবার লুকিয়ে পড়ল। খেলার উত্তেজনায় ভুখনও ছুটতে শুরু করল। কী একরকম ঘাস পায়ের তলায় দ'লে দ'লে যাচ্ছে, একটা সুঘ্রাণ উঠছে। কী একটা উত্তাপ বিচ্ছুরিত হচ্ছে সেই শুকনো খটখটে ঘাসের বাদামি আলোর পৃথিবী থেকে। এইমাত্র ভুখন ছোটবেলার পাকড়ানোর কায়দায় পাকড়ে ধরেছিল দুলারহিনকে। কিন্তু এবারও রাখতে পারল না। দুলারহিন হাত ছাড়িয়ে হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে দৌড়ে পালাল, তারপরে হাসতে-হাসতে ছুটতে-ছুটতে ক্লান্ত হয়ে আতপ্ত ঘাসের উপরে শুয়ে পড়ল। দুলারহিন ছোটবেলাকার ভঙ্গিতে শুয়ে আছে—যেমন করে ছোটবেলায় বলত : আমি মরে গেছি। উরু দুটি প্রসারিত, অর্ধনিমীলিত দৃষ্টি, ঈষৎ মুক্ত ঠোঁট দুটি, বুক কাঁপছে থরথর করে।

কিন্তু দুলারহিন ধড়ফড় করে উঠে বসল। বল নিয়ে লুফতে-লুফতে যদি হঠাৎ সেটা কুয়োয় পড়ে যায় তাহলে সেই কুয়োর চারিদিকে ঘুরে-ঘুরে কুয়োর অন্ধকার মনে নিয়ে যেমন ফিরে যায় খেলুড়েরা, তেমনি মন নিয়ে ফিরে চলল ভুখন আর দুলারহিন।

দুলারহিন একবার বলল, 'ভুখন পিছিয়ে পড়ছিস'। কিন্তু সেটা যেন ভাষা নয় ভাষার খোলস শুধু। ভুখন মুখ নিচু করে থাকে, কথা বলে না। দুলারহিন ভাবে, কখনও কপালে হাত রেখে।

একদিন খুব সাহস করে দুলারহিন ভাবল : ভগবানের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলবে ভুখনোয়ার কোনো

দোষ নেই, বয়সে সে-ই বড়। আর এই কথা বলে যদি ভুখনকে মুখ দেখাতে না-পারে, মরবে সে। মরা যত সহজ, বলা তত নয়। ভগবানকে যদি বলা যায়, মানুষকে নয়।

দুলারহিন রান্না করতে-করতে ভুখনের পিঠের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাবে, আহা, সংকোচে যেন ভেঙে পড়েছে। সে ভাবে : তোর জন্য আমি কী-না করেছি। ছোটবেলায় একবার আগুনের মধ্যে গুলি ফেলে দিয়ে তুই কেঁদে উঠেছিলি ; আর তোর সেই গুলি খুঁজে দিতে হাত দিয়ে জ্বলন্ত আঙরা সরিয়েছিলাম, দাগটা ছিল কিছুদিন। তাও কি তোর মনে নেই।

একসময়ে দুলারহিনের চিন্তার পথ কিছু বদলাল। চিন্তায় সাহস আগে ছিল না, এমন নয়। কিন্তু স্নেহের করুণরসে মজ্জিত হয়ে সে-সাহসও হয়ে উঠত করুণ। সমস্যাগুলোকে একদিন জীর্ণ বাসের মতো তুচ্ছ মনে হল। নিজেকে অসীম ক্ষমতার উৎস বলে অনুভব করল সে। সাহসে এত প্রাণ, এত পূর্ণতা এ কে জানত? এতদিন পথে-পথে ঘুরে আজ তবে পথ দেখা গেল। আবার সেই স্নেহগুলো ফিরে আসতে লাগল। অনাস্বাদিত এক আস্বাদে বর্ণাঢ্য হয়ে-হয়ে। দুঃসাহসী হওয়ার জন্য নিজের ভিতরে প্রেরণা এল তার।

সন্ধ্যার পর ভুখন ফিরে এল তেমনি গম্ভীর মুখে। পায়ের শব্দে দুলারহিনের স্নায়ুগুলি রিনরিন করে উঠল। নাগরদোলায় কযেক পাক ঘুবে হঠাৎ মাটিতে দাঁড়াতে গেলে যেমন পরিচিত পৃথিবী অপরিচিতের মতো টলমল করতে থাকে তেমনি হল দুলারহিনের।

দুলারহিন ভুখনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, 'ভুখনোয়া'।

ভুখন অবাক হয়ে গেল। রুক্ষ চুলগুলি ভিজে-ভিজে পাট-পাট করা, বোধহয় তেলজাতীয় কিছু দিযে বাঁধা। পরনে লাল সেই শাড়ি। কপালে কালির টিপ। আব চোখ! সে-চোখ কোনোদিনই দেখেনি ভুখন। অনুচ্চারিত হাসিব মতো তেমনি আভাযুক্ত কিছু দুলারহিনের সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল মুখের বসন্তেব দাগগুলিকে অস্পষ্ট কবে। ভুখনেব মনে হল প্রবল একটা আক্ষেপ বোধ হয় আসছে তার সারা দেহে। ভুখন নিরুদ্ধ গলায় মৃদু গর্জন করে উঠল।

দুলারহিন একটা হাত রাখল ভুখনের কাঁধে।

ভুখন দু'হাতের সবটুকু জোর দিয়ে দুলারহিনের হাতখানা ছুঁড়ে ফেলে দিল। যা কোনোদিন সে কল্পনাও কবেনি তেমনি করে দুলারহিনের আধখোলা ঠোঁটের উপরে প্রচণ্ড একটা চড় মারল সে। আঘাত একটা দেয়ার জনাই মন যেন উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। একটা কিছুর প্রাবল্য দরকার এই সে অনুভব করেছে এ কয়েকটি দিনের প্রতিটি ক্ষণ।

কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হল—আহা এ কী করল সে। দুলারহিন, বহিন। পৃথিবীতে কে আছে তার দুলারহিন ছাড়া। আর যে দুলারহিন নাকি তার মুখ চেয়ে তারই আশ্রয়ে থাকে, এত কোমলা, এত দয়াবতী। ছোটবেলায় দুজনের একজনকে বাবা মারলে অন্যজন তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠত, তেমনি হল।

ভুখন কেঁদে-কেঁদে-কেঁদে হেঁচকি তোলার মতো করে বলল, 'আর কখনও তোকে মারব না। এই প্রথম, এই শেষ। দুলারহিন দুলারহিন, বহিন'।

দুলাবহিন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'মেবে লাল, মেরে ভুখনোয়া ভাইয়া'।

অনেকক্ষণ কেঁদে মনের নিরুদ্ধ পীড়াগুলিকে ধুযে-মুছে দু'জনে নিজের-নিজের চাটাই-এ একসময়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে ঘুম ভাঙল ভুখনের। ঠিক যা মনে করেছিল তাই, এই ভাবল সে। বাবা মারলে তারপর কয়েকদিন খুব কাজে মন হত দুলারহিনের ; ভোর থাকতে উঠে কাজে লেগে যেত। আজ বোধ হয় তাই করেছে, জল আনতে গেছে।

ভুখন ভাবল : কী বোকা মেয়ে রে বাবা। অনেক বেলা হলেও যখন দুলারহিন ফিরল না তখন ভয় হল ভুখনের, সে খুঁজতে বার হল।

কিন্তু সবসময়ে খুঁজে বার করা সহজ নয়। কয়েকদিন স্নানাহার ত্যাগ করে খুঁজেও দুলারহিনকে সে

পেল না। ভুখন বরং বুঝতে পারল ওগুলোকে বর্জন করলে খোঁজার পরিশ্রমকেও বাদ দিতে হবে। তখন সে স্নানাহারের দিকে নজর দিল। হাতের পয়সা কয়েকটি একসময়ে ফুরিয়ে গেল। ততদিনে সে বহুদূরে এসে পড়েছে। গাঁয়ে ফিরে গিয়ে খেতির কাজ করে আবার হাতে পয়সা করে বেরুতে গেলে দুলারহিনকে বোধ হয় আর কোনোদিনই পাওয়া যাবে না। তখন সে পথ চলতে-চলতে কাজ করতে শুরু করল। যখন যে-গ্রামে গিয়ে পৌঁছয় সে-গ্রামেই খেতির যে-কাজ পারে জুটিয়ে নেয়। কাজ ফুরিয়ে গেলে চলতে শুরু করে। একবার খুব বিপদে পড়েছিল। এক চায়ের বাগানে কাজ করতে গিয়ে তিন বছর একনাগাড়ে খাটতে হয়েছিল, পথ চলবার উপায় ছিল না। ভুখনের ধারণা, সেই সময়েই দুলারহিন সবচাইতে দূরে গিয়ে পড়েছে। তাকে একজন মুরুব্বি বলেছে দুলারহিন যে-বছর হারিয়ে যায় সেবার প্রায় দু'তিন হাজার মেয়ে-পুরুষ নাকি মরিসাস দ্বীপে কাজ করতে গিয়েছে। ভুখনের ইচ্ছা সে একবার মরিসাস দ্বীপটিও খুঁজে আসবে।

আসল ব্যাপার ঠিক এ-রকম নয়।

দুলারহিন পথে বেরিয়ে এক বুড়োর দেখা পেল। বুড়ো তাকে প্রশ্ন করতেই দুলারহিন কেঁদে ফেলে তাকে বলল—সে ভাইকে সুখী করার জন্য পথে বেরিয়েছে।

—কী করলে সে সুখী হয়, বিটিয়া?

—যদি অন্তত ষাট-সত্তর টাকা দিতে পারি তাকে।

—আচ্ছা, তুই আমার গোরুবাছুরের তদবির কর, দুধ দো, দুধ বেচ, আমি টাকা দেব ধীরে-ধীরে।

সেই বুড়োর কাছ থাকতে-থাকতে বুড়োর ছেলে একদিন কেড়ে নিল দুলারহিনকে। বুড়ো খুব হুঁশিয়ার, সে ছেলে বলে রেয়াত করল না। টাকা নিল চার কুড়ি ছেলের কাছে বুঝে। সেই টাকা আঁচলে বেঁধে বুড়োর ছেলের ঘর করছে দুলারহিন। যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আঁচলে-বাঁধা টাকা নিয়ে দুলারহিন অপেক্ষা করতে লাগল। এ-লোক সে-লোকের মুখে সংবাদ দিয়েছে সে ভুখনকে ঘরে ফেরার জন্য। ভুখন ফিরলেই সে যাবে। লোকগুলো খবর দিয়েছে নিশ্চয়ই।

এখন দুলারহিন আর চট করে যেতে পারে না কোথাও। মাটিতে শিকড় বসিয়ে দিয়েছে সে। তিন-চারটি ছেলেমেয়ে তার। তারা সবাই তার দেহকে এবং অধিকাংশ মনকে নিজেদের পরিবারে দৃঢ়বদ্ধ করে দিয়েছে। এখন বড়জোর মনের একটা উন্মুক্ত অংশ তার ছোটবেলাকার গাঁয়ের দিকে বাতাসে আগ্রহের পল্লব মেলে ডাকতে পারে। প্রথম শীতের মাটির রসে কোনো-কোনো গাছ যেমন শিউরে ওঠে—তেমনি কখনোও অনুভব হয় তার ; শূন্যতা যেন শীত অন্ধকার একটা প্রবাহের মতো মাটি থেকে উঠে তার হৃদয়-মূলকে শিথিল করে দেয় কখনও কখনও।

আর ভুখন। বলো দেখি যে-ব্যবধান এসে গেছে তাদের জীবনে সে কি মরিসাস দ্বীপের সাগরের চাইতে কম দুস্তর? আর-একটি পরিবারের দেহগুলোর ক্রমায়াত শৃংখলের একটি বৃত্ত যার দেহ, তাকে কখনও ফিরিয়ে আনা যায়—পারত তাই ভুখন, যদি জানতও সে? তার চাইতে মরিসাসের দূরত্ব-কল্পনাও ভালো।

কিন্তু ভুখন এখন আর দুলারহিনকে খুঁজে বেড়ায় না। তবু কী খোঁজে একটা। দেশে-দেশে ঘুরে বেড়ানো নেশায় দাঁড়িয়েছে। মরিসাসের কথাও বলে না। দু-এক বছর পরপর শহর বদলে কাজ করে বেড়ায় সে। ভালো লাগে না অনেকদিন এক জায়গায় থাকতে। কিছুদিন সে বাংলাদেশের গ্রামে মাটিকাটার কাজ করে বেড়াল পথের ধারে-ধারে। সন্ধ্যার অন্ধকারে কুপি জেলে কড়াই-এ ভাত চাপিয়ে সঙ্গীরা যখন দিনজমানার গল্প করে, দেশের গল্প করে, কোনো-কোনো দিন সে চাটাই বিছিয়ে নীরবে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকে।

তারপর শুধু গল্পটাই থাকবে।

অঘটনা

কেউ বলল অফিসের ক্যাশ ভাঙা, কেউ বলল—প্রচ্ছন্ন বিপ্লবী ; দু-একজন ইঙ্গিত করল নেশা করে জলে ডুবেই হয়তো, অন্তত একজন বলল—এমন হয় যে সাধারণ গৃহস্থ হিমালয়ের টানে আর-সবকিছু ভুলে যায়।

যাই হোক, এক সন্ধ্যায় চিত্রার স্বামী ফিরল না, রাত্রিতেও নয়, তার পরদিনও নয়, আর কোনোদিনই নয়। বড় দুঃসময়ের দিন সেসব। মানুষ যেমন এখন হঠাৎ হারিয়ে যায় তেমনি তখনও হঠাৎ হারিয়ে যেত। হোক নিঃসম্বল গরিব কেরানি তবুও সে একটি মেয়ের স্বামী, দুটি শিশুর পিতা, তাদের সকলের আশ্রয়—যদি-বা তোমরা বলো সংসারের সে এমন কোন স্থানটি পূর্ণ করে ছিল যে সে চলে গেলে ধরা পড়বে মানুষের চোখে?

চিত্রার পিতৃকুলে কেউ ছিল না। দূর-পশ্চিমের এই শহরে বিয়ের পরে সে শাশুড়িকে পেয়েছিল আর স্বামীকে। তারপর একদিন অতি-দূর সম্পর্কের এই দেবরটি এসেছিল।

চিত্রার স্বামী বলেছিল এই আত্মীয়টিকে বসিয়ে খাওয়াবে এমন সামর্থ্য তার নেই। চিত্রার মাথায় চেপেছিল কথাটা প্রকাশ করার দায়িত্ব। চিত্রা তাকে বলেছিল—তোমার দেশে কে আছে?

—দেশে?

—হ্যাঁ দেশে, মানে বাবা-মা, ভাই...

আত্মীয়টি হেসে বলেছিল—বেশ যা হোক। আমার নাম অশোক। তার মানে এই নয় আমি কারো শোক দূর করেছি। আমাকে কারো জন্যে শোক করতে হবে না তাই।

—ও! চিত্রা থ' হয়ে গিয়েছিল।

স্বামীকে চিত্রা রাত্রিতে বলেছিল—ঠিকই এসেছে ও। আমার তবু মামাবাড়ি আছে। তোমার তবু মা আছেন, আমি আছি। ওর সেসব বালাইও নেই। অনাত্মোর আড্ডা ঠিকই খুঁজে বার করেছে।

চিত্রার স্বামী হেসে উঠেছিল—কিন্তু ওকি লেখাপড়া করবে? জিজ্ঞাসা কোরো।

চিত্রার যখন প্রথম ছেলেপুলে হল তখন অশোক বার দু'এক কলেজের প্রথম পরীক্ষায় ঘায়েল হয়ে বলল—ও আর হবার নয় দাদা, পাঁচ বছর লেখাপড়া ছেড়ে থেকে মাথার ভিতরটা পাথর হয়ে গেছে, দাগ বসছে না। বলো তো নোকরি খুঁজি, না-হয় ছেড়ে দাও, আবার ভেসে পড়ি।

চিত্রা বলেছিল—ভাসবে কেন?

স্বামীকে সে বলেছিল—স্বজন নেই আমাদের, যারা আসছে তাদের নিয়ে আমরা একটা মস্ত পরিবার হব একদিন। নেই বলতে কত হবে। এখন কিন্তু অশোককে চলে যেতে দিও না।

সে কয়েকদিন মাত্র মা হয়েছে কিন্তু তার বসার ভঙ্গি, কথার সুর, বক্তব্য সবটা মিলিয়ে একটি চিরকালের মায়ের মতো দেখাল। তার স্বামী দেখে খুশি হল।

এই বিভুঁই বিদেশে অবাঙালির দেশে দুটি ছেলে নিয়ে চিত্রা, তার স্বামী, তার শাশুড়ি আর অশোক একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ মানবগোষ্ঠী হয়ে উঠল ক্রমশ। অশোক অর্থ উপার্জন করতে লাগল, সংখ্যার পরিমাপে সামান্য, কিন্তু হৃদয়ের পরিমাপে অনেক। শেষ পয়সাটা পর্যন্ত চিত্রার হাতে তুলে দিয়ে সে সংসারের একজন হয়ে রইল।

একদিন চিত্রার স্বামী বলেছিল—তুই যা পাচ্ছিস, তারে তোর একার তো ভালোই চলে রে অশোক, আমাদের সকলের সঙ্গে তবে দুঃখের অন্ন ভাগ করে খাচ্ছিস কেন?

—তুমি যা উপার্জন করো, তাতে তোমারও তো একলার ভালোই চলে শুনেছি। চলো দুজনেই মেসে গিয়ে উঠি।

—এরা?

—তাই তো, বলে অশোক হেসেছিল।

যা বলছিলাম। চিত্রার স্বামী এল না। অশোক খুঁজল। সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গায়, পুলিশের কাছেও খবর দিল। খবর কেউ আনল না। শুধু পুলিশ যেন সুযোগ পেয়ে চিত্রার স্বামীর অফিসে খোঁজ করল, সঙ্গী-সাথীদের খোঁজ নিতে লাগল, শেষ পর্যন্ত সম্ভাব্য বাঙালি-বিপ্লবীর এই বাড়িটাতেও তল্লাসি করে গেল। চিত্রা কাঁদল, চিত্রার শাশুড়ি কাঁদল। চিত্রাকে কাঁদতে-কাঁদতে উঠে বসতে হতো ছেলে দুটির জন্য আহার্য যোগাড় করতে। চিত্রার শাশুড়ির এমন তাগাদা ছিল না। এক বছর পবে তার সব কান্না সব তাগাদা ফুরিয়ে গেল।

একদিন বোঝা গেল সংসারটা চলছে না। খাবার লোক দুজন কমেছে কিন্তু তার সঙ্গে কমেছে চিত্রার স্বামীর উপার্জন। বাকি খরচ যা আছে সেটা অশোকের উপার্জনে কুলোয় না।

অশোক বলল, 'সংসার না-চলাটাই স্বাভাবিক। এতদিন কী করে চলল সেটাই বিস্ময়ের। অকাজের জিনিস, সোনার টুকরো-টাকরা যা ছিল সব গেছে তো'?

'কী করি তাই বলো এখন'।

'তোমার মামারা না থাকেন, মামাতো ভাইরা আছেন। একটা চিঠি লিখে দ্যাখো'?

'এতদিন কোনো খবর দেয়া হয়নি'।

'এ তো মৃত্যু নয়'।

চিত্রা মামাতো ভাইদের খবর দিয়েছিল। দিন পনেরো পরে উত্তর এল। অশোক উৎসুক হয়ে ঘুরল খবরটা চিত্রা আপনি দেবে আশা করে। অবশেষে সে প্রশ্ন করল, 'বলো কী লিখেছে ভাইরা। খারাপ হলেও মাথা ঘুরে পড়ে যাব না'।

'কিছু করার নেই তাদের'।

চিত্রা বলতে পারল না মামাতো বউদি কী লিখেছেন। লেখার যুক্তি আছে তাঁর। ধরতে গেলে তিনিই মানুষ করেছিলেন চিত্রাকে। সে-কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি লিখেছেন . শাশুড়িও নেই, এ-অবস্থায় একজন নিঃসম্পর্কিত যুবাপুরুষের সঙ্গে একা একবাড়িতে তোমার মতো বযসেব একটি মেয়ের দিন কাটানো সমাজের সামনে খারাপ নজির রাখছে।

সে চিঠিটা পড়ে অশোকের পরিচিত মুখখানা কযেকবার দেখেছিল, মাঝখানে একবার একটু সংকোচ বোধ হয়েছিল বইকি তার চোখে-চোখে তাকাতে। আর-একবার তার নিজের অনাহার-জীর্ণ প্রসাধন-সম্পর্কহীন রুক্ষদেহের দিকেও নজর পড়েছিল—চিঠিটার এমনি শাসন।

কিছুদিন পবে চিত্রা বলেছিল, 'তুমি সারা জীবন এমনি অকারণের ঘানি টানবে'?

শিশু দুটির দিকে নির্দেশ কবে অশোক বলল, 'ওদের চাইতে বড কারণ আমার জীবনে আর-কোথায় আপাতত'।

প্রায় দু-বছর প্রতীক্ষায় কাটিয়ে খোঁজ-খবর নেয়াতে তখনও ক্লান্ত না-হয়ে অশোক বলল, 'এক কাজ করো না-হয়, বাংলাদেশে কোথাও রেখে আসি বরং তোমাদের, আমি খুঁজে বেড়াই'।

'তা হয় না। যদি উনি এসে আমাদের এখানে না-পান—কী করে ঠিকানা জানবেন আমাদের? দু-পক্ষকেই হারালে চলবে না। আমাদের স্থির হয়ে থাকতেই হবে। আমার মৃত্যুর পরেও খোকারা থাকবে তাঁর জন্যে দরজা খুলে রেখে। আমি বলি, তুমি বরং এবার বিশ্রাম নাও'।

'চাকরি করবে তুমি? চট করে কি তা পাওয়া যায়। মেয়েদের স্কুলে চাকরি করার ডিগ্রি তোমার নেই। হাসপাতালে নার্স হতে পারো। কিন্তু এটা তো গল্প নয়, বলা মাত্র হাসপাতাল তৈরি হল। শহরে আছে বটে, কিন্তু নার্স দুটির একটি না-মরা পর্যন্ত তুমি চাকরি পাচ্ছ না'।

চিত্রা কী জবাব দেবে?

অশোক ধীরে-ধীরে বলল, 'দশ-বিশ টাকা সেলাই করে পাওয়া যায়, কিন্তু চট করে সংসার চালাবার টাকা ওতে হয় না। বরং সেলাইয়ের কাজও করো, আমিও চাকরি করি। দুয়ে মিলিয়ে সংসারটা চালানো যায় কিনা দ্যাখো'।

তারপর এগারো বছর গেল।

চিত্রা বলল, 'শ্রাদ্ধ করতে হবে'।

'তা করো'।

সামান্য আয়োজনের শ্রাদ্ধ চুকে গেল।

অশোক সন্ধ্যার পরে ঘরে এসেছিল কাল সকালেই বাজার করতে হবে কিনা খবর করতে। চিত্রাকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। দারিদ্র্যজীর্ণ হলেও এতদিন পাড়-দেয়া শাড়ি পরেছে সে, কপালে কখনও-কখনও সিঁদুরও দিত। অবেলায় মাথা ঘষে সিঁদুর তুলে ফেলেছে, হাতের লোহা ভেঙেছে, সদ্য-বিধবার বেশে দাঁড়িয়েছে। বোধ হয় এইমাত্র শাড়ির পাড় টেনে-টেনে ছিঁড়েছে। এখনও হাঁপাচ্ছে, কিম্বা হয়তো সেটা কান্না চাপার চেষ্টা।

'এ কী'?

'শ্রাদ্ধের পরে এই বিধান'।

'না'।

অশোক জানত কোথায় সিঁদুর থাকে। আঙুলে করে সিঁদুর এনে চিত্রার কপালে দিয়ে দিল অশোক।

চিত্রা কিছু বলতে পারার আগেই অশোক ঘর ছেড়ে চলে গেল।

প্রায় এক সপ্তাহ পরে অশোক বলল, 'অমন চেহারা করবে? ছেলেরা ভয় পাবে। পরিবর্তনের কারণ খুঁজে পাবে না'।

'ওরা কি সত্যিটা জানবে না'?

'জানবে যখন প্রয়োজন হবে'।

'তুমি জানো, এ মিথ্যা অভিনয় নয়'?

'অভিনয় হতে পারে, মিথ্যা কেন'?

আরো দু-বছর পরে, চিত্রার বড়ছেলে তখন ম্যাট্রিক পাশ করেছে। ছোটছেলেও ডাগর হয়ে উঠেছে। অশোক একদিন এসে বলল, 'তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে, চিত্রা'।

'পার্টনারকে ডাকছ বুঝি'?

'ঠিক তাই। পর-পর চারবার প্রোমোশনের সুযোগ পাশ কাটিয়ে গেছি এই শহরে থাকার তাগাদায়'।

'সে কি? বলোনি তো কোনোদিন। কী তাগিদ এমন এ-শহরে থাকার তোমার'?

'সেটা পরে হিসেব করব। এখন বলো কোম্পানি প্রমোশন দিয়ে অন্য শহরে পাঠাতে চাচ্ছে, যাব কিনা'।

'তুমি বলো কী করা উচিত'।

'টাকা খুব দরকার। বড়খোকার কলেজে পড়ার খরচ চালাতে হবে, অথচ অন্য জায়গায় গেলে সে

যদি এসে ফিরে যায়'।

চিত্রা অশোকের মাথার উপর দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল, চোখ নামিয়ে আনতে চোখ পড়ল অশোকের চুলের একপাশে যেখানে দু'একটা পাকা চুল চিকচিক করছে।

'এখানকার ব্যবস্থাও একটা কিছু কোরো'।

চিত্রারা অন্য শহরে এসেছে। প্রোমোশনটা সত্যিকারের। বাসা পেয়েছে। তাদের পুরনো দু-একখানা ঘরের বাসার মতো নয়। বসবার ঘর আছে, শোবার ঘর আছে অনেকগুলি, সামনে একফালি মরশুমি ফুলের বাগান।

অশোক শুধু নিজের চাকরির উপযুক্ত পোশাক করল না। চিত্রার ছেলেদের সাজালো যত প্রকারে সম্ভব। একদিন অফিস-ফেরত শাড়ি কিনে আনল চিত্রার জন্য। বলল, 'তুমিই-বা বাদ থাকো কেন'?

'আমি'?

'নয় কেন'?

'উচিত কি'?

'কেন অনুচিত'?

এই সময়ে চিত্রা যেমন দেখতে হয়েছিল তার একটু বর্ণনা দেওয়া দরকার। প্রায় চল্লিশের দাগ পার হয়েছে তার। পরিমিত আহার এবং কঠিন জীবন যাপনের ফলে প্রৌঢ়ত্ব আসেনি। আধপাকা ধানের রঙ তার ত্বকের, কানের পাশে দু'একটি চুলে পাক ধরেছে, সিঁথিতে সিঁদুর নেই, কিন্তু তার দাগটি আছে। প্রোফাইলটায় তাকে ভালো দেখায় সামনাসামনি তাকে দেখার চাইতে, কিন্তু ঠোঁটের বাঁ কোণে যে-তিলটি আছে তা চোখে ধরা পড়ে না। শেষের দিকের কয়েক বছরে একটু পুষ্টাঙ্গী হয়ে উঠেছে সে, গলাটা ভারি হয়েছে।

এখন তার না-করলে-নয় কাজগুলি করলেই চলে না। অশোক প্রয়োজনের অতিরিক্ত উপকরণ সংগ্রহ করছে জীবনের, চিত্রাকে দু-হাত ভরে সেগুলিকে ঘরে তুলতে হয়, গুছিয়ে রাখতে হয়।

একদিন অফিস ফেরত অশোকের পিছনে ট্রাক-বোঝাই হয়ে মস্ত টেবিল এল আর তার সঙ্গে মাপ করে তৈরি চেয়ার। চিত্রার ছোটছেলে দেখতে পেয়ে লাফিয়ে উঠে হৈ-হৈ করে মাকে ডেকে আনল, 'দেখবে এস মা, কী এনেছে খানসাহেব'।

চিত্রা এল। কর্মক্লান্ত পুরুষ বাড়ি ফিরবার সময় হাতে করে যা এনেছে সেটা হাত বাড়িয়ে নিতেই হয়।

সে বলল, 'কিন্তু খাঁসাহেব, তোমার বসবার ঘরে এ ধরবে কোথায়'?

'এটা তো খাবার টেবিল'।

'খাবার মানে, সাহেবি ব্যবস্থা'?

'আমরা সবাই একসঙ্গে বসে খেতে পারব তারই ব্যবস্থা,' বলল অশোক খাঁ ভাদুড়ী।

ছোটছেলে আত্মহারা হয়ে বলল, 'এতদিনে ঠিক একটা কাজ করেছে খানসাহেব। আমরা দু-ভাই, তুমি মা, আর খানসাহেব চারজন, আরো দু-খানা চেয়ার অতিথির জন্য'।

'সে কিরে, আমি খাব কি তোদের সঙ্গে'?

অশোক বলল, 'এ-বিষয়ে আমি আর ছোটবাবু একদলে, ভোটে তোমার হার'।

চিত্রা বলল, 'তা হবে। এখন অমনি থাক। আগে চা হোক'।

একদিন ছোটছেলে মুখ লাল করে ফিরে এল স্কুল থেকে। চিত্রার অনেক অনুনয়েও সে মুখ খুলল না

কিন্তু অশোকের কাছে খবর পৌঁছেছিল চিত্রার মুখে। রাত্রিতে খেতে বসে অশোক ছোটছেলের বেদনাটা খুঁজে বার করল। তার সহপাঠীদের কাছে খানসাহেব নামটা অপরিচিত নয়। তাদের কেউ-কেউ আতিথ্য নিয়ে দু'এক বেলা এ-বাড়িতে থাকার সুযোগ নিয়ে খানসাহেবের সঙ্গে আলাপ করেও গেছে। তাদের মুখে-মুখে তাঁর সহৃদয়তা, সদয়তা, সরসতার খ্যাতি সহপাঠীদের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। আজ একটি ছেলে প্রশ্ন করেছিল : 'তোরা তো চক্রবর্তী আর খানসাহেব তো মুসলমান, তবে'? ছোটছেলে প্রশ্নকর্তার মূর্খতায় হেসে উঠে বলেছিল : 'খানসাহেবও হিন্দু, তাঁর উপাধি খাঁ ভাদুড়ী'। দ্বিতীয় একটি ছেলে বলেছিল : 'তা হোক, বাবাকে কেউ বাবা ছাড়া খানসাহেব বলে না'। আর-একজন বলেছিল : 'তুই-বা চক্রবর্তী হতে গেলি কেন, খাঁ ভাদুড়ী তো চমৎকার উপাধি'।

সব শুনে অশোক হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর তেমনি সহসা হাসি থামিয়ে সে বলল, 'ছোটবাবু, তুমি কি খাঁ ভাদুড়ী হতে চাও'?

'হ্যাঁ'।

'বেশ, কাল স্কুলে যাব আমি, ঠিক করে দিয়ে আসব। আর কী'?

'খানসাহেব বলা ভালো নয়, এখন আমরা বড় হয়েছি'।

'তোমার দাদা আরো বড় হয়েছে, তার তো ওই ডাকেই চলছে'।

'তা চলুক, বাবা'।

অশোক সময় নিল। তার সময় নেয়াটা যাতে ছোটছেলের চোখে না-পড়ে সেজন্য চুরুট জ্বালালে এবং তার জ্বালানোর ছলে মুখের সামনে দেশলাইসমেত হাত দু-খানা বিস্তৃত করে রাখল।

'আচ্ছা, হোক তাই'।

ছোটছেলে তখন-তখনই উঠে পড়ল। একটা অজানা দেশের দিশা পেয়েছে সে। উদ্‌ঘাটনটা তাকে এত অস্থির করে তুলল যে বসে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হল না।

অশোক দেখল অভুক্ত আহার সম্মুখে পাংশু মুখে চিত্রা বসে আছে। দু-হাত দিয়ে টেবিলের ঢাকনাটা চেপে ধরেছে নতুবা যেন সে মূর্ছায় ভেঙে পড়বে। সে সময় নিক।

অশোক উঠে চলে গেল নিজের ঘরে।

ছোটছেলে মাস্টারের কাছে পড়ছে—এমন সময় চিত্রা এল অশোকের ঘরে। অসুখ-বিসুখ ছাড়া অশোকের ঘরে চিত্রা আসে না। হয়তো-বা মামিমার প্রাথমিক শাসনই মনের তলায় একটা বাধা সৃষ্টি করেছে। পুরনো বাড়িতে পাশের ঘরে থাকার সময়ে তবু এর চাইতে বেশি আসত চিত্রা। এ-বাড়িতে কয়েকটি ঘর ডিঙিয়ে প্রায়ই আসা হয়ে ওঠে না, ঝি বিছানা করে রাখে, চাকরে ঝাড়পোঁছ করে।

অশোক বলল, 'বোসো'।

চিত্রা বলল, 'এ কী করলে তুমি'?

অশোক বলল, 'উপায় ছিল কি আর'?

'সত্যর চাইতে ভাস্বর আর কী? ওদের কী অপরাধ? সত্য পরিচয় লুকোতে হবে'।

চেষ্টা তো করেছিলাম চিত্রা, সত্যই আমার উদ্দেশ্য ছিল। হল আর। তোমার ছেলেদের নর-নারীর সম্বন্ধ বুঝবার বয়েস হয়েছে'।

'তারা কি তাদের মাকে বিশ্বাস করে না, তোমাকে অবিশ্বাস করে'?

'না। এসব প্রশ্ন তাদের নেই। অত্যন্ত সহজ তাদের বিশ্বাস। কী করে হল জানি না। বিশ্বাস ভাঙিয়ে সত্যটাকে আঙুল দিয়ে দেখাতে গেলে অবিশ্বাস আসলেও আসতে পারে—এই আমার ভয়'।

'তাই বলে সারাজীবন মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা বইব, তুমি বইবে'?

'তারা তো একে কলঙ্ক বলে জানে না। কলঙ্ক বলে সন্দেহ করলেও করতে পারত যদি সত্যটা জানত। তারা মিথ্যা একটা কল্পনাকে সত্য বলে জেনেছে, তার উপর জীবন গড়ে তুলেছে। কোনো সন্দেহ, কোনো

অবিশ্বাসের অবকাশ নেই তাদের কল্পনায়। কলঙ্ক একটা ঘটনা নয় চিত্রা। কলঙ্ক রটনা। কলঙ্কের জন্ম মানুষের মনে, প্রকাশ জিহ্বায়। একটি মিথ্যাও সত্যিকারের কলঙ্ক হয়ে দাঁড়াতে পারে'।

'কেন তুমি আত্মপ্রকাশ করোনি ওদের কাছে এতদিন? আ, অশোক, কেন ওদের মিথ্যাকে সত্যি বলে বুঝবার সময় দিলে'।

'বোধ হয় ওদের শিশু মনকে নিদারুণ সত্যটা থেকে আড়াল করার ইচ্ছায়; কিন্তু তুমি জানো চিত্রা, আমাকে খানসাহেব বলে ডাকতে আমিই শিখিয়েছিলাম'।

'আমি কী করব? কী করব'?

অশোক উঠল, চুরুট জ্বালিয়ে কী ভাবল, দেরাজ খুলে একখানা চিঠি বার করে দিল চিত্রার হাতে।

বড়ছেলে লিখেছে :

> খানসাহেব, আমার মনে হয় এতদিনে তোমার জীবনের ভঙ্গিটা বুঝতে পেরেছি। সেটা হচ্ছে একটা মধুর রসিকতা বলে সবটাকে গ্রহণ করা। তার সবচাইতে বড় প্রমাণ, তুমি তোমাকে খানসাহেব বলে ডাকতে শিখিয়েছ। পরম আরাধ্যের পদমর্যাদায় আসীন থাকার চাইতে সহচরের নৈকট্যে নেমে এসেছ। কিন্তু শোনো, গত পরীক্ষার আগে একরাতে যখন মনে হয়েছিল—আশানুরূপ সাফল্য লাভ হবে না, রাত্রির অন্ধকারের দিকে চেয়ে-চেয়ে তোমাকে ডাকলাম বার বার উৎসাহ, আশ্বাস এবং তোমার বিশিষ্ট খেলোয়াড়-উচিত মনোভঙ্গি পাবার জন্য। বাববার বলেছিলাম, বাবা, আমি যেন তোমার মতো বেদনার দিকে হাসিভরা মুখ ফিরিয়ে থাকতে পাবি।...

চিঠি পড়ে উঠে দাঁড়াল টলতে-টলতে।

অশোক বলল, 'আজ সারা রাত তুমি ভাববে কলঙ্কমুক্ত মিথ্যা কিম্বা কলঙ্কের ছায়াগ্রস্ত সত্য কোনটা হবে। কাল আমাকে হুকুম কোরো'।

ছোটছেলের পড়ার ঘরের দরজার চৌকাঠে হাত রেখে দাঁড়াল চিত্রা। শুনতে পেল ছোটছেলে বলছে তার মাস্টারমশাইকে, 'কাল থেকে স্কুলেও আমার নাম বদলে দেয়া হবে। পাকিস্তান হয়েছে বলেই তাজমহল ভেঙে ফেলা হবে না : তেমনি আমাদের ভাষাগুলো থেকে ফাবসি কথাগুলো বাদ দেয়া হবে না। তবে আমার উপাধি খাঁ ভাদুড়ী বলতে দোষ কী হবে'।

চিত্রা দাঁড়াল না।

কুণ্ঠা, সংকোচ ও গ্লানি সবটুকু কাটিয়ে উঠতে না-পারলেও চিত্রা দেখল এই মিথ্যা পরিচয়টা জীবনকে সুসাধ্য করেছে। অত্যন্ত প্রয়োজনে পথে বেরিয়েও আগে মনে হতো বহু শত চক্ষু তাদের দুজনের সম্বন্ধটাকে প্রশ্ন করছে, এখন যেন সেসব প্রশ্নের নিবৃত্তি হয়েছে। পৃথিবীর নানা ব্যাপার (হোক তা রাজনীতি কিংবা সাহিত্য, জুতোর দোকানদারের শিষ্টাচারের প্রয়াস কিংবা কাপড়ের দোকানীর অর্থলালসা) নিয়ে অশোকের মতামত যে-হাসি আকর্ষিত করে সে-হাসি এতদিন চিত্রাকে চেপে রাখতে হতো ওই প্রশ্নসংকুল কাল্পনিক দৃষ্টিগুলোর জন্য। এখন সে হাসে। ছেলেদের সামনেও সে-ও আজকাল হাসে।

তবু ইতিমধ্যে একদিন এ-পাড়া ও-পাড়ায় খবর নিয়ে ফিরতে-ফিরতে এমনসব কথাবার্তা হল, (এতদিন এসব খবরদারি ছুটি-ছাটার দিনে অশোককে একাই করতে হতো)।

'সে যদি আসে কোনোদিন?'

'এই নাকি চিত্রা তোমার বুকের বোঝা? তা যদি হয় তবে হাসো তুমি। আমার মনে হচ্ছে তার হাতে তোমাকে ফিরিয়ে দেবার মুখ আমার থাকবে'।

চিত্রা হাত বাড়িয়ে অশোকের একখানা হাত ধরে বলল, 'তুমি পারবে পার্টনার। তোমার মনের

প্রসারের তুলনায় আমার মন কী তা তুমি দেখতে পেলে এখুনি'।

বড়ছেলে কোথায় এক রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত। নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই তার, বাড়িতে আসা দূরের কথা। ছোটছেলেও পড়তে গেল অন্য শহরের কলেজে। খাঁ ভাদুড়ী দম্পতীর হাতে অফুরন্ত সময়। ছোটখাটো সভা, ক্লাবের মিটিং, চ্যারিটির জন্য বাজার এসবেই দিন কাটে। তাদের ছোঁয়াচে যারা আসে তারাও খুশি কুড়িয়ে নিয়ে যায়। লোকে বলে খাঁ ভাদুড়ীদের উভয়কে উভয়ের মাপে ভগবান কেটে ছিলেন।

অশোক বলে, 'বহু যুগের সাধনায় পাওয়া সম্বন্ধ। বিয়ের চাইতেও বড়, কী বলো পার্টনার'?

চিত্রা হাসি ফিরিয়ে দিয়ে বলে, 'প্রায় প্যারালাল স্ট্রেইট লাইনের সাধনা'।

শহবের সবচাইতে আলোকোজ্জ্বল অংশে স্বামী-স্ত্রীরা ওদের দেখাদেখি পরস্পরকে পার্টনার বলে ডাকতে শুরু করেছে।

কিন্তু আলোর সঙ্গে অন্ধকাব না-থাকলে বুঝি মানুষের মন ভরে ওঠে না, নইলে খাঁ ভাদুড়ী দম্পতীর পোষ্য এমন একটি পিশাচ কী করে বসবাস করতে পারে এ-বাড়িতে। এমন কুৎসিত এমন ভয়াবহভাবে কুৎসিতও যে কোনো মানুষ হতে পারে তা না-দেখলে কল্পনা করার কথাও মনে হয় না। একটি চোখ একেবাবেই নেই। দ্বিতীয়টির মণিও নিষ্প্রভ, শাদাটে রঙ ধরেছে। ডান হাতের গুটিকয়েক আঙুল নেই। কিন্তু সব ছাপিয়ে উঠেছে তার মুখের বীভৎসতা। গলিত ক্ষত শুকোনোর সময়ে ত্বকের যে-সংকোচন হযেছিল তাতে তার মুখখানা কঙ্কাল আর পশুর মধ্যবর্তী একটা আকৃতি নিয়েছে। হোক না দারোয়ানের ঘবেব পাশেই তাব ঠাঁই, কিন্তু তাও তো সদরেরই আবর্জনা। এক বিপদসংকুল মেঘের সন্ধ্যায় সে চিত্রার আকস্মিক সদযতার আশ্রয় পেয়েছে। আহা থাক না, সারাদিনে তো একবারও বেরোয় না ঘর থেকে যে কাবো চোখে পড়ে অসুবিধা ঘটাবে।

ছোটছেলে ছুটিতে বাড়ি এসেছে। সেদিন ওরা পিকনিক করতে বার হচ্ছে। ফিরতে দুদিন দেরি হলেও হতে পারে।

সদব দিয়ে বেরুতে-বেরুতে চিত্রা বলল, 'দারোয়ান চাকরদের খাবার ব্যবস্থা ঠিক করা থাকল, দুদিন দেবি হলেও ক্ষতি হবে না'।

'তা হবে না, চারদিন হলেই-বা ক্ষতি কি। ভদ্রগোছের ডাকবাংলো পেলেই হল'।

গাড়িতে উঠে ছোটছেলে বলল, 'ওই লোকটা কিন্তু বাঙালি, ঠিক আমাদের মতো নয়, বোধ হয় মহাতো উপাধির প্রবাসী বাঙালি। উচ্চারণটায় জড়তা আছে'।

'তা নাও হতে পারে। আমরা ঠোঁট, জিভ, দাঁত দিয়ে শব্দ উচ্চারণ করি, ওর বোধ হয় মুখের পেশিগুলো ঠিক কাজ করে না'। অশোক বলল।

ছোটছেলে বলল, 'ভীতু কিন্তু লোকটি। সেদিন যেই শুনেছে আমাদের উপাধি চমকে উঠল। যে-চোখটা অবশিষ্ট আছে তার মণিটা অস্বাভাবিকভাবে নড়েচড়ে উঠল যেন তা করে বিপদ থেকে পালিয়ে যেতে পারবে, কিংবা বিপদের পরিমাণটা আন্দাজ করতে পারবে। আমি বললাম—তুমি মিছেই ভয় পাচ্ছ, আমরা হিন্দু'।

'আঘাত পাওয়া লোক কিনা। কিন্তু এবার তোমার গল্পটা বন্ধ করো ছোটবাবু। তোমার মায়ের মন ভার হয়ে উঠছে। কষ্টের কথা শুনলে সকলে সইতে পারে না'।

'কিন্তু লোকটির একটি সদ্‌গুণও আছে। কাজ করতে চায়, বসে খেতে চায় না'।

'কী কাজ করতে পারে'?

'কাজ পাগল লোক, খেপল এবার', হাসল চিত্রা।

'কয়েকটা ছোট-ছোট কাজ দিয়েছিলাম, পারল না। হেসে বলল, কিছুই যে আর পারি না, বাবুসাহেব'।

'লেখাপড়ার কাজ দিয়ে দেখেছ'?

চিত্রা পিছন থেকে অশোকের কাঁধে একখানা হাত রাখল।

'কী'?

'দু'পুরুষের কাজের তাগিদে বেচারা কুকুরটা গাড়ি চাপা পড়ছিল'।

অশোক হেসে স্টিয়ারিং হুইলে মন দিল।

কথাটা পিকনিকেই স্থির হয়েছিল। হিলস্টেশনের অত কাছে অমন সমতল উপত্যকায় অতটা ফাঁকা জায়গা পড়ে আছে এমনটা সহসা আশা করা যায় না। ছোটছেলে চারিদিকে ঘুরে এসে বলেছিল, 'উপত্যকাটা বিচ্ছিন্ন ছিল; ওরা বলছে গত বছরে যে-রাস্তাটা শেষ হয়েছে সেটার জন্যেই এতদূর আসতে পেরেছি আমরা। আর সেজন্যেই আজ আমাদের চোখে লেগেছে জায়গাটা'।

চিত্রা বলল, 'এমন জায়গায় এবার কত বাড়ি উঠবে। ঝরনার দিকে মুখ রেখে একটা ছোট বাড়ি খুব ভালো হয়'।

বাসায় ফিরে এসে খাবার টেবিলে এই কথাটাই উঠল। নৈশ-আহার পর্ব শেষ হয়েছে। আলোগুলো কাঁচের বাসনগুলোতে ছোট-ছোট তরঙ্গের মতো খণ্ড-খণ্ড হয়ে জ্বলছে। চিত্রার হাতে উলের কাঁটা। অশোক পরিতৃপ্তির ছোট একটি উদ্‌গার তুলে উঠে দাঁড়িয়ে চুরুট জ্বালল। স্নিগ্ধ প্রতিষ্ঠার অবসর এটা। চিত্রা বলল, 'তুমি তাহলে এখন খুব বড় চাকরি করছ, বলো'?

এখানে বাইরের লোক নেই। যারা আছে তারা সৌভাগ্যের ও কৃতার্থতার অংশীদার। মুখের আদল দেখা যেত আয়না থাকলে। তা না-হলেও প্রৌঢ় এই লোকটিকে তার দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে একটা বড় ডাইরেক্টরের মতোই দেখাচ্ছে না?

অশোক বলল, 'চিরকাল তো চাকরি করতে পারব না। তখন কোম্পানির এ-বাসা ছেড়ে দিতে হবে। নিজের নীড় দরকার হবে'।

চিত্রা বলল, 'বাঁচার উপরে তোমার খুব লোভ'।

ছোটছেলে কফির কাপটা অশোকের হাতে পৌঁছে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'কোথায় যাচ্ছ ছোটবাবু'?

রুমালে ঢাকা একটা প্লেট হাতে ছোটছেলে বলল, 'পুডিংটুকু দিয়ে আসি লোকটাকে'।

'তার কথা তুমি এত ভাবো'?

'লোকটিও আমাকে ভালোবাসে। সেবার আমার অসুখের ব্যাপার জানো না তো। সে নাকি খবর পেয়েই দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিল ডাক্তার ডাকা হয়েছে তো? দারোয়ানরা হেসেই বাঁচে না। কিন্তু তাদের হাসিতে ভ্রূক্ষেপ না-করে আবার জিজ্ঞাসা করেছিল—ডাক্তার কী বলে গেল? দারোয়ান চাকরদের পিছন-পিছন ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আমার অসুখ সম্বন্ধে তোমাদের আলাপ নিজের কানে শুনে যেত'।

'অদ্ভুত স্নেহপ্রবণ তো লোকটি'! বলল চিত্রা।

ছোটছেলে চলে গেল খাবার নিয়ে।

চিত্রা বলল, 'অশোক, এ শুধু নিজেদের জীবন পর্যন্ত নয়। বাড়ি করা মানে আমরা চলে যাবার পরও আমাদের ইতিহাস জড়িয়ে রইল পৃথিবীতে'।

অশোক বলল, 'ভেবে দেখি'।

কিন্তু ওদের আলাপে ছেদ পড়ল। ছোটছেলে কাতরমুখে ফিরে এল।

'সে নেই'।

'সে কী! কোথায় গেল'?

'সন্ধ্যায় খাবার-টাবার খেয়ে কোথায় চলে গেছে কে জানে'।

'অনেক রাত হল। চোখে ভালো দেখে না'। বলল চিত্রা।

'সে ফিরবে না', বলল ছোটছেলে।

'কী করে জানলে'?

'এই দ্যাখো'।

দু'একটা পুরনো কাগজের কাটিং একটা ছোট কাগজের টুকরো এগিয়ে দিল ছোটছেলে। কাগজের টুকরোটায় লেখা আছে—'ছোটবাবু, বিনা কাজে খেতে পারি না, তাই চলে যাচ্ছি'।

একটা ক্ষণিক বিরতি। ঝি এসে টেবিলের বাসনগুলো নিয়ে গেল। তাস দিয়ে গেল একজোড়া। ঘুমতে যাবার আগে আধঘণ্টা খেলা নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাসে হাত রেখে অশোক বলল, 'কাগজের কাটিংগুলো কেন'?

'ওগুলি তার বালিশের নিচে ছিল। ২৬শে জানুয়ারির সংকল্প আছে একটিতে, তার চাইতেও পুরনো একটিতে বেয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো প্রস্তাবের খানিকটা। উল্টোপিঠে কে-একজন দাদা হারিয়ে গেছে, আর তার ছোটভাই অশোক তাকে খুঁজে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে'।

'তুমি এখন কী করবে, খোকা'? অশোক জিজ্ঞাসা করল।

'শুতে যাব'।

'কবিতা পড়ে শোনাবে বলেছিলে'। অশোক বলল।

'আজ থাক'। চিত্রা উঠে দাঁড়াল।

'তোমার শরীরটা খারাপ হয়েছে, মা'?

চিত্রা হাসতে চাইল।

'জিন্ খেলেই তোমার অমন হয় দেখছি। এখন থেকে ওটা টেবিলে আনা চলবে না। মুখখানিও তোমার ছাইয়ের মতো হয়ে গেছে'।

চিত্রা চলে গেলে অশোক আর-একটা সিগার ধরাল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ছোটছেলে বলল, 'তুমিও আজ বিচলিত হয়েছ দেখছি। কফির পরে তুমি কদাচিৎ নতুন সিগার ধরাও'।

অশোক কাগজের টুকরোগুলো উল্টেপাল্টে দেখে দলা পাকিয়ে ফেলে দিল। বলল, 'হঠাৎ একটা লোক চলে গেল'।

শহিদ

মহাত্মা সীতানাথ একাডেমির তৃতীয় শিক্ষক শ্রীবিনোদলাল কড়ুই সদরের শহরে গিয়েছিল বলেই এই গল্প। বিনোদলাল লম্বা, চিমসে, হলুদ রঙের। কপালে বলি, নাকের দু-পাশে ভাঁজ, গাল তোবড়ানো। রোগা-রোগা হাতে-পায়ে অজস্র শিরা-উপশিরা কিলবিল করছে। পিঠের ও কাঁধের হাড় জামার তলায় ধারালো হয়ে ফুটে উঠেছে। তার বয়স এবার সাতান্ন পার হয়েছে। কিন্তু একটু আনুপূর্বিক বলা দরকার।

দরজা বন্ধ করা ছিল হেডমাস্টারের হুকুমে যাতে বাইরের খোলা পৃথিবী শিক্ষক এবং ছাত্রদের মনোনিবেশের গাঢ়তাকে হালকা করে না-দেয়। কিন্তু বাঁশের বাখারির উপরে মাটি এবং তার উপরে এক-ফেরতা চুনের কলিতে তৈরি দেয়ালের একটা জায়গা দরজার পাশেই ভাঙা। বিনোদলালের মনোযোগ সেই ভাঙাপথে অকর্তব্যপরায়ণ ছাত্রের মতো পলায়ন করল। শ্রীপদ দপ্তরি খালি গায়ে মাথায় গামছা দিয়ে ঘড়ি পিটতে যাচ্ছে। মনোযোগ-ভ্রষ্ট হওয়ার আগের মুহূর্তে শিক্ষকমশাই যে-বাক্যটি শুরু করেছিল সেটায় ব্যায়াম শব্দটা ছিল। সেটা শেষ হওয়ার আগেই এই দুর্ঘটনা। নিচের পাটির ক্ষয়াবশিষ্ট দু-তিনটি হলুদে দাঁত প্রকাশিত করে হাই তুলতে বাধ্য হয়েছিল সে। ব্যায়াম শব্দটির শেষভাগ হাইয়ের ফাঁপা অনুনাসিক শব্দে মিশে গেল। ঘণ্টাও বাজল।

তৃতীয় শিক্ষক তাদের বসবার ঘরে এল। কয়েকটি বার্নিশহীন কাঠের আলমারির ফাঁকে-ফাঁকে কয়েকখানি চেয়ার ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শিক্ষকদের জন্যে। মাথার উপরে টিনের ছাদ রোদে তেতে কটকট করছে। বাইরে চৈত্রের-রোদে-পোড়া চরাচর। ঘাসগুলো শুকিয়ে খড়ের রঙ নিয়েছে, তার উপরে ধুলোর স্তর জমেছে। একদিকে কিছু ঝামা ইট জমা করা, তার পাশে একটা পেঁপে গাছ। তার রোদে ঝলসানো ডালে একটা কাক কর্কশতার ঐক্যতানে সংযোগ রাখতে উপস্থিত। শিক্ষকরা খাতা-বই মুখের সম্মুখে নেড়ে-নেড়ে গরম তাড়াচ্ছে। হেডমাস্টারের ঘরে অবশ্য নতুন টানা-পাখা টানছে এক ছোকরা।

তা ভালো, এটা যেন তৃতীয় শিক্ষকেরই একটি সফলকাম উচ্চাভিলাষ। এ রকম একটি ঘরই সে হেডমাস্টারের জন্যে কল্পনা করত। কারণ মহাত্মা সীতানাথ একাডেমি যখন স্থাপিত হয়েছিল তখন থেকে প্রায় বিশ বৎসর সে-ই হেডমাস্টার ছিল। সে-সময়ে যা হয়নি এই নতুন হেডমাস্টারের বেলায় তা হয়েছে। তৃতীয় শিক্ষক বিনোদলাল এখন-আর বিদ্বেষ অনুভব করে না। করেছিল বটে যখন কমিটি সরকারি সাহায্য বেশি করে পাওয়ার জন্যে একজন বি.টি. পাশ করা অল্পবয়সী হেডমাস্টার এনে বিনোদলালের মাথার উপরে বসাল। সে-ঘটনা দশ বছর আগেকার। চার বছরের পুরনো একটি ঘটনাও আছে, একেবারে টাটকা এম.এ, বি.টি হেডমাস্টার এসে বিনোদলালের মাথায়-বসা হেডমাস্টারের উপরে বসেছে। বিনোদলাল তৃতীয় শিক্ষক হিসেবে কোঁচার খোঁট দিয়ে বাতাস খাচ্ছে, আর দ্বিতীয় দফার হেডমাস্টার তার সম্মুখে সহকারী প্রধান শিক্ষকরূপে একটা তালপাখা নাড়ছে নিজের মুখের সম্মুখে।

এমন সময়ে ডাকপিওন এল।

চিঠি! আশ্চর্য হল বিনোদলাল। উপাধি কী লিখেছে?

ডাকপিওন পড়ে বলল, 'কড়ুই'।

তাহলে, বিনোদলাল ভাগ্যনির্ভর হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'তাহলে আমারই হবে। 'ড'য়ে বিন্দু 'ড়'কে কেউ-কেউ ইংরাজিতে 'ডি' দিয়ে লেখে বটে'।

সরকারি খাম। একেবারে টাটকা নয়, আরো দু-একবার এটায় করে চিঠি চালাচালি হয়েছে। খামের উপরে কাগজের তাপ্পি মেরে বিনোদলাল কড়ুইয়ের নাম-ঠিকানা লেখা আছে। চিঠি খুলতে চেষ্টা করে

বিনোদলালের হাত কাঁপল। সে চিঠি না-খুলে খামখানা উল্টেপাল্টে দেখতে লাগল। পুরনো একটা ঠিকানা খামের পিছন দিকে নজরে পড়ল তার—পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্টের ঠিকানা ছিল সেখানে। চিঠিটা অত্যন্ত মূল্যবান সন্দেহ নেই। উঁচু মহলের ঠিকানা লেখা খামে যার যাওয়া-আসা।

কিন্তু এসব কিছুরই পক্ষে সময়ের একান্ত অভাব ছিল। বিনোদলালকে এবার ইতিহাস পড়াতে যেতে হবে। প্রকৃতপক্ষে কোঁচার খুঁটে হাওয়া খাওয়ার এই সময়টুকু ইতিহাস-ক্লাস থেকে চুরি করে নেওয়া। সুতরাং চিঠিটা পাশ-পকেটে ঢোকাতে-ঢোকাতে বিনোদলাল উঠে দাঁড়াল।

ক্লাসে বসে ইতিহাস বই খুলে পাঠ্য অংশ বার করে সে ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আজ, আকবর'। এবং বলতে-বলতে চেয়ারের তলায় হাত গলিয়ে বেয়াদপ জুতোটাকে আঙুল দিয়ে টেনে-টেনে চটিত্ব থেকে জুতোর অবস্থায় নিয়ে এল। উত্তেজনায় একসময়ে সেটা অর্ধচ্যুত হয়েছিল। বাংলায় পড়বে ছেলেরা, বইটিও বাংলায় লেখা তবু আকবর সম্বন্ধে কিছু বলার আগেই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে—আকবর দি গ্রেট। বছরের পর বছর এই একই ব্যাপার ঘটছে। ছেলেরা হঠাৎ ইংরেজি শুনে হকচকিয়ে যায়। বই খুলে অতঃপর বাবর ও হুমায়ুনের সঙ্গে আকবরের রক্তের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে বিনোদলাল বলে, 'আমরা ভিনসেন্ট স্মিথের বই পডতাম হে—এই এত মোটা বই'। তারপরই নিয়মিতরূপে আসে স্যার যদুনাথ সরকারের কথা। এবং এই নামটা উচ্চারণ করতে-করতে বিনোদলাল যুক্তকর কপালে ঠেকাল কয়েকবার। ছাত্রদের কেউ ভাবে সেটা আকবরের প্রাপ্য, কেউ ভাবে যদুনাথের। এরপরে একটা বাৎসরিক রসিকতা করার কথা বিনোদলালের।

কিন্তু রসিকতাটা এবারের ক্লাসে বাদ পড়ল। হেডমাস্টার এল।

'এই ব্যা, খেয়েছে, দরজা যে খোলা'—এই স্বগতোক্তি করে বিনোদলাল উঠে দাঁড়াল। হেডমাস্টার বলল, 'আপনি একবার আমার ঘরে আসুন'।

স্বাভাবিক মর্যাদার ছাপ কারো-কারো মুখাবয়বে থাকে না। পদমর্যাদাতুল্য গাম্ভীর্য আনতে গিয়ে তারা নিজের মুখের চেহারাকে যেমন করে, হেডমাস্টারেব মুখ তেমনি ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

হেডমাস্টারেব পিছন-পিছন বিনোদলাল হাতড়ে চলার ভঙ্গিতে হাঁটছিল। হাঁটু নুয়ে-নুয়ে যাচ্ছিল ভয়ে।

হেডমাস্টার বলল, 'আপনি বাড়ি যান'।

'আমি? কেন-কেন'?

বলির পাঁঠার অনুভব নেই, বিনোদলাল অনুভবেব বালাই নিয়ে টলতে লাগল। অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাব সর্বাঙ্গে ঘাম ছুটল।

হেডমাস্টার যেন একটু সদয় হল, বলল, 'রিক্সায় করেই যান না-হয়'।

কথাটা একটা নির্দয় বিদ্রূপের মতো শোনাল। বিনোদলাল উঠে দাঁড়াল। তবে কি তার নিজের তৈরি এই স্কুলে তাকে তৃতীয় শিক্ষক হিসাবেও থাকতে দেবে না? হেডমাস্টারের হাত ধরে তার পায়ের কাছে বসে পড়ে কিছু-একটা বলতে ইচ্ছা হল তার কিন্তু একটা অভিমান তাকে চূড়ান্ত হীনতা থেকে বাঁচাল।

বাড়ির পথে ফিরতে-ফিরতে বিনোদলাল চিন্তা করল—তাকে কি অশক্ত বলে তাড়ানো হল? কিন্তু তাহলে কি অন্তত নোটিশ দিত না? তবে কি পকেটের চিঠিটাই সে নোটিশ? হেডমাস্টার কি এ-বিষয়েও তার বহুপ্রচারিত ক্ষিপ্রকারিতার পরিচয় রাখল? কিন্তু ব্যাপারটা তার পক্ষেও অতিদ্রুত ঘটছে না? তাহলে সেই তহবিল তছরূপের ঘটনাটাই কারণ হবে। নতুবা এমন নির্দয় ও আকস্মিক খড়্গাঘাত হতো না। আঙুলের মাথায় গুণল বিনোদলাল, পনেরো বছর হল। তখন সে হেডমাস্টার ছিল। ছোটভাই সে-বছর একইসঙ্গে এম.এ এবং ল-এর পরীক্ষা দিচ্ছে। তার ফিসের টাকা আর তিন-চার মাসের বাকি মাইনা বিনোদলাল স্কুলের তহবিল থেকে নিয়েছিল। মিথ্যাভাষণে অনভ্যস্তের মতো সে তার দরুন অনেক মিথ্যা-হিসাবে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু পনেরো বছর পরে কি সেই ঘটনা তাকে এমন বিপন্ন করতে পারে?

তা পারে। যদি হেডমাস্টার পনেরো বছরের পুরনো হিসাবখাতা খুঁজে পেয়ে থাকে তাহলে অবাক হওয়ার কী আছে। ফৌজদারি কখনও তামাদি হয় না। ঘটনাটা বিনোদলাল মনের মধ্যেও সবসময়েই খুঁজে পায়।

'কী হবে, কী হবে বলো'!

দুটি ঘটনায় তার জীবন বাঁক নিয়েছে। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে জেলার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য আকস্মিকভাবে ইংরেজ পুলিশসাহেবের কাছে থেকে একটি স্বর্ণপদক লাভ এক নম্বর ঘটনা। এরই ফলে বংশগত বৃত্তি দোকানদারিতে তার রুচির অভাব দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় ঘটনা এই তহবিল তছরূপ। মহাত্মা সীতানাথ একাডেমির তদানীন্তন হেডমাস্টার বিনোদলাল কড়ুই আদর্শ-কঠোর শুচিতাদম্ভী ছিল; চিত্তদৌর্বল্যের প্রতি তার ছিল প্রচণ্ড বৈর ; দারিদ্র্য ছিল রাজমুকুট। কিন্তু ভ্রাতৃস্নেহের কাছে যখন তার স্বাতন্ত্র্য, দম্ভ, এবং সততার তেজ পরাজিত হল এবং সে তহবিল তছরূপ করল তারপর থেকে সে মিইয়ে গেল। তার কণ্ঠস্বরে পরিবর্তন দেখা দিল, স্বাস্থ্যের ঋজুতা নুয়ে এল। সে যে ডিস্টিংশনে বি.এ. পাশ এটা তার মুখের ভাষা থেকে, পরে চিন্তা থেকেও দূরে সরে যেতে লাগল। এক কথায় তখনই বর্তমানের তৃতীয় শিক্ষক নির্বিবাদী ভালোমানুষ বিনোদলালের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

সেই ভাই এখন জেলার প্রথম পাঁচজন লোকের একজন। নামকরা পয়সাওয়ালা উকিল, আইনসভার সভ্য। সদরের সাহেবপাড়ায় সাহেবি বাংলোবাড়ির গারাজে নাকি একাধিক মোটর গাড়ি তার। কিন্তু এ হেন ভাইয়ের জন্য মানসিক সুখভোগ বা আত্মতৃপ্তি অনুভব করার সুযোগ নেই মন্দভাগ্য বিনোদলালের। তার পরিবারের সকলে তাকে ছি-ছি করে ওঠে। একদা তিন-চার পৃষ্ঠাব্যাপী আশীর্বাদ, স্মৃতি-রোমন্থন ও গর্ববোধে ভরা দীর্ঘ একখানি চিঠি লিখেছিল বিনোদলাল তার ভাইকে। উত্তরটা আসতে অনেক দেরি হতে লাগল, অবশেষে তার ভাইয়ের একান্ত সচিব চিঠিটার প্রাপ্তিস্বীকার করেছিল। কিন্তু বিনোদলালের ভ্রাতৃবধূ বোধ হয় একটি কারুণ্য দ্বারা চালিত হয়েছিল—মনি-অর্ডার করে পঞ্চাশটি টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল। বিনোদলালের গৃহিনী এবং পুত্রকন্যারা অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।

'হায়-হায়। এ কী হল'!

বিনোদলাল ঘরে ঢুকে দেখল গৃহিনী নেই সেখানে, বোধ হয় পাড়া-বেড়াতে গিয়েছে। ভালোই হয়েছে—নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে। ঘরের কোণে ছাতা রেখে বিছানায় বসল সে। মুহূর্তের একটা অংশ ধরে তার মনে ক্রুর একটা-কিছু জাগ্রত হল—চাকরি গেছে, এবার সকলে বুঝুক তৃতীয় শিক্ষক বিনোদলালের এই বৃদ্ধ বয়সের অক্লান্ত শ্রমের মূল্য কিছু আছে কিনা। কিন্তু কথাটার অন্যমুখের সঙ্গেও যে অপরিচিত নয়। বেদনায় সে ও-ও করে উঠল। জামা গায়ে বিছানায় শুয়ে দু-হাত দিয়ে সে চোখ আড়াল করল, কারণ দু-চোখ ভরে অজস্র জল এসেছে।

অনেকক্ষণ মুহ্যমান থাকার পর প্রতিকার খোঁজবাব অবস্থায় এল তার মন।

হাতির দাঁতের পাত—এমন সাদা, মসৃণ ও শক্ত কাগজ। নীলাভ একটা বর্ডার, এককোণে রাষ্ট্রীয় প্রতীক আঁকা। টাইপ-রাইটারে লেখা সরকারি চিঠি। তলায় জনসংযোগ বিভাগের অধিকর্তার সই। একাধিকবার আগাগোড়া সে চিঠিটা পড়ল। একটা কুয়াশা যেন তার বুদ্ধিবৃত্তিকে ঢেকে ফেলেছে। তারই মধ্যে সে একবার ভেবে নিল—এতদিন পরে কি সে সত্যি-সত্যি ইংরেজি ভুলে যেতে আরম্ভ করেছে। প্রবল জ্বরের সময়ে মস্তিষ্ক অনেকক্ষেত্রে এমন নিভে-নিভে আসে, প্রোথিত একটা চিন্তা থেকে কথা খসে-খসে পড়ে যায়।

তারপর তার মনে হল একটা চূড়ান্ত কান্নায় সে নিজেকে বিস্ফোরিত করে দেবে, নিজেকে শতভিন্ন করে সংসারময় উৎক্রোশ কান্নায় ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু কান্নাটা গলার কাছে আটকে-আটকে গিয়ে কয়েকটি বিকৃত শব্দে পরিণত হল। মাথা কোটার মতো কয়েকবার বিছানায় মাথা ঠুকে চিঠিটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সে কাঁদার চেষ্টা করল। কিন্তু তার অশ্রুগ্রন্থিগুলো তার বেদনার প্রতি উদাস হয়ে রইল,

ইতিপূর্বে অন্য কারণে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, চোখে জল এল না। ঘরের চারিদিকে লক্ষ্য করে সে দেখল তার কান্নায় পাথর গলা দূরে থাক, কাঠ-বাঁশ প্রভৃতির দৈনন্দিন আকৃতিতেও কিছুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। উপায়ান্তর না-দেখে সে শুকনো কান্নায় আউ-খাউ করতে লাগল।

বিনোদলালের মেজছেলের নাম ছিল সুধীরলাল। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে তার বয়স ছিল যোলো-সতেরো। ম্যাট্রিকে ফেল করেছিল বলে বিনোদলাল একদিন রাগারাগি করেছিল। তারপর থেকে সুধীবলাল তার সামনে বড়-একটা আসত না। তারপর একদিন কী-একটা কাজে খোঁজ করতে গিয়ে বিনোদলাল শুনল সে সদরে তার পিসির বাড়িতে গেছে। সেই পিসির বাড়ি থেকেই ছেলে কোথায় কোনদিকে চলে গেল এই পাঁচ মিনিট আগেও বিনোদলাল জানত না। এখন সে নিশ্চিততম সংবাদ পেয়েছে। সেই ৪২-এ সদরে ম্যাজিস্ট্রেটসাহেবের দপ্তর দখল করতে গিয়ে যে-কয়েকটি তরুণ গুলিতে প্রাণ দিয়েছিল সুধীরলাল তাদের অন্যতম। সুধীরলাল এবং সহমৃত অন্য কয়েকটি যুবকের প্রতিমূর্তি স্থাপনের উৎসব হচ্ছে—তাতে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছে সে।

বিনোদলাল চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরে পকেটে বেখে বিছানা থেকে নেমে তামাক সেজে মেঝেতে উবু হয়ে বসল। তামাক খেতে-খেতে মেজছেলের অনেক ছবি যেন তার চোখের সম্মুখে ফুটে উঠতে লাগল। এত স্মৃতি যে তার মনে সঞ্চিত ছিল সে নিজেও জানত না।

কিন্তু ছেলের কথা কাকে সে বলবে? ছেলেদের কথা আলোচনা করতে গেলে গভীর একটা লজ্জাবোধ, অপরিসীম বেদনা ও অভিমানে তার কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। চিন্তাটা থেকে নিজের মুখ আড়াল করার জন্যে সে হুঁকোয় ঘনঘন টান দিতে লাগল।

তার অনেকগুলো ছেলেমেয়ে—নয়টি সবশুদ্ধ। অপরিচিত একজন তার ছেলেমেয়ের বয়েসের পরিচয় পেয়ে প্রশ্ন করেছিল বিনোদলালের একাধিক বিবাহ কিনা। স্কুলের মাস্টারমশাইরা এ নিয়ে রসিকতা করে। চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি ছোকরা মাস্টার যে নাকি ছ-মাস হল বিবাহ করেছে সে-ও উপদেশ দিয়েছিল ফ্যামিলি প্ল্যানিং সম্বন্ধে।

সামান্য-সামান্য ঘটনা থেকে এ-ধরনের আলোচনা উঠে পড়ে। দু-মাস আগে বাড়ির উঠোনে প্রকাশ্যে আলোচনাটা উঠে পড়েছিল। বিনোদলালের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা অবশ্য আলোচনার কুৎসিত দিকটা বুঝতে পারেনি কিন্তু তার যোলো-সতেরো বছরের মেয়েটির মুখ লজ্জায় বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল। বিনোদলালের ছোট্টছেলেটির বছর চারেক বয়স। ধবধবে রঙ, টুকটুকে লাল ঠোঁটে ফুরফুরে হাসি। ছেলেটি অধিকাংশ সময়ে দাদা-দিদিদের পরিত্যক্ত জামাকাপড় পরে থাকে। একদিন ছেলেটির কী খেয়াল হল সে তার বাবার কাছে একটা প্যান্ট চাইল আর বিনোদলাল এক টাকা দামের একটা প্যান্ট এনে দিয়েছিল। এ-ব্যাপারে যদি দোষের কিছু থেকে থাকে তবে তা এই যে সস্তা প্যান্টটিতে ছোটছেলেটিকে রাজপুত্রের মতো দেখাচ্ছিল।

এমন দিনে এসব কথা মনে আসে কেন—এই ভেবে বিনোদলাল তামাক ছেড়ে উঠে পড়ল। সুধীর থাকলে সে-ও কি এসব আলোচনায় যোগ দিত? নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তার বড়মেয়ে একসময়ে তার পক্ষ নিয়ে দাদা-বউদির সঙ্গে তর্ক করত এখন সে ধীরে-ধীরে পরাজিত-পক্ষ ত্যাগ করছে।

হয়তো ওরা ঠিকই বলে। যতদিন সে হেডমাস্টার ছিল সে সংযমী ছিল কি না-ছিল, হুঁশিয়ার ছিল। তারপর চাকরিতে অবনতির সঙ্গে-সঙ্গে সে লোকজন বই পুঁথির সংস্রব ত্যাগ করতে শুরু করল, আর

বিনোদলাল নিজেকে ধমকেও শান্ত করতে পারল না। এমন সময়ে তাকে বাঁচাল তার কনিষ্ঠ ছেলেটি এসে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সুধীর-সুধীর বলে সে উদ্বেলিত অশ্রুটার পথ করে দিতে

পারল। একসময়ে ছেলেটিকে বিছানায় বসিয়ে, পকেট থেকে চিঠিটা বার করে তার পাশে বসে আবার পড়ল চিঠিখানা। বুড়ো বয়সের ছেলে দুরন্ত নয়, বরং যেন চিন্তাশীল। সে বাবার চিঠিপড়া দেখতে লাগল।

'শহিদ'। কথাটা ইংরাজিতেও তাই লিখেছে। বিনোদলাল এদিক-ওদিক চাইল। গত পুজোর বন্ধের আগে তার ছাত্রেরা তাকে একখানা অভিধান উপহার দিয়েছিল। বানানটা বাংলায় 'ই'কার কিম্বা 'ঈ'কার দিয়ে হবে তা দেখার ইচ্ছা হল তৃতীয় শিক্ষক বিনোদলালের। অভিধানটা বার করে সে কথাটা খুঁজে বাব করল। দুই বানানই অভিধানকার লিখেছে, শব্দটা মূলত আরবি, অর্থ ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি। তা কথাটা যখন আরবি তাহলে 'শ' কেন হতেই হবে।

বিকেলে হেডমাস্টার এল। পদমর্যাদায় যাই হোক বয়সে সে একালের। খববের কাগজ পড়ে, ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখে, একালের কাণ্ডকারখানায তার যথেষ্ট আকর্ষণ আছে।

'যাচ্ছেন তো? নিশ্চয়ই যাবেন, এমন মহৎ উদ্দেশ্য যার পিছনে আছে'।

'তাহলে যাব'।

'আর এই নিন চল্লিশটা টাকা। আপনি চলে আসবার পর এস.ডি.ও অফিস থেকে আপনার পথখরচের জন্য পাঠিয়েছে। ফার্স্ট ক্লাসে যাওয়া-আসা, সদরে দু-দিন থাকা'।

হেডমাস্টার অভিনন্দন জানিয়ে চলে গেল।

বিকেলে সে ছোটছেলের হাত ধরে বেড়াতে বেরুল। বহুদিনের একটা কামনা পূর্ণ হল তার। যে-সংকোচটা বাড়তে-বাড়তে ছোটছেলেটিকে প্রকাশ্যে স্বীকার করাব সাহসটাকেও শুকিয়ে দিচ্ছিল সেটা যেন আজ একেবারেই নেই। সুধীরলালের ভাই এই পরিচযই দেবে সে, তার ছোটছেলেটি সম্বন্ধে কেউ যদি রসিকতা ক'রে প্রশ্ন করে।

রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে—বিনোদলাল ভাবল স্ত্রীকে বলাই সঙ্গত হতো। তাবও তো ছেলে। তিক্ততা থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে বেশি কথা না-বলা অভ্যাস কবেছে সে। তার ফলে এমন খবরটাও সে দিতে পারল না। দারিদ্র্য-জরাজীর্ণ স্ত্রীর জন্যে কিছুটা কারুণ্য সে অনুভব করল।

সাড়ে নটায় পৌঁছানোর বদলে প্রায় বারোটায় সদরের স্টেশনে নামল বিনোদলাল। কারণ একটি স্পেশ্যাল ট্রেনকে পথ করে দেওয়ার জন্যে তাদের গাড়িটাকে সাইডিং-এ ফেলে রাখা হয়েছিল। কিন্তু উৎসব, তার জন্যে কি উৎসবের বিলম্ব হয়ে যাচ্ছি না? কুণ্ঠিত হল সে।

স্টেশনের কাছেই গেট বাঁধা হয়েছে। এই তোরণ যে-উৎসবের জন্যে তার মর্মস্থলে তাব নিজের ছেলে এই অনুভব হল তার। তোরণটির প্রতি স্নেহবোধ করল সে, কাছে দাঁড়িয়ে সেটাকে স্পর্শ করার লোভ হল। কিন্তু তখন যাত্রীরা দুদ্দাড় করে বেরিয়ে আসছে, সেই স্রোতে তাকেও চলতে হল। গেটের বাইরে সে তার সহযাত্রীকে আবার দেখতে পেল।

'এই যে, মশাই'।

'আর বলেন কেন'।

বিনোদলাল তার রিকশায় সহযাত্রীকে টেনে তোলার মতো কবে উঠিয়ে নিল।

সহযাত্রীর নাম শচীন সান্ডেল, পথে আলাপ। মাঝবয়সী ভদ্রলোক, পরনে ধোপদুরস্ত খাদি। চোখে-মুখে কথা, কথায়-কথায় রসিকতা। জানে না এমন বিষয় নেই। অত্যন্ত নামী রাজনৈতিক নেতারাও তাব 'দাদা'। কিন্তু যেন অত্যন্ত সরল। নিজে সে অকপটে ছোট। বলেছে—উকিলের মুহুরির কর্ম করা হয়, মশাই, টাউটগিরি পেশা।

পথে আরো গেট ছিল। গাছে-গাছে লটকানো জাতীয় পতাকার মালা। বিনোদলালের প্রাণ একটি

বেদনাকেন্দ্রিক পুলকে পূর্ণ হয়ে উঠল।

শচীন সান্ডেল বলল, 'আপনি তাহলে শহীদদের দিকেই যাবেন'?

'আপনিও চলুন না'।

'তা চলুন। ওরা তো এককালে আমার আপনই ছিল'।

বিনোদলালের কৌতূহল হল। 'ওদের চিনতেন বুঝি'?

শচীন সান্ডেল বাঁ হাতের আস্তিন গুটিয়ে একটা ক্ষতচিহ্ন দেখাল।

'ওদের দুজন অন্তত আমার ফুটবল টিমে ছিল। আজ সুধীরলাল কডুয়ের নাম সকলের মুখেই শুনবেন, এক এম.এল.এ নাকি বলছে—ওর ভাইপো। সরকারি ইস্তাহারে নাম বেরিয়েছে কিনা। কিন্তু তখন তার মৃতদেহ শনাক্ত করতে কেউই আত্মপ্রকাশ করেনি'।

'আপনি সুধীরলালকে চিনতেন'?

'তারই জন্যে সবচাইতে বেশি ভাবনা ছিল। সে মরতে ভয় পেত। তাকে বোঝাতে হতো রাইফেলের গুলিতে শরীর এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেলে বেদনা অনুভবের ক্ষমতা থাকে না, যা থাকে ফুটবল খেলায় সাধারণ চোট লাগলে যেমন হয় তার চাইতে বেশি নয়'।

বিনোদলাল রিকশার হাতল চেপে ধরল।

শচীন সান্ডেল বলল, 'তবে কেন উকিলের মুহুরি? দেশের জন্যে স্কুল ছেড়েছিলাম মশাই, পাশ দেওয়া হয়নি। আর—চার অধ্যায় পড়েছেন? হ্যাঁ, তাই বেয়াল্লিশের পরে পাঁচ বছর লুকিয়ে বেড়াতে হয়েছে। সাতদিন এক এলা জুটেছিল ; যেমন কুৎসিত তেমনি মুখরা, কিন্তু শরীর ছিল'।

সামনে মর্মরবেদির উপরে তেরপলে ঢাকা হাউই কামানের মতো কী-একটা দেখা যাচ্ছে লোকারণ্যের মাথার উপর দিয়ে। বেদির ওপাশে রেশমি রিবন ও জাতীয় পতাকায় সাজানো সুদৃশ্য এক মণ্ডপে অনেক টেবিল চেয়ারে অনেক সুসজ্জিত মানুষ।

শচীন সান্ডেল বলল, 'যে রকম ভিড় দেখছি, পকেট মারা না-যায়'।

'এমন সভায় কে-আব পকেট মারতে আসবে'? বিনোদলাল রুমালে বাঁধা বুকপকেটে রাখা টাকা কয়েকটি হাত বুলিয়ে অনুভব করল।

রিকশা থেকে নেমে বিনোদলাল ভাড়া দিতে গেল।

'আরে না-না আপনি কেন'? শচীন সান্ডেল নিজে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বন্ধুর ভঙ্গিতে বিনোদলালের বুকে একটা হালকা চাপড় দিয়ে তাকে উৎসাহিত করল ; তারপর তার হাত ধরে ভিড়ের মধ্যে টেনে নিয়ে গেল।

বেদির উপরে কামানের মতো ঐ যে কিছু দেখা যাচ্ছে আজকের যা কিছু ওখানেই হবে। তেরপলটার চারিদিকে রঙিন দড়ি বাঁধা। হয়তো কোনো যন্ত্রকৌশলে ওই দড়িতে টান পড়বে আর তেরপলটা ধীরে-ধীরে গুটিয়ে গিয়ে শহিদদের অনাবৃত করবে।

বিনোদলালের দৃষ্টি মঞ্চের দিকে আকৃষ্ট করে শচীন সান্ডেল তার ঝকঝকে ভাষায় মঞ্চোপবিষ্টদের পরিচয় দিয়ে চলল, 'ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশসাহেব, জেলা-জজ, কংগ্রেসের জেলা প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, উপমন্ত্রী'। তারই মধ্যে কাত হয়ে, কনুই দিয়ে ভিড় গুঁতিয়ে শচীন ক্রমশ এগিয়েও যাচ্ছে। বিনোদলাল তার মতো পারছে না। দু-এক সারি মানুষের ব্যবধান ইতিমধ্যে হয়েছে তার শচীনের সঙ্গে।

এমন সময়ে বিনোদলালের মনে পড়ল সে আজকের এই উৎসবে বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত। সে চাপা গলায় শচীনকে বলল, 'মঞ্চে যাবার রাস্তা কোনদিকে? যাব'?

'তা যান'—শচীন মুখ না-ঘুরিয়েই বলল।

বিনোদলাল ঘুরে-ঘুরে মঞ্চের প্রবেশপথের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল। লাল কাঁকড়ের উপরে ম্যাটিং পাতা, পাতাবাহারের টবে সাজানো, পুলিশের বর্ডার দেওয়া সেই পথে সারি-সারি মোটরগাড়ি পার্ক করা।

এখনও দু'একজন করে আসছে। শেরোয়ানি-আচকান পরিহিতরা মঞ্চে চলে যাচ্ছে মোটর থেকে নেমে। একজন পুলিশ বিনোদলালকে দেখতে পেয়ে বলল, 'সরে যান, মশাই'।

বিনোদলালের মনে পড়ল, এবং সে হতাশ হল—নিমন্ত্রণপত্রটা সে বাড়িতে রেখে এসেছে। কাউকে কিছু না-বলে চলে এসেছে সে, তার উদ্দেশ্য ছিল চিঠিটা পড়ে বাড়ির লোকরা তার গতিবিধি আন্দাজ করতে পারবে। পুলিশের সঙ্গে নিরর্থক তর্ক না-করে সে ভিড়ের মধ্যে পিছিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এ-জায়গা থেকে বেদি অনেক দূরে। একটু উঁচু জায়গায় দাঁড়াতে পারলে হতো।

উঁচু জায়গায় খোঁজ করতে গিয়ে বিনোদলাল একটা ক্রেন দেখতে পেল। ক্রেনের মঞ্চের উপরে অনেক লোক উঠেছে। এই বয়সে সে কি ওখানে উঠতে পারবে? কিন্তু একজন এক অহেতুক সমবেদনায় হাত বাড়িয়ে তাকে উঠতে সাহায্য করল।

মঞ্চের সম্মুখভাগে তিন-চারখানা চেয়ার খালি আছে—সেগুলি পূর্ণ হলেই সভার কাজ আরম্ভ হবে। বিনোদ এদিক-ওদিকে চেয়ে দেখল। ক্রেনটার গায়ে ইংরেজিতে লেখা আছে 'ফাইভ ইয়ার প্ল্যান'। আরো কী লেখা আছে যা পড়া গেল না, দর্শকরা ঢেকে দাঁড়িয়েছে। মাথার উপরে মোটা লোহার শিকলে প্রকাণ্ড কপিকল। যদি হঠাৎ ওটা নেমে আসে? কল দিয়ে আটকানো আছে, কিন্তু তা বিকল হতে কতক্ষণ। তাছাড়া যারা উপরে উঠছে তারা খুটখাট করে যন্ত্রপাতির গায়ে হাতও দিচ্ছে।

জনতা হঠাৎ 'ঝায়' বলে চেঁচিয়ে উঠল। 'এসে গেছে', বলে হুল্লোড় তুলল কয়েকজন।

'কে, মশায়, কে'?

'হবে কেউ মন্ত্রি-ফন্ত্রি'।

ব্যান্ডে বিলেতি কায়দায় জাতীয় সঙ্গীত বাজছে। মঞ্চে মাত্র একখানা চেয়ার খালি আছে যেন কোনো নিমন্ত্রিত যে মঞ্চে যেতে পারেনি তার অপেক্ষায়। ব্যান্ড থামলে একজন বক্তা উঠে দাঁড়াল। সেকালের বিপ্লবীদের কর্মপন্থাকে অবৈপ্লবিক বলে একালের কার্যক্রমকে একমাত্র বিপ্লব বলে শুরু করে বেয়াল্লিশেব অহিংস নাশকতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলল, অবশেষে সে একটা বোতাম টিপল। শহিদমূর্তির তেরপলের ঢাকনা রঙিন দড়ির টানে-টানে গুটিয়ে যেতে লাগল। বিনোদলালের যেন দম বন্ধ হয়ে এল। কী দেখব কী দেখব?

পলকে অনেক চিন্তা করল সে। শচীন সান্ডেল বলেছে—সুধীর মৃত্যুকে ভয় পেত। রাইফেলের গুলিতে হাড় ভেঙে গেলে বোধশক্তি নাকি থাকে না। ফুটবল খেলার মাঠে চোট লাগলে কেমন লাগে? বিনোদলালের কোনো ধারণা নেই। সে এত শান্ত এবং ভালো ছাত্র ছিল যে খেলার মাঠে যেত না। বি.এ পাশ করে সে এম.এ পড়ল না কারণ তাহলে ছোটভাইয়ের পড়া হতো না। সদর আদালতে পেশকার-নাজিরের চাকরি সে নেয়নি, কারণ সেসব চাকরির সঙ্গে অসাধুতার গল্প জড়ানো থাকে। ভাইদের চোখের সম্মুখে সাধুতা এবং বিদ্যার গৌরবের আদর্শ রাখবার জন্যে সে স্কুলমাস্টার হয়ে রইল।

ভাস্করের কলাকৌশলে সেই মৃত্যুর ঘটনা নাটকীয়ভাবে পুনর্ঘটিত হয়েছে। বিনোদলাল দূরেই ছিল কিন্তু বাবার চোখ ছেলেকে চিনতে পারল। সুধীবলাল মৃত্যু-আঘাত পেয়েছে। দুঃসহ বেদনায় তার মুখ বিকৃত, তার অবশ হাত দুখানা অসহায়ের মতো ঝুলছে, অশক্ত হাঁটু ন্যাকড়ার মতো লুটিয়ে পড়েছে, তার এক সঙ্গী তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে।

বিনোদলালের দমবন্ধ মন অন্তঃস্থিত চাপে ফেটে গেল, 'সুধীর সুধীর। বাবারে, আমাকে কেন নিলি না সঙ্গে। ও-হো-হো'।

পাশেব একজন লোক ধমকে উঠল, 'কী ফ্যাক ফ্যাক করছেন'।

ধমক খেয়ে বিনোদলাল থেমে গেল, দৃশ্যমান চবাচর আচ্ছন্ন করে তার চোখে জল নামল। সেই অন্ধ অবস্থায় সে শুনতে পেল মাইকের ঘোষণা : 'শহিদ সুধীরলালের পিতা বিনোদলাল কড়ুই অনিবার্য কারণে আসতে না-পারায় তার খুল্লতাত গোবিন্দলাল কড়ুই শহিদতর্পণের ভাষণ দেবেন'।

বিনোদলাল চোখ তুলে তাকাল। গোবিন্দলাল? হ্যাঁ গোবিন্দলালই তো। তারই ছোটভাই গোবিন্দলাল বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়েছে। ঝকঝকে শেরোয়ানি-আচকানে তাকে চেনা কঠিন। তাহলেও ভাইয়ের চোখ তো বটে। ভ্রাতৃগর্বে বিনোদলালের বুক ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল। হ্যাঁ, আজ সে বলতে পারে অন্তত একটিকে সে মানুষের মতো মানুষ করতে পেরেছে।

মন একটু স্থির হলে গোবিন্দলালের কথাগুলো বিনোদলাল বুঝতে পারল। গোবিন্দলাল বলছে, 'সুধীর সেই প্রকৃতির লোক ছিল যারা বেনির সঙ্গে মাথা কেটে দিতে পারে'।

বিনোদলাল বিড়বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ কবিতাটা আমিই পড়িয়েছিলাম, গোবিন্দলালের এক পরীক্ষার আগে তাকে পাশে বসিয়ে। সুধীরলালকেও পড়িয়েছিলাম'।

সুধীর...। সেই মৃত্যু-অবশ অসহায় সুধীর। 'সুধীর, সুধীর'—ফোঁপাতে লাগল বিনোদলাল। তার একবার একটা ইচ্ছা হল ছুটে গিয়ে সুধীরলালকে কুড়িয়ে আনতে। আর-একবার মনে হল সুধীর আমি তোমার উপযুক্ত পিতা নই। সারা জীবন শুধু বোকা-আদর্শকে আঁকড়ে রইলাম।

ক্রেনটা যেন ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠল। বিনোদলালের মনে হল ক্রেনের আকাশছোঁয়া দাঁড়া লোহার শিকল ও কপিকল-সমেত নেমে আসছে। পালাচ্ছে, পালাচ্ছে। পলকের মধ্যে তার মনে হল এতদিনে এবার সে একটা-কিছু করতে পারবে। সকলে পালালেও যে ছেলেটি এখনও বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে তাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিতে গিয়ে সে নিজেই ফাইভ ইয়ার প্ল্যানের ক্রেনটার নিচে চাপা পড়ে যাবে। কেউই তাকে চিনবে না, খবরের কাগজে বেরুবে 'অজ্ঞাতনামা পুরুষের আত্মাহুতি'। তারপরে গোবিন্দলাল কাগজে ছাপানো ফটো দেখে যদি এখানেই আর-একটা বেদি করে দেয়! তাহলে সে মৃত্যু-অবশ সুধীরলালের চিরকালের সঙ্গী হতে পারে।

পালাক আর না-পালাক লোকগুলো সত্যি চলে যাচ্ছে, এবং ভিড় থেকে আগে বেরুনোর জন্যে ছুটোছুটিও করছে। বিনোদলাল চেয়ে দেখল সে ক্রেনেব উপরে একাই দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকের মঞ্চও খালি হয়ে গেছে, কাবা এসে টেবিল চেয়ার সরাচ্ছে।

তখন বেলা দুটো বাজে। জনতা মানসিক উত্তেজনায় চৈত্রের রৌদ্র ভুলে ছিল, বিনোদলালও অনুভব করেনি। কিন্তু ক্রেন থেকে নেমে সে অপরিসীম ক্লান্তি ও পিপাসা বোধ করল।

পিপাসা! অমন অবস্থায় সুধীরলালের না-জানি কী পিপাসাই পেয়েছিল।

সে স্থির করল কোনো দোকান থেকে একটু জল খেয়ে কিছু কেনাকাটা করে সে স্টেশনে যাবে। কিন্তু দোকানে ঢোকার আগে চোখ-মুখ মোছা দরকার।

বিনোদলালকে থামতে হল। বুকপকেটে টাকা-বাঁধা রুমালটা নেই। তাহলে সে কি (এর আগে কখনও) চোখ মুছতে রুমাল বার করেছিল? এ-পকেট, সে-পকেট, কোমর, সব খুঁজল সে। ক্রেনের কাছে সে ছুটে গেল। এদিক-ওদিক, উপরে-নিচে। হায়-হায়। শচীন সান্ডেল পকেটমারের কথা বলেছিল। হায়-হায়। শচীনই ঠাট্টা করে সরায়নি তো?

আদালত খুব দূরে নয়। বিনোদলাল আদালতে গিয়ে শচীন সান্ডেলের খোঁজ করল। সে তো উকিলের মুহুরি। একজন বলল, 'শচীন সান্ডেল, সে তো জেলা জজের নাম'। আর-একজন বলল, 'এক শচীন সান্ডেল আছে, বাজারে মাড়োয়াবির দোকানে'। একজন দোকানদার বলল, 'শচীন সান্ডেল গণ্ডাপাঁচেক নেই তো কি বলেছি। আর আপনিও কেমন মশাই, এত বড় শহরে কোন পাড়ায় থাকে তা না-জেনে লোক খুঁজতে বেরিয়েছেন'।

টাকা না-পেলে এই অজানা শহরে সে কী করবে? বাড়ি ফিরবে কী করে? এখানে আসবার জন্যে সে নতুন জামাকাপড় কিনেছিল। আর সেগুলি পরতে সে লজ্জিত হয়ে পড়েছিল, তার চোখের সম্মুখে ভেসে উঠেছিল তার ছেঁড়া-ছেঁড়া ফ্রকপরা চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়েটির আকৃতি। হঠাৎ পাওয়া এই টাকায় সে বাড়ির সকলের জন্যেই কিছু-কিছু উপহার কিনে নিয়ে যাবে ভেবেছিল। সকলের মুখেই একটু

হাসি দেখবে সে, একটু পারস্পরিক প্রীতি অনুভব করবে—এই আশা করেছিল।

চৈত্রের খাড়া রোদে সে মাড়োয়ারি দোকানে-দোকানে শচীন সান্ডেলের খোঁজ করে বেড়িয়েছে। স্বভাবতই তার গতি অত্যন্ত দ্রুত হয়েছিল। সারা দুপুর, বিকেল পর্যন্ত। তার এক পায়ের পুরনো স্যান্ডেল খুলে গিয়ে পায়ের পিছনে ও আগে ঘসড়ে-ঘসড়ে চলছে। চোখ দুটি লাল। মুখের ভিতরে থুথু আঠার মতো জড়িয়ে-জড়িয়ে যাচ্ছে, ঠোঁটের কোণে সাদা-সাদা দাগের মতো শুকনো লালা।

ইতিমধ্যে একদল ছেলেকে চায়ের দোকানে বসে থাকতে দেখে সে তাদের মধ্যে সুধীরকে খুঁজতে গিয়েছিল। ছেলেদের একজন সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছিল, 'এই বুড়ো বিড়ি খাবি'?

তাদের হাত এড়ানোর জন্যে সে এ গলি-ও গলি করে শহরের গলিপথে এমন করে জড়িয়ে পড়ল যে পথের কোনো ঠিকানাই তার রইল না। একবার সে ভাবল : দ্যাখো দেখি, ওদের মধ্যে সুধীর কী করে থাকবে।

বিকেলের দিকে সে একটা গাছতলায় বসে পড়েছিল। সে কি এখন গোবিন্দলালের বাড়িতে ফিরে যাবে? গোবিন্দ? ও, হ্যাঁ গোবিন্দলাল। তার অনুভব হল সে ভাশুর হয়ে সে-বাড়িতে যেতে পারে না। আ, ছি-ছি। সে বাড়িতে ভাইবউ আছে যে।

বিনোদলাল উঠে দাঁড়িয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলতে শুরু করল। দূরের স্টেশনের সিগন্যালেব আলো যেমন অন্ধকারের বুকে মিটমিট করে তেমনি তার মনে পডল তাব চৌদ্দ-পনেরো বছবেব মেয়েটির শাড়ি নেই। ছোটছেলেটির মতো এ-মেয়েটিকেও একসময়ে সে আদর করত।

গোবিন্দলাল বলেছিল—বিনোদলাল অনিবার্য কারণে উপস্থিত হতে পারেনি। তাহলে একথাটাই খবরের কাগজে ছাপা হবে। তাহলে? লোকে বলবে সরকার থেকে পাওয়া টাকাটা মাববার জন্যেই সে গা-ঢাকা দিয়েছে। বিনোদলালের কপালে বিনবিন করে ঘাম ফুটে উঠল। টাকাটা পুরোপুরি ফিরিয়ে দিতে হবে নতুবা কেউ তাকে ছাড়বে না। এ পর্যন্ত কে তাকে কবে ছেড়েছে?

ঝকঝক শব্দে, ঝকঝকে আলোয়, বারোমিশালি কোলাহলের মধ্যে দু'একটি চড়া গলায় বলা কথায় খেয়াল করে বিনোদলাল দেখলে সে স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি একটা থেমে আছে। লোকজন ওঠা-নামা করছে।

ও, বাড়িতে যেতে হবে।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে বিনোদলালের মনে হল সে টিকিট করেনি। গাড়ির হাতল ছেড়ে নেমে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে রেল কর্মচারীকে খুঁজতে লাগল।

গার্ড হুইসিল দিয়ে সবুজ আলো দেখাতে-দেখাতে এগিয়ে এল। বিনোদলাল তার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'টিকিট . . .

'বেশ তো রাত চারটের গাড়িতে এসো টিকিট করে'।

বিনোদলাল প্রাণপণ বলে বলল, 'আমি শহিদ, আমি শহিদ' . . .

গার্ড হেসে পাশে দাঁড়ানো কনেস্টেবলের দিকে তাকাল। সে বিনোদলালকে ডেকে নিল—'এই, ইধর আও'! গাড়ি ছেড়ে দিল।

বিনোদলালের বলার ইচ্ছা ছিল, আমি শহিদ সুধীরলালের বাবা। কিন্তু কিছুতেই কেন যেন নামটাই তার মনে পড়ল না।

তৃতীয় শিক্ষক বিনোদলাল বিনা-টিকিটে রেলে চড়তে পারে না। কী করে পারে, বলুন? সে সেই অজ্ঞাতজনের অরণ্যে একটা বেঞ্চের একটি কোনায় বসে পড়ল রাত চারটের গাড়ির জন্যে। কিন্তু কোনো গাড়ির জন্য টিকিট করার টাকা তার কাছে নেই, এটা সে মনে করতেই পারল না।

স্টেশনের নিচেই মোটর-চলার রাস্তা। সে-রাস্তায় একটা বাস যাচ্ছে। ফুলে-পাতায় সাজানো মহাত্মা-

সীতানাথ একাডেমির ছাত্র এবং শিক্ষকরা বাসে করে সদরে এসেছিল উৎসবে যোগ দিতে। করিৎকর্মা আধুনিক হেডমাস্টারের সুযোগ্য নেতৃত্বে উৎসবের শেষে তারা সীতানাথ একাডেমি ও শহিদ সুধীরলালের জয়কারে পথ মুখরিত করে ফিরে যাচ্ছে।

এ খবর অবশ্য বিনোদলাল জানে না।

সাগ্নিকা

সীতার পাশে উর্মিলা নয়, বড়বউয়ের পাশে ছোটবউ। একবছর আগে এ-সংসারে এসে বড়বউ ছোটকে ঘরে তুলেছিল। এ-রকম ধারণা হতে পারে বড়বউ সম্ভবত বয়সের দিকেও, যেমন যৌথ পরিবারের পদমর্যাদার দিকে, অনেকটা বড়। তা নয়। পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দিলে এটা আরো স্পষ্ট হয়। মনে হবে দু'রঙের বটে, কিন্তু জাতে এক, সদ্য ফুটে উঠেছে। একই দামের, একই জমি ও নকশার, শুধু যা রঙে তফাত—এমন সব শাড়ি পরে এরা।

কিন্তু অনেক মিলের মধ্যে তফাত আছে : এখন সেটা ভালো করে বোঝা যাচ্ছে। ধোপা কাপড় এনেছে, পরনের ময়লাগুলো তাকে দিয়ে দু'বউ শাড়ি পাল্টে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে ঠিক একই কথা বলতে, অর্থাৎ ভাঁটি দিও না মিস্ত্রিবউ রং জ্বলে যাবে। রঙেব কথায় চোখ তুলে তাকালে দেখা যাবে : দু'খানা শান্তিপুরী পরনে তাদের, ছোটবউয়ের হালকা নীল জমিতে সাদাব চেক, বড়বউয়ের জাম-রঙের গায়ে সবুজ ডুরি। দু'জনেরই ব্লাউজ গলার কাছে কেটে নামানো চোখে পড়ার মতো অনেকটা, বুক ও গলার অনাবৃত অংশে উঁচুদামে পালিশ করা সরু সোনার হার। বডবউয়ের বেণীটা মাথার পেছন থেকে উঠে এসে একটা মালার মতো সমস্ত মাথাটাকে বেষ্টন কবেছে, আর ছোটবউয়েব এলোখোপার মস্ত ভারটা যেন বাঁধন খুলে ঠিক কাঁধের উপর নেমে এসেছে। পাঁচ-ছ'বছব আগে এসব লক্ষ্য করা যায়নি। স্বাস্থ্যবতী ছিল দু'জনেই, ষোল-সতেরোর কৃশতা দেহে লেগে থাকা সত্ত্বেও। তারপরে দু'জনেই বেড়েছে। বড়বউ যেন বর্ধিত হয়েছে—ষোলো বছরের এনলার্জ করা ছবি যেন, তবু এখনও তেমনি কিশোরী। ছোটবউয়ের চেহারা বদলে গেছে, আগে তার ছিল পালিশ করা চেহারা, এখন একটু-বা রুক্ষ, হয়তো-বা প্রসাধনের ফলেই। দৃষ্টি বদলেছে, অভিজ্ঞতার ছাপ লেগেছে হাসিতে। অদ্ভুত শোনালেও সত্য—সে পীন বক্ষে ও গুরু নিতম্বে তন্বী।

ধোপা গেলে বড়বউ বলল, 'কর্তাদের আসার সময হল। লুচির মযদাটা মেখে ফেল, ময়ী'।

ছোটবউ রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল কী-একটা কাজে, ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এখন কেউ আসবেন না, নিমন্ত্রণ আছে'।

'ও মা, তাইতো। কী-যে হয়েছে আমার মন! তুই যা ছিলি, ভাই'।

'এসো। ততক্ষণ দু'জনের জন্য চা করি। তুমি বরং কর্তা সেজে বোসো, আমি গুছিয়ে দিই'।

'কেন, তোর বুঝি আসলে তৃপ্তি নেই'?

দুই বউই একসঙ্গে হেসে উঠল।

একটুপরে ছোটবউ বলল, 'শাড়িটা পালটে এসো তো দাদা, রান্নাঘবের জলকাদার ছাপ নিয়ে উঠেছ; এখনই ঠাকুর এসে '

বড়বউ একটু যেন রাগ করেই বলল, 'তা বলুক, এ কী-রকম ব্যাভার, বল দেখি! উঠতে-বসতে খুঁত ধরলে মানুষ বাঁচে? কখন কী পরি তার দিকেই-বা অত নজর কেন? হলই-বা একটু ময়লা। তাতে যদি ভালবাসা কমে, যাক ক'মে'।

ময়ী বলল (ছোটবউয়ের নাম বিয়ের আগে কী ছিল জানি না, এখন রূপময়ী, সংক্ষেপে ময়ী। বড়বউয়ের নাম বিয়ের আগে এবং পরে সুভদ্রা), 'পুরুষের ভালোবাসার কথা আর বোলো না, ধুলোর মতো গলা শুকিয়ে আছে'।

'সত্যি তাই'।

'তার চাইতে যদি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হতো, কত সুখী হতাম দু'জনে'।

ময়ী রান্নাঘরের টিপয়ের উপরে দু'কাপ কফি রাখল, তার পাশে ঝকঝকে কাঁচকড়ার পিরিচে বাদামি করে ভাজা হালকা দু'খানি টোস্ট।

সুভদ্রা সত্যিই ভাবতে বসেছিল, এবার হেসে উঠল, বলল, 'ও পোড়ামুখী, ঠাট্টা হচ্ছে'!

কিন্তু কফি শেষ করেই সুভদ্রা উঠে গেল শাড়ি পালটাতে।

কলেজে ছাত্র পড়িয়ে ফিরে মাস্টারির ভাবটাই থাকে মহেন্দ্রের, গম্ভীরভাবে কথা বলে, গম্ভীর সুরে উপদেশ দেয়। হয়তো এসে বলবে : বড়বউ, (বডবউই সে বলে, মিষ্টি কোনো নাম ধরে ডাকে না) গানটা বোধ হয় আজও তোলা হয়নি? তারপরেই বলবে, হলুদ নাকি কাপড়ে? তাহলে তো আমার জামাতেও চক লেগে থাকা উচিত ছিল। ঠাকুরপোও বলেন, বোধ হয় সব পুরুষই বলে। কপালের সিঁদুর নাকে লাগায়, ঠাকুরপো বলেছিলেন—সুবচনী ঠাকরুন। কিন্তু তাঁর বলবার ধরনই আলাদা।

মহেন্দ্র ক্লাস শেষ করে বাড়ি আসবার সময়ে কলেজের গ্রন্থাগারে গিয়েছিল—বইয়ের জন্যই নয়। তাদের বিশ্রামঘর থেকে বেরুবার পথটিতে কমনরুম ও লাইব্রেরির দরজা। একটার দরজা তাকে পার হতেই হতো। লাইব্রেরির কাউন্টারে দাঁড়িয়ে কতগুলো ছেলেমেয়ে বই নিচ্ছে দেখতে পেল মহেন্দ্র। সহকারী গ্রন্থাগারিক তাকে দেখে যথোচিত সম্মান জানাল। ছাত্রছাত্রীরা অনেকে ফিরে চাইল। ঠিক সেই সময়ে এই অনুভবটা হল তার : অধ্যাপক যখন সে ছাত্রছাত্রীদের চাইতে তার বেশি পড়া দরকার ; অন্তত সে যে বেশি পড়ে এ-ধারণা তার প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধার গঠনে থাকা উচিত। এগিয়ে গিয়ে, সে অবশ্যই অন্যান্য অধ্যাপকদের মতো পুর্জি পাঠিয়ে বই নিতে পারত, সে ছাত্রদের সারিতে দাঁড়িয়ে বলল, 'দিন না-হয়, একখানা বই'।

গ্রন্থাগারিকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মহেন্দ্রর মনে হল, সে অঙ্কের অধ্যাপক, অঙ্কের অধ্যাপকেরা শুধু অঙ্কই জানে আর-কিছু বোঝে না, এ-ধারণাটা, এই অর্ধ-অপমানকর ধারণাটা যেন ছাত্রদের চোখেমুখে ফুটে উঠেছে। তাই সে বলল, 'সিবোলভের বায়োলজির একখানা আমায় পড়তে দেবেন বলেছিলেন'।

বইখানি হাতে নিয়ে কলকাতার রঙহীন রোদে ভরা পথে চলতে-চলতে সহসা একটা চিন্তা প্রায় নাটকীয় আতিশয্য নিয়ে স্ফুরিত হয়ে উঠল তার মনে · ছাত্ররা কী মনে করবে এটা বড় কথা নয়। এতগুলো ছাত্র এসে দাঁড়িয়েছে, তাদের অভাব পূরণ করার মতো জ্ঞানের সঞ্চয় থাকা উচিত বইকি অধ্যাপকদের। আরো পড়া উচিত। আরো কিছু, কিছু কেন—সত্যিকারের জ্ঞানী হওয়া উচিত।

বাঁক নিয়ে অধ্যাপক মহেন্দ্র দেখল সুধীর আর ক্ষমা যাচ্ছে। সুধীর দু'বছর আগে দর্শনশাস্ত্রে কোনোরকমে প্রথম সারিতে প্রথম হয়ে তার কলেজেই চাকরি পেয়েছে। ক্ষমা পড়ছে ইকোনমিক্সে। কলকাতার ছাত্রমহলে বিশ্বাস এ-বছরের পরীক্ষায় সেই সর্বশ্রেষ্ঠ হবে। এমনকী অত্যাশ্চর্য কিছু-একটা ঘটতে পারে।

অথচ এমন কথা শোনা যায় সুধীর ও ক্ষমা প্রকাশ্যে প্রেম করছে। ক্ষমার মতো মেয়েকে তার বাবা-মা কী-বা বলতে পারে? বেলা দু'টোর রোদ্দুরে লম্বা-লম্বা পা ফেলে তারা ফুটপাত বেয়ে চলেছে। এই অশ্রদ্ধেয় কথাটা এখানে বলতে হবে, ক্ষমার চলন দেখে কোনো এক চিত্রনায়িকার প্রাণপূর্ণ উরুদেশের কথা মনে হল মহেন্দ্রর। কেন হয়?

তার ভালো লাগত যদি এরা দু'জনে আলাপ করত তাকে নিয়ে। মহেন্দ্র খুব দীন মনোবৃত্তির লোক নয় কিন্তু এরকম দু'জন কর্তৃক উল্লিখিত হতে ভালো লাগে বইকি। যদি এরা আলাপ করত ইকোনমিক্স কিংবা দর্শনের কোনো দুরূহ অঙ্গ নিয়ে তাহলেও মহেন্দ্র খুশি হতো।

সে শুনল ক্ষমা বলছে সাহিত্যের কথা। মাঝখান থেকে শুনে বিষয়বস্তু বোঝা গেল না। সুধীর অনেক ভেবে অল্প কথায় বলল, 'ইন্দ্রিয়াতীত অনুভবটা কি বড় নয়'?

'তুমি যখন বলছ, বড় তাহলে। কিন্তু ধরা দিয়েও দেব না, ধরা দেবার জন্য আঁকাবাঁকা পথে নিয়ে যাব কাশ্মীরে, স্কার্দুতে, কিম্বা হরিদ্বারের গঙ্গাতীরে, জীবনটাকে করে দেব পাটনা আর কুশারীদের গ্রামে আর বৈষ্ণবী-আশ্রমে ছড়ানো কবিতা—এমন মিষ্টি মেয়েটি আমি নই'।

'কী চাও তুমি'?

'আমি হয়তো বলতাম, বিয়ে করি এসো, সংসার পাতি। যে-কোনোরকমের একটা বিয়ে, দু'একটি ছেলে মেয়েকে দুরন্ত করে মানুষ করি'।

মহেন্দ্র লজ্জিত হয়ে উঠেছিল। ট্র্যাম এসে পড়াতে ওরা আচমকা অন্তর্ধান করল।

সুধীর ও ক্ষমা কী আলোচনা করলে তার ভালো লাগবে সে-সম্বন্ধে একটা আন্দাজ সে করেছিল কিন্তু যা সে শুনল সেটা কি আরো ভালো লাগার মতো কিছু?

নিমন্ত্রণের কথা ভুলে বাড়িতে এসে মহেন্দ্র দেখল, শোবার ঘরে তার স্ত্রী টেবলের কাছে দাঁড়িয়ে ফুলের তোড়া গুছিয়ে রাখছে। মহেন্দ্র ঘরে ঢুকে অন্য-অন্য দিনের মতো স্ত্রীর পিছনে গিয়ে দাঁড়াল না।

ফিরে দাঁড়িয়ে চমকে ওঠার সুযোগ না-পেয়েও সেই সুরেই সুভদ্রা বলল, 'ওমা এ কী! আজ না চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল'?

(বলে রাখা ভালো, সুভদ্রা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মহেন্দ্রকে দেখেই এ-ঘরে ঢুকেছিল, আয়নার সামনে একটু দাঁড়িয়েও নিয়েছিল, তারও আগে শাড়ি পালটেছিল)।

'মন ভালো নেই বুঝি'—সুভদ্রা বলল।

সুভদ্রার আবার সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছে। মহেন্দ্রর মনে হয় প্রকৃতপক্ষে যত তার চাইতে বেশি সে এখনই দেখতে পায়। সম্ভাবনার প্রায় কাল্পনিক লক্ষণগুলোতে তার চোখ আটকে গেল। খানিকটা কৌতুক, কিছুটা কৌতূহল, অনেকটা স্নেহাভাস ফুটে উঠল তার চোখে।

সে-দৃষ্টিকে অনুসরণ করে লজ্জিতা সুভদ্রা বলল, 'খাবার নিয়ে আসি'।

মহেন্দ্র লক্ষ্য করল সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে গেল সুভদ্রা। চলার ভঙ্গিতে মাতৃত্বের গাম্ভীর্য ফুটে ওঠেনি।

পথের মহেন্দ্রকে স্থানচ্যুত করে ঘরের মহেন্দ্র ইতিমধ্যে নিজের গোছানো পরিবেশে তৃপ্তি বোধ কবতে শুরু করেছে।

ছোটজায়ের কাছে গিয়ে সুভদ্রা বলল, 'এদিকে তোর ভাসুর এসে পৌঁছেছেন। কী করি বল তো? কী দেয়া যায় খেতে? পেঁপে কেটে দিই, আর সেই নতুন সিরাপটা সরবতে'?

ঘুঁটে ভালো নয়। ধোঁয়ায় চোখ রাঙা হয়ে উঠেছিল ময়ীর। ঝি তখনও আসেনি। চোখ তুলে, জল মুছে সে হাসল।

'ও-রকম করে হাসিস নে'।

'তুমি ওপরে যাও, আমি যাচ্ছি যা নিয়ে যাবার'।

'তা যা ভালো বুঝিস', এ বলে সুভদ্রা আবার তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।

রাত্রিতে বায়োলজির বইখানা লিখবার জন্য সিবোলভের অনেক ঊর্ধ্বতন পুরুষকে অভিসম্পাত দিচ্ছিল মহেন্দ্র। এ-রকম স্বচ্ছ ভাষায় এমন বই কে লিখতে বলেছিল তাকে! বই না-পড়ে ফেরত দেয়ার অভ্যাস নেই বলে আরো অসুবিধা হয়েছে।

সুভদ্রা এসে বাঁচাল। সদ্য একটা স্নিগ্ধ প্রসাধন শেষ করেছে সে। বেণীটা দুলছে পিঠের উপরে। পরনের শাড়ির খসখসে রঙ চোখে লাগতে পারে—সুভদ্রা তাও জানে। একটু হেসে সে সাদা আলোটা পালটে নীল আলোটা জ্বালল। রাত্রির রঙে শুধু শাড়ির আঁশ মিশে গেল না, সুভদ্রাও রাত্রির অংশ হয়ে গেল।

মহেন্দ্র বলল, 'এ-রকম সময়ে সবাই এমন মিষ্টি হয়ে ওঠে, তাই নয়'?

ব্রীড়াবনতা সুভদ্রা মুচকি হেসে চোখে নামাল।

কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ার আগে সাদা আলো জ্বালতে হল সুভদ্রাকে। টেবল থেকে সিগারেট কেস এনে দিতে হল মহেন্দ্রকে। সেই সাদা আলোয় সিগারেট টানতে-টানতে ক্ষমার কথা মনে হল মহেন্দ্রর। কলেজ থেকে ফিরে জামাটা খুলে আলনায় ঝুলোতে গিয়েও তার কথা মনে পড়েছিল তার একটু অন্যভাবে: ইউনিভার্সিটিতে সে আর সুভদ্রা যদি একইসঙ্গে যেত? সে-ও সোনার পদক পেয়েছিল ; বহুদিনের কল্পনা সত্য হয়ে উঠেছিল। সে-সময়ে সুভদ্রাও যদি ডিগ্রির ডিপ্লোমাটাও নিদেন নিত? ভালো লাগত হয়তো অনেকের চোখের উপর দিয়ে সুভদ্রাকে, অবিবাহিতা সুভদ্রাকে, খুব কাছে নিয়ে বেরিয়ে আসতে কনভোকেশন হল থেকে, কতকটা ক্ষমাকে সঙ্গে করে সুধীরের পথ চলার মতো। বর্তমানে যে ক্ষমার কথা তার মনে হল সে ঠিক দিনের আলোয় দেখা ক্ষমার মতো নয়, ঘুমের আগের সিগারেটের মতো নেশায় স্তিমিত, কতকটা সুভদ্রার মতোই।

এ রকম সময়েই ময়ী আলসে থেকে অলস হাতখানা কুড়িয়ে নিয়ে পায়ে-পায়ে ঘরে ফিরে চলল ছায়ামোহময় এক স্বপ্নোত্থিতার মতো। তখন তার মনে হল : উপেন্দ্র সন্ধ্যার খানিকটা পরে বাড়ি ফিরেছিল চায়ের নিমন্ত্রণের পর। দুই বউয়ের জন্য খাবার কিনে এনেছিল সে। প্রায়ই এমন হয় যে উপেন্দ্রর বাড়ি ফেরার সময়ে সুভদ্রা থাকে দরজার কাছে। চোখে স্বাগত ভরে 'ভাই ঠাকুরপো' বলে এগিয়ে গিয়ে অন্তত দৃশ্যত ময়ীকে ছায়ায় ফেলে দেয়।

আজ সে ছিল না।

উপেন্দ্র আবৃত্তির সুরে বলল, 'দ্যাখো কী এনেছি'।

'বউদের জন্য কতগুলো খাবার'।

কবিতা থেকে একেবারে গদ্যে নেমে গেল সুর।

উপেন্দ্র হেসে বলল, 'কী-রকম মানুষ, একেবারে অবাক হও না'।

(বলা বাহুল্য সুভদ্রা আশ্চর্যে গান গেয়ে উঠবার মতো সুরে কথা বলত)।

'বোসো এখানেই। চা দিই একটু'।

নিজের খুব কাছে আসন পেতে দিয়ে ময়ী চা করতে বসেছিল। স্বাভাবিক যা তা করল না সে, অন্তরের সোহাগ ধরা না-দেবার লাস্যে ঢেকে দিল না ; বরং একটু এগিয়েই এল।

এই কথাগুলোই কি ভাবছিল সে? এই ভেবে সে নিজেই অবাক হয়ে গেল। কী আছে এই আটপৌহরে কথাগুলোর মধ্যে ভাবনার মতো।

সে ধীরে-ধীরে নিজের ঘরের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল।

উপেন্দ্রও বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে উঠে বসল। টাইমপিসটায় দেখল রাত তখন সাড়ে এগারোটা পার হচ্ছে। দেখল টেবলে জল ঢাকা আছে—ময়ী তাহলে এসেছিল। একটু জল খেয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখার পর তার নজরে পড়ল একখানা বই পড়ে আছে ময়ীর বসবার চেয়ারটার উপরে। সে তুলে দেখল, রোমাঞ্চ উপন্যাস। সে বইখানা লুকিয়ে রাখল। বই লুকোতে গিয়ে আরো অনেক জিনিস লুকোবার কথা মনে হল তার। ড্রয়ার্স থেকে চিঠি লিখবার কাগজ ও কলম সরালো, তারপর সে ভেবে পেল না আর কোন-কোন জিনিসকে অবলম্বন করে ময়ী চেয়ারটায় আড় হয়ে বসে হাই তুলতে-তুলতে কাজ করতে পারবে। একটি সুশিক্ষিতা মেয়ের যেমন শুচিবায়ু থাকতে পারে, ময়ীর যেন তেমনি কাজের বাতিক। অন্তত উপেন্দ্রর তাই ধারণা।

চটিটা পায়ে দিয়ে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে উপেন্দ্র হাসিমুখে ভাবল : কাজের মধ্যে ঘুমন্ত ময়ীকে বিছানায় তুলে নিয়ে যেতে হয়নি, হয়তো হবে একদিন।

কিন্তু উপেন্দ্র কি লক্ষ্য করেছে ময়ী যখন বসে-বসে উপেন্দ্রর ঘুমের প্রতীক্ষা করতে থাকে ময়ী নিজেও তখন ঘুমে ঢুলে-ঢুলে পড়ে। বিছানার জন্যে তার কর্মক্লান্ত দেহ নুয়ে-নুয়ে আসে। অনেকদিন

ময়ীর এ-কৌশল সার্থক হয়, কোনো-কোনো দিন হয় না। একদিন উপেন্দ্র রাত দুটো অবধি জেগে থেকে ময়ীর কাজের সঙ্গে আড়ি দিয়েছিল। সেদিন যেন ময়ীর পরীক্ষা। যতবার সে ভেবেছে উপেন্দ্র ঘুমিয়েছে এবার সে-ও শোবে, উপেন্দ্র 'তাহলে শোনো ' বলে ছোট আর-একটা গল্প গুছিয়ে নিয়েছে।

কিছুদিন পরে এক দুপুরে ময়ী বড়জায়ের একমাসের শিশুটার দোলনা তদারক করতে-করতে একখানা চিঠি লিখছে এমন সময়ে উপেন্দ্র এল দুপুরের রোদে ঘেমে।

কলম চালাতে-চালাতে ময়ী বলল, 'আড্ডা ভেঙে গেল'?

'গেল'।

কলম চালাতে-চালাতে ময়ী বলল, 'কিছু খেতে দেব'?

'দিয়ো'।

বলা বাহুল্য এমন দুপুরে সব পুরুষই কলম কেড়ে নিতে চায়। কিন্তু উপেন্দ্র কি জানে ময়ী যখন তার বান্ধবীকে চিঠি লেখে তখন সে এমন ছেলেমানুষ হয়ে যায় যে সে-চিঠির প্রতি কেউ উপদ্রব করলে তার চোখ ছলছল করে ওঠে? সে-ময়ীর সঙ্গে দিনরাত্রির অন্যকোনো-ময়ীর তুলনা হয় না। ছেলে-মানুষের মতো কথাও সে লেখে সঙ্গিনীকে।

খস করে বাঁকা একটা টান দিয়ে চিঠির শেষ সূচনা করে প্যাডটা নামিয়ে রাখল ময়ী। আঁচল তুলে উপেন্দ্রর মুখটা মুছে দিল। হয়তো এরপরে একসময়ে সে একটা পুনশ্চ দিয়ে শুরু করে বন্ধুকে লিখবে আবার। নিজে থেকে আঁচল দিয়ে স্বেদ মুছে না-দিলে উপেন্দ্র নিজেই হয়তো তা করত সে-আশঙ্কাও ছিল, তেমনি নিজে থেকে কলম ও প্যাড নামিয়ে না-রাখলে হয়তো উপেন্দ্র কলম কেড়ে নিত। মাঝপথে ঘটনাকে লুফে নিতে হয় ময়ীকে।

ময়ী বলল, 'ভারি ঠাণ্ডা ছেলেটি'।

কোনো বিষয়ে গভীর মতামত জানাবার সুরে উপেন্দ্র বলল, 'নাকটিও বেশ খাঁদা-খাঁদা। ভালো-মানুষের মতোই'।

কিন্তু এত সব গবেষণা তার সম্বন্ধে খাটে না এটা প্রমাণ করার জন্যে তখন-তখনই হাত-পা ছুঁড়ে কেঁদে উঠল শিশুটি। ময়ী তাকে কোলে নিয়ে একটু দোলা দিয়ে মিষ্টি কী-একটা বলে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিল তখনই।

উপেন্দ্র জানত এ রকম অবস্থায় মেয়েরা এক সহজ উপায়ে শিশুকে শান্ত করতে পারে, সে বিষয়ে ময়ীর একান্ত অসহায়তার কথা চিন্তা করে সে বিব্রত হয়ে উঠেছিল। বলল, 'ছেলে ভুলানো শিখলে কোথায়'?

এ-রকম ধরনের কথায় ময়ী উপেন্দ্রর অন্তরটা বুঝবার চেষ্টা করে। উপেন্দ্রর এই প্রশ্নটার চারিদিকে কোথাও কি কোনো খেদ লুকিয়ে আছে? এই সাধারণ কথাটায় কি কোনো ইঙ্গিত আড়াল করছে উপেন্দ্র? ময়ীর ছেলেপুলে হয়নি। কিন্তু ঝলমল করে উঠল দুলজোড়া, ময়ী বলল, 'ওর কাকাকে ভোলাতে-ভোলাতে অভিনয়ে পাকা হয়েছি'।

পুরুষ এমন অবস্থায় যা করে তাই করল সে।

উপেন্দ্র বলল, 'জ্বলে যাচ্ছে? অভিনয় যে'!

'ওতে কি প্রমাণ হয়'? বলল ময়ী। ভাবল সে ঠোঁটের আনন্দের পিছনে শূন্যতাও থাকতে পারে।

নিজেদের কথা দিনের প্রখর আলোর মাঝখানে চিন্তা করার অবসর এমন অখণ্ডভাবে রোজ আসে না। ময়ীর কাছে বসে উপেন্দ্রর পুরনো কথাও মনে হল। সে বললে, 'কিন্তু সবসময়ে অভিনয়ও তুমি করো না'।

'কী রকম'?

'সেবার সাগরসঙ্গমে বেড়াতে গিয়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়ার পর ডেকে শীতের রাত্রিতে একলা পায়চারি

করতাম কিন্তু একজন জেনেও আসত না'।

'সেটাও অভিনয়, তোমার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার জন্যে'। ময়ী বলল হাসিমুখে।

'হয়তো সত্যি। ভালোবাসাটা যেন গল্প সৃষ্টি, কথার পরে কথা বসিয়ে পাঠকদের উপরে প্রভাব মেপে-মেপে আরো কথা বসানো'।

খিলখিল করে হেসে ময়ী বলল, 'লজ্জায় মরে যাই, দ্যাখো দেখি একটা কথাও কি নতুন রাখতে দিয়েছ যে সেটি দিয়ে বোঝাব কত ভালোবাসি'।

'যেন কোন বাদশা-হারেমের অতিথি আমি, কখনও কণ্ঠের মণি, কখনও কোতল হচ্ছি'। কথাটা বলতে গিয়ে নিজেই হেসে ফেলল উপেন্দ্র।

উপেন্দ্র চলে গেলে, দেখলি খোকন, তোর কাকাবাবু কী বললেন—এই জোলো কথাটা থেকে চিন্তার সূত্রপাত হল। অনেকটা সময় ভাবল ময়ী। এক-একটা কথা এমন লেগে যায় প্রাণে। সে যেন বুঝতে চেষ্টা করল, অন্তত তার ইচ্ছা হল বুঝতে এই অভিনয়ের ব্যাপারটা। সে কি অভিনয় করার মতোও করুণাবতী নয়!

কিন্তু কথাটি কি অভিনয়?

কথাটা শুনতে লজ্জা করে, নিজের সম্বন্ধে ভাবতেও। আগ্রহ বাড়ানোর কথা সে হয়তো রসিকতা করে বলেছিল কিন্তু সেটা তো মিথ্যা নয়। ওরা তো আজকাল বলছে : শাড়ি পরা, কানের দুলটি পছন্দ করার মূলে যা, এই যে সে ঘুরে-ফিরে সংসারের কাজ করে যাচ্ছে তার মূলেও সেটাই আছে—উপেন্দ্রকে তার প্রতি আগ্রহশীল করে তোলা। তার প্রতি উপেন্দ্রর সব দিকের দৃষ্টি ধেয়ে আসুক, শুধু এই। যেন উপেন্দ্র পৃথিবীর আর-কোনো মেয়ের কথা চিন্তা করতে না-পারে।

ময়ী উঠে গিয়ে একটা সেলাই নিয়ে এল, সেটাকে জানুর উপরে বিস্তৃত করে নিয়ে দাঁত দিয়ে সুতো কেটে নতুন জায়গায় ফোঁড় তুলল।

সে এবং তার মতো সবাই মিলে যে ষড়যন্ত্র করেছে তার জন্যে ময়ীর লজ্জা বোধ হল। কিন্তু কী করবে সে? এই বোধ হয় স্ত্রীজাতির ভাগ্যলিপি যে সমস্ত জীবনটা নিজের সন্তানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে হয়। সে যদি-বা হাতুড়ি আর গাঁইতি নিয়ে পাহাড়ের চুড়োয় আঘাত করতে যায়, কিম্বা যায় চামড়ার নৌকায় ডুবন্ত সূর্যের সোনা কুড়োতে ঢেউয়ের মাথা থেকে, তাকে ভুলিয়ে আনতে হয় ঘরে, পাতা দিয়ে, রঙিন মাটি দিয়ে অলংকৃত করতে হয় দেহ। সেই তো পুরুষ যাকে সৃষ্টি করেছ, লালিত করেছ; তার প্রতিও সদয় হতে পারো না?

অবশ্য মানুষের সমাজে প্রথা নেই ঠিক নিজের সন্তানটিকে এমন করে ভুলানোর। ছিল এককালে হয়তো, সেই প্রথা সৃষ্টির আগের যুগে।

ময়ীর অসহায় বোধ হল। সামনের দিকে দেয়ালের গায়ে তার দৃষ্টি নিরর্থক হয়ে রইল। কী করবে সে যদি জন্মের থেকেই সে ষড়যন্ত্রী হয়েছে?

পাশের ঘরে রেডিও নানাস্তরের আর্তনাদ করে উঠে একটা গান ধরল। আর্তনাদে ময়ীর তন্ময়তা টুটে গিয়েছিল। সে শুনতে পেলে সুভদ্রা রেডিওর সঙ্গে-সঙ্গে গাইছে। গলা মিলছে না। ময়ী হাসি-হাসি মুখে মুখে মনে-মনে বলল : হবে না, হবে না।

সুভদ্রা একদিন রাগ করে বলেছিল—দ্যাখো তো ব্যাভার! এখন কি ওসব শেখা যায় আর—ওই ফরাসি?

ময়ী হাসতে হাসতে বলেছিল—বড়ঠাকুর শিখতে বলেছেন বুঝি?

—কাল থেকে এক ক্যাথলিক সিস্টার আসবেন। তা আমি বলি, বাপু, আমাকে সভা-সমিতিতে নিয়ে যাওয়াই-বা কেন? আর যাবেই যদি নিয়ে তবে আমি যা তা বললে লজ্জা কী?

—তবে পড়ো কেন?

—কপাল! সুভদ্রা এইটুকুই বলতে পেরেছিল।

উত্তরটা, যেন তা সত্যি উত্তর, ময়ী পেয়েছিল অন্য একদিন উপেন্দ্রর মুখে। উপেন্দ্র বলেছিল—ভগবান মিলিয়েছেন ভালো, যেমন আমরা তেমন ওরা দুটি। বউদি শুনলাম ফরাসি ভাষা শিখেছেন অনেকটা। দাদার টেবলে সেদিন দেখলাম রাশি-রাশি সংস্কৃত বই। আমরা দুটি বেশ হাঁদা-হাঁদা।

ময়ী বলল—দিদি খুব শ্রদ্ধা করেন বড়ঠাকুরকে। এক না-হলে অন্যের চলত না, কিন্তু দেখে নিও দিদি যা শিখেছেন ক্যাথলিক মেমের সাধ্য নেই তার এক লাইন বেশি শেখায়।

—সে তো ভালো নয়, দাদার মনে লাগবে।

রেডিওর গায়ক তখন মিড়ের কাজ করছে সুরে, ধরতে না-পেরে সুভদ্রার শিউরে উঠছে গলা। ময়ী ভাবল—বাঃ, দাদার লাগবে মনে এর চাইতে বড় কথা যেন আর নেই! সুভদ্রা-নামা যে-জীবনটি তার নিজস্ব অস্তিত্বই যেন কিছু নেই। সে যে বেঁচে থাকবে তার কেন-টা কোথায়? রান্না করা, ঘর গুছিয়ে রাখা, স্বামীর মনের মতো শাড়িটা পরা এতসব আয়োজনের উদ্দেশ্যটা?

ময়ী আবার ফিরে এল সেই ষড়যন্ত্রে। একটা দ্বন্দ্ব চলেছে যেন সুভদ্রা ও তার স্বামীতে। কিছু সুবিধা হয়েছে সুভদ্রার, কী সে ভালোবাসে এ বলে দিয়ে মহেন্দ্র নিজের দুর্বলতাগুলোই যেন সুভদ্রাকে বলে দিয়েছে।

কিন্তু তাই যদি হয় সুভদ্রাও কেন ব্যথিতা হয়ে ওঠে। সুভদ্রা কি জানে না এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপার? একটু ভেবে দেখতে গিয়ে ময়ীর মনে হল—না জানাটাই সম্ভব, নতুবা সুভদ্রার ব্যথা অত ক্ষণস্থায়ী কেন হবে। শুধু ক্ষণস্থায়ী কেন, সে-ব্যথা যেন সুখে পরিণত হয়, অন্তত ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশগুলো আরো মধুর হয়ে উঠে। বিহুলা যেন সুভদ্রা। এত বড় ফাঁকির বিষয়টিকে সে যেন প্রশ্নও করে না। আঘাত পেয়ে অভিমান করে, কিন্তু কখনও ভেবে দেখবে না একটা নিছক প্রয়োজনের ব্যাপার সবটাই।

উঠে সেলাইটা গুছিয়ে রেখে অভ্যাসমতো আয়নার সম্মুখে একটু দাঁড়িয়ে সিঁড়িতে পা দিল ময়ী।

রান্নাঘরের সম্মুখে দেখা হল সুভদ্রার সঙ্গে। ছোট একটা টেবলের পাশে দাঁড়িয়ে সে মহেন্দ্রর পাঞ্জাবি গিলে করছে।

'বাব্বা এত'?

সুভদ্রা লজ্জিত হয়ে বলল, 'ঠাকুরপোর গুলো এনে দে'।

'দরকার হয় নিয়ে এসো। ঝির কাজ করছি বলে ধোপার কাজও করে দেব অত ভালোবাসি না'। ময়ী হাসল।

রান্নাঘরে ঘণ্টাখানেক কাজ করতে হল ময়ীকে। এক-এক করে দুই কর্তাই বাড়িতে এলেন। সুভদ্রাকে প্রায় জোর করে মহেন্দ্রর সঙ্গে বেড়াতে পাঠাল ময়ী।

সুভদ্রা বলল, 'কষ্ট হবে তোর ছেলে সামলাতে'।

'ছাই কষ্ট। ভাশুরকে নিয়ে যদি বেরিয়ে না-যাও ও-লোকটির কী উপায় বলো তো? তারও তো সাধ যায় অফিস ফেরত বউয়ের সঙ্গে কথা বলতে কিম্বা খোলামেলা ছাদের সান্ধ্য টেরাসটা উপভোগ করতে'।

সুভদ্রা যেন কর্তব্যে অবহেলা করার লজ্জায় জড়িয়ে পড়ল। 'ছি-ছি। দেখ দেখি। এসব কি লক্ষ্য করেছি কোনোদিন? কী অন্যায়! আমরা এখুনি বেরিয়ে যাচ্ছি'।

সুভদ্রা বেরিয়ে গেলে তার শিশুটিকে কোলে নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে ময়ী হাসি থামিয়ে রাখতে পারল না। কত সরল, কী ভালোমানুষ!

ছাদের টেরাসের দিকে তার ঘরের দরজা খোলা। ময়ী গিয়ে সেই দরজার গোড়ায় বসল। মুখে তখন হাসির সুখটুকু লেগে আছে। চারিদিকের বাড়ির চাপাচাপি থেকে ছিনিয়ে নেয়া একটুকরো আকাশ। ভাগ্য

ভালো, সেটুকু যেন পূর্ণতরটির একটা ক্ষুদ্র অনুকৃতি। সামান্য কিছু সাদা মেঘ আর একটিমাত্র নারকেল গাছের মাথা কাঁপানো ঝিরঝির বাতাস।

উপেন্দ্র মুখের সামনে থেকে কাগজ সরিয়ে ময়ীকে দেখে উঠে এল, 'কী ব্যাপার'?

'বসতে দি কাছে সন্ধ্যাভোর যদি একটি দু'টি মিষ্টি গন্ধের সিগারেট খাও'।

'তাতেই রাজি'।

কিন্তু রাত্রিতে উপেন্দ্র ঘুমিয়ে পড়লে মারি স্টোপস খুলে পড়তে বসল ময়ী। লজ্জায় কানের পাশ দু'টি লাল হয়ে উঠতে লাগল। তবু চেয়ারে সোজা হয়ে বসে সে পড়তে লাগল ওষুধ খাওয়ার মতো মুখ করে। দুপুর ও বিকেলের চিন্তাগুলোর উদ্দামতা সে বুঝতে পেরেছে ইতিমধ্যেই। কী করবে সে মারি স্টোপস প্রমুখাদের সাহায্য নেয়া ছাড়া? কোনো বিচক্ষণ পণ্ডিত তো নারী হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করেনি যে নিজের সমস্যাগুলো তার নিরিখে বিচার করা যাবে। কী করে তারা পারবে? তাদের ভাষাও যে পুরুষের তৈরি। সে অনুভব করল উপেন্দ্রকে আর-একটু গভীর করে ভালোবাসতে পারলে বোধ হয় ভালো লাগত।

ভালো কি সে বাসে না? সেই একটুকরো আকাশে চাঁদের আলোব মতো একটা আভা জেগেছিল সন্ধ্যায়। উপেন্দ্রের ক্লাবে বেরোনোর মুখে চটুলতার মাঝে মাঝে একটি-দু'টি মিষ্টি কথাও কি সে বলেনি অন্তর থেকে? বলেছিল, পেরেছিল। তখন কি মনে ছিল বৈজ্ঞানিক কোনো আপ্তবাক্য? বরং ঠিক যেন সুভদ্রার মতোই হয়ে গিয়েছিল সে। সুভদ্রা যেমন বিকেলে অন্তরের সমস্তটুকু সেবা প্রবৃত্তি একাগ্র করে দিয়েছিল জামা ইস্ত্রির কাজে, তেমনি সে একাগ্রতাটুকু ময়ীরও। এমনই সে ভাব-গভীরতা যে ধরা পড়লে গালে রং ফোটে।

কিন্তু সুভদ্রাকে কি এমনসব কথা ভাবতে হয়? হয়তো ওরা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আলোটা নিবিয়ে দিয়ে টেরাসের দিকের দরজার গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল সে। অন্ধকার টেরাস। অন্ধকারের হালকা কালোর গায়ে গাঢ় কালোর আলসেগুলো একটা কোমল ত্রিমাত্রিক চিত্রের দুরূহতাব মতো ঝিলঝিল করছে। দরজার কালো ফ্রেমে ঝিলমিলে ছবিটার অংশ হয়েই সে দাঁড়িযে রইল হাত দু'টি বুকের উপরে আড়াআড়ি রেখে। একটা কোমল কালো নীরবতা যেন থৈ-থৈ করছে তার চাবিদিকে।

সুভদ্রাকে ভাবতে হয় না। কিন্তু তাকে ভাবতে হয় কেন? একি ভাবার বিষয়? ভেবে, চিন্তা করে কি ভালোবাসা যায়? গভীর অনুভূতিতে সব চিন্তা মগ্ন—তেমন হয় না কেন তার? চিন্তা কি সন্দেহ নয়? হঠাৎ যেন কান্না পেল ময়ীর। ডাক্তাররা যে-কথা বলে তাহলে সে কি তাই, সেই বিশেষ অর্থে ফ্রিজিড? অথবা, অথবা—ছবির রেখা গলে যাওয়ার মতো সজল হয়ে উঠল তার চোখ দু'টি।

তাদের পাশের বাড়ির নিচতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছে। একদিন ময়ীর আলাপ হল সে বাসার গিন্নিব সঙ্গে। গিন্নি বলতে তাদের চাইতেও কম বয়সের একজন। ক্ষমা নাম মেয়েটির। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কলেজে অধ্যাপনা করে। ময়ী আর সুভদ্রা দুপুরের আড্ডার খোঁজে গিয়ে আবিষ্কার করেছিল।

এ কথায়-ও কথায় আলাপে সম্বোধন তুমি এল। আসবার সুবিধাটা ছিল এই যে, প্রকাশ পেল এই নতুন ভাড়াটেরা দু'জনেই একসময়ে মহেন্দ্রর ছাত্র-ছাত্রী ছিল একই বছরে। এই বাসার খোঁজও তারা মহেন্দ্রর কাছেই পেয়েছে।

আর-এক ছুটির দিনে ভদ্রলোক বাসায় ছিলেন না, কোন-এক সভায় গিয়েছিলেন, ময়ীরা গিয়ে দেখল ক্ষমা বই পড়ছে এবং নোট নিচ্ছে। সুভদ্রা বলল, 'ক্ষমা, তোমার ভালো লাগে এখনও এমনসব বই পড়তে'?

অত্যন্ত অভ্যাসের ফলে যে আত্মসমালোচনা ও দম্ভের ভাবটি যুগপৎ আসে তেমনটি মুখে ফুটিয়ে তুলে ক্ষমা বলল, 'এই দেখুন কাল কলেজে পড়াতে হবে এইগুলো (শেলফের কয়েকটি বই দেখিয়ে দিল), আর এই বইটি উনি নিয়ে এসেছেন (কোলের বইটি তুলে ধরল)—ওঁর সঙ্গে হয়তো রাত্রির অনেকটা

সময় তর্ক হবে এরই বিষয় নিয়ে'।

আলাপের মাঝে একসময়ে ঝি এসেছিল। তাকে ক্ষমা বুঝিয়ে দিল না, সে-ই ক্ষমাকে বলল আজ কী-কী আহার্যের ব্যবস্থা হয়েছে, কী-কী আর হতে পারে। ক্ষমা খুশি হল। ময়ী লক্ষ্য করল এটা।

ক্ষমা বলল, 'আপনারা ভাবছেন স্বামীর জন্যে নিজের হাতে খাবার করি না কেন'।

মনের প্রশ্নটা মুখের চেহারায় প্রকাশ পেয়েছে ভেবে ময়ী মুখ নামিয়ে নিয়েছিল। পথে আসতে-আসতে ময়ীর মনে হল স্বামীকে সুস্বাদু আহার্য রান্না করে দেওয়া ছাড়া কী-বা সে করেছে? এমনসব সময়ে তার মনে পড়ে যায় নভেলের মেয়েদের কথা, তারাও (নভেলের মেয়েদের কথা মনে পড়ে এই জন্যে যে তাদের মানসিক অবস্থাটা লেখার কৌশলে সুস্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে)- তারাও-বা কী করছে? প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অগোছালো পুরুষটির চারিপাশে পরিচ্ছন্নতা, উদাস পুরুষের সামনে সুজাতার পরমান্ন এনে দিচ্ছে। সে যদি গ্রহণ করে, ট্র্যাজিডি থাকে না। ঠিকই করেছে ক্ষমা। রান্না করা এবং তা করা বলতে যে-সমুদয় বোঝায় তার জন্যেই যদি শুধু দেহ নয় মস্তিষ্কও ব্যাপৃত থাকে, নিজের ঐশ্বর্যগুলো কখন দেওয়া যায় ভালোবাসার মানুষটিকে? ময়ী বলল, 'সত্যি তা ভাবিনি'।

কিন্তু ভালোবাসার নিদর্শনগুলি বোধ হয় দিতে হয় এবং নিতে হয়। কয়েকদিন পরে বিছানায় একটা বিশেষ সেন্টের লেশমাত্র ছড়াতে-ছড়াতে ভাবল সে—এ তো গল্পের সমস্যা হতে পারে। মানুষের জীবনে তারই প্রয়োগ করতে হবে এ কোনো মহাভারতে লেখা নাই। বিছানাটা ঢেকে দিয়ে বিছানা থেকে নেমে এল সে। নেশার দরকার হয় যেমন উপেন্দ্রর কাঙালপনা এই সেন্টটার জন্যে। ময়ী এখন ব্যবহার করে কিনা, কোনো সেন্টই করে কিনা সেটা বিচার্য নয়, বিয়ের রাতের কথা মনে পড়ে তাই এখনো মাঝে-মাঝে বিছানার একপ্রান্তে এর দু-এক ফোঁটা দিতে হয়। এটাকে কোনো বিষয়ের প্রতীক করতে হবে কেন? আর কৌতুকের বিষয় এই, উপেন্দ্রর এই কাঙালপনা পাছে সোচ্চার হয় তাকে ব্যস্ত হয়ে থাকতে হচ্ছে তার আগেই তার তৃষ্ণা মিটিয়ে দিতে। অন্যদিকে ভালোবাসা ছাড়া জীবনই কি বৃথা হয়ে যায়? ধরো না একটা মেয়ের কথা, যার স্বামী অধ্যয়নে ডুবে থেকে তার স্ত্রীর যৌবন কখন সৌরভ-রেণুর আমন্ত্রণ জানাল তার খোঁজ নিল না। স্ত্রী অন্য পুরুষকে ভালোবাসল, তৃপ্তি না-পেয়ে প্রতিহিংসা নিল, পাগল হয়ে গেল অবশেষে। যদি সে অন্য পুরুষের ভালোবাসা পেত? পায় তো। তারপরও কি উদগ্রতা থাকে ভালোবাসার? দু'চারটে ছেলেমেয়ে হওয়ার পরে সমস্যাটারও কি ভরাডুবি হয় না?

ময়ীর সাময়িকভাবে মনে হয়েছিল যেটা সে খুঁজছে সেটা ধরা পড়েছে ক্ষমাদের জীবনে। মাঝে-মাঝে তার যে অগভীর অনির্দিষ্ট অভাববোধটা হয় যেন সেটার ঊর্ধ্বে উঠে গেছে ওরা। নিজে যা খুঁজে ফিরি হঠাৎ তার সন্ধান পাওয়া গেছে মনে হলে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। ক্ষমাদের জানলা খোলা দেখলে কোনো-না-কোনো ছুতো করে ময়ী যাবেই তাদের বাড়িতে। সুধীরের সঙ্গেও তার আলাপ হয়ে গেল।

এখন ব্যাপার হচ্ছে এই ময়ী নিজে ট্র্যামে চড়ে অফিসে বেরোয় না, কিন্তু জানে সেটা জীবন নয়, যেমন নয় কোথাও না-বেরিয়ে রান্না করাটা। জীবন যদি থাকে তবে তা আছে ট্র্যামের পথ শেষ হওয়ার পর। যদি কেউ বলে ক্ষমা স্বাধীনা তাই ময়ীর মোহ? এরকম লোকে বলছে বটে, বিশেষ করে তারা যারা অর্থনীতি দিয়ে মানুষকে বিচার করে। কিন্তু শ্ল্যাক্স পরলেই কি বন্ধন যায়? সেই অনুকৃতি কি হীনতর বন্ধনদশা নয়? ময়ী তবু কিছু-একটা যেন খুঁজে পায় ক্ষমাদের জীবনে। ময়ী অনুভব করার চেষ্টা করল ভালোবাসার দেনাপাওনা চুকিয়ে যেখানে ওরা দাঁড়িয়েছে সেখানে ওদের একটির মন অপরটির পরম সাথী। কখনো মনে হয় তার : সংসারের বাইরে যে কেন্দ্র—কেন্দ্র একটা নিশ্চয় আছে নতুবা কাকে লক্ষ্য করে প্রাণধারণ—সেদিকে ওদের দুটি মন শিশুর নিরাবরণ কৌতূহল নিয়ে চেয়ে আছে।

এরই ফলে ময়ী কোনোদিন বাসায় ফিরে এসে বলে, 'আচ্ছা, তোমার খাবার সময়ে আমি যদি না-থাকি, মানে দিদির আড়ালে থেকে যদি না-গুছিয়ে দেই? অবশ্য তোমাকে আর-একটা রাঁধুনি রাখতে বলছি না'।

উপেন্দ্র বলল, 'ভালোই হয় তাহলে, আর-একটু কাছে পাই'।

ময়ীর মনে হয়েছে উপেন্দ্রের শান্ত কিন্তু কৌতুকপ্রিয় দৃষ্টির দিকে চেয়ে তাহলে কি ব্যথাটা যায়?

কিন্তু উপেন্দ্রর আর-একটা স্বভাব আছে। ময়ীকে চিন্তার অবসর না-দিয়ে সে বলে বসতে পারে—একটা কাজ করতে পারো ময়ী? নিচে দেখে এলাম তোমার বড়জা তোমার বড়ঠাকুরকে খেতে দেবার নাম করে গল্প করছেন। তুমি টুকটুক করে গিয়ে উনুনের কেটলি থেকে জল নিয়ে চুপ-চুপ করে এক কাপ চা তৈরি করে আনতে পারো? সাবধান করে দিচ্ছি : ধরা পড়লে বউদি জিজ্ঞাসা করবেন—কে খাবে। প্রশ্নটা দাদার সম্মুখে হবে এবং আমি কিছুদিন আগে ঘোষণা করেছি, যখন-তখন চা খাওয়া যখন-তখন বিয়ার খাওয়ার চাইতেও খেলো বিলাসিতা।

এ-রকম একটু অনুভূতি হল ময়ীর—সে-মুহূর্তের জন্য উপেন্দ্র তাকে কানায়-কানায় পূর্ণ করে দিয়েছে। কিন্তু নেশা, এ তো একটা মিষ্টি নেশা।

একদিন দুপুরে জানালা খোলা দেখে ক্ষমাদের বাসায় গিয়ে ময়ী দেখল ক্ষমা নেই বাসায়, সুধীর শুয়ে আছে। ময়ী ফিরে যাচ্ছিল, সুধীর ডেকে কথা বলল।

ময়ী বলল, 'বিছানায় কেন, অসুখ নাকি'?

'ম্যালেরিয়ার মতো শীত নিয়ে এসেছে ফ্লু, খুব কুইনাইন খেয়েছি'।

দুর্বল লাগল সুধীরের গলা।

ময়ী বলল, 'ক্ষমা কোথায়'?

'পার্টি আছে। যেতে হয়েছে তাকে'।

ময়ীর ভালো লাগল না। সুধীর অবশ্য বলেছে যেতে হয়েছে তাকে অর্থাৎ ইচ্ছা করে যায়নি এবং তার স্বরে কিম্বা দৃষ্টিতে নালিশ ছিল না, তবু ময়ীব ভালো লাগল না সুধীরকে রোগশয্যায় একা রেখে ক্ষমার বাইরে যাওয়া। ঠিক তখন অন্য কোনো কথা মনে হল না. শুধু উপেন্দ্রর রোগপাণ্ডুর একখানা মুখ যেন তার দিকে একান্তভাবে ফিরানো আছে।

ময়ীর মতো মেয়ে যে-কোনো রোগশয্যার পাশেই বসতে পারে, তাই বসেছিল সে।

পরের দিন দুপুরেও ময়ী গিয়েছিল। ক্ষমা ছিল না বাসায়। কলেজে গিয়েছে। দু'পিরিয়াড ক্লাস নিয়েই ফিরবে। হালকা বাদামী একটা মলিদা গায়ে সুধীর বিছানাতেই ছিল। তার দৃষ্টিটা ক্লান্ত।

কিন্তু হঠাৎ চলে আসতে হয়েছিল ময়ীকে। সুধীরকে তার চলে আসার কারণ সম্বন্ধে সজাগ না-করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এসেছিল সে।

বাড়িতে ফিরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে তিরস্কার করল—সবসময়েই যে-ব্লাউজটা কিছু না-ভেবেই গায়ে তোলে সেটা পরার জন্যই ; শোবারঘরের ইলেকট্রিক হিটারে জল চাপানোই ছিল, সেটা ফুটে উঠতেই সুধীর যখন নিজের জন্য ওভালটিন গুলতে যাচ্ছিল, তখন সে এগিয়েছিল কাজটুকু নিজে করে কাপটা সুধীরের সামনে এগিয়ে দেয়ার জন্যেই। সুধীরদের দৃষ্টিকে সতৃষ্ণ করে তোলার জন্য মেয়েদের এ-বকম ব্লাউজ উদ্ভাবন করা হয়েছে এ-বিচার করার বুদ্ধিও কি থাকতে নেই?

তবু উপেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করল সে, 'অসুখ হলে বড্ড মনে পড়ে মায়ের কথা, নয়? মা, দিদি, বন্ধু এদের স্পর্শ ভালো লাগে, ভরসা দেয়'?

'পড়ে না মনে? কান্না আসে মনে হলে'।

এবার ময়ীরও মনে পড়ল : কয়েকদিন আগে রোদ লেগে বিশ্রী মাথা ধরেছিল উপেন্দ্রর। সারা রাত ছটফট করে ভোরের দিকে উপেন্দ্র ঘুমিয়ে পড়েছিল। সকালে বিছানা ছাড়তে গিয়ে ময়ী দেখেছিল বালিশ থেকে নেমে এসে তার বুকের কাছে মুখ রেখে দশ আঙুলে তার ব্লাউজের গলার কাছটা চেপে ধরে ঘুমিয়ে আছে উপেন্দ্র। শিশুদের মতো?

কিন্তু কোনো-কোনো দ্বিধা সহজে যায় না। মনে হল, ক্ষমা না-থাকতেও পারে আজও এ-রকম

সম্ভাবনা কি মনের কাছে অসম্ভব ছিল? মনে হল সুধীরের দৃষ্টি ভীরু ছিল। যেন ক্ষমার কাছে সে-দৃষ্টি লুকিয়ে থাকতে চায়।

ক্ষমা পারেনি, ক্ষমা পারেনি। আর তা যদি না-পেরে থাকে, সুধীরকে তৃষ্ণায় অকাতর করতে, ক্ষমা শুধু স্ত্রী-স্বাধীনতাই পেয়েছে আর-কিছু নয়—পুরুষদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ, অর্থোপার্জনের সুবিধা।

দু'বউ একসঙ্গে খেতে বসেছিল।

সুভদ্রা বলল, 'হ্যাঁরে ছোটকি, একটা সত্যি কথা বলবি'?

'অভ্যাস বড় খারাপ দাদা, মিছেটাই মুখে আসে'।

'মিছে বলিসনে, আমি জানি। এ কী হল তোর বল তো, এমন শুকিয়ে উঠছিস কেন'?

'আঃহাহা, চুলে তেল দিইনি'।

'তা নয়, তোর ঠাকুরও বলছিলেন, ছোটমায়ের হাসি শুনতে পাই না আজকাল'।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ময়ী অবাক হয়ে গেল, এমন বদলে গেছে চেহারা, এমন নীরস হয়েছে দৃষ্টি!

রাত্রিতে উপেন্দ্রকে সে বলল, 'এ কী হল আমার বলো তো'?

'কী হল? কিছুই তো হয়নি। যেমন ছিলে তেমনি বউটি আছে। একটু-বা জেদি, একটু-বা যেন নতুন ধরনের, কিন্তু সব মিলিয়ে দেখলে ভালো, খুব মিষ্টি নয়, হলেও মনের মতো, অথবা মনের মতো মেয়ে বলতে একজনকেই জানি'।

কিছুটা রসিকতা অল্প কিছু সত্যের সঙ্গে মিশিয়ে বলতে-বলতে মাঝপথে থামল উপেন্দ্র। এরকম ভঙ্গি, এরকম দৃষ্টি রোজ থাকে না ময়ীর। সাদৃশ্যে চার-পাঁচ বছরের আগেকার একটা লজ্জার ঘটনা মনে পড়ে গেল। ময়ী তখন আরো ছিপছিপে ছিল, কথা দিয়ে জয় করতে জানত না, হেসে লঘু করে দেবার মতো ঐশ্বর্য সঞ্চিত হয়নি মনে। জেদে, রাগে কাঠ হয়ে গিয়ে শোবার ঘরেরআলোতে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সর্বাঙ্গের আবরণ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠেছিল।

পরের দিন সকালে মারি স্টোপসের কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে—সবগুলো প্রবন্ধের বই একসঙ্গে পারা যায় না ছিঁড়তে—নিয়ে গেল ময়ী উনুন ধরাতে। ভাববে না সে। দু'একখানা প্রবন্ধের বই এদিকে-ওদিকে পড়ে রইল মেঝেতে। ঘুম ভাঙবার চোখে উপেন্দ্র দেখল ময়ী স্নান শেষ করে গোল করে কপালে সিঁদুর আঁকছে।

সেদিন খেতে বসে মহেন্দ্র উপেন্দ্রর দিকে চাইল, উপেন্দ্রও ভাবল এত আহার্য এত সুস্বাদ করে রান্না হওয়ার কী কারণটা ঘটল?

অফিস যাওয়ার মুখে উপেন্দ্র দেখল দরজার কাছে ময়ী। বিয়ের প্রথম দিকে যে-রকমটা প্রাত্যহিক ছিল তেমনি এগিয়ে গেল উপেন্দ্র, ময়ীও দাঁড়াল সূর্যমুখীর ভঙ্গিতে। উপেন্দ্রর মনে হল—কী যেন জ্বলছে ময়ীর চোখ দুটিতে।

একটুপরে (একটু-বা ক্লান্ত সুরে) ময়ী বলল, 'ভুলে গিয়েছিলাম, পকেটের রুমালটা দাও তো পালটে দি'।

ময়ীর দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাও যেন ক্লান্ত।

মহেন্দ্রর সঙ্গে তার ছাত্রী ক্ষমার প্রতিবেশী হিসাবে দেখা হয়েছে। সুধীরের বন্ধুর বিয়ের উপলক্ষ্য ছিল। তা না-হলেও যে-কোনো একটা রবিবারের পার্টিতে, দেখা হতে পারত। কিন্তু উপলক্ষ্যটাই এ-ব্যাপারে যেন অর্থগূঢ় হয়েছে। পাত্র-পাত্রী ইউরোপে মানুষ। পাত্রী লন্ডন আর পারী, ফ্রেবুর্গ ও সালৎসারে ঘুরে-ঘুরে বুদ্ধি ও বিদ্যাতে তার ছোট মাথাটা পরিপূর্ণ করেছে' আর পাত্র বরফের উপরে হেঁটে-হেঁটে দেশলাই

বিক্রি করেছে, সাময়িক পত্রিকায় জীবন-বেদ ও বৈদিক জীবন আলোচনা করেছে, রাজনীতির কিম্ভূত দল রচনা করেছে ইউরোপের অনেক শহরের পিছন দিকের গলিতে। অবশেষে যে-পরীক্ষায় কেউ কোনোকালে ফেল করে না সেটা পাশ করে ইদানীং কলকাতার সেন্ট মার্টিন, এ-পথে ব্যারিস্টার।

সুধীর এবং ক্ষমা যখন সঙ্গে-সঙ্গে এসে মহেন্দ্রকে তার বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল তখনই হয়তো সুভদ্রার ভয়-ভয় করে উঠেছিল। মহেন্দ্রের একরকমের অবুঝপনা আছে। তার ছাত্রজীবনের সঙ্গে জড়ানো কোনো বোহেমিয়ানপনার ইতিহাস নেই, ঘড়ির কাঁটা ধরে অতিবাহিত যৌবনে উপ্ত হয়নি কোনো স্মৃতির অঙ্কুর—এই দুঃখেই হয়তো সে মুহ্যমান হয়ে পড়বে। এ-রকম একটা আশঙ্কা হয়েছিল সুভদ্রার। বিয়েটা মা দিয়ে গেলেন মৃত্যুর আগে বউকে ঘরে আনবাব মোহে, তখনও মহেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলের আগে ছুটবার পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে।

সুভদ্রা মহেন্দ্রের চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে বলল, 'এত ভাবনা কেন'?

'ভাবছি দেওঘরের কাছাকাছি শহর থেকে একটু দূরে একটা বাড়ি করলে কী রকম হয়'।

'ভালোই হয়। তোমার শরীরটা ভালো থাকে ওদিকের জলে'।

'ক্ষমাও বলছিল বটে। সুধীর হাঙ্গামাটা নিতে চায় না। সে যেন একটু ছেলেমানুষ। দর্শনের ছাত্র, একটু হালকা হযে চলতে হয়'।

সুভদ্রা সেদিন হাসিমুখে নেমে যেতে-যেতে ভাবল, 'বেশ হয় বাড়িটা হলে'।

তারপব স্বস্তি বোধটাব কারণ খুঁজতে গিয়ে সে অনুভব করল মহেন্দ্র ক্ষমার কথা তুলে যা বলবে বলে আশঙ্কা কবেছিল সেটা বলেনি মহেন্দ্র—ক্ষমাকে কিম্বা অন্য কোনো ছিমছাম মেয়েকে সুভদ্রার সম্মুখে আদর্শ করে তুলে ধবেনি কথার ইঙ্গিতে।

বিকেলেব দিকে ক্ষমা এসে উপস্থিত ছেলে কোলে করে। সুভদ্রার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'বলুন তো দিদি, কী কবি। সেই থেকে কাঁদছে। পেট ব্যথা করছে, না কান—কী করে বুঝব'?

সুভদ্রা ছেলে কোলে কবে, তাকে উপুড় করে, চিৎ করে দেখে অবশেষে বলল, 'পেটই বোধ হয়। পার্টির ঝামেলায় সময় মতো খাওয়ানো হয়নি। দাঁড়াও একটু সেঁকে দি'।

ছেলে শান্ত হলে ক্ষমা তাকে কোলে করে চলে গেল। পাশ দিয়ে যেতে-যেতে মনে পড়ল ময়ীব এই ক্ষমাই একদিন সুভদ্রাদের কাছে তার বইয়ের শেলফসমেত আত্মপ্রকাশ করেছিল।

একদিন খেতে বসে সুভদ্রা বলল, 'কী ভয়ই না করতাম মেয়েটাকে! মনে হতো যেন ও আমার সুখের সংসারের আগুন জ্বালাতে এসেছে। এদিকে তোর বড়ঠাকুবের বাতিক ; ওদিকে হাতেব কাছে চোখের সামনে বিদুষী কন্যে। ভাবলাম, হযেছে, আবার কলেজে ভর্তি করে না-দেয়'।

একটু পরে আবার সে বলল, 'বেটাছেলেরা যে কত গুমোর করে। বেশ রেঁধেছিস চচ্চরিটা। পিঠে লুটিয়ে দেওয়া একটা বেণী, চোখেব কোণে লুকিয়ে দেওয়া একটু কাজলে যারা ভাবে কী স্বর্গ পেলাম'।

'বড়ঠাকুর তোমাকে আর পড়তে বলেন না'? ময়ী প্রশ্ন করল শান্ত স্বরে।

'বলেছিলেন টুনি হবার পরও। চোখের সামনে তুলে ধরে বললাম আর এই যে দ্বিতীয় এসেছে? পালাতে পথ পেলেন না'।

'যখন-তখন ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে এমন অশ্রদ্ধাভরে কথা বলো'।

'বলিস কিরে? শিবঠাকুরের মাথায় বেলপাতা দেবারও যে সময় পাই না। ওরাই আমার সহায়। আমাকে ভালো লাগুক আর নাই লাগুক, এদের জন্যেই ভালো লাগবে আমাকে'।

মহেন্দ্রকে যেন মোটামুটি বুঝতে পেরেছিল ময়ী। সে চেয়েছিল সাধারণ পারিবারিক জীবনেতর অন্য-কিছু, কিন্তু সুভদ্রাকে টলাতে পারেনি, অনুনয়েও নয়, অনুযোগেও নয়। আর এখন, যখন সে দুটি সন্তান নিয়ে বসে থাকে তাকে অন্যতর জীবনে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয় শুধু, ভাবাও চলে না সে-কথা। হয়তো সুধীর ক্ষমার জীবনকে মহেন্দ্র ভালো চোখে দেখেছিল। তারা কলেজে পড়বার সময় থেকে

ভালোবেসেছে, একসঙ্গে কলেজে গেছে, বেড়িয়েছে, পড়েছে—মিলনে কোথাও বাধা ছিল না। এটাই সম্ভবত বড় হয়েছে মহেন্দ্রর চোখে। ব্যাপারটা এমনি হয়, নতুবা অবশ্যই মহেন্দ্র লক্ষ্য করত এখন ডক্টর ক্ষমার প্রচেষ্টা খানিকটা সুভদ্রা হওয়ার। মহেন্দ্রর এই ভালো চোখে দেখার মধ্যে ঘোর লাগা ছিল কিনা সেটাও অন্য প্রশ্ন।

কিন্তু যখন মধ্যদিনের অকরুণ দৃষ্টিতে কলকাতা উদ্‌ঘাটিত তখন ময়ীর অবসর। ছাদের আলসেতে বসে দাঁড়কাক ডাকে। শব্দ থেকে বোঝা যায় এখন ট্রাম-বাসগুলো লম্বা-টেনে-টেনে চলছে। পথের পাশে আরোহীর প্রতীক্ষা কমেছে কয়েক ঘণ্টার জন্য। ময়ী তখন তার শোবার ঘরের মেঝেতে চুল শুকানোর ভঙ্গিতে বসে কোনো বই পড়ে কিম্বা বড়জার ছেলেকে নিয়ে খেলা করে। ততক্ষণে সুভদ্রা হয়তো ঘর গুছোয়, এদিক থেকে ওদিকে টানে পালঙ্ক, টেবল-ক্লথ পালটায়, রুপোর অ্যাসট্রে শাড়ির আঁচলে ঘষে ঝকঝকে করে।

কিন্তু আজ ময়ী চিঠি লিখতে বসল তার কুমারীজীবনের সঙ্গিনীকে। ময়ীর আগে তার বিয়ে হয়েছিল একটি বাইশ-তেইশ বছরের ছোকরার সঙ্গে। এখন তারা সংসারী। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে কেরানি আর স্কুল মাস্টারদের সংসার।

বান্ধবী গত চিঠিতে লিখেছে :

> মোটা হয়ে গেছি। দাঁতে পানের কালো দাগ পড়েছে বলে কষ্ট হয় বটে, তার চাইতেও অনেক বেশি কষ্ট হয় যখন দিনের মধ্যে একবার শুধু সিঁদুর পরার জন্যে আয়নায় সামনে গিয়ে দাঁড়াই। শুধু মুখের নয়, সারা দেহের পেশিগুলো শ্লথ হয়ে গেছে, মেদে ঢেকে গেছে। যদি বলিস এগুলো আমার অত্যাচারেরই চিহ্ন, প্রতিবাদ করার কিছু নেই। মেপে-মেপে চলা দূরের কথা নিজের সম্বন্ধে ভাববারও অবকাশ নেই। চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ে, স্বামী-দেওর-শাশুড়ি নিয়ে সংসার আমার। যদি কেউ এসে প্রশ্ন করে—'আমি কে'। ছেলে-বুড়ো সবাই বলবে, রান্নাঘর থেকে শোবার ঘর এই কাজগুলো যার সে-ই। আর ভালোবাসা? সেটা কি বল তো? তোমাকে দূরে রেখে থাকতে পারি না—এ আমার স্বামী এখনও বলেন। কাছে পাওয়ার ইচ্ছাটাই কি ভালোবাসা নয়? মহাভারত পড়ার নাম করে শাশুড়ি কাছে বসতে ডাকেন। ছেলেমেয়েরা এখনও ঘুমের ঘোরে মা-মা বলে খোঁজে। ছোটটি যে কী করে তা তুই বুঝতে পারবিনে। আর আমার লজ্জা করে রাত্রির অন্ধকারের সব কথা বলতে। সাহিত্যিক নই যে ঘুরিয়ে বলি। বিয়ের সময়ে সুমিতা বোধ হয় ইসাডোরার একখানি আত্মজীবনী উপহার দিয়েছিল। শরীর সম্বন্ধে তার কোনো-কোনো কথা বোধহয় মিথ্যা নয়।

ময়ী প্যাড ও কলম নামিয়ে রাখল। চিঠিখানা দ্বিতীয়বার পড়লে চিঠি লিখবার মতো কথা সহসা গুছিয়ে তোলা যায় না। তাছাড়া চিন্তা করতে গেলে ময়ী হাঁপিয়ে ওঠে আজকাল। ক্ষমা-সুধীরদের কাছে অনেক আশা নিয়ে গিয়ে সে একটা আঘাত পেয়েছে। তারপর থেকে সে ভেবেছিল আর সে চিন্তা করবে না।

কী হবে চিন্তা করে এই ভাবতে-ভাবতে ময়ী বাইরে বেরিয়ে এসে দেখল বেলা অনেকটা পড়ে গেছে। সুভদ্রা উনুনের ধারে খাবার করতে বসেছে, ঝি পাশে বসে লুচি বেলে দিচ্ছে। উপেন্দ্র অফিস ফেরত অফিসের পোশাকেই সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে কোনো কৌতুকের কথা নিয়ে।

'ডাকোনি কেন'? ময়ী হাসল বটে, একটু ঝাঁজ ছড়িয়ে রইল তার উচ্চারণে।

'তাতে আর কী হয়েছে' বলে সুভদ্রা হাসল।

কিন্তু সুভদ্রার দিকেই চাইল ময়ী। কিছু-একটা অস্পষ্টভাবে তার চোখে পড়ে কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। লুচিগুলো ভাজতে গিয়ে হাতের যে সামান্য গতি হয়েছে তাতেই হাতের পিছন দিকের শ্লথ পেশিগুলো থলথল করে দুলছে। এ যেন তার সঙ্গিনীরই ছবি, শুধু পানের রসে দাঁত কালো হয়নি। স্বচ্ছল ঘরের বলে পরনের শাড়িটা দামি, কিন্তু সেই দামের আড়ালে ঢাকা যায়নি কুক্ষির শ্লথ বিস্তার। ব্যাপারটা একটি চকিত আঘাত দেয়ার জন্যই যেন ফুটে উঠল।

ঝি উঠে গিয়েছিল কাজে। ময়ী সুভদ্রার পাশে গিয়ে বসল।

সুভদ্রা বলল, 'দেখলে ভাই ঠাকুরপো, কেমন জিনিসটা যোগাড় করে দিয়েছি, রূপ বাড়ছে বয়সের সঙ্গে'।

বউদি ও দেওরের সাধারণ হাসি-ঠাট্টা।

অন্যদিন হলে হয়তো ঈষৎ লজ্জাবোধ করত ময়ী। তার মনে হল : ছাই রূপ, আহারের ও স্বাস্থ্যের সাধারণ নিয়মগুলো মানলে যা টিকে যায়। এ রূপে যাতে মানায় তেমন জীবন?

এক রবিবার। শোবার ঘরে দুপুরবেলা ঢুকে দেখল ময়ী ছেলেকে ভুলিয়ে রাখছে উপেন্দ্র। (ক্ষমার মতো ময়ীও এখন সন্তানবতী) এমন হয় পাশেই যে-লোকটি থাকে রোজ নজরে পড়ে না সে বাড়ছে বা তারও পরিবর্তন হচ্ছে। হঠাৎ একদিন নজরে পড়লে অবাক হয়ে যেতে হয়।

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখল : ছেলেটি বিছানায় উঠে বসতে গিয়ে টলছে, কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেলছে আব উপেন্দ্র ঘরময় পায়চাবি করে বেসুরো গলায় কবিতা আওড়ে শোনাচ্ছে তাকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে গেল ময়ী।

উপেন্দ্র ছেলেটার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, 'শুনলি তো, এবার মানে শোন। সব জিনিসেরই একটা করে অর্থ আছে। এসবই তো হাসির কথা নয়। এই যে তোমার মা...'

'থাক, ওর মায়ের কীর্তি আর ওকে শোনাতে হবে না'। হাসির ফেনায় পা রেখে ঘরে ঢুকল ময়ী।

ছেলেকে বুকের কাছে তুলে ধরে ময়ী ভাবল : এত সাধ লুকিয়েছিল এই লোকটির মনে। কাজে ব্যস্ত স্বল্পভাষী এ-লোকটি যে এত স্নেহশীল, এমন অনাড়ম্বর আনন্দে ভরা, কে জানত! এটা বোধ হয় একটি পবিণতির ইঙ্গিত। হযতো মানুষের চরিত্রগঠনের কখনও শেষ নেই, জীবনের শেষ দিন অবধি চলছে পরিবর্তন ও পরিবর্জন। ভাবতে গিয়ে মনে হল শুধু দাদার ছেলেমেয়ে ক'টির সঙ্গে উপেন্দ্র হাসে না, সবসময়েই যেন হাসি মুখটিকে ফিরিয়ে রেখেছে পৃথিবীর দিকে। কখনও যদি অভিমানের ছাযা ভ্রুব কাছে কালো হযে আসে সেটা অন্য কারো চোখে পড়বার আগে মিলিয়ে যায়। আর কথা বলবার ধরনও যেন বদলে যাচ্ছে। বূঢ়ভাষী কোনোদিনই নয়। আগে ঝিকিযে ওঠা একটা আবরণ ছিল তার চিন্তার, এখন কথাগুলো যেন সরল ও গভীর হয়ে আসছে। পাছে কথার ঝিলিক অন্যকে কষ্ট দেয় এই ভেবে যেন ইচ্ছা করে নরম করে দেয় কথার পালিশকে। কিছুদিন পরে একটি সুপরিপক্ক সুমিষ্ট বৃদ্ধ হবে নাকি? জীবনকে খুঁজে পেলে যে-ধীরতা আসে সেটা পাবে?

মানুষের জীবনে কখনও-কখনও বিশ্রামের ইচ্ছা এসে পৌঁছায়, মাঝে-মাঝে নিজেকে প্রবোধ দিতে শুরু করে সে তখন : এই তো অনেক, যতটা ভেবেছিলাম, হয়নি। বোধ হয় কারো কোনোদিন হয় না।

ময়ী ভাবল একদিন : আসলে জীবনটা একটা ঘটনামাত্র। এই যে উনুনে আগুন জ্বলছে, কখনও শিখাটা লাল হয়ে নেমে আসছে, কখনও বেগনি হয়ে লাফিয়ে উঠছে, কাঠটা পুড়ে যাচ্ছে—এটাই ঘটনা, শিখাগুলো তার বাহ্যিক রূপ। বৃহত্তর জীবন, গভীরতর প্রেম—এসবও বোধ হয় বেগনি শিখা, কিন্তু শিখাগুলো তেমন দ্যুতিমান না-হলেও জীবন ফুরিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা একদিন ঘটবে।

মহেন্দ্রের কথা মনে হয়। কী অদ্ভুত পরিবর্তন।

এ বাড়িতে প্রথম যখন ময়ী আসে তখন মহেন্দ্র পঁচিশ-ছাব্বিশের অল্পবয়সী একজন। ময়ী শুনেছিল সে অধ্যাপক, দেখেছিল সোনার প্যাঁশনে চোখে সাহেবি-পোশাকে কলেজে যেতে। তখন সাহেবিয়ানাব ঢেউ উঠেছিল। বাড়িতে বদলে গেল সে-রূপ ; গলাবন্ধ কোট, কোঁচানো চাদর এই হল পরিচ্ছদ। শুধু দেহে নয়, মনেরও স্তরে-স্তরে পরিবর্তন এসেছে। সংগীত সুরুচির বিষয় বলেই হোক কিম্বা নিজে গান ভালোবাসত বলেই হোক, কত চেষ্টাই না সে করেছে সুভদ্রাকে গান শেখাতে। গান তোলা হয়নি বলে ধমক খেয়ে সুভদ্রা এক-একদিন কাঁদতে বসেছে। ফরাসি ভাষা শেখার ব্যাপারটা অবশ্য হাস্যকবই হয়েছিল। কিন্তু কোথায় গেল সেই মহেন্দ্র! যে-মেয়েটিকে নিজের মতো করে গড়ে নিতে চেয়েছিল,

অর্ধেক-গড়া সেই মেয়েটির কাছে অধ্যাপক মহেন্দ্র এখন শান্তির আশ্রয় কামনা করছে।

একদিন দুপুর-রোদ মাথায় করে একখানা বই হাতে সুধীর এসে ডাকল ময়ীকে, 'আসতে পারি'।

'আসুন'।

'বড় বউদি সুভদ্রা কোথায়'?

'ছেলে ঘুম পাড়াচ্ছে'।

সুধীর শুনল না টানাটানি করে তাকেও নিয়ে এল।

'কী ব্যাপার'?

সুধীর বলল, 'এইমাত্র দপ্তরির কাছে পেলাম, মাস্টারমশাই নিজেও এখনও খবর পাননি'।

ময়ী অবাক হল। অধ্যাপক বই লিখবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই, না-লিখলেই বরং অবাক হতে হয়। ময়ী অবাক হল এইজন্যে যে সে যখন ভেবেছে মহেন্দ্র তলিয়ে গেছে তখনই যেন উঠবার সিঁড়িতে পা দিয়েছে সে।

ময়ী বলল, 'পড়ি, দিয়ে যাও বইখানা'।

সুধীর বলল, 'ক্ষমাকে এক কপি দিয়ে এসেছি তাব কলেজে'।

তারপর সে এক দুপুর বোদ মাথায় করে মহেন্দ্রকে চমকানি খববটা দেবার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

বইখানি হাতে দিয়ে ময়ী সুভদ্রাকে বলল, 'এখানা কী দ্যাখো তো'।

সুভদ্রা হাতে করে দেখল বইটিতে গ্রন্থকারের নামের জায়গায় মহেন্দ্রের নামটিকে। আনন্দে তার চোখ ছলছল করে উঠল।

ময়ী রসিকতা করে বলল, 'দেখলে তো, লোকটাকে যদি তোমার ঐ স্থূল দেহ দিয়ে গ্রাস না-করতে তাহলে আবো কত বড হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল'।

সুভদ্রার চোখ আবার ছলছল কবে উঠল। লেখাপডার জন্য মহেন্দ্র যতদিন তাকে যত কথা বলেছে সবগুলোই বোধ হয় তার একে-একে মনে পড়তে লাগল।

বলল সে, 'তুই ভাই, তোর বড়ঠাকুরের ঘব গুছিয়ে দিবি। বই খাতাপত্তর গুছিয়ে দিলেই হবে না; তুই তো কথা বলিস, তুই অনেক লেখাপড়াও করিস, এখন থেকে সন্ধ্যার পর তুই বোজ একটু ভাশুবেব কাছে বসবি। নইলে মানুষটা এ ছাই সংসার নিয়ে কী করে বাঁচে বল! মনের মতো একজনকে না-পেলে কোনো পুরুষই বাঁচে না'।

'আমি ছোটভাইবউ, মনের মানুষ হব কি গো'? কথাটার এ-অর্থটুকু চোখে পড়তে সুভদ্রাও লজ্জায় হাসতে আরম্ভ করল।

ময়ীকে ভাবতে হল : এত কোমলতা, এমনি মায়ের মতো স্নেহ লুকানো ছিল সুভদ্রার মনে? যে-সুভদ্রা বিজয়িনীর ভঙ্গিতে নিজের প্রতিষ্ঠায় বাস করে সেই সত্যি, না এখন সহসা প্রকাশ হয়ে পড়া সুভদ্রা?

যা আশা করা গিয়েছিল তার চাইতেও বেশি ঘটল।

সন্ধ্যায় ছেলেমেয়েকে গান শেখাবার নাম করে মহেন্দ্রের কাছাকাছি এক জায়গায় বসে সুভদ্রা গান গাইতে শুরু করল। অনভ্যাসের ফলে সুভদ্রাব গানের গলাটি ধ্বংস হয়েছে, সন্তান-প্রসবজনিত ক্ষয়ে ফুসফুসের আর ক্ষমতা নেই সুরকে পূর্ণ করে তোলার। তথাপি রান্না ঘরে বসে ময়ীর মনে হতে লাগল—সুভদ্রার গানেব সুর মহেন্দ্রর বুকের কাছে আশ্রয় নিতে, পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়তে, একটি অল্পবয়সী মেয়ের মতো লজ্জাকে জয় করার চেষ্টা করছে।

ক্ষমাও এসেছিল, বলল, 'মাস্টারমশাই, ধন্যবাদ দিতে এলাম। বইটি পড়ে ফেলেছি বিকেল থেকে বসে বসে। আলোচনাও হয়েছে সুধীরের সঙ্গে। ডক্টরেট পাওয়ার মতো নতুন কিছু বলা হয়নি বইটিতে। *সুধীর বলছিল লা গার্দিয়ের যে স্থান ওদেশের বায়োলজির লিটারেচরে সেটা আপনার প্রাপ্য হয়েছে দেশে। আমি অতটা বলি না। তাহলেও বিজ্ঞানেব বই সাধারণের বুদ্ধির আওতায় এনে দেওয়ার প্রথম*

সম্মান আপনার'।

এই বলে ক্ষমা আর-একটু খুঁটিনাটি আলোচনা করল। অবশেষে বলল, 'কিন্তু এতসব করলেন কখন'?

মহেন্দ্র কিছুই বলল না। গড়গড়ার নলটা—এটা ধরেছে মহেন্দ্র মেদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে—আরো একটু আমিরি চালে ধরে অতি নরম কুশনে পিঠ রেখে মৃদুমন্দ হাসতে লাগল।

কোথায় প্রতিভা এ খোঁজ করতে গিয়ে—প্রতিভা নেই তার, সাধারণ সে, এই বলে দুঃখ করতে গিয়ে যেসব কথা কখনও মনে হয়েছে, তার কিছু কখনও লিখে রেখেছিল মহেন্দ্র ; তারই কয়েকটি ছেঁড়া ছড়ানো পাতা যোগ করে সুধীর একখানা বই করেছে, এতে মহেন্দ্রের কী-বা বলবার আছে। বইখানিতে তার যে মনের ছাপ আছে সে মন এখন তার নেই। এখন সত্য বোধ হচ্ছে এই নরম শয্যায় এই মধুরগন্ধি অম্বুরিটি। পৃথিবীতে বাঁচার জন্য সঞ্চয় করতে আর সাধ যায় না, যেমন দুঃখ নেই সঞ্চয় হয়নি বলে! ভালো লাগছে ক্ষমার ধন্যবাদ দিতে আসাটা। উপেন্দ্র, ময়ী, ক্ষমা, সুধীর এরা সবাই তার কাছে এসে বলেছে, তুমি কিছু-একটা করেছ। এটা তার সন্ধ্যাটিকে খানিকটা রসাল, খানিকটা সবল করে দিচ্ছে। এটাই কি তার সঞ্চয়?

খাবার ঘরে গিয়ে দেখল মহেন্দ্র উপেন্দ্রর উৎসাহের আরো খানিকটা—এত আয়োজন করেছে। ক্ষমাকে বাড়ি যেতে দেয়নি। সুধীরকেও ধরে এনেছে।

মহেন্দ্র হাসিমুখে বলল, 'ব্যাপার কী রে'?

উপেন্দ্র বলল, 'মানে, বইটি লিখে কিছু টাকা পাওয়া যাবে, তখন তার সৎ ব্যয়ও করা উচিত'।

সুধীর হেসে বলল, 'আগাম হল যে'?

উপেন্দ্র বলল, 'আগাম সব জিনিসই মধুর। ছেলেকে স্কুলে দিয়ে ভাবি ছেলে বড় হয়ে সুধীরবাবুর মতো বিদ্বান হবে, আনন্দটা তখনই হয়। ছেলে বড় হয়ে কী হনুমান হবে, তা দেখার জন্য অপেক্ষা করলে আনন্দ হয়, বলুন'?

উপেন্দ্রর ধরনটাই এই, ভাবল ময়ী। লোকটি কোলাহল করে নিজের কোমল বৃত্তি জাহির করে না, তার উদাস দৃষ্টি দেখে মনে হয় না কখনও সংসারের খুঁটিনাটি জিনিসে এত তার আকর্ষণ, এত গভীর আস্থা তার জীবনের উপকরণে। মনে হয়, লোকটি যেন খুশি হতে শিখেছে সাধনা করে। উচ্ছল আনন্দ নয়, রসাল স্বল্পপ্রকাশ গভীর খুশি। প্রধান হওয়ার কলাকৌশল সে আয়ত্ত করেছে। পৃথিবী যাদের ক্বচিৎ আশীর্বাদে নন্দিতা এমন কোনো বৃদ্ধ সে হবে। সংসার সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান যাদের চোখের কোণে হাসি হয়ে ফোটে, ঠোঁটের কোলে ছড়ার ছন্দে স্পন্দিত হয় এমন এক ঠাকুরদাদা হবে সে।

সেদিন রাত্রিতে একটি সাধারণ মেয়ের মতোই বলল ময়ী, 'চোখ বোঁজো তো, গরম লাগছে, জামাটা খুলব'।

উপেন্দ্রর কাঁধের কাছে মাথা রেখে ময়ী ভাবল : জীবনের একটা প্রান্ত যেন মহেন্দ্র ধরতে পেরেছে। বেঁচে থাকার সার্থকতা কি এই ধরতে পারাটুকু? কিম্বা এই ধরার জন্য পথের ধুলোয় যে ক্লান্ত পদচিহ্ন রেখে মানুষ ছুটে চলেছে সেগুলিই সার্থকতা?

নিজের কথাও সে ভাবল : লজ্জায় কানের পাশ দুটি লাল হয়ে ওঠে যখন মনে হয় স্বাস্থ্যমণ্ডিত দেহটি এখনও উপেন্দ্রর উপাসনার বিষয় হয়ে আছে। সাধনা কি এর জনাই? মনটা এখনও ভালোবাসার আঁধার ও আলোকে শঙ্কায় ও খুশিতে বিহ্বল হয়ে ওঠে উপেন্দ্রের সান্নিধ্যে। এই কি তার বেঁচে থাকার সার্থকতা? কিম্বা সফলতা এই দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের প্রতিদিনের ইতিহাস?

রাগ করে সে সঙ্গিনীকে অনেকদিন চিঠি লেখেনি, তার কথাও মনে পড়ল। একটা মানুষের সাধারণ কতকগুলি শিশুকে লালিত করতে তার সঙ্গিনী জীবনটাকে ব্যয় করে দিলে—এই অভিমান হয়েছিল ময়ীর। কিন্তু সঙ্গিনী পালটা অভিমান করেনি। অনেক দেরিতে হলেও লিখেছে সে। অন্যান্য খবরের মধ্যে এটাও জানিয়েছে সে, বড়ছেলে এবার কলকাতায় পড়তে আসবে, গরিবের সংসারে টানাটানি হবে।

লিখেছে সে :

> আমি বলেছিলাম—কলকাতায় তোদের এক মাসি আছে, রানীর মতো। সে তোদের মায়ের চাইতে কম ভালোবাসবে না। শুনে বড়ছেলেটা তবু আনমনা হয়, ছোটটা রুখে ওঠে। সে বলে—আমি চালাব দাদার খরচ। আমার ভয় করে ভাই, এমনি দুর্বল, দুটি ছাত্র পড়িয়ে দাদার খরচের কিছুটা যোগাড় করছে, থাইসিস বা কিছু-একটা ধরে না-ফেলে। আমি কিছু বললে বলে—তুমি বেঁচে থাকো মা, তুমি গায়ে হাত বুলিয়ে দিও একটু, আমরা পারি না কি?

সেই পুরনো কথা।

তবু সোহাগে ঘুমে চোখ যখন মুদে আসছে, ময়ী সঙ্গিনীর কথা বলল উপেন্দ্রকে। বলল সে 'ওর সংসারটা একবার দেখতে ইচ্ছা করে। ও কি সার্থক হল'?

তারপর তার নিটোল ঠোঁট দুটো কাঁপল কোন অভিমানে যা স্নিগ্ধ অলস অনেক গভীর থেকে উঠে আসা অশ্রুর মতো হতে পারে।

নাটক

মহাসত্ত্ব

স্থান : অরিশিরোমণিবিভূষিতপাদ শ্রীমল্লক্ষণসেনের নবদ্বীপের নিকটস্থ স্কন্দাবার। এখন যাকে বল্লালটিপি বলে, জায়গাটা তার কাছাকাছি হবে। স্কন্দাবার বলতে কিন্তু তাঁবুর ব্যবস্থা নয়, সুপরিকল্পিত নগর, রাজার মত পরিবর্তিত হলে কিম্বা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে পরিত্যক্ত হতে পারে বলে স্থাপত্যের সর্বত্রই সাময়িকতার ছাপ আছে। কিন্তু রঙ্গশালাটির স্থাপত্য লক্ষণীয়। যে-রকম স্থাপত্যের নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিকরা এখনও আবিষ্কার করতে পারেননি তেমন একটি গঠন এই রঙ্গশালার। স্থপতি অভিনবত্ব দেবার চেষ্টা করেছে এটাই তার প্রমাণ। ঠিক যেন রোমের কোনো বৃত্তাকার গ্যালারি, শুধুমাত্র আয়তনে ছোট। গ্যালারিগুলির পারস্পরিক উচ্চতা নগণ্য এবং ধাপে-ধাপে নেমে না-এসে চারিদিকের দেয়াল থেকে বৃত্তের মধ্যবিন্দুর দিকে সামান্য ঢালু হয়ে নেমে এসেছে মেঝে। বৃত্তাকার প্রেক্ষাগৃহের ঠিক মাঝখানে গৃহতল থেকে সামান্য উঁচু একটি চতুষ্কোণ মঞ্চ। এটাই রঙ্গমঞ্চ। রঙ্গমঞ্চটির ঠিক মাঝখানে একটি স্তম্ভ। এটির প্রয়োজন শুধুমাত্র আলোকসজ্জার জন্য। স্তম্ভটির গায়ে খোদাইকরা নগ্নিকা মূর্তিগুলির সব ক'টির হাতেই আলোকাধার। স্তম্ভটির উপরে একটি স্বল্প আয়তন চন্দ্রাতপ। চন্দ্রাতপটি থেকে পেতলের ঝকঝকে শেকলে বড়-বড় কয়েকটি প্রদীপ ঝুলছে।

গ্যালারিটি কিন্তু পূর্ণবৃত্ত রচনা করতে পারেনি। চতুষ্কোণ মঞ্চটির বাহুগুলির সমান্তরালে কয়েকটি চাপ রঙ্গাগারের বৃত্তকে খণ্ডিত করেছে। এই চাপগুলি দেয়াল। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের এইরকম দেয়াল দু'টির পেছনে নট-নটীদের নেপথ্যঘর বা গ্রীনরুম। পূর্বদিকের দেয়ালটি কারুকার্যখচিত, দূর থেকে মনে হয় যেন স্তম্ভ গবাক্ষ ইত্যাদি সমন্বিত একটি রাজপ্রাসাদের অঙ্গ। উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকের দেয়ালগুলির প্রত্যেকটিতে একাধিক দরজা জানালা আছে। নাটকের সময়ে এইসব দরজা দিয়ে নট-নটীরা মঞ্চে প্রবেশ ও প্রস্থান করে, জানালা দিয়ে মুখ বার করেও তাদের কথা বলতে দেখা যায় অভিনয়ের প্রয়োজন মতো। ফলে দর্শক আর নট-নটীদের পার্থক্য ঘুচে গিয়ে দর্শকরাও নিজেরাই যেন অভিনয়ের অংশ হয়ে পড়ে। পূর্বদিকের দেয়ালটি সাধারণত স্বর্গ, রাজান্তঃপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়, এবং নাটকের প্রয়োজন অনুসারে উত্তর ও দক্ষিণের ঘরগুলি পৃথিবী, পাতাল, মগধরাজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের প্রতিরূপ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। মনে করুন কোনো এক নাটকে কুরু-পাণ্ডব উভয়পক্ষই দেখাতে হবে, সেক্ষেত্রে রণস্থল, বনস্থলী ইত্যাদি হবে। চতুষ্কোণ মঞ্চটুকু আর নেপথ্য বিধানের ঘরগুলি হবে কুরু ও পাণ্ডবের পৃথক-পৃথক শিবির।

রঙ্গাগারটির প্রবেশপথ পশ্চিমদিকে, পথ থেকে দু'থাক সিঁড়ি উঠে রঙ্গাগারের মেঝেতে পৌঁছানো যায়। যে-লক্ষ্যণীয় ব্যাপারটি এতক্ষণ বলা হয়নি সেটা হচ্ছে, রঙ্গাগারের ছাদ নেই। নেপথ্যবিধানের ঘরগুলি ছাড়া রঙ্গাগারের সবটুকুই খোলা আকাশের আলো পায়। এছাড়া সবগুলি প্রদীপ জ্বললে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিতেও পূর্ণিমার রাত্রির মতো আলো হয় মঞ্চটিতে।

মঞ্চের অত্যন্ত কাছে খানকয়েক ধাতব আসন ইতস্তত স্থাপিত আছে। সম্ভবত অনন্যসাধারণ দর্শকদের জন্য।

কাল : আনুমানিক ১১৭৫ খ্রিস্টাব্দের একটি ঘটনাসমৃদ্ধ সন্ধ্যা ও রাত্রি।

এখন সন্ধ্যা। প্রবেশ সোপানের দু'পাশে দু'জন বল্লমধারী সৈনিক পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। এদেব আকৃতি বাঙালির বলে মনে হয় না। এরা ব্রহ্মক্ষত্রিয়। সেনরাজাদের সঙ্গে যারা এসেছিল তাদেরই বংশধব। বাজনীতির প্রয়োজনে এরা নিজেদের রক্তের বিশুদ্ধতা বাঁচিয়ে রয়েছে। 'রাজকীয় সান্ত্রিবাহিনী' বলে যে-বিশেষ সৈন্যদল আছে এরা তারই অঙ্গীভূত। সেকালের দু'একজন বাঙালি এই বাহিনীর সান্ত্রি হতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করেছে। এদের মাথার চুলগুলি চূড়া করে বাঁধা, বাঙালিদের বাবরি চুল নয়। এদের মুখাবয়বেও ককেশীয়-সুলভ তীক্ষ্ণতা আছে, সাধারণত বাঙালিদের ক্ষেত্রে যা দুর্লভ।

নে প থ্যে

প্রথম। নাটকটা কী গো?

দ্বিতীয়। ধোয়ীর নয়, জয়দেবের নয়, এমনকী সারন কবিরও নয়। তাদের হলে বলতে পারতাম। এ এক নতুন কবির নাটক।

তৃতীয়। দেখা শোনা যাবে তো?

প্রথম। ভীমা কামার দেখেনি এমন নাটক আবার নবদ্বীপে কবে হল?

তৃতীয়। এগিয়ে দ্যাখো না ভীমাদাদা।

প্রথম। পেছনে থাকিস কিন্তু আমার পেছন দিকটাতেই ভয়-ভয় করে।

সামান্য হাসাহাসির শব্দ। অল্পপরে প্রবেশ-সোপানের একপ্রান্তে ভীমার দেহের উর্ধ্বাংশ এবং তার মুখখানি দেখা গেল। প্রকাণ্ড একটি কাঁধের উপরে মস্ত একটা মাথা, চওড়া বুক। মুখভরা হাসি।

ভীমা। ভাইগো, শুনছেন, একটু রং তামাসা দেখব।

প্রথম সান্ত্রি। যাও, যাও। এখানে আজ সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। রাজকুমার আর তাঁর বন্ধু-বয়স্যরা নাটকের মহলা দেখবেন।

ভীমা। মশাইগো, বড্ড সখ হয়েছে প্রাণে নতুন কবির নাটকটা দেখি।

প্রথম সান্ত্রি। ঝামেলা কোরো না, যাও।

ভীমার মুখ অন্তর্হিত হল।

দ্বিতীয় সান্ত্রি। নেমন্তিৎ চিনবার উপায় কী? (প্রথম সান্ত্রির দিকে এগিয়ে)

প্রথম সান্ত্রি। কোনো উপায় নেই, মহলায় আবার নেমন্তন্ন কি? দেখতে হবে ভিড় না-হয়। আর কোনোক্রমেই ওরা না-আসে। (গলা নিচু করে) কবির এই প্রথম নাটকের মহলা, রাজকুমার চান না দেখলে যাদের পাপ হয়, সেই বৌদ্ধরা কেউ উপস্থিত থাকে। (স্বাভাবিক গলায়) তাহলে বুঝতে পারছ, অনিমন্ত্রিত কেউ যেন উপস্থিত না-থাকে।

দ্বিতীয় সান্ত্রি। উঁ-হুঁ।

প্রথম সান্ত্রি। ও কী?

দ্বিতীয় সান্ত্রি। মানে, চেষ্টা করছি গলা ওঠানামা করতে। (দু'জনে হাসল) ওটা কি তোমার বেশি নাটক শোনার ফল—ঐ গলা তোলপাড় করে কথা কওয়া?

প্রথম সান্ত্রি। আজ সকালের আদেশ শোনোনি? জাতধম্মের কথা তুলে বৌদ্ধদের মনে কষ্ট দেয়া আর চলবে না। আমাদের রাজা ধম্ম পতিপক্ষ।

দ্বিতীয় সান্ত্রি। ধম্ম পতিপক্ষ নয়, কথাটা ধম্ম নিরংপক্ষ।

প্রথম সান্ত্রি। তা যাই বলো মাঝে মাঝে গাল না-দিলে ওরা খুব বেড়ে যাবে।

দ্বিতীয় সান্ত্রি। বুদ্ধি করে গাল দিতে হবে আর কি।

দু'জনে বিপরীত মুখে হাঁটতে শুরু করল, খানিকটা গিয়ে থামল, ফিরে এসে আবার মুখোমুখি হল।

দ্বিতীয় সান্ত্রি। নাটকটা আমরা দেখতে পাব তো?

প্রথম সান্ত্রি। অভিনয়ের রাত্তিরে যদি ভেতরে পাহারা হয়, তবে তো।

একটু ঘুরে এসে আবার।

দ্বিতীয় সান্ত্রি। আমার মামা বলেছিলেন, সান্ত্রি আবার নাটক শোনে কবে? আমরা নাটক দেখে গান শুনে বেহন্নলা হয়ে পড়েছি, তাদের সময়ে নাকি সবাই ভারি-ভারি অজর্জুন ছিল।

প্রথম সান্ত্রি। রাখো ওসব বুড়োদের বুড়োমি। নিজের কালকে সবাই ভালো বলে। ওদের সময়ের অস্ত্রগুলো দেখেছ? বল্লমগুলি ছিল সোজা-সোজা বাঁশের গায়ে বসানো লম্বা লোহার ফলা। ফলার পিছনে এই আড়াআড়ি ফলাটাও ছিল না, আর উল্টোদিকের এই বশুলও ছিল না।

দ্বিতীয় সান্ত্রি। ওরা বলে যুদ্ধের সময়ে এতে অসুবিধাই হবে।

প্রথম সান্ত্রি। যুদ্ধ লাগে না, পরীক্ষা হয় কী করে?

দু'জনে সোপানের প্রান্তের দিকে সরে যেতে-যেতে ক্রমে অদৃশ্য হল। কিছুক্ষণ পরে মালবিকা ও মালঞ্চমালা নামে দু'জন নটী প্রবেশ করল। তাদের হাতে ধূপদীপাদি মঙ্গলাচবণের উপচার।

মালবিকা। এখানে যুবরানী আসবেন কি গো, এখানে কি মহিলাদের ব্যবস্থা আছে? নতুন কবির নাটকের জন্য নতুন রঙ্গশালা হল। শুনছি পরে সাজঘরগুলিকে বদলে মহিলাদের বসবার জায়গা হলেও হতে পারে।

মালঞ্চমালা। নগরের উত্তরে নাকি আর-একটি হচ্ছে।

মালবিকা। সকলের মুখেই শুনছি। সেটা বৌদ্ধদের জন্যই বিশেষ করে হচ্ছে। মহারাজা তাঁর বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রজাদের সকলকেই সমান সুবিধা দিতে চান।

মালঞ্চমালা। তাহলে দু দলের জন্যে আলাদা কেন, এক জায়গায় বুঝি সমান সুবিধা দেয়া যায় না?

এরা আলাপ করতে-করতে মঞ্চের উপরে একটি সুদৃশ্য সোনার প্রদীপাধার, ধূপাধার রেখে জ্বালিয়ে দিল। একটি সপল্লব পূর্ণ কলস রেখে তার গায়ে সিঁদুর দিয়ে স্বস্তিক চিহ্ন এঁকে দিল।

মালঞ্চমালা। নাকি এক নতুন নটীও এসেছে?

মালবিকা। সোমা তার নাম।

মালঞ্চমালা। আমাদের সোমার কথাই বাইরের লোকের মুখে অমন শতখানা হয়ে আমাদের কানে আসছে? যাই বলো, অপূর্ব সুন্দরী।

মালবিকা। নটী অপূর্ব সুন্দরী হলে তোর লাভ কী? তার পথের উপরে একটি ফুল ফেলে দেয়া যাবে না, স্মরণ করে রাত জেগে থাকাও যাবে না।

মালঞ্চমালা। তুমি যেন কেমন, মালা!

একটু হাসাহাসি।

মালবিকা। রাজান্তঃপুরে ভালোই ছিল, এখন ওর সুনামে আমাদের অখ্যাতি।

মালঞ্চমালা। তা হোক।

মালবিকা। তাহলে তুই ওকে ভালোবাসিস?

মালঞ্চমালা। অমন রূপ, অমন স্বভাব। কিন্তু এখানে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ওর আসা ভালো হয়নি। রাজপুরীর চাইতে পরিশ্রমও এখানে বেশি।

মালবিকা। আসল খবর কী জানিস? সোমাকে নিয়ে যুবরাণীর স্বস্তি ছিল না। শয়নকক্ষের পরিচারিকা, না-যায় তাকে বাদ দিয়ে চলা, না-চলে তাকে রাজকুমারের সামনে আসতে দেয়া।

মালঞ্চমালা। কেন, বৌদ্ধ বলে?

মালবিকা। তা নয়, ও নাকি যথেষ্ট সুলক্ষণা নয়।

মালঞ্চমালা। লক্ষণের মুখে ছাই, এই রূপ কখনও কুলক্ষণ হতে পারে? এরা যে কী মনে করেছে বুঝি না। মানুষ যেন বেলেপাথরের মূর্তি, তার বুকের মাপ এতটা হবে, তার বর্তুলতা সে-রকম হবে, কোমরে পরিমাপ হবে ততটা। অপমান বোধ হয় অমন সব পরিমাপের কথা শুনলে।

মালবিকা। উপায় কী বলো! সোমা যেন ঠিক বেলেপাথরের মূর্তির মতো দেখায় না। আমি শুনেছি ওকে দেখলে নাকি চোখ স্নিগ্ধ হয় না, ওর গড়নে কোথায় একটা উগ্রতা আছে। মেয়েমানুষ বলে বোধ হয় ওকে।

মহাকালের মন্দিরে আরতির বাজনা বাজতে আরম্ভ করল।

মালঞ্চমালা। চলো সময় হচ্ছে।

মালবিকা। এবার সাজ করতে হবে।

দু'জনে চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত ধরে আরতির বাজনাটা ফুলে-ফুলে উঠে নীরব হল। তারপর সূত্রধার প্রবেশ করল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। সাদা কাপড়, সাদা উত্তরীয়, দু'হাতে রুপোর অঙ্গদ। প্রবেশ করে কিছুক্ষণ ইতস্তত দেখল। স্তম্ভটির আলোকসজ্জার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য করল। তারপর উত্তর দিকের সজ্জাঘরের কাছাকাছি গিয়ে ডাকল।

সূত্রধার। মালবিকা, মালঞ্চমালা, তোমরা কি এখনও প্রস্তুত হওনি?

উত্তরদিকের সাজঘরের জানালা খুলে মালঞ্চমালা দেখল, তারপরে বেরিয়ে এল।

মালঞ্চমালা। প্রণাম আচার্য, আর-সকলে প্রস্তুত, সোমলতার প্রসাধন এখনও হয়নি।

সূত্রধার। কেন, কেন?

মালঞ্চমালা। তার কি হাস্যরসের সাজ হবে?

সূত্রধার। সে কী! তোমরা কি সোমাকে গ্রাম্য মেয়ের মতো সাজাবে?

মালঞ্চমালা। কিন্তু সে তো প্রথম অঙ্কে চুড়ো করে চুল বেঁধে গাছকোমর শাড়ি পরে নামতে চাচ্ছে।

সূত্রধার। সে কী? (একটু চিন্তা করল) তা মন্দ নয়। পনেরো-ষোল বছরের একটি মেয়ে গাছকোমর বেঁধে ছেলের দলে হুটোপুটি করলে চরিত্রের একটা বিশেষ দিক ফোটে বটে। তারপর সে বিবাহের বন্ধনে পড়লে রসের বৈপরীত্যও পরিস্ফুট হয়।

মালঞ্চমালা। তাহলে কী হবে, কিছু বললেন?

সূত্রধার। দ্যাখো, মহলার সময়ে সোমা তার খুশি মতো বেশভূষা করে নামুক। প্রয়োজন হয়, অভিনয়ের সময়ে বদলে দেয়া যাবে। সোমা আর কবি আজ দু'জনেরই পরীক্ষার দিন, কবির এই প্রথম নাটক, সোমার প্রথম মঞ্চে নামা। দ্যাখো, আমরা মাইনা করা লোক, তাদের সাহায্য করাই আমাদের কর্তব্য।

মালঞ্চমালা। তাই হবে। (সজ্জাঘরে চলে গেল)

সূত্রধার। কোন সজ্জায় ওকে মানায়, আসলে আমিই বুঝে উঠতে পারছি না। করুণ বলো, হাস্য বলো, কোনোটিতেই সবটুকু মানায় না।

দক্ষিণদিকেব সাজঘরের একটা দরজা খুলে কবি দিব্য বাব হল। আচার্যকে দেখে তাব দিকে এগিয়ে এল। কবির পরিচ্ছদ—চাঁপা রঙের কাপড় ও চাদর।

কবি। নমস্কার। শুনলাম, আজকের মহলায় নাকি আপনার প্রধানা নটী অনুপস্থিত।

সূত্রধার। তাকে আসতে বলা হয়নি।

কবি। তাকে বাদ দিচ্ছেন? তাকে দিয়ে কি ময়নামতীর অভিনয় চলল না।

সূত্রধার। না, ঠিক যেন হচ্ছিল না।

কবি। তাহলে নায়িকার ভূমিকায়?

সূত্রধার। সোমলতা। মাঝে মাঝে মহলায় বদলি হিসাবে নামত।

কবি। সে তো একেবারে নতুন লোক।

সূত্রধার। ভালোই তো, কবিও নতুন, নাটকও নতুন।

কবি। পুরনো অভিজ্ঞ নট-নটীদের বাদ দেয়া কি ভালো হবে? যে-নটীকে দিয়ে কবি জয়দেবের নাটকগুলি অভিনীত হল তাকেই বাদ দিলেন?

সূত্রধার। সোমলতার অভিনয় দেখার পর ভাবছি, কী করে অন্য কেউ এতদিন নায়িকার অভিনয় করেছে।

কবি। দেখবেন, তীরে এসে তরী ডুবে না-যায। আমি কবিবর ধোয়ীর কাছে একবার যাব। তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রণ করা হয়নি এখনও।

সূত্রধার। কবি, আমার প্রস্তাবটা ভেবে দেখেছেন?

কবি। কী? ও সেই বাংলায় কথা বলা? তা কী করে সম্ভব? এ কি কোনো নাট্যশাস্ত্রে আছে? প্রাকৃত ভাষা বড় জোব দেখা যায়, কিন্তু সাহিত্যহীন একটা দেশি ভাষার সাহায্যে নাটক লেখা যায় না। লিখলেও সেটা নাটক হয়ে ওঠে না।

সূত্রধার। কবি, বয়স হল আমার। যৌবন থেকেই এ-কাজ করছি। প্রাকৃত যাদের বলবার ভাষা ছিল, প্রাচীন কবিরা তাদের মুখেই প্রাকৃত দিয়েছেন, যদি বাঙালি ময়নামতী কান্নার সময়ে বাংলায় বিলাপ করেন, দোষের হয় না বোধ হয়।

কবি। কিন্তু আচার্য, কোথাও কি, কোনো নাট্যশাস্ত্রে দেশিভাষার প্রয়োগ দেখেছেন? এ যে ভারতশাস্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, দলত্যাগী হয়ে বিপথে যাওয়া।

সূত্রধার। পথিকৃৎ হওয়া মানেই দলত্যাগ করা—বিপথে চলার চেষ্টা।

কবি। ওসব লোভের কথায় আমার দরকার নেই আচার্যমশাই, পবনদূতের কবি যাতে যশ পেয়েছেন, জয়দেব কবি যাতে মধু ঢেলেছেন, সেই সংস্কৃত কাব্যের আদর্শই আমার আরাধ্য। ময়নামতীর বিলাপের শ্লোকগুলি কি ভালো হয়নি?

সূত্রধার। অনুপম হয়েছে, কিন্তু সোমার মুখে যদি সেগুলির বাংলা প্রতিরূপ শুনতেন।

কবি। (একটু দ্বিধা করে) না-না। তা কী করে হয়, কী করে হয়? মহলার একটু দেরি আছে তো? আমি একটু আসি। (কবি সোপানের পথে প্রস্থান করল)

সূত্রধার। কবিমাত্রেই অবুঝ। আরে দাসী কে আছিস? (নটীদের সাজঘরের দরজার কাছে একজন দাসীকে দেখা গেল) সোমাকে একটু খবর দিস।

দাসী চলে গেল একটু পরে নটীদের সাজঘবেব আর-একটি দরজা খুলে সোমলতা প্রবেশ

করল। রানী হবার উপযুক্ত চেহারা তার।

সোমলতা। আমাকে ডেকেছেন?

সূত্রধার। তোমার অভিনয় সম্বন্ধে নির্দেশ দেবার আর-কিছু আমার নেই। মহলায় এতদিন তোমাদের উপদেশ দিয়েছি। আজ দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে পুরো নাটকের মহলাটা দেখব। কবি নাটক লিখেছেন রাজপুত্রকে কেন্দ্র করে, আর অভিনয়ের রস কেন্দ্রীভূত হবে তোমার ভূমিকায়। মনে হচ্ছে, নির্দেশ না-দিয়ে তোমাকে নিজের পদ্ধতিতে অভিনয় করতে দেয়া উচিত।

সোমলতা। আপনি পিতৃতুল্য, আপনি নির্দেশ দেবেন, এটাই স্বাভাবিক।

সূত্রধার। না সোমা, ভালোকে ভালো বলতে দাও আমাকে। আজকের মহলায় রাজকুমারের সম্মুখে তুমি নিজের অভিনয় করে যাবে, নিজে যা বুঝেছ তেমনি করে নায়িকার চরিত্র ফুটিয়ে তোলো, আমি অন্যান্য নট-নটীদের চালনা করে যাব।

সোমলতা। কিন্তু যদি বাড়াবাড়ি করে ফেলি, যদি হাস্যকরভাবে নাটকীয় হয়ে যায় অভিনয়?

সূত্রধার। তোমার পা এমন নাচের ছাঁদে বাঁধা, মৃদঙ্গকে ছাড়িয়ে যেতে পারে এমন তালভঙ্গ হবে না সোমা।

সোমলতা। আপনি কি কবিকে সংলাপের কথা বলেছিলেন?

সূত্রধার। কবির মত নয় বাংলায় সংলাপ হয়।

সোমলতা। তাহলে?

সূত্রধার। সোমা নাটক শুধু কবির নয়, আমাদেরও। খানিকটা স্বাধীনতা না-পেলে আমবাই-বা কী করে অভিনয় সার্থক করি?

সোমলতা। আপনি কি রাজকুমারকে বলবেন?

সূত্রধার। দেখা যাক।

একজন সৈনিক প্রবেশ করল সোপানের পথে।

সৈনিক। মহাশয়, আপনি সূত্রধারকে চেনেন?

সোমা। তুমি তাঁর সঙ্গেই কথা বলছ।

সৈনিক। সেনানী চন্দ্রসেন আপনার সাথে কথা বলতে চান।

সূত্রধার। সানন্দে, সানন্দে। তাঁকে আসতে বলো। (সৈনিক সোপান বেয়ে চলে গেল) সোমা, তাড়াতাড়ি নেপথ্যবিধান শেষ করো। রাজকুমারের পারিষদরা আসতে শুরু করলেন, হয়তো এখনই নিজেই তিনি আসবেন।

সেনানী চন্দ্রসেন প্রবেশ করল। কটিতে তরবারি কিন্তু অন্যসব বেশভূষা কবির মতো। নীল চিনাংশুকের ধুতি ও উত্তরীয় পরিধানে, বাহুতে অঙ্গদ, কানে কুণ্ডল, মাথায় শিরোভূষণ। সোমা তাকে দেখার জন্যই দাঁড়িয়েছিল, একটা সতর্ক হাসি তার মুখে খেলে গেল। চন্দ্রসেন আরো কাছে এগিয়ে আসার আগেই সে ধীরে-ধীরে সাজঘরে প্রস্থান করল।

চন্দ্রসেন। নমস্কার, আচার্যমশাই।

সূত্রধার। আসুন-আসুন। নমস্কার, সেনানীশ্রেষ্ঠ।

চন্দ্রসেন। একটু প্রয়োজন ছিল। আচ্ছা, আপনার সঙ্গে কথা বলছিল এ-নটীটিকে যেন আগে কোথাও দেখেছি।

সূত্রধার। অসম্ভব নয়, ইনি দু'দিন আগেও রাজান্তঃপুরের পরিচারিকা ছিলেন।

চন্দ্রসেন। না, তার চাইতেও বেশি পরিচিত। যাক গে। আমি আপনার নটী সোমলতাকে খুঁজছিলাম।

সূত্রধার। এখনই, না নাটকের শেষে?

চন্দ্রসেন। এখন হলেই ভালো হয়। রাজকুমার বীরসেনের সঙ্গে আরবীয় অশ্ব বাজি রেখেছি। সোমলতার দেশ জাতি ইত্যাদি জানার উপরে সেই বাজির নিষ্পত্তি হবে।

সূত্রধার। স্বচ্ছন্দে, স্বচ্ছন্দে। কিন্তু অনেকটা সময় যেন নেবেন না।

চন্দ্রসেন। তাঁকে কোথায় পাব?

সূত্রধার আপনার সম্মুখেই তো দাঁড়িয়েছিলেন। সাজঘরের দিকে যান দেখতে পাবেন। আমিও যাই, নটদের সাজা হল কিনা দেখি।

সূত্রধর নটদের সাজঘরে প্রবেশ করল, চন্দ্রসেন নটীদের ঘরেব কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

চন্দ্রসেন। সোমলতা আছেন, সোমলতা?

একজন পবিচারিকা বেরিয়ে এল।

পরিচারিকা। কাকে চাই? কী চাই?

চন্দ্রসেন। সোমলতার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

পরিচারিকা। তিনি কি এখন কারো সঙ্গে দেখা কববেন? জিজ্ঞাসা করি আপনার নাম কী বলব?

চন্দ্রসেন। সেনানী চন্দ্রসেন।

পরিচারিকা। আপনি একটু অপেক্ষা করুন।

পরিচাবিকাব প্রস্থান, ক্ষণপবে সোমলতার প্রবেশ।

সোমলতা। আমি সোমলতা। (চন্দ্রসেন বিস্মিত দৃষ্টিতে সোমার দিকে চেয়ে রইল) আমাকে দিয়ে আপনার দরকার আছে? নটীর দিকে অমন হাঁ করে চেয়ে থাকতে নেই।

চন্দ্রসেন। তুমিই সোমলতা? তুমি কোন জাতীয়া জানতে এসেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে তোমাকে আমি চিনি। কত সুন্দর হয়েছ তুমি।

সোমা। পরিচারিকা হিসাবে অনেকসময়ে রাজসভায় গিয়েছি, আমাকে চেনা বিচিত্র নয়।

চন্দ্রসেন। তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?

সোমা। আপনাকে? শিরোভূষণ ও অস্ত্র দেখে মনে হচ্ছে আপনি একজন সেনানী। ওদেব মুখে শুনলাম আপনার নাম চন্দ্রসেন।

চন্দ্র। তা নয়।

সোমা। তবে? পূর্বজন্মের কথা বলছেন?

চন্দ্র। যদি তাই বলি, ফুল্লরা।

সোমা। ফুল্লরা? সেনানী, আপনার বাকবৈদগ্ধ্য নাগরিকার কাছে বিস্ময়ের নয়। ফুল্লরা নামটি আপনার প্রিয় তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু মানুষে-মানুষে অমন কত মিল থাকে চেহারায়।

চন্দ্রসেন। (ব্যঙ্গের সুরে) তা হবে। যদি আপত্তি না-থাকে, বলবে কি কোন জনপদ তোমার জন্মভূমি হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে?

সোমা। পদ্মার তীরে, বরেন্দ্রভূমি আমার জন্মস্থান।

চন্দ্রসেন। জাতি?

সোমা। বাঙালির উপাস্য অমিতাভ তথাগত।

চন্দ্রসেন। রাজকুমার বীরসেন জানতে চেয়েছেন কিনা ...

সোমা। আপনার নিজের বোধ হয় আর কৌতূহল নেই, সেনানী?

চন্দ্রসেন। আমরা সৈনিক। যুদ্ধ আমাদের ব্যবসা। জনসাধারণের সেবায় ঔৎসুক্যের অবসর বড় কম।

সোমা। আমরা কলাব্যবসায়ী। জনসাধারণের সেবা আমাদেরও লক্ষ্য। রাজকুমারের কাছে নটীর জাতি ও ধর্মের কথা বলতে গিয়ে নিজের ভুলটার কথাও যেন বলবেন না। সুন্দরীদের সঙ্গে নিগূঢ় জন্মার্জিত সম্বন্ধ অনুভব করা অনেক পুরুষের পক্ষেই স্বাভাবিক।

সম্ভব হলে চন্দ্রসেন সোমাকে ভস্মীভূত করত। সে একটা ভ্রূকুটি করে প্রস্থান কবল। সোমলতাও তার দিকে চেয়ে রইল। মালঞ্চমালা প্রবেশ করল।

মালঞ্চমালা। ওরা বলছিল সেনানী চন্দ্রসেন। তাহলে এ-ধরনের কথা বলা ভালো হয়নি।

সোমা। তুমি কি আমাদের আলাপ শুনছিলে?

মালঞ্চমালা। হ্যাঁ। সেনানী চন্দ্রসেন মহারাজকুমার বীরসেনের বয়স্য। ব্রহ্মাক্ষত্রিয়। অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যের অন্যতম প্রধান সেনাপতি হবেন এ-রকম সম্ভাবনা আছে। কোমবে কৃপাণ বাঁধা সেনাপতি নন, বিচক্ষণ কৌশলী বলেও নাম আছে।

সোমা। তবু ভালো বীর হিসাবে বিখ্যাত নয়। কিন্তু অভিনয়েব সময় প্রায হয়ে এল। তোমাব এখনও সাজা হয়নি।

মালঞ্চমালা। কেন আর কী করতে হবে?

সোমা। সেটা যদি বুঝতে তাহলে কি দুঃখ ছিল। বেনি বাঁধলে হবে না, চুল তোমাকে খুলে রাখতে হবে। যে রাণীর পুত্রশোক উপস্থিত তাকে শোক প্রকাশই করতে হবে—শাস্ত্রীয় মুদ্রা নয়। যাও।

মালঞ্চমালা সাজঘরে প্রবেশ করল ; মালবিকা অদূরে কোমবে হাত দিয়ে দাঁড়িযে এদেব কথা শুনছিল। এবার সে এগিয়ে এল।

মালবিকা। সোমা...

সোমা। তোমার আবার কী হল?

মালবিকা। এখানে আপাতত নির্জন, গুটিকয়েক কড়া কথা তোমাকে এইবেলা শুনিয়ে দি।

সোমা। এখন না-হলেই নয়? বলো তাহলে।

মালবিকা। এ তোর কোন দিশি ব্যাভার ফুল্লরা? আর কতদিন এমনি অভিনয় করতে হবে?

সোমা। অভিনয়? তোমার কি ধারণা আমি তোমাকে নিয়ে শহরে এনেছিলাম সেনানীদের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে অভিনয় করে যেতে? কিম্বা অন্য কথায় নিজের পরিচয় গোপন রেখে উদ্দেশ্যসাধনের সুযোগ খুঁজতে? আমি রঙ্গমঞ্চের নায়িকা, জীবনের নয়। পরিচয় হয়তো গোপন রেখেছি ...

মালবিকা। কেন, তাই বল।

সোমা। ভয় করি বলে।

মালবিকা। তুই করিস ভয়? কাকে?

সোমা। কাকে নয়, কারো-কারো রাজনৈতিক-প্রেম।

মালবিকা। চন্দ্রসেনের প্রতি তুই চিরদিনই এমনি অবিচার করবি? যদি তোকে এতদিন নেবার সাহস না-পেয়ে থাকে তার কারণটাই কি তুই অনুসন্ধান করেছিলি? বৌদ্ধ-অর্ধাঙ্গিনী নিয়ে তার পক্ষে আজকের এই উন্নতি করা সম্ভব হতো? এখন সে পারে যে-কোনো সমাজ থেকে স্ত্রী আনতে।

সোমা। তোর কথাটা সাজালে কী দাঁড়ায় জানিস? স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি। কিন্তু আমার অ-রাজকীয় কুলটাকে আমি দুষ্কুল ব'লে মনে করি না, এই যা গোলমাল।

মালবিকা। শত হলেও সে বাল্যবন্ধু। উচ্চাশায় সে যদি অন্ধ হয়ে থাকে সাময়িকভাবে?

সোমা। এখন তাকে তুই চক্ষুষ্মান কর না।

মালবিকা। যদি করি, জানিস, সে তোকে যাতে আরো দেখতে পায় তার জন্যে।

সোমা। বেশ তো। আমি কি তাঁকে আমার কাছে আসতে মানা করেছি? সামান্যা নটী আমি, তাঁর মতো রাজপুরুষকে প্রত্যাখ্যান করি এমন সাধ্য কী আমার? তিনি সহস্রচক্ষু হয়ে আমাকে দেখুন।

মালবিকা। তোর হৃদয়টাকেও কি তুই পদ্মায় বিসর্জন দিয়ে এসেছিস? তুই কিছুতেই বুঝবি না উচ্চাভিলাষী পুরুষের পক্ষে প্রেমাস্পদাকে সাময়িক উপেক্ষা করা অস্বাভাবিক নয়।

সোমা। তুই উচ্চাভিলাষ, হৃদয়, এসব কত কী বলছিস। এখুনি মহলা শুরু হবে। তুই দেখবি উচ্চাভিলাষ আমারও আছে, হৃদয়ও আমি বিসর্জন দিইনি।

মালবিকা। নটীর হৃদয়! বৃদ্ধা লোলচর্মা, উপেক্ষিতা এক নটী এই তোর পরিণতি।

সোমা। তুই বড্ড রাগ করেছিস, এবার চল। হ্যাঁরে, আমাদের তথাগত জরার যেন কী একটা প্রতিকারেব কথা বলেছেন? চল, পরে সে-আলোচনা করব।

দু'জনে সাজঘবে ফিবে গেল। সোপানের বিপবীত প্রান্ত থেকে প্রহরীদ্বয় এসে মুখোমুখি দাঁড়াল।

প্রথম সান্ত্রি। পাহারার কাজে আগে টহল দেয়াই ছিল নিয়ম, দাঁড়ানোটা ব্যতিক্রম, এখন দাঁড়ানোই নিয়ম, টহলটাই ব্যতিক্রম।

দ্বিতীয় সান্ত্রি। বদলাল কেন?

প্রথম সান্ত্রি। সবকিছুর কাবণ কি বলা যায়?

দ্বিতীয় সান্ত্রি। এটায় যায়। টহল দিতে থাকলে বাধা হিসাবে আমরা বৌদ্ধদের চোখে পড়ব। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে অতটা নজরে পড়ব না। বাধা দেব বটে, বাধা হিসাবে চোখে পড়ব না।

প্রথম সান্ত্রি। (হো-হো করে হেসে উঠে) সাবাস আবিষ্কার করেছ। এটা একটা সূক্ষ্ম কৌশল বটে, আমাদের নগরপালের কাছে এমন সূক্ষ্মতাই আশা করা যায়।

দ্বিতীয় সান্ত্রি। পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

প্রথম সান্ত্রি। আরে ও কে? কী বিপদ।

আমাদের পূর্বপরিচিত ভীমা কামারকে সোপানের গোড়ায় দেখা গেল। তার বেশ পরিবর্তন হয়েছে। পরিধানে ছেঁড়া হলুদ রঙের একটা আলখিল্লা।

ভীমা। বুদ্ধং সারনং গচ্ছেমঃ

দ্বিতীয় সান্ত্রি। কী বিপদ বৌদ্ধ যে ...

প্রথম সান্ত্রি। এবার সামলাও। ও যদি ভেতরে যেতে চায় ...

ভীমা। সান্ত্রিমশাই গো।

দ্বিতীয় সান্ত্রি। দেখুন, আপনি ভেতরে গিয়ে কী করবেন? এখানে এক নাটক হচ্ছে মাত্র।

ভীমা। সান্ত্রিভাই গো, আমি একটু নাটক দেখতে চাই।

প্রথম সান্ত্রি। না-না, ওসব হবে না। এটা বৌদ্ধদের নয়।

দ্বিতীয় সান্ত্রি। ভুলে গেছ নাকি ওদের সঙ্গে প্রকাশ্যে এসব কথা বলা যায় না।

ভীমা। হ্যাঁ, জোর করে বাধা দেয়ার নিয়মও নেই।

প্রথম সান্ত্রি। কিন্তু আমাদের চাকরিটা রাখতে হবে তো, আপনি বাধা পাবার আগেই সরে পড়ুন।

ভীমা। কেন, আমাকে দেখলে কি পাপ হয়?

প্রথম সান্ত্রি। আমরা কিন্তু আপনাকে ওসব কথা বলিনি।

দ্বিতীয় সান্ত্রি। দেখুন মশাই, আমরা আপনাকে বাধা দিতে চাই না, কিন্তু আপনারও কি বাধা পাবার চেষ্টা করা উচিত?

ভীমা। আপনারা বাধাই দিন।

প্রথম সান্ত্রি। কী মুশকিল, কী মুশকিল। (কিন্তু বাধা দেবার চেষ্টাও করল না)

দ্বিতীয় সান্ত্রি। আরে, ভীমা না? হ্যাঁ? তুমি আবার বৌদ্ধ হলে কবে। রোসো...

বল্লম তুলে তাড়া করার ভঙ্গি করল।

ভীমা। এখন খুব বীরত্ব না?

প্রথম সান্ত্রি। আচ্ছা লোক তো তুমি? (হাসতে শুরু করল)।

ভীমা হো-হো করে হাসতে হাসতে চলে গেল।

দ্বিতীয় সান্ত্রি। কিন্তু সত্যি যদি কোনো বৌদ্ধ আসে ...

প্রথম সান্ত্রি। সত্যিকারের বৌদ্ধরা প্রায়ই আসে না।

দ্বিতীয় সান্ত্রি। আসবে, আসবে। একদিন কর্তাদের চোখের সম্মুখে পাহারা দিতে-দিতে ওদের মুখোমুখি পড়ে যাব।

প্রথম সান্ত্রি। সেদিন না-পারব সূক্ষ্মভাবে আটকাতে, না-পারব পথ ছেড়ে দিতে। চাকরিটা যাবে। ঐ দ্যাখো এবার বড়রা আসছেন।

টহল দিতে শুরু করল। নগরপাল, কবি ও শ্রেষ্ঠী জয়পাল প্রবেশ করল। প্রহরীরা সোপানের মাঝামাঝি জায়গায় যুক্তভাবে নগরপালকে সম্মান জানাল। নগরপাল রঙ্গশালায় উঠে দাঁড়াতেই প্রহরীরা চলে গেল।

কবি। বন্ধু সামন্তসেন।

নগরপাল। তুমি খুব বিচলিত হয়ে পড়েছ কবি।

কবি। তোমার এ-অনুযোগের সত্যতা স্বীকার করি। কিন্তু ভেবে দ্যাখো, যদি ব্যর্থ হয়ে যায় আমাদের কাব্য? বৃথা উচ্চাশার বেদনা থাকবে, আর পরের যশের প্রতি মাৎসর্য।

নগরপাল। তা হবে না। নাটকের চরিত্রের নতুনত্বই যা একটু অসুবিধা করেছে, নতুবা অন্য সব বিষয়ে অনবদ্য হয়েছে তোমার নাটক।

জয়পাল। তাহলে চরিত্র বাদ দিলেই হতো।

নগরপাল। কবিরা যখন কথা বলেন, তখন ওসব শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। কবি, তোমার দেখছি উদ্দেশ্য ভালো নয়।

কবি। যদি একযুগে শ্রেষ্ঠীরা জেতবন দান করতে পেরে থাকে এ-যুগে একটি প্রাসাদ দান

করতে পারবে না কেন?

জয়পাল। কী বললে, কী দান করার কথা বলছ?

নগরপাল। দেখলে কবি, শেঠ অমনি সতর্ক হয়ে গেছে।

জয়পাল। না-না, সতর্ক হবার কিছু নেই। এক খণ্ড বিষাদ না, কী বললে?

নগরপাল ও কবি হেসে উঠল।

কবি। বিষাদ তোমাকে দান করতে হবে না বন্ধু, ও তোমার ভাণ্ডারে নেই আমি জানি।

জয়পাল। এটা কিন্তু আনন্দের কথা কবি। কৃষ্টির এই স্বর্ণযুগে শ্রেষ্ঠী জয়পালের মতো কট্টর ব্যবসায়ীও কাব্যরস আস্বাদ করতে চায়।

জয়পাল। আমাকে কি বললেন—স্বর্ণযুগ? আমি কি স্বর্ণবণিক না নাথযুগী?

নগরপাল। দেখলে কবি, তোমার সান্নিধ্যে কী রকম ভাষাজ্ঞান হয়েছে শেঠের?

কবি। (হাসতে-হাসতে) না-না, সুবর্ণবণিক নয়। বণিক কুলের স্বর্ণ, বণিক সুবর্ণ বরং বলা যায় আপনাকে।

জয়পাল। নগরপাল, আপনার কি এখনও সন্দেহ আছে আমি ...

নগরপাল। থামো-থামো শ্রেষ্ঠী, তোমার হাস্যরসের একান্ত অভাব। তোমাকে যদি হীন সুবর্ণবণিক বলে জানা যেত তাহলে রাজকোষের ভার দেয়া হতো না।

মহারাজকুমাব বীবসেন ও চন্দ্রসেন প্রবেশ কবল। প্রহবীরা সোপানের প্রান্ত থেকে একটু এগিয়ে সংবর্ধনা করল এবং সবে গেল। বাজকুমাবেব উৎসবের বেশ। বলয, অঙ্গদ, হাব, কুণ্ডল, মুকুট, উত্তরীয় এসবই উৎসবের উপযুক্ত।

বীরসেন। দেখেছ চন্দ্রসেন, বাজ্য আমাদের কতদূর অগ্রসর। শ্রেষ্ঠী জয়পালও নাটক দেখার জন্য উদ্গ্রীব।

চন্দ্রসেন। নিঃসন্দেহে।

বীরসেন। তোমাকে বলেছি বিক্রমাদিত্যের যুগ অপেক্ষা এটা কোনো অংশে ছোট নয়।

চন্দ্রসেন। একথা আমারও মনে হয়েছে। কালিদাসের নাম সকলের মুখে-মুখে, তেমনি একদিন মহাকবি ধোয়ীব নামও ছড়িয়ে পড়বে। এখনও যে ভাবতবর্ষের সবাই সে-সত্যটা স্বীকার করছে না তার কারণ কবির সম্মান হয় মৃত্যুর পরে।

বীবসেন। অথচ ভাবো বল্লাল সেনের পূর্বেকার কথা। পাল রাজাদের সবই ছিল, ছিল না শুধু সমাজজ্ঞান। কী করে সমাজের স্তরে-স্তরে সভ্যতার সৌরভ বিস্তৃত করে দেয়া যায়, সে-ধারণা ছিল না। বঙ্গ-বগধা। একটা জাতি সভ্যসমাজে বিহঙ্গ বলে পরিচিত হয়েছে। গৌড়ভুজঙ্গ মহারাজ শশাঙ্ক, দ্বিতীয় দাশরথি রামপালদেব, এঁদের আমি মহান বিবেচনা করি, কিন্তু তাঁদের সময়েও দেশের বৃহত্তর একটা অংশ অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছিল। তারা তাদের মতো ভূত-পিশাচের পূজা নিয়ে মত্ত ছিল। রাজার চারিদিকে সভ্যতার আলো ছিল, সেটা বড়জোর প্রাসাদ-প্রাঙ্গণ পর্যন্ত পৌঁছাত। কিন্তু আজ! আর্যসভ্যতার এমন বিস্তার কেউ কল্পনা করতে পারে? পঞ্চব্রাহ্মণ, পঞ্চকায়স্থ দেশটাকে আর্য করে তুলেছে।

এরা এগিয়ে গিযে মঞ্চের নিকটস্থ ধাতব আসনগুলি ঘুরিয়ে নিয়ে বসল।

কবি। ভূমি প্রস্তুত ছিল, সোনা ছিল, স্বর্ণমুদ্রা হয়েছে।

বীরসেন। কথাটা কবির উপযুক্ত বটে। এদেশকে কবি ভালোবাসেন, আমিও বাসি। আমিও বিশ্বাস করি এদেশের এই শ্যামবর্ণ নর-নারীর রূপের বৈশিষ্ট্য আছে। আমার মনে হয় বর্ণসংকরগুলিকে যদি আর্যবর্ণের একটিতে উঠিয়ে নেয়া যেত, মহান উপকার হতো তাহলে। শুধু বর্ণাশ্রমে ধর্মের বর্ণ নয়, এত বিভিন্ন দেহবর্ণের লোক এরা যদি আর্যসমাজে পুরোপুরি স্বীকৃত হতো! হবে একদিন, তার সূচনাও দেখা যাচ্ছে। দ্রাবিড়-ব্রাহ্মণ কনৌজ-ব্রাহ্মণের পাশে বসে সামগান করছে, বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে। গোটা বাঙালি জাতিটা একদিন এক হয়ে যাবে।

কবি। আপনার স্বপ্ন সফল হোক রাজকুমার। গৌড়-রাঢ়-বঙ্গ বিস্তৃত বাঙালি জাতি, মহান আর্যজাতির সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যাক, আমি সেই কাব্যের হব উদ্‌গাতা।

বীরসেন। কৌতুক বোধ হয় ভাবতে গেলে, আজ থেকে পাঁচশো বছর পরে এই সংমিশ্রণের কথা কেউ কি মনে রাখতে পারবে নগরপাল?

নগরপাল। ভৃত্য উন্মুক্ত হয়ে শুনছে রাজকুমার।

বীরসেন। আপনার বিনয় আপনার কর্মদক্ষতারই তুল্য। নগরীর গোপন সংবাদগুলি আপনিই বলতে পারবেন। আপনি কী লক্ষ্য করছেন?

নগরপাল। মহামতি বল্লাল সেন যার সূচনা করেছিলেন, এখন সেটা সার্থক হয়ে উঠেছে। বাঙালিমাত্রেরই আগ্রহ দেখতে পাচ্ছি। আর্যধর্ম, আর্যশিক্ষা, আর্যআচার ক্রমশই তাদের প্রিয় হয়ে উঠছে। নগরের প্রত্যন্তসীমাতেই এসব ভালো করে চোখে পড়ে। আভীরদের অনেকেই গোপ বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে আজকাল, তারা বলছে, তারা বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয়। কৈবর্ত জাতীয়েরা বলছে তারাও আর্যসমাজভুক্ত শূদ্র। অধিকাংশই ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আশ্রয় করেছে।

কবি। আলোর প্রতি প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, শুধু পতঙ্গের নয়।

বীরসেন। নিশ্চয় কবি, নিশ্চয়। বৌদ্ধদের সঙ্গে অসদ্ভাবের ঘটনাগুলিও আজকাল তেমন শুনি না।

নগরপাল। মহারাজাধিরাজ লক্ষ্মণ সেনের আদেশে বৌদ্ধদের ক্রমশই সুবিধা দেয়া হচ্ছে। তাদেব ধর্মহীন ক্রিয়াহীন বলা দণ্ডনীয় হয়েছে। (হেসে) কেউ-কেউ বলছে তাবাই নাকি বেশি সুবিধা পাচ্ছে।

বীরসেন। (হেসে) একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। যুবরানীর এক দাসী রাত্রিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে গিয়ে রাজবাড়ির বুড়ি ধাত্রীর সঙ্গে গুঁতো লেগে গেল। বুড়িকে কিছুতেই থামানো যায় না। যুবরানী অবশেষে বললেন, ও সাধারণ দাসী নয়, বুড়িমা, ধর্মে বৌদ্ধ। সঙ্গে-সঙ্গে ধাত্রী থেমে গেল। মুখ কালো করে সে বারংবার জিজ্ঞাসা করতে লাগল, রাগের মাথায় দাসীকে তার ধর্মমতে আঘাত দিয়েছে কিনা। যুবরানী তাকে বুঝিয়ে বললেন, পোড়ামুখি চোখখাকি প্রভৃতি যা সে বলেছে তা হিন্দু বৌদ্ধ সকলের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

সকলেই হাসল।

নগরপাল। আমার কিন্তু মনে হয়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপটা আরো কিছুকাল থাকা ভাল। মহারাজ বল্লাল সেনের কঠিন বিধানগুলি শ্লথ করে দেয়া ভালোই হয়েছে, কিন্তু ব্যঙ্গের প্রয়োজন এখনও আছে। সরাসরি মন্দ বলার চাইতে বিদ্রূপ করা ভালো, তাতে দোষকেও উদ্‌ঘাটিত করে, হাসিতে তিক্ততাও ডুবে যায়।

বীরসেন। কলহের সুযোগ না-দিয়ে ব্যঙ্গ করতে পারা খুবই স্পৃহনীয় শক্তি। কোনো-কোনো

কবির নাটকে বৌদ্ধদের এরকম ব্যঙ্গ করা হয়েছে—হ্যাঁ গো, কবি, তোমার নাটকে বৌদ্ধ শ্রমণ-ট্রমন নেই?

চন্দ্রসেন। এ নাটকের আগাগোড়াই যে হাস্যরস, আর বোধ হয় প্রচ্ছন্নভাবে অনার্য বৌদ্ধদের নিয়েই লেখা।

বীরসেন। নাটকের কথায় মনে পড়ে গেল চন্দ্রসেন, তোমার সংবাদ যদি সত্য হয় তবে সোমলতা বৌদ্ধ।

চন্দ্রসেন। মনে হয় ওর জীবন কিছুটা রহস্যাবৃত।

বীরসেন। সব নটীর জীবনই খানিকটা তাই।

চন্দ্রসেন। আমার মনে হচ্ছে, পাহাড়পুরের এক ছায়াচ্ছন্ন রাত্রিতে দেয়ালের গায়ে অন্যান্য ছায়াগুলির মধ্যে এর ছায়াও আমি দেখেছিলাম।

বীরসেন। সে-অনুসন্ধান আমি করব। আরবীয় ঘোটক পাবার পক্ষে যথেষ্ট খোঁজ নিয়েছ, কিন্তু আসল খোঁজ নেয়া হয়নি। তুমি কি বলতে পারো সোমা বিবাহিতা কিনা?

নগরপাল। রাজকুমার . . .

বীরসেন। না, নগরপাল, দ্রুত কিছু করা হচ্ছে না। আপনি প্রাচীন ভারতের একটি প্রথার কথা নিশ্চয়ই জানেন। রাজসভার অঙ্গ হিসাবে কলাকুশলী নৃত্যগীত পটিয়সী একজন গণিকা সেকালে থাকত রাজাদের।

নগরপাল। হ্যাঁ, শুনেছি বটে, নামটা মনে পড়ছে না, মগধরাজ বিন্দুসারের এমনি একজন ছিলেন, রাজকোষ পূরণে অনেক সহায়তা করেছে সেই বারাঙ্গনা।

বীরসেন। এভাবে রাজকোষ পূরণ কি অন্যায় হবে?

নগবপাল। রাজকুমার, কৌটিল্যে নিষেধ নেই বরং . .

চন্দ্রসেন। সোমলতাকে এ-স্তরে নামিযে আনা . .

নগরপাল। না, উঁচুতে তোলা।

বীরসেন। বয়স্য চন্দ্রসেন, তোমার মত কি অন্যপ্রকার? সোমলতার সঙ্গে দেখা হবাব পর থেকেই যেন অপেক্ষাকৃত নির্বাক হয়ে গেছ, পাহাড়পুরের কথায় কয়েক পংক্তি কবিতাই যেন বলে ফেললে। (কৌতুকেব হাসি)

চন্দ্রসেন। না রাজকুমার, কোনো অভিপ্রায়ই আমার নেই, কিন্তু . . .

নগরপাল। আমরা সোমলতাকে যত বড় ভাবছি আসলে সে হয়তো তা নয়। আজকের মহলা শেষ হবার পবই আমরা বুঝতে পারব, সামান্য নটীর চাইতে সে কত বড়। রাজকীয় গণিকার সম্মান তাকে দেয়া যায় কিনা।

বীরসেন। আপনার বাস্তবজ্ঞানের জন্য ধন্যবাদ। নাটকের আর দেরি কত? এদিকে শ্রেষ্ঠী তো ঘুমিয়েই পড়েছে।

জয়পাল। উঁ, হুঁ-হুঁ, আজ্ঞে না। আমি ঘুমোইনি, একটু তন্দ্রা। রাজকোষ পূরণ না কী বলছিলেন। আজকাল বড় খরচ-খরচা। গত মাসের ব্যয় আয়ের চাইতে একুশ কার্যাপন বেশি ছিল।

বীরসেন। ঠিকই শুনেছেন, চিন্তার কথাও বটে। কবি. শ্রেষ্ঠীকে আর কষ্ট দেয়া উচিত হবে না। তুমি দ্যাখো, আচার্যমশাই কোথায়। নান্দীর কাজটা তিনি সংক্ষেপে সেরে নিন।

কবি পূর্বদিকের প্রকোষ্ঠটির দিকে চলে গেল।

বীরসেন। মহারাজা বল্লাল সেন কেন সুবর্ণবণিকদের সমাজে অধঃপতিত করেছিলেন এখন তা বোঝা যাচ্ছে। এই এক দেশ যেখানে বণিক সম্প্রদায় নিজেদের রাজধানী স্থাপন করত।

রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করত।

চন্দ্রসেন। শুধু তাই নয়, দেশের অর্থসম্পদ তাদের অধিকারে থাকায় রাজশক্তিকে তারা স্তম্ভিত করে রাখত।

নগরপাল। শুনেছি মহারাজা বল্লাল সেনের রাজত্বের প্রথম দিকে সুবর্ণবণিকদের সৈন্যবাহিনী, নৌ-বাহিনীও থাকত। এবং অর্থবলে বলীয়ান বণিকদের সৈন্যবাহিনী রাজকীয় সৈন্যবাহিনীর চাইতে সুসজ্জিত ছিল।

চন্দ্রসেন। রাজার যে-কোনো অভিযান, যে-কোনো শাসন-প্রস্তাবকে বানচাল করে দেয়ার ক্ষমতা ছিল তাদের।

বীরসেন। আমি শুধু ভাবি কতখানি রাজনীতি জ্ঞান থাকলে সামাজিক শক্তিগুলিকে এমন করে কাজে লাগানো যায়। তাদের ক্ষমতা ছিল, জনবল ছিল তবু সমাজের জনসাধারণ তাদের চায় না এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। এবং এটা বুঝতে পারা তখনকার দিনে সহজসাধ্য ছিল না।

নগরপাল। সেসব চাঁদ সদাগরের চাইতে আমাদের জয়পাল অনেক ভালো। এই বৌদ্ধ বণিকদের অর্থ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে দৃষ্টি দেয়ার উৎসাহ নেই। আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

কবি ফিরে আসছে এমন সময় পুরুষদের নেপথ্যগৃহ থেকে সূত্রধারও প্রবেশ করল।

সূত্রধার। রাজকুমার, নবীন মঞ্চ ও তার বৃদ্ধ সূত্রধার আপনার পৃষ্ঠপোষকতায় ধন্য হয়েছে।

বীরসেন। আমিও ধন্য হবার আশা রাখি নাটক দেখে।

সূত্রধার। আপনি অনুগ্রহ করে মঞ্চে আরোহণ করুন, নেপথ্যে নট-নটীরা আপনার আশীর্বাদের জন্য সমবেত হয়েছে। রাজ-আশীর্বাদের পর আমি নান্দীর সূত্রপাত করব। কিন্তু তারও আগে আমার একটি আবিষ্কারের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দেব। সোমলতা, এদিকে এস ...

সোমলতা নটীদের সাজঘর থেকে প্রবেশ করল। ছেলেদের মতো কাছা দিয়ে কাপড় পরা, গায়ে একটা মেরজাই জাতীয় জামা, ওড়নাটা গলার দু'পাশ দিয়ে ঝুলছে, চুলগুলি কপালে, গলায় বাহুতে লোটাচ্ছে।

কবি। এ কী?

বীরসেন। এটা কি রঙ্গসজ্জা?

সূত্রধার। বৃদ্ধ আচার্যের শেষ দুঃসাহস।

চন্দ্রসেন। সোমলতা কি নারীর অভিনয় করছে না? সে কি নায়িকা নয়?

সূত্রধার। নাটকের গল্পটা শুনুন। কোটালকন্যা ময়নামতী বড় দজ্জাল, বড় দয়াবতী। সে তির চালনায় সেনাপতিপুত্রকে হারিয়ে দিয়েছে, রথ চালনায় সূতপুত্রকে। সে পুরুষের বেশে রাজধানীর সর্বত্র হৈ-রৈ করে বেড়ায়। রাজপুরী থেকে অনুযোগ হয়েছিল, কোটাল তাকে শাসনের চেষ্টা করেছে, কিন্তু একমাত্র কন্যাকে পিতা কি শাসন করতে পারে? রাজপুত্রকেও হয়তো কোনো না কোনো বিষয়ে হারিয়ে দিত কিন্তু রাজার পুত্রই ছিল না মোটে। অনেক যাগযজ্ঞের পর রাজার রাজপুত্র হল, কিন্তু গণক গুণে বললেন পরমায়ু ছ' মাস। কী উপায়? উপায় এই যদি কোনো ষোড়শী সতী তার জন্য বেহুলার মতো তপস্যা করে। কে সে ষোড়শী? গুণে দেখা গেল কোটালকন্যা। তিনদিনের রাজকুমারের সঙ্গে ষোড়শী কোটালকন্যার বিয়ে হয়ে গেল, এইখানে নাটক আরম্ভ।

সোমলতা কোটালকন্যার অভিনয় করছে। আপনি অনুমতি করুন, আমি কাজ আরম্ভ করি। (একখানি পাণ্ডুলিপি দিল রাজকুমারকে)।

বীরসেন। কী অদ্ভুত কল্পনা! (হো-হো করে হেসে উঠল)

নগরপাল। রাজকুমারের মৃত্যু দৃশ্যও আছে। সেখানেই হাস্যরস সব চাইতে তীব্র। কোটালকন্যা ছ' মাসের রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে 'হা নাথ' 'হা নাথ' করে শোকও করেছে।

বীরসেন। বলো কী! পুরোপুরি বিলাপও আছে নাকি?

কবি। কবিবর ধোয়ী বলেন, রস ব্যাভিচারেই নাকি হাস্যরসেব সৃষ্টি হয়েছে।

বীরসেন। ঠিকই বলেছেন। কিন্তু কবি, এ যদি নাথ-বৌদ্ধদের সমাজকে বিদ্রূপ করেও লিখে থাকো, কোথাও প্রকাশ্যে তাদের আক্রমণ করোনি তো? দেখো, ধর্মনিবপেক্ষ রাষ্ট্রে রাজরোষে পড়তে না-হয়।

সোমা কী বলতে গেল, তাকে থামিযে দিয়ে সূত্রধার কথা বললে।

সূত্রধার। আমি বলছি মা। আমাদের সোমলতা বলে, ময়নামতীর বিলাপগুলি নাকি বাংলায বলতে পারলে ভালো হয়। কবি রাজি হচ্ছেন না। ভরতশাস্ত্রের নজির দেখাচ্ছেন।

চন্দ্রসেন। সত্যি কথাই, কোন কাব্যে বাংলা ভাষার স্থান আছে, বাংলা কি কাব্যেব ভাষা হতে পারে?

সূত্রধার। এ বিষয়ে কবিব সঙ্গে অনেক কথা কযেছি। আমি বলি, আজকের মহলায সোমাকে দু'একবার বাংলায় কথা বলতে দিয়ে দেখুন।

কবি। আচার্য, আপনার বাংলাপ্রীতি অস্বাভাবিক। মনে হয় কোনো উদ্দেশ্য আছে। আমি আবার বলছি, নাট্যকাব্যে দেশিভাষার স্থান হতে পারে না। অকারণ মহলার সময় নষ্ট করে কী হবে?

সূত্রধার। উদ্দেশ্য আছে। এ-রকম বিষয়বস্তু নিয়ে, এ-রকম চারিত্রিক সংঘাত নিযে নাটক হয় এ আমি জানতাম না। সর্বৈশ্বর্যময়ী ষোড়শীর সঙ্গে তিন দিনের শিশুর বিবাহ যতই অবাস্তব হোক, প্রতি অঙ্গে আমাকে দ্বিধা করতে হয়েছে। লঘু হাস্যকৌতুকের সুরে চলতে পারিনি। আচ্ছা কবি, এ-সম্বন্ধে আপনাব নিজের মত কী?

কবি। আপনি আমাব প্রতি কোনো অজ্ঞাত কারণে বিরূপ হযেছেন, এই আমাব মত।

সূত্রধার। না-না, কবি। আমার মনে হয বিপরীত রসের সমন্বয়ে এতে একটা গূঢ় সত্যেব প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কাঁটা আর গোলাপ, পদ্ম আর পঙ্কে যেমন একটা তৃতীয় সত্যেব প্রতিষ্ঠা হয়, এ-ও তেমনি। এর জন্যই আমার পুরনো প্রধান নটীকে বাদ দিতে হয়েছে। সে এই দুই বিপরীতের সমন্বয় করতে না-পেরে উৎকট হাস্যরসের সৃষ্টি করছিল।

কবি। (হাসতে-হাসতে) কী সাংঘাতিক!

সূত্রধার। সত্যি বলছি কবি, সোমার অভিনয়ই আমার চোখে সত্যের আবরণ খুলে দিয়েছে। মাঝে-মাঝে মহলায় প্রাকৃতভাষার বদলে সে যখন বাংলায় কথা কযে ওঠে তখনই এই চমৎকার ব্যাপারটা ঘটে। তখনই নাটকটি নিছক হাস্যবসের অনেক ঊর্ধ্বে উঠে যায়। ময়নামতীর বুকে বাৎসল্য ও আদিরসের সন্নিপাতে নারীমনের যে-দ্বৈতরূপটি ফুটে ওঠে সেটা কবির বৈপ্লবিক সাহসের পরিচয়।

কবি। আপনি এরই প্রশংসা করছেন? আপনার কাছে বোধ হয় কবিবর ধোয়ীর মতামতেরও খুব একটা মূল্য নেই।

বীরসেন। দাঁড়াও কবি। আচ্ছা সূত্রধর, আপনি সত্যি নারীমনের এই বিপরীতমুখী বৃত্তিগুলি নাটক

দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন?

সূত্রধার। পারব, না সোমলতা? সোমলতা বলে প্রায় এ-রকমই একটা নাটক ওদের দেশে গ্রাম্যভাষায় পাওয়া যায়, প্রায় একই রকম কাহিনী।

বীরসেন। কাহিনীটা ওদের দেশে প্রচলিত?

সোমলতা। আমরা কখনও-কখনও দিশি ভাষায় অভিনয়ও করেছি।

নগরপাল। একথা তো আমাকে বলোনি কবি।

কবি। বন্ধু নগরপাল ...

বীরসেন। না, কবি, লজ্জার কিছু নেই। প্রচলিত কাহিনী নাট্যকাররা ব্যবহার করে থাকেন— কালিদাস, ভবভূতিও করেছেন।

চন্দ্রসেন। কিন্তু আমরা যে হাস্যরসের আশ্বাস পেয়েছি, সেটা কি তারপরও পাওয়া যাবে?

সূত্রধার। হাস্যের বদলে মধুর পাওয়া যাবে, কী হবে বলতে পারি না। অনুমতি করুন নাটক আরম্ভ করি। ওদের সকলকে মাঙ্গলিক সঙ্গীতের জন্য প্রস্তুত হতে বলো সোমলতা। (সোমলতা নটীদের সাজঘরের দিকে চলে গেল) রাজকুমার ...

বীরসেন। হ্যাঁ আচার্যমশাই আপনি আরম্ভ করুন।

সূত্রধার পূর্বদিকের ঘরখানিতে প্রবেশ করল। ঠিক এমন সময়ে মুণ্ডিতমস্তক পীতবাস একজন শ্রমণ এসে দাঁড়াল সোপানগুলির কাছে। প্রায় একই মুহূর্তে সান্ত্রি দু'জন সোপানেব উভয় প্রান্ত থেকে এসে শ্রমণের পথরোধ করে দাঁড়াল। শ্রমণ গৌরবর্ণ, সে অতিশয় দীর্ঘ ও ঋজু। তাব মুখাবয়বে বৈশিষ্ট্য আছে, ঠিক বোঝা না-গেলেও কোথায় যেন একটা মোঙ্গলীয় ভাব আছে।

শ্রমণ। এখানে নাটক হচ্ছে বাপু? এখানে নাটক হবে শুনছি।

প্রথম সান্ত্রি। (রূঢ়ভাবে) তাতে তোমার কী?

দ্বিতীয় সান্ত্রি। আহা-হা করো কী? অমন করে বলে? দেখুন মহাশয় এখানে একটা নাটক হচ্ছে আপনার যেসব বিষয়ে প্রয়োজন তেমন-কিছু নয়।

শ্রমণ। কিন্তু ভেতরে যাওয়াটা আমার খুব দরকার হয়ে পড়েছে যে ...

প্রথম সান্ত্রি। কঠিন সমস্যা। দেখুন মহাশয়, আপনাকে কী করে নিষেধ করা যাবে বুঝতে পারছিনে, আপনি এখনও অসুবিধার সৃষ্টি করছেন কেন?

শ্রমণ। (হাসতে হাসতে) জিজ্ঞাসা করলে বোলো, বাধা দিয়েছিলে, আমি সে বাধা মানিনি।

কথা বলতে-বলতে শ্রমণ এদের পার হয়ে রঙ্গশালায় প্রবেশ করল।

প্রথম সান্ত্রি। পার হয়ে গেল যে! বলপ্রয়োগ করলেও তো হতো।

দ্বিতীয় সান্ত্রি। কী করব বাপু, মনে কষ্ট না-দিয়ে কী করে যে বলপ্রয়োগ করা যায় বুঝি না। এখন সরো। (দু'জনে নিষ্ক্রান্ত হল। শ্রমণ বীরসেন প্রভৃতির দিকে অগ্রসর হল)।

বীরসেন। কে এ নগরপাল, ঠিক এ সময়ে ...

নগরপাল। মূর্তিমান বাধা, আর-কিছু বুঝতে পারছি না। শ্রমণ—(শ্রমণ হাত জোড় করল) প্রহরীরা তোমাকে বাধা দিল না?

শ্রমণ। না।

জয়পাল। আপনি কি নিমন্ত্রিত?

শ্রমণ। তা-ও নয়।

চন্দ্রসেন। কিন্তু এটা তো উপাসনাগৃহ নয়, রাজার দরবারও নয়।

শ্রমণ। কোথায় কী হবে একি কখনও বলা যায়?

কবি। দ্যাখো শ্রমণ, তোমাদের এসব আজগুবি ধরনের কথাবার্তা, তার রহস্যজনক ব্যাখ্যা অলস অবসরে ভালো লাগে . . .

শ্রমণ। সব ব্যাপার ভালোলাগার মতো হয়ে ঘটে না। স্পৃহাহীন হতে পারলে অবিচলিত থাকা যায় মাত্র। আমি রাজকুমার বীরসেনের সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা করি।

বীরসেন। আপনার ইচ্ছাটাকে আপনি কি বিশ্বের পরিচালক-শক্তি বলে মনে করেন? বীরসেনকে সে-শক্তি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে বাধ্য করবে?

শ্রমণ। ইচ্ছাশক্তির কি শেষ আছে? ইচ্ছা করলে কুষ্ঠী হওয়া যায়, ইচ্ছা করলে মরা যায় ; ইচ্ছা করলে নীরোগ হওয়া যাবে না কেন, চিরজীবী হওয়া যাবে না কেন?

নগরপাল। (বিদ্রূপ করে) আপনার ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতা আমরা দেখলাম, অশিক্ষিত প্রহরীরা পথ ছেড়ে দিয়েছে।

শ্রমণ। না, ওরা ঠকেছে। মিনতি নয়, বলপ্রয়োগ নয়, শুধু ইচ্ছা জানানো—এ অবস্থায় কী করা যায় তা ওরা এখনও শেখেনি।

বীরসেন। আপনি সুন্দর আলাপ করতে পারেন, কিন্তু রাজকুমার বীরসেন আপনার ইচ্ছা হওয়ামাত্রই আলাপ করবেন কেন?

শ্রমণ। তিনি তো আলাপ করছেন আমার সঙ্গে।

বীরসেন। আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?

শ্রমণ। আপনার শিরোভূষণ আর মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের সঙ্গে আপনার আকৃতিগত সাদৃশ্য। (হেসে) কোনো রহস্যজনক উপায়ে নয়।

বীবসেন। আমাকে দিয়ে আপনার কী প্রয়োজন?

শ্রমণ। বলছি। তার আগে আপনাকে জানানো দরকার আমি ভিক্ষু মহাসত্ত্ব।

বীরসেন। মহাসত্ত্ব!

নগরপাল। যাকে বন্দী করার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে?

শ্রমণ। আমি নিজেই সে-কথা বলতে যাচ্ছিলাম।

চন্দ্রসেন। কী দুঃসাহস আপনার!

কবি। আপনি মহাসত্ত্ব! সত্ত্বপদাবলির কবি?

শ্রমণ। হ্যাঁ কবি, লোকে তাই বলে। কিন্তু দেশের শ্রেষ্ঠ ধীশক্তিগুলির সমবেত আক্রমণে বিপর্যস্ত।

বীরসেন। তোমার পরিচয় আমি পেলাম, এবার তোমার বক্তব্য?

নগরপাল। মহারাজকুমার, আমরা একটা শুভ কাজের উদ্যোগ করেছি . . .

বীরসেন। নগরপাল ঠিকই বলেছেন শ্রমণ, তোমার বক্তব্য অন্যসময়ে শুনলে হয় না?

শ্রমণ। আমার বক্তব্য খুব বেশি নয়। এখানে সোমলতা নামে এক নটী আছে শুনলাম, তাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

নগরপাল। রাজকীয় রঙ্গশালার নটী কোথাও যাবার আগে রাজকীয় অনুমতি প্রয়োজন। সেটা কি চাইবা মাত্রই পাওয়া যাবে?

শ্রমণ। কবি, সোমলতাকে একটু ডাকো না? রাজকুমার, আমি আপনার অনুমতি চাইছি।

চন্দ্রসেন। তাকে তুমি কোথায় নিয়ে যেতে চাও? সে যাবে কেন?

শ্রমণ। সোমলতাকে আমি স্নেহ করি, সে আমার শিষ্যা, তাকে নতুনতর অভিজ্ঞতার জন্য অন্যত্র নিয়ে যেতে চাই।

বীরসেন। তার সঙ্গে আমাদের স্নেহের সম্বন্ধ নয়, কিন্তু সে আমাদের প্রজা, তদুপরি তার কলাবিদ্যা সম্বন্ধে আমরা অনেক আশা রাখি।

শ্রমণ। সোমলতার অভিনয়ে অনুপ্রেবণা দিচ্ছে তার নবীন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা। এমনও হয় সংস্কৃতির আকর্ষণে সুপ্ত প্রতিভা জেগে ওঠে।

কবি। কিন্তু এই নবীন সংস্কৃতির কেন্দ্রই তো নবদ্বীপ।

শ্রমণ। আমি তাকে নবীনতর সংস্কৃতির স্বরূপ দেখাতে নিয়ে যাব।

নগরপাল। তোমার তর-টি বোধ হয় ভারতের বাইরে?

শ্রমণ। না। নতুন একটি আর্যস্রোত ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে। নৃতত্ত্বের হিসাবে নালন্দার পদ্ধতিতে বিচার করে দেখা গেছে এরা আর্যজাতীয়, হুন কুশানদের মতো অনার্যজাতীয় নয়।

বীরসেন। আপনি ইসলামধর্মীদের কথা বলছেন?

শ্রমণ। বাংলার রাজকুমার অন্যান্য দেশের রাজকুমারদের চাইতে বেশি খবর রাখেন। তাদের ধর্মের নাম ইসলাম, কিন্তু তাতে তাদের আর্য হওয়াতে বাধা নেই। এদেশে আর্যরা যখন আসে তখন তারাও এদেশের অধিবাসীদের কাছে বিধর্মী ছিল।

সহসা সোমলতা প্রবেশ করল।

সোমলতা। আচার্যমশাই, (থেমে দাঁড়াল) আমি আচার্যমশাইকে খুঁজছিলাম।

কবি। কেন সোমা?

সোমলতা। নাটক সম্বন্ধে একটু দরকার ছিল।

শ্রমণ। ফুল্লরা?

সোমলতা। (শ্রমণকে চিনতে পেরে আনন্দোজ্জ্বল হয়ে) মহাসত্ত্ব, আপনি?

শ্রমণ। শান্তিলাভ করো। আমি তোমাকে খুঁজছিলাম ফুল্লরা।

কবি। দেখলে, সোমাকে ডাকতে হল না। একি শ্রমণের ইচ্ছাশক্তি!

নগরপাল। পূর্বপরিকল্পিত কিছু হতে পারে।

চন্দ্রসেন। বয়স্য রাজকুমার, আমি সোমলতাকে পাহাড়পুর সংঘারামে দেখেছিলাম সন্দেহ নেই, অথচ ফুল্লরা অস্বীকার করছে।

সোমলতা। নটীদের অনেক কারণেই মিথ্যা অভিনয় করতে হয়, রাজকুমার।

শ্রমণ। (হাসিমুখে) আপনার সঙ্গে অপরিচিতার অভিনয় করেছে? ফুল্লরা, আর্য থেকে আর্যতর খুঁজে বেড়ানো কবে তোমার শেষ হবে? শোনো ফুল্লরা, আমি তোমাকে নিতে এসেছি।

সোমলতা। অসময়ে প্রভু? রাজনগরীতে অভিনয় করার এই প্রথম সুযোগ পেয়েছি, আজ প্রথম মঞ্চে নামা। এখন আমাকে কঠোর ব্রতের আদেশ করবেন না।

শ্রমণ। তুমি কি ধর্মের চাইতে কলাকে বড় বলে মনে করো?

সোমলতা। দাসীর অজ্ঞতা ক্ষমা করবেন প্রভু।

শ্রমণ। অজ্ঞতা নয় ফুল্লরা। আমি বিশ্বাস করি শিল্পকে অবলম্বন করে তোমার যে অভিজ্ঞতা হবে সাধারণের ধর্মকে অবলম্বন করেও তা হয় না। আশীর্বাদ করি তোমার এক শিল্পীজীবনে জন্মজন্মান্তর ঘটে যাক। তোমার অভিজ্ঞতা তোমার বন্ধন মোচন করুক।

সোমলতা। আপনার অনুমতি পাব আমি জানতাম।

শ্রমণ। না ফুল্লরা, কথা আমার শেষ হয়নি। যে-সংস্কৃতি তোমার অভিনয়-শিল্পের অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে তার চাইতে শক্তিশালী সংস্কৃতির সন্ধান আমি পেয়েছি।

সোমলতা। তার চাইতেও বড়, কোথায় প্রভু? আমরা কনৌজের কথা শুনেছি, সেখানে কি?

শ্রমণ। না, বাংলার দরজায়। যাবে?

সোমলতা। আপনি অপেক্ষা করুন, আমি প্রস্তুত হয়ে আছি। (সোমলতা সাজঘরে প্রস্থান করল)

চন্দ্রসেন। কী আশ্চর্য!

নগরপাল। ব্যাপারটা এই? (একটু থেমে) শ্রমণ, তুমি একটি নারীকে প্রবঞ্চিত করছ।

কবি। সোমার এই ভুল ভাঙতে হবে, নগরপাল।

নগরপাল। সোমা তোমাকে বিশ্বাস করে, তার অন্যায় সুযোগ নিচ্ছ তুমি।

শ্রমণ। আমি প্রতারণা করি না।

নগরপাল। তুমি কি সত্যি বিশ্বাস কর, ইসলামীদের কৃষ্টি সেন-কৃষ্টির চাইতে মহত্তর?

শ্রমণ। সেন কৃষ্টি ও ইসলামীয় কৃষ্টি মূলত এক, কারণ দু'টিই প্রসারণশীল পরমত-অসহিষ্ণু আর্যকৃষ্টি।

কবি। তাদের কাব্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদির সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে?

শ্রমণ। আর্যকৃষ্টি বৃদ্ধ হলে কাব্য রচনা করে, যৌবনে করে পররাজ্য জয়। সোমা সিংহ দেখতে চায়, তাকে স্থবির সেন-সিংহ না-দেখিয়ে যৌবনদৃপ্ত সিংহ দেখানো কি অন্যায় হবে?

নগরপাল। মূর্খ শ্রমণ, তুমি বারংবার সেন-কৃষ্টির প্রতি অপমানজনক ইঙ্গিত করছ।

বীরসেন। বন্ধু নগরপাল—(নগরপালের উদ্যত ক্রোধ থামিয়ে) তুমি বলছিলে শ্রমণ, ইসলামিদের কৃষ্টির সাক্ষাৎ বাংলার দ্বারদেশে পাওয়া যাবে। তোমার কথাটা ঠিক বোঝা গেল না। সোমাকে তুমি কোথায় নিয়ে যাবে?

শ্রমণ। আপাতত তাকে ইখতিয়ারউদ্দিনের কাছে নিয়ে যাব।

নগরপাল। যেন চেনা-চেনা নাম। নামটা যেন আজকাল মাঝে-মাঝেই কানে আসছে। এটা কি ইসলামীয়দের সাধারণ নাম?

শ্রমণ। না। ইখতিয়ারউদ্দিন বলতে আমি একজনকেই চিনি।

বীরসেন। দাঁড়াও, দাঁড়াও। চন্দ্রসেন, তোমার সেই অশ্ব-বিক্রেতাটির নাম কী?

চন্দ্রসেন। তার নামও ইখতিয়ারউদ্দিন, নগরপাল তার নামই শুনে থাকবেন। কারণ সে অপেক্ষাকৃত কম দামে ভালো ঘোড়া দিচ্ছে।

শ্রমণ। লোকটি ভদ্র এবং রসিক। বাংলা ভাষায় কথা বলতে শিখেছে।

নগরপাল। ভদ্র এবং রসিক। তবে আর কী। কৃষ্টির অভাব কোথায়? হোক সে ঘোড়াওয়ালা, সাবাস। (হো-হো করে হেসে উঠল)।

কবি। তুমি হাসছ, নগরপাল? কৃষ্টির নাম বলে একজন ঘোড়াওয়ালার কাছে সোমাকে নিয়ে যেতে চায় আর সেই কথাতেই হাসছ? স্বত্বপদাবলির কবি বলে আপনার প্রতি আমার যে-শ্রদ্ধা ছিল, তা আর রইল না শ্রমণ। আপনি কি সোমার সম্মানের কথা ভেবে দেখেছেন?

শ্রমণ। তুমি কি দৈহিক সম্মানের কথা বলছ? ফুল্লরা প্রতিভাবান শিল্পী। তার কাছে দেহের মূল্য, তার প্রতি মমত্ব সাধারণ গৃহস্থ নারীর চাইতে বেশি।

কবি। আর আত্মা?

শ্রমণ। হৃদয় যাদের পথ দেখায়, হৃদয়ের অভিজ্ঞতা তিক্ততর হলে তাদের আত্মার মুক্তির সহায়তাই করে।

চন্দ্রসেন। রাজকুমার, আমরা একটি নাটকের প্রথম রজনীর উৎসব করতে এসেছিলাম। এই শ্রমণের প্রলাপ শোনার জন্য নয়। আমাদের কাজের বিলম্ব হচ্ছে। আপনি শ্রমণকে

বলে দিন—সোমা যাবে না।

বীরসেন। আচ্ছা শ্রমণ, তোমার এই ইখতিয়ারউদ্দিন তো সাধারণ একজন অশ্ব-ব্যবসায়ী, সোমার মতো শিল্পীর মূল্য সে বুঝবে? কিম্বা অন্যকথায় সোমা কি ইখতিয়ারউদ্দিন পর্যন্তই যাচ্ছে, না তার মাধ্যমে তাদের রাজার অন্তঃপুর পর্যন্ত?

চন্দ্রসেন। কবির মুখের দিকে চেয়ে দেখুন বয়স্য, তার নাটকটা ...

বীরসেন। আজ শুক্লা ত্রয়োদশী। আলোর অভাবে নাটকের বিঘ্ন হবে না। একটু দেরি হোক না। শ্রমণ, তুমি প্রসারণশীল একটি আর্যস্রোতের কথা বলছিলে, আর তার সঙ্গে-সঙ্গেই অশ্ব-ব্যবসায়ী ইখতিয়ারউদ্দিনের কথা বলছ এমনভাবে যেন তোমার এই আর্যস্রোতের সঙ্গে সে সংযুক্ত।

শ্রমণ। বাংলার রাজকুমার অন্যান্য রাজকুমারদের চাইতে সতর্ক, এজন্য আমি নিজেকে বাঙালি হিসাবে ধন্য জ্ঞান করছি। ইখতিয়ারউদ্দিনকে আমি সামান্য অশ্ব-ব্যবসায়ী মনে করি না।

বীরসেন। তোমার স্রোতের উপমা দিয়েই বলা যাক, শ্রমণ, ইখতিয়ারদের আর্যস্রোত এখন কী করছে?

শ্রমণ। গাঙ্গেয় উপত্যকার ঢালু বেয়ে গড়িয়ে আসছে বাংলার দিকে।

বীরসেন। বেশ বলেছ কথাটা। সোমলতাকে আশ্রয় দেবার মতো প্রাধান্য তুমি ইখতিয়ার উদ্দিনকে দিচ্ছ। আমার মনে হচ্ছে হয়তো-বা সে সামান্য অশ্ব-ব্যবসায়ী নয়। আমি অনুসন্ধান করব। যদি তোমার এ-সংবাদ সত্য হয়, তোমাকে পুরস্কৃত করব। সোমা আজ নাটকে নিযুক্ত আছে, আজ যেতে পারে না। যদি সে আদৌ যেতে চায়, তার আবেদন যথাসময়ে বিবেচনা করব।

শ্রমণের ভ্রু দ'টি একটু অন্ধকাব হয়ে উঠল। হাত দিয়ে কপাল ঢেকে এক মুহূর্ত দাঁড়াল সে। তারপর তার নির্বাক মোঙ্গলীয় হাসি চোখের কোণ থেকে সমস্ত মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

চন্দ্রসেন। সাধু, সাধু, বয়স্য।

বীরসেন। বয়স্য চন্দ্রসেন, হৃদয়দৌর্বল্য সর্বত্র প্রকাশ করতে নেই। (হাসল) সোমা এখনও তার সব পূর্বপরিচিতকে স্বীকার করে নেয়নি।

সোমা প্রবেশ করল। তার বেশভূষার পরিবর্তন হয়েছে।

কবি। সোমা, তুমি যাবার জন্য প্রস্তুত?

সোমলতা। কবি, আপনার জন্য আমার কষ্ট হবে, বিশ্বাস করুন।

কবি। আমি নতুনতর মহত্তর নাটক রচনা করব সোমা।

সোমলতা। যদি ওদের মহত্তর সৃষ্টির ক্ষমতা না-থাকে, নিশ্চয়ই আমি ফিরে আসব।

নগরপাল। কিন্তু রাজ-অনুমতি না-পেলে তুমি যাচ্ছ কী করে? রাজকুমার তোমাকে যেতে নির্দেশ দেননি।

চন্দ্রসেন। বরং তুমি যাবে না, তাই বলেছেন।

সোমলতা। মহাসত্ত্ব?

শ্রমণ। আমার ইচ্ছা তোমাকে নিয়ে যাওয়া। অভিনয়ের চাইতেও বড় প্রয়োজন আমার। *রাজকুমাব, আজ অভিনয় না-হলেই কি নয়?*

চন্দ্রসেন। তোমার যখন ইচ্ছা, তাই হবে হয়তো!

শ্রমণ। (মোঙ্গলীয় হাসি) অনেক রাজ্যে এ-রকম হয়েছে বটে।

শ্রমণের চোখের প্রান্ত দু'টি কুঞ্চিত হয়ে একটা কুঞ্চনের ঢেউ তার সারা মুখে ধীরে-ধীরে প্রসারিত হতে-হতে তার ঠোঁটের কোণ দু'টিতে এসে মৃদু শব্দময় হয়ে উঠল। সহসা দপ দপ করে জ্বলে উঠে সোপানের কাছে দেয়ালগিরি দু, চন্দ্রাতপ থেকে ঝোলানো গুটিকয়েক প্রদীপ, সাজঘরের দরজার উপরে দেযাল বসানো আলোকসজ্জাগুলি নিভে গেল।

চন্দ্রসেন। কে আলো নেভাল?

কবি। কেউ ওদিকে যায়নি তো?

নগরপাল ছুটে সোপানেব কাছে গেল।

নগরপাল। সান্ত্রি, সান্ত্রি ...

সান্ত্রিদ্বয়। প্রভু।

নগরপাল। আলো নিভিয়ে দিল কে?

সান্ত্রি। এদিকে তো কেউ আসেনি, প্রভু।

সান্ত্রিরা অদৃশ্য হল, নগরপাল ফিরে আসনগুলির কাছে এল।

নগরপাল। কী আশ্চর্য ...

কবি। এ যদি শ্রমণের যাদুমন্ত্র হয়, ইচ্ছাশক্তি হয়?

নগরপাল। যাদুমন্ত্র চুলোয় যাক। (ছোট একটা বাঁশি বার করে ফুঁ দিয়ে, দ্রুত কয়েকজন সান্ত্রি প্রবেশ করল। তাদের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য কবে নগরপাল বললে) কামন্দক, রঙ্গালয়ের চারিদিকে কড়া পাহারার দরকার। একটি প্রাণীও যেন বিনা অনুমতিতে বাইরে যেতে না-পারে।

সান্ত্রিরা অভিবাদন করে প্রস্থান করল।

শ্রমণ। আপনারা বিচলিত হচ্ছেন কেন? প্রদীপ নিভে যাওয়াটা কি এতই অস্বাভাবিক? মাপ করে তেল দিতে একদিন কোনো দাসীর ভুলও হতে পারে!

বীরসেন। শ্রমণ ঠিকই বলেছে নগরপাল। আপনারা কেন ধরে নিচ্ছেন শ্রমণই এইভাবে আপনাদের নাটক বন্ধ করার চেষ্টা করছে, একজনকে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে বলুন।

নগরপাল এক পা অগ্রসর হবার আগেই সূত্রধার প্রবেশ করল।

সূত্রধার। (বিচলিত স্বরে) রাজকুমার, কী একটা গোলমাল শোনা গেল।

বীরসেন। আপনি প্রস্তুত? নাটকের জন্য প্রস্তুত কিনা জিজ্ঞাসা করছি, শ্রমণের কাছে কিছু-কিছু রাজনৈতিক খবর পাচ্ছি কিনা, তাই একটু দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সূত্রধার। একটা গোলমাল হচ্ছে রাজকুমার, লোকজন রঙ্গাগারের পেছনের পথটা দিয়ে ছুটোছুটি করছে। নাটক হবে না, এমনসব কী কথা বলছে।

নগরপাল। কোন দিকে যাচ্ছে তারা?

সূত্রধার। ইতস্তত

বীরসেন। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে? নগরপাল? আচ্ছা সূত্রধার আপনি প্রস্তুত হন গে।

নেপথ্যে ঘোড়ার খুরের শব্দ। সহসা পত্রবাহক প্রবেশ করল। বীরসেনকে অভিবাদন করে একখানা পত্র দিল।

বীরসেন। (পত্র পড়ে) মহামাত্য আজ রাত্রিতে একবার পরামর্শ-সভায় যেতে বলেছেন।

নগরপাল। কী হয়েছে রাজকুমার?

বীরসেন। শ্রেষ্ঠী জয়পাল, সোনানী চন্দ্রসেন, নগরপাল—। পত্রবাহক তুমি যাও, মহামাত্যকে বলো আমরা অবিলম্বেই মন্ত্রণাশালায় উপস্থিত হব।

পত্রবাহকের প্রস্থান।

চন্দ্রসেন। মন্ত্রণাশালায়, রাত্রিতে?

বীরসেন। পূর্বস্থলীতে বিদেশি সৈন্য উপস্থিত। এপারের অশ্ব-ব্যবসায়ী ইখতিয়ার তাদের সঙ্গে সংযোগ রাখছে বলে সন্দেহ হচ্ছে। সন্ধ্যার পর থেকে ইখতিয়ারের শিবির পরিত্যক্ত। মহাসত্ত্ব হয় তুমি শত্রুর চর, নতুবা, নতুবা তুমি বিচক্ষণ রাজনৈতিক।

শ্রমণ। রাজকুমার—। ফুল্লরা আর দেরি নয়।

চন্দ্রসেন। এখনও তুমি সোমলতাকে ইখতিয়ারের কাছে নিয়ে যেতে চাও? কী অপূর্ব তোমাদের নীতিজ্ঞান!

শ্রমণ। এখন দেখছি আমার আরো তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার। চলো সোমলতা, সময় বড় সংক্ষিপ্ত।

নগরপাল। নগরীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ও কলাশিল্পীকে অনেকেই উপঢৌকন হিসাবে স্বীকার করবে। তুমি কি সোমাকে ইখতিয়ারের উপহার করে নিয়ে যেতে চাও?

শ্রমণ। উপহার দেবার কথা ভাবিনি। এখন দেখছি তা যায় বটে। কিন্তু ফুল্লরা কি রাজি হবে? ও যেতে চেয়েছিল সংস্কৃতির খোঁজে, শত্রুর হাতে উপহার হয়ে যাওয়াটা ত্যাগ স্বীকারের ব্যাপার। আত্মত্যাগের মতো মহৎ হতে কি ফুল্লরা পারবে?

চন্দ্রসেন। তোমার উদ্দেশ্য কী, উপহার দিয়ে কী লাভ হবে তাই আমরা জানতে চাই।

শ্রমণ। উপহার দিয়ে যা হয়, বলবান শত্রুকে খুশি করা।

চন্দ্রসেন। বিস্ময়কর স্পর্দ্ধা তোমার শ্রমণ, রাজ্যের বলিষ্ঠ শক্তিগুলির সামনে দাঁড়িয়ে তুমি শত্রুকে খুশি করার কথা বলছ? তুমি রাষ্ট্রদ্রোহী, তোমাকে বন্দী করা হল।

শ্রমণ। কী মুশকিল! আজ না-হয় ফুল্লরা থাক। ইখতিয়ারও সহসা উপহার নিতে রাজি হবে বলে মনে হয় না। লোকটা কাজ ভালোবাসে। ও-পন্থায় তার আক্রমণ রোধ করা যাবে না।

চন্দ্রসেন। রাজকুমার সীমাহীন আপনার ধৈর্য। বিনা বিচারে শ্রমণদের দণ্ডিত করা নিষিদ্ধ হয়েছে, কিন্তু রাজদ্রোহের অপরাধেও কি তাই?

বীরসেন। মুক্তি পেলে তুমি কী করবে, শ্রমণ?

শ্রমণ। ধীমান্ রাজকুমার, আপনি বুঝবেন। আমাকে মুক্তি দিন। আমি বাংলা দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াব। যাতে যুদ্ধ না-হয় তারই চেষ্টা করব।

বীরসেন। যুদ্ধ যাতে বাংলা দেশে না-পৌঁছায় তার জন্য আমাদের সৈন্যবাহিনী অগ্রসর হচ্ছে।

শ্রমণ। না-না, ও-উপায়ে হয় না। মহামতি অশোকের সময়েও হয়নি।

বীরসেন। তুমি কী করতে চাও?

শ্রমণ। আমি প্রচার করব, যুদ্ধ তোমরা কোরো না।

চন্দ্রসেন। শত্রু যাতে বাধা না-পায়, এই না তোমার উদ্দেশ্য?

শ্রমণ। না। লোকক্ষয় হবে না, রক্তপাতও হবে না। শত্রুকে বাধা দিলে উভয়পক্ষের সৈন্যদলের চাপে কত শিশু নিষ্পিষ্ট হবে, কত নারী দলিত হবে। রাজকুমার, অকারণ রক্তপাত বন্ধ করুন।

নগরপাল। রাজকুমার, কালক্ষেপণ হচ্ছে। নাটক, আর না-হয় মন্ত্রণাশালাতে যাওয়া দরকার। শ্রমণ, তুমি রাজদ্রোহী—কিন্তু বাতুল। ষড়যন্ত্রের যারা মূল তারা তোমার মতো নির্বোধকে যন্ত্র করে ভালো করেনি।

বীরসেন। অকারণ রক্তপাত। শ্রমণ তোমাদের ধর্ম কি এই শিক্ষা দেয়? আত্মরক্ষার জন্যও রক্তপাত নিষিদ্ধ, ক্লীবের জীবনের কি এতই মূল্য?

শ্রমণ। জীবনকে আমি বড় ভালোবাসি। মন্ত্রের সাধনার জন্য জীবন ব্যয় করা যায়, কিন্তু এ-যুদ্ধে শরীরের পতনই হবে, কোনও সাধনাই হবে না। একটি দেশ নিজের করায়ত্ত রাখায় কোনো সিদ্ধি নেই। তাছাড়া এক্ষেত্রে ...

বীরসেন। কী এক্ষেত্রে?

শ্রমণ। সংবাদ যদি সত্য হয় তবে পরাজয় অনিবার্য।

চন্দ্রসেন। শ্রমণ!

বীরসেন। আহ্ চন্দ্রসেন! কেন পরাজয় অনিবার্য শ্রমণ? বাঙালি জাতির বাহুতে কি বল নেই?

শ্রমণ। আমার মতো অ-যুদ্ধব্যবসায়ীর মতের কি মূল্য আছে? রাজকুমার, এ-অভিযান একটিমাত্র তরঙ্গে আসবে না। একের পর এক তরঙ্গ আসবে, সেই অবিরত আঘাতে সেন-শক্তি ভেঙে পড়বে। বিক্রমশীলার ভিক্ষুদের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে নবীন অভ্যুদয়কে পুরাতন রোধ করতে পারে মাত্র একটি অবস্থায়, যখন সমগ্র দেশের অধিবাসীরা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নিজের বলে অনুভব করে। এক্ষেত্রে জনসাধারণ রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিবর্তনের দর্শকমাত্র।

বীরসেন। বাঙালি কি এমনি নিঃস্ব জাতি যে বিদেশি বিধর্মী শত্রুর আঘাতও তারা অবনত হয়ে মেনে নেবে?

শ্রমণ। সেন শাসনও বাঙালির কাছে বিদেশি ও বিধর্মী শাসন। তার সঙ্গে বাঙালির কতটুকু সংযোগ। কোন শাসনের সঙ্গেই-বা কতটুকু যোগ তার? যারা ফসল তুলছে, কাপড় বুনছে এরাই তো বাঙালি। এদের হৃদয় আবদ্ধ এদের সমাজে ; সেই সমাজের বিধানে এদের সূর্য উদিত হয়, অস্ত যায়। রাজশক্তি যদি সেখানে ছায়া ফেলে তারা তাড়াতাড়ি রাজশক্তিকে উপহার দিয়ে বিদায় করে দেয়। যেদিন তার সমাজের ভেতরে রাষ্ট্রীয় অন্যায় অনুপ্রবেশ করে, সে-অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাঙালির বাহুবল প্রকাশিত হয়, গোপালদেবকে তারা রাষ্ট্রনায়ক করে। কিন্তু প্রাসাদদ্বারে অপেক্ষা করে না। সমাজের কুটিরগুলিতে ফিরে যায়। কে রাজা হল, কোন রাজা চলে গেল, এ তাদের কাছে আলাপ করার সংবাদমাত্র। আকাশের চাঁদের ক্ষয়বৃদ্ধি আর রাজার ক্ষয়বৃদ্ধি এদের কাছে সমান ব্যাপার।

বীরসেন। তুমি কি বলতে চাও, বাঙালি বিপদকালে সেনরাজাদের পাশে দাঁড়াবে না? সেনরাজারা কি বাংলাকে কিছু দেয়নি।

শ্রমণ। দিয়েছে। কিন্তু বাংলা কি তা গ্রহণ করেছে? বাঙালির কি সেটা প্রয়োজনের ছিল?

বীরসেন। আর্যসভ্যতা ও ব্রাহ্মণ্যধর্মকে অবশ্য তুমি ঘৃণা কর।

শ্রমণ। না, প্রশ্রয় দিই।

চন্দ্রসেন। রাজকুমার, রাজকুমার ...

নগরপাল। রাজকুমার, এখানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই ভিক্ষুকের কাছে অপমানিত হবেন না ...

বীরসেন। (এদের নিরস্ত করে) শ্রমণ, যারা সেন-সংস্কৃতিকে ভালোবেসে সেন-শিক্ষাদীক্ষাকে অবলম্বন করেছে তাদের সংখ্যা কি নগণ্য? তাদের এ-অবস্থা কি তারা উন্নততর

বিবেচনা করছে না?

শ্রমণ। তাদের কেউ-কেউ এজন্য কৃতজ্ঞও বটে। কিন্তু সে-কৃতজ্ঞতার মূল্য কতটুকু? ফুল্লরা, ইখতিয়ার রাষ্ট্রের শত্রুতা করার আগেই আমাদের সীমান্ত পার হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমি তো ...

সোমলতা। আমি প্রস্তুত, মহাসত্ত্ব।

বীরসেন। তুমি কোথায় যাচ্ছ, তা জানো সোমলতা?

সোমলতা। কোথায়, রাজকুমার?

বীরসেন। বিধর্মী শত্রুস্থানীয় একজন অশ্ব-ব্যবসায়ীর হাতে তোমাকে সমর্পণ করা হবে।

সোমলতা। সমর্পণ করা হবে?

শ্রমণ। দেখতে দোষ কী ফুল্লরা? তোমার নিশ্চয়ই সাহসের ভাব হয়নি?

সোমলতা। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি মহাসত্ত্ব।

বীরসেন। আমাদের শুভেচ্ছার প্রয়োজনও বোধ হয় আর নেই, না সোমলতা?

সোমলতা। রাজকুমার ...

শ্রমণ। বীরসেন, আপনি সোমলতার কাছে কৃতজ্ঞতা আশা করেছিলেন, যেমন সেন-কৃষ্টিতে বিশ্বাসী অন্য অনেকের কাছে করেন। ফুল্লরা কৃতজ্ঞ, কি বলো ফুল্লরা? কৃতজ্ঞের চাইতেও বেশি। আমার তো মনে হয় সেন-কৃষ্টিকে আর-কেউ এত ভালোবাসেনি। রমণীর পক্ষে শিল্পকলার আকর্ষণে পারিবারিক জীবনের বাইরে পা দেয়া, প্রেমকে উপেক্ষা করা সুতীব্র আগ্রহেরই সূচনা করে। সেই শিল্পকলাব উৎস যে কৃষ্টি সেটা নিশ্চয়ই তার কাছে ধর্মের মতই উপাস্য।

বীরসেন। তুমি কি এই ঘটনা দিয়ে প্রমাণ করতে চাও সেন-কৃষ্টির প্রতি সোমলতার আকর্ষণ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী?

কবি। আপনি আপনার প্রভাব কাজে লাগিয়েছেন, প্ররোচিত করেছেন, সোমলতা মোহগ্রস্ত।

শ্রমণ। যে-আকর্ষণ প্ররোচনায় টুটে যায়, তা কখনও রাষ্ট্রবিপ্লব কাটিয়ে উঠতে পারে না, কবি। তবু সোমার আকর্ষণ কত খাঁটি। সেনরাজাদের আকর্ষণে তাদের কাছে খ্যাতি পাবার লোভে সে আসেনি। অভিনয়-শিল্পের আকর্ষণেই সে এসেছিল। কিন্তু তোমার এ প্রীতি কত ক্ষণস্থায়ী ভেবে দেখেছ কবি?

কবি। ক্ষণস্থায়ী?

শ্রমণ। হ্যাঁ কবি, তুমিও মুক্তি চাও। এ কৃষ্টিকে তুমিও অন্তরে স্বীকার করতে পারছ না।

কবি। আমি? কী বলছেন আপনি মহাসত্ত্ব!

শ্রমণ। নিজের শ্রেষ্ঠ মানস-সৃষ্টিকে উপহসিত হতে দেখে তুমি কষ্ট পেয়েছ। যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি তোমাকে ময়নামতীর গান রচনায় সাহায্য করেছিল, আজ তা কোথায় কবি? সভাস্তাবক ধোয়ীর অনুমোদন লাভের আশায় নিজের কাব্য ভাষান্তরিত করেছে। ওরা যখন বুঝতে না-পেরে বলছে উদ্ভট হাস্যরস, তখন নিজেকে ধন্য জ্ঞান করছ। সাহস করে বলতে পারছ না, এ আমার নবীন সৃষ্টি, হাস্যরসের চাইতেও শুভ্র, করুণের চাইতেও গভীর—নারী হৃদয়ের চিরন্তনী স্বরূপের উদঘাটন। মনে আছে সত্ত্বপদাবলির কবি কী বলে তোমাকে অভিনন্দিত করেছিল?

কবি। মহাসত্ত্ব?

বীরসেন। এ তোমার অনূদিত নাটক?

কবি। পরাস্বপহরণ নয় রাজকুমার, দেশিভাষা থেকে রাষ্ট্রভাষায় অনূদিত।

বীরসেন। তথাপি সোমলতাকে বাংলায় অভিনয় করতে দিতে তুমি আপত্তি করেছ, বৃদ্ধ সূত্রধারকে ভরতশাস্ত্রের নজির দেখিয়ে নিরস্ত করেছ?

সোমলতা। কবির এ-নাটক আমাদের দেশিভাষায় যে কত মধুর, কত অনির্বচনীয় তা বর্ণনা করা যায় না।

নগরপাল। অথচ কবি, অনুবাদ করে ব্যঙ্গকাব্যে পরিণত করেছ?

বীরসেন। কিন্তু কেন তুমি তা করতে গেলে কবি? রাজসভার খ্যাতির আশাতেই কি?

কবি। রাজকুমাব, কবিও মানুষ। কাব্য আমাদের পণ্য, অর্থলাভ না-হোক, যশ না-হোক, অন্তত শ্রোতা প্রয়োজন।

বীরসেন। সেন-শাসনই কি তোমার শ্রোতার অভাবের জন্য দায়ী?

কবি। বাংলার ভাগ্য তাই। বিদগ্ধ শ্রোতামাত্রই রাজানুগ্রহে রাষ্ট্রভাষা সংস্কৃতকে ভালোবাসার জন্য প্রাণপণ করছে।

শ্রমণ। কিন্তু বিচক্ষণ ইখতিয়ারউদ্দিন ইতিমধ্যে বাংলা শেখার জন্য গ্রামে-গ্রামে ঘুরে বেড়ায়।

বীবসেন। তাই তো। (একটু নিস্তব্ধতা)

মহাসত্ত্ব। আমাকে বিদায় দিন, রাজকুমাব।

বীরসেন। তোমাকে আমি মুক্তি দিতে পারি না। বাঙালির সহায়তা ছাড়াই সেনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাদের সহায়তা ছাড়াই বক্ষিত হবে। কিন্তু মুক্তি পেলে সমগ্র দেশকে তুমি যুদ্ধবিমুখ করার চেষ্টা কববে, সেটা রাজনীতির পক্ষে সহনীয় নয়। তুমি আমাকে খানিকটা সাবধান করে দিয়েছ শ্রমণ, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ।

চন্দ্রসেন। মূর্খ শ্রমণ। তুমি তোমার বৌদ্ধ অনুচরদের অকৃতজ্ঞতার কথা প্রকাশ করে তাদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন করলে মাত্র। তাদের অনার্যত্ব ও ধর্মহীনতার উপরে নির্ভর করে সেনবাজ্য সারা ভারতে প্রখ্যাত হয়নি।

শ্রমণ। সেনানী চন্দ্রসেন, আপনি ক্ষত্রিয়, কিন্তু ব্রহ্মক্ষত্রিয় নয়। আপনার মাতুল আমার পবিচিত।

চন্দ্রসেন বিচলিত।

চন্দ্রসেন। ব্রহ্মক্ষত্রিয় আমার সহোদর, আমরা এক মহান আর্যজাতির অংশ।

শ্রমণ। (হাসিমুখে) কিন্তু সেনানী, আপনার কাছে বলার মতো বিশেষ সংবাদ ছিল। রাষ্ট্রবিপ্লবের কাল উপস্থিত। শক্তিমানরা এ-সময়ে সবরকম সংবাদই সংগ্রহ করে থাকেন। আপনার মাতুল এখন কামতা রাজ্যে, তাছাড়া তার চাইতেও বড় কথা ফুল্লরার সম্বন্ধেও কিছু. . .(চন্দ্রসেন দ্বিধা করতে লাগল) এই মুহূর্ত থেকে আমি রাজদ্রোহী, বন্দী, কথা বলার অবসর পরে না-ও হতে পাবে।

চন্দ্রসেন। বলো আমরা শুনছি।

শ্রমণ। আপনি অনুগ্রহ করে এক পা সরে আসুন। সকলের কাছে কথাগুলি প্রীতিপ্রদ হবে না— (চন্দ্রসেন শ্রমণের দিকে এক পা অগ্রসর হলে) রাজকুমার বীরসেন, রাষ্ট্রবিপ্লবের সম্মুখে বন্দীর কাছে বিশেষ সংবাদ শোনবার জন্য যে সেনানী উন্মুখ, সে আপনার কতখানি বিশ্বাসভাজন?

চন্দ্রসেন। (তরবারি নিষ্কাশিত করে) প্রতারক, ভণ্ড শ্রমণ।

বীরসেন। (তিরস্কারের সুরে) চন্দ্রসেন।

চন্দ্রসেন। (জানু পেতে বীরসেনের পায়ের কাছে তরবারি ভূমিতে রেখে) রাজকুমার।

বীরসেন। বয়স্য চন্দ্রসেন ব্রহ্মক্ষত্রিয় কিম্বা আদিক্ষত্রিয় সে-বিচার পরে হবে। এখন আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াব, ওঠো। কবি, তোমার নাটকের মহলায় আজ নানারূপ প্রতিবন্ধক এসে গেল। তার জন্য আমি দুঃখিত। সূত্রধারকে বলবে তিনি যেন কাল একবার আমার সঙ্গে দেখা করেন। সোমা, তুমি আর অন্য নট-নটীরা বিশ্রাম করো আজ। কাল, তুমি এবং কবি সূত্রধারের সঙ্গেই প্রাসাদে যাবে। দেখি নাটকটার কী করা যায়। যাও তোমরা। নগরপাল?

কবি ও সোমলতা বিপরীত মুখে প্রস্থান করল।

নগরপাল। চলুন রাজকুমার, আমি বন্দী শ্রমণকে সান্ত্রিদের হাতে দিয়ে যাচ্ছি। সান্ত্রি—(সান্ত্রিরা কেউ এল না। নগরপাল কয়েক পা এগিয়ে গেল) সান্ত্রি! কে? (পিছিয়ে এসে) কে তোমরা? কী চাও?

আট-দশজন পাঠান সৈন্য প্রবেশ করল। তাদের চেহারা যমজের মতো। পোষাকেও হুবহু একরকম। তাদের প্রসারিত ডান হাতে ধরা উম্মুক্ত তরবারির অগ্রভাগ প্রায় ভূমি স্পর্শ করছে। নিঃশব্দে যন্ত্রচালিতের মতো একইসঙ্গে তারা সোপান বেয়ে রঙ্গাগারের ভেতরে এসে দাঁড়াল।

শ্রমণ। রাজকুমার, এখনও আমাকে এগিয়ে যেতে দিন, এরা ইসলামীয় সৈন্য।

রঙ্গাগারের নানাদিক দিয়ে নট-নটীরা, সোমলতা, কবি, সূত্রধার প্রমুখ প্রবেশ করে রাজকুমারের কাছে দাঁড়াল।

সূত্রধার। রাজকুমার! রাজকুমার!

কবি। রাজকুমার দূরে কোথায় আগুন লেগেছে। বহু লোকের আর্ত কোলাহলের শব্দ ভেসে আসছে। দুঃসময় উপস্থিত।

বীরসেন। (হাসল। চন্দ্রসেনের হাত থেকে উম্মুক্ত তরবারি নিজের হাতে নিল। চন্দ্রসেন ও নগরপাল বীরসেনের ইঙ্গিতে শ্রেণীবদ্ধ হয়ে বীরসেনের পেছনে দাঁড়াল)। নগরপাল, যে-রকম দেশের অবস্থা, এখন থেকে সর্বদা সশস্ত্র থাকবেন। কবি, আজকের রাতটা বোধ হয় তোমাদের বন্দী হয়েই থাকতে হবে। নট-নটীরা, তোমরা সূত্রধারের আশ্রয়ে থাকো। সূত্রধার, আপনার এ-রঙ্গশালায় যদি গুপ্তপথ নির্মাণ না-করে থাকেন রসিক চূড়ামণিদের জন্য তবে বুঝব আপনি অভিজ্ঞ না-হয়েই বৃদ্ধ হয়েছেন।

বীরসেন, নগরপাল, চন্দ্রসেন শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, শ্রমণ স্তম্ভটির পাশে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। নট-নটী ইত্যাদি সূত্রধারের পেছনে অন্তর্হিত হল। বীরসেন এবার অগ্রসর হল। পাঠান সৈন্যদের প্রায় সবগুলি তরবারি বীরসেনের তরবারির উপর আঘাত করল। কৌশলে নিজের দেহকে বাঁচিয়ে প্রথমে নগরপাল ও চন্দ্রসেনকে পলায়নের পথ করে দিল বীরসেন, তারপরে তরবারি দিয়ে পাঠান সৈন্যদের আঘাত ঠেকাতে-ঠেকাতে পেছনে হঠতে-হঠতে সোপানে পৌঁছে ছুটে পালাল।

ইখতিয়ার। ব্যস। তোমরা ঘরগুলি খুঁজে দ্যাখো, দু'জন-দু'জন করে।

জন ছয়েক পাঠান সৈন্য রঙ্গাগারের তিনদিকের ঘরগুলির দরজা ঠেলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ইলতুৎমিস। দাঁড়িয়ে দেখলে?

ইখতিয়ার। তুমিও তাই। তবে তোমার তরবারি চালানোর পথ ছিল না এই যা। ব্যাপার কি জানো

ইলতুৎমিস? লোকটিকে আমার বীর বলে মনে হলে। নতুবা আমাদের দেখেও অমন হেসে-হেসে কথা বলতে পারত না।

ইলতুৎমিস। নির্বোধরাও হাসে।

ইখতিয়ার। কিন্তু একখানা তরবারি নিয়ে দশখানার সামনে সতর্ক পায়ে মেপে-মেপে এগিয়ে আসে না।

ইলতুৎমিস। ছিপাহছালার যা বলছেন শিরোধার্য।

ইখতিয়ার। (হেসে) তুমি কি ভেবেছ বিনা রক্তপাতে ওকে বন্দী বা হত্যা করা যেত? দু'তিনজনের জান যেতে পারত। আর সে দু'তিনজনের মধ্যে আমি এবং তুমিও থাকতে পারতাম।

ইলতুৎমিস। ছিপাহছালারকে কাপুরুষ বলতে পারি না, এটা বোধ হয় তাঁর রসিকতা।

ইখতিয়ার। (হো-হো করে হেসে) তুমিও দেখছি ভারতীয় হচ্ছ। এরপর সম্মুখ যুদ্ধের ক্ষত্রিয়োচিত মৃত্যুর প্রশংসা শুরু করবে। আরে কে ওখানে, হেকিমসাহেব না ...

শ্রমণ। হ্যাঁ, ইখতিয়ারউদ্দিন।

ইখতিয়ার। বাংলা শিখলে বাঙালিরা পেয়ার করে সেটা ঠিক। তোমাকে বহুৎ শুকরিয়া।

শ্রমণ। যুদ্ধের জন্য বাংলা শিখতে আমি বলিনি ইখতিয়ার, তোমার ব্যবসায়ের জন্য বলেছিলাম।

ইখতিয়ার। জঙ্গ আমার কারবার।

শ্রমণ। ইখতিয়ারউদ্দিন, তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে।

ইখতিয়ার। ফরমাইয়ে জনাব ...

শ্রমণ। তুমি বিনাযুদ্ধে এ-রাজ্য জয় করতে পারবে।

ইখতিয়াব। হুঁ? কী শর্ত?

শ্রমণ। অকারণ নরহত্যা কোরো না।

ইখতিয়াব। (হো-হো করে হেসে উঠে) যদি কাল ফজর তক জিন্দা থাকি তবে তোমার কথা ভেবে দেখব।

শ্রমণ। আমি তোমাকে বিনা বক্তপাতে দেশ জয়ের উপায় বলে দিতে পারি। ইখতিয়ার আমাকে বিশ্বাস করো। আমাকে এরা বন্দী করেছে, তুমি মুক্তি দাও, আমি গ্রামে-গ্রামে পবিভ্রমণ করব, জনসাধারণকে বলব, সৈন্যদের বলব অস্ত্রত্যাগ করতে।

ইখতিয়ার। দেশদ্রোহীকে বিশ্বাস করা কঠিন। তাছাড়া এভাবে দেশ জয় হয় এ কোনো কেতাবে লেখে না। তোমাব স্বার্থ কী? তুমি কি পাল বংশের শাহ্‌জাদা, প্রতিহিংসা চাও? এ-সওয়াল পরে হবে যদি জান নিয়ে ওয়াপস আসি।

নেপথ্যে অশ্বপদ শব্দ। বহুলোকের ভীত কণ্ঠের কোলাহল। কে একজন সাহস দিয়ে বলছে—ভয় পেয়ো না দেশবাসী, অপরিমেয় শক্তি মহাবাহু লক্ষ্মণসেন এ দেশের প্রতিপালক। বিভ্রান্ত হয়ো না। পাঠান সৈন্যরা নিজেদের সমবেত করার জন্য চিৎকার করছে—হুকমতে ইখতিয়ার। কারা চিৎকার করে উঠল—আগুন আগুন। কে একজন কেঁদে উঠল—বাবা আমার, সোনা আমার।

মহাসত্ত্ব। শোনো, শোনো, ইখতিয়ার ...

ইখতিয়ার। পূর্বস্থলীর জওয়ান এসে পড়েছে। ইলতুৎমিস শুনতে পাচ্ছ, আমি গাজি। বলো হেকিম, আমি তোমাকে দু'পলক সময় মঞ্জুর করলাম। (হাসিমুখে বিজয়ীর ভঙ্গিতে দাঁড়াল)

মহাসত্ত্ব। আমাকে মুক্তি দাও। তোমার যুদ্ধক্ষত সারিয়েছিলাম, মনে আছে? এখানে তো

অনেকের তেমনি ক্ষত, তেমনি যন্ত্রণা। আমাকে ছেড়ে দাও।

ইখতিয়ার। (একটু চিন্তা করে) আচ্ছা, যাও। কিন্তু দ্যাখো হেকিম, মানুষের চিকিৎসাই কোরো। সওয়ার ভুলে আবার ঘোড়ার ক্ষত সারাতে বোসো না। তোমার কাছে তো সোওয়ার আর ঘোড়ার তক্‌লিফ সমান। (মহাসত্ত্ব নত মস্তকে চলে গেল) ইলতুৎমিস পাহারায় থাকো। চারিদিকে পাথর দিয়ে ঘেরা এমন শিবির আর পাওয়া যাবে না।

ইলতুৎমিস। ছিপাহছালার কি একা এই রাত্রিতে সহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ানো উত্তম বিবেচনা করেন? চারিদেকে শত্রু ক্ষিপ্ত হয়ে আছে।

ইখতিয়ার। উপায় কী ইলতুৎমিস? যারা গঙ্গা পার হয়ে এল তাদের এক জায়গায় জমায়েত করতে হবে তো। সারি বেঁধে দাঁড় করাতে হবে। আজ রাত্রিতে বেশি লুটপাট করলে কাল সকালে রাজার সৈন্যদের সামনে দাঁড়াতে পারবে না। আমি যাচ্ছি। আর শোনো, কেউ যদি প্রবেশ করে, সে যেই হোক আটক করবে।

ইখতিয়ার চলে গেল। ইলতুৎমিস মঞ্চের উপরে উঠে দাঁড়িয়ে পদচারণা করল। মঞ্চের উপরে কবির পাণ্ডুলিপিটি পড়ে ছিল, সেটা তুলে নিয়ে দেখল, তারপর মঞ্চেব উপরে ফেলে দিল। স্তম্ভের গায়ের প্রদীপের সারিগুলি হঠাৎ নিভে গেল। ব্যাপারটা এত আকস্মিকভাবে হল যে ইলতুৎমিস খানিকটা চমকে উপরের দিকে তাকাল। খোলা আকাশের চাঁদের একটু খালি আলো তার মুখের উপরে এসে পড়ল, তাবপর অন্ধকার হয়ে গেল। স্তম্ভের প্রদীপগুলি ইতিমধ্যে প্রায় সবই নিভে গিয়েছিল। ফলে আকাশের চাঁদের আলো ছাড়া আর কোনো আলো ছিল না। আকাশে মেঘও ছিল। বিচক্ষণ ইখতিয়ার এই রাত্রিটি সেজন্যই বেছে নিয়েছিল অভিযানের জন্য। কিন্তু ইলতুৎমিস অন্ধকারে বিচলিত হয়ে উঠল।

ইলতুৎমিস। কই হ্যায়?

দু'জন পাঠান সৈন্য সাজঘর থেকে প্রবেশ করল।

পাঠান সৈন্য। জনাব।

ইলতুৎমিস। বড় অন্ধকার, মশাল জ্বালো।

পাঠান সৈন্য। মশাল—বন্দে আলি, মশালের কোনো ব্যবস্থা নেই।

ইলতুৎমিস। এদের ঘরের ভেতরে কিছু পেলে না?

পাঠান সৈন্য। জি কেতাব আছে, আর রকম-রকম পোশাক। আদমি, জেনানা কেউ নেই।

ছুটতে-ছুটতে শ্রমণ প্রবেশ করল। ইলতুৎমিস বিচলিত হয়ে উঠল।

ইলতুৎমিস। হুঁশিয়ার।

শ্রমণ। দাঁড়াও-দাঁড়াও, ভুলে গেছি। পেয়েছি, পেয়েছি।

মহাসত্ত্ব এগিয়ে গিয়ে সূত্রধারের হস্তচ্যুত কবির নাটকের পাণ্ডুলিপিটি কুড়িয়ে নিল।

ইলতুৎমিস। হ্যাই। কৌন হ্যায় রে?

শ্রমণ। কিছু না, কিছু না। এটা অস্ত্র নয়, একখানা নাটক শুধু।

বাইরে কোলাহল ও আর্তনাদ

ইলতুৎমিস। হুঁ। কেতাব? ফিকির বটে।

শ্রমণ। সত্যি তাই, সত্যি তাই। ফিকির নয়। এ-কেতাবের মূল্য অনেক।

ইলতুৎমিস। ঠিক আছে। আমি ইলতুৎমিস আছি, ইখতিয়ার নয়। বহুত আচ্ছা অভিনেতা আছে বাঙালিরা। (মহাসত্ত্বের হাত থেকে পুঁথি নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল)

ইলতুৎমিস। তুমি আটক। বাঁধো একে।

দু'জন পাঠান সৈন্য অগ্রসর হয়ে মহাসত্ত্বের হাত চেপে ধরল।

শ্রমণ। কেন-কেন ইখ্‌তিয়ার আমাকে মুক্তি দিয়ে গেল শোনোনি?

ইলতুৎমিস। ইখতিয়ারের হুকুমেই তুমি বন্দী।

পাঠান সৈন্যরা শ্রমণকে স্তম্ভের কাছে নিয়ে নিয়ে তার হাত দু'টি স্তম্ভের দু'পাশে কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল। মনে হচ্ছে শ্রমণ স্তম্ভ থেকে উদ্বাহু হয়ে ঝুলছে।

শ্রমণ। আমি, আমি ভিক্ষু মহাসত্ত্ব, বন্দী আমি মহাসত্ত্ব—আমি বন্দী?

(কথাগুলি বলতে-বলতে অট্টহাসিতে শতদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল শ্রমণের মুখ। সে অট্টহাসিতে বিদ্রোহ ছিল, কিন্তু সহসা তার হাসির পরিবর্তন হল। তাতে স্নেহ ও করুণা আসতে লাগল। মধুর হয়ে উঠল হাসি। ঝরণার কলতানের মতো অজস্র ও মধুর হতে-হতে অকস্মাৎ সে হাসি থেমে গেল। শ্রমণের সর্বাঙ্গ স্থির হয়ে গেল। মাথাটা ঢলে পড়ল)।

পাঠান সৈন্য। কী এ? ইয়া আল্লা—তুক্ নাকি?

দ্বিতীয় পাঠান সৈন্য। আরে ও কে আসে জিন?

ইলতুৎমিস। (তরবারি নিষ্কাশিত করে) পিছিয়ে এসো।

পাঠান সৈন্য ও ইলতুৎমিস স্তম্ভের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সোমা আঁচলে ঢাকা প্রদীপ নিয়ে সোপারের পথে প্রবেশ করল।

সোমা। কবি? মহাসত্ত্ব! কবি! (তীক্ষ্নস্বরে ডাকল কিন্তু ভয়ে হাঁপাচ্ছে) মহাসত্ত্ব? (শ্রমণকে দেখে এগিয়ে) প্রভু আপনি এখানে? আপনাকে খুঁজছি। আপনাকে পাচ্ছি না, কবিকে পাচ্ছি না, ওরা বোঝে না—তা হলে নটীর জীবনে কলঙ্ক ছাড়া আর কী রইল। মহাসত্ত্ব-

সোমা প্রদীপ নিয়ে মঞ্চে উঠতে যাবে এমন সময় ইলতুৎমিসের তরবারি বিদ্যুতের মতো তাকে আঘাত করল। সোমা কাতরোক্তি করে মঞ্চের নিচের ধাপে লুটিয়ে পড়ল।

সোমা। (একটুপরে) প্রভু, প্রভু এই কি মহাযোগ? এই কি বিরাম?

ইলতুৎমির ও পাঠান সৈন্যরা স্তম্ভের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় ভীমা কামন্দক ও তার একজন সঙ্গী প্রবেশ করল।

ভীমা। (দৃশ্যটা অনুভব করে) একি নাটক হচ্ছে নাকি? ভালো করে দ্যাখ তো, মধুর নেশায় ঠিক ঠাহর হচ্ছে না।

সঙ্গী। না ভীমাদাদা, নাটক শেষ করে বাড়ি গেছে। মঞ্চের পাহারা রেখে গেছে।

ভীমা। তবে যে চেঁচামেচি শুনলাম, যুদ্ধ-যুদ্ধ নাটক যেন—এরই মধ্যে শেষ হল!

সঙ্গী। দেখছ না যখ বেঁধে রেখে গেছে থামে। পাহারার যখ।

এমন সময়ে আকাশ বোধ হয় মেঘমুক্ত হল। শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদের অজস্র কিরণ এসে পড়ল শ্রমণের মুখে। মনে হল যেন তার দেহ থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

ভীমা। ও বাবা, এ যখ নয় রে। কোনো ঠাকুর। প্রণাম কর, প্রণাম কর। জ্বলছে দেখছিস না! হে ঠাকুর, ভীমার অপরাধ ক্ষমা কোরো। সে একটু বোকা। একটু বুদ্ধি দাও।

ভীমা ও তার সঙ্গী প্রস্থান করল। মহাসত্ত্ব অজস্র কিরণে কখনও-কখনও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে লাগল।

যবনিকা

রচনাপ্রসঙ্গ

আলাপচারিতায় অমিয়ভূষণ বারেবারেই খোলামেলা। তখন তিনি নিজের ভালো লাগা-মন্দ লাগা, নিজের ভাবনা-চিন্তা-পাঠের জগৎ নিয়ে মুখোমুখি বসেন। কথায় তাঁকে পেয়ে বসে। মানুষ, পৃথিবী, যাপিত জীবন সবটা নিয়ে তিনি তখন আর-এক মানুষ যেন। এত বেশি সাক্ষাৎকার, কথোপকথন বা আলাপচারিতা আর-কোনও বাঙালি সাহিত্যিকের আছে কিনা ঠিক জানা নেই। কথায় কথায় তাঁর রচনাকৃতি যেমন স্বাভাবিকভাবেই চলে আসে, প্রাসঙ্গিক সূত্রে সে-রকমই উঠে আসে সমাজ ঘিরে সাহিত্যভাবনা। উপন্যাসের ভাবনা নিয়ে লিখেছেন প্রবন্ধ, কিন্তু বলেছেন বোধ হয় সবচেয়ে বেশি। 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় অরুণেশ ঘোষের সঙ্গে ১৯৭৫-এর অক্টোবর মাসে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারের অনেকটাই জুড়ে আছে সাহিত্যভাবনা। সাক্ষাৎকারটি ১৯৮৩-র জানুয়ারিতে পুনর্মুদ্রিত হয় বিজ্ঞাপনপর্ব ১০ সংখ্যায়। অমিয়ভূষণের সাহিত্য-মনন বুঝতে কোথাও হয়তো এই নির্বাচিত অংশটুকু সাহায্য করে।

যখন আমি প্রথম লেখা শুরু করি এবং এখন যখন আমি লিখছি এই দুই আমি এক। কিন্তু এই দুই আমির মধ্যে তফাৎ হল এই : প্রথম যখন আমি লেখা শুরু করি তখন লিখেছি স্বীকৃতির জন্য, আজ লিখি আনন্দের জন্য—যে-আনন্দ আমি আর কোথাও পাই না। অত্যন্ত দামি মদ খেলে কিন্তু মাতাল না-হলে যে-অনুভূতি হতে পারে কলম হাতে আমার চরিত্রগুলোর মধ্যে আমি যখন বলতে থাকি তখন আমার সেই অনুভূতি হয়। কখনও মনে হয় মাথায় একটা পদ্ম আছে যা থেকে মধুস্রাব হচ্ছে এবং সে-মধু অ্যালকোহলের চাইতেও তীব্র আনন্দে আমাকে ভবে তোলে।

...

সাহিত্য রচনা হয় সমাজে, যেমন মানুষের সব শুভকাজ সব অপরাধ সমাজেই হয়ে থাকে। এদিক দিয়ে সাহিত্যকর্ম সামাজিক কর্ম, কেননা লেখক ও পাঠক এই দুইয়ে মিলে এক সমাজ আছে যেখানে সাহিত্য সৃষ্টি হয়। সাহিত্য একটা কম্যুনিকেশন, নিঃসঙ্গ মানুষের কোনো কম্যুনিকেশন নেই।

আর-পাঁচটা দেশের মতন ভারতবর্ষও UNO-র সদস্য, আর-পাঁচটা দেশের মতোই তার নানান সমস্যা—এদিক থেকে তাকে আলাদা করা যায় না। কিন্তু সংস্কৃতিগত দিক থেকে ভারতবর্ষের আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে।

আধুনিক সাহিত্য এই সংজ্ঞাটি সাহিত্যের ইতিহাসে যে-কোনো মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কে প্রয়োগ করা যায়। যে-কোনো দেশের সংস্কৃতি দশকে দশকে নতুন পোশাক পরে, কিন্তু তার পুনর্জন্ম হয় হাজার হাজার বছর পরে, সাহিত্যের ট্র্যাডিশন পুনর্জন্ম নেয় পাঁচশো সাতশো বছর পরে। কিন্তু যুগ থেকে যুগে তার ধরনধারণে চালচলনে পরিবর্তন আসতে থাকে। আমরা, ভারতীয়রা, মূলন 'পেগান' সংস্কৃতির লোক। কালিদাসের আমলে যে-'পেগান' ভদ্রলোক ছিলেন আর আজকের কলকাতায় যে-'পেগান' ভদ্রলোক আছেন মানুষ দুটি এক হলেও তাদের কথাবার্তা সামাজিক পরিস্থিতি চিন্তা অভীপ্সা এগুলিতে পরিবর্তন হচ্ছে। সাহিত্য সৃষ্টি করে একজন বর্তমান মানুষ, সাহিত্যের উপাদান সে সংগ্রহ করে বর্তমান জীবন থেকে। এই বর্তমান মানুষ সবসময়ই আধুনিক। এবং বর্তমান জীবনও কখনও অনাধুনিক নয় সেজন্য সবযুগেই আধুনিক সাহিত্য রচিত হচ্ছে। আমার মনে হয় ঐ আধুনিকতার স্বরূপ কী তা না-বললে এ প্রসঙ্গ শেষ হয় না। পরপর দুটি মহাযুদ্ধ সমস্ত পৃথিবীর মানুষের মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর সাহিত্য বলতে বর্তমান দিনে মুখ্যত যে-সাহিত্যকে বুঝি তা ইউরোপীয় ও আমেরিকান সাহিত্য। ভারতীয়, জাপানি, চীনা সাহিত্যে এই ইউরোপীয় সাহিত্য এমনভাবে অনুপ্রবেশ করেছে যে তাকে অর্থাৎ শেষোক্ত কয়েকটিকে ইউরোপীয় সাহিত্যের কমপ্লিমেন্টারি ছাড়া বেশি কিছু বলা যায় না। এই

ইউরোপীয় সাহিত্যের এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি ছিল ক্রিশ্চিয়ান ধর্মবিশ্বাস। এ-বিশ্বাসটা প্রায় মুছে গেছে। তাদের জীবনের উপাদান ছিল ইউরোপ আফ্রিকা এশিয়া এবং লাতিন আমেরিকায় ছড়ানো কলোনিগুলি থেকে আদায়-করা সহজলভ্য সুখ এবং আয়াস। সেই জমিদারি এখন নেই। ধর্মবিশ্বাস হারিয়ে জীবনের উপাদানে বিশ্বাস না-রাখতে পেরে কলোনিচ্যুত আলবেয়ার কাম্যুর মতো সাহিত্যিকরা জীবনের স্বরূপ খুঁজতে প্রশ্ন তুলে চলেছেন।

এটা সমাধানের যুগ নয়, সেজন্যই আধুনিক সাহিত্যের মূল সুর 'অ্যাবসার্ড'—যখন তা নয়, যখন অন্য সুর প্রাধান্য পেতে চেষ্টা করে তখন অবিশ্বাস প্রশ্ন ঘৃণা প্রভৃতি প্রকাশ পেতে পারে। বাংলা সাহিত্যেও এর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যাবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জেনকিন্স স্কুল শতবার্ষিকী স্মরণী, ১৯৬১।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করার, ১৯৩৪ সালে জেনকিন্স স্কুলের ছাত্র অমিয়ভূষণ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন।

নয়নতারা

'গড় শ্রীখণ্ড' অমিয়ভূষণের প্রথম উপন্যাস রচনা। যদিও গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় 'নয়নতারা'। ('গড় শ্রীখণ্ড' প্রসঙ্গে 'রচনাসমগ্র ১' দেখুন)। 'নয়নতারা' লেখকের 'নীল ভুঁইয়া' শিরোনামে প্রকল্পিত ত্রয়ী উপন্যাসের প্রথম পর্ব। প্রকাশনা সংক্রান্ত বিবরণ :

কলকাতা : নাভানা, ১৯৫৫ : ১৩৬১ বঙ্গাব্দ। এই সংস্করণে নী ল ভুঁ ই য়া শিরোনামে প্রকাশিত। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে উপন্যাসটি ধারাবাহিক ক্রমে হুমায়ুন কবীর-সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ন য় ন তা রা শিরোনামে প্রকাশিত হয়। 'নাভানা' সংস্করণের, ১৯৫৫ প্রথম, লেখকের ভূমিকা থেকে জানা যায়.

> এই বইখানির রচনাকাল ১৯৫৩-র আগস্ট-সেপ্টেম্বরে। ত্রৈমাসিক 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার চারটি সংখ্যায় 'নয়নতারা' নামে পর্বে পর্বে প্রকাশিত উপন্যাস থেকে এটি অভিন্ন। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় 'নীল ভুঁইয়া' নাম নেওয়ায় কোনো মৌল পরিবর্তন সূচিত হয়নি। 'নীল ভুঁইয়া' ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়, কারণ এর সবগুলি চরিত্রই কাল্পনিক। আবার, এটি ঐতিহাসিকও, যেহেতু তৎকালীন নীলাক্ত সমাজকে দেখবার চেষ্টা হয়েছে।

'নীল ভুঁইয়া' শিরোনামে নাভানা-প্রকাশিত উপন্যাসটির নতুন সংস্করণ 'নয়নতারা'। কলকাতা . ভারবি, : বঙ্গাব্দ। দ্বিতীয়বার প্রকাশের সময় অমিয়ভূষণ জানান :

'নীল ভুঁইয়া' নামে আমার যে-উপন্যাসখানি প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়াব পর সুদীর্ঘকাল অমুদ্রিত ছিল, 'নয়নতারা' তারই পরিশোধিত নতুন সংস্করণ—নতুন উপন্যাস নয়।

নাম-বদলের কৈফিয়ৎস্বরূপ বলা দরকার যে, 'নীল ভুঁইয়া' নামে যে-ট্রিলজি লেখকের কল্পনায় ছিল, প্রকৃতপক্ষে এটি তারই প্রথম খণ্ড। সংকল্প ছিল সমগ্র ট্রিলজি 'নীল-ভুঁইয়া' নামে খণ্ড-খণ্ড প্রকাশিত হবে। এখন অনুমান করছি কাহিনীর স্বয়ংসম্পূর্ণতার দরুণ বিভিন্ন খণ্ডের পৃথক নামকরণ যুক্তিযুক্ত হবে যদি পরিকল্পিত ট্রিলজির পরবর্তী খণ্ডগুলি লেখা সম্ভব হয়ও। সুতরাং লিখবার সময়ে ও 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় প্রকাশকালে এই খণ্ডটির যে-নাম ছিল তা ফিরিয়ে দেওয়া হল। ৩১ আষাঢ় ১৩৭৩

পুনর্মুদ্রণ · কলকাতা . অরুণা প্রকাশনী,
উৎসর্গ : 'আমার সব গল্পের দিদিমা কালোদি-কে উৎসর্গ করে ধন্য হলাম'।

জুলাই -তে প্রকাশিত 'এই সময়' পত্রিকা-তবফে গীতাংশু কর ও সৈয়দ কায়সর জামালের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ('অমিয়ভূষণের সঙ্গে তিনঘণ্টা') বর্তমান উপন্যাস প্রসঙ্গে জানা যায়

> প্রথমে বইটার নাম ছিল নীল ভুঁইয়া—এটা ট্রিলজি হবার কথা ছিল। তারপরে 'নয়নতারা' নাম দেওয়া হল এইজন্যে যে যখন দেখলাম যে 'নীল ভুঁইয়া' নামে ট্রিলজি কেউ ছাপতে চাইছে না, আমিও আর লিখতে পারছি না। ইতিহাসের ডিটেল্স বড় বেশি এসে যাচ্ছে, একশো বছরের ইতিহাসের ধারাটাকে ঠিক ধরতে পারছি না। সেই সময় ভাবলাম, এটা 'নয়নতারা' নামে আলাদা একটা বই-ই হোক। তারপব আবার মত বদলে যায়, তখন ট্রিলজির সেকেন্ড পার্ট 'রাজনগর' লিখতে আরম্ভ করি। এখন এই সম্পূর্ণ ট্রিলজি মিলে এর নাম 'নীল ভুঁইয়া' হবে। কিন্তু পার্ট বাই পার্ট—'নয়নতারা', 'রাজনগর'...এই রকম।

এই সাক্ষাৎকারে অমিয়ভূষণ উপন্যাসটির প্রেক্ষিতে বলেন .

> ওখানে এই জিনিসটা বলা আছে—আমরা যাকে রেনেশাঁস বলেছি, কালচারাল রিভাইভাল বলেছি, এই যে আমাদের হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত বাংলাদেশের উপর দিয়ে উনবিংশ শতকে যেসব পরিবর্তনগুলো হয়েছিল, যা নিয়ে নানারকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেখানে আমি দেখাতে চেয়েছি যে এর মধ্যেও সৌন্দর্য, রূপবোধ এবং জীবন ভালোবাসা—এগুলো এত মহার্ঘ যে বিভিন্ন সময়ের মধ্য দিয়েও এগুলি ফুটে ওঠে। এই যেমন বইটার শেষে রানী মানস-সরোবরে যাচ্ছে, সঙ্গে চাকর রূপচাঁদ। তাকে বলা হয়, তুই কেন যাবি, রানী তো আর ফিরবে না। কেননা, সবাই বুঝতে পারছে যে রানীর এই যাওয়া হিমালয়ের দিকে ; তিনি ততদিন হাঁটতে থাকবেন যতদিন আনসিন, আননোন শী ড্রপ্স ডাউন অন দ্য রোডসাইড। তাঁর জীবনে আব-কিছু করার নেই—তিনি স্বামীকে ভালোবেসেছেন, ছেলের প্রতি কর্তব্য করেছেন, রাজ্য চালিয়েছেন...সব করেছেন, কিন্তু যাকে তিনি ভালোবাসা দিতে পারেননি, সে হল পিয়েত্রো, মামাতো ভাই। এখন রানীর মনে পিয়েত্রো আর হিমালয় যেন এক হয়ে গেছে। বলা হয়েছে, কে এত প্রবীণ হিমালয়ের মতো? আমরা পিয়োত্রোকেও প্রবীণ দেখেছি। ভালোবাসাও উনি হিমালযের কাছে চান, ওর ভালোবাসাটাও এই স্তরে দাঁড়িয়ে গেছে। এই হচ্ছে বইটার শেষ। অর্থাৎ নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যা থেকে যাচ্ছে, তা লাইফ এবং লাইফ-এর পরিণতি। লাইফ বলতে বলা হযেছে ওই ইস্থেটিক ডিলাইট এবং লভ।

লক্ষ্য করার, কথাবার্তা হচ্ছে 'নয়নতারা'-র প্রসঙ্গে, চলে এসেছেন 'রাজনগর'-এ। এই প্রেক্ষিত তো 'রাজনগর'-এ। ত্রয়ী উপন্যাসের লক্ষ্য স্পষ্টত ধরা পড়ে। পরে 'প্রসঙ্গ . রাজনগর' দেখুন।

কথাপ্রসঙ্গে অমিয়ভূষণ জানিয়েছেন পিয়েত্রো রানীর 'মামাতো ভাই'—প্রকৃতপক্ষে পিসতুতো ভাই ও মামাতো বোন সম্পর্কে দুজনের।

রা জ ন গ র

নীল ভুঁইয়া/নয়নতারা প্রসঙ্গে জানা গেছে পরিকল্পিত ট্রিলজির দ্বিতীয় পর্ব 'রাজনগর'। গীতাংশু কর-সৈয়দ কায়সর জামালের সঙ্গে অমিয়ভূষণ তাঁর সম্পূর্ণ ভাবনা কী এই উপন্যাস নিয়ে জানিয়েছেন। 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার বঙ্গাব্দে 'রাজনগর' প্রকাশিত হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময়ে বর্ধিত ও পরিমার্জিত হয়।

প্রকাশনা সংক্রান্ত বিবরণ :
কলকাতা অরুণা প্রকাশনী,
উৎসর্গ : অপরূপজ্যোতি মজুমদার

'উত্তরদেশ' সাময়িকপত্রের ৯ : ২, জুলাই -তে অমিয়ভূষণ 'প্রসঙ্গ : রাজনগর' শিরোনামে জানিয়েছিলেন:

ত্রিশ বৎসর আগে ১৮৫৭ সালের সমাজ নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার কথা ভেবেছিলাম। সে-সমাজ নানাদিক দিয়ে কলকাতা মহানগরীর সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, আবার অন্যান্য বিষয়ে বিশিষ্টও ছিল। তখন অনুভব করেছিলাম এই চিন্তাভাবনা একটি ত্রিস্তর উপন্যাসের রূপ নেবে। ফলে প্রায় ত্রিশ বৎসর হল এই ট্রিলজির প্রথম উপন্যাস 'নীল ভুঁইয়া' প্রকাশিত হয়। 'রাজনগর' ট্রিলজির দ্বিতীয় উপন্যাস। তৃতীয় অংশ যার সম্ভাব্য নাম ছিল 'স্যর রাজচন্দ্র'—আমি তা না-লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

আমি বাস করি কলকাতা থেকে দূরে। বিভবশালী পত্রিকাগোষ্ঠীর সাহিত্যপত্রিকাগুলির সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই এবং কলকাতায় যে-সাহিত্যসম্পদ উৎপাদিত ও আত্মস্থ সে-সম্বন্ধে আমার ধ্যানধারণা নিতান্তই অল্প। তাহলেও ছোট পত্রিকাগুলিতে অধিকাংশ লেখাগুলির জন্যই কলকাতার সঙ্গে আমার ক্ষীণ যোগাযোগ আছে। আমার সীমিত পাঠকসমাজ কলকাতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এ থেকে আমাদের এক অংশ মনে হয় জানতেই পারে না অন্য অংশ কী করে বাঁচে। যাই হোক, 'নীল ভুঁইয়া'র নায়িকার নামে 'নয়নতারা' উপন্যাসটি পঞ্চাশের দশকে হুমায়ুন কবীরের 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় ধারাবাহিক বেরুতে আরম্ভ করে।

অন্যতম বিশিষ্ট আধুনিক কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। 'নীল ভুঁইয়া' সম্পর্কে তাঁর মতামত আমায় চিন্তিত করেছিল। তিনি বলেছিলেন, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক পটভূমিকে কেন্দ্র করে কোনো কিছু লেখা আধুনিক লেখকদের পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ বিষয়। এই বইটি যে একটি উপন্যাস এর উল্লেখেও তিনি বিরত ছিলেন। তবে এ ব্যাপারে আমার ভিন্ন অভিজ্ঞতাও হয়েছিল। প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী ও ঔপন্যাসিক ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় বইটি পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যদিও কয়েকটি বিষয়ে ত্রুটি তাঁর নজরে পড়েছিল তা সত্ত্বেও তাঁর প্রশংসা আমার অতীত ছিল। বীরেন্দ্র একজন সন্নিষ্ঠ বামপন্থী কবি বলে খ্যাতিমান ছিলেন। এই বইটি প্রকাশ হওয়ার পঁচিশ বৎসর পর আর-একজন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী, বর্তমানে ঔপন্যাসিক, বইটিকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত গুটিকয়েক উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্যতম বলে মূল্যায়ন করার কষ্ট স্বীকার করেন। এই ধরনের আরো অভিজ্ঞতা লাভ করেছি।...

ত্রিস্তর উপন্যাসটির প্রসঙ্গে ফিরে যাই। পিতামাতাব উদাসীনতা (সন্তানের ক্ষেত্রে) অসম্ভব বিষয় নয়, কিন্তু কোনো-কোনো সময় সে-রকম ক্ষেত্রেও অবহেলিত সন্তান হৃদয় সংলগ্ন হয়ে পড়ে। প্রায় আঠারো বৎসর আগে এই ত্রিস্তরের দ্বিতীয় উপন্যাস ধারাবাহিক প্রকাশে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু সে-সময়ে হুমায়ুন কবীরের পত্রিকা খুবই অনিয়মিত হওয়ার দরুণ উপন্যাসটির অর্ধেক অংশই বের হতে বৎসরের অধিকাংশ সময়ই চলে যায়। পত্রিকাটির পরিচালক সে-সময়ে আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যে পড়েন। তাঁকে খুবই পরিশ্রান্ত মনে হতো। যাই হোক, আমি পরবর্তী কিস্তিগুলি পাঠানো বন্ধ কবে দিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে উপন্যাসটি প্রকাশের জন্য চুক্তিবদ্ধ হতে জনৈক প্রকাশক আমায় রাজি করান। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর উপন্যাসটির অসমাপ্ত থেকে যায়।

চল্লিশ বৎসর কায়ক্লেশে চালিয়ে যাওয়া সামান্য চাকুরি থেকে সত্তর দশকের শেষদিকে অবসর নিই এবং আমার সহধর্মিণীর নিরবচ্ছিন্ন সাহচর্যের মধ্যে পূর্ণতা খুঁজে পাই। এটিকে ধরে রাখার জন্য আমি দিনের পর দিন ওঁকে একটি নতুন গল্প অথবা আমার অসমাপ্ত উপন্যাসগুলির একটি নতুন অধ্যায় শোনাতাম। মনে পড়ে, এইরকম কোনো এক বৈঠকে ওঁকে জিজ্ঞাসা কবেছিলাম যে আমার গদ্যরচনা পাঠক আকর্ষণ করার পক্ষে যথেষ্ট সরল কিনা অর্থাৎ ওঁর কি মনে হয়েছে যে আমার গদ্য সহজ নয়? অকথিত উত্তর। আমি বুঝতে পারলাম, এই গদ্যই একজন ভালোবেসেছে। এই অবস্থায় আমার ছোটগল্প উপন্যাস নভেলেট-এর কপিগুলি একসঙ্গে রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম যাতে নব্বই-এর দশকে অথবা প্রয়োজনে পরবর্তী শতকের প্রথম দশকে ব্যবহার করার জন্য এগুলি আমাদের সন্তানদের হাতে দিয়ে যেতে পারি। এই পরিকল্পনা অযৌক্তিক ছিল না। কেননা কৃতবিদ্য বীরেন্দ্রর অভিমত কয়েক দশকের অগ্রগতিতে যেমন বদলিয়েছিল কিংবা পরবর্তী এক প্রজন্ম যেমন এইসব সাহিত্যকর্মকে প্রশংসা করেছিল

তারই নিরিখে আমাদের ঐ ভাবনা হয়েছিল।

আশির দশকের একজন উদীয়মান লেখক হিসাবে নতুন প্রজন্মের সামনে উপস্থিত হতে আমি কিছুটা বিব্রত বোধ করেছিলাম। আনুমানিক এইসময়েই আর-একজন প্রকাশক অনেকদিন আগে লেখা আমার 'চাঁদবেনে' উপন্যাসটি ছাপাবার স্বত্ব ক্রয় করেন। আজকের এই টিভি যুগের উপযুক্ত করার জন্য ওই বিশাল আকারেব উ~ ্যাসটিকে ছোট করা কম আয়াসসাধ্য ছিল না। সেইজন্য আমি ওঁকে 'রাজনগর'-এর প্রস্তাব দিলাম। উনি সঙ্গে-সঙ্গে তা মেনে নিলেন। অতএব, আমি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত অংশটুকু আবার লিখে ফেলে উপন্যাসটি শেষ করলাম। এব পবের ঘটনা সকলেই জানেন। উপন্যাসটি ইতিমধ্যে দুটি পুরস্কার পেয়েছে। মনে হচ্ছে যদিও নব্বই-এর দশকে পৌঁছতে আর মাত্র কয়েক বৎসব বাকি, আমি আমার পাঠকদের আরো কাছে পৌঁছে গেছি।

কিন্তু, সর্বকিছুই যেন মানুষেব জীবনে জোয়াব-ভাঁটার মতো। সম্ভবত নব্বুইয়ের দশক আমায় শ্রুতিতে নেবে না। কেননা, আজকের দিনেও আমার গদ্য নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। আমি শুনেছি রাগী তরুণ যুবকরা স্বঘোষিত দাবি করেছেন যে, অনুগামীরূপে আমি যেন কাউকে আশা না-করি। কারণ আমার গদ্যে, এমনকী যখন দীনহীনদেরও চিত্রিত করি, কোনো ক্রোধের প্রকাশ থাকে না। বোঝাই যাচ্ছে, নোংবা ও জঘন্য শব্দগুলি এই গদ্যে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বাস্তববাদী (!) উপন্যাসের পক্ষে যা শোভন তাব চেয়ে একটু বেশিমাত্রায পবিচ্ছন্ন ও সংস্কৃত হযে পডেছে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমি নীচু, ভূমিহীন ও সর্বহাবাদেব সঙ্গে একই সমবেদনার দৃষ্টিতে অভিজাত ও বুর্জোযাদেবও এঁকেছি। অর্থাৎ উচ্চবিত্ত শ্রেণীকে আলাদাভাবে শোষক ও দুর্নীতিপবাযণ হিসাবে উপস্থিত করতে অসফল হযেছি।

একমাত্র আশা এই যে কালেব অগ্রগতির সঙ্গে চারপাশেব মানুষের চিন্তার জগৎ পূর্ণতা পাচ্ছে। বন্ধু বীরেন্দ্র, যৌবনোত্তব দিনে, পেশাদাব বামপন্থী থেকে একজন মানবতাবাদীতে পবিবর্তিত হন। সুভাষ, আব-একজন কবি, আমি সানন্দে লক্ষ্য করেছি, তাঁব হাত আর সবসময়ের জন্য মুষ্টিবদ্ধ করে বাখেন না। ভারতবর্ষে অদূব ভবিষ্যতে সহৃদয় নৈতিকতা হয়তো সমাজের উপর প্রভাব ফেলবে এবং জীবনেব জটিল আলোচনা নীতিবাদের চেয়ে সহৃদয়তার মাধ্যমেই বোধ হয় ভালোভাবে ব্যক্ত করা যাবে।

'বাজনগব' ১৯৮৬ সালেব বঙ্কিম পুবস্কাব ও সাহিত্য অকাদেমি পুবস্কারে সম্মানিত হয। সাহিত্য অকাদেমির তদানীন্তন সম্পাদক ইন্দ্রনাথ চৌধুবী এক তাববার্তায় জানান

AMIYABHUSHAN MAJUMDAR CARE ARUNA PRAKASHANI
. RAJNAGAR SETS SAHITYA AKADEMI AWARD (.)
CONGRATULATIONS ( )

বঙ্কিম পুরস্কার নিয়ে অবশ্য বিতর্ক বাধে। কলকাতার এক দৈনিক সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় শিবোনাম-খবর ছিল

'গোটা ব্যাপারটা আগেই ঠিক করা থাকে'। বা 'বিচারকরা দ্বিধাবিভক্ত, বঙ্কিম পুরস্কার পাচ্ছেন অমিয়ভূষণ মজুমদার'।

প্রসঙ্গক্রমে জানানো যেতে পারে, সালে কোচবিহারের ল্যান্সডাউন হল্-এ সাহিত্যকৃতির জন্য অমিয়ভূষণ মজুমদারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করে কোচবিহারেব ত্রিবৃত্ত সংস্থা। তখনকার কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এবং পুরস্কার অর্পণ কবেন। সঠিক জানা নেই এই অনুষ্ঠানেব আগে কোনও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান অমিয়ভূষণকে সম্মান জানিয়েছে কিনা। দিনটি ছিল ৪ মার্চ

সাহিত্য অকাদেমির প্রকল্পে RAJNAGAR অনুবাদ করেন কল্পনা বর্ধন, সালে। সম্প্রতি এক ব্যক্তিগত কথাবার্তায় তিনি বলেছিলেন যে উপন্যাসটির গঠন, বিষয়ের ভাষার ও ঋজুতা তাঁকে আকর্ষণ করে বলেই অনুবাদ করেছিলেন। লেখকের সঙ্গে তাঁর কোনও পরিচয় ছিল না, জানেন না অনুবাদের বিষয়ে লেখকের মতামত।

দীপিতার ঘরে রাত্রি

অমিয়ভূষণের প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের অন্যতম 'দীপিতার ঘরে রাত্রি' নির্দিষ্ট গল্পটির শিরোনামে নামাঙ্কিত হয়। কলকাতা : সিগনেট প্রেস থেকে ১৩৭২ : 1965 সালে প্রকাশিত হয়। গল্পটি কোনো সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা না-থাকায় পাণ্ডুলিপি-সূত্রের সালের তারিখ হিসাবে ১৪.৫.১৯৪৮ গণ্য করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপি-সূত্রে জানা যায়, 'দীপিতা' ছিল প্রথম শিরোনাম। লেখক তখন চাকরি-সূত্রে দার্জিলিং-এ ; সেখানেই ১৪.৫.১৯৪৮ তারিখে লেখা।

কলঙ্ক

পূর্বাশা, ১৪ : ১২, চৈত্র ১৩৫৮। 'দীপিতার ঘরে রাত্রি' গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত।

দুলারহিনদের উপকথা

চতুরঙ্গ, ১৪ : ৪, মাঘ-চৈত্র ১৩৫৯। কলকাতা : নিউ স্ক্রিপ্ট, ১৯৬২-তে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ 'পঞ্চকন্যা'-য় অন্তর্ভুক্ত। 'চতুরঙ্গ'-এ প্রকাশের সময়ে নাম ছিল 'ভুখন'। পাণ্ডুলিপি-সূত্রে জানা যায় আদি শিরোনাম ছিল 'গল্প'।

অঘটনা

পূর্বাশা, ১৫ : ১২, চৈত্র ১৩৫৯। 'দীপিতার ঘরে রাত্রি'-র অন্তর্ভুক্ত।

শহিদ

পূর্বাশা, ১৮ : ১, মাঘ ১৩৬৩। 'দীপিতার ঘরে রাত্রি'-র অন্তর্গত। এ গল্পগ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণে পরিবর্ধিত পাঠ লক্ষ্য করা যায়।

সাগ্নিকা

'চতুরঙ্গ'-এ প্রকাশিত। পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানা নেই। 'পঞ্চকন্যা' গল্পগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত। পাণ্ডুলিপি-সূত্রে জানা যায়, ৬ মার্চ ১৯৪৮ দার্জিলিং-এ থাকার সময়ে রচনা। পাণ্ডুলিপি ও পত্রিকার শিরোনাম গৃহীত হয়েছে। সে অর্থে বিন্যাসে ভ্রান্তি রয়ে গেল।

মহাসত্ত্ব

চতুরঙ্গ, ১৫ : ১, বৈশাখ ১৩৬০ : 1953।

ডাক ও তার দপ্তর, কোচবিহার শাখার রিক্রিয়েশন ক্লাব নাটকটি কোচবিহারের ল্যান্সডাউন হল্-এ ১৯৫৩-র কোনো একসময়ে মঞ্চস্থ করে 'সূত্রধার'-এর ভূমিকায় ছিলেন অমিয়ভূষণ। এই সময়কালে অমিয়ভূষণ মজুমদার ইউনিয়ন অভ পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ ওয়ার্কার্স-এর কোচবিহার শাখার সম্পাদক ('সচিব')। লেখকের পারিবারিক ও সংশ্লিষ্ট তথ্যসূত্রে জানা গেছে।

রচনাসমগ্র ২ কাঙ্ক্ষিত পূর্ণতা পেল না। অসঙ্গতি, অপূর্ণতা, অপ্রাসঙ্গিক মনে হতেই পারে। তাঁর লেখকজীবনের দীর্ঘপর্বের সব সন্ধান করতে পেরেছি এমন নয়, সারা জীবনই ছোট পত্রিকা, স্বল্পায়ু পত্রিকায় লিখেছেন। ফলে সীমাবদ্ধতা থাকছেই। তাঁর পাঠকদের কাছে তাই অনুরোধ কোনো তথ্য, রচনার সন্ধান থাকলে জানিয়ে যদি বাধিত করেন, এমনকী রচনাসমগ্রের অপূর্ণতা-সহ তাঁদের সহৃদয় মতামত।